“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

উজ্জ্বলভারত

নব পর্য্যায়

মাঘ—১৩৬০—পৌষ ১৩৬১

সম্পাদক

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

সপ্তম বর্ষ

নরনারায়ণ আশ্রম
৮এ রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা ২৬

উজ্জ্বলভারত

বর্ষসূচী

৭ম বর্ষ (১৩৬০ হইতে ১৩৬১ পৌষ পর্য্যন্ত)

উজ্জ্বলভারত

৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

মাঘ ১৩৬০

নববর্ষের প্রণতি

আরও একটা বৎসর কাটিয়া গেল। এই মাঘ হইতে উজ্জ্বলভারত তাহার সপ্তম বর্ষ আরম্ভ করিল। দীর্ঘকাল আগে জটিলতম ঘটনাসমূহে বিচরণ করিবার পথ দেখাইয়া যে সহজ জীবনের খবর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, আজিকার বিশ্বের জটিল আবর্তের মধ্যে সেই সহজ জীবনের সাধনা প্রয়োজন। আমাদের নূতন বৎসরের নূতন দিনে সেই ভূমাস্বরূপ সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের প্রণতি জানাই। বিশ্বসভ্যতা আজ তাঁহাকে চায়। আদর্শকে বাস্তবের সঙ্গে মিলাইবার তাঁহার এই সহজ জীবন-দর্শনকে আজিকার কালে অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষের বুকে যিনি দার্শনিকভাবে প্রস্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শনের আলোকে জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা জনসমাজের কাছে পৌছানই উজ্জ্বলভারতের কাজ। আজ এই নূতন বৎসরের নূতন দিনে শ্রীনিত্যগোপালকে আমাদের মধ্যে ধ্যান করি—তাঁহার সহজ জীবন আমাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হউক। ইহার পরেই মনে পড়ে মহাত্মাজীর কথা। ছয় বৎসর আগে মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণের দিনে উজ্জ্বলভারত প্রথম যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। আজ তাঁহাকে আমাদের প্রণতি জানাই। শ্রীনিত্যগোপালের দর্শনকে বাস্তবতার বিরাট ক্ষেত্রে রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেকাংশে রূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন মহাত্মাজী। তাঁহার এই ব্রতকেই উজ্জ্বলভারত আগাইয়া লইয়া যাইবে। আজ আর স্মরণ করি আমাদের সেই বন্ধুবান্ধব গ্রাহক অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের যাহাদের সহযোগিতার জন্যই আমাদের এতদূর পর্য্যন্ত আসা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাদিগকে আমাদের প্রাণের অকুণ্ঠ

প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাই। উজ্জ্বলভারত সামগ্রিকতার বা সমন্বয়ের জীবন-দর্শন উৎপীড়িত মানুষের দরবারে উপস্থিত করিতে চাহিতেছে, তাহাকে সুষ্ঠু রূপদান করিতে হইলে আমাদের অধিকতর সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা সকলের প্রাণের স্পর্শকে স্মরণ করিয়া নূতন দিনের যাত্রা আরম্ভ করিলাম। বিশ্বের ব্যক্তিগত ও জাতিগত মহাপ্রাণ সুস্থ হউক, স্বস্থ হউক, ইহা দেখিতেই আমাদের যাত্রা সুরু।

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

বিশ্বসঙ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাল'-চক্র ও চক্রী-'পুরুষের' সমন্বয় করিয়া দিব্য একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চঞ্চল বাহিরে মজদুররাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটিই একান্ত সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথাস্থানে ও যথামানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বসঞ্জাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোঠে মাঠে স্বরাজসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজ-মূর্ত্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্য্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্ম-জ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটীতেই চাষী-রাজর্ষি-ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে স্বার্থক আস্বাদন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সংঘাবৃত। কৃষিক্ষেত্র-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা—'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'।

উজ্জ্বলভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে।

আমাদের কথা

'নূতন সমুদ্রতীর পানে দিতে হবে পাড়ি'

তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি

—কী উদাত্ত আহ্বান! সেই আটত্রিশ বৎসর আগেকার আহ্বান আজও আকাশে বাতাসে মিশে গিয়ে সেই একই সুরে ডেকে চলেছে। চারদিকে বিরুদ্ধ আবেষ্টন, সে ডাক শোনা যায় কি না যায়! কিন্তু যার কান আছে শোনবার মত প্রাণ আছে, সে শোনে সেই প্রচণ্ড আহ্বান, সেই ভীষণ-মধুর ডাক—

ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্র-তীরে—
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,—
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরণো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা
আর চলিবে না।

—এ কি শুধু আটত্রিশ বৎসরের আহ্বান? বন্দরের নোঙর কি এইবারই শুধু তুলতে হল, বন্ধনকাল কি শুধু এইবারই শেষ হল? তা

নয়; যুগে যুগে নূতনের আহ্বান আসে, পুরণো ভাব, পুরণো পুঁজি দিয়ে নূতন দিনে আর বেচাকেনা চলে না, মুদ্রা অচল হয়ে যায়, তখনই বন্দরের নোঙর তুলতে হয়। সম্মুখের আহ্বান এসে গেছে, কিন্তু তবু পেছনের আকর্ষণও তো আছে। ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে কালোয় ঢেকেছে আলো, কিন্তু তবু এগিয়ে যাওয়া তো সহজ নয়!

বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জ্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;—

অতীতের সংস্কার আকড়ে রাখে, এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়! কিন্তু তবু ডাক যে আসে—

যাত্রা করো যাত্রা করো যাত্রীদল
উঠেছে আদেশ
বন্দরের কাল হল শেষ।

এ তো বড় বিপদ হলো, ডাক কাণে এসে পৌছয়, কিন্তু মা কাঁদিছে পিছে। কিন্তু এই বিপদকে যুগে যুগে মানুষ ভেদ করে এসেছে। নূতনের ডাক যে শুনেছে, পেছনের আরামের শয্যাতলকে আকড়ে সে পড়ে থাকে নি, নূতনের সহস্র বিপদকে বরণ করে নূতন কালের নোয়ার নৌকায় উঠে সে বসেছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনিশ্চিত অমৃতের সন্ধানে।

মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় ত নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।

কেন মানুষের কাছে নূতনের এ আহ্বান আসে? কালের ধর্মই হচ্ছে একদিকে সে জীর্ণ করে তোলে আর একদিকে নূতনকে সে জন্ম দেয়। অশীতিবর্ষীয় লোলচর্ম বৃদ্ধের কোলে প্রাণচঞ্চল শিশু সে কথা জানায়। কালের

আঘাতে শাস্ত্র, সমাজ, রাষ্ট্রও এমনি করেই জীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন আবার তাকে নূতন ঢঙে, নূতন রঙে দেখবার দরকার হয়ে ওঠে—যাকে বলি নিউ ওরিয়েণ্টেশান। যে শাস্ত্রব্যবস্থা মানুষে মানুষে ভেদের সৃষ্টি করে কাউকে বড় কাউকে ছোট করেছে, সে ব্যবস্থা আজ চলবে কেমন করে? তাকে আজ নূতন করে নিতেই হবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মৌলিক সমতা সমস্ত যোগ্য হওয়ার প্রয়োজনীয়তার পিছনেও স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আজ আর দ্বিতীয় পথ নেই। পুরণো সমাজের সমস্ত ব্যবস্থাও আজকের দিনে হুবহু চালানো সম্ভব নয়। যে সমাজ নারীকে তার প্রাপ্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করতে এত বেশী উদ্যোগী ছিল, সে সমাজের সে ব্যবস্থাকে আজ নূতন যুগের ভোরে চালান যাবে না। যে রাষ্ট্রব্যবস্থা ধনিক শ্রমিকের উপযুক্ত সম্পর্ক ও স্থান-নির্ণয় না করতে পারবে, আজকের দিনে তার অস্তিত্ব কেমন করে সম্ভব? বেরিয়ে তাই পড়তেই হবে। নূতন আবেষ্টনে

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে-দেশ,—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে—
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল
যত অশ্রুজল
যত হিংসা হলাহল
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।

—আজকের অবস্থা এই-ই—নূতনের আহ্বান এসে গেছে অথচ চারদিকে উথলে উঠছে হলাহল। চারদিকে আজ অন্যায় অসত্য অভিসন্ধির ক্রূর বিদ্রূপ। সমস্ত দিকে ভাঙন যখন সুরু হয় তখন এমনি করেই দুর্দিন উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ

জাতি-অভিমান

মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান

এই অবস্থার সৃষ্টি করে তুলেছে। ব্রাহ্মণ আজ আর ব্রাহ্মণ নেই, ক্ষত্রিয়ও ক্ষত্রিয় নেই, বৈশ্য শূদ্র কেউ নিজ নিজ আত্মধর্মে স্থিত নেই—প্রত্যেকেই তার ধর্ম খুইয়েছে। ধর্ম খুইয়েছে নূতন করে সৃষ্ট হয়ে উঠবে বলে! দিব্য ব্রাহ্মণ দিব্য ক্ষত্রিয় দিব্য বৈশ্য দিব্য শূদ্রের কল্পনা এসে গেছে মানুষের মধ্যে—এখন তাকে রূপ দেবার কাজটুকু বাকি। এমনি সকল ক্ষেত্রেই—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল ক্ষেত্রেই পুরণো অর্থে পুরণো রূপে আজ আর তাদেরকে চালান যাবে না।

পুরণো সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনা যখন চলে না, তখন তাকে একেবারেই ছেড়ে আসে কি মানুষ? না—অভিব্যক্তির ইতিবৃত্ত অন্যরূপ সাক্ষ্য দেয়। সবই থাকে, অথচ সেই সবেরই নূতন রূপ নূতন প্রকাশ অভিব্যক্ত হয়। অতীতকে একেবারে মুছে ফেলে বর্তমান সৃষ্টি হয় না। বৈষ্ণব কবি যখন গাইলেন

বহুদিন শ্রবণে শুনেছি ঐ নাম
কভু তো পরাণ করে নি এমন
কি জানি কি এক নব ভাবোদয়
হৃদয় মাঝারে হতেছে।

তখন তিনি কি বোঝালেন? বহুদিনের শোনা নামই নিমাইর মুখে আজ নূতন করে শোনা হল, নূতন অর্থ নিয়ে আজ আমার হৃদয়-তন্ত্রীতে বেজে উঠল সেই নাম—সবটাই গেল বদলে। তেমনি সমাজ শাস্ত্র রাষ্ট্র সবই নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিতে চাইছে নূতন মানুষের কাছে। চির পুরাতনকে উজ্জ্বলভারত চির নূতন করে নেবে—এই তার ব্রত।

শুধু এক মনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয় ধ্বজা তুলে।

তৃষ্ণা

নিশিকান্ত

এসো পরম ব্যথা, এসো পরম তৃষা
দাও বহ্নি জ্বালা তব দাহন দিশা,
এই সুপ্ত হিয়া
তোলো অতন্দ্রিয়া,
হোক তীব্রতর মম বিরহ নিশা।

মোর চলার পথে অবিচল করিয়া
চলো মুক্ত-ধারার গতি নির্ঝরিয়া,
শত কৃষ্ণ-শিলা
টুটি স্বচ্ছ লীলা
বহি সিন্ধুপানে চলো তরঙ্গিয়া।

এই মল্লি লতার ম্লান কুঞ্জ টোটো,
মম কণ্টকিত শাখে গোলাপে ফোটো
মম প্রণয় জাগে
যেন রক্ত রাগে
মম হৃদয় বিমস্থিয়া বিকশি ওঠো।

তুমি ধ্রুব দিশারী অভিসার লগনে
তব মন্ত্র জপো মম সঙ্গোপনে ;
মোরে গভীর করো,
মোরে ডুবায়ে ধরো
রাখো দুঃখ-অতল-মণি সঞ্চয়নে।

মরু-সরনী 'পরে করো অগ্রগামী,
দেখি ছায়ার মায়া যেন কভু না থামি,
নদী মরীচিকাতে
যেন গতি না বাঁধে,
তব রৌদ্র তাপের সুরা লভিব আমি।

"আর নাইরে দেরী, আর নাইরে দেরী",
বলি' বক্ষে বাজাও তব বজ্র ভেরী

মম মঞ্জু বীণা
হোক ধূলী বিলীনা,
আনো করাল প্রলয় মম প্রভাত ঘেরি।

ওগো সর্ব্বগ্রাসী, ওগো সর্ব্বনাশা,
দাও নিমেষে নাশি মম সকল আশা,
তব একটি আশয়
তব একটি ভাষায়
মম সকল কথা আজি লভুক ভাষা।

এসো দীর্ণ করি' ঘন পুঞ্জমসী,
এসো রূপায়-সোনায়-গড়া তীক্ষ্ণ অসি !
তব নির্ম্মম সে
খরধার পরশে
মোহ-কুজ্ঝটিকার প্রেম পড়ুক খসি।

মোর চন্দ্রমারে দাও রাহুর বাধা,
করো কঠোরতর তা'র সাধন সাধা,
রাহু গ্রাসিবে যত
শশী হাসিবে তত
শেষে সফল হবে তার জ্যোতির শাদা।

এসো হে অনুভূতি, এসো হে অনুপম,
চির শত্রুরূপী, চির বন্ধু মম।
মম মৃৎ পেয়ালা
নীল অগ্নি জ্বালা
তব চুল্লীতলে করো কঠিনতম।

শেষে পূর্ণ হবে সেই পাত্রখানি
তব স্বর্গমিলন-সুধা দেবে গো আনি;
আমি তাহারি লাগি
আছি রাত্রি জাগি'—
মম বেদন বেলা লভি ধন্য মানি।

করো তীব্রতর এই বিরহ নিশা,
দাও বহ্নি লীলায় তব দাহন দিশা,
মম আকুল হিয়া
রাখো অতন্দ্রিয়া,
ওগো পরম-ব্যথা ! ওগো পরম তৃষা !

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নবমোঽধ্যায়ঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ৯।১৩

(পক্ষান্তরে) মহাত্মানঃ [বিশালচিত্ত; ক্ষুদ্রচিত্ত নয়] মাং [পুরুষোত্তম আমিকে] হে পার্থ, দৈবীং [শরণাগতিরূপা, পরমোজ্জ্বলা, পরম ক্রীড়াময়ী, পুরুষোত্তমময়ী] প্রকৃতিম্ [প্রকৃতিকে] আশ্রিতাঃ [স্বয়ং-মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া আশ্রিত] ভজন্তি [ভজনা করেন] অনন্যমনসঃ [পুরুষোত্তম 'আমি' ও বিশ্বরূপের সঙ্গে অন্যমন না রাখিয়া অনন্যমন হইয়া; পুরুষোত্তম ব্যতীত অন্যে যাহাদের মন নাই, এবং পুরুষোত্তমে যাহাদের 'অন্য' বলিয়া বুদ্ধি নাই, তাহারাই অনন্যমনা] জ্ঞাত্বা [জানিয়া] ভূতাদিম [যিনি ভূতের আদি; এবং ভূত যাহার আদি; যিনি ভূতের অন্তে দাঁড়াইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন তিনিই ভূতের আদি হইবার যোগ্য ভূতাদি] অব্যয়ম্ [অব্যয়]।

হে পার্থ, দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত মহাত্মাগণ আমাকে ভূতসমূহের আদি ও অব্যয় জানিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করেন। ৯।১৩

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ৯।১৪

(কি প্রকারে ভজনা করেন?) সততং [কালের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের বাহিরে থাকিয়া সর্ব্বদা] কীর্ত্তয়ন্তঃ [সকল কায়মনোবাক্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে] মাং [আমাকে] যতন্তঃ চ [এবং যত্ন করিতে করিতে, দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সবটুকুতে পুরুষোত্তমকে ধারণা করিবার জন্য যত্ন করিতে করিতে] দৃঢ়ব্রতাঃ [পুরুষোত্তমে আত্ম সমর্পণ করিয়া 'তেষু চাপ্যহম্' বাক্যের সার্থকতা-স্বরূপ সকল প্রাণ ও প্রজ্ঞাদ্বারা তাঁহাকে সঙ্ঘজীবনে ধারণ করার ফলে দৃঢ়, স্থির, অচঞ্চল হইয়াছে পুরুষোত্তম-ব্রত যাহাদের] নমস্যন্তঃ চ [এবং নমস্কার করিতে করিতে, জীবনের সবটুকু পুরুষোত্তম জীবনকে ধারণ

করিবার অনকূলে নোয়াইয়া দিতে দিতে] ভক্ত্যা [ভক্তি পূর্ব্বক] নিত্যযুক্তাঃ [পারমার্থিক স্তরে স্বরূপসিদ্ধ নিত্যযোগে যুক্ত] উপাসতে [উপাসনা করেন, অর্থাৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রের সাধনার সিদ্ধির আস্বাদনরূপে পুনরায় দ্বিতীয় যোগের অনুষ্ঠান করেন। পারমার্থিক নিত্যযুক্ততা বোধ জাগ্রত না হইলে উপাসনাই হয় না]।

সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন করিয়া এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া যত্ন করিতে করিতে এবং ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করিতে করিতে নিত্যযুক্তগণ উপাসনা করেন। ৯।২৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।

একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ৯।১৫

(তাঁহারা কোন কোন্ প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাই বলা হইতেছে) জ্ঞানযজ্ঞেন [ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা] যজন্তঃ [পূজা করিতে করিতে] মাং [অন্য উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে] চ অপি অন্যে [অন্য কোনও ব্যক্তি] উপাসতে [উপাসনা করেন] (সেই জ্ঞান কি কি রূপ ধারণ করে ?) একত্বেন [ভক্ত-ভগবানের একত্ব দ্বারা] (কেহ কেহ) পৃথক্ত্বেন [ভক্ত-ভগবানের পার্থক্য বজায় রাখিয়া উপাসনা করেন] [কেহ কেহ বা] বহুধা [বহুরূপে অবস্থিত সেই এই ভগবান] বিশ্বতোমুখম্ [বিশ্বরূপকে বহু প্রকারে উপাসনা করেন]।

জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা পূজা করিতে করিতে আমার উপাসনা করেন ; সেই জ্ঞান কাহারও একত্ব বিষয়ক, কাহারও কাহারও বা পৃথকত্ব বিষয়ক, কেহ বা বহু ভাবে অবস্থিত বিশ্বরূপ ভাবিয়াও উপাসনা করেন। ৯।১৫

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম।

মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ৯।১৬

(পুরুষোত্তম যে বিশ্বতোমুখ, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন) অহম্ [আমি] ক্রতুঃ [বেদ-বিহিত যজ্ঞ ; পুরুষোত্তমস্তরেই ক্রতু ক্রতুপদবাচ্য সার্থক, পুরুষোত্তম আমির অংশ, পুরুষোত্তম-আমি ; কিন্তু রাগদ্বেষের স্তরে বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত সত্যধর্ম্মের গ্লানিগ্রস্ত শাসনের বুকে, দুর্য্যোধনের দেশে ক্রতু ব্যর্থ। এখন ক্রতুর সব-কিছু মর্য্যাদা ও শক্তি নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইয়া পুরুষোত্তম আমিই ক্রতু] অহং যজ্ঞঃ [পুরুষোত্তম স্তরে স্মার্ত্ত যজ্ঞ যজ্ঞ হিসাবে আমারই আস্বাদন, আমি ; রাগদ্বেষের স্তরে যজ্ঞ সারহীন খোঁসামাত্র] স্বধা অহম্

[পুরুষোত্তম স্তরে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি শ্রাদ্ধের হিসাবেই আমার আস্বাদন, আমি ; পক্ষান্তরে আমার বাহিরে উহা বিকল্প, বিগত কল্প, নির্বীর্য্য, ফাঁকি] অহম্ ঔষধম্ [পুরুষোত্তম স্তরে ওষধি-জাত অন্ন অথবা ভেষজ ঐ হিসাবেই আমার অংশ আমি ; রাগদ্বেষ স্তরে আমার বাহিরে সব নির্ব্বীর্য্য। আমার ভিতরে আমার পরশ লাগাইয়াই অন্নের অন্নত্ব, ভেষজের ভেষজত্ব পুনরায় গড়িয়া তুলিতে হইবে] মন্ত্রঃ অহম্ [পুরুষোত্তম স্তরে মন্ত্র মন্ত্ররূপেই আমার আস্বাদন, আমি ; রাগদ্বেষের স্তরে মন্ত্র শুধুই শব্দ মাত্র, বাচারম্ভণং বিকারঃ ; এই মন্ত্রকে আমার জীবনের মাঝে সার্থক মন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে] অহম্ এব আজ্যং [পুরুষোত্তম স্তরে হোমাদি-সাধক ঘৃতাদিই আমি] অহম্ অগ্নিঃ [পুরুষোত্তম স্তরে অগ্নি অগ্নিরূপেই আমার অংশ, আমি ; রাগদ্বেষের স্তরে অগ্নির অন্তর্য্যামী হিসাবেই শুধু আমি সত্য ; অগ্নির যাহা বাহিরের রূপ তাহা ব্যর্থ ; বাহিরের অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে কি ফল হইবে ?] অহম্ হুতম্ [পুরুষোত্তম স্তরে হোম হোম রূপেই সার্থক আমি ; রাগদ্বেষের স্তরে হোমের নিগূঢ় স্বরূপগত অর্থ আমি বটে ; কিন্তু হোমের বাহ্যিক রূপ সেখানে শুধু ব্যর্থতাই আনিয়া দেয়]।

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি শ্রাদ্ধাদি, আমিই ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃতাদি, আমি অগ্নি, আমি হোম। ৯।১৬

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ ॥ ৯।১৭

পিতা অহম্ [পুরুষোত্তম স্তরের পিতা পিতা হিসাবেই আমার অংশ, আমি, সার্থক পিতা ; রাগদ্বেষের স্তরের পিতা ব্যর্থ পিতা ; সেখানে পিতৃত্বের সব অধিকার কাড়িয়া লইয়া আমিই পিতা] অস্য জগতঃ [এই জগতের] (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সব ব্যাখ্যা করিতে হইবে) মাতা [মাতা] ধাতা [কর্ম্মফলপ্রদাতা] পিতামহঃ [পুরুষোত্তম স্তরে পিতামহ পিতামহ হিসাবে সার্থক পুজনীয় ; রাগদ্বেষের স্তরে যে-পিতামহ যেমন ভীষ্ম তাহার অধিকার কাড়িয়া লইয়া আমিই পিতামহের আসনে অধিষ্ঠিত] বেদ্যং [আমিই বেদ্য যাহা-কিছু] পবিত্রম্ [যাহা কিছু পাবন] ওঙ্কারঃ [আমিই ওঙ্কার] ঋক্ সাম যজুঃ এব চ [আমিই ঋক্ সাম এবং যজুঃও]।

এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ আমি, আমিই বেদ্য, পবিত্র, ওঙ্কার, আমি ঋক্, সাম, ও যজুঃ।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ৯।১৮

গতিঃ [পুরুষোত্তম স্তরে স্থিতি-গতি সমান্বিত বলিয়া আমিই সার্থক গতি ; আমার বাহিরে সব 'গতি' ব্যর্থ, উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র] ভর্ত্তা [গতি-পথে আমিই সার্থক ভর্ত্তা] প্রভুঃ [গতি-পথে আমিই সার্থক নিয়ন্তা] সাক্ষী [আমিই সত্য বাস্তব সাক্ষাতে দেখিয়া সমস্ত ঘটনার সাক্ষী ; দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা চোখের সামনে দেখিয়াও ভীষ্মাদি মিথ্যা সাক্ষী] নিবাসঃ [পথিকদের আমার মধ্যেই সার্থক নিবাস ; নিবসতি অস্মিন্ ইতি নিবাসঃ] শরণম্ [পথচারী শরণাগতদের আমি সার্থক শরণ, আশ্রয়] সুহৃৎ [প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না রাখিয়া উপকারী ; আমি শুধুই আশ্রয়দাতা নই, আমি হৃদয়বান আশ্রয়দাতা] প্রভবঃ [প্রকৃষ্টরূপে সমগ্রত্ব লইয়া জন্ম হয় আমা হইতে, তাই আমি সার্থক প্রভব] প্রলয়ঃ [কিছুই না হারাইয়া প্রকৃষ্ট রূপে লয় হয় আমার ভিতরে, তাই আমি প্রলয়] স্থানং [আমার ভিতরে সকলের নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত স্থান রহিয়াছে, তাই আমি স্থান) নিধানম্ [যাহার ভিতর সব হারানো নিধি মজুত থাকে, নিহিত থাকে, সেই নিধান আমি] বীজম্ [প্ররোহধর্ম্মী, জগতের আত্মানাত্ম সমন্বিত প্ররোহকারণ সৃষ্টিমূল বীজ আমি] অব্যয়ম্ [অব্যয় ; প্রত্যহই প্ররোহ হইতেছে, তথাপি এ বীজ অব্যয়ই রহিয়াছে]।

আমি গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রলয়, স্থান, নিধান, এবং অব্যয় বীজ। ৯।১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ৯।১৯

(আরও) তপামি [তাপ দান করিয়া থাকি] অহং [আদিত্য রূপে তীব্র রশ্মি দ্বারা] অহম্ বর্ষং [বৃষ্টি] নিগৃহ্লামি [আট মাস ধরিয়া শোষণ করি] উৎসৃজামি চ [এবং বিসর্জ্জন করি] অমৃতং চ এব [এবং অমৃতই] মৃত্যুঃ চ [এবং মৃত্যু ; 'বীর্য্যানি তস্যাখিলদেহভাজাং অন্তর্ব্বহিঃ পুরুষ কালরূপৈঃ। প্রযচ্ছতো মৃত্যুং উতামৃতঞ্চ মায়া-মনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্ ॥' পুরুষোত্তম স্তরে অমৃত ও মৃত্যু দুই-ই সার্থক ; সেখানে অমৃত যোগায় ভাব, মৃত্যু যোগায় রস। পুরুষোত্তমের বাহিরে দুই-ই ব্যর্থ] সৎ অসৎ চ অহম্ [পুরুষোত্তম স্তরে আমি সৎ ও অসতের (থাকা ও না থাকার) উভয় পদার্থ-প্রধান দ্বন্দ্ব সমাস। আমার বাহিরে সৎও বিকল্প, অসৎও বিকল্প]।

আমি তাপ দিয়া থাকি, আমিই বৃষ্টি শোষণ করি ও ত্যাগ করি, আমিই অমৃত ও মৃত্যু। হে অর্জ্জুন আমিই সৎ এবং অসৎ।

ত্রৈবিদ্যাঃ মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈঃ ইষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান ॥ ৯।২০

(যাহারা অকৃষ্ণবিৎ, জ্ঞানহীন, কামকাম সেইসব) ত্রৈবিদ্যাঃ [ঋক্, যজুঃ ও সাম সংজ্ঞক তিন বিদ্যা যাহাদের, তাহারা ত্রিবিদ্য ; ত্রিবিদ্য শব্দের উত্তর স্বার্থে অল্ ত্রৈবিদ্য ; অথবা তিন বিদ্যা অধ্যয়ন করে, জানে যাহার তাহারা ত্রৈবিদ্য। এক সমগ্র বেদকে টুকরা টুকরা বহুশাখা বিশিষ্ট, নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-রত ঋক, সাম ও যজুঃবিৎ] মাং [বসু আদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপী আমাকে] সোমপাঃ [সোম পানকারিগণ] পূতপাপাঃ [বিহিত সোমপান দ্বারা বিগত-পাপ] যজ্ঞৈঃ [অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি নানাবিধ যজ্ঞসমূহ দ্বারা] ইষ্ট্বা [পুজা করিয়া] স্বর্গতিং [স্বর্গগমন] প্রার্থয়ন্তে [প্রার্থনা করে] তে [তাহারা] পুণ্যং [পুণ্যফল স্বরূপ] আসাদ্য [প্রাপ্ত হইয়া] সুরেন্দ্রলোকম্ [ইন্দ্রলোক] অশ্নন্তি [ভোগ করে] দিব্যান্ [স্বর্গে ভব] দিবি [স্বর্গে] দেবভোগান্ [দেব যোগ্য ভোগ সমূহ]।

ঋক্, যজু ও সামবেদবিৎ, সোমরসপায়ী, বিগতপাপ ব্যক্তিগণ যজ্ঞসমূহ দ্বারা আমারই উপাসনা করিয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা পবিত্র ইন্দ্র-লোকে গমন করিয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ্য ভোগ করিয়া থাকেন। ৯।২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ৯।২১

তে [তাহারা] তং [সেই] ভুক্ত্বা [ভোগ করিয়া] স্বর্গলোকং বিশালং [বিস্তীর্ণ] ক্ষীণে পুণ্যে [পুণ্য ক্ষীণ হইলে] মর্ত্ত্যলোকম্ [সাধনার ক্ষেত্র, চরম সিদ্ধি ক্ষেত্র এই মর্ত্ত্যলোকে] বিশন্তি [প্রবেশ করে] এবং [যথোক্ত প্রকারে] ত্রয়ী ধর্ম্মং [এক অখণ্ড বেদকে বহু বাদে বিভক্ত করিয়া পরস্পর-বিবাদরত বহু শাখাময়, একান্ত বৈদিক ধর্ম্ম] অনুপ্রপন্নাঃ [আশ্রিত হইয়া] গতাগতম্ [গমন-আগমন] কামকামাঃ [কাম দ্বারা কাম কামনা করে যাহারা তাহারা] লভন্তে [লাভ করে, পুরুষোত্তম সুরে যাওয়া আসার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আস্বাদন করিতে না পারিয়া তাহারা ব্যর্থ আসে আর ব্যর্থ যায়। 'এমন গৌরাঙ্গে যার রতি না জন্মিল। লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল' ॥]

তাহারা বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করার পর পুণ্য ক্ষীণ হইলে মর্ত্ত্যলোকে

প্রবেশ করে ; এইরূপ বেদোক্ত ধর্মকে আশ্রয়কারী কামকামী পুরুষগণ গমনাগমন করিয়া থাকে। ৯।২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ৯॥২২

(কিন্তু যাহারা অকামকামী সম্যকদর্শী) অনন্যাঃ [অনন্য পুরুষগণ ; নাই আমি ছাড়া 'অন্য' যাহাদের, এবং আমি যাহাদের কাছে 'অন্য' নই, তাহারাই অনন্য ; সর্ব্বদেব-সমন্বয় পরদেব পুরুষোত্তম 'আমি'কেই 'আমি' বলিয়া বুঝিয়াছেন যাহারা, তাঁহারাই 'আমি'-ভূত অনন্য] চিন্তয়ন্তঃ [প্রকৃতির বুকে, চিন্তার ক্ষেত্রের পরতে পরতে মিশাইয়া চিন্তা করিতে করিতে] মাং যে জনা [যে জনগণ] পর্য্যুপাসতে [পরিতঃ অর্থাৎ সকল দৃষ্টি কোণ (angels of vision) হইতে উপাসনা করেন] তেষাং [সেই সব] নিত্যাভিযুক্তানাং [মানুষীতনু পুরুষোত্তম আমিতে নিত্য অভি অর্থাৎ অভাগে যুক্ত বলিয়া যে সব পুরুষ নিত্য-অভিযুক্ত তাহাদের। খণ্ড দেবতা ও খণ্ড বুদ্ধি বিশিষ্ট পুরুষদের কাছে তত্তৎ বিশিষ্ট খণ্ড দৃষ্টি কোণের অতীত অবস্থিত থাকিয়া কাহারও একান্ত ব্যবহারে একচেটিয়া হইয়া হাত-ধরা হইয়া না থাকার অভিযোগে পুরুষোত্তম সকলের কাছেই অভিযুক্ত (accused), যেমন শ্রীদাম বৃন্দাবনে ব্রহ্মা-ইন্দ্র-বরুণাদির দৃষ্টিতে পুরুষোত্তম অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই নিত্য-অভিযুক্ত পুরুষোত্তমের উপাসক যাহারা তাহারাও কোন দলীয় নয় বলিয়া নিত্য-অভিযুক্ত ; তাহাদের] যোগক্ষেমম্ [যোগ এবং ক্ষেম ; অপ্রাপ্তির প্রাপ্তিই যোগ এবং সেই প্রাপ্তির রক্ষণই ক্ষেম] বহামি [অযাচিত ভাবে বহন করি ; ভক্ত তো কিছুই চাহেন না, আমি আমার নিজের দায়িত্বে নিজের প্রেরণায় আমারই নিজরূপ ভক্তের দুয়ারে নিজের মাথায় বহন করিয়া পৌছাইয়া দেই। যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাহাও আমি দেই ; কিন্তু সেই দেবতার মারফতে। দুইটা 'দেওয়ার' মাঝে পার্থক্য এই। অনন্য ভক্তকে দেই সাক্ষাৎ আমি, অন্য দেব-ভক্তকে দেই পরোক্ষভাবে। সাক্ষাৎ প্রাপ্তির ফলগত মাধুর্য্য অপূর্ব্ব]।

অনন্য হইয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যে সব লোক আমাকে সব দৃষ্টিকোণ হইতে উপাসনা করেন, সেই সব নিত্য অভিযুক্তদের যোগক্ষেম আমি বহন করি ॥ ৯।২২

ক্রমশঃ

সংকল্প ও সাধনায় প্রেরণা : রবীন্দ্রনাথ

অমলচন্দ্র চক্রবর্তী

কবি বলিতে সাধারণতঃ আমরা স্বপ্নবিলাসী ভাবুক একশ্রেণীর লোককে বুঝি, মাটির সাথে যাহার কোন যোগ নাই, দেশের নাড়ীর সাথে যাহার বন্ধনের বালাই নাই, জনগণের সমস্যার সাথে যাহার কোন পরিচয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ের কবি নন! প্রকৃতির আনন্দ উপলব্ধি করিবার সাথে সাথে দেশের হিতের জন্য, দুর্বল মানুষের উদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে, প্রয়োজনবোধে তিনি বিদ্রূপের কশাঘাত হানিয়াছেন, কখনও বা আত্মবিশ্বাস উদ্বোধনের প্রেরণা জাগাইয়াছেন, আবার কখনও আপন কর্মপদ্ধতিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন।

স্বদেশপ্রেমের গোড়ার কথা আত্মোপলব্ধি। আমার ক্ষমতা কতটুকু, সর্বহিতার্থে আমার দেয় কতখানি, তাহার কি পরিমাণ অংশই বা আমি নিয়োগ করিয়াছি, এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা থাকা আবশ্যক। জানিবার আগ্রহ হইতে নিজকে সমর্পণ করিবার উৎসাহ জাগে, অন্তরে উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ দেখি শ্রান্তিহীন কর্মের মাধ্যমে।

অপমানের কঠোরতায়ও আত্মার বিনাশ হইবেনা! কবি তাই বলেন—

"জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার এখনও অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধূলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, "আত্মানং বিদ্ধি", আপনাকে জানো।"

জোর করিয়া বলিতে হইবে, আমাদের আত্মা অমর, অমৃতের পুত্র আমরা। ভগবানের উদ্দেশে,

"ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে,—
ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মতো।"

আত্মোপলব্ধির চেতনার প্রারম্ভে প্রার্থনা করিতে হইবে,

"বীর্য দেহো, ক্ষুদ্রজনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহো চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।"

সত্যে নিষ্ঠা থাকিলে মানুষ ভয়হীন চিত্তে সেবায় ব্রতী হইতে পারে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। দুর্বলতা, শঙ্কা ও সংশয় কাটাইয়া উঠিবার জন্য কবি সংকল্প করেন,

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি ওঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে।"

কেননা, নিরন্তর নির্বিবাদে অপমান ও পীড়ন সহ্য করা সত্যভ্রষ্টতার চরম নিদর্শন।

"ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ্য করে যদি
তবে সেই দীন প্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয়।"

সত্যে দীক্ষিত বীরের কাছে নিরাশা বলিয়া কিছু নাই। নিত্য নূতন কর্মধারায় তাহার জীবন সঞ্জীবিত হইতে থাকে, ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সে বৃহত্তর জগতের হিতকামনায় চঞ্চল হইয়া উঠে।

এই বৃহত্তর জগৎ তাহার দেশ, মুষ্টিমেয় জনের সে দেশ নয়, সে দেশ জনগণের। নবীন আশা লইয়া, একের পর এক তুচ্ছতাকে অগ্রাহ্য করিয়া সে অগ্রসর হইবে। এই ত তাহার নবজীবনের পথ। কবি বলেন, এ যাত্রায় জয় নিশ্চিত,

"হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,

জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়
তোমারই হউক জয়।"

কর্মে অগ্রসর হইবার পূর্বে জানা আবশ্যক ব্রতীর উদ্দেশ্য কি। অপমানিত দেশমাতৃকার ক্রন্দন অহরহ তাহার কানে আসে। বীভৎস অত্যাচার আর নিদারুণ অন্যায়ে জর্জরিত সাধারণ মানুষ আকুল হৃদয়ে মুক্তির অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। কবির উদাত্ত আহ্বান তখন কর্মীর কানে পৌছায়,

"ওরে তুই ওঠ আজি !
আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎজনে। কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল ; কোন অন্ধ কারা মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া।"

এই আহ্বানে কর্মী জাগিবে। তাহার প্রার্থনা হইবে,

"করো মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার।
... ...
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি বিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।'

তারপর সে বলিবে,

"শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয়ও করব না, ভক্তিও করব না ; তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব। সেই মনুষ্যত্বের অভিমান আমাদের হবে, যে অভিমানে মানুষ এই স্থূল বস্তুজগতের প্রবল প্রকাণ্ডতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বলতে পারে, আমার সম্পদ্ এখানে নয় ; বলতে পারে, শৃঙ্খলে আমি বন্দী হইনে, আঘাতে আমি আহত হইনে, মৃত্যুতে আমি মরিনে।"

কিন্তু সংকল্প সাধনের পথ কুসুমাস্তৃত নয়। দুঃখ এ পথে অনিবার্য সাথী। কিন্তু দুঃখেই ত হয় সাধনার পরীক্ষা। সাধনার একাগ্রতায় বাধাবিপত্তির শক্তির পরাজয় ঘটে। কর্মে ব্রতী হইবার পুর্বে যে বাধাকে বিরাট দানবের মত মনে হয়, সাধনার সিদ্ধিপথে অগ্রসর হইলে দেখা যায়, সেই দানবের বীভৎসতা দৃঢ়তার কাছে নত হইয়া পড়ে।

সাধনার উদ্দেশ্য, দেশের প্রকৃত উন্নতি এবং সেজন্য দেশকে "সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা" সম্পূর্ণ আপন করিয়া তুলিতে হইবে। স্বার্থান্ধ একদল লোক মনে করে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণকে চিরকাল নত করিয়া রাখিতে পারিলেই তাহাদের লাভ। কিন্তু দেশসেবায় সকলকেই অংশগ্রহণ করিতে হইবে, কেননা "নিরতিশয় দুর্বলেরও প্রতিকুলতা নৌকার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মত। শান্তির সময় নিরন্তর জল সেঁচিয়া সেই ফাটা নৌকা বাওয়া যায়, কিন্তু তুফানের সময় যখন সকল হাতই দাঁড়ে হালে পালে আটক থাকে, তখন অতি তুচ্ছ ফাটলগুলিই মুশকিল বাধায়।"

মানুষের অধিকারে যাহাকে বঞ্চিত করা হয়, কালের বিধানে সেই বঞ্চিত মানুষই বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং দেশের প্রতিটি মানুষের মূল্য আছে, ইহার অস্বীকৃতি বিপজ্জনক। কবি বলেন, "মানুষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে, এটা, যে লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয়, কারও পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে খর্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয়, মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে।... ...... প্রত্যেক মানুষের যে দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি সে দেশে আপনিই বড় হয়।" 'জীর্ণ লোকাচার', অজ্ঞতা, কুসংস্কার দেশোন্নতির পরিপন্থী। সমবেত চেষ্টাতেই এইগুলি দূর করা সম্ভব।

দেশকে কিভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে? বর্তমান 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'তে বৃহৎ রাষ্ট্রের পরিচয় নির্ভর করে অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাফল্যের উপর। শান্তির কথা এই সকল দেশ হইতেও শোনা যায়। কিন্তু ইহার অসারতা কবি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায়, "রক্ত কলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ঐ যে আজ একটা শান্তির দরবার উঠেছে, ঊর্ধ্ব আকাশের নির্মল নিঃশব্দতা তার বেসুরকে ধুয়ে দিতে পারছে না।

শান্তি? শান্তির দরকার সত্যসত্যই। কে করতে পারে? ত্যাগের

জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মত কিল্‌বিল্‌ করছে তারা শান্তি চায় বটে, কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়।" শান্তির বুলির পিছনে অস্ত্রের শব্দে কবি আশঙ্কা প্রকাশ করেন,

"শক্তিদম্ভ স্বার্থ-লোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আসি ঘিরিছে ভুবন।"

কিন্তু 'নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বে' আমার দেশ লিপ্ত হইতে পারেনা, কারণ কবি জানেন,

"স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতিমাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কালঝঞ্ঝা ঝংকারিত দুর্যোগ-আঁধারে।"

তাই আমার দেশ হইবে সেই আদর্শ-দেশ যাহার ঐতিহ্য প্রেরণা জাগাইবে,—ভোগের নয়, ত্যাগের,—যেখানে প্রতিবেশীর সহিত হৃদ্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিবেনা, যেখানে প্রীতির ঔজ্জ্বল্যে অস্ত্রের চাকচিক্য ম্লান হইয়া পড়িবে। দেশকে এই আদর্শে পৌঁছাইবার জন্যই কবি বারবার কর্তব্যে আহ্বান জানান,

" ....ওরে জাগিতেই হবে
প্রদীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্মধামে। ....
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।"

———

শেষের প্রণতি

নচিকেতা

প্রাণের সোনালী আজো হাসে মোর মরণের কালো মেঘে,
দুহাতে বাজাই খুশীর শঙ্খ ডমরুর গুরু ঢেকে।
কারে করি ভয় এই দুনিয়ায়
মৃত্যুর দূত ভয়ে ভয়ে চায়
এখনো মনের পঞ্চ-প্রদীপে সাজাই আরতি ডালি।
প্রাণ যজ্ঞের মহা প্রয়োজন প্রেমের বহ্নি জ্বালি ॥
ভয় নাই ওরে শ্মশান-যাত্রী শ্মশানই বাসর শয্যা!
খুলিব না কভু এই দেহ হতে সুন্দর বর সজ্জা,—
যতখন দেহে আছে প্রাণ মোর
চুম্বন-রাগে রহিব বিভোর
দু'হাতে জড়ায়ে পরাণ প্রিয়ার কণ্ঠ আলিঙ্গনে।
প্রেমের প্রণব মন্ত্র জপিব বক্ষে পরাণ পনে ॥
মৃত্যুর মুখোমুখি তবু গাহি জীবনের জয় গান!
প্রাণের পুজারী আমি যে বন্ধু কার ভয়ে হব ম্লান?
আসিছে মরণ জানি তাহা জানি—
তাই বলে কেন মিছে হার মানি
উন্নত শির লুটাব ধূলায় মরণ চরণ তলে?
মোর কালো চোখে প্রাণের প্রদীপ এখনো যে ভাই জলে ॥
শত্রু শিবিরে সন্ধি যাচিয়া করিব না স্বাক্ষর
প্রাণ-প্রতিনিধি আমি যে বন্ধু! শ্বেত পত্রের পর।
আমি পদাতিক সেনানী যে ভাই
কারে কোন দিন ভয় করি নাই
রক্ত নিশান উড়ায়ে উর্দ্ধে করিয়াছি সংগ্রাম।
প্রয়োজন হলে প্রাণ দিয়ে যাব কেন সন্ধির নাম?

মৃত্যুর চর মোর জানালায় উঁকি দিয়ে যায় দিক !
মন্ত্রিত তবু কণ্ঠে আমার জীবনের মধু ঋক।
মৃত্যু যে দিন আসিবে আসুক
অতল আঁধার নামিবে নামুক
বেয়ে যাব তরী গেয়ে যাব গান অট্ট হাস্য দিয়ে,
মৃত্যুর মুখে তুড়ি মেরে যাব বিজয় পতাকা নিয়ে ॥
মৃত্যুর সাথে বাজি খেলে যাব যতখণ আছে প্রাণ—
এখনো অনেক বাকী আছে ভাই খেলে যাও শেষ দান।
সকল খেলারই আছে হারজিত
হতে পারে আজো ঠিক বিপরীত
নির্ভয়ে খেল শেষ দান নাও হতে পারে পরাজয়।
কালো দিগন্ত হতে পারে আজো আবার স্বর্ণময় ॥
যদি পরাজয় তবু কিবা ভয় হারজিত নিয়ে খেলা।—
মরণের মুখে হাসির ঝরণা খুলে দাও এই বেলা।
খুলে দাও তরী তুলে দাও পাল, —
যতক্ষণ প্রাণ ধরে থাক হাল
ক্রুদ্ধ-ভ্রূকুটি মহাকাল তারে করিও না ভ্রূক্ষেপ।
প্রীতির পরাগ অঙ্গে মাখিও খুশী-চন্দন-লেপ ॥
প্রাণ-মন্দির এস রচি ভাই শ্মশানের শাদা ধূলে—
কল হাস্যের উচ্ছল গীতে মৃত্যু মোহানা কূলে।
এস সবে মিলি ছুটে চলে যাই
বসন্ত বা'র ধরুক সানাই
'হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিয়ে তালি।'
শেষের প্রণতি রেখে যাই এস দেহ-ধূপ মোর জ্বালি ॥
প্রাণের পূজার শেষ আরতির লগ্ন যদি বা আসে—
গানে গানে তার গাহিও মন্ত্র গাঁথা মঞ্জুল হাসে।
এ দেহ প্রদীপ জ্বালি নির্ভয়ে—
করিও আরতি নিজ হাতে বয়ে,
গোধূলি-লগ্নে পূজা অবসান নামুক নীরব রাত !
মৃত্যুর বুকে হেনে যাব শেষ সৃষ্টির পদাঘাত ॥

এ দেহ আমার পুড়ে ছাই হবে তবু প্রাণ-সম্ভারে
মাটিরে জাগাবে সৃষ্টি স্বপ্নে মহা অমৃত ধারে।
নবসৃষ্টির প্রাণ অঙ্কুর :
রেখে যাব মোর শ্বেতাস্থি-চূর,
দগ্ধ দেহের মেধ-গন্ধটি পৃথিবীর পথে পথে !
ফুলে ফুলে আর সোনা ধানে ধানে জীবনের জয় রথে ॥

———

ভাববার কথা

(২)

ধীরেন্দ্র চৌধুরী

মানব সমাজে যে সব বিশৃঙ্খলা ডাকিয়া আনিয়াছে বর্ত্তমান যন্ত্র সভ্যতা শুধু তাহার বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদে, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি গত প্রবন্ধে। এখন আমরা আলোচনা করিব মানব দেহ ও মনে যে সব অশুভ প্রতিক্রিয়া এই সভ্যতা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে, সে সম্বন্ধে।

যন্ত্র সভ্যতার পীঠস্থান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সুতরাং ডলারে মোড়া ইয়াঙ্কী সমাজের বাহ্যিক চাক্‌চিক্যের মোহ ত্যাগ করিয়া আমরা যদি তাহার আভ্যন্তরীণ রূপটি একবার অবলোকন করিতে পারি, তবেই বুঝিতে পারিব এই সভ্যতা আজ ইয়াঙ্কী দেহ ও মনকে কোন্ পরিণতির দিকে নিয়া চলিয়াছে। অবশ্য এই দর্শন সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। এজন্য যে সত্যনিষ্ঠা, ও সংযম প্রয়োজন, বর্ত্তমান সভ্য সমাজে তাহা নিতান্তই বিরল। আমাদের দেশ হইতে যাহারা ঐ দেশে যান, তাঁহারা আমেরিকার ভোগৈশ্বর্য্যের জৌলসে এমনই মোহিত হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের নিকট কিছু জানা সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে ঐ দেশেরই এমন সব লোকের উপরে যাহারা নিজ দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেন। এজন্য আমি সাহায্য নিয়াছি প্রধানতঃ ডাঃ এলেক্‌সিস্ কেরল লিখিত "মেন্ দি আন্‌নোন" বইখানা এবং

আমেরিকা হইতে প্রচারিত ১৯৫৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের "ফেডারলী বুলেটীন" প্রচার পত্রিকাখানার। ডাঃ কেরল নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক।

বহিঃ শত্রু তথা সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ যে আমেরিকা অনেকাংশ প্রশমিত করিয়া আনিয়াছে বিজ্ঞান বলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মহামারি সৃজনকারী সংক্রামক ব্যাধি অপেক্ষা অধিকতর সর্ব্বনাশকর যে সব ব্যাধি বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া একটা গোটা জাতিকে ধ্বংস করিতে সক্ষম, সে সব ব্যাধি আজ ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে আমেরিকায় দিনের পর দিন।

সতত পুলিশ, আইন ও 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই প্রহরায় আমরা অধিকাংশই যেমন চরিত্রবল রক্ষা করিয়া ভদ্র হইয়া উঠিতেছি বলিয়া গর্ব্ব করি, তেমনই আবাল্য প্রকৃতির স্পর্শবর্জ্জিত, ডাক্তারী প্রহরায় পরিচালিত হইয়া আমেরিকানরাও একটা অপ্রাকৃত স্বাস্থ্যসম্পদ লাভ করিতেছে বটে, কিন্তু ডাক্তার নির্দ্দিষ্ট ঐ বাধাধরা চলার পথে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলেই দেখা যায় তাহারা আর স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। ডাঃ কেরল বলেন, বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনের জন্য আমেরিকানদিগের দেহ পুষ্ট ও দীর্ঘ হইতেছে বটে কিন্তু তাহা কর্মতৎপরতা (agility) সহনশীলতা (endurance) ও দুঃসাহসিকতা (audacity) প্রভৃতি গুণবর্জ্জিত ; অথচ জীবনকে প্রকৃত উন্নত স্তরে উপনীত করাইতে হইলে এই গুণগুলি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই দেখা যায় তথাকথিত স্বাস্থ্যবান আমেরিকানগণ জীবনপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কিম্বা দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্য্যয় ঘটিত নানা দুরারোগ্য, অপ্রতিরুদ্ধ ও বংশানুক্রমিক রোগে আক্রান্ত হইতেছে, অথবা স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াসমতা (nervous balance) হারাইয়া নানা স্নায়বিক ব্যাধি এমন কি উন্মাদরোগ-গ্রস্ত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন মাত্র ১৪ কোটী লোকের বাসভূমি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর যে সংখ্যক লোক শুধু যন্ত্রাঘাতে আহত, বিকলাঙ্গ ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার হিসাব দেখিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। একমাত্র ১৯৪৯ সনেই ৯৫ লক্ষ লোক যন্ত্রাঘাতে আহত হইয়াছে এবং মরিয়াছে ৯১ হাজার। ১৯৫০ সনে ঐ মৃত্যুসংখ্যা গিয়া দাঁড়াইয়াছে ৯৭ হাজারে।

বর্ত্তমান আমেরিকায় যে সব দৈহিক ও মানসিক রোগ ভয়াবহরূপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে নানা বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তন্মধ্যে ক্যানসার (Cancer), হৃদ্-বৃক্ক রোগ (Cardio vascular-renal diseases), শর্করা মেহ (Diabetis), গ্রন্থীবাত (Osteo arthritis), দৃষ্টিশক্তিহীনতা ও অন্ধত্ব, বধিরত্ব, অন্ত্রপ্রদাহ (Colitis), এলারজি (Alergy) এবং সর্ব্বোপরি স্নায়ুরোগ এবং উন্মাদরোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'লেডারলী বুলেটীন' বলিতেছে, 'গত ৫০ বৎসর যাবৎ (অর্থাৎ যন্ত্র-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে) ক্যানসার রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।' ডাবলীনের হিসাব মতে দেখা যায় ১৯০০ সনে প্রতি লক্ষ লোকের মধ্যে ৬৪ জন লোক এই রোগে মারা গিয়াছে। কিন্তু ১৯৪৬ সনে ঐ মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছে প্রতি লক্ষে ১৩০ জন এবং ১৯৪৮ সনে ১৩৫ জন। ডর্ন যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ১৯৪৪ সনে ৫ লক্ষ লোক এই রোগে ভুগিতেছিল। সুতরাং বর্ত্তমানে এই রোগীর সংখ্যা যে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমেরিকান 'ন্যাসনাল হেলথ সার্ভে'র হিসাবে দেখা যায় ১৯৩৯ সনে প্রায় ৯২ লক্ষ লোক ভুগিতেছে হৃদ্-বৃক্ক রোগে। এবং এই জন্য প্রতি বৎসর গড়ে ১০ কোটী man-days (কর্ম দিন) নষ্ট হইতেছে।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসিত হইতেছে এমন শর্করা মেহ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ এবং বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে আরও প্রায় ১০ লক্ষ লোক এমন আছে যাহাদের রোগ এখনও ধরা পড়ে নাই। অন্যান্য চিকিৎসকের সংখ্যা বাদ দিলেও একমাত্র 'ডাইবেটীক এসোসিয়েসনে'র সভ্য আছেন ১৫০০ ডাক্তার যাহারা শুধু এই রোগেরই চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

গ্রন্থীবাত রোগে যে লক্ষ লক্ষ লোক ভুগিতেছে তাহাদের জন্য বৎসরে man-days নষ্ট হইতেছে ১০ কোটী। চশমা ভিন্ন দেখিতে পায় না এখন লোকের সংখ্যা আমেরিকায় অগনিত। 'অন্ধত্ব নিবারণী জাতীয় সমিতির' হিসাব মতে দেখা যায় দেশে অন্ধের সংখ্যা হইতেছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার এবং এক চোখে মাত্র দেখিতে পায় এমন লোকের সংখ্যাও হইবে প্রায় ৫ লক্ষ। আজ-কাল আমেরিকায় গড়ে প্রায় ২২ হাজার লোক প্রতি বৎসর অন্ধ হইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বধিরের সংখ্যা কত তাহা জানিতে পারি নাই। তবে সেখানে বালক বালিকাদিগের মধ্যে এই রোগের সংখ্যা দেখিলেই বুঝিতে পারিব

এই রোগের প্রাদুর্ভাব কত বেশী। হারফোর্ড কাউন্টি ও মেরীল্যাণ্ডে ৩ বৎসর ব্যাপী পরীক্ষাকার্য্য চালাইয়া হ্যামন্, রীচ্ ও স্টার্ক যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, শতকরা ১৪টি ছেলে মেয়ে হয় কানে কম শোনে, নয় তো বা একেবারেই শুনিতে পায় না।

ইহাই হইল যুক্তরাষ্ট্রবাসীর দৈহিক অধঃপতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এখন তাহাদের মনোজগতে যে কি ভয়াবহ দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহার একটা হিসাব নিম্নে দিতেছি। ১৯৩২ সনে একমাত্র সরকারি হাসপাতালেই পাগল ভর্ত্তি ছিল ৩ লক্ষ ৪০ হাজার এবং ঐ সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া ১৯৪৯ সনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে ৫ লক্ষে। ইহা ভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালেও পাগল আছে আরও কয়েক লক্ষ। কয়েকটি ষ্টেটে অন্যান্য রোগীর সংখ্যা হইতে পাগলের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। ডাঃ কেরল বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে প্রতি বৎসর ৮৬ হাজার লোক নূতন পাগল হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ ডাঃ সি, ডবলিউ, বিয়ার্স বলেন, নিউ ইয়র্ক স্টেটে প্রতি ২২ জন লোকের মধ্যে ১জন অদূর ভবিষ্যতে পাগল হইবে।

দেখা গিয়াছে আমেরিকায় যত রোগী চিকিৎসার্থ হাসপাতালে আসে তাহাদিগের মধ্যে কোথাও শত করা ৫০ জন কোথাও বা ৭৫ জনই কোন না কোন প্রকার স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত। গত মহাযুদ্ধের সময় ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোককে স্নায়বিক রোগের কারণে সমর বিভাগ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে 'ন্যাসন্যাল কমিটি অব্ মেণ্ট্যাল হাইজীন' বলেন, মোট বালক বালিকাদিগের মধ্যে ৪ লক্ষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন নিম্ন স্তরের যে তাহাদের পক্ষে লেখাপড়া করা একেবারেই নিরর্থক। বয়স্কদিগের মধ্যেও ঐরূপ দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সম্পন্ন লোক আছে প্রায় ৫ লক্ষ। দিনের পর দিন যুক্তরাষ্ট্রবাসীর মানসিক বল ও বুদ্ধিবৃত্তি এত দ্রুত অধোমুখীন হইয়া পড়িতেছে যে তাহা দেখিয়া তথাকার মনিষীবৃন্দ ইতিমধ্যেই বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। ১৯৪৯ সনে ১৬০০ লোক আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে ঐ দেশে, ইহাও মানসিক ব্যাধিরই লক্ষণ মাত্র। অনুমান যে যুক্তরাষ্টে বর্ত্তমানে শতকরা অন্ততঃ ১০ জন লোক অল্পাধিক মানসিক রোগে ভুগিতেছে এবং এই মানসিক দুর্ব্বলতার আধিক্য জন্য ঐ দেশে দিনের পর দিন দুর্নীতিপরায়ণতা কিরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব পরের প্রবন্ধে।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্ম-শতবার্ষিকী

স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি

১১

মধ্যলীলা

'আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলভির নিকট কল্‌মা পরে মুশলমান হই নাই, মুশলমানের দলের মুশলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপ-টাইজ্‌ড না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। বাহ্যিক জপতপ পূজা অর্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কানে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহিনা—ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা অর্চনা জপই আস্তিকের কার্য্য তাঁহারা বলেন। এখন কোন দলে ত আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে ডোবাতেই, পঙ্কিল পঙ্ক-পরিপূর্ণ পুতিগন্ধযুক্ত পল্বলেই হইয়া থাকে, স্বচ্ছ সরোবরে প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি?—আমি সকল দলে ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেমভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই; সেইজন্য আমার এক সকল দল লয়ে অখণ্ড দল। শাক্ত শৈব গাণপত বৈষ্ণব খৃষ্টান মুশলমান সকল জাতি সকল সম্প্রদায়ই আমাকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন। হিন্দুর বাড়ী মুশলমানেও ভিক্ষা করেন। মুশলমানের বাড়ীতে হিন্দুতে ভিক্ষা করেন না।' —সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তির, সকল না ও সকল হাঁ-এর সমন্বয়ঘন এই যে জীবনবোধ, কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া ইহা সম্ভব? তাহা প্রাণের স্তর, শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় যে প্রাণ সর্ব্বান্তরী, ভাগবতের ভাষায় যাহা সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল, উপনিষদের ভাষায় যাহা মধ্যম প্রাণ এই প্রাণের দেবতা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল। তাঁহার মধ্যে সমস্ত মতবাদের বিষয়বস্তুই প্রতিরূপ গ্রহণ করিয়াছে। তাই সমস্ত মতবাদের শীল বা স্বভাবই তাঁহার স্বভাব। এই প্রাণের স্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াই শ্রীনিত্যগোপাল বলেন তিনি বিশেষভাবে বৈষ্ণবও নহেন, মুশলমানও নহেন, খ্রীষ্টানও নহেন, অথচ তিনি সকল দলের

ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। নিত্যগোপালের কোন বিশেষ দল নাই, সকল দল লইয়া তাঁহার এক অখণ্ড দল। প্রাণের স্তরে কোন বিশেষেরই একমাত্র সত্যতা নাই বলিয়া সকল দলের মিলনে এক অখণ্ড দল গঠন সম্ভব। এই প্রাণই যে নিত্যগোপালের বিশেষ কথা এ কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। কোনসময়ে নবদ্বীপে গরমে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছে মনে করিয়া নিত্যকালী (ইনি ঠাকুরের শিষ্যা, ঠাকুরের সেবাই বৃদ্ধার শেষ বয়সের একমাত্র কাজ ছিল) তাঁহাকে বাহিরে বাতাসে যাইতে বলিলেন। ইহাতে ঠাকুর বলিলেন, 'আমার বাহিরেও বাতাস, ভিতরেও বাতাস, আমার ভিতরে প্রাণ, বাহিরে প্রাণ—আমার সব প্রাণ—প্রাণে পরিপূর্ণ।' এই নির্ব্বিশেষ প্রাণতত্ত্ব ও তাহার ধারাকে বর্ত্তমান বিশ্বের কাছে উপস্থিত করিতেই শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব।

সর্ব্ব বিশেষ সমন্বিত নির্ব্বিশেষ এই প্রাণকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে খানিকটা ধরিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পুরন্দর সন্ন্যাসীকে তিনি কেমন সন্ন্যাসী এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। কোনো উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে। জন্মেছি দিগম্বর বেশে মরব বিশ্বাম্বর হয়ে।' কোন বিশেষ উপাধির মধ্যে আসক্ত হইয়া যাওয়ায় যে জীবনের গৌরব নাই, সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তিই যে সত্যিকারের মুক্তি—একথা রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়িয়াছিল। বিশ্বাম্বর হওয়া মানেই সকল মতকে সমান সত্য বলিয়া আস্বাদন করিয়া সকলের মিলনে এক অখণ্ড দল গঠন করা—এইখানে দাঁড়াইয়াই সর্ব্ব ধর্ম্ম মিলন বা সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় সম্ভব। ইহা মতসহিষ্ণুতা নহে—ইহা সকল মতকেই নিজের বলিয়া আস্বাদন করা। এইজন্যই নিত্যগোপাল বহুদিন কোরাণ শ্রবণ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়াছেন, যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা স্মরণ করিয়া নিজের চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া যীশুর কথা স্মরণ করিতে করিতে রক্তাক্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি মুসলমান হইয়াই ইসলাম ধর্ম্ম আস্বাদন করিতে পারেন, খ্রীষ্টান হইয়াই খ্রীষ্টধর্ম্ম আস্বাদন করিতে পারেন—দূরে দাঁড়াইয়া কেবল নমস্কার করিয়া নহে। এইজন্যই নিত্যগোপালকে বৈষ্ণব তাঁহার ইষ্টরূপে দর্শন করিয়াছেন, শাক্তও তাঁহার ইষ্টরূপে দর্শন করিয়াছেন। এইজন্যই নিত্যগোপালের সামনে যখন যে ভাবের গান হইত, তখন গান শুনিয়া সমাধিস্থ নিত্যগোপালের দেহ সেই সেই ভাবের মূর্ত্তিতে পরিণত হইত।

এইজন্যই তান্ত্রিক যুবকের তন্ত্রসাধনায় তিনি চক্রেশ্বর হইয়া তাহার সিদ্ধির কারণ হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, সর্ব্ব মতবাদ, সর্ব্ব বৃত্তি, শুচি-অশুচি কোমল-কঠোর সকল কিছুর সমন্বয়মূর্ত্তি সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য নিত্যগোপাল দীক্ষা গ্রহণের পর পরিব্রাজক হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। যাইবার পুর্ব্বে স্নেহময়ী দিদিমার সম্মতি লওয়া প্রয়োজন। নিত্যগোপাল কাশী যাইয়া দিদিমাকে তাঁহার ইচ্ছা জানাইলেন। দিদিমাকে না জানাইয়াও নিত্যগোপাল যাইতে পারিতেন। কিন্তু রক্তের সম্পর্ককে হীন বলিয়া মনে করা দূরের কথা, রক্ত আর আদর্শ, জড় আর অজড়ের সমানমূল্যদাতা নিত্যগোপাল দিদিমাকে অকুণ্ঠ একটী বিশেষ মর্য্যাদা দান করিবার জন্যই যাইবার পুর্ব্বে তাঁহার অনুমতি লইলেন। অনুমতি না লইয়া গেলে তাঁহার সহজ জীবনের পক্ষে সামাজিকতার দিক হইতে error of omission (বাদ দেওয়ার ভুল) হইত। স্নেহকাতর দিদিমা তাঁহার গমনে বাধা দিলেন না, কেবল আবার ফিরিয়া আসিবার এবং তাঁহার মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার মুখে গঙ্গাজল দিবার ও ভগবানের নাম শুনাইবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন। আরও একটি প্রতিশ্রুতি তিনি লইয়া রাখিলেন। এক দৈবজ্ঞ দিদিমাকে বলিয়াছিলেন পুরীতে গেলে তাঁহার দৌহিত্রের দেহ পুরুষোত্তমের দেহে মিশিয়া যাইবে। তাই দিদিমা বলিলেন, 'পর্য্যটনকালে আর যেখানেই যাস, তুই পুরীধামে যাইবি না, আমাকে বল।' ঠাকুর তাহাতেই সম্মত হইয়া পর্যাটনে রওনা হইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

এখন হইতে এক ভিন্নতর জীবন তাঁহার আরম্ভ হইল। পুর্ব্বেই বলিয়াছি নিত্যগোপাল তাঁহার জীবনে প্রত্যেকটী মতবাদকে আস্বাদন করিয়াও কোন বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত না হইয়া, হয় এটা নয় ওটার দলে না ভিড়িয়া এক সহজ মানুষ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। আজ তাঁহার কঠোর তপস্বীর মূর্ত্তি। পনের যোল বৎসর বয়সের অপরূপদর্শন মহাভাবে আবিষ্ট ভাবভোরা এক কিশোর পদব্রজে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। এক গভীর রজনীতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তিনি কালীঘাটের কালী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। নাট মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া জগজ্জননী মায়ের কথা স্মরণ করিয়া নিত্যগোপাল বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন—এদিকে শ্যামা মাও তাঁহার সন্তানকে দর্শন দিবার জন্য নিত্যগোপালের সম্মুখে

আবির্ভূত হইলেন। মায়ের আশীর্ব্বাদ লইয়া নিজ স্বরূপানন্দকে বিশ্বরূপের বাস্তব ক্ষেত্রে আস্বাদন করিবার মানসে কিশোর নিত্যগোপাল যাত্রা সুরু করিলেন। ছয় বৎসর ব্যাপী তাঁহার এই পর্য্যটন লীলার বিস্মৃত বিবরণ দিবার স্থান এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা নহে, কেবল আমরা জানিয়া রাখি যে, এই সময়ে তিনি আহার-বিহার বসন-ভূষণ হইতে দেহের দিক দিয়া যে কঠিন তপস্যা আচরণ করিয়া ছিলেন, তাহা কোন সাধারণ যোগী বা তপস্বীর সাধ্যায়ত্ত নয়। এক বস্ত্রে তিনি চলিয়াছেন। অপরূপ রূপ অথচ পরণের একমাত্র কাপড় ময়লা, ছেড়া, কলুর তেনার মত, মাথার চুল তেলজল ও যত্নাভাবে পাগলের ন্যায়, গলিত স্বর্ণ ও চম্পকের বর্ণী দেহ ধূলি ধুসরিত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা একইভাবে চলিতেছে—দিনের পর দিন সেই একই ভাবভোরা আত্মভোলা রূপ। কখনও গোগ্রাসে হবিষ্যান্ন, কখনও গাছের পাতা, কখনও বেলপাতার রস, কখনও দুর্ব্বাঘাস, কখনও বা কাদা খাইয়া তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। দক্ষিণ দিক হইতে পর্য্যটন আরম্ভ করিয়া সমস্ত দাক্ষিণাত্য ঘুরিয়া তিনি আর্য্যাবর্ত্ত পরিভ্রমণ করেন। হিমালয়ের তুষারাবৃত দুর্ল্লঙ্ঘ্য পথ অতিক্রম করিয়া তিনি বহু দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই পর্য্যটনকালে সারা ভারতবর্ষে বহু সাধু সজ্জনের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে, কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, কত ব্যক্তিই তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

দিদিমার কথা মত পুরীধামে না যাইয়া উত্তরখণ্ড পর্য্যটনান্তে নিত্যগোপাল শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা স্থলে নিত্যগোপাল সমাধিস্থ হইয়া দশবার দিন পর্য্যন্ত মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলেন। সেই দেহের উপর শিশুদের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া নেপাল রাজ সেনাপতি সৈন্যদ্বারা 'নিত্যগোপালের বুত্থান না হওয়া পর্য্যন্ত সে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহার পর কাশীতে দিদিমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত নিত্যগোপাল সেইখানেই অবস্থান করিয়াছেন। নিত্যগোপাল সব কিছুই পারেন, অথচ কোন কিছুতেই বদ্ধ নহেন—এ যেমন তাঁহার চিত্তবৃত্তিতে, তেমনি তাঁহার দেহের বৃত্তিতে; যেমনি তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদে, তেমনি বাহিরের ব্যবহারে। এতদিন ঘুরিয়াছেন, এবার ঘরে বসিলেন। একটী এঁদো ঘর নিত্যগোপাল নিজের জন্য বাছিয়া লইয়াছিলেন। সে

ঘরে কখনও সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিত না। সেই ঘরটীর মধ্যে সারা দিন কাটাইতেন, একমাত্র মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাহির হইতেন না। দিদিমা মামীমারা কেহ ঘরের মধ্যে খাবার রাখিয়া যাইতেন; কখনও খাইতেন, কখনও খাইতেন না। আর এ সময়েও বহুদিন পর্য্যন্ত আহারের কৃচ্ছ্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহও এমন নমনধর্ম্মশীল (flexible) ছিল যে কঠিনতম কৃচ্ছ্রতাও সহ্য করিতে পারিতেন। ঐ ঘরে সমাধিস্থ হইয়া কখনও একাদিক্রমে দশবারো দিন কাটিয়া যাইত। কখনও বা তিনি কাশীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সাধারণতঃ তিনি কোন মানুষকেই ধরা দিতেন না। কখনও কোন ঘটনাদ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশের সম্ভাবনা দেখিলেই তিনি সেস্থান হইতে সরিয়া পড়িতেন। এই সময়ই তিনি বহু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়কার বহু ঘটনার মধ্যে তাহার পরবর্ত্তীকালে রচিত 'সিদ্ধান্ত দর্শন' ও 'জাতি দর্পণ বা নিত্য দর্শন' নামক পুস্তকদ্বয়ের রচনার পশ্চাতের দুইটী ঘটনার কথা জানা যায়।

জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম সর্ব্বত্র যিনি সহজ বিচরণ করিতে পারিতেন, অথচ কোন একটাতেই যিনি বদ্ধ ছিলেন না, উদার সেই নিত্যগোপাল সর্ব্বদা ভাবানন্দে মগ্ন থাকিলেও যখনই তাঁহার সম্মুখে যে কোন বিষয় লইয়া গোঁড়ামির কোন ঘটনা ঘটিত, তখনই তিনি অশ্রুতপূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা তাহা খণ্ডন করিতেন। সত্যানন্দ পরমহংস নামক এক অদ্বৈতবাদী একদিন এক প্রকাশ্য সভায় দ্বৈতবাদের নিন্দা করিয়া অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে উপস্থিত জনগণকে নির্দ্দেশ দিতে ছিলেন। সভার লোকেরা কিছু বলিতেও পারে না অথচ অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি গঙ্গায় ভাসাইয়া দিবার কথা শুনিয়া বিশেষ পীড়িত বোধ করিতে ছিল। এমন সময় ঝড়ের মত নিত্যগোপাল সেখানে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার অপরূপ মূর্ত্তিখানি দেখিয়াই সভাস্থ সকলে খুশী হইয়া উঠিল। সত্যানন্দ নিত্যগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কস্ত্বং'? ইহাতে তিনি উত্তরে বলিলেন, 'অদ্বৈতবাদী হইয়া আপনি তাহার বিপরীত জাতীয় প্রশ্ন কিরূপে করেন? আপনার কাছে তো এক ছাড়া দুই নাই, তবে কিরূপে আপনি আমি তুমির ভেদ করিতেছেন?...বেদান্তানুসারে আত্মাই ব্রহ্ম। তবে ব্রহ্মের দেহ নাই কি প্রকারে বলিতেছ?...অদ্বৈত মতে নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে, যে অহঙ্কারদ্বারা নিজের অস্তিত্ব বোধ হয়, তাহাও

মায়িক। সুতরাং সেই মায়িক অহঙ্কার যাহা নির্ব্বাচন করে, তাহা সত্য কি প্রকারেই বা বলা যাইতে পারে ?...তুমি ত নিরাকার—তোমার দেহ যে মিথ্যা একথা পরীক্ষা করিয়া দেখিব কি ?' এই বলিয়া তিনি জ্বলন্ত টীকা তাঁহার দেহ সংস্পৃষ্ট করিতে চাহিলে সত্যানন্দ লজ্জিত হইলেন। নিত্যগোপাল তাঁহার যুগান্তকারী 'সিদ্ধান্ত দর্শন' নামক গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে অদ্বৈতবাদকে সমর্থন করিয়াছেন। একের দৃষ্টিকোণে অপরে সত্য কিছুতেই হইতে পারে না। চিরকাল অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে দ্বৈতবাদ মিথ্যা, কিন্তু দ্বৈতবাদের দৃষ্টিকোণ মিথ্যা নহে। অদ্বৈতবাদের সঙ্গে দ্বৈতবাদের মিলন ইহাদের কাহারও স্তরে হইবে না, হইবে আর একটি বৃহত্তর স্তরে। এই মহামিলনের সংবাদ রাখিয়া 'সিদ্ধান্ত দর্শন' গ্রন্থ অপূর্ব্ব। সত্যানন্দের প্রসঙ্গ লইয়াই ঠাকুর ঐ গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন।

কোনো বৈশ্য ভক্তবরকে ব্রাহ্মণত্বাভিমানী দুই পণ্ডিত নীচ জাতীয় বলিয়া অপমান করিলে ঠাকুর অতিশয় ব্যথিত হন। শূদ্র যে শূদ্র বলিয়াই হীন নহে, হীন কাজ করিলে যে ব্রাহ্মণও হীন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই যে সর্ব্বথা পূজ্য নহে—এই সকল তত্ত্ব দার্শনিক ভাবে প্রমাণ করিয়া নিত্যগোপাল তাঁহার 'জাতি-দর্পণ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'ভবিষ্যতে সকল জাতি এক জাতি হইবে।'

কাশীতে নিত্যগোপালের দিদিমা আর মামীমা তাঁহার বিবিধ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন—কিন্তু সে সমস্ত কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে নিত্যগোপাল নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে নিত্যগোপাল কলিকাতায় আসিলেন তিনি আসিয়া তাঁহার মাসতুতো ভাই মনোমোহন মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখনও তাঁহার পরিচয় তাঁহার ভাইরা কেহই জানেন না। তিনি সর্ব্বদা নিজের ভাব ও ঐশ্বর্য্যকে গোপন রাখিবার প্রয়াস পাইতেন। তবে তিনি যে যুক্তিতর্কে বিশেষ পারদর্শী এবং সকল ঘটনাকে সকল দিক হইতে বিচার করিয়া দেখাই যে তাঁহার স্বভাব, এ কথা তাঁহার ভাইরা জানিতেন। তাঁহারা অনেকদিন নিত্যগোপালকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই পরমহংসদেবের ভক্তশিষ্য ছিলেন। কিন্তু আপন স্বরূপানন্দে মগ্ন নিত্যগোপাল কখনও স্বীকৃত হন নাই। একদিন কোনো নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে তাঁহারা একত্র রওনা হইলে রামবাবুরা (রামচন্দ্র দত্ত—ইনিও ঠাকুরের মাসতুতো

ভাই ছিলেন) নিত্যগোপালের সম্মতি লইয়া তাঁহাকে পরমহংসদেবের সন্নিধানে লইয়া উপস্থিত করিলেন। তবে নিত্যগোপাল সেখানে যাইয়া যুক্তিতর্ক বিস্তার করিবেন না, এ কথা তাঁহারা আগেই বলাইয়া লইয়া ছিলেন।

রামকৃষ্ণ-নিত্যগোপালের হৃদ্যতা দেখিয়া রামবাবুরা বিস্মিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যগোপালকে এতই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলেন যে, মনে হইল তাঁহাদের দুইজনের পরিচয় আজিকার নহে, তাঁহারা যেন একই বৃন্তে দুইটী ফুল। নিত্যগোপাল সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উক্তি শুনিয়া রামবাবু প্রভৃতি অবাক হইয়া গেলেন। কলিকাতা থাকাকালীন সেই সময়ে এবং পরবর্ত্তী সময়ে বহুবার রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নিত্যগোপালের দেখা হইয়াছে—প্রতিবারই তিনি নিত্যগোপালকে দেখিয়া খুব প্রীত হইতেন, তাঁহাকে নিজ হাতে খাওয়াইতেন, আবার আসিবার জন্য বার বার বলিয়া দিতেন। নিত্যগোপালকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'তুই এসেছিস, আমিও এসেছি'। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে পরিপূরণ করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব সমন্বয়তত্ত্বের প্রথম অধ্যায় দিয়াছেন, নিত্যগোপাল দিয়াছেন পরবর্ত্তী অধ্যায়। তাঁহাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ইহাই প্রমাণ করে যে, তাঁহাদের যাহারা, তাঁহারাও পরস্পর হৃদ্যতা রক্ষা করিয়া চলিবেন। রামকৃষ্ণ নিত্যগোপাল সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিলেই নিত্যগোপালতত্ত্ব বুঝা যাইবে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন ভক্ত ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়েন। সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'নিত্যগোপালের ভাব মহাভাব হয়, তাতে তার কোমরের কাপড় খসে না। তোদের ছটাক নটাক কি একটু হয়েছে, আর তোরা ন্যাংটা হয়ে নাচ সুরু করেছিস; পর, শালারা কাপড় পর।' আর একদিন বলিয়াছিলেন, 'ট্যাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব।'

বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ কাঞ্চন ও বারবণিতা স্পর্শে সঙ্কুচিত হইতেন। একদিন এক বারবণিতা আসিয়া তাঁহার পায়ে হাত ছোঁয়াইয়া প্রণাম করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার পায়ে শিং মাছের কাঁটা ফুটিল। অপর একদিন এক ভদ্রলোক কিছু মিষ্টদ্রব্য শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য আনিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তাহা গ্রহণ তো করিলেনই না, বরং যেখানে ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, সেখানকার মাটী তুলিয়া ফেলিয়া গোবর ও গঙ্গাজল

ছিটাইয়া দিলেন। ভদ্রলোকটী এ সকল কথা জানিতে পারিয়া দারুণ মনস্তাপে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে নিত্যগোপাল তাঁহাকে আশ্রয় দেন। ভদ্রলোকটীর নাম তারাপদ, তিনি ছিলেন জারজ। এ ঘটনা শুনিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, 'নিত্য তা পারে। আমি বেছে গুছে নেব, নিত্য কি আর বেছে গুছে নেবে? সে যা পাবে তাই নেবে। আমি তাজা গোবরে ঘুঁটে দেব, নিত্য পচা গোবরে ঘুঁটে দেবে।'

কিছুদিন পরে হরিশ মুস্তফী বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের এক ভক্ত তাঁহার বাড়ীতে কোনো উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীসহ ঠাকুরকে ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকট তারাপদকে দেখিয়া হরিশবাবু বিপদ গণিলেন। তিনি তারাপদকে যেন নিত্যগোপাল তাঁহার বাড়ীতে না লইয়া যান, এরূপ অনুরোধ করিলেন। ইহাতে পাপীর বন্ধু নিত্যগোপাল কহিলেন, 'আমাকে যদি আপনার বাড়ীতে যেতেই হয়, তবে তারাপদকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব এবং আমার পাশেই তাহাকে স্থান দিব। অন্য ভক্তগণ অন্য পংক্তিতে বসিবেন।' মুস্তফী মহাশয় অগত্যা তাহাতেই রাজী হইয়াছিলেন। তারাপদের জন্মদোষের জন্য তারাপদ দায়ী ছিল না। সে যদি আজ উন্নত জীবন যাপন করিতে চায়, ভগবানকে ভালবাসিবার জন্য আশ্রয় খোঁজে, তবে জন্মদোষ তাহার পথের বাধা হইতে পারে না। ইহা ছাড়া পাপীকে পাপী হিসাবে না দেখিয়া প্রথমে তাহাকে মানুষ হিসাবে দেখিতে হইবে। পাপকে ঘৃণা করিব, পাপীকে নয়। তাহাকে আপন জন বলিয়া কোলে তুলিয়া লইলেই তাহার ভাল হইবার পথ খুলিতে পারে, অন্যথা তাহাকে ভাল করিবার আর পথ নাই। নিত্যগোপাল জীবন ভরা এই তত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মানুষকে তিনি কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে পথের খবর দিয়াছেন, কোনোদিন কাহাকেও শত অপরাধেও ঘৃণা ভরে পরিত্যাগ করেন নাই। আমরা আগেই বলিয়াছি যে নিত্যগোপাল ছিলেন জনগণের ঠাকুর—ধনী, কুলীন, পণ্ডিতকে এড়াইয়া তিনি চিরদিন একেবারে সাধারণ মানুষকে চাহিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে চলাফেরা করিয়াছেন। সেইজন্য সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই তিনি স্থান দিবেন, তামসগুণীকে পরিত্যাগ করিবেন, এ নিয়মও তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রাণের সুরের অধিষ্ঠাতা বলিয়া মানুষের প্রাণকেই তিনি দেখিয়াছেন, তাহার জন্মগত বা

স্বোপার্জ্জিত পাপকে নহে। মনের স্তরে বিধিনিষেধের ভঙ্গকারীর দণ্ডদানই একমাত্র পথ, প্রাণের স্তরে প্রাণের স্পর্শদানই তাহার উদ্ধারের পথ। অহল্যা এইজন্যই শ্রীরামচন্দ্রের করুণার অধিকারী, জগাইমাধাই এইজন্যই মহাপ্রভুর কৃপার পাত্র। নিত্যগোপাল এই প্রাণের সম্পদ লইয়াই আজ মানুষের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। কেবল তারাপদর ঘটনাই নহে, বহু বহু ঘটনাই তাঁহার জীবনে ছিল, যেখানে মানুষকে তিনি প্রাণের মূল্যে সম্মান দিয়াছেন, ভালবাসিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছেন।

একদিকে নিত্যগোপালের ঐশ্বর্য্য বা যোগবিভূতির অন্ত নাই, অন্যদিকে জীবনের দৈনন্দিন ঘটনায় তিনি একজন অতি আপন জন, যিনি ভালবাসিতে জানেন, তাঁহার চারদিকে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য একটী সস্নেহ দৃষ্টি যাঁহার সদা জাগ্রত। ছোট বড় ভাল মন্দ যে কেহ তাঁহার নিকট আসিয়াছেন প্রত্যেককেই এমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে সাধারণতঃ কোন মানুষ পারে না। মানুষ কম বেশী করে, আপন পর করে, এমন প্রাণভরা আদর যত্ন স্নেহ কি মানুষ করিতে পারে? তাঁহার অপরূপ রূপই যে মানুষকে আকর্ষণ করিত কেবল তাহাই নহে, তাঁহার অনন্যসাধারণ মিষ্টি কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার, তাঁহার আপন করা দৃষ্টি, প্রত্যেকের সম্বন্ধে তাঁহার একটী ভাবনা তাঁহাকে আপন জন, প্রাণের মানুষ করিয়াছিল। অথচ নির্ব্বিকল্প সমাধি, একই সময়ে বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান, বিভিন্ন মানুষের তাঁহার মধ্যে তাঁহাদের স্ব স্ব বিভিন্ন ইষ্টদেবতা দর্শন—এই সকল বিভূতি ঐ সহজ মানুষটিরই ছিল, সাধারণ মানুষকে যিনি ভালবাসিতেন। কতখানি বিরাট হইলে একই মানুষ একই সঙ্গে অনু ও মহান্, গভীর ও ব্যাপক উভয়ই হইতে পারেন! আর এই উভয়ই হওয়াতেই তো মানুষের মুক্তি।

বলিয়াছি এই সহজ মানুষটি শুচি অশুচি ভালমন্দের কোনটাতেই আবদ্ধ নহেন। বলিয়াছি তাঁহার পরণের বস্ত্র ও চাদরখণ্ড পর্য্যটনে বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই ছিন্ন মলিন অবস্থায় থাকিত, সেদিকে তাঁহার কোনো খেয়াল জন্মান সম্ভবই হয় নাই; পর্য্যটনের সময় তো পরিধেয়ের অবস্থা অধিকতর খারাপ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যে দশজনের সঙ্গে আছেন তাহাতেও পরিধেয় সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারেন নাই। নিজের বেশভূষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এই মানুষটি শতছিন্ন ময়লাবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একদিন কোঁচানো নূতন ধুতি, নূতন জামা ও শাল গায়ে দিলেন, চুল আঁচড়াইলেন, মোজা ও জুতা পরিয়া

বাগবাজারের শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যিনি কাহারো কথায় নিজের পরিধেয় সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারেন নাই, সেই পরম রূপবান মানুষটি আজ স্বেচ্ছায় সাজিয়াছেন দেখিয়া সকলে কতই না প্রীতিলাভ করিলেন। পরবর্ত্তীকালে কোন সময়ে জামাইষষ্ঠীর দিনে নিত্যগোপাল নূতন ধুতিচাদর চাহিয়া লইয়া পরিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনটিকেও যে মধুর করিয়া তোলা যায়, দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যও যে সুষ্ঠুভাবে পালন করা যায়, নিত্যগোপালের জীবনভরা এই দৃষ্টান্ত। পরবর্ত্তীকালে এক সময়ে তিনি হুগলীতে ভোট দিতে যাইবার সময় যেমন ভাবে সংসারের দশজনের মধ্যে যাওয়া চলে, সেইভাবেই পরিষ্কার ধুতিচাদর পরিয়া গিয়াছিলেন—সে খেয়াল তাঁহার ঠিক ছিল। এই মানুষটীই একদিন বাহ্যজ্ঞান প্রায় নাই—কোন মতে পথ চলেন—বহু সময়ই নিত্যগোপাল এই ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—গঙ্গার ঘাটের দিকে যাইতেছিলেন। কয়েকটী পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে লইয়া একেবারে বলরামবাবুর বাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিলেন। নিত্যগোপালকে বলরামবাবু নারায়ণের অবতার রূপে দেখিতেন। তাই অকস্মাৎ তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া বিষ্ণুখট্টায় লইয়া যাইয়া বসাইলেন। ভাবাবেশে ঠাকুর আহারও করিলেন—মুখ ধুইতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার মনে হইল তাঁহার শৌচ হয় নাই। তিনি সে কথা বলরামবাবুকে বলিলে বলরামবাবু বলিলেন, আপনার আবার শৌচের প্রয়োজন কি? অথচ অন্যত্র বহু ঘটনায় দেখা যাইবে নিত্যগোপাল শুচিতা সম্বন্ধে কত সচেতন—পিয়নের নিকট হইতে পত্র লইয়া তাহা গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া পরে ঘরে রাখিয়াছেন, এমনও হইয়াছে। এত শুচিবোধ যাঁহার, তাঁহাতেও এ জিনিষ কখনও শুচিবাইতে পরিণত হয় নাই। প্রস্রাব করিতে জল ব্যবহার না করার জন্য একদিন কেহ অভিযোগ করিলে উত্তর দিয়াছিলেন, 'আপনি শরীরের কোন্ স্থান শৌচ করিতে বলিতেছেন? শরীরের কোন্ অংশ শুদ্ধ? জনকজননীর রক্ত এবং রেতে এই শরীর গঠিত—তাহা কিরূপে শুদ্ধ হইবে? উদর মলমূত্রে পরিপূর্ণ—শৌচ হয় কিরূপে?' পরবর্ত্তীকালে ঘর হইতে যখন প্রায় বাহিরই হন না, তখন তাঁহার চৌকির উপরেই একটা ঘটিতে গঙ্গাজল থাকিত আর একটীতে তিনি প্রস্রাব করিতেন। অবধূত নিত্যগোপালের প্রাণের ঐশ্বর্য্যের কাছে কোন বিধিনিষেধ শুচিঅশুচিবোধই টিকিতে পারে নাই। বলরামবাবুর

রবার্ট বলিয়া একটা কুকুর ছিল। একদিন বলরামবাবু নিত্যগোপালকে প্রাণের সাধে খাওয়াইতেছেন, এমন সময় রবার্ট কেমন করিয়া বাঁধ খুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া নিত্যগোপালের পাতে মুখ দিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। বলরামবাবু হায় হায় করিতে লাগিলেন। ঠাকুর সাদরে রবার্টকে কোলের কাছে লইয়া তাহার সঙ্গে একত্রে আহার করিলেন। শুচি অশুচি ভাল মন্দকে বড় করিয়া কখনও প্রাণের অমর্য্যাদা করিতে নিত্যগোপালকে দেখা যায় নাই। একই প্রাণ যে আকাশের শকুনি হইতে আরম্ভ করিয়া মাটীর কুকুরের মধ্যে বিদ্যমান, প্রাণের দৃষ্টিতে সবই যে এক—এ কথা প্রমাণ করিতেই অত বড় শুচিসম্পন্ন মানুষও কুকুরের সঙ্গে অনায়াসে খাইতে পারেন।

এইভাবে নিত্যগোপাল তাঁহার জীবন দিয়া এই কথাটাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, কোন মত, আচরণ বা কোন কিছু লইয়া বাড়াবাড়িতে বাহাদুরী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবন থাকে না, প্রাণ বাদ পড়িয়া যায়। শুচিতা রক্ষা করিয়া শুচিতার মূল্য তিনি দিয়াছেন, আবার শুচিতা লইয়া গোড়ামি যে চলে না, তাহাই দেখাইবার জন্য এমন অশুচিও তিনি হইতে পারিতেন, যাহা আমি আপনি পারি না। অশুচিরও একটা দিক আছে বলিয়াই শ্মশানবাসী হইয়াও শিব শিব হইয়া আছেন। নিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, 'অবধূত কোনো নিয়মনিষেধের অনুগামী বা বিদ্বেষ্টা নহেন, তিনি পরমানন্দ স্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করিয়া থাকেন।' নিত্যগোপাল ঠিক ইহাই। তিনি শীতের রাত্রিতে কখনও গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হইয়া, কখনও হাওড়ার পুলের নীচে, কখন নিমতলা শ্মশানে, কখনও ধাপার মাঠে পড়িয়া রহিয়াছেন—সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য অপরূপ মানুষ নিত্যগোপাল এমনি করিয়া যেমন একটি সহজ জীবন যাপন করিয়াছেন, তেমনি কঠোরতম কৃচ্ছ্রতা আচরণ করিয়া সেদিক দিয়াও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতায় অবস্থান কালে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যগোপালের মাঝে মাঝে দেখা হইত। এই সময় নরেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, গিরিশ ঘোষ, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি মনীষীগণ নিত্যগোপালের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়ই নিত্যগোপালের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, কিন্তু নিত্যগোপালের আকুল নিষেধে তাহা পারিয়া উঠেন নাই। তাঁহারা দুইজনে একত্র বসিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন, কখনও বা অপরের অবোধ্য ভাষায় কি আলাপ করিয়াছেন, কখনও দুইজনে কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য

করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে পরম তৃপ্তি দান করিয়াছেন। দেহরক্ষা করিবার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যগোপালকে একদিন কহিলেন; নিত্য, আমি আর এ দেহ রাখিব না। এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-নিত্যগোপালের পারস্পরিক হৃদ্যতা আমরা জানি—একজন আপনজনকে আর দেখিতে পাইবেন না, কান্না এ জন্যও বটে। তদুপরি শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়াতলে আসিয়া কত ব্যক্তি জীবনে আনন্দ পাইতেছিলেন, তাঁহার তিরোধানে আর তো তাহা সম্ভব হইবে না—কান্না সেজন্যও বটে। কান্নাটা প্রাণের ধর্ম্ম, হৃদয়ের বস্তু। প্রাণের অধিষ্ঠাতা দেবতা নিত্যগোপাল কাঁদিবেন—ইহা তাঁহারই পক্ষে উপযুক্ত, সার্থক।

সন্ন্যাসীর দেহ পোড়ান হয় না, তাই শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ পোড়াইতে নিত্যগোপাল নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রক্ষা করা শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত মণ্ডলীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাস্থি কোথায় সমাহিত করা যায়, ইহা লইয়া যখন তাঁহার ভক্তবৃন্দ বিব্রত, তখন নিত্যগোপাল তাঁহার মাসতুতো ভাই রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে নিজের অর্থে কিছুকাল পূর্ব্বে কাঁকুরগাছিতে যে বাগান কিনিয়াছিলেন, সেই কাঁকুরগাছি যোগোদ্যানে দেহাস্থি সমাহিত করিবার অনুমতি দিলেন। রামবাবু এতদিনে বুঝিলেন কি জন্য ঠাকুর নিত্যগোপাল রামবাবুর নামে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। নিত্যগোপাল শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির উপর নিজ হাতে ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় এই কয়টী কথা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

প্রচলিত বর্ণাশ্রমকে নিত্যগোপাল স্বীকার করিয়া লন নাই। গুণ ও বর্ণ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে গুণ ও বর্ণ কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে বর্ণাশ্রম নিত্যগোপালের অভিপ্রেত নয়। তিনি গুণ ও তথা বর্ণের বিভাগকে স্বীকার করেন, কিন্তু কাহারও কৌলীন্য স্বীকার করেন না। জীবস্ত এই বিশ্বে প্রত্যেকেরই সমান এবং অনন্য অধিকার ও প্রয়োজন রহিয়াছে। এইখানে দাঁড়াইয়াই সিঁড়িতান্ত্রিক উচ্চনীচ ভেদবাদকে অস্বীকার করিয়া নিত্যগোপাল বৈশ্য ভক্তকেও পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দিবার সামর্থ্য রাখেন। মানুষের সম্মান ভগবান বুদ্ধও দিয়াছিলেন, এই সেদিন মহাত্মা গান্ধীও জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে সমান মর্য্যাদা দিবার প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত বর্ণাশ্রমের সিঁড়িতান্ত্রিক উচ্চনীচ ভেদবাদের দার্শনিক জবাব দিয়া তাঁহারা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। ভারত-

বর্ষের শক্ত প্রচলিত বর্ণাশ্রমের নিকট তাই তাহা স্থায়ী আসন গাড়িতে পারে নাই, শাস্ত্রীয় মর্য্যাদাও লাভ করে নাই। নিত্যগোপাল তাঁহার এইরূপ সমস্ত কর্ম্মের পিছনে একটা দার্শনিক জবাব রাখিয়া গিয়াছেন, যাহাতে তাহারা শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে।

এই স্তরে দাঁড়াইয়াই শ্রাদ্ধের অন্ন গ্রহণ করা নিত্যগোপালের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। প্রচলিত বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধ তাঁহার কোন আচরণকেই শুধুমাত্র তিনি মহাপুরুষ বলিয়াই করিতে পারেন, এরূপভাবে দেখিলে চলিবে না— একটী বৃহত্তর সমীকরণধর্ম্মী জীবনবাদের মধ্যে এগুলির দার্শনিক জবাব দিয়াই তিনি প্রত্যেকটী আচরণ করিয়াছেন। একদিন নিত্যগোপাল যখন রামচন্দ্র বাবুর ওখানে ছিলেন, তখন মনোমোহনবাবু তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে রামবাবু ও নিত্যগোপালকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে শ্রাদ্ধান্ন ভোজনে পরমহংসদেবের নিষেধ আছে, ইহা রামবাবু জানাইলে মনোমোহনবাবু নিত্যগোপালকে তিনি কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত্যগোপাল তৎক্ষণাৎ বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি খাইব। যথাসময়ে মনোমোহনবাবুর বাড়ীতে নিত্যগোপাল উপস্থিত হইলেন। সেখানে মনোমোহনবাবুর ভগ্নিপতি রাখাল মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধান্ন ভোজন সম্বন্ধে তিনি কি করিবেন নিত্যগোপালকে জিজ্ঞাসা করায় নিত্যগোপাল বাড়ীর ছাদের উপর পৃথক করিয়া রান্না করিবার ব্যবস্থা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মনোমোহনবাবু ভাবিলেন নিত্য বুঝি তাঁহাদের প্রস্তুত সামগ্রী গ্রহণ করিবেন না—দুঃখিত হইয়া আবার নিত্যগোপালকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়ই খাইব, আমাকে সব কিছু আনিয়া দেওয়া হউক।' মনোমোহনবাবু সকল আহার্য্য সযতনে আনিয়া নিত্যগোপালের সম্মুখে দিলে তিনি খাইতে আরম্ভ করিলেন। রাখাল মহারাজ নিত্যগোপালকে বলিলেন, আপনি প্রসাদ করিয়া দিন আমি খাইব। নিত্যগোপালের নিকট এই ঘটনা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য প্রণবানন্দ মহারাজ তাঁহারা এ বিষয়ে কি করিবেন তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। নিত্যগোপাল খাইবার অনুমতি দিয়া বলিয়াছিলেন, 'শ্রাদ্ধান্ন খাইলে যে ভক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সে ভক্তি আমি চাই না।'

পর্য্যটন হইতে কাশীধাম ও সেখানে হইতে কিছুকাল কলিকাতায় কিছুকাল কাশীধামে এইভাবে নিত্যগোপাল অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখন তিনি কাশীধামে আসিয়াছেন। দিদিমাতা খুবই বৃদ্ধা হইয়াছেন, বর্ত্তমানে অসুস্থ হইয়া

খুবই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অন্তিম সময় সন্নিকট বুঝিয়া নিত্যগোপাল পূর্ব্বপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দিদিমার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া দিদিমাকে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইয়াছিলেন। দিদিমার তিরোধানে নিত্যগোপাল আকুল হইয়া কাঁদিলেন, অশৌচ পালন করিয়া যথারীতি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধান করিলেন।

১২৯৫ সালে ২৬শে পৌষ দিদিমা দেহরক্ষা করিয়াছেন; নিত্যগোপালের বয়স তখন চৌত্রিশ বৎসর। ইহার মধ্যেই তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন একটী পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার জীবনের স্পর্শে ও আকর্ষণে কলিকাতায় ও কাশীধামে অনেকেই আসিয়া জুটিয়াছেন। কেহ শিষ্য, কেহ ভক্ত, কেহ পিতৃভাবে ভজনা করে, কেহ মাতৃভাবে, কেহ বন্ধুভাবে, কেহ সখাভাবে, কেহ পুরুষ হইয়াও নিত্যগোপালকে স্বামীভাবে ভজনা করে, কেহ ঈশ্বর ভাবে। কাশীধামে প্রিয়লালবাবু নিত্যগোপালকে বন্ধুর মত ভালবাসিতেন। একজন সমাধিস্থ পুরুষ যে আবার বন্ধু হইতে পারেন, ইহা নিত্যগোপালকে দেখিয়া জানিলাম। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে দরদ, যে দৃষ্টি, বন্ধুর দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে বন্ধুর যে কর্ত্তব্য, প্রিয়লাল সম্বন্ধে নিত্যগোপালের সেই দৃষ্টি সেই দরদ ছিল এবং তাহা এমন ভাবেই ছিল যাহা কোন সংসারের বন্ধুর নিকট হইতে কেহ পাইবার আশা করিতে পারে না। প্রিয়লালবাবুর সংসার কষ্টে চলিত—একদিন নিত্যগোপাল তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে প্রিয়বাবু যেন ঠাকুরের কাছে একটা কাঠের বাক্স রাখেন এবং যখন যাহা উপার্জ্জন করিবেন তাহা যেন তাঁহার কাছে আনিয়া দেন, প্রিয়বাবু দরকার মত চাহিয়া লইবেন—কখনও হিসাব চাহিতে পারিবেন না। বহু ঘটনার মত এই ছোট্ট ঘটনাটীর মধ্যে একসঙ্গে নিত্যগোপালের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বন্ধুর প্রয়োজনকে তিনি বুঝিতে পারেন, সে প্রয়োজনকে মিটাইবার জন্য নিজের বিভূতিকেও প্রয়োগ করেন। একজন সমাধিস্থ পুরুষের পক্ষে ইহা যে কী অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব কথা—তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে বিরাট প্রাণের প্রয়োজন হয়। আর একদিন প্রিয়লালবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে কলহ হয়—অভিমানিনী স্ত্রী গভীর রাত্রিতে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে হঠাৎ নিত্যগোপাল সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রিয়বাবুর স্ত্রীকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিলেন। এইভাবে নিত্যগোপাল প্রভু, বন্ধু, পালন ও রক্ষণকর্ত্তা। এমন আপনজন ব্রহ্ম নিত্যগোপালকে আজ আমাদের বড় প্রয়োজন।

কলিকাতায় ফিরিয়া কিছুদিন পরে ১২৯৯ সালের মাঘমাসে নিত্যগোপাল প্রথম নবদ্বীপ যাইতে ইচ্ছা করিলেন। নবদ্বীপ পৌছিয়া সেখানকার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান সকল দর্শন করিয়া ঠাকুর হরিসভার গৌরাঙ্গদর্শনে যখন গেলেন তখন বেল দ্বিপ্রহর; আর তখন তিনি প্রায় সমাধিস্থ। হরিসভার সেবাইত মথুরানাথ সবে দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের সঙ্গে নিজ ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ। মথুরানাথ 'আবার কি গৌর এলি রে' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে মথুরানাথ দেখিলেন নিত্যগোপাল। ঠাকুর গৌরদর্শনের জন্য আসিয়াছেন জানিয়া মথুরানাথ মন্দির খুলিতে উদ্যোগী হইলে ঠাকুর দ্বিপ্রহরের শয়নের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিলেন। মথুরানাথ বলিলেন, 'আপনি নিজেকে নিজে দর্শন করিবেন, ইহাতে আর নিয়ম কি?' গৌরাঙ্গ দর্শনান্তে মথুরানাথ মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করিতে চাহিলেও ঠাকুর আর অপেক্ষা করিলেন না, তখনই আবার নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

পর্য্যটনে বাহির হইবার কিছুদিন পুর্ব্ব হইতেই নিত্যগোপালের সদাসর্ব্বদার জন্য যে একটা আত্মভোলা আপনভোলা অবস্থা হইয়াছিল ক্রমে সেটা কমিয়া আসিয়াছে, এখন ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন। কথাবার্ত্তা বলিতেন বটে কিন্তু গান বা কীর্ত্তন শুনিবার সময় কিংবা কথা বলিতে বলিতেই যে তিনি কতবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। নবদ্বীপ যাইয়া কিছুদিন একাদিক্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন—মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া শিষ্য বা ভক্তদের বাড়ীতে অল্প দিনের জন্য থাকিয়া যাইতেন। নবদ্বীপে এই সময় ধর্ম্মদাস রায়, দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রভৃতি অনেকেই আসিয়া ঠাকুরের পদপ্রান্তে সমবেত হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে উপদেশামৃত দান করিতেন, পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হইত, ঠাকুরকে এক এক জন এক এক রূপে দর্শন করিতেন, সমাধির সময় ঠাকুরের দেহ বিভিন্ন দেব দেবী বা অবতারের রূপ পরিগ্রহ করিত—ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেন। এইভাবে মহানন্দে কিছুদিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপে ঠাকুরের দিনগুলি কাটিয়াছে। আবার ইহারই মধ্যে তিনি গ্রন্থাদিও লিখিয়াছেন। পেনসিল দিয়া যে সব গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, দ্বারিক বলিয়া তাঁহার এক ভক্তদ্বারা সেগুলি নকলও করাইয়াছিলেন।

নবদ্বীপ গোঁড়া ব্রাহ্মণদের স্থান। ঠাকুরের আকর্ষণে যখন অনেকেই তাঁহার চরণপ্রান্তে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল, তখন ইহার বিরুদ্ধে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটী প্রতিবাদ ঘনায়িত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মদাসের পিতা প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায় শুনিলেন তাঁহার পুত্র শূদ্রের নিকট মন্ত্র লইয়াছে, শূদ্রের প্রসাদ খায়। ধর্ম্মদাসকে তিনি তলব করিলেন। পিতাকে ধর্ম্মদাস ভয় করিতেন। উত্তর দিলেন, 'আপনি তাঁহাকে একবার দেখিবেন। যদি তাঁহাকে দেখিয়া বলেন তুমি ইহার কাছে যাইও না, তবে আমি যাইব না।' ব্যবস্থা করিয়া ধর্ম্মদাস একদিন পিতাকে লইয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিলেন। ঠাকুর ভাল আছ প্রশ্ন করিয়াই সমাধিস্থ হইলেন—মতিলাল রায়ও ভাবস্থ হইলেন—এই সমাধিস্থ অবস্থায় দুইজনেরই প্রায় চারি ঘণ্টা কাটিল। সমাধি ভঙ্গের পর মতিবাবু ঠাকুরকে বলিলেন, 'ধামাইকে (ধর্ম্মদাস) তো পায়ে স্থান দিয়াছেন, ধামাইয়ের বাবা হোয়ে আমি যেন বঞ্চিত না হই'। পুত্রকে মতিবাবু বলিয়াছিলেন, 'সংসারে পুত্র বন্ধনের কারণ, তুমি আমার মুক্তির কারণ। যদি সকলে একবাদী হইয়া ঠাকুরের কাছে যাইতে নিষেধ করে, তুমি বজ্রপতন বাধাও মানিবে না। এইভাবে মতিবাবুর মতির পরিবর্ত্তন হইল, শূদ্রের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন।

এইরূপ ঘটনা আরও ঘটিয়াছিল। দেবেনবাবুর শ্বশুর রঘুনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় জামাতা অব্রাহ্মণের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে জন্য তাহাকে জাতিচ্যুত করিতে মনস্থ করিয়া একদিন একেবারে ঠাকুর যেখানে থাকেন, সেই রামচন্দ্র সাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভিতরে কীর্ত্তনানন্দে সকলে বিভোর, ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধের ডাক ভিতর হইতে কেহ শুনিতে পায় না। অবশেষে ঠাকুরই দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। কীর্ত্তন ও নৃত্যের আকর্ষণে বৃদ্ধও ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ নৃত্যের পর সকলে মিলিয়া ঠাকুরের প্রসাদ পাইলেন। অতঃপর রঘুনাথ ভক্তসহ তাঁহার বাড়ীতে ঠাকুরের ভিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া বিদায় হইলেন। এইভাবে একদলের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও নবদ্বীপে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কেহ বলিতে লাগিল আবার গৌর আসিয়াছেন, কেহ বলিতে লাগিল এক সোনার মানুষ, অপরূপ মানুষ আসিয়াছেন।

কোনো সাম্প্রদায়িক চিহ্নহীন এই সহজ মানুষটীর কাছে শিক্ষিত ও বৈষ্ণব এবং মানী ঘরের ছেলেরা যেমন আসিতে লাগিল, তেমনি

একেবারে নামগোত্রহীন লোকেরাও তাঁহার স্পর্শ পাইতে লাগিল। ঠাকুর কলিকাতার ও নবদ্বীপের আশেপাশে বিভিন্ন গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। একদিন নবদ্বীপের কাছাকাছি ভাতশালা গ্রামে প্রিয়শিষ্য ধামাইর বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে মুচিপাড়ার এক ঘরে যাইয়া উঠিলেন; বলিলেন নবদ্বীপের মুচিবাড়ীতে হরিনাম হইবে না তো কোথায় হইবে? ঠাকুর যে সে মুচীর বাড়ী উঠেন নাই। ভুবনমুচী পরম ভক্ত—স্ত্রী পুত্র কন্যা জামাতা সকল সহ সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনানন্দে দিন কাটায়। ঠাকুর বলিলেন—'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে,' বলিয়া ভুবনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ভুবন ধন্য হইয়া গেল।

প্রাণের স্তরের সাধনা আর মনের স্তরের সাধনা পৃথক—এ কথা বিস্তৃত ভাবে আমরা আলোচনা করিয়াছি। প্রাণের সাধনার ইঙ্গিত দিতে যাইয়া ঠাকুর লিখিয়াছেন, 'জীবের শিবের প্রতি আপনার অদ্বৈততা বোধ হইলেই শিবের প্রতি জীবের যে ভক্তি হইয়া থাকে, আমাদের বিবেচনায় তাহাকেই পরা ভক্তি বলা হইয়া থাকে।' 'অগ্রে শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগ না হইলে শ্রীভগবানের পূজাদিতে অনুরাগ হয় না।' ঠাকুর তাই সর্ব্বাগ্রে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন, আপনজন বলিয়া স্থান দিয়াছেন, অদ্বৈতবোধ জন্মানই সাধনার প্রথম স্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এইজন্যই স্বভাবচরিত্র জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই আশ্রয় দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়। তাঁহার প্রেমের টানে আমরা আমাদের স্বভাব বদলাইব, চরিত্র শোধন করিয়া লইব, যেমনটি হইলে তাঁহার আনন্দ হয়, তাহার মর্য্যাদা থাকে, আমরা তেমনটি হইব—ইহাই তো সাধনা। কলিযুগ ভাগবত যুগ—ভগবানের সঙ্গে জীবন মিলাইয়া প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের সাধনাই কলিযুগের সাধনা। যুগধর্ম্মানুসারে পূর্ব্ব যুগের মাপকাঠিগত কোন নিয়মকানুন, আচার অনুষ্ঠানই আজ নাই, সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়াছে, মানুষ সে হিসাবে পতিত হইয়াছে, ব্রাত্য হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেই সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির পথও খুলিয়া গিয়াছে। কানো বিশেষ আচরণ মাত্রই কলিযুগের সাধনা নয়, কোন বিশেষ আচারই আজ উত্তম বা অধম নহে। তাই ঠাকুরের ইচ্ছার সাথে স্বভাবের সাথে উপদেশের সাথে মিলাইয়া আমরা আমাদের চরিত্র ও প্রকৃতি বদলাইয়া জীবনকে অধিকতর ব্যাপক ও অধিকতর গভীর করিয়া তুলিব—ইহাই আমাদের একমাত্র সাধনা। ঠাকুর যখন বলেন তোমাদের কিছু করিতে হইবে না, সব ভার আমার উপর

রহিল, তখন তাহা এইখানে দাঁড়াইয়াই বলেন। জপ, তপ, ব্রত উপবাসের কঠোর কৃচ্ছ্রতা আমরা করিব না—কিন্তু তাঁহাকে ভাল তো বাসিতে হইবে—তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার মত স্বভাবযুক্ত হইবার প্রয়াস তো করিতে হইবে। তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী ছিলেন। সে মিষ্টত্ব যে কী তাহা কোন্ ভাষা দিয়া বুঝাইব? আমরা কি মিষ্টভাষী হইব না? ইহাও কি আমাদিগকে করিতে হইবে না?

নবদ্বীপে একদিন ঠাকুর বসিয়া আছেন, এমন সময় মথুর বাগ নামক নীচকুলোদ্ভব একটী লোক আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, 'তুমি আর যাও না কেন? তোমাকে আর দেখি না কেন? তুমি আমায় তুলসী তলায় বসে জপ করতে বলে এলে, কিন্তু আর গেলে না কেন?' ঠাকুর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি কি এখনও তোমার বউর সঙ্গে ঝগড়া কর?' বাগ মহাশয়, 'ওঃ, তুমি সেই জন্য যাও না? আচ্ছা, আমি আর বউর সঙ্গে ঝগড়া করব না, তাহলে তুমি যাবে তো?' ঠাকুর বলিলেন, 'হাঁ যাইব'। মথুর বাগকে যদি অপরের সঙ্গে ঝগড়া করিতে তিনি নিষেধ করিয়া থাকেন, আমাকে আপনাকে কি নিষেধ করেন নাই? মথুর ঠাকুরের প্রেমের টানে নিজের চরিত্র বদলাইবে স্থির করিয়া ফেলিল। আমরা কি তাঁহাকে ভালবাসিয়া আমাদের সকল ক্ষুদ্রতা দূর করিব না?

ঠাকুরের সকলই নূতন ধরণের। তাঁহার আচার আচরণ, চালচলন, সাধনা আরাধনা সবই নূতন রঙে রঞ্জিত। একদিন নবদ্বীপে বসিয়া আলোচনা হইতেছে। নিত্যধামগত শোকহরণ মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর, আমাদের অপরাধ কি আপনি নেন না? ঠাকুর উত্তরে বলিলেন, 'পরমহংস মহাশয়কে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন আমি অপরাধ নেই না বটে, তবে কর্ম্মফল আছে।' ভক্তগণ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া কহিলেন, 'আমরা আপনার কথা শুনিতে চাই।' তখন 'আমি অপরাধ নেই বটে, তবে স্নেহ যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন সব ভাসিয়া যায়' বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। আমার পুত্র অপরাধ করিলে আমিই তাহাকে শাসন করিব, তাহাকে দণ্ডদাতা পুলিসের হাতে ছাড়িয়া দিব না। ঠাকুর আমার অপরাধ অবশ্যই লইবেন, যাহাতে আমি আর অপরাধ না করি সেজন্য ব্যবস্থা তিনি করিবেন, কিন্তু কর্ম্মফলের হাতেই যদি আমার ভালমন্দের বিধান ব্যবস্থা থাকে, তবে তাঁহাকে ভগবান

বলি কেন, তাঁহার সহিত আমার সম্পর্কই বা থাকে কি করিয়া আর বিধি বা আইন কি ভগবানের অপেক্ষাও বড়? বিধির, আইনের সাধন তো আজিকার সাধন নহে। আজিকার সাধনা প্রাণের, প্রেমের। প্রাণের সাধনায় আপনজনই অপরাধ লইবেন, শাস্তি দিবেন,—বিধান বা আইনের স্থান সেখানে গৌণ।

এই আমাদের প্রাণের ঠাকুর নিত্যগোপাল ভক্তদের কত ভালই যে বাসিতেন! তাঁহার মিষ্টি হাসি আর মধুর ব্যবহার বড়ই প্রাণমাতানো ছিল। এই মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন মানুষটীর দৃষ্টি সব দিকে ছিল। প্রসন্নবাবুর মাথা গরম, তাঁহাকে বাতাসার সরবৎ দিতে বলিলেন, কোন ভক্তের স্ত্রীর কাপড় নাই—তাঁহার জন্য কাপড় দিয়া দিলেন। একদিন এক ভক্ত হুগলী হইতে চলিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর সে সময় ভাবস্থ ছিলেন। ভক্তটী আশ্রম হইতে চলিয়া আসিবার কিছু পরেই ঠাকুর আত্মস্থ হইয়া সেই ভক্তটীর নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সঙ্গে তাহার পথে খাওয়ার জন্য কিছু দেওয়া হইয়াছে কি না। হয় নাই জানিয়া দুঃখ পাইলেন, তখনই কিছু খাবার আর একজন ভক্তকে দিয়া স্টীমার স্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। স্টীমার তখন ছাড়ে ছাড়ে—কোনমতে খাবারটী ভক্তের নিকট পৌঁছান সম্ভব হইয়াছিল।

ঠাকুরের হাসি ছিল বড়ই মিষ্টি—হাতখানি মুঠা করিয়া মুখের সামনে ধরিয়া উচ্চে হাস্য করিতেন—সে হাসির মধ্যে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল যাহার ভাষা নাই। ঠাকুরের আমাদের কৌতুকবোধ বা রসিকতাও ছিল। অনেকদিন আগে তখন তিনি কলিকাতায়। তাঁহার এক ভাইর স্ত্রীর গায়ের রং ছিল খুব কালো। একদিন পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিয়া তিনি কেমন দেখাইতেছে তাঁহার ঠাকুরপোকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মৃদু হাসিয়া নিত্যগোপাল উত্তর দিলেন, 'ঠিক যেন টিকায় আগুণ ধরেছে।' আর একদিন দাঁড়ি গোফ লাগাইয়া ঠাকুর অভিনয় করিয়াছেন, সেই সাজেই একেবারে সেই বৌদির ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অপরিচিত লোক দেখিয়া তাঁহার বৌদি তাড়াতাড়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তখন ঠাকুর, 'আমায় চিনলে না বৌদি' বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নবদ্বীপে থাকাকালীন একদিন দুপুরে ঠাকুর বলিয়া যাইতেছেন, দ্বারিক লিখিতেছেন—চারিদিক নিস্তব্ধ। এমন সময় কোথা হইতে এক বিড়াল আসিয়া ডাকিল,

ম্যাও। ঠাকুর ঐরূপ স্থানে ঐরূপকালে বিড়ালের ঐ অদ্ভুত ডাক শুনিয়া এমন হাসিতে লাগিলেন যে হাসি আর থামে না। ঠাকুরের ঐরূপ হাসি দেখিয়া দ্বারিক হাসিতে হাসিতে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, হাসির শব্দে জাগিয়া উঠিয়া পাশের ঘর হইতে মাঠাকরুণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিয়া ইঁহাদের হাসি দেখিয়া তিনিও হাসিতে লাগিলেন—এই ভাবে এক হাসির রোল পড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ পর ঠাকুর 'নারায়ণ নারায়ণ' বলিয়া স্থির হইলেন। এতদিন ধরিয়া আমরা যাহার জীবন দর্শন আলোচনা করিয়াছি, সেই মানুষটীরই যে আবার এমন সুমধুর কৌতুক ও রসিকতা থাকিতে পারে, এইখানেই তাঁহার জীবনের সামগ্রিকতা। তিনি একটী পরিপুর্ণ সহজ মানুষ।

ভক্তা ও দেশো বলিয়া দুইটী কুকুর নবদ্বীপ আশ্রমে থাকিত। ঠাকুর তাহাদের আদর করিতেন, তাহাদের মাথায় পা রাখিতেন। ভক্তার মৃত্যুর পর ভক্তেরা তাহার দেহ গঙ্গা জলে ডুবাইয়া সৎকার করিয়াছিলেন, আর দেশো মারা গেলে তাহাকেও গঙ্গাতীরে সমাধি দিয়া মহোৎসব করেন। একদিন ঠাকুর ঘরে ঢুকিতেছেন এমন সময় চাল হইতে একটী টিকটিকি তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া মরিয়া গেল। দেখা গেল পায়ের সেই স্থানটীতে একটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুচিত্র হইয়াছে। ঠাকুরের নির্দ্দেশে তুলসী তলায় টিকটিকির সমাধি দেওয়া হইল, দৈ-চিড়ার মহোৎসব হইল। মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার মধুর দৃষ্টি ও স্নেহ যেমন অফুরান ছিল, তেমনি টিকটিকি কুকুর প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র জীবজন্তু সম্বন্ধেও তাঁহার একটা সস্নেহ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার বিরাটত্বের কথা চিন্তা করিলে এত ছোট ঘটনাগুলি কেমন যে মহনীয় আর মধুর হইয়া উঠে, তাহার তুলনা নাই।

'ঠাকুর সমস্ত খুঁটিনাটি কর্ম্মেই সুদক্ষ ছিলেন। আশ্রমে কখন কখন তাঁহাকে নিজহস্তে রন্ধনকার্য্যও করিতে হইয়াছে। ঠাকুরের কুটনা কুটা এক অদ্ভুত রকমের ছিল। মহোৎসবাদিতে তিনি স্বয়ং ঝুড়ি ঝুড়ি তরকারি অতি ক্ষিপ্রহস্তে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কুটিয়া ফেলিতেন।' নবদ্বীপে অবস্থান কালে ঠাকুরের কয়েকটী দিন সম্বন্ধে একটী উদ্ধৃতি—'শ্রীধাম নবদ্বীপে আম্পুলিয়া পাড়ার সেই ছোট ঘরটীতে তক্তপোষের উপর ঠাকুর আসন জমাইয়া বসিয়া আছেন। ইদানীং প্রায় একাসনেই সারাদিন কাটাইয়া দিতেন। বাড়ীর বাহিরে তো যাইতেনই না, (কেবল প্রস্রাব শৌচের জন্য

কোন কোন দিন আসন ছাড়িয়া উঠিতেন মাত্র) স্নানও সকল দিন করিতেন... না। যেদিন করিতেন হয় তো ১০।২০ ঘড়া জলে স্নান করিয়া উঠিতেন। সেই সময়ে ঠাকুর কোন নিয়মেই আবদ্ধ ছিলেন না। আহার স্নান প্রস্রাব শৌচ ইত্যাদির কোন নিয়মিত সময় বাঁধা ছিল না। আসনে বসিয়া আছেন, পিপীলিকা শ্রেণী সারি সারি ঠাকুরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া সমস্ত বিছানা অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে; আর তাহার মধ্যে ঠাকুর নিশ্চল, নিস্পন্দ; আরষ্টের ন্যায় সারাদিন বসিয়া রহিয়াছেন। সেই সমস্ত পিঁপড়া তাড়াইবার যো নাই; অথবা বিছানাটী ঝাড়িয়া দেওয়ার যো নাই; অথচ নিজেও সেই পিঁপড়ার দঙ্গল হইতে সরিয়া যাইবেন না। একটী পিঁপড়াও যদি কোন দিন দৈবাৎ মরিয়া গেল—আর রক্ষা নাই। অমনি ঠাকুরের মুখ গম্ভীর হইল; চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। কাছে কাহারো যাইবার যো নাই—যেন কি একটী প্রলয় কাণ্ড সেইদিন হইয়া গেল বলিয়া মনে হইত।'

প্রসাদের জাত বিচার করায় ঠাকুর তাঁর প্রিয় ভক্তকে একদিন বিশেষ শাস্তি দিয়াছিলেন। অপরাধ তিনি নিয়াছিলেন, শাস্তিও দিয়াছিলেন, আবার কোলেও তুলিয়া লইয়াছিলেন। নবদ্বীপে দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন তাঁহার এক আত্মীয় উপস্থিত থাকায় প্রসাদ গ্রহণ হইতে বিরত ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'সে যেন আমার কাছে না আসে, আমার কথা না কয়, আমার প্রসাদ না খায়।' বলিয়া তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রসাদ না পাইয়া দেবেন বাবু অনাহারে থাকিলেন—এইভাবে দশবার দিন কাটিল। দেবেন বাবুর দেহে অসহ্য কষ্ট হইতে লাগিল। ইহার পর মা ঠাকুরাণী ঠাকুরের প্রসাদ দেবেন বাবুকে দিবার ব্যবস্থা করিলেন—ভাবস্থ হইয়া ঠাকুর প্রসাদ দিয়াছিলেন, পরে বলিয়াছিলেন, যে সয়, তাকেই সইতে হয়।

ঠাকুর কলিকাতায় একটা স্থান করিতে ইচ্ছা করিয়া ১৩০১ সালের ৫ই আষাঢ় (১৮ই জুন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) ২৯ নং মনোহরপুর রোডে জমি কিনিয়া মহানির্ব্বাণ মঠ স্থাপন করেন। উহার বর্ত্তমান ঠিকানা ১১৩ নং রাসবিহারী এভিনিউ। সেখানেই তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে হইবে এবং উহাই বিশ্বজনের কাছে গুরুপীঠ বলিয়া গণ্য হইবে—এ ব্যবস্থাও তিনি করিয়া রাখিয়া যান। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ীই কাজ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহার সমাধির উপর এক সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। অভ্যন্তরে তাঁহার সেবাপূজাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এখন ঠাকুর কখনও কলিকাতায় কখনও নবদ্বীপে এইভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে প্রথমে রামচন্দ্র সাহার ভাড়া বাড়ীতে কিছুকাল থাকিয়া পরে আমপুলিয়া পাড়ায় নিজ আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, আর কলিকাতায় মহানির্ব্বাণ মঠ স্থাপিত হইল। ইহার পর তিনি মহানির্ব্বাণ মঠে একাদিক্রমে দীর্ঘদিন ছিলেম। কখনও কখনও নবদ্বীপ যাইয়া থাকিতেন। নবদ্বীপে যাতায়াত সুবিধার নয় বলিয়া হুগলীতে আসিয়া থাকিবার জন্য সেখানে চকবাজারে একটী পুরণো হাসপাতাল বাটী ক্রয় করিয়া ১৩১৩ সালের ১লা বৈশাখ সেখানে উপস্থিত হন। ইহার পর তিনি হুগলীতেই বেশী সময় থাকিয়াছেন। আমরা অন্তালীলায় সে কথা আলোচনা করিব। পর্য্যটনের সময় ঠাকুর সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তিনি কলিকাতা, কাশী, নবদ্বীপ ও হুগলী এই চারি স্থানেই বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়াছেন। আর পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালা দেশের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ছোটোখাটো যে সকল জায়গায় তিনি গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে মায়াপুর, ভাতশালা, বিদ্যানগর, কাটোয়া, বজরাপুর, বাওড়া, ষয়দিয়া, জগন্নাথপুর, ময়নাপুর, আমলাগুড়া, কৃষ্ণনগর, রসকুণ্ড, খানাকুল কৃষ্ণনগর, সাধুহাটী, স্বরস্তুনা, হালতু প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য।

নবদ্বীপ থাকা কালে ১৩০৪ সালে নিত্যগোপাল 'সর্ব্বধর্ম্মরক্ষিণী সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন। সর্ব্ব ধর্ম্মের একতা স্থাপনই এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভার প্রথম অধিবেশনে ঠাকুর যে ভাষণ পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে আছে, 'সেই সম্মিলনরূপ অমৃতফল আস্বাদিত হইলে সেই একই বহু এবং বহুই এক বোধ হইবে। তখন বহু ধর্ম্মকেও একই সত্যধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইবে।...কারণ সর্ব্ব-ধর্ম্মের অদ্বৈততার মধ্যেই, কারণ সর্ব্ব ধর্ম্মের ঐক্যের মধ্যেই পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ সুখ নিহিত রহিয়াছে। সেইজন্যই সর্ব্বধর্ম্মের ঐক্যবোধ যাহাতে হয় এই সভার তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য।' এই সভার প্রত্যেক সভ্যের স্থান ও মান কিরূপ, তাহা ঠাকুর যেভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহাতে সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ সম্পর্কে একটী নূতন বোধের আভাষ পাওয়া যায়। প্রতি অংশই যে নিরংশ অর্থাৎ প্রত্যেক অংশের মধ্যেই যে একটী সামগ্রিকতা রহিয়াছে—এই ভাবটী বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'যেমন একই দেহের সমস্ত অংশেরই প্রয়োজন আছে, তদ্রূপ সর্ব্বকর্ম্মরক্ষিণী সভার সমস্ত সভ্যেরই প্রয়োজন আছে।' ...ইত্যাদি। সভাসমিতি সম্মেলন পারস্পরিক আলোচনা আজিকার

যুগধর্ম্ম। ব্যক্তিকৈন্দ্রিক বর্ণাশ্রমী হিন্দু সভ্যতার দার্শনিক যুগে প্রত্যেকে নিজের সাধনা লইয়া ব্যস্ত—এ হেন চিন্তাধারার মধ্যে আজ থেকে ৫৬ বৎসর আগে সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া নিত্যগোপাল 'সর্ব্বধর্ম্মরক্ষিণী সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'পূজার সময় বাদ্যের মনোহর ধ্বনিতে কত লোক দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা দ্বারাও অনেকে দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হন।' 'জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে অনেকেরই উপকার হইয়া থাকে, জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে ক্রমে অনেকেরই জ্ঞানের সঞ্চার হইতে থাকে।' সর্ব্বধর্ম্মরক্ষিণী সভায় বক্তৃতাদি দ্বারা অপরকে আহ্বান করার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। ঠাকুরের অনুমতি ক্রমে 'সর্ব্বধর্ম্ম' নামে একটী পত্রিকাও কিছুদিন প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ঠাকুর নিজে সম্পাদক হইয়া 'শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৩০৬ হইতে ১৩০৭ পর্য্যন্ত এই পত্রিকাটী চলিয়া ছিল।

সর্ব্ব ধর্ম্মী, সর্ব্ব গুণকর্ম্মবান, সর্ব্ব যোগ্যতা সম্পন্ন, জ্ঞানভক্তিপ্রেমের সমন্বয় মূর্ত্তি সকল দলের ভিখারী এই সহজ মানুষ নিত্যগোপাল বলিয়াছেন, 'সম্প্রদায় গঠন আমার উদ্দেশ্য নয়। তাহা হইলে আমি বিস্তর শিষ্য করিতে পারিতাম। ... আমি দল গড়িতে আসি নাই। সাম্প্রদায়িক ভাব খুবই খারাপ—ইহাতে কোন না কোন ধর্ম্মমতের বা সম্প্রদায়ের বা মহাপুরুষের নিন্দা করিতেই হয়। ...আমি কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত নহি, আমার ইষ্ট যেমন বহুরূপী, আমি সেইরূপ বহু সম্প্রদায়ী। আমার ইষ্ট যখন শিব হন, আমি তখন শৈব; তিনি যখন বিষ্ণু হন, আমি তখন বৈষ্ণব; তিনি যখন অন্য কোন সাম্প্রদায়িক হন, আমিও তখন সেই সাম্প্রদায়িক হই।...আমি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান।...I am a cosmopolitan. ...প্রকৃত জ্ঞানীর কোন সম্প্রদায় নাই; অথচ তাঁহার সকল সম্প্রদায়।'

এমনই এক সমন্বয়মূর্ত্তি সহজ ব্রহ্ম-মানুষের বর্ত্তমান যুগে বড়ই প্রয়োজন। তাঁহার পদপ্রান্তে আমরা আমাদের সকল সত্তা নোয়াইয়া দিয়া বার বার নমস্কার করিতেছি।

কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা

সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

শিশুদিগকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহারা স্থির হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই, কোন কিছু একটা কাজ করিতেছে। হয়ত তাহারা লাফাইতেছে, খেলিতেছে, চিৎকার করিতেছে, কোনও একটা জিনিষ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, পিতামাতা বা বয়স্ক ব্যক্তিদের নকল করিয়া কোন কাজ করিতেছে বা কথা বলিতেছে বা রেল ইঞ্জিন হইয়া হুস্ হুস্ শব্দ করিতেছে, এমন আরও কত কি? চুপ করিয়া যে তাহারা একেবারে না বসিয়া থাকে তাহা নয়; যখন তাহাদের কাছে কোনও একটি সুন্দর চিত্তাকর্ষক গল্প বলা হয়, তখন তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া শোনে বই কি! কিন্তু তাহা ছাড়া, গল্প শোনা বা নিশ্চেষ্ট মনে ছবি দেখা বা কোনও কিছু পড়া কিংবা লেখা ছাড়া, তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। চুপ করিয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে তাহারা কাজও করে, কিন্তু কোনও কাজ ছাড়া তাহারা শূন্য মন লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, ইহা আমরা প্রত্যহ শিশুদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলেই দেখিয়া থাকি। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে শিশুর শক্তির উৎস ক্ষয়িত হয় এবং তাহাতে তাহাদের স্নায়ুর উপর বস্তুতঃ পক্ষে জুলুম করা হয়। ফলে শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শারীরিক বৃদ্ধির জন্য সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরিচালন এবং তৎ সঞ্চালনজনিত কাজ অতীব প্রয়োজন। এইরূপ কর্ম্মের ফলেই শিশু স্বকীয় কাজগুলি সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়, তদুপরি তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মও সুনিয়ন্ত্রিত হয়, এবং কর্ম্ম ও নিজের দেহের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিতে শিক্ষা করে। এক কথায় কর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া শিশু জীবনের প্রতি কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হয়।

শিশুকে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করার ফলে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা যাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি দিয়া শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন। এযাবৎকাল পর্য্যন্ত শিশুকে কেন কর্ম্ম করিতে নিষেধ করা হইয়াছে? প্রথম কথা হইতেছে, শিশুকে মনে করা হইয়াছে অক্ষম; তাহার দ্বারা কোন কাজ

সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহাই বয়স্কেরা মনে করিয়া আসিয়াছেন। তাই শিশুর প্রতি কর্ম্মে বিধি নিষেধের সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ শিশুর ধ্বংস করিবার প্রবৃত্তির উপরই পিতামাতা অভিভাবক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। শিশুরা ভাঙ্গিতেই সক্ষম, গড়িতে তাহারা পারে না, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শিশুকে কোন কিছু স্পর্শ করিতে দেন নাই। ফলে শিশু নিজের উপর নিজে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছে— তাহারা হইয়াছে নিস্তেজ, অক্ষম, ভীত ও সন্ত্রস্ত, এবং যে কোনও কর্ম্মে তাহারা পশ্চাৎপদ। ত্রুটি কাহার? পিতামাতা-অভিভাবকের, না শিশুর? শিশুকে সুযোগ দান না করিলে শিশু শিক্ষা লাভ করিবে কেমন করিয়া? প্রথম অবস্থায় প্রত্যেকেরই ভুল হয়, শিশুর ভুল ত হইবেই। ভুল হইবে, এই আশঙ্কায় তাহার কর্ম্ম রুদ্ধ করিলে চলিবে কেন? শিশুকে কাজ করিতে দিলে সে ভুল করিয়া ঠেকিয়া শিক্ষা লাভ করিবেই, কিন্তু কর্ম্মে অক্ষম মনে করিয়া তাহাকে নির্জ্জীব পদার্থে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলে তাহার অমঙ্গল ডাকিয়া আনাই হইবে। তাহা ছাড়া শিশুর কর্ম্ম শুধু কর্ম্মেই নিবদ্ধ নয়। শিশুর কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞান আহরণের ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের প্রশ্ন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শিশু প্রতি বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান আহরণ করিতে চায়, প্রয়োজন হইলে সে বস্তুকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া তাহার ভিতরে কি আছে তাহা দেখিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায়ই পিতামাতা অভিভাবক শিশুকে বাধা দেন সবচেয়ে বেশী। শিশুকে এই অবস্থায় সাহায্য করিলে শিশুর ধ্বংস প্রবৃত্তিকে সাহায্য করা হইবে এই কথাই তাঁহারা মনে করেন। কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকিলেও, সর্ব্বক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে। শিশুর অভিজ্ঞতা লাভের পথে ব্যক্তিগত বা সমাজগত কোন ক্ষতি যাহাতে না হয়, তাহা লক্ষ্য করা দরকার সন্দেহ নাই, কিন্তু বহুক্ষেত্রে সেরূপ আশঙ্কা থাকে না, তবে শিশুকে 'অনধিকার চর্চ্চার' অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয় কেন? এই অনধিকার চর্চ্চার কথা আমরা আরও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

যাহারা বয়স্ক তাহারা অনধিকার চর্চ্চা করেন না, তার কারণ তাহাদের পরিবেশে যে সব বস্তু আছে তাহাদের সঙ্গে তাহাদের সম্যক পরিচয় আছে, কিংবা পরিচয় না থাকিলেও ঐ বস্তুর সংশ্লিষ্ট অন্য বস্তুর সঙ্গে পরিচয় আছে। অতএব কোন বিষয়ে তাহারা অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাইয়া অনধিকার চর্চ্চা হইতে বিরত থাকেন। কিন্তু এমন জিনিষ যদি তাহাদের পরিবেশে

হঠাৎ দেখা যায়, যাহার সঙ্গে তাহাদের কোনও পরিচয় নাই, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন? ঐ বস্তুর সম্যক পরিচয় লাভে তাঁহাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকিবে না। জ্ঞান আহরণের স্পৃহা ও ঔৎসুক্য বয়স্ক মনকেও আঘাত করিবে। সামাজিক আদব-কায়দাদুরস্ত বয়স্ক মন অনধিকার চর্চ্চা করে না বটে, কিন্তু জ্ঞান লাভে আগ্রহ জানায়। শিশুর ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিশুর সঙ্গে তাহার পরিবেশের পরিচয় সামান্য, তাহা ভাল করিয়া মোটেই দানা বাঁধে নাই, এ মতাবস্থায় শিশু যদি হঠাৎ তাহার আবেষ্টনীতে নূতন জিনিষের সমাবেশ দেখিতে পায়, তবে গভীর দৃষ্টি লইয়া সে দেখিবে বই কি? তাহাকে সেখানে বাধা দিলে উহা মনস্তত্ত্বসম্মত হইবে না নিশ্চয়। তাহা ছাড়া শিশু যদি কোন একটি বস্তু একবার ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরকার তথ্যের সন্ধান লইতে সক্ষম হয়, তবে সেই বস্তু সম্পর্কিত ব্যাপারে সে পুনরায় আর অনুসন্ধিৎসু হইবে না। এই ভাঙ্গার মধ্য দিয়াই শিশু ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠে এবং তাহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।

শিশু যে শুধু ভাঙ্গিয়াই শিক্ষালাভ করে, এমন নহে; সে গড়িয়াও শিক্ষালাভ করে। ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্যে সে একটা সম্পর্ক স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া শিশু ভাঙ্গা গড়ার অন্তর্দৃষ্টি লইয়াও যে সব সময় শিক্ষা লাভ করে, তাহা নয়। কতকগুলি জিনিষে শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য কেন্দ্রীভূত হয়, অথচ সেই জিনিষগুলির অন্তরে প্রবেশ করিতেও তাহারা সক্ষম নয়। সে সমস্ত ক্ষেত্রে তাহারা অনেক সময় বহিরাবরণ টুকুকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। পিতামাতা বা অভিভাবকের কর্ম্মের কথাই ধরা যাউক। শিশু উহাদের কাজে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সকল অবস্থাকে আয়ত্ব করিতে পারে না। সে সকল ক্ষেত্রে শিশু পিতামাতা-অভিভাবককে অনুকরণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিশু ডাক্তার পিতার কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া রোগীর পরিচর্য্যা করে, মাতার কার্য্যাদি লক্ষ্য করিয়া রান্না করে, বাসন ধোয় ইত্যাদি। শিশু বাস্তব জীবনে যাহা দেখে তাহা অনুকরণ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে।

বস্তুতঃ পক্ষে শিশু নিজের কর্ম্মের মধ্য দিয়া যাহা আয়ত্ব করে তাহাই সে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা করে। রুশো এবং পরবর্ত্তী শিক্ষাবিদ্‌গণও স্বীকার করিয়াছেন যে, শিশু অবস্থায় ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রসূত জ্ঞানই শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই গ্রহণ করিতে

শিক্ষা করে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালনের ফলেই শিশুর জ্ঞানের ভিত্তি জন্মায়। শিশু মন পরিপক্ক হইয়া উঠিলে অবশ্য প্রজ্ঞাপ্রসূত জ্ঞান শিশুমনে দানা বাঁধিতে থাকে। অতএব জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে শিশুকে স্বীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, ইহা আজ সকল শিক্ষাবিদ্‌ই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কিছুদিন পুর্ব্বে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাতে শিক্ষকই চিন্তা করিয়াছেন, পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং অবশেষে তাহাদের চিন্তাধারা শিশুর উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। শিশুর কাজ ছিল শিক্ষকের আদেশ পালন করা এবং তাহাদের প্রতি শাসন ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত কঠোর। শিক্ষা ছিল শ্রেণীগত, পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি ছিল অনমনীয়। কর্ম্ম হইতে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন বা কাজের কোন ব্যবস্থাই শ্রেণীকক্ষে ছিল না, শুধু ছিল পুস্তকের বহুল ব্যবহার। খাতা, পেন্সিল, কাগজ, পুস্তক ও প্রশ্নোত্তর ছিল শিক্ষাদানের মূল কথা। এমন কি শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটা ধরাবাঁধা রীতি অনুসরণ করা হইত।

কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের রূপ যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার কারণ আমরা সংক্ষেপে অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব। পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা কেন আজ শিশুকেন্দ্রিক ও কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। এই অবস্থার সূত্রপাত যে আজ হঠাৎ হইয়াছে তাহা নয়, ইহার সূত্রপাত হইয়াছে বহুদিন পূর্ব্বে—প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কমেনিয়াসের সময়। তারপর রুশো, পেস্তালজি, ফ্রয়েবেল, মন্টেসরি, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রভৃতি মনস্বীগণ কর্ম্মের ধারাকে বিভিন্ন দিক হইতে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া শিশুর শিক্ষাকে কর্ম্মকেন্দ্রী করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইহার গোড়া পত্তন হইলেও আজ বিংশ শতাব্দীতে কর্ম্মকেন্দ্রিকতার দিকে এতটা ঝোঁক কেন দেখা যাইতেছে, তাহা দেখা যাইতে পারে।

ইহার প্রথম কারণ হইতেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির গতি পূর্ব্বকাল হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী। বিজ্ঞানের বিস্ময় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে অতি দ্রুত গতিতে নাড়া দিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের

এই কম্পনকে অস্বীকার করিবার আজ আর উপায় নাই। শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয় পক্ষই আজ শিশুর চাহিদাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। মনোবিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্য শিক্ষার গোড়াকে নাড়া দিয়া যাইতেছে। বেশী দিনের কথা নয়, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও বিদ্যালয়ে শাস্তির স্থান ছিল অমূল্য। শাস্তি ব্যতিরেকে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, ইহাই ছিল ভারতে প্রচলিত। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশ সমূহে আরও কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ইহার অপকারিতা স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে শাস্তি ও কঠোর শাসন শিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল, তাহাই শিক্ষা দানে বাধার সৃষ্টি করে বলিয়া বর্তমানে সকল শিক্ষাবিদ্‌দের অভিমত। তাঁহারা বলেন, শিশুর শাস্তির প্রতি ঘৃণা রূপান্তরিত হইয়া শিক্ষকে বা শিক্ষণীয় বস্তুতে যাইয়া স্থিতিলাভ করিতে পারে। কথাটা কতদূর মারাত্মক তাহা বিশেষভাবে চিন্তনীয়। শিক্ষাক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে শিশুর শিক্ষার ধারা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার পর বিশেষ করিয়া ফ্রয়েড ইয়ুঙ্গ ও এ্যাডলারের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁহারা অচেতন মনের যে খবর আমাদের দিয়াছেন, তাহা আমাদের উপেক্ষা করিবার মোটেই উপায় নেই। মনের ⅞ ভাগের কোন খবরই আমরা জানি না। এই অজানা ভাবধারা যে শিশু জীবনে কতটা ক্রিয়াশীল তাহাও আমাদের বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শিশুর ভাবাবেগের মূলে যে কোন কারণ নাই একথা কে বলিতে পারে? অতএব মনের অচেতন অবস্থাও আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

স্তলজার রুশোর কাল হইতে শিক্ষাবিদগণ শিশুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিবার জন্য বিশেষ করিয়া আবেদন জানাইয়া আসিতেছেন। তাহা হইলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্তও ইহা ভালভাবে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ শিক্ষক সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে, ফলে শিশু-পর্য্যবেক্ষণ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া শিশুর শিক্ষাব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে সাহায্য করিতেছে।

শিক্ষার ধারা বদলানর দ্বিতীয় কারণ সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনজনিত। যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন এবং তাহার ফলে নানারকম সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হইতেছে। শিল্পোন্নতির ফলে

সহর ও সহরতলী এবং শিল্পাঞ্চলে বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছে। আমাদের বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক্। ১৯২১ সনের আদমসুমারীতে কলিকাতা সহরে ও সহরতলীতে ১৩ লক্ষ লোকের বাস ছিল; সেই লোকসংখ্যা আজ ১৯৫৪ সনে উন্নীত হইয়া প্রায় ৭০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। জন্মের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রামাঞ্চল হইতে গ্রামবাসীরা পয়সা উপার্জ্জনের জন্য সহরে আসিয়া ভীড় জমাইয়াছে, ইহাও অনস্বীকার্য্য। ফলে গ্রাম হইতে আগত শিশুর দল শান্ত সুনিবিড় পরিবেশের বহু বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। শিশু-জীবন আজ সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত। সুবিধা যে তাহারা কোনও কোনও ক্ষেত্রে না পাইতেছে তাহা নয়; জীবনধারণের মান হইয়াছে উচ্চ এবং জ্ঞান আহরণের সীমারেখাও পরিবর্দ্ধিত। কিন্তু অসুবিধার কথা মনে হইলে তাহার বহুলতাকে মূল্য না দিয়া উপায় নাই। জীবন হইয়াছে তাহাদের জটিলতর, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এবং তাহারা হইয়াছে গৃহকর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। গ্রামে অবস্থানকালে প্রতি শিশু প্রতি পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করিত, কিন্তু সহরে পরিবার সেই সুবিধা ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হইতেছে যে, গ্রামে শিশুরা বয়স্কদের সংযোগে বৃদ্ধি পাইত, পিতামাতা পুত্রকন্যা একটি বিশেষ মনোবৃত্তি লইয়া সংসার-জীবন যাপন করিত, পারিবারিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য-গুলি শিশুরা পিতামাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিত।

বিদ্যালয়ে কর্ম্মের অভাব ছিল, শিশুরা সেখানে আয়ত্ব করিত পুস্তকমুখী বিদ্যা, কিন্তু গৃহে তাহারা শিক্ষালাভ করিত জীবনযাপনোপযোগী অন্যান্য আচারব্যবহার। কিন্তু সহরে আগমন করিবার পর তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পিতা রহিয়াছেন সহরের কর্ম্মচক্রে সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান, আর মাতার অবস্থা গৃহের আবেষ্টনীতে ততোধিক সঙ্কটাপন্ন। অতএব শিশুদের সঙ্গে পিতামাতার যোগাযোগ কোথায়? সমাজ ব্যবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে শিশুদের পক্ষে যে ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, তাহা পরিপুরণ করিবার পন্থা কি? এই দ্রুত অবনতির পথ হইতে শিশুদের আজ রক্ষা করিতে পারে একমাত্র বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের কাজ শুধু পুস্তকমুখী হইলে চলিবেনা। পুস্তকমুখী পাঠদান কিছুটা চলিয়াছে গ্রামে, কারণ শিশুদের ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষা পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে গৃহে। কিন্তু সহরে সেই সুবিধা থাকিবে না। গৃহের শিক্ষার অভাবের পরিপুরণ

করিবার জন্যই সহরে এই সব বিদ্যালয়ের কার্য্যক্রমের আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। শিশুর প্রয়োজন আজ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আর উপেক্ষা করিবার উপায় নাই, সময়ও নাই। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন আজ একান্তভাবে কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশুর জীবন আজ কর্ম্মের সূত্রে তাহার সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে। শিশুদের জীবনের দাবী আজ মানিতেই হইবে। Dewey বলিয়াছেন, "It is a change, a revolution, not unlike that produced by Copernicus when the astronomical centre shifted from the earth to the sun. In this case the child becomes the sun round which the appliances of education revolve."

ক্রমশঃ

'মানুষ যে যাহার মত করিয়া জগৎকে গড়িয়া লইতে পারে, কেননা 'একটি জগৎ' বলিয়া একটি সত্য বস্তু আছে। কোন্ সংগঠন ব্যবস্থাদ্বারা এই প্রতি মানুষের গড়া জগৎগুলিকে ঐ 'একটি জগতে' (One World) গড়িয়া তোলা যায়, তাহার সম্যক আলোচনা করাই এই পত্রিকার লক্ষ্য।'

সাময়িকী

বিশ্বদর্শন : ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের বরোদায় অনুষ্ঠিত ২৮শ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ডাঃ সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী বলিয়াছেন, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিশিষ্ট ধারাগুলির উন্নয়ন ও সংস্করণের মধ্য দিয়া ইহাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের ফলে এই দুই স্বতন্ত্র ধারা একীভূত হইয়া এক সাধারণ বিশ্বদর্শন সৃষ্টি করিতে পারে।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এমন ভাবে বৈষয়িক সর্ব্বক্ষেত্রে—রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে ও কৃষ্টিতে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, এককে অপর হইতে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা আর সম্ভব নয়। অথচ কেহই কাহাকে একান্তভাবে পরিপাক করিয়া একক হইতে পারিতেছে না। প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে একান্ত-ভাবে পরিপাক করিতে পারে নাই, পাশ্চাত্যও প্রাচ্যকে পারিতেছে না। দুই দুই-ই আছে; অথচ নাই দুইকে দুই রাখিয়া এক হইবার, সমন্বিত হইবার কোন সাধনা। তাই আজ 'বিশ্বদর্শনে'র প্রসঙ্গ উঠিয়াছে দর্শন কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ হইতে। প্রাচ্য কোন্ কৌশলে প্রাচ্য থাকিয়াই পাশ্চাত্যের জড়বাদ স্বীকার করিতে পারে, পাশ্চাত্যই বা কোন্ কৌশলে পাশ্চাত্য থাকিয়া প্রাচ্যের অজড় দর্শনকে বরণ করিতে পারে, আজ তাহারই পথ খুঁজিতে হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশেষ দুইটী ভাবধারার উপাসনা করিয়া চলিয়াছে। প্রাচ্য প্রধানতঃ অজড়বাদী, তাহারা জড়কে রাখিয়াছে অজড়ের সহায়করূপে; পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জোর দিয়াছে জড়ের উপর যাহার ফলে অজড় হইয়া রহিয়াছে অনেকটা জড়েরই সহায়করূপে। প্রাচ্যদর্শন মূলতঃ আকড়াইয়া ধরিয়াছে অতীন্দ্রিয়কে, আর পাশ্চাত্য শক্ত করিয়া ধরিয়াছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে। অথচ কেহই একান্তভাবে পরিপূর্ণ সমাধান দিতে পারে নাই। আজ তাই প্রয়োজন হইয়াছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা ও অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির সমন্বয়ের। এই সমন্বয়ের উপরই গড়িয়া উঠিতে পারে বিশ্বদর্শন।

এই বিশ্বদর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বিশ্বনাগরিক শ্রীনিত্যগোপাল, যিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন, **'I am cosmopolitan,'**

এবং নিজ হস্তে লিখিয়া গিয়াছেন, 'সমন্বয়। নিত্যানিত্য সমন্বয় বা আত্মানাত্ম সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার সমন্বয়। আকার-নিরাকার-সাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়।' জড়াজড় সমন্বয়ের এই দার্শনিক ফরমুলার মধ্যে বর্ত্তমান বিশ্বের —কি এদেশের কি ওদেশের—সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান নিহিত রহিয়াছে। বর্ত্তমানের সর্ব্ববিধ জটিল সমস্যার মূল রহিয়াছে জড় ও অজড়ের দ্বন্দ্বের (সঙ্ঘর্ষের) মাঝে। অজড়বাদী ভারতবর্ষ জড়কে ছাড়িতে পারিতেছে না, পরিপাক করিতে পারিতেছে না বলিয়া জড়ের হাতে মার খাইতেছে এবং জড়বাদী পাশ্চাত্য অজড়কে ছাড়িতে বা রাখিতে কিছুই পারিতেছে না বলিয়া অজড়ের হাতে লাঞ্ছিত হইতেছে। বিশ্ব আজ দুইয়ের কাছে ভীতির বস্তু। কোথায় তাহাদের কাছে বিশ্ব বা বিশ্বদর্শন? বিশ্বকে তাহাদের না মানিয়া আজ উপায়ও নাই, অথচ কোন্ কৌশলে যে মানা যায়, তাহাও তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষে সর্ব্বক্ষেত্রে যে ন্যক্কারজনক নৈতিক পতন ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার কারণও হইতেছে জড়কে পরিপাক করিতে না-পারা। পরিণামধর্ম্মী জড়কে কোন্ কৌশলে অপরিণামধর্ম্মী অজড় 'নিজ' বলিয়া আস্বাদন করিতে পারে, তাহারই কৌশল আজ শিখিতে হইবে।

অজড় ও জড় একই সমগ্র জীবনের আস্বাদন। জড় ও অজড় যখন পরস্পরকে স্ববুদ্ধিতে অনন্য-বুদ্ধিতে উপলব্ধি করিতে পারে, তখন জড় নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে এবং অজড়ও তাহার সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠে, তখনই হয় জড় অজড়ে সমন্বয়। শ্রীনিত্যগোপাল এই জড়-অজড়ের সমন্বয়ে বিশ্বদর্শন গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রত্যক্ষ ও অতীন্দ্রিয় উভয় অভিজ্ঞতার সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে যে যুক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষের যোগ রহিয়াছে, আমরা সেই যুক্তিকেই স্বীকার করি।' প্রত্যক্ষ বাদ দিলে একান্ত অতীন্দ্রিয় সৃষ্টি করে ভাবুকতা। এই ভাবুকতার ফলেই এদেশ জড়বাদের 'দাস' হইতে পারিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই যে অতীন্দ্রিয় রহিয়াছে তাহা উপলব্ধ হয় তখনই, যখন প্রতিটি ইন্দ্রিয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির অভিজ্ঞতাকে মান্য করে এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে নিজ অভিজ্ঞতাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যত্নপর হয়। তখন প্রতিটী ইন্দ্রিয় নিজের উর্দ্ধে উঠে, নিজের

নিজত্ব বজায় রাখিয়া নিজেকে ডিঙ্গাইয়া যায়, অতীন্দ্রিয় হয়। সর্ব্বেন্দ্রিয় সমন্বয়ই অতীন্দ্রিয়ত্ব। যখন ইন্দ্রিয়সমূহের অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পরস্পর্দ্ধী হয়, তখন এক ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়কে ধ্বংসই করে—এই ধ্বংস হওয়াকেই এতদিন অতীন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিত প্রাণদ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিতে পারে বিশ্বদর্শন। শ্রীনিত্যগোপাল এই বিশ্বদর্শনই বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনিত্যগোপাল জড়ের সঙ্গে অজড়ের সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে জড়ের অন্তর্নিহিত এক নূতন রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। জড় বহুপ্রসবধর্ম্মী বলিয়া প্রকৃতিকে বহুপ্রসবিনী বলা হইয়াছে। যেখানে বহু, সেখানে অংশ থাকা অনিবার্য্য। এতদিন অংশগুলিকে কিছুতেই নিরংশের সঙ্গে সমন্বিত করা যায় নাই। কিন্তু প্রতিটী অংশও যে নিরংশ, অল্প প্রতিটী অংশও যে পুর্ণ, তাহা শ্রীনিত্যগোপাল প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, 'অল্প অগ্নিও পুর্ণ, অধিক অগ্নিও পুর্ণ।' অল্প পুর্ণ হইলে অল্পের সঙ্গে ভূমার ভেদ কাটিয়া যায়। বাঙ্গলার প্রতিটী অংশ-জেলা যেমন বাঙ্গালাই, গঙ্গার প্রতিটী অংশ জলকণাও যেমন গঙ্গা, তেমনি মায়াসমন্বিত ব্রহ্মের প্রতিটী অংশও ব্রহ্ম—এইভাবে অল্প 'পুর্ণ' হইলে অল্পগুলির মধ্যে উচ্চ-নীচ বিভাগ করিয়া অধিক পুর্ণ, অধিকতর পুর্ণ ভেদ করিয়া ব্রহ্মকে অধিকতর পুর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ অল্পতর পুর্ণকে ব্রহ্ম হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না। শ্রীনিত্যগোপাল মতে অল্প হইতে পুর্ণ ব্রহ্ম যতদূর, অধিক হইতেও পুর্ণ ব্রহ্ম ততদূর। এইভাবে বহুপ্রসবিনী প্রকৃতিকে বুঝিতে পারিলে ব্রহ্ম-প্রকৃতির সমন্বয় বাস্তব হয়, বিশ্বদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দেশে প্রাচীনেরা এতদিন প্রকৃতির সর্ব্ববিধ স্তরে উচ্চনীচ বিভাগ স্থাপন করিয়া চৈতন্যের সঙ্গে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যে সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে সহনশীলতা হয় নাই। প্রকৃতির প্রতিটী বিভাগের সঙ্গে পুর্ণের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই বাস্তব সহনশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীনিত্যগোপাল এই সহনশীলতার পরিপুর্ণতায় অত্যাশ্চর্য্য সমন্বয় দর্শন প্রচার করিয়া ধন্য। ভারতীয় দর্শন এইভাবে ভাবিত হইলে পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে ইহা অনায়াসে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে এবং পাশ্চাত্যদর্শনও তাহার স্বমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে মিলিত

হইতে পারে। এই মিলন সম্ভবপর হইলেই বিশ্বশান্তি নামিয়া আসিবে। ধরার ধূলি ব্রহ্মরেণুতে গড়িয়া উঠিবে।

বেরিয়া হত্যা ঃ সোভিয়েট রাশিয়ার একটী সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সোভিয়েটের ভূতপূর্ব্ব সহকারী প্রধানমন্ত্রী লাভারেন্তস্কি বেরিয়াকে তাঁহার ছয়জন সহকর্ম্মীসহ বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে হত্যা করা হইয়াছে। এই সংবাদটী বিশ্বময় এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্ববাসী ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে কি শোচনীয় ব্যর্থ শাসন চলিতেছে প্রগতির গর্ব্বে গর্ব্বিত রাশিয়ার মধ্যে। সোভিয়েট রাশিয়ার গঠনের সময় স্ট্যালিন যাহা করিয়াছিলেন, ম্যালেনকভ তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। বেরিয়া ৩৮ বৎসর প্রাণ খুলিয়া মাতৃভূমির সেবা করিয়া আসিয়াছেন। ১৯১৫ সালে তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত পুলিশ বিভাগে কৃতিত্বের সহিত কাজ করেন। পরে তিনি ১৯৪১ সালে সহকারী প্রধান মন্ত্রীত্বে উন্নীত হন। ১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ্চ বেরিয়ার সমর্থনে ম্যালেনকভ প্রধানমন্ত্রীপদে মনোনীত হন। তিন মাস পরেই তাঁহাকে বৈদেশিক চর অপবাদ দিয়া গত ২৯শে ডিসেম্বর তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার বুকে অনুষ্ঠিত এই হত্যাকাণ্ড দলীয় ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। যে পুরুষটী তাঁহার কৌমার বয়স হইতে রাশিয়াকে উন্নত করিবার জন্য বহু বিপদ বরণ করিয়া লইয়াছেন, যে পুরুষ জার্ম্মাণীর সামনে নিজের বুক পাতিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি ছিলেন ষ্ট্যালিনের বিশ্বাসভাজন সঙ্গী এবং যিনি নিজ যোগ্যতায় রাশিয়ার নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত রাশিয়া শেষ পর্য্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারিল না। অথচ এই ভারতবর্ষকে যাহারা রাশিয়ার ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে, তাহারা প্রতি ব্যাপারে এখানে 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' ক্ষুণ্ণ হইতেছে বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্য কতখানি রাশিয়া ও চীন রাখিয়াছে তাহা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। হিংসাই যাহাদের রাজনীতিতে একান্ত পন্থা বলিয়া স্বীকৃত, সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নই থাকিতে পারে না। যে কংগ্রেস-শাসনকে দুঃশাসন বলিয়া ইহারা ঘোষণা করে, সেই দুঃশাসনের মধ্যেই তাহারা তেলেঙ্গানা সৃষ্টি করিয়াও আজও

সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিবার সুযোগ পাইতেছে। আজও ইহারা এদেশে সুস্থ শরীরে আন্দোলন করিবার সুযোগ পায়। রাশিয়া এ দেশ হইলে ইহাদের দশা বেরিয়ার মত হইত। কিন্তু এ দেশের গণতন্ত্র প্রতি সংস্থাকে তাহার বক্তব্য বলার সুযোগ দিবে, যতক্ষণ না তাহা হিংসার আশ্রয় লয়। ইহাদের প্রচারের ফলে জনসাধারণ যদি ইহাদের মতাবলম্বী হয়, এ দেশের সরকার সে পথে কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না। আর ইহারা 'হাতে মাথা কাটিবার' নীতি লইয়াই জন্মিয়াছে, বাঁচিতে চাহিতেছে। ইহারা অপরকে মারিয়া নিজেরা বাঁচিতে চায়। এই নীতি অনুসরণ করিয়া কংস শেষ পর্যন্ত বাঁচিতে পারে নাই, মনস্তত্ত্বের এই সিদ্ধান্ত আজ প্রতি হিংসপন্থী রাষ্ট্রকে স্মরণ রাখিতে বলি। বন্দেমাতরম্

'ব্যক্তিকে সর্বপ্রকারে সমাজের অপেক্ষমান করিয়া রাখিলে ব্যক্তিজীবনের সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে সমাজের সমগ্রতাকে বাদ দিয়া ব্যক্তিজীবন আজ অর্থহীন বাতুলতা। পৃথিবীর ইতিহাস ও আধুনিক বিজ্ঞান বলিতেছে যে, ব্যক্তি ও সমাজ যেমন পরস্পর-অপেক্ষমান, তেমনি পরস্পর-নিরপেক্ষও বটে এবং তাহারা পরস্পরকে হজম করিয়া এক অখণ্ড সমাজ রচনার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩৬০

'উজ্জ্বলভারত' *

ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধেয় স্বামীজী † ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

আমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য আজকের সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করে আমায় যে সম্মান দিয়েছেন তার জন্যে আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। অনুগ্রহ করে এ কথাটা আপনারা মামুলী কথা বলে মনে করবেন না। সত্যিই আমি এখনও বুঝতে পারিনি কেন আমায় সভাপতি করা হয়েছে। উজ্জ্বলভারতের আমি একজন গ্রাহক কিন্তু এখানে আমার চেয়ে যোগ্যতর গ্রাহক-গ্রাহিকা অনেকেই উপস্থিত আছেন। আমি 'উজ্জ্বলভারত'কে ভালবাসি। এখানে উপস্থিত অনেকেই উজ্জ্বলভারতকে আমার চেয়ে ঢের বেশী ভালবাসেন ; এবং এর উন্নতির জন্যে অনেক বেশী চেষ্টা যত্ন করে থাকেন। সুতরাং সে দিক থেকে সভাপতি হওয়ার কোন দাবীই আমার থাকতে পারে না। তবে স্বামীজী আমায় একটু স্নেহের চোখে দেখেন, শ্রীমতি রেণু আমায় একটু ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। সেই জন্যেই তাঁরা আমায় এই সম্মান আজ দিয়েছেন। এই মনে করে আমি নিজেকে যথেষ্ট ধন্য জ্ঞান করছি। তাঁদের প্রীতির পাত্র হওয়া, আপনাদের আস্থাভাজন হওয়া আমার পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা। সেইজন্যেই বলছি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন শুধু একটা কথার কথা নয়।

---

* উজ্জ্বলভারতের সপ্তম বর্ষারম্ভে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫৪ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রীতি-সম্মেলনে সভাপতি ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র কর্তৃক পঠিত অভিভাষণ।

† উজ্জ্বলভারত সম্পাদক 'স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ'।

উজ্জ্বলভারত আজ ছ' বছর পেরিয়ে সাত বছরে পড়ল ; 'লালয়েৎ-' এর বয়স পেরিয়ে এখন 'তাড়য়েৎ'-এর কোঠায় এল। এখন তাকে শাসন করা, নিয়ন্ত্রিত করা, ঈপ্সিত পথে চালিত করা প্রয়োজন। কোন্ দিকে, কোন্ পথে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তার বিচার বিবেচনা করার সময় এসেছে। এ বিষয়ে আপনারা আপনাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করবেন এবং আমি অনুরোধ করছি যাতে সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা চলতে পারে সেই রকম উপদেশ আপনারা দেবেন। আমি পত্রিকা সম্বন্ধে আমার নিজের যা বলবার তা ঘরোয়া ভাবে, বক্তৃতা হিসাবে নয়, আপনাদের জানাচ্ছি।

বাংলা দেশে মাসিক পত্রিকার অভাব নেই। এ দেশের অতিবড় শত্রুও বলবেনা যে, এখানে পত্রিকার দুর্ভিক্ষ হয়েছে। এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, দুই একখানি ছাড়া বেশীর ভাগ পত্রিকারই ধরণ-ধারণ একই রকম— কয়েকটি হালকা ধরণের গল্প এবং ক্রমশঃ উপন্যাস, কবিতা (অনেক সময় দুর্ব্বোধ্য), কয়েকটি প্রবন্ধ—এই হচ্ছে তাদের সকলেরই মাল-মসলা ; এবং এই গল্প আর উপন্যাসের জোরেই সেগুলি চালু থাকে। 'উজ্জ্বলভারতে' এ সবের প্রাদুর্ভাব আদৌ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রিকাখানি যে ছ' বছর চলেছে তা থেকে যাঁরা এই পত্রিকার কর্ণধার তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা, আন্তরিক কর্ম্মনিষ্টারই সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রিকার গ্রাহক গ্রাহিকারা এজন্যে তাঁদের কাছে যথেষ্টই ঋণী, এবং তাঁদের তরফ থেকে আমি পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পত্রিকা এতদিন চালু থাকায় আর একটা সিদ্ধান্ত করাও বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, নিশ্চয়ই এমন লোক অনেক আছেন যাঁদের কাছে পত্রিকা যে মত ব্যক্ত করে এবং যে পথ নির্দ্দেশ করে, তার একটা আবেদন আছে। তাঁদের মতের সমর্থন পত্রিকায় পান বলেই পত্রিকাখানিকে তাঁরা আদর করেন। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে তা'হলে এই কথাই বুঝতে হবে যে, এই মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি মনে করি এই শ্রেণীর পাঠক সংখ্যা বাড়লে সমাজের সত্যই মঙ্গল হবে, এবং উগ্র অশান্তির অযথা অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একটা পথ লোকে খুঁজে পাবে।

স্বভাবের নিয়ম অনুসারে সমাজের রূপ ক্রমশঃই বদ্‌লাতে থাকে। সমাজ গতিশীল। পুরাকালে আমাদের সমাজ যে রকম ছিল আজ সে রকম নেই,

থাকতে পারে না। তখন আমরা নিজের দেশের মধ্যেই প্রধানতঃ আবদ্ধ থাকতুম, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ ছিল না। আজ ট্রেনে, জাহাজে, এরোপ্লেনে অল্প সময়ের মধ্যে বাইরের পৃথিবীর লোক আমাদের দেশে আসচে, আমাদের দেশের লোক বিদেশে যাচ্ছে। এই যাওয়া আসায় বিদেশের অনেক আচারব্যবহার, রীতিনীতি, ভাবপ্রবাহ, চিন্তাধারা আমাদের দেশে এসে পড়েচে, তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তারা তাদের প্রভাব অনেক রকম ভাবেই বিস্তার করে যাচ্ছে। আমি যতদূর বুঝি উজ্জ্বলভারত বলে, এই সব নতুন ভাবধারাকে অস্বীকার করে পুরাকালের ভাবধারাকে কেবল পুরান বলেই আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করা একেবারেই ব্যর্থ প্রয়াস। উপরন্তু সে চেষ্টা করার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই নেই। নতুনকে শুধু নতুন বলেই, বিদেশীকে শুধু বিদেশী বলেই কেন অস্বীকার করব? পুরান যা, তা সেকালের পক্ষে উপযোগী ছিল এবং সেই হিসেবে সত্যই ছিল, এ কথা কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু তা এখনকার পক্ষে যে উপযোগী নয় এবং সেই হিসেবে সত্য নয় একথাও মেনে নিতে হবে। অবশ্য এ কথা আমি বলছি না যে, পুরান সবই মিথ্যে হয়ে গেছে আর নতুন সবই সত্যি। কিন্তু পুরান সবই সত্যি আর নতুন সবই মিথ্যে, এই মনোভাবটা আমি একেবারেই সমর্থন করতে পারি না। উজ্জ্বলভারতের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ এক মত।

পুরান অনেক ভাব এবং কর্ম্মধারার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন একথা মেনে নিলে তারপর আসে বিচারের কথা—কোন্‌টা পরিবর্ত্তন করতে হবে, কোন্‌টা বজায় রাখতে হবে; নতুনের কোন্‌টা গ্রহণীয় আর কোন্‌টাই বা বর্জ্জনীয়। সমস্যা আজ অনেক—রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, কর্ম্মজীবন, সবই আজ সমস্যাসঙ্কুল, সর্ব্বত্রই অশান্তি, চারিদিকেই ব্যর্থতা। এই অশান্তির একটা মূল কারণই হচ্ছে প্রাচীন মনোভাব নিয়ে বর্ত্তমানের সম্মুখীন হবার চেষ্টা অথবা অতি আধুনিক হয়ে বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টা। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, অস্পৃশ্যতা এককালে সমাজের হিতকর প্রতিষ্টান ছিল, আজকে যে সে প্রথা একেবারেই অচল, একথা অস্বীকার করবার কোন উপায়ই নেই। ট্রামে আমার পাশে যিনি বসে আছেন, সে কালের বিবেচনায় তিনি একজন অস্পৃশ্য, পার্টিতে আমার সঙ্গে এক টেবিলে যিনি খাচ্ছেন তিনি একজন 'ম্লেচ্ছ'। যতদিন মনে করতে থাকব যে, ট্রামে চড়ে

বা পার্টিতে গিয়ে অন্যায় করছি, ততদিন অশান্তি ভোগ করতেই হবে। এখনকার দিনে কিন্তু ট্রামে বাসে চড়তেও হবে—পার্টিতে যেতেও হবে। সুতরাং সময়োপযোগী মনের পরিবর্ত্তন করে নিতে না পারলে কষ্ট পেতেই হবে—অশান্তি ভোগ করতেই হবে। পুরুষরা অনেকটা হয় ত মেনে নিয়েছেন—কিন্তু বাড়ির ভেতর? গৃহিনীরা এখনও অনেকেই মানতে পারেন না—কাজেই এখানে আবার একটা সংঘর্ষের ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। এই রকম অনেক সমস্যার দৃষ্টান্ত চোখ চাইলেই চারিদিকে দেখা যায়। সমাজে মেয়েদের স্থান, তাদের অধিকার, তাদের স্বাধীনতা, এসবই এখন আলোচনার বিষয়। যদিও এসব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আগে উঠত না। উট পাখীর মত চোখ বুজে রাখলেই সমস্যাগুলো উবে যাবে না। এগুলোর সম্মুখীন হতে হবে—এদের সমাধান করতেই হবে। উজ্জ্বলভারত এই সমস্যাগুলো ফুটিয়ে তোলে এবং কোন্ দিক দিয়ে এদের সমাধান হবে তারও একটা ইঙ্গিত দেয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যে এবং রেণুর লেখার মধ্যে এই সব প্রশ্নের আলোচনা বিশেষ করে চোখে পড়ে। আর কোন মাসিক পত্রিকা আমি জানি না যা এই সব সমস্যার একটা দার্শনিক বা কাল্পনিক নয় পরন্তু বাস্তব সমাধানের চেষ্টা করাকেই তার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করে। এইটেই আমি উজ্জ্বলভারতের বিশেষত্ব বলে মনে করি। এর সঙ্গেই কিন্তু আর একটা কথা আমি বলব—উজ্জ্বলভারতকে ভালবাসি বলেই বলব। উজ্জ্বলভারতের বহুল প্রচার আমি কামনা করি। বহুল প্রচারের উপস্থিত একটা বাধা আমার মনে হয় এই যে, পত্রিকার প্রবন্ধের ভাব এবং ভাষা সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের পক্ষেও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সকলের বোধগম্য ভাষায় বক্তব্যগুলি বর্ণিত হলে আরও অনেক বেশী লোক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হবে বলে মনে হয়।

পত্রিকা থেকে লোকে শুধু শিক্ষা নয়, আনন্দও পেতে পারে। পত্রিকা স্কুলের পাঠ্যতালিকাভুক্ত অনুমোদিত পুস্তক ত নয় যে সকলকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক পড়তেই হবে। সুতরাং লোককে কিনতেই হবে। ভাল না লাগলে লোকে কিনবে না পড়বে না। তাতে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। বেশী সংখ্যক গ্রাহককে আকর্ষণ করতে হলে দুটো জিনিষের কথা ভাবা প্রয়োজন। একটা হচ্ছে বাহ্যিক দিক—যাকে বলে The get-up। আর একটা ত ভেতরের দিক—যেটা পত্রিকার আসল বক্তব্য। Get-upটা—বাহিরের দিকটা

বোধ হয় এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে—যদিও পাতার সংখ্যা আর একটু বাড়লে খারাপ হবে বলে মনে হয় না। আর ভেতরের দিকটার কথা ত আগেই বলেছি। অনেক সময় মনে হয় যাঁরা যেটা বলতে চাইছেন সেটার সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের ধারণাগুলি নিজেদের কাছেই বোধ হয় বেশ পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেনি। সুতরাং তাঁদের ভাষার মধ্যেও একটা অস্পষ্টতা, একটা আড়ষ্ট ভাব থেকে যায়।* এই ধরণের প্রবন্ধ থাকলে পত্রিকা পড়ে লোকে আনন্দ পাবে না, কাজেই পত্রিকা যে শিক্ষা দিতে চাইছে তা কার্য্যকরী হবে না। কারণ প্রকৃত শিক্ষা আনন্দের ভিতর দিয়েই হয়ে থাকে। এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করে শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতির আজ অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। The Play way, The Project method প্রভৃতির মূল কথাই হচ্ছে এই যে, খেলার কল্পনার আনন্দের ভেতর দিয়েই শিশু শিক্ষালাভ করবে। জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ঐ শিশু শিক্ষার ব্যবস্থার মতই হওয়া দরকার। আনন্দ পাবার আর একটি উপকরণ হচ্ছে বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য—পত্রিকায় সেটার একটু অভাব আছে বলে আমার মনে হয়।

ধর্মের, আচারব্যবহারের সব রকম গোড়ামি ত্যাগ করতে হবে, এই কথাই উজ্জ্বলভারত বলে। মানুষ মানুষই—এই কথাই হচ্ছে সর্ব্বপ্রথম। একালের হোক বা সে কালের হোক, এ দেশের হোক বা বিদেশের হোক, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করুক বা তথাকথিত চণ্ডাল হোক, স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, শিক্ষিত সভ্য হোক বা অশিক্ষিত অসভ্য হোক, মানুষ মাত্রকেই মানুষের মর্য্যাদা দিতে হবে। এই কথাই উজ্জ্বলভারত বলতে চায়। এর চেয়ে মহত্তর তত্ত্ব আর কি হতে পারে আমি জানি না। তাই আমি উজ্জ্বলভারতের আদর্শকে একান্তভাবে সমর্থন করি। শুধু আমাদের দেশে নয়, আজ সারা বিশ্বে বিষম অশান্তি, বিরাট ভেদনীতি, বিরাট অনিশ্চয়তা ও সংশয় বিরাজ করছে। এই অস্বাভাবিক অসহনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা যে হচ্ছে না, তা নয়। U. N. O.-র মত আন্তর্জাতিক সংঘের প্রতিষ্ঠান এই চেষ্টা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু ঐ মহাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের কোন রকম প্রাণের যোগাযোগ ত নেই। সে যোগাযোগ স্থাপন হবে যদি ঐ আদর্শকে

* এই সম্বন্ধে কৈফিয়ত স্বরূপে আমাদের যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা সাময়িকীতে "প্রীতি-সম্মেলন"-নিবন্ধের মধ্যে সম্পাদকীয় ভাষণে বলা হইয়াছে।

মেনে নিয়ে প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে ঐ রকম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। আমাদের উজ্জ্বলভারত পরস্পরের মধ্যে এই প্রাণের যোগাযোগ স্থাপন করবার একটা প্রকৃষ্ট পন্থা। তাই বয়সে, আকারে ক্ষুদ্র হলেও দাম এর খুবই বেশী, স্থান এর খুবই উঁচুতে।

সকলকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দিয়ে, অশান্তের মনে শান্তি এনে, অস্থির চিত্তকে স্থির করে, হতাশ্বাসকে আশা দিয়ে, সব ভয়, সংশয় দূর করে উজ্জ্বল-ভারত উজ্জ্বলতর হোক এই প্রর্থনা করি। নমস্কার—

সাধক কবি নিশিকান্ত

শশাঙ্কমোহন চৌধুরী

ছন্দোবদ্ধ কবিতাই কাব্য নয়। তার বাচ্য সুষমামণ্ডিত হ'তে পারে, তার মধুর ঝঙ্কার আমাদের মনকে দোলা দিতে পারে। কিন্তু তার অতিরিক্ত আর কিছুর ইঙ্গিত যদি তাতে না পাই তবে তা আর যা-ই হোক, কাব্য নয়। কবিতার অবয়ব-সংস্থানকে ছাড়িয়ে যে ইঙ্গিত তা হচ্ছে রসলোকের ইঙ্গিত। রস আনন্দস্বরূপ, রসিক যারা তারা তার আস্বাদ পায়। রসিক কারা? আলঙ্কারিকদের মতে যাদের আছে সহৃদয়হৃদয়সংবাদী মন। অর্থাৎ দরদী মনের অনুভূতিতে হয় রসের আস্বাদন।

অধ্যাত্মবাদীরা বলেন আত্মা আনন্দস্বরূপ। আত্মোপলব্ধিই রসোপলব্ধি। সুতরাং রস ও আত্মা অভিন্ন, এবং এই হেতুই 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'।

আনন্দই কাব্যসৃষ্টির মূল উৎস ব'লে কবিরাও অধ্যাত্মবাদীদের সমধর্মী। তবে বিকাশের তারতম্য হিসাবে রসের গভীরতা ও অগভীরতা বিচার করা সম্ভব। কাব্য সার্থকতা লাভ করেছে কিনা তা নির্ভর করে রসের গভীরতার উপর।

কবি নিশিকান্তের কবিতার ছন্দ অনবদ্য, শব্দচয়নে অসাধারণ নৈপুণ্য এবং বাক্য বিন্যাসে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা আছে। তা ছাড়াও আছে এক রহস্যলোকর ইঙ্গিত যা উদ্বুদ্ধ অধ্যাত্ম-চেতনাকে বাচ্যার্থের অন্তরালে টেনে নিয়ে গিয়ে মধুর গুঞ্জরণ শুনায়।

রহস্যলোক কী? রসলোক থেকে তা কি ভিন্নতর? না। তবে তা আত্ম-উপলব্ধির পথ—অন্তর্মুখী ধ্যানীর সত্যদৃষ্টির পথ।

রসলোকের একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

বন্দীরা গাহেনা গান,
যমুনা-কল্লোল সাথে নহবৎ মিলায় না তান।
তব পুরসুন্দরীর নূপুর নিক্বণ
ভগ্ন প্রসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।

কবির বক্তব্য এখানে শুধু বাচ্যার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, মানুষের বাসনা-কামনার বস্তুর ধ্রুব নশ্বরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কবির ভাব এখানে মনোহারী ছন্দে গাঁথা শব্দলালিত্যের মোহ ছাড়িয়ে রসে পরিণত হয়েছে।

রহস্যলোকের হলেও যা ভাবলোকেরই গান—

আসে বসন্ত ফোটে যে ফুল,
দিক-দিগন্ত পুলকে দোলে,
অধীর গন্ধে ঝরে বকুল,
দখিণা সমীর আপনা ভোলে;
বসন্ত নেই, আমি যে আছি!
মম যৌবন-কুসুম-রাজি
জাগে গৌরবে, রূপে সৌরভে
বাঁধন ভাঙে—
কত আরক্ত-রাগে যে রাঙে!

বস্তু জগতের বসন্ত ও চিত্তের বসন্ত এখানে একাকার। অন্তর্লীন সৌন্দর্যে কবি অভিভূত হয়ে অনন্তের আভাস দিয়েছেন। এই অনন্তের রসলোকে যিনি ডুব দিয়েছেন তাঁর কাছে ক্ষণ বসন্ত চিরবসন্তে রূপান্তরিত।

কবি নিশিকান্তের কাব্য-সৃষ্টিতে অনন্ত, অসীমের অভিব্যঞ্জনা সুপরিস্ফুট। রসে নিমগ্ন না হলে রসসৃষ্টি সম্ভব নয়; তার জন্য প্রয়াস করা চলে কিন্তু সে-প্রয়াস হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। নিশিকান্তের কবি-জীবনের উন্মেষ থেকে আজ পর্যন্ত দেখি তাঁর কাব্য-সাধনা চলেছে একটা বিশেষ পরিণতির দিকে। মানুষের জীবনের টুক্‌রা টুক্‌রা হাসি-কান্না ও সুখ-দুঃখের খণ্ডিত রস যাঁর

চিত্তে অলকানন্দার ধারা এনে দিয়েছিল, তিনি শুনলেন একদিন মহাসাগরের ডাক। পুরাতনের মোহ তখন তাঁর হয়েছে বিগত, তাই তখন তাঁর বীণায় বেজেছে খেদের সুর—

হায়রে! সেদিন, আমিও ছিলাম তোমাদের ঐ খেলায় অন্যমনা!
মদির-নেশায় কুড়ায়ে অধীর সুখের দুখের কণা
মাতিয়াছিলাম নয়নাভিরাম তোমাদের নন্দনে;

* * * *

কিছু চোখে দেখা, কিছু কানে শোনা, কিছু হাতে ছোঁয়া কিছু মনে মনে ভাবা,
কিছুবা প্রাণের হঠাৎ-পাওয়ার হাল্‌কা হাওয়ায় কাঁপা,
কিছুবা অধরা পাওয়া-না-পাওয়ার কুহেলি মায়ায় মাখা
কিছুবা না-বোঝা বর্ণের ছবি আঁকা;—
আমি তাই নিয়ে মোর গানে গানে করেছি রচন
মোহন সুরের মুগ্ধ বচন!

বিশাল এই পৃথিবীর মধ্যে একদিন কবি চেয়ে দেখলেন তাঁর পরিবেশ কত ছোট। পুর্বাচলে বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে সূর্যদেব তেমনি ওঠেন ভোরের বেলা; অগণিত সন্ধ্যাতারকা আকাশের গায়ে নিত্য তেমনি করে দীপালি উৎসব; গৃহবাসী যারা, পথচারী যারা তাদের কল-কল্লোল তেমনি ভেসে আসে কানে; কিন্তু তৃপ্তি নেই। মন ছুটে যেতে চায় আর কোথাও যেখানে সীমাহীন আনন্দ থাকে বেদনায় অনাহত। কবির অন্তর আকুল হয়ে যেন কার কাছে তার বেদনা জানায়। এমনি হয়েছিল একদিন রবীন্দ্রনাথের, তিনি জানিয়েছিলেন এক অদৃশ্য শক্তির কাছে তাঁর অন্তরের প্রার্থনা—

"অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।"

কিন্তু কেমন সেই বিকাশ? যে বিকাশে ক্ষুদ্রতার কোন মালিন্য নেই—যা সুন্দর, উজ্জ্বল, মঙ্গলময়। নির্বাধ জীবনে সমগ্র বিশ্ব এসে একাত্ম হয়ে যে-জীবনকে করেছে বৃহত্তর মহত্তর, সেই জীবনের প্রশান্তির মধ্যে ডুবতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

"যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোর ছন্দ।"

কবি নিশিকান্তরও এলো একদিন এই আকুলতা। রতি, হাস, ক্রোধ, উৎসাহ, বিস্ময় প্রভৃতি বহুবিধ ভাবের আবেশে মানুষের মনে যে রসাভাস ঘটে, সেই রসের আদি উৎস কোথায়? অর্থাৎ এই সব রস কোথায় এসে স্থিতি লাভ ক'রে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হয়েছে? কবির আত্মা ছুটে যেতে চায় সেইখানে, অর্থাৎ জীবাত্মা চায় পরমাত্মার সংযোগ। এই পরমাত্মার সংযোগ সাধনই কবি নিশিকান্তকে তাঁর পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। নিশিকান্ত সাধক কবি।

মহাকাব্যের যুগ থেকে সরে এসে আমরা এখন চলেছি খণ্ডকাব্যের যুগে। একালে খণ্ডকাব্যের সর্বজনপূজ্য স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই সর্বরসাধারের সাধনার সূচনা। 'গীতাঞ্জলি'র যা মূল সুর তা হচ্ছে আত্মাভিমানকে ডুবিয়ে পরমাত্মার চরণে আত্মসমর্পণ, কারণ তা হলেই সম্ভব পূর্ণ রসের আস্বাদন। ভবিষ্য কাব্য-সাধনা কোন্ পথ ধরে চলবে রবীন্দ্রনাথই দিয়ে গেছেন একালে তার প্রথম ইঙ্গিত। কবি এখানে হয়েছেন দার্শনিক অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা। নিশিকান্ত এই সত্যেরই উত্তরসাধক। তাঁর সাধনা একাগ্রভাবে চলেছে এই দিকে। বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের স্পর্শে তাঁর চেতনা রূপান্তরিত হয়েছে দিব্য চেতনায়।

মানুষের প্রকাণ্ড মেলা। সেই মেলার মধ্যে অবস্থিত নাগর-দোলায় দুলছে শিশু, কিশোর, যুবক-যুবতী আর হয়তো জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। মাথার উপরে অন্তহীন আকাশ থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে; মাটী থেকে উড়ছে ধূলি। আলো-ছায়াচ্ছন্ন ধূসর-মলিন জীবগুলির অতি সন্নিকটে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি সকলকে দোল খাওয়াচ্ছে, সে ওদেরি মতো অতি সাধারণ মানুষ; কিন্তু কী অনায়াস-লব্ধ যেন তার শক্তি! সেইদিকে চোখ মেলে কবি পেয়ে গেলেন তাঁর দিব্যদৃষ্টি। তিনি গেয়ে উঠলেন—

ঘুরিতে ঘুরিতে তারি চোখে চেয়ে
থেমেছে ঘোরার ঘোর,
এতদিনে আমি চিনিতে পেরেছি তারে;
উঠি নামি—তবু এক হ'য়ে গেছে
অতল-উর্দ্ধ্ব মোর,
মৃত্তিকা-বুকে দেখেছি নীহারিকারে;
দোলায় বসিয়া অদোল-চেতনা ধরি'
রঙিন মেলার রঙে রঙে আঁখি ভরি,

স্বপনের মতো তুলিছে মূর্তি যত
কোন্ খেয়ালীর খেয়াল মূর্ত করি।

মৃণ্ময়ে এই চিণ্ময় চেতনা কবিকে এনে দিয়েছে আনন্দঘন রস,—যে রসে নিমজ্জিত হয়ে তিনি হয়েছেন স্থিতপ্রজ্ঞ।

কিন্তু তার আগে কত দীর্ঘ দিনের ব্যাকুলতা ঝরে গেছে অশ্রু হয়ে। নিজের অহমিকার শেষ চিহ্নটুকু যেদিন মুছে গেলো সেইদিন কবি দেখলেন তাঁর করণীয় আর কিছুই নাই—তিনি শুধু যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রমাত্র; পথে চলেছেন, দিশারী চলেছে পথ দেখিয়ে।

আমি তো জানিনা, কোন্ ফুলে মালা
গাঁথিতে হবে,
বীণাতে আমার কোন্ সুরে তার
বাঁধিতে হবে;
আমি তো জানিনা, কি কথা বলিব,
কোন্ পথ ধরি কেমনে চলিব;
আমি তো জানিনা কেমনে সাধনা
সাধিতে হবে।

অনাগত কালে হয়তো আবার কোন্ কবি সৃষ্টি করবেন এক মহাকাব্য যার বিচিত্র রসের ধ্বনি ঝঙ্কৃত হয়ে শুনাবে একটি মাত্র তান, এবং সে তান হবে দিব্য চেতনার সুরে বাঁধা।

রবীন্দ্রনাথ পথ নির্দেশ করেছেন। সে-পথের ইঙ্গিতে সাড়া দিয়েছেন নিশিকান্ত. মুগ্ধ কবি তাঁর যাত্রা-পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ধরে রেখেছেন তাঁর কাব্যে; চলমান খরতোয়ার জলকল্লোল, বায়ু-হিল্লোলে মর্মরিত বনশিখর, তুষারধবল হিমগিরির রূপ-বৈভব, আকাশচারী পক্ষিকুলের নির্দেশবিহীন সঞ্চরণ অথবা শ্রান্ত, ক্লান্ত, অগণিত নর-নারীর বিমলিন আচ্ছন্ন বিলাস—এ সবেরই মধ্যে কবি দেখেছেন জ্যোতির্ময়তা! তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সেই জ্যোতির উৎস

যে-উৎসের বিম্ব দোলে অম্বরের তপনে, ইন্দুতে,
নীহারিকা-বলাকায়, চিরন্তন সন্ধ্যার সিন্ধুতে;
যে-পাণির ক্লান্তিহীন রচনায় এ-বিশ্বভুবন
বিশাল কাব্যের মত দিকে দিকে ভঙ্গি উদ্ভাসন

কল্প হ'তে কল্পান্তরে প্রমূর্তিয়া উঠেছে ঝঙ্কৃয়া
কালহীন ছন্দে তালে।

নিশিকান্ত এই জ্যোতির্ময়ের প্রেমে পাগল। তাঁরই গান তিনি গেয়ে চলেছেন তাঁর কাব্যে। কিন্তু

যত গাহি গান তব নীরবতা তত যে নিবিড় হয়,
যত উছলাই, তোমার অতলে তত হই তন্ময়,
যত কাছে পাই খনে খনে তুমি তত দূরতম হও,
কোন্ অভীষ্ট সুদূরের পানে মোর অভিসার লও,
মিলনে-বিরহে বহি' ব্যাকুলতা কোন্ সে মিলন লাগি
দিবা-নিশি আছ জাগি।

পৃথিবীর মানুষ আমরা। উদয়াচলে আদিত্যের নিত্য আবির্ভাবে যে নব জীবনের উদ্দীপন হয় দিকে দিকে, তা কয়জন লক্ষ্য ক'রে থাকি? কবি সেই রূপককে আশ্রয় ক'রে সকলকে শুনিয়েছেন সেই পরম জ্যোতির বাণী। তাঁর কাব্যের দ্যুতি অমল। তাঁর সৃষ্টি সার্থকতা বহন ক'রে চলেছে।

—মানুষের অন্তরের সহজ বিশ্বরূপ-মানুষটিকে জাগ্রত করে তোলাই হচ্ছে সকল কর্ম্মপদ্ধতির মূল রহস্য।—

গান্ধী

সন্তোষকুমার অধিকারী

মৃত্যুর কূলে জীবন দেখেছো অমৃতময় দীপ্ত
মৃত্যুঞ্জয় নাম ?
সূর্য্যের লেখা চিররাত্রির মেরু তুষারের বক্ষে—
দুঃসহ উদ্দাম ?
দেখেছো মানব মৃত্যুসাধকে শতাব্দী ব্যাপী পুণ্যে
মহাত্মা যার নাম ?
মৃত্যু ত তাকে নীরব করেনি মহৎ করেছে সত্যে
রক্ত যে তার হয়েছে অশোক জীবনের অমরত্বে,
প্রাণের প্রকাশে পরশমণির স্পর্শ পেয়েছি ভাগ্যে
পেয়েছি অমর জীবনের জয় নির্ভয় বৈরাগ্যে।
চির অভয়ের হাস্য দেখেছি প্রেমের দীপ্ত চক্ষে
মুক্তির মানে হিংসায় জয় নির্ভয় পাওয়া বক্ষে।
তুমি ভারতের গান্ধী ?
কঠিন দৃপ্ত,…চরণে বিজয় অজিকৃত দাণ্ডী !
সত্যে অটল, নির্ভয় ; মনে বিক্ষোভ নেই, শান্তি।
একলা চলার পথে কোনদিন আসেনা বিকার শ্রান্তি।
অফুরন্তের আনন্দে বলো, কি পেয়েছো, কি সে সত্য ?
এক জীবনের অবসানে একি জীবনের অমরত্ব ?
শুনেছি গান্ধী নাম………
তুষার মেরুতে পড়েছি তিমিরসূর্য্যের লেখা নাম।
মেরুঝঞ্ঝায় মুক্তবল্গা বাতাসের বুক চেরা
সূর্য্য সে উদ্দাম………
শত শতাব্দী পুণ্যে যে পাওয়া-মৃত্যু তাকে দিলাম।

যাত্রাগান

জয়দেব রায়

অভিনয় কলার ক্রমবিকাশে যাত্রার স্থান সুপ্রশস্ত। প্রাচীনকাল থেকে অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যাত্রাগানের রীতিমতো আদর ছিল। আধুনিক থিয়েটারের ধরণধারণ বিলিতি কায়দার হ'লেও এর আদি এদেশে যাত্রাভিনয় থেকেই হয়েছে। থিয়েটারের নাটকের সঙ্গে যাত্রার নাটকের পার্থক্য যথেষ্ট, তার আঙ্গিকের সঙ্গে যাত্রার পালার আঙ্গিকের তফাৎ প্রধানতঃ পরিবেষণ প্রণালীতে।

থিয়েটার অভিনয়ের আয়োজন অনেক, তার stage চাই, makeup চাই, scene scenery চাই, নানা বায়না! সেদিক থেকে যাত্রার সুবিধা অনেক। যে আসরে কীর্ত্তন গাওয়া হ'ত, পাঁচালী শোনানো হ'ত, কবির গান বস্‌তো, সেখানেই যাত্রাও অনায়াসে চল্‌বে। পাঁচালীর সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, যাত্রাভিনয়ের জন্যে একাধিক লোকের প্রয়োজন, যেখানে পাঁচালীতে একজনই নানারঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

প্রথম প্রথম পাঁচালীকাররাই যাত্রার আসর করতেন। বিখ্যাত যাত্রাধিকারী ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় প্রভৃতিরা সকলেই আগে পাঁচালী-গায়ক ছিলেন। পাঁচালীর আসর থেকেই উদ্ভব হয় যাত্রার পালার; আবার আধুনিক যুগের থিয়েটার সেই যাত্রার আসরের ওপরেই গড়ে উঠেছে।

আধুনিক রঙ্গ মঞ্চের অভিনীত নাটক আর আসরের যাত্রার পালার মধ্যে আর একটি স্তর আছে সেটা গীতাভিনয়ের। নাগরিক সুরুচিসম্পন্ন আসরে যাত্রার পুরাতন পালাগুলোকে একটু রঙচঙ্ করে অভিনয় হ'ত, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এগুলোকে তখন বলা হ'ত 'গীতাভিনয় বা গীতিনাট্য'। প্রথম যুগে ইংরেজি কায়দায় নাটক লেখার আগে বহু নাট্যকার এরকম গীতাভিনয়ের পালা লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় মনোমোহন বসু, হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতির।

ইংরেজি opera ঢঙে রচনা এগুলোর ঠিক নয়; সে ধরণের গীতিনাট্য পাওয়া যায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে। জ্যোতিরিন্দ্র

নাথ ঠাকুরের মানময়ী, রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ার খেলা খাঁটি বাংলা অপেরার নিদর্শন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কালমৃগয়া, বাল্মীকি প্রতিভাকে যাত্রার আদর্শেই গঠিত বল্‌লেও অন্যায় বলা হবে না।

সেকালে হরিমোহন রায় নামে একজন নাট্যকার অপেরা রচনা করেছিলেন বলে দাবী জানিয়ে গেছেন—"অপেরা অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহু দিবস হইল, আমি জানকী বিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত অপেরার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকী বিলাপ খানি কথঞ্চিৎ অপেরার আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। প্রায় দশ-বারো বৎসর অতীত হইল, উক্তরূপ গীতিকার অভিনয়ে আর কেহই যত্নবান হ'ন নাই। ১২৮১ সালের আশ্বিন মাসে প্রধান জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন নিয়োগী 'সতী কি কলঙ্কিনী' নামে একখানি গীতিকার অভিনয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানিও 'জানকী বিলাপে'র কথঞ্চিৎ আদর্শস্বরূপ।"

যাত্রার মূল উপজীব্য কিন্তু নাটক নয়, সঙ্গীতই! আগের দিনে বাংলা সাহিত্যের সমগ্র অংশই তো ছিল সুরে বদ্ধ। তার কারণ অবশ্য কেবল বাঙ্গালীর সুর-প্রবণতাই নয়; প্রচারের সুবিধার জন্যেই কবিদের রচনা গায়কদের কণ্ঠের ওপরই নির্ভর করত। লিখিতভাবে কোনো কিছুর প্রচার ছিল একান্ত গণ্ডীবদ্ধ; সুরই কাব্যকে স্থায়ী করত, বিবৃত করত। সুরের ভিতর দিয়েই তাই অন্য কলার রূপানুবর্ত্তন হ'ত। একটা পুঁথি হয় তো থাকত যাত্রার অধিকারীর কাছে, আর তার অধিকারের বলেই তিনি হতেন দলের অধিপতি। দূরদূরান্তের গ্রাম গ্রামান্তর থেকে খ্যাতিলিপ্স তরুণদল হাজির হ'ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্যে, গুণী বাদ্যকররা তাঁবেদারী করত তাঁর দয়ার আসরে ঠাঁই পাবার লোভে। পাঁচালী খেউর, কীর্ত্তন কোনো গানেই বেশি লোকের প্রয়োজন হ'ত না, কিন্তু এ যাত্রায় অভিনয়ের জন্যে চাই নানা শ্রেণীর অভিনেতাদের। কাজেই যাত্রার দলে ভীড় করত অনেকেই।

যাত্রার সুবিধা ছিল অনেক। সাজসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ কিছুই লাগত না যেমন, নতুন নূতন গল্পেরও তেমনি প্রয়োজন ছিল না। একই রামায়ণের কাহিনী হনুমানের প্রভুভক্তি, মহাভারতের যুদ্ধ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কিংবা রাধাকৃষ্ণের

লীলারঙ্গ নিয়েই রাশিরাশি পালা রচিত হয়েছিল। তার ওপর ছিল বিদ্যাসুন্দরের পালা; ঐ কেচ্ছাকাহিনী যে সে যুগের লোকে কি ভালোই না বাস্‌ত, তা বলে শেষ করা যায় না!

যাত্রাগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য মূলতঃ চারটি—প্রথমতঃ যাত্রা আগাগোড়া সুরে ভিত্তি করে রচিত। কেবল যাত্রাই নয়, আমাদের পাঁচালী, কবির গান, পালাগল্প, এমন কি চৈতন্য দর্শনের মতো গূঢ় শাস্ত্রও সবই তো ছিল এ রকম সুরের ওপরই স্থাপিত। যাত্রায় সবাই গান করে; রাজা বিচার করতে করতে গান গা'বে, সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে গাইবে; এমন কি দেবতারা মঙ্গল বর দিতে এসে গান কর্‌তেন, দানবরা অনিষ্ট চিন্তা করে গান ধর্‌ত। অধিকাংশ কাহিনীই প্রকাশ পেত গানেরই মাধ্যমে। এমন কি যখন রঙ্গমঞ্চের রীতিমতো উন্নতি হ'ল, তখনো যে যাত্রার অবসান হয় নি' তার কারণও যাত্রায় এই সুরের রাজত্ব। থিয়েটারের পরিপুরকরূপে যাত্রার চলন থেকে গেল। অনেক সময়ে থিয়েটারের নাটকের মধ্যে অনেকগুলো গানের সমাবেশ করে তাদেরকে যাত্রার পালায় পরিণত করা হ'ত। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী প্রভৃতি নাটক এভাবে যাত্রার আসরে অভিনয় হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রও তাঁর নট-জীবন এ রকম যাত্রার পালা রচনা করতে গিয়েই সুরু করেন।

যাত্রার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বড়ো বড়ো বক্তৃতা। যাত্রার আসরে সময় পেলেই অভিনেতারা দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এ সব বক্তৃতাতেই সুবিধা মতো নানা রকম তত্ত্বকথা, আলোচনা, ধর্মউপদেশ, এমন কি সাময়িক ইতিহাস ও সংবাদও তারা বলে নিতেন। প্রহ্লাদ কিংবা ধ্রুবের পালায় তাঁরা হয়তো এক চোট বিষ্ণু স্তোত্র আউড়িয়ে নিলেন, রাজার বক্তৃতায় রাজ কর্তব্য কিংবা শাসন নীতি বিষয়ে নানা অনুশাসনের উল্লেখ করা হ'ল—এ রকম।

প্রায় সমস্ত বক্তৃতাই আবার পদ্যে বলা হ'ত। গিরিশচন্দ্রের অনুস্যূত অমিত্রাক্ষর ছিল প্রায় সব পালারই বক্তৃতার standard বা প্রচলিত ভাষা। একবার আরম্ভ করলে অভিনেতারা নিজেদের বলার গতিতেই ছন্দ এনে ফেল্‌তেন। এভাবে যাত্রার একটি বিচিত্র কথা বলার ঢঙ্‌ই গড়ে উঠেছিল। থিয়েটারের যুগে নানা রকম ফীলিংস (feeling)-এর সাহায্যে এ রকম দীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োজনের অবসান করা হয়েছে।

যাত্রার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আর্ট এবং আঙ্গিকের অপেক্ষা লোকের দর্শনকালীন চাহিদারই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য তাতে কৃত্রিমতা অপেক্ষা স্বভাবিকতারই সঞ্চার হয়। যাত্রার টেকনিক (technique) নির্ভর করত স্থান-কাল-পাত্রের ওপর। দর্শকদের কাছে রসই ছিল আসল বস্তু, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাহ্য আড়ম্বরে না ভুলেও শুনেই তারা তন্ময় হয়ে যেত। অভিনেতারাও তাদের আর্ট-এর পারদর্শিতা দেখানোর চেয়ে বক্তৃতা শোনানই মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করত, চারপাশের সবাইকে তারা দর্শক বলে ধর্‌ত না, শ্রোতা বলেই মনে কর্‌ত।

চতুর্থতঃ যাত্রাগানের প্রধান রস ছিল ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মঙ্গলকাব্যে যেমন মানুষের চেয়ে দেবতার লীলার প্রাধান্য দিয়ে তাকেই শেষে জয়ী করা হ'ত, সে রকম যাত্রার পালায়ও সব সময়ে 'ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়' দেখাতে গিয়ে দেবমহিমার গুণগানেই ভরে উঠ্‌ত। যাত্রার অধিকাংশ পালাই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত; অবশ্য সে সময়ে দেশবাসীর কাছে এরকম কাহিনী ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগা সম্ভব ছিল না। পরবর্ত্তীকালে যদিও সামাজিক পালা নিয়ে যাত্রা রচিত হয়েছিল, তথাপি যাত্রা বল্‌তে আমরা পৌরাণিক গল্পই বুঝি। তার মধ্যে আবার জনপ্রিয় ছিল এরকম কয়েকটা গল্প যথা—সীতাহরণ, কংসবধ, সাবিত্রী-সত্যবান, রাম-রাবণের যুদ্ধ, লঙ্কাদাহন, নল-দময়ন্তী, অভিমন্যুবধ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, কমলেকামিনী প্রভৃতি। এ ছাড়া বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত কয়েকটি কাহিনী সমাদৃত হয়, যেমন নিমাই সন্ন্যাস, কৃষ্ণলীলা, জগাই মাধাই, নৌকাবিলাস প্রভৃতি।

ক্রমশঃ

ভুলবশতঃ এইরূপ ছাপা হইয়াছে—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়, যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ৯।২৩

(তুমিই যখন অন্য দেবতারূপে প্রকাশিত, তখন যে কোন ব্যক্তি যে দেবতারই উপাসনা করেন, সে তো তোমারই ভক্ত ; তবে কেন 'অন্য' ও 'অনন্যে'র মধ্যে এই পার্থক্য ? এই আশঙ্কার নিরাকরণ করিতেছেন) যে অপি [যে সব] অন্য দেবতাভক্তাঃ [অন্য সব দেবতার ভক্তগণ হইয়া] যজন্তে [পূজা করেন] শ্রদ্ধান্বিতাঃ [শ্রদ্ধাযুক্ত অর্থাৎ খণ্ড তাঁহাকেই 'একান্ত' সত্য বলিয়া ধারণা করিবার যোগ্যতাযুক্ত হইয়া] তে অপি [তাহারও] মাম্ এব [পরোক্ষভাবে আমারই] হে কৌন্তেয়, যজন্তি [পূজা করেন] (কিন্তু এই যজন সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ভজন নহে, কেন না) অবিধিপূর্ব্বকম্ [অবিধি হইয়াছে পূর্ব্বে যাহার ; 'অবিধি' অর্থ শরণাগতি রূপ, 'অনন্য'-হইয়া যাওয়া-রূপ পুরুষোত্তম বিধান বা বিধির আশ্রয় না লওয়া ; পুরুষোত্তম-'আমি'কে ভেদদৃষ্টি ও 'অহমকর্ত্তা'—এইরূপ অজ্ঞান পূর্ব্বে লইয়া পরে যজন করাই অবিধিপূর্ব্বক যজন]।

যাহারা অন্যদেবতা-ভক্ত, অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উপাসনা করে, তাহারাও অবিধি পূর্ব্বক আমারই উপাসনা করে। ৯।২৩

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নবমোঽধ্যায়ঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অহম্ হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ৯।২৪

(তাহাদের যজন অবিধিপূর্ব্বক কেন হইল, তাহাই বলিতেছেন)

অহম্ [প্রাণমূর্ত্তি আমিই] হি [যেহেতু] সর্ব্বযজ্ঞানাম্ [জীবনব্যাপী সর্ব্ব-কর্ম্মরূপ যজ্ঞ সকলের] ভোক্তা চ [সেই সেই দেবতা রূপে ভোক্তা] প্রভু: এব চ [এবং স্বামী ; "অধিযজ্ঞোঽহম্"] তু [আমি এই সর্ব্বময় প্রাণঘন হইলেও কিন্তু] মাম্ [আমাকে] ন অভিজানন্তি [অভিজ্ঞান লাভ করে না ; পূর্ব্বে আত্মভূত আমাকে পুনরায় প্রকৃতির পরিণামের ক্ষেত্রে জানে না] অতঃ [অতএব] তত্ত্বেন [তত্ত্বদৃষ্টিতে, যজ্ঞ সম্বন্ধে যথাবৎ তত্ত্ব হইতে] চ্যবন্তি [যজ্ঞ ও তাহার ফল হইতে চ্যুত হয় ; যজ্ঞেশ্বর 'আমি'কে অন্য বুদ্ধিতে দেখার ফলে যজ্ঞের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও সিদ্ধি সব তাহাদের জীবনে ব্যর্থ হয়]।

আমিই নিশ্চয় সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু কিন্তু তাহারা আমার অভি-জ্ঞান লাভ করে না, এই কারণেই তত্ত্ব দৃষ্টিতে তাহারা চ্যুত হয়। ৯।২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ৯।২৫

(যজ্ঞের সমগ্র নিগূঢ় প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলেও তাহাদের অল্প ফল প্রাপ্তিতে কোনও বাধা হয় না, ইহাই বলিতেছেন) যান্তি [প্রাপ্ত হয়] দেবব্রতাঃ [দেবতাগণের প্রীতির উদ্দেশ্যেই যাহাদের ব্রত অর্থাৎ নিয়ম ও ভক্তি, তাহারা দেবব্রত] দেবান্ [দেবসমূহকে] পিতৄন্ [পিতৃগণকে] যান্তি [প্রাপ্ত হন] পিতৃব্রতাঃ [শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপর পিতৃভক্ত] ভূতানি [বিনায়ক, মাতৃগণ ও চতুঃ-ষষ্টি যোগিনী প্রভৃতিকে] যান্তি ভূতেজ্যা [ভূত পূজকগণ] যান্তি [অনায়াসে প্রাপ্ত হয়] মদ্‌যাজিনঃ অপি [আমার যজনশীল পুরুষোত্তম ভক্ত] মাম্

[সমগ্র সাধনাসিদ্ধিঘন আমাকে] (ক্ষিপ্রসিদ্ধিকামী অন্য দেবভক্তের শ্রমও বেশী, লাভও হয় অল্প ; পক্ষান্তরে আমার ভজন "কর্ত্তুম্ সুসুখম্", অথচ লাভ হয় সমগ্র ফল রূপ 'আমি')।

দেবতাযাজিগণ দেবতা প্রাপ্ত হন, পিতৃযাজী পিতৃলোক প্রাপ্ত হন ; ভূত যজ্ঞকারীগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন ; আর মৎপরায়ণগণ আমাকে প্রাপ্ত হন।

৯।২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৯।২৬

(শাস্ত্র ব্যবস্থার ফলে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সমস্ত সুযোগে যাহারা বঞ্চিত, সর্ব্বক্ষেত্রের শক্তিমানদের শোষণে যাহারা সর্ব্বহারা পতিত, সেই পতিত সর্ব্বহারাদের জন্যও যে তাঁহার স্নেহঘন শাস্ত্র প্রসারিত রহিয়াছে, তাহারা সেখান হইতেই যে সর্ব্বোত্তম সর্ব্বগুহ্যতম সাধনা ও সিদ্ধি আস্বাদন করিতে পারেন, শক্তিক্ষেত্রে বঞ্চিত থাকিলেও যে তাহাদের পুরুষোত্তম দত্ত সহজ অধিকার কেহ কাড়িয়া লইতে পারে নাই, শত শোষণেও যে প্রাণের স্তর শুষ্ক হয় না, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং [অতি সহজে, সর্ব্বহারাদেরও ঘরের কোণায় লভ্য পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি ছোট ছোট উপকরণ সমূহ] যঃ [যে দীন হীন কাঙাল] মে [দীননাথ, কাঙালশরণ, পতিতপাবন আমাকে] ভক্ত্যা [ভক্তি দ্বারা ; ভক্তির মহিমা ইহাই যে, ভক্তিদেবী অতি 'ক্ষুদ্র'কে অনন্তে গড়িয়া তুলিতে পারেন। ভক্তিশাস্ত্রে অংশও পূর্ণ। ভক্তি শাস্ত্রই বলিতে পারেন—'সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি। ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।' অংশ-অংশীর ভেদ ভক্তিতে নাই, কেন না পরিণামভেদ যে রাগদ্বেষ স্তরের ধর্ম্ম, সে স্তরের উর্দ্ধে রহিয়াছে ভক্তিস্তর] প্রযচ্ছতি [সমর্পণ করেন] তৎ [সেই পত্র পুষ্পাদি] অহম্ [আমি] ভক্ত্যুপহৃতম্ [ভক্তিদ্বারা উপহৃত, প্রাপিত] অশ্নামি [সাক্ষাৎভাবে ভোজন করি ; কাহারও মুখের মারফতে পরোক্ষভাবে নয়] প্রযতাত্মনঃ [প্রাণ দ্বারা প্রযত প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাদ্বারা প্রযত প্রাণের সংযমনে পুরুষোত্তম মাত্রায় সংযত আত্মা অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি চিত্তাহঙ্কার যাহার]।

ভক্তিপূর্ব্বক যে কোনও ব্যক্তি আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল অর্পণ করেন, সেই প্রযতাত্মা ব্যক্তির ভক্তিদ্বারা উপহৃত সেই সকল দ্রব্য আমি ভোজন করিয়া থাকি।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭

(সকল কর্ম্মক্ষেত্রে অধিকারচ্যুত হওয়ার ফলে যাহার যে-কিছু সহজ কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহার উপর দাঁড়াইয়াই যে সেখান হইতে পুরুষোত্তম পথে যাত্রা করিতে হয়, এবং তাহাতেই যে মানুষের চরম সার্থকতা লাভ হয়, তাহাই পুরুষোত্তম বলিতেছেন) যৎ করোষি [যাহা কিছু স্বভাবের প্রেরণায় জীবনের অভিব্যক্তিরূপে কর, তাহা সাত্ত্বিকই হউক, রাজসই হউক বা তামসই হউক] যৎ অশ্নাসি [জীবন রক্ষার তাগিদে, অনায়াস-লব্ধ, তাহা সাত্ত্বিক রাজস বা তামস হউক, এমন যা-কিছু ভক্ষণ কর] যজ্জুহোষি [সাত্ত্বিকই হউক, রাজসই হউক, আর তামসই হউক, সমাজ রক্ষার অঙ্গ হিসাবে যা-কিছু হোম কর] দদাসি যৎ [যাহা কিছু দান কর] যৎ তপস্যসি [তপস্যারূপে যাহা কিছু তপশ্চরণ কর] তৎ কুরুষ্ব [তাহা কর] মদর্পণম্ [মদর্পণকে পূর্ব্বে কৌশলরূপে আশ্রয় করিয়া] (কর্ম্ম করা খাওয়া প্রভৃতির 'বাহিরে' ভজন বলিয়া পৃথক্ কোন ব্যাপার করিবার প্রয়োজন নাই, উহাদিগকেই ভজনের রূপ দান করিবার কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। 'ন তু পৃথগ্ ব্যাপার এব করণীয়ঃ'। দেশ কাল বস্তু দেহ প্রভৃতি যখন এমন শোচনীয় দুর্গতিতে পরিণত হয় যে, নিজ জীবন রক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহজ কর্ম্ম করিতেই দিনের অধিক সময় চলিয়া যায়, তখন কষ্টসাধ্য ভজন করিবার অবসর কোথায়? যোগ্যতাই বা কোথায়? উপাদান সংগ্রহের সম্ভাবনাই বা কোথায়? তখন পরম করুণাময় পুরুষোত্তম প্রতি সহজ কর্ম্মকেই ভজনের রূপে গড়িয়া তোলেন। একটী দৃষ্টান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিব। 'God' শব্দের উচ্চারণ 'গড্'; কিন্তু এই উচ্চারণটী অক্ষরগুলির পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণের যোগফল নয়। God শব্দের মধ্যে আছে G, O, D; ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ অক্ষরের উচ্চারণ যোগ করিলে তো 'জি ও ডি'ই হয়, গড্ হয় না। 'জি ও ডি' হইতে 'গড্' উচ্চারণ নিশ্চয়ই পৃথক্। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলির পৃথক্ পৃথক অক্ষরগুলির পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণের যোগফলই শব্দের উচ্চারণ। ধরুন পুরুষোত্তম শব্দ, 'পুরুষোত্তম' শব্দের মধ্যে রহিয়াছে প্+উ+র্+উ+ষ্+ও+ত্+ত্+অ+ম্+অ। এখানে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর গুলির উচ্চারণ সমষ্টিই শব্দের উচ্চারণ। ঠিক সেইরূপ সারা দিন কর্ম্ম করিব এক ঢং-এ, আর রাত্রি নয়টার সময় জপ তপ, সাধন ভজন আরম্ভ হইবে অন্য ঢং-এ—ইহা

পুরুষোত্তম ভজন নয় ; কেননা সারা দিনকার সহজ কর্ম্মের বাহিরে রহিতেছে ভজন। সারা দিনের সহজ কর্ম্মগুলিও এমন ঢং-এ, এমন কৌশলে করা যায়, যাহাতে কৌশল পূর্ব্বক কৃত ঐ কর্ম্মগুলির সমষ্টিই যোগরূপে, ভজন রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে। ৯।২৭

যাহা কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপশ্চরণ কর, হে কৌন্তেয়, সেই সব 'মদর্পণম্'-কৌশল পূর্ব্বক কর।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ৯।২৮

(এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে তোমার কি হইবে, তাহা শুন) শুভাশুভ ফলৈঃ [শুভ এবং অশুভ, ইষ্ট ও অনিষ্ট রূপ ফল হইতেছে কর্ম্মের অন্তর্নিহিত যে বন্ধনের, তাহাই শুভাশুভ ফল] কর্ম্ম বন্ধনৈঃ [কর্ম্মের অন্তর্নিহিত যে বন্ধন, সেই বন্ধন দ্বারা] এবং [এইরূপ মদর্পণ রূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া] মোক্ষ্যসে [মুক্ত হইতে পারিবে ; তখন সহজ কর্ম্ম গড়িয়া উঠিবে লীলায় ; ব্রজকৌশলে কৃত জীবনের সহজ কর্ম্মগুলিই লীলা ; তখন কর্ম্মের অন্তরের বন্ধন পরিণত হয় 'রসে'] (সেই এই) সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা [সন্ন্যাস যোগ দ্বারা যুক্ত হইয়াছে আত্মা যাহার ; যাহা সন্ন্যাস তাহাই যোগ ; কর্ম্মসমর্পণ হইতেছে সন্ন্যাস এবং এই সমর্পণই হইতেছে কর্ম্মের কৌশল বা যোগ] (সেই সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা হইয়া তুমি) বিমুক্তঃ [কর্ম্ম বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া] (এই দেহ থাকিতে থাকিতেই) মাম্ [আমাকে] উপৈষ্যসি [তত্ত্ব দৃষ্টিতে বুঝিয়া সমগ্র ভাবে আমাকে নূতন করিয়া প্রাপ্ত হইবে]।

শুভাশুভ ফলের হেতু কর্ম্ম বন্ধন হইতে এই প্রকারে তুমি মুক্ত হইবে। সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা তুমি বিমুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে। ৯।২৮

সমোঽহম্ সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ৯।২৯

(তবে তো তোমার রাগ দ্বেষ রহিয়াছে ; কেননা ভক্তগণের প্রতি তোমার অনুগ্রহ দেখিতেছি, যাহা অন্যের প্রতি নাই—এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপ বলিতেছেন) সমঃ অহম্ [আমি সম; সকলের সহিতই আমার সম (equal] সাক্ষাৎ (direct) সম্বন্ধ ; বিশেষ কোন লোক, বিশেষ কোন দেশ বা কাল, বিশেষ কোন অবস্থাই আমার 'বাছিয়া রাখা' (singled out) নাই ; আমি সকল স্তরের জন্যই সমান সুযোগ চালু করিয়া রাখিয়াছি, কোনও কৌলীন্যের

স্থান আমার দর্শনে নাই। যে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে, সেই তাহা পাইবে] সর্ব্বভূতেষু [সকল দেশের, সকল কালের, সকল স্তরের, সকল দর্শনের সকল ভূতেই] ন মে [আমার] দ্বেষ্যঃ [একান্ত (absolute) দ্বেষার্হ বলিয়া] ন অস্তি [কেহ নাই] ন প্রিয়ঃ [একান্ত প্রিয় কোলের বা পিঠের কেহ নাই ; সকলেই আমার বুকের ধন]। তু [কিন্তু] যে [যাহারা] ভজন্তি [ভজনা করেন] মাং [পুরুষোত্তম আমাকে] ভক্ত্যা [ভক্তিদ্বারা] ময়ি [ব্যাপক আধার আমাতে] তে [ব্যাপ্য তাহারা] তেষু চ অপি [ব্যাপ্য তাহাদিগকেই ব্যাপক করিয়া আধার তাহাদিগের মধ্যে] অহম্ [ব্যাপক রূপে আমি ; আমি ও তাহারা সম ব্যাপ্য ব্যাপক যোগে, সম ব্যাপ্তিযোগে উপাধি বিধুর সহজ সম্বন্ধে যুক্ত]।

আমি সর্ব্বভূতের কাছে সম ; আমার দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই ; কিন্তু যাহারা ভক্তি পুর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে, এবং আমি তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান থাকি। ৯।২৯

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৯।৩০

(আমার ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ কর) অপি চেৎ [যদিও] সুদুরাচার [সুষ্ঠু দুরাচার ; দুষ্ট আচার যাহার সে-ই দুরাচার ; কাল প্রভাবে যাহারা কোনও সম্প্রদায়ের বিধি ও আচরণ মানিয়া চলিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারাই দুরাচার ; তাহাদের এই নিজস্ব দুরাচারত্ব সম্বন্ধে যখন তাহারা বেহুঁস, তখনই তাহারা সু-দুরাচার। ভাগবত গ্রন্থে ধরণী বলিতেছেন— ‘আত্মানঞ্চানুশোচামি ভবন্তঃ চ অমরোত্তম। দেবানৃষীন্ পিতৄন্ সাধূন্ সর্ব্বান্ বর্ণাংস্তথাশ্রমান্ ॥’ ভাগবত ১।১৬।৩২

ধরণী বলিতেছেন ধর্ম্মকে—‘নিজের জন্য, ধর্ম্ম তোমার জন্য, দেবতাদের জন্য, ঋষিদের জন্য, পিতৃগণের জন্য, সাধুদের জন্য, সর্ব্ব বর্ণের জন্য, সর্ব্বাশ্রমের জন্য আমি অনুশোচনা করিতেছি। কেননা সবই আজ শ্রীনিবাসের স্পর্শ হারাইয়া কাঙ্গাল, নিঃস্ব, দুরাচার, সর্ব্ব আচারে অনধিকারী ; অথচ এমনই অনাথ যে ইহারা, বুঝিবার সে শক্তিও ইহারা হারাইয়াছে, তাই তাহারা সু-দুরাচার] (একমাত্র শ্রীমান্ ভগবান দ্বারা কথিত ভাগবত শাস্ত্রই দুরাচারদের—দুরাচার ধরণী ও ধর্ম্ম, দেব ঋষি পিতৃ সাধু বর্ণাশ্রম প্রভৃতির—দুরাচারত্ব ঘুচাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মাত্মকরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন। ‘কৃষ্ণে স্বধামোপগতে

ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥'—ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে পর এই ভাগবতরূপ পুরাণ সূর্য্য অধুনা উদিত হইয়াছে। সব সুদুরাচারদের সদাচারে গড়িয়া তুলিবার শাস্ত্রই ভাগবত শাস্ত্র)। ভজতে মাং [আমাকে ভজনা করেন] অনন্যভাক্ ['সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমারি দুয়ারে এসেছি'—এই অনন্যতা লইয়া আমিকেই একমাত্র নিজ মনে করিয়া যে ভজন করে, তিনিই অনন্যভাক্। সু-দুরাচারেরই বুঝি অনন্যভজন হয়, কেননা প্রাণই তাহার একমাত্র সম্বল। বাল্মীকিও দুরাচার ছিলেন, কিন্তু প্রাণ তাঁহার শুকায় নাই। ভাগবত যাহাদের জন্য ভাগবতী কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রাণসম্বল দুরাচার। শাপ-গ্রস্ত মুমূর্ষু অসহায় পরীক্ষিৎ ভাগবত শুনিলেন ; ভাগবত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন কত পুতনা, কত কুব্জা, কত অজামিল, কত প্রহ্লাদ, কত ঘর-ছাড়া ব্রজের মেয়ে, কত গজেন্দ্র, কত কালীয়, কত যমলার্জ্জুন।

'তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত মহত্তমাঃ
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥
কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥ ভাগবতঃ ১১।১২।৭-৮

সাধুঃ এব [সুদুরাচার হইলেও সাধুই] সঃ [তাহাকে] মন্তব্যঃ [মনে করিতে হইবে] (ইহার হেতু কি ?) হি [যেহেতু] সম্যক্ [ঠিক ঠিক] ব্যবসিতঃ [সাধুনিশ্চয় ; যাহাকে জানিলে সব জানা হয়, যাহাকে ধরিলে সবকে ধরা হয়, ঠিক সেই জায়গায়ই, আমার শ্রীচরণ তলেই সে তাহার 'স্থান' বাছিয়া লইবার মত ভাগ্য ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অধিকারী হইয়াছে]।

সুদুরাচারও যদি আমাকে অনন্যভাবে ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে। কেননা সে ব্যক্তি সম্যক্ ব্যবসিত হইয়া ঠিক স্থান বাছিয়া লইবার মত ভাগ্য ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করিয়াছে। ৯।৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৯।৩১

(তবে কি তোমার চরণতলে স্থান পাইয়াও তাহারা সুদুরাচারই থাকিয়া যায় ? এই সন্দেহের নিরসন করিতেছেন)। (সেই সুদুরাচার) ক্ষিপ্রং [অচিরকালে, সত্বই] ভবতি [হন] ধর্ম্মাত্মা [ধর্ম্মময় দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-চিত্ত যাহার] (যাহার ফলস্বরূপ) শশ্বৎ [নিত্য] শান্তিং [প্রাণ জুড়ানো অবস্থা]

নিগচ্ছতি [প্রাপ্ত হন] হে কৌন্তেয় (তুমি পরমার্থ সত্য শ্রবণ করিয়া) প্রতিজানীহি [প্রতিজ্ঞা করিয়া, জয় ডঙ্কা বাজাইয়া সর্ব্বহারা, কাঙ্গাল বিশ্বকে বল]।

ন মে [আমার] ভক্তঃ [সুদুরাচার ভক্ত] ন প্রণশ্যতি [ডুবিয়া যান না, মুছিয়া যান না, বরং পুরুষোত্তম-গৌরবেই প্রতিষ্ঠিত হন]।

শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়, সর্ব্বদা শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘোষণা কর যে, আমার সুদুরাচার ভক্ত ডুবিয়া যান না। ৯।৩১

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯।৩২

মাং [আত্মানাত্ম-সমন্বয় পুরুষোত্তম আমাকে] হি [যেহেতু] হে পার্থ, ব্যপাশ্রিত্য [আশ্রয়স্বরূপ আমাকে গ্রহণ করিয়া] যে অপি [যাহারাও] স্যুঃ [হয়] পাপযোনয়ঃ [পাপজন্মা] (এবং) স্ত্রিয়ঃ [তোমাদের বেদে অনধিকারী, সকল সুযোগ হইতে বঞ্চিত স্ত্রীগণ] বৈশ্যাঃ [কৃষি-আদি কর্ম্মে হিংসার সম্ভাবনা আছে বলিয়া যাহাদের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সেই সব বৈশ্যগণ] শূদ্রাঃ [বেদে অনধিকারী, সকল সুযোগে বঞ্চিত শূদ্রগণ] তে অপি [তাহারাও] যান্তিং [প্রাপ্ত হন] পরাং গতিং [পরম গতি আমাকে]।

হে পার্থ, যে সকল পাপযোনি, স্ত্রী, বৈশ্য, অথবা শূদ্রগণ আমায় আশ্রয় করে, তাহারাও পরাগতি লাভ করেন। ৯।৩২

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৯।৩৩

কিং পুনঃ [তাহাদের কথা আর কি বলিব ?] ব্রাহ্মণাঃ [শাস্ত্র-ব্যবস্থায় অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ] পুণ্যাঃ [পুণ্য জন্ম বলিয়া সমাজে স্বীকৃত] ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ [সুযোগ প্রাপ্ত রাজা ও ঋষি একাধারে] তথা [সেইরূপ সুযোগযুক্ত] অনিত্যং [ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধ] অসুখং [রাগদ্বেষ স্তরের সুখহীন] লোকম্ ইদম্ [এই মনুষ্য লোক] প্রাপ্য [প্রাপ্ত হইয়া] ভজস্ব [ভজনা কর] মাম্ [মানুষী তনু-আশ্রিত আমাকে]।

পুণ্যজন্মা, ভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ যদি আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? (অতএব) এই অনিত্য, সুখবর্জ্জিত মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া আমার ভজনা কর। ৯।৩৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯।৩৪
রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ নাম নবমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

(কি প্রকারে ভজনা করিব ?) মন্মনাঃ [পরিচ্ছিন্ন আমির আনুগত্য ছাড়িয়া পুরুষোত্তম আমিতেই মন যাহার, তেমন] ভব [হও] মদ্ ভক্তঃ [আমার ভক্ত হও] মদ্‌যাজী [আমার যজনশীল হও] মাং নমস্কুরু [জীবনের সব-কিছু আমার জীবনের কাছে নোয়াইয়া দাও, আমার শরণাগত হও] মাম্ এব [পুরুষোত্তম আমিকেই] এষ্যসি [পাইবে] যুক্ত্বা [পুরুষোত্তমে যুক্ত হইয়া] এবং [এই প্রকারে] আত্মানং [সর্ব্বাভূতান্তরাত্মা আমাকে ; এষ্যসি-র সহিত সম্বন্ধ] মৎপরায়ণঃ [আমিই পর অয়ন (গতি) যাহার]।

আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার প্রীতির জন্য জীবন যজ্ঞ কর, আমাকে নমস্কার কর—এইরূপে যুক্ত হইয়া, মৎপরায়ণ হইয়া আত্মভূত আমাকেই পাইবে। ৯।৩৪

নবমাধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্ম-শতবার্ষিকী

স্মৃতিপূজার প্রস্তুতি

১২

অন্তলীলা

সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল সর্ব্বধর্ম্মী, সর্ব্ব বর্ণী, সর্ব্ব সম্প্রদায়ী হইয়া এক অখণ্ড সামগ্রিকতার জীবনবাদ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, 'সর্ব্ব ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার ক্ষমতা নারায়ণ ভিন্ন অপর কাহারও নাই।' 'সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা করে যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাঁরই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী কোন ধর্ম্ম নষ্ট করেন না।' সর্ব্ব ধর্ম্ম বলিতে অদ্বৈতধর্ম্ম, দ্বৈতধর্ম্ম, শাক্ত ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, ইসলাম ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম; সর্ব্ব ধর্ম্ম বলিতে সত্ত্ব ধর্ম্ম, রজো ধর্ম্ম, তমো ধর্ম্ম; সর্ব্ব ধর্ম্ম বলিতে বাল্যের ধর্ম্ম, কৈশোরের ধর্ম্ম, যৌবনের ধর্ম্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রভৃতি মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে যত রকমের ধর্ম্ম রহিয়াছে, সেই সর্ব্ব ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে হইবে। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিতঃ পূর্ণ পরিপূর্ণ অবস্থা। কোন না কোন ধর্ম্মকে তথা সত্যকে নষ্ট করিয়া যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা পরিপূর্ণ নহে, প্রকৃত নহে। এত বিভিন্ন এবং বিপরীত দেহবৃত্তি চিত্তবৃত্তি বা মনোবৃত্তিকে রক্ষা করিয়া চলার ক্ষমতা কোন মানুষের থাকিতে পারে না। অথচ বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট এই জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য করিবার দিকে দৃষ্টি না থাকিলেও দ্বন্দ্বে সংঘর্ষে মানুষ পীড়িতই হয়। তাই পরস্পর-বিপরীতের সমন্বয়ের এই বার্ত্তা বিশেষ কোনো মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়, আমরা সেই বার্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া, সেই বিশেষ মানুষের জীবনকে অনুসরণ করিয়া সামঞ্জস্যের সাধনায় অগ্রসর হইয়া যাইব—ইহাই মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাস। এই সামঞ্জস্যের বার্ত্তা বর্ত্তমান মানুষের কাছে পৌছাইয়াছেন শ্রীনিত্যগোপাল। সামগ্রিকতাই ভগবান, এই সামগ্রিকতা জীবনে আনাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম; তাই বর্ত্তমানের মানুষ ভাগবতধর্ম্মী। অঙ্কশাস্ত্রে যাহা ল, সা, গু, জীবনশাস্ত্রে তাহাই সামগ্রিকতা। সেখানে ৩, ৫, ১ প্রত্যেকটীই আছে, নাই কেবল তাহাদের

কোন একটীর আতিশয্য বা অপর কোন একটীর অবলুপ্তি। এই ল, সা, গু-র জীবন ও দর্শন রাখিয়া নারায়ণ শ্রীনিত্যগোপাল আজিকার দিনের মানুষকে বাঁচিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীনিত্যগোপালের স্বল্পায়ু জীবনখানা ভরিয়া আছে এই তত্ত্বেরই ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত—কাহারও আতিশয্য নাই, কাহারও অবলুপ্তি নাই। মুহুর্মুহুঃ তিনি সমাধিস্থ হইতেছেন—নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া যাইতেছেন, দেহ অঙ্গার-স্পৃষ্ট করিলেও চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে না—অথচ তথাপি এ কথাও তিনিই লিখিতে পারেন, সকল ঘটনাই মায়িক, সমাধিও একটা ঘটনা, অতএব তাহাও মায়িক। সমাধিও একটা ঘটনা, অতএব উহা যেমন অসত্য নহে, তেমনই জাগ্রত বিশ্বের অপেক্ষায় ঐ সমাধিকেই পরম বা একমাত্র সত্য বলার অযৌক্তিকতাও তিনি রাখিয়া যান নাই। সমাধি অথবা নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন নাই বটে কিন্তু উহার অর্থ প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও আয়ত্ত করার পরম প্রয়োজন আছে। সমাধির নিগূঢ় অর্থই হইতেছে সব কিছুর অতীত থাকা। প্রতি বিশেষের অতীত থাকিতে পারার সাধনা জীবনের সামগ্রিকতার পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন। বিশেষকে অস্বীকার করিয়া অতীত থাকা নয়, বিশেষকে আস্বাদন করিয়া অতীত থাকা। নিত্যগোপাল অতীত থাকার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকার এই সংবাদ পৌঁছাইয়াছেন।

দেহে প্রকাশাবস্থার মাত্র ছাপান্নটী বৎসরের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন মিলাইয়া বেশী সময়ই যাঁহার কাটিয়াছে সমাধিস্থ অবস্থায়, সেই মানুষটীই বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় কেমন সুষ্ঠু ভাবে বিচরণ করিতে পারিতেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ এই বিচরণ করায় তাঁহার ব্রহ্মত্বে কোথাও কখনও আটকায় নাই। মানুষকে এমন মর্য্যাদা দান করিয়া তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, কথা বলিতেন যে, উহা একটা দেখিবার মত জিনিষ ছিল। তিনি অত্যন্তব্যবহার কুশল ছিলেন হুগলীতে থাকা কালীন কোন সময়ে সেখানকার ডি এস পি কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি সন্ন্যাস-কৌলীন্যের বশবর্ত্তী হইয়া নিজে চৌকীতে উপবিষ্ট থাকিলেও ডি এস পি মহাশয়ের জন্য একখানি চেয়ার আনিয়া দিয়া তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ভুল করেন নাই। অপরদের দূরের কথা, নিজ ভক্ত বা শিষ্যদের সহিত কথা বলিতে বা ব্যবহার করিতে তিনি

তাহাদের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, তাহাদের ব্যক্তিত্বকে অপমান করিয়া সারা জীবনে একটী কথাও বলেন নাই। ভক্তদের বা শিষ্যদের কাহাকেও তিনি নির্দ্দেশ দিয়া কোন কথা কোন দিন বলিতেন না, imperative mood তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই ভক্তরা চলিয়া যান, ইহা তাঁহার পক্ষে বেদনা-দায়ক হইত, তাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত থাকিলে তিনি বিশেষ সুখী হইতেন। কেহ দেখা করিতে আসিয়াছেন, দুইতিন দিন পরে আজ হয়ত যাইবেন, কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা তিনি আর একদিন থাকেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাকে তাঁহার ভাল লাগাকেও তিনি কখনও কাহারও উপর চাপাইতেন না, নির্দ্দেশ দিয়া কিছু বলিতেন না। 'আর একদিন থাকিলে বিশেষ আনন্দের কারণ হয়'—তাঁহার কথা বলার ইহাই ছিল ভাষা। 'সুবিধা হইলে এরূপ করা ভাল, বা ওরূপ না করাই ভাল'—এমন ভাষাতেই তিনি কথা বলিতেন। গুরু হইয়াও শিষ্যের পারা না পারার অবকাশ রাখিয়া, তাহার উপর কোন কর্ত্তৃত্বের ভার না চাপাইয়া এমন করিয়া এমন মিষ্টি ভাষায় কথা বলা এক অপূর্ব্ব বস্তু। শিষ্যদের তিনি কখনও কখনও নামের সহিত 'বাবু' যোগ করিয়া সম্বোধন করিতেন, কখনও বা আপনি বলিতেন। ইহাতে শিষ্যরা দুঃখ পাইলে বলিতেন তোমরা দুঃখ পাও কেন? বাবু অর্থ সুন্দর গন্ধ যাহার, তোমরা ভাল গন্ধযুক্ত, তাই তোমাদের বাবু বলি। আর আপনি বলি কেন? কেন নিজেকে মানুষ আপনি বলে না? আমি আপনি এ কাজ করতে পারি—এ কথা আমরা বলি না? আমি জানি তোমরা আমারই বিকাশ—এই কথা বলিতে বলিতে নিত্যগোপাল সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিতে এই জন্যই তিনি পারেন কেননা অংশের নিজের মধ্যে নিজের যে একটা পূর্ণতা আছে, সেটা তিনি গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এইজন্য তিনি লিখিতে পারেন, 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ; পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত, সচ্চিদানন্দও পূর্ণ।' অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করিতে যাইয়া সমগ্রের সঙ্গে, সমষ্টির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক বা স্থানকে তিনি ভুল করেন নাই—এইজন্য তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি অত্যাধুনিকতার উচ্ছৃঙ্খলতাকে জন্ম দিতে পারিবে না।

মানুষকে এতখানি স্বাতন্ত্র্য ও মর্য্যাদা দিতেন বলিয়াই কাহারও উপর বিধির কোন চাপ দিয়া কাহাকেও তিনি ভাল করিতে চাহেন নাই।

মানুষকে অনেকখানি ছাড়িয়া রাখিয়াই তিনি মানুষকে আগাইয়া যাইবার পথে ডাক দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রাণের স্পর্শ রাখিয়া বিপথগামী মানুষকে তিনি পথে আনিয়াছেন। পাপ অপেক্ষা মানুষকে যে তিনি বড় করিয়া দেখিতেন, ইহা পুর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। হুগলীতেও ঐ তত্ত্বকে উদ্ঘাটন করিয়াছিল আর একজন ভক্তের জীবনের ঘটনা। ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করার পরও তাঁহার কোনো শিষ্য পতিতালয়ে গমনের প্রবৃত্তি দূর করিতে পারেন নাই। একদিন পতিতালয় হইতে বাহির হওয়ার পর ঠাকুরের কাছে গিয়া পড়িবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ঐ বেশেই ঠাকুরের জন্য কিছু অমৃতী লইয়া সোজা হুগলী রওনা হইয়া চলিয়া আসিলেন। ঠাকুরের ঘর যখন খোলা হইল, ভক্তগণ একে একে প্রণাম করিতে লাগিলেন, কিন্তু উক্ত ভক্তটী দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে ভিতরে আসিতে আহ্বান করিলে তিনি বলিলেন, ঠাকুর, আমি পতিতালয় হইতে আসিতেছি। ঠাকুর তথাপি তাঁহাকে ভিতরে অহ্বান করিলেন। ভক্তটী ভিতরে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া জানাইলেন যে, তিনি খাবার আনিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার পরণে গত রাত্রির পতিতালয়ের বেশই রহিয়াছে। ঠাকুর মাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া ভক্তটীর হাত হইতে অমৃতীর ঠোঙ্গাটী লইতে বলিলেন। কিন্তু মাঠাকুরাণী এরূপ খাবার লইতে সভয়ে ইতস্তত: করিতে থাকিলে ঠাকুর ভক্তটীর হাতের ঠোঙ্গা হইতে অমৃতী লইয়া একটীর পর একটী অনেকগুলি খাইয়া ফেলিলেন; তারপর বলিলেন, নাও, এইবার নাও। ভক্তটী ঠাকুরের এইরূপ অপরিসীম করুণার স্পর্শ পাইয়া স্নেহে বিস্ময়ে আনন্দে পুলকে হতবাক হইয়া রহিলেন।

কার্য্যে চিন্তায় আচরণে গণতন্ত্রের মূর্ত্ত বিগ্রহ নিত্যগোপালের পক্ষেই পাপীর অন্ন খাওয়া সার্থক। তিনি যদি ঘৃণাভরে সেদিন ভক্তকে পরিত্যাগ করিতেন, তবে তাহাতে নীতি রক্ষা পাইত বটে, কিন্তু মানুষেরও যেমন অমর্যাদা হইত, পাপীরও তেমনি উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত হইত। এই যে তিনি ভক্তটীর আনীত অমৃতী খাইতে পারিলেন, ইহাতেই ভক্তটীর প্রাণের উপর গভীর রেখাপাত হইল। এমন করিয়া যিনি পাপীকে ভালবাসিতে পারিলেন, তাঁহার কাছে আদর পাইয়াই পাপ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার চিরদিনের মত চলিয়া গেল। নিত্যগোপালের সুপথে আনিবার রীতি এই রকমই ছিল। শাসনের দণ্ড তিনি ভুলিয়া ধরেন নাই, আধুনিক

কালের মনস্তত্ত্ব সম্মত পথেই তিনি চলিয়াছিলেন সেই ষাট বৎসর আগে, যখন এ পথের কোনো প্রসঙ্গই সমাজের কাছে ছিল না।

বর্ত্তমান যুগীয় জীবনবোধের একটী মূর্ত্ত বিগ্রহ নিত্যগোপাল। কোন বিশেষ মতবাদ বা দিককে ঐকান্তিক রূপ দেওয়াই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নয়—আজিকার দিনের কথা হইতেছে জীবনটা একটা অখণ্ড সত্তা, দেহে মনে কর্ম্মে আবেষ্টনে বিরুদ্ধ ও বিপরীতধর্ম্মী হইয়াও সব মিলাইয়া তাহার একটী অচ্ছেদ্য পূর্ণতা রহিয়াছে। ঐহিক ও পারত্রিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত, জড় ও অজড় সব মিলাইয়াই জীবনের পরিপূর্ণতা—ইহার কোনো একটীকে ঐকান্তিক করিয়া তোলা জীবনকে তাহার পূর্ণতা হইতে খণ্ডিত করাই। নিত্যগোপাল এই পরিপূর্ণতার দর্শন দিয়া একটী অহিংস বিপ্লবের বার্ত্তা রাখিয়া গিয়াছেন। সমাজের একটা সর্ব্বাঙ্গীণ পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে এই অহিংস দার্শনিক বিপ্লবকে সমাজের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

সমন্বয় মূর্ত্তি নিত্যগোপাল সন্ন্যাসী হইয়াও মাছ খাইতেন। তাঁহার এ কার্য্যের দার্শনিক অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তাহা বোঝা দরকার। আমিষ নিরামিষ, হিংসা অহিংসা প্রভৃতি কোন কিছুকেই তিনি ঐকান্তিক করিয়া তোলেন নাই। প্রয়োজন বোধে নিত্যগোপাল চিন্তায় ও আচরণে যে কোন কৃচ্ছ্রতা বা যে কোনো অবস্থাকে বরণ করিতে পারিতেন—তাই পরম শুচিসম্পন্ন হইয়াও কখনও তাঁহার শুচি-বোধ শুচিবাইতে পরিণত হয় নাই—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমিষ বা নিয়ামিষ তাঁহার লক্ষ্য নহে—তাঁহার লক্ষ্য জীবন—জীবন যদি আমিষে পরিপুষ্ট হয়, তবে আমিষ বলিয়াই আমিষকে নীচু বা হেয় বোধ বোধ করা তাঁহার ধর্ম্ম নয়। আবার নিরামিষের প্রয়োজনীয়তাও তিনি যথোপযুক্তভাবেই রক্ষা করিয়াছেন। নিজে তিনি নিরামিষ ভালও বাসিতেন। প্রাচীনকাল হইতে শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা উল্টাইলেই দেখা যাইবে আমীষ খাইয়াও প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিদের মুনিঋষি হওয়াতে আটকায় নাই, আবার নিরামিষ খাইয়াও চোরডাকাতবদমাইস হওয়াতে আটকায় নাই। তথাপি দার্শনিক যুগ হইতে হিন্দুর প্রচলিত শাস্ত্র ব্যবস্থায় আমিষ নিরামিষের যে মান প্রত্যেকের জন্য বিহিত হইয়া আছে, তাহার পেছনেও একটী দার্শনিক তত্ত্ব রহিয়াছে। সেই মতে সত্ত্বগুণের সঙ্গে নিরামিষের গুণগত সাধর্ম্ম রহিয়াছে, আর রজোগুণকে পুষ্ট করে আমিষ। প্রচলিত শাস্ত্র ব্যাখ্যায় তিনগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্ম বস্তু লাভের জন্য সাত্ত্বিকতাই

বিশেষভাবে কাম্য। সত্ত্বগুণের এই শ্রেষ্ঠতার জন্যেই নিরামিষেরও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়া আছে। কিন্তু নিত্যগোপাল গোড়ার এই চিন্তাধারাতেই আঘাত হানিয়াছেন—তিনি গুণসমূহের মধ্যে সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন না। নিত্যগোপাল প্রত্যেক গুণকে তাহাদের প্রত্যেকের স্থানে সমান মূল্যে স্থাপন করিয়াছেন—কাহারই শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতা স্বীকার করেন নাই—তাঁহার মতে ব্রহ্মবস্তুর সঙ্গে প্রত্যেকের সম্বন্ধ সম ও সাক্ষাৎ। যে কোন গুণই সমর্পিত বুদ্ধি দ্বারা কৃত হইলে তাহাদ্বারা ব্রহ্মবস্তু লাভ হয়। তাই

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্ ॥

গুণসমূহের মধ্যের উচ্চ নীচ ভেদবাদের এই hierarchy-কে গোড়ায় মানেন নাই বলিয়াই আমিষ খাওয়ায় তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান নষ্ট হয় না, নিরামিষ খাইলেও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বাড়ে না। এই কারণেই মায়ের কাছে নিবেদিত মহাপ্রসাদও তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন, আবার অহিংসার মূর্ত্ত বিগ্রহ এই নিত্যগোপালেরই উৎসর্গকৃত ছাগ শিশুকে দুয়ার গোড়ায় দেখিয়া চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িয়াছে ; বিছানার ছারপোকা এই নিত্যগোপালই কখনও মারিতে দেন নাই, গায়ে বসিয়া মশা কামড়াইতে থাকিলে তাহাকে কখনও মারিয়া ফেলেন নাই, আস্তে আস্তে অঙ্গুলী নাড়িয়া কখনও তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কখনও বা মশাকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ত খাইতে দিয়াছেন। এইভাবে বিপরীত চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধ ধর্ম্ম তাঁহার জীবনে পাশাপাশি রহিয়াছে।

গুণ ও বর্ণের তথা কর্ম্মের প্রচলিত কৌলীন্যকে যুক্তি ও তত্ত্ব সহায়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রচলিত অনেক শাস্ত্র ব্যাখ্যাই মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নবদ্বীপে একদিন সূর্য্যগ্রহণ লাগবার আগেই ঠাকুরকে আহার্য্য গ্রহণ করিতে নিবেদন করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 'জন্মাবধি গ্রহণের আগে খেয়ে এলো সবাই, কই মুক্তি তো হয় নি।' গ্রহণের সময় খাইলে চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়—এ কথা শুনিয়া ঠাকুর যাহা কহিয়াছিলেন, ভক্তবর ধর্ম্মদাসের ভাষায় তাহা এইরূপ—

(তখন) ঢলিয়া ঢলিয়া ঠাকুর কন হাসি হাসি।
চণ্ডাল-উচ্ছিষ্ট আমি বড় ভালবাসি ॥
যে চণ্ডাল উদয়েতে হরি নাম হয়।
সেই পায় সেই উচ্ছিষ্ট যার ভাগ্যে রয় ॥

চণ্ডাল হয় রে যদি হরিপরায়ণ।
সর্ব্বদা তাহার প্রসাদ করি যে ভক্ষণ॥
হেনকালে সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইল।
সকলেই বলে ভাই 'হার, হরি' বল॥
ঠাকুর বলেন, হোল উত্তম সময়।
আন আন অন্ন পাত্র ক্ষুধা নাহি সয়॥
বড়পিসী হস্তে করি সেই অন্ন থাল
দিলেন ঠাকুরে বলি 'খাওরে গোপাল'।
ঠাকুর বলেন ভাবে 'আয়রে চণ্ডাল।
যে খাবি আমার সাথে গ্রহণের কাল॥
চণ্ড আমার পিতা, চণ্ডী যে জননী।
চণ্ড চণ্ডীর পুত্র যে চণ্ডাল আপনি॥
আমি সে চণ্ডাল মোর নাহি জাতি ভয়।
গুহক চণ্ডাল মিত্র আমার যে হয়॥
শবরী চণ্ডালী দিল উচ্ছিষ্ট যে ফল।
রামরূপে খাইলাম বিদিত সকল॥'
বলিতে বলিতে প্রভু অন্ন আহারিয়া।
ভক্তরে দিলেন প্রসাদ বাঁটিয়া বাঁটিয়া॥

এইভাবে অর্থকে বাদ দিয়া, তাহার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাকে বিস্মৃত হইয়া, প্রাণকে পদদলিত করিয়া নিত্যগোপাল কখনও আচরণকে বড় করিয়া তুলেন নাই—সেইজন্যই জারজকে স্থান দেওয়াতে কিংবা যে কোন অবস্থাকে জীবনে বরণ করিয়া লইতে যেমন তাঁহার কোনো অসুবিধা হয় না, তেমনি নিরামিষ ভালবাসিলেও আমিষে তাঁহার জাত বা ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। তাঁহার এত বড় বিপ্লব পরম অর্থের সঙ্গে সমন্বিত হইয়া সামগ্রিক জীবনবাদকেই উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছে।

ঠাকুরের কাছে ভক্তগণ সমবেত হইলে হয় সঙ্গীত নয় বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইত। একদিন গীতাপাঠ কালে সাত্ত্বিক আহারের প্রচলিত ব্যাখ্যা শুষ্ক ও পর্য্যুষিত অন্ন সাত্ত্বিক আহার নয়—এইরূপ পাঠ শুনিয়া সেখানে উপবিষ্ট ঠাকুরের এক জেলে ভক্ত মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, তাহা হইলে তো কোনদিনই সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করার তাঁহার কোনো সম্ভাবনা নাই। প্রতিদিন সকালে

পান্তাভাত খাওয়া ছাড়া তাঁহার তো কোন উপায় নাই। এমন সময় ভাবমগ্ন ঠাকুর উক্ত ভক্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি পান্তোভাত খেয়ো। সাত্ত্বিকতার কোন্ স্তরে ঠাকুর পান্তাভাত খাইতে বলিতে পারেন, তাহা পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। যাহা কিছু অনায়াসলব্ধ, মানুষের পক্ষে তাহাই সাত্ত্বিক। একজন জেলের পক্ষে পান্তাভাত না খাওয়া যে অসম্ভব, বাস্তব দৃষ্টি যাহার আছে, তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ভক্ত হইলে যদি কাহাকেও জোর করিয়াই সাত্ত্বিক আহার খাইতে হয়, তবে তাহা জীবন্ত ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া আত্মহত্যারই ব্যবস্থা মাত্র। এমন সাত্ত্বিকতা নিত্যগোপালের বক্তব্য নয়।

দার্শনিক জগতে নিত্যগোপাল প্রকৃতিকে, শক্তিকে, মায়াকে ব্রহ্মেরই মত, শক্তিমানেরই মত সমান মূল্যে স্বীকৃতি দিয়াছেন, ব্রহ্মের মত প্রকৃতিও যে অনাদি অনন্ত, তাহা প্রস্থাপন করিয়াছেন—এ কথা বহুবারই বলা হইয়াছে। এই তত্ত্বকে অনুসরণ করিয়া তিনি সমাজের ক্ষেত্রে নারীর স্বাতন্ত্র্যকেও পূর্ণ মর্য্যাদায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাই নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন, নারী যে কোন দেশ কাল পাত্রে পরের অপেক্ষাধীন, তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই—মনুর এ ব্যবস্থাকেও তিনি ষোল আনা মানিয়া চলেন নাই। স্ত্রীশূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নাই—ইহাও নিত্যগোপাল রক্ষা করেন নাই। তিনি মেয়েদের কেবল স্বাতন্ত্র্য দেন নাই কিংবা বেদপাঠে অধিকারই দেন নাই, তিনি মেয়েদের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারও দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার মঠে মেয়েদেরও স্থান দিয়াছেন, যাহা ভারতবর্ষের কোন সন্ন্যাসীর মঠে একরূপ অভূতপূর্ব্ব কল্পনা মাত্র। এতবড় বিপ্লবের গুরুত্ব আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত এই বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল সমাজ না বুঝিতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রমী ভারতবর্ষের বুকে এ যে কত বড় মারাত্মক কথা, সে কথা যে-কোন বর্ণাশ্রমী হিন্দু জানেন। উচ্ছৃঙ্খলতাকে জন্ম না দিয়া মেয়েরা কি করিয়া ব্যক্তি পরিবার ও সমাজকে মিলাইয়া একটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ও গৌরবজনক জীবন যাপন করিতে পারে, নিত্যগোপাল তাঁহারই খোঁজ রাখিয়া গিয়াছেন। কেবল ঘরের মেয়েদেরকেই তিনি স্থান দেন নাই, যাহারা ঘরের নয়, সমাজের কাছে যাহাদের স্থান নাই, সেই সকল মেয়েরাও—জারজ বা পতিতালয়াগত পুরুষ ভক্তের মতই—তাঁহার পতিতপাবন চরণতলে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। হুগলীতে গোলাপ বলিয়া এক গয়লানী

ছিল, ঠাকুর তাহার দুধ খাইতেন। তাহার স্বভাব ভাল ছিল না। মদ খাইয়া অচেতন হইয়া কোন কোন দিন দুধ আনাই তাহার হইত না। একদিন এইরূপ দুধ না আনায় ঠাকুর তাঁহার ভক্ত হরিবাবুকে কহিলেন, 'দেখ তো গোলাপ বুঝি আজ আর উঠিতে পারে নাই, তাহার গরুগুলি বুঝি খাবার পাইল না। যাও দেখি তাহাদের একটা ব্যবস্থা কর।' আমরা ভাবিয়া পাই না, চরিত্রহীন গোয়ালনীর প্রতিও এত স্নেহের দৃষ্টি তাঁহার কেন? এ কথা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই—আমরা ভাল মানুষকে ভালবাসিতে পারি, পাপীকে কি ভালবাসিতে পারি? খুব বেশী হইলে না হয় তাহাদিগকে কৃপা করিতে পারি। কিন্তু অভক্তকে ভালবাসিতে, পাপীর প্রতিও স্নেহের দৃষ্টি রক্ষা করিতে তিনিই পারেন যিনি অতি বড়, অতি মহৎ, যিনি নারায়ণ—ভালমন্দ দুই-ই যাঁহার মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। ইহাই ভাগবতী দৃষ্টি, ইহাই ভগবৎ প্রেম। করুণা ত্রিগুণাতীত, তাহা সত্ত্ব-রজো-তমোগুণ-নিরপেক্ষ হইয়া আপনার স্বভাবেই আপনি ঝরিয়া পড়ে। আমার গুণের অপেক্ষাতেই যদি তাঁহার করুণা ঝরিত, তবে তিনি তো একান্তভাবে আমার অপেক্ষাধীন হইয়া পড়িতেন। কিন্তু করুণা ভক্ত অভক্ত বাছে না, সত্ত্বগুণী তমোগুণীর অপেক্ষা রাখে না। সূর্য্যের আলো কি পাপীর নিকট হইতে নিজেকে সংবরণ করে? বাতাস কি দুর্জ্জনের নাকে প্রবেশ করা হইতে বিরত থাকে? আজিকার বিজ্ঞান বলিতেছে 'Now the discovery of the photo-electric effect has indubitably shown that every type of radiation produces considerable effects on Matter, and that these effects *donot diminish as the distance from the source increases.*'—Louis De Broglie. আলোর বিকিরণের মতই ভগবৎ করুণাও তাহার উৎপত্তিস্থল হইতে যত দূরেই যাক, তাহার শক্তি তাহাতে হ্রাস হয় না—দেশগত ব্যবধান সত্ত্বেও তাহার অখণ্ডত্ব সে রক্ষা করিয়া চলে। কিংবা ভগবৎ করুণা হইতে দূরে যাইবারই প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না—সে করুণা সর্ব্বত্র সমানভাবে বর্ষিত হইতেছে। তুমি যাইবে কোথায়? তাঁহার বিশ্ব ছাড়িয়া তো যাইতে পারিবে না? যাহা আপনি বর্ষিত হইতেছে, তাহাকে ধারণ করিবার জন্য আমার সত্তাকে আমি উন্মুখ করিয়া তুলি—ইহাই আমার সাধনা।

হুগলী মঠে একদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইতেছে। সর্ব্বসাধ্যসার সম্বন্ধে নিগূঢ় আলোচনায় রায় রামানন্দের সঙ্গে যেখানে মহাপ্রভু এহ বাহ্য

আগে কহ আর বলিয়া বলিয়া ক্রমেই আগাইয়া যাইতে যাইতে কান্তাপ্রেম বা বা মধুর রসকেই সর্ব্বসাধ্যসার বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন, সেই স্থান পঠিত হইলে নিত্যগোপাল কহিলেন, 'এইখানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের সহিত আমি একমত নহি ; তথাপি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে আমি বার বার নমস্কার করিতেছি।' এই বলিয়া দুই হাত জুড়িয়া মাথায় ঠেকাইতে ঠেকাইতে তিনি সমাধিস্থ হইলেন। উত্তমাধমের ভেদবাদ নিত্যগোপাল ত্রিগুণের, কর্ম্মের বা বর্ণের ক্ষেত্রে যেমন স্বীকার করেন নাই, তেমনই রসের ক্ষেত্রেও স্বীকার করেন নাই। তাঁহার ভক্তিযোগদর্শন নামক পুস্তকে তিনি লিখিতেছেন, 'পরম প্রেমযোগে যে সকল দিব্যভাব হইয়া থাকে, সেই সকল দিব্যভাবের মধ্যে দিব্যমধুর ভাবকেই মধুর প্রেমাচার্য্যগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাকেন। মহাত্মা শান্তদেবের বিবেচনায় পরমেশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভাবই উৎকৃষ্ট, মহাত্মা শান্তদেবের বিবেচনায় পরমেশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভাবই শ্রেষ্ঠ। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক শান্তভাবেরও উৎকৃষ্টতা এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক দাস্যভাবেরও উৎকৃষ্টতা এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক সখ্যভাবেরও উৎকৃষ্টতা এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক বাৎসল্যভাবেরও উৎকৃষ্টতা এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক মধুর ভাবেরও উৎকৃষ্টতা এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন।' এই ভাবে নিত্যগোপাল গুণ বা রস বা যে কোন ক্ষেত্রে একের দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ কৌলীন্য ও অপরের হেয়ত্ব মূলক ভেদবাদকে সমূলে উৎখাত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই জন্যই জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণকে তিনি সহজেই আনিয়া ছিলেন। গুরু হইয়াও তিনি গুরুগিরি করেন নাই—ছিলেন সকলের Divine Companion। তাঁহার মধুর মিষ্টি ব্যবহার, শিষ্যদের সুখদুঃখকে তাহাদের প্রাণ লইয়া উপলব্ধি, তাহাদের ভালমন্দের সংবাদ লওয়া—এই সমস্তই তাঁহাকে প্রিয় সখা করিয়াছিল—গুরুত্বের চাপ তিনি কাহারও উপর রাখেন নাই। মনীন্দ্র বলিয়া এক শিষ্যের কলেরা হইয়াছে—সব চিকিৎসা, সব শুশ্রূষা ব্যর্থ হইয়াছে, মনীন্দ্রের জীবনের আর কোন আশা নাই। সকল শুনিয়া ঠাকুর আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন. চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'মা, মনীন্দ্রকে ভাল করিয়া দাও, বৃদ্ধের একমাত্র পুত্রকে সুস্থ করিয়া দাও।' বরোদাবাবু বলিয়া এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন,

'বরোদাবাবু, একটু ওষুধ দিন।' বরোদাবাবু বলেন, ওষুধ দিবার আর তো কিছু নাই ঠাকুর। 'তবু দিন'। বরোদাবাবু ওষুধ দিলেন, মৃত্যুর দুয়ার হইতে মনীন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুরের ঐশ্বর্য্য বিভূতির অন্ত ছিল না, অনায়াসেই মনীন্দ্রকে তিনি সুস্থ করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু আমার দুঃখে তিনি কাঁদেন, ইহাই আমার গৌরব, ইহাই আমার সার্থকতা, আর এইখানেই তাঁহার ব্রহ্মত্ব অটুট, আমার ছোট হওয়ার দীনতা বিদূরিত। গুরু হইয়াও এই ভাবেই তিনি Divine companion। তখন নিত্যগোপাল গুরুতর অসুস্থ—মৃত্যুর দিন কয় আগে সতীশ চক্রবর্ত্তী বলিয়া এক ভক্ত দেখিতে আসিয়াছেন। সেই সময়ও ভক্তদের সুখ দুঃখের সংবাদ লইতে তাঁহার ভুল হয় নাই। তিনি যে ভালবাসেন, তাই নিজের দেহযন্ত্রণা তাঁহার স্নেহাস্পদদের ভালমন্দ সম্বন্ধে বিস্মৃতি ঘটাইতে পারে নাই। তাঁহার এই ভালবাসার কথা, এই আদর যত্নের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না—অথচ তিনি বড়, তিনি ব্রহ্ম। সতীশ চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার খাওয়া হইয়াছে কি না। এইরূপ সময়েই পুর্ণবাবু বলিয়া এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'আপনারা আমাকে কত ভালবাসেন, আমি তো কিছুই ভালবাসিতে পারিলাম না।' রাখালদাস পাল বলিয়া এক ভক্তের স্ত্রীর অসুখ শুনিয়া রাখালদাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখেও জল পড়ে—তবু তিনি ভালবাসিতে পারিলেন না? ভক্তদের বাড়ীর কুকুর বিড়ালের সংবাদ পর্য্যন্ত লইতে তাঁহার ভুল হইত না।—এমন মায়ের প্রাণ যাঁহার সদা জাগ্রত, তবু তিনি ভালবাসিতে পারিলেন না? হায়, তাঁহার ভালবাসার পরিমাপ করিবে এমন মানদণ্ড কোথায় পাওয়া যাইবে?

ভগবানের এক বিশেষণ তিনি নিজ জীবন দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে ভগবান অভক্তবৎসল। ভক্তবৎসল ভগবান—ইহাতে তাঁহার খুব গৌরব নাই—কিন্তু যে তাঁহাকে ভালবাসিল না, যে তাঁহার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিল, যে তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাঁহাকে অপমান করিবার প্রয়াস পাইল, তাহাকেও ভালবাসিয়া, তাহাকেও সস্নেহে ক্ষমা করিয়া লইয়া, তাহারও সম্বন্ধে তাহার ভবিষ্যতের পথ খুলিয়া রাখিয়া তিনি তাঁহার অভক্তবৎসল নাম প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। চিন্তায় ভাবনায় আচরণে এই অহিংস চিত্তবৃত্তি কত বড় প্রাণ থাকিলে সম্ভব, আমাদের ছোট দৃষ্টিদ্বারা তাহা ধারণা করিতে পারা সম্ভব নয়। কোনো ভিন্ন সম্প্রদায়ের একজন মহিলা হুগলী মঠে থাকিতেন। তিনি নিজে রান্না করিয়া খাইতেন। মাঝে

মাঝে ঠাকুরকে এটা ওটা রান্না করিয়া খাওয়াইতেন। একদিন তিনি রুটির সঙ্গে কাঠবিষ মিশাইয়া ঠাকুরকে খাওয়াইলেন। ঠাকুরের দেহে খুব যন্ত্রণা হইল। ভক্তেরা আকুল হইয়া পড়িলেন, ঠাকুরকে সকলের দেওয়া আহার্য্য গ্রহণ না করিতে অনুরোধ করিলেন। একদিন উহাদের অনুরোধে আমিও ঠাকুরকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি যেন যার তার দেওয়া খাবার না খান। ঠাকুর উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ, সেদিন খুব যন্ত্রণা হয়েছিল। ভুলিকে বললাম দরজাজানালাগুলি খুলে দিতে—কিন্তু তাতে শরীরের তাপ গেল না। দেহের জন্য কোনদিন তো কিছু করি নি, সেদিন প্রাণায়াম করলাম—পায়খানা হয়ে গেল। কিছুটা আরাম হল—কিন্তু তবু জ্বালা রইল। কিন্তু শরৎ, আমাকে কেউ কিছু দিলে আমি তো তা না খেয়ে পারব না।' ঐ ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঠাকুর সকলকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, সেই মহিলাকে যেন কিছু বলা না হয়। ভক্তেরা উৎকণ্ঠিত হইয়া ছিলেন। কিন্তু নীলকণ্ঠ ঠাকুর স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন, 'তাকে যেন কিছু বলা না হয়।' এমন করিয়া বিষদাতাকে যিনি ক্ষমা করিতে পারেন কোন বিদ্বেষ বা বিরক্তি না রাখিয়া, সাধারণ মানুষের চিত্তবৃত্তি তাঁহার নয়, তাঁহার প্রাণ বিশ্বপ্রাণ।

ঠাকুরের অপরিসীম স্নেহের সুযোগ লইবার মত মূর্খতাও ভক্তদের হইয়াছিল। একদিন কুমারেশ বলিয়া এক ভক্ত ঠাকুরের জন্য কিছু খাবার লইয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিলেন, এখন তুলিয়া রাখ—পরে খাইব। ইহাতে কুমারেশের খুব অভিমান হইল। তাঁহার প্রাণের সাধ ঠাকুর তখনই ঐ খাবার গ্রহণ করিবেন। প্রবল অভিমানে তিনি খাবারের ঠোঙ্গা নিত্যকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার এতই অভিমান হইয়াছিল যে, দিন কয় তিনি আর ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হন না। একদিন কোনো উপলক্ষে ঠাকুরকে একটু বিশেষ ভাবে ভোগ দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তদের প্রসাদ দিতেছেন। কুমারেশ অপরের হাত হইতে প্রসাদ তুলিয়া লইয়া খাইলে অপর ভক্তটী ঠাকুরকে বলিয়া দিলেন, ঠাকুর, 'কুমারেশ আমার প্রসাদ লইয়া গেল।' তখন ঠাকুর সেই ভক্তের হাতে এক ভাগ তাহার নিজ নামে আর এক ভাগ কুমারেশের নামে এই দুই ভাগ প্রসাদ দিয়া তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়াই দুই ভাগ খাইতে বলিলেন। সেই ভক্তটী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুর, কুমারেশকে প্রসাদ দিবেন না?' ঠাকুর বলিলেন, 'আমার ভাগ সে জলে দিতে পারিল, তার ভাগ আমি তোমায় দিতে পারি না? তা আমি খুব পারি।' শাস্তি তিনি দিয়াছেন—কিন্তু সে শাস্তি বড় মধুর ছিল।

বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যের ঠাকুরের অন্ত ছিল না। কত ঘটনাই যে ছিল যাহা তাঁহার অভূতপুর্ব্ব ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করিতেছে, তাহা লিখিতে আরম্ভ করিলে বড় বড় বই হইবে। কিন্তু এই বিভূতিকে তিনি কখনও নিজের স্বার্থে প্রয়োগ করেন নাই। অনেক প্রকারে অনেক ভোগই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সাধনার পথে যোগীর কাছে ঐশ্বর্য্য স্বভাবতঃই আসিয়া পড়িলে তাহা লইয়া কেমন ব্যবহার চালাইতে হয়, কেমন করিয়া বিশ্বসেবার ক্ষেত্রে তাহা ছড়াইয়া দিয়া তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, সেই ব্যবহার তিনি নিজ জীবন দিয়া করিয়া সে পথের খবর রাখিয়া গিয়াছেন। বিকেন্দ্রীকরণের বার্ত্তাকে তিনি সর্ব্বত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। সন্ন্যাসী লোকশিক্ষক, ভোগে তাঁহার অধিকার নাই। সারাজীবন নিত্যগোপাল কী অসাধারণ কৃচ্ছ্রতা করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সে ইতিহাস অনুধাবন করিলে স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়। সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত কৃচ্ছ্রতা তিনি কৃচ্ছ্রতারই উদ্দেশ্যে করেন নাই, উহা তাঁহার বিলাস হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, উহা তাঁহার সহজ জীবনকে নষ্ট করিতে পারে নাই, বরং তিনি যে বিকেন্দ্রীকরণের বার্ত্তাকে অধ্যাত্ম ও ব্যবহারিক জীবনে প্রস্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহজ জীবনকেই রূপ দিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কোন দিন ভাল খান নাই, ভাল পরেন নাই। প্রথম জীবনে পিতার সম্পত্তি ছিল—তাহা তিনি কোন দিন নিজের ভোগে লাগান নাই। দান বিতরণে যখন তাহা নিঃশেষ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মেশোমহাশয় সেগুলিকে কোম্পানীর কাগজে রূপান্তরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সময়ে কাঁকুরগাছী যোগোদ্যানও—যেখানে এখন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাস্থি রহিয়াছে—তিনি নিজ অর্থে কিনিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনেও নিত্যগোপাল সামর্থ্য থাকিলেও ভাল খান নাই, পরেন নাই। কেহ তাঁহারই জন্য ভাল জিনিষ দিয়া গেলেও সকলকে না দিয়া তাহা শুধু নিজে গ্রহণ করেন নাই—বলিতেন 'একেলা খাইব, সুখ না পাইব।' হুগলী মঠে যখন অনেক ভক্ত তাঁহার ওখানে সমবেত হইয়াছেন, তখন শুধু মসল্লার ঝোল তিনি সকল ভক্তের সঙ্গে সমানভাবে খাইয়াছেন। সকলের জন্য ইহার বেশী সংস্থান করা তখন সম্ভব ছিল না। কেহ কেহ বলেন, ভোগ যখন আমার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন বিধাতা উহা আমার

ভোগের জন্যই পাঠাইয়াছেন। অতএব কেন না ভোগ করিব? এইজন্যই এক এক মোহান্ত কোটী কোটী টাকার মালিক হইয়া বসিয়া আছেন, এইজন্যই ত্যাগের বেশ পরিয়াও কত কত সন্ন্যাসী চরম ভোগের দ্বারা সমাজ জীবনকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছেন। বর্ত্তমান বিশ্বে যেখানে সর্ব্বত্র বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন আসিয়া গিয়াছে, সেখানে সন্ন্যাসীর পক্ষে ধনকে কেন্দ্রীভূত করা যে মহাপাতক, এ কথা ভারতবর্ষের ধনী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় যত শীঘ্র বুঝিতে পারেন, ততই প্রত্যেকের মঙ্গল। ভগবানের চাপরাশ পাইয়াই সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী হইয়াছেন। সেই সন্ন্যাসী দেহ রক্ষা করার জন্যই খাদ্যপরিধেয়শয্যা গ্রহণ করিতে অধিকারী, ভোগের বিলাসিতার মত পাপ তাহার পক্ষে আর কিছু হইতে পারে না। নিত্যগোপাল যখন ভাবস্থ হইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটাইয়াছেন, তখনকার কথা ছাড়িয়াই দেই, যখন তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে রহিয়াছেন, তখনও ন্যূনতম প্রয়োজনকেই গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে অনেক ঘটনার মতই তাঁহার জীবন অধ্যাত্মক্ষেত্রকে ছাড়াইয়া সমাজনীতি ও রাজনীতিক্ষেত্রকেও স্পর্শ করিয়াছে। অথচ ইহা তাঁহার অধ্যাত্মবাদই বটে। অর্থাৎ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হিসাব বা মানদণ্ড লইয়া তিনি চলেন নাই—তাঁহার একই প্রাণতত্ত্ব অধ্যাত্মজীবন ও ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়া একই সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির সুষমাকে ব্যক্ত করিতেছে। জীবনে কোঠাবিভাগ তাঁহার ছিল না—একই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তাঁহার জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রের ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছে।

এইজন্যই তাঁহার কাছে ব্রহ্মজ্ঞানও পাইতে পারি, আবার সংসারে কেমন করিয়া চলিলে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত, খুব হিসাব করিয়া সাধারণ সংসারীর কিংবা প্রত্যেক সংসারীরই চলা উচিত, তাহাও শিখিতে পারি। তাঁহার আশ্রম তিনি এমন গুছাইয়া, সামান্যতম বস্তুটিকেও কাজে লাগাইয়া এমনভাবে করিতেন যে, এমন সমাধি যাঁহার তিনি আবার এমন হিসাবী, এমন খেয়ালযুক্ত কেমন করিয়া হন ভাবিলে এই কথাটাই শুধু ফুটিয়া উঠে যে, তিনি একটী পরিপূর্ণ মানুষ, যাঁহার মধ্যে পরস্পর বিপরীতের বিরোধ ছিল না, ছিল একটী গভীর সামঞ্জস্য যাহা পরম প্রেমের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হুগলী মঠের বাগান হইতে শুকনো ঘাস তিনি তুলাইয়া রাখিয়াছেন বর্ষার দিনের জ্বালানীর জন্য; লিখিতে লিখিতে পেনসিল ছোট হইয়া গিয়াছে আর ধরা যায় না, তিনি উহাতে কাগজ জড়াইয়া লইয়া লিখিয়াছেন—এখনও

তাঁহার লিখিবার সরঞ্জামের মধ্যে অত্যন্ত ছোট ছোট পেনসিল পাওয়া যায়। তাঁহার রুচি বা পছন্দহ ধনীর পছন্দ নয়—তরকারী কুটিয়া যাহা যাহা আমরা ফেলিয়া দেই—আলুর খোসা কুমড়ার খোসা ইত্যাদি ইত্যাদি—সেই সব উঞ্ছ বস্তু দিয়া চচ্চড়ি খাইতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন—তাঁহার জন্ম প্রতিদিন এইটী প্রস্তুত করিতে হইত। তাঁহার ঘর এমন সুন্দরভাবে গুছান থাকিত যে, দেখিলে নয়ন তৃপ্ত হইত। সত্যিকারের বড় বলিয়াই এত ছোট জিনিষেরও এমন মূল্যদানের এবং এমন শৃঙ্খলার সঙ্গে এমন কর্ম্মকুশলতা তাঁহার ছিল। আর তিনি যে রান্না করিতে, তরকারী কুটিতে প্রভৃতি ঘরের কাজেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন—তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সকল ছাড়াও কাহার খাওয়া হইয়াছে, কাহার হয় নাই, কাহার কোন্‌দিন কোন্‌টুকু প্রয়োজন, পিতা হইয়াও মায়ের প্রাণ লইয়া তাহা তিনি সম্পাদন করিয়াছেন। সংসারের সমস্ত দিকেই তাঁহার যেমন নজর ছিল তেমনি দক্ষতা ছিল। এমনি করিয়া একটী সহজ জীবন এমন প্রেমময় আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহা মানুষকে মুগ্ধ করিয়াছিল, বিহ্বল করিয়াছিল।

নিত্যগোপালের অন্তহীন ঐশ্বর্য্যের কথা আমরা কিছুই প্রায় বলি নাই। যে সকল ঘটনা তাঁহার প্রাণের মাধুর্য্যকে প্রকাশ করিয়া সেই সঙ্গেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যকে বা বিভূতিকে প্রকাশ করিয়াছে, এমন অল্প কয়েকটী ঘটনাই শুধু আমরা উল্লেখ করিয়া একদিকে তাঁহার বিরাট প্রাণের ও আর একদিকে তাঁহার সমন্বয়তত্ত্বের পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। পরমহংসদেব একদিন নিত্যগোপালকে রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া সমাধিস্থ নিত্যকে শিবমন্দিরে শিকল আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন, অথচ পরে যাইয়া আর তাঁহাকে তথায় দেখিতে পান নাই। নিত্যগোপাল যোগবলে বদ্ধঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে বৃক্ষতলে গিয়া বসিয়া ছিলেন, এ সকল যোগবলের বহু বহু সংবাদ আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করি নাই। নিত্যগোপালকে বহু ভক্ত কেহ কৃষ্ণরূপে, কেহ গৌরাঙ্গরূপে, কেহ কালীরূপে প্রভৃতি বহু জনে বহু রূপে দর্শন করিয়াছেন, এ সংবাদও আমরা উল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছি। শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার দুই ভক্তের প্রাণের ঐকান্তিক অনুরোধে একজনের স্ত্রীর এবং আর একজনের পিতার পরলোকগত আত্মার পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, হুগলী মঠে নিত্যগোপাল বহু ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন, যদিও এই সময়টাতে তিনি অনেকখানি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন

সারাদিনই তাঁহার বন্ধ ঘরে তিনি ভাবস্থ হইয়া থাকিতেন; কোনদিন সকালে একবার কোনদিন বা দিনান্তে একবার এবং কোনদিন বা সকালে বিকালে এই দুইবার তাঁহার ঘরের দরজা খোলা হইত; কখনও বা তিন চারি দিন পর দরজা খোলা হইত। ভক্তেরা আসিয়া বসিতেন, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কুশলাদি তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, সুখ দুঃখের খবর লইতেন। তাহার পর হয় কোন গ্রন্থাদি পাঠ হইত, নয় কীর্ত্তন বা ভজন গান হইত। প্রত্যেকের সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল—সাধনার ক্ষেত্রেও যেমন, ব্যবহারের জগতেও তেমনি তিনি মধ্যবর্ত্তীত্বের লোপ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকার জন্যেই প্রত্যেকেই তাঁহার প্রাণের অপরূপ স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, প্রত্যেকেই জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের মিলিত বিগ্রহ এই অপরূপ মানুষটীকে নিজের অন্তরতম করিয়া মনে করিতে পারিয়াছিল। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য তাঁহার কাছে রক্ষিত হইত, তাই কেহই কোনদিন বৈশিষ্ট্যলোপের দুঃখ তাঁহার কাছে পায় নাই। যে যাহার পথ চলিবে, তিনি শুধু প্রাণের জোগান দিয়া গিয়াছেন।

১৩১৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি হুগলী মঠে আসিয়াছিলেন। ইহার পর আর মাত্র বছর চারেক তিনি প্রকট ছিলেন। হুগলীতে অবস্থান কালে তিনি মাত্র তিনদিনের জন্য আশ্রমের বাহিরে গিয়াছিলেন। একদিন মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচনের ভোট দিতে, একদিন তাঁহার মাসতুতো ভাই খগেনবাবুর বাড়ীতে সামাজিক বিধি রক্ষার প্রয়োজনে আর এক দিন জনৈক ভক্তের গৃহে অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে। দেহের যত্ন কোনদিন করেন নাই, নিজেও করেন নাই—কাহাকেও করিতে দেন নাই। যে সমন্বয়তত্ত্বকে স্থাপন করিতে তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন, লোকচক্ষুর আড়ালে তাহার বীজ বপন করিয়া লোকচক্ষুর আড়ালে থাকিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কালের অনুকূল হাওয়ায় পরস্পর-বিপরীতের সে সমন্বয়ের বীজ একদিন মহীরূহ হইয়া গজাইয়া উঠিবে; কিন্তু তাঁহাকে তো আর শত মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যাইবে না। যে কাহারও সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, তাহাদের তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছেন, আদর যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য কেহ ছিল না। অভিসন্ধিহীন প্রাণের সৌন্দর্য্যকে বুঝিতে পারা মানে মানুষের সভ্যতার দিকে অনেকখানি আগাইয়া যাওয়া। মানুষের কালচার আজও ততদূর পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। তাই মূর্ত্তিমান প্রাণ

ঐ মানুষটী বহুজন পরিবৃত হইয়াও ছিলেন একেবারে একক, একেবারে অনপেক্ষ। নূতন যুগের বার্ত্তা লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন, আসিয়াছিলেন যখন এবং যাহাদের মধ্যে, তাঁহারা তাঁহার বার্ত্তাকে সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন নাই। নূতন যুগের কথা তিনি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার অনেকগুলি বইতে, কিন্তু কাহাকেও শিখাইয়া যান নাই, কাহারও অপেক্ষাতেও লেখেন নাই। বিরাট বিশ্বের জন্য তাঁহার বার্ত্তা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, সভ্যতার ক্রমাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিন সে কথা মানুষ আপনি খুঁজিয়া লইবে।

যাহা হউক, সমন্বয়-মূর্ত্তি নিত্যগোপালের অপ্রকট হইবার সময় হইয়া আসিল। বলিয়াছি দেহের যত্ন নিজেও কোনদিন করেন নাই, কাহাকেও কোনদিন করিতে দেন নাই। আমরা এমন তাঁহার কেহ ছিলাম না যে, তিনি নিষেধ করিলেও তাঁহার সেবাযত্ন কিছু করিতে পারি। দীর্ঘদিন হইতেই ডায়েবেটিস ছিল, কোনদিন সেজন্য উপযুক্ত আহার বা ঔষধ পড়ে নাই। তাঁহার দেহ তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল। ডায়েবেটিসের রোগী তিনি, অথচ সমাধিস্থ কিংবা ভাবমগ্ন হইয়া কিংবা কীর্ত্তনানন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিনও কাটিয়া গিয়াছে, তিনি প্রস্রাব করেন নাই। যাহাহউক, একদিন বলিলেন 'দেখ তো আমার এইস্থানে কি হইয়াছে?' দেখা গেল তাঁহার গুহ্যদ্বার ঘা হইয়া পচিয়া গিয়াছে, অথচ এ পর্য্যন্ত ভক্তেরা কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। এখন অপারেশন করা নিতান্ত প্রয়োজন—ঠাকুর অপারেশন করিতে চান না। ভক্তগণের একান্ত অনুরোধে শেষে বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমরা যদি কর, তবে রাজী আছি—বাহিরের ডাক্তারকে দিয়া অপারেশন করাইব না।' যজ্ঞেশ্বর ও সতীশ বলিয়া তাঁহার দুই ভক্ত ডাক্তার ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিলেন 'তোমরা অপারেশন কর।' যজ্ঞেশ্বর ও সতীশ ডায়েবেটিস ও ঘা-এর এই মারাত্মক অবস্থায় নিজেরা অপারেশন করিতে সাহস পাইতেছিলেন না; কিন্তু কোনক্রমেই বাহিরের ডাক্তারকে দিয়া অপারেশন করাইবার অনুমতি ঠাকুরের নিকট হইতে পাওয়া গেল না। অগত্যা যজ্ঞেশ্বর দত্তই সতীশকে লইয়া অপারেশন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ক্লোরোফরম না করিয়া তো এত বড় অস্ত্রোপচার করা চলিবে না। ঠাকুরকে সে কথা বলিলে তিনি তাহাতে রাজী হইলেন না। কিন্তু ডাক্তারেরা যখন কিছুতেই সাহস পাইলেন না, তখন অনুমতি দিলেন। অপারেশনের কাজ আরম্ভ হইল, ক্লোরোফরম করিবার জন্য ওষুধ প্রযুক্ত হইল; কিন্তু ঠাকুর

অচৈতন্য হইলেন না। তিন বার চেষ্টা করিয়াও ঠাকুরকে অচৈতন্য করান গেল না। ভক্তগণের ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গানের লাইন বুঝিবা মনে পড়িল—'সে যে সদা সচৈতন্য, হবে কেন অচৈতন্য'—চিৎস্বরূপ যিনি, তাঁহাকে অচৈতন্য করা সম্ভব হইল না। ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'অমনি কর।' ঠাকুর ভক্তগণ সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন—দেহের উপর এতবড় একটা ব্যাপার যে ঘটিতেছে, সেজন্য এতটুকু বিকৃতি বা যন্ত্রণার লেশমাত্র তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল না। অপারেশন শেষ হইলে ঠাকুর বলিলেন একটা শিরা কাটিয়া গিয়াছে।

দেহের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে হইতে ১৩১৭ সনের ৭ই মাঘ, শনিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে রাত্রি দশটা পাঁচ মিনিটের সময় তিনি আলোবাতাসের এই জগৎ হইতে নিত্যগোপালরূপে অপ্রকট হইলেন। নিত্যগোপাল শেষ সময়ে বলিয়াছিলেন, 'জাগো, জাগো, নিয়ত জাগো। এ সংসার অতি ভীষণ স্থান। এখানে খুব সাবধানে থাকতে হয়। অর্থে সুখ নাই, যশে সুখ নাই. প্রকৃত সুখ ভগবানের দর্শনে, স্পর্শনে, তাঁর গুণকীর্ত্তনে। ......।' আর তাঁহার উইলে শেষ উপদেশ লেখা আছে, 'আমার শিষ্যগণের প্রতি আমার এই শেষ উপদেশ যে, তাঁহারা সকলে ভ্রাতৃভাবে থাকিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিপদে পড়িলে অন্য সকলে তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন। যদ্যপি কাহারো কোন কষ্ট হয় তবে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবেন ও পরস্পর সাহায্য করিবেন। অনাথ আতুর দেখিলে সাহায্য করিবেন। পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমানভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিবেন।' ব্যবহারিক জীবনের এত সাধারণ কথায় তাঁহার শেষ উপদেশ দেওয়ার তাৎপর্য্য গভীর। ব্রহ্মজ্ঞান ঘনীভূত হইলেই ব্যবহারিক জীবনের এই সহজ স্বভাব এমন প্রীতিপূর্ণ হওয়া সম্ভব। ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াই ব্যবহার-জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে, অন্যথা উহা নিছক বৈষয়িকতা মাত্র।

নিত্যগোপালের দেহ হুগলী হইতে আনিয়া তাঁহার নির্দ্দেশমত তাঁহার স্থাপিত বিশ্বগুরুপীঠ কলিকাতার মহানির্ব্বাণ মঠে সমাহিত করা হইল। সর্ব্ব সম্প্রদায়ী নিত্যগোপাল বলিয়াছিলেন, একদিন সকল সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের প্রত্যেকের নিশান লইয়া এই মহানির্ব্বাণ মঠে আসিয়া সমবেত হইবে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, 'ভবিষ্যতে জগতে সমস্ত জাতি এক জাতি হইবে, সমস্ত

জাতি এক ধর্ম্ম মানিবে। তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারো প্রতি কাহারো কোনো বিদ্বেষ থাকিবে না।' সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া, সর্ব্ব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া যে এক ধর্ম্ম, সর্ব্ব জাতির সমন্বয় করিয়া, সর্ব্ব জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া যে এক-জাতিয়ত্ব, ভবিষ্যৎ বিশ্ব সেই এক ধর্ম্ম, সেই এক জাতি দেখিতে পাইবে, এত বড় আশার ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়া আজিকার এই বিদ্বেষ সংশয় অনিশ্চয়তা আর বিভেদের যুগে নিত্যগোপাল মানুষের সামনে আলোর বর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়াছেন।

শ্রীনিত্যগোপাল আর নাই, কিন্তু সত্যিই কি তিনি নাই? 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।' চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া তুমি কি আমাদের জীবনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে না? নিত্য বর্ত্তমান তুমি, তুমি নাই এ কথা তো সত্য নয়। নিত্যগোপাল রূপে তুমি নাই আবার অন্যরূপে ফুটিয়া উঠিবে বলিয়াই তো? স্থূল দেহে যখন তিনি নাই, তখন সূক্ষ্ম দেহে আছেন, কারণ দেহে আছেন, তখন আমার জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে আছেন—'When I shall be no more, my spirit will be with you.' নিত্যগোপাল রূপে তাঁহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে; কিন্তু নূতন আবেষ্টন, নূতন প্রয়োজন, নূতন দেশকালপাত্র তাঁহাকে আবার নূতন রূপে সৃষ্টি করিয়া তুলিবে—তাই চির পুরাতন হইয়াও তিনি চির নূতন।

তিনি বলিয়াছেন, 'আমি কলিতে যে মত প্রচার করছি, সত্যযুগে ত্রেতাতে ও দ্বাপরে পুনঃ প্রবল হবে। আমি আবার সে (সব) সকল যুগে জন্মাব।' তিনি আবার আসিবেন, আবার তাঁহার স্বতস্ফূর্ত্ত স্নেহধারার অমৃত সিঞ্চন পাইয়া মানুষ আত্মানন্দ সম্ভোগ করিবে—সে যে কী গভীর আশার কথা, কী সুনিবিড় ভরসার সংবাদ, কী অতলস্পর্শী আনন্দের ইঙ্গিত—তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়। সেই ইঙ্গিতের ধ্যানে আমাদের সকল সত্তা শিহরিত হইয়া উঠুক। তিনি আছেন, তিনি আসিবেন—আমাদিগকে নূতন জগতে, নূতন আলোবাতাসে নূতন মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, আমাদিগের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব সার্থক হইবে। আমরা পাইয়াছি, পাইবার প্রচেষ্টা আমাদের সাধনা নহে। তাঁহাকে যে পাইয়াছি ইহা আস্বাদন করিবার ভিতর দিয়া আমরা তাঁহার পরিকল্পিত সত্যযুগকে গড়িয়া তুলিব, তাহাতেই তাঁহার আবার আসার পথ সুগম হইয়া উঠিবে। তাঁহার জন্ম জয়যুক্ত হউক। বন্দেমাতরম্

কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা—অনির্দ্দেশিত কাজ

সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কর্ম্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের কর্ম্ম সম্বন্ধে নানারকম ভুলভ্রান্তিময় ধারণা অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্মের নানা রূপ ও প্রকার সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা গিয়াছে। শিক্ষকের কর্ম্ম ও শিশুর কর্ম্ম এবং দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কেও অনেক ভ্রান্তি বর্ত্তমান। এই অবস্থায় কর্ম্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিশুর কর্ম্মের স্থান কোথায় এবং কর্ম্মের স্বরূপই বা কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান শিক্ষার ধারা শিশুর কর্ম্ম-চঞ্চলতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং এই স্বীকৃতির ভিত্তি হইতেছে শিশুর নিজস্ব চিন্তাধারা ও তাহার শিক্ষালাভ সম্পর্কিত মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান। শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা অতীত হইতে বর্ত্তমানে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমাদের শিশুর শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, তাহার বাহিরে কোনও রূপ কিছু আরোপ করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

শিশুর কর্ম্মকে আমরা দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া উভয়ের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে পারি। প্রথমটি হইতেছে, শিশুর স্বয়ং-কর্ম্ম ও দ্বিতীয়টি হইতেছে শিক্ষক বা শিক্ষিকার নির্দ্দেশ অনুযায়ী শিশুর কর্ম্ম। শিশুর স্বয়ং-কর্ম্ম বলিতে আমরা সেই কর্ম্মকেই বুঝি যাহা শিশু স্বেচ্ছায় সম্পাদন করে, বয়স্কদের চাপ যেখানে সম্পূর্ণভাবে অবর্ত্তমান। অর্থাৎ শিশুর সমস্ত ব্যক্তিত্ব যেখানে কর্ম্মের মধ্যে সমাহিত। কিন্তু শিশু যেখানে শিক্ষক বা শিক্ষিকার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন করে, সেখানে গোটা জিনিষটার পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষক বা শিক্ষিকাই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন শিশুদের দ্বারা করাইয়া থাকেন। শিশুরা কর্ম্ম-ব্যস্ত থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাকে প্রকৃত কর্ম্মের পর্য্যায়ে ফেলা চলে না, কারণ ঐ কর্ম্মের মধ্যে শিশুদের মন

সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত নয়। মোট কথা ঐ কর্ম্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট শিশুর মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে। শিক্ষক বা শিক্ষিকার আদেশে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, সেই কর্ম্মে শিশুর মানসিক শক্তির প্রকৃত অনুশীলন হয় না। তাহা ছাড়া শিশুর মনের মধ্যে একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়; শিশু মনে করিতে থাকে যে, আদিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কর্ম্মের কোন মূল্যই নাই। সে নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। শিশুর কর্ম্ম-ক্ষমতাই যে এই মনোবৃত্তির ফলে রুদ্ধ হয় তাহা নয়, শিশুর জীবনের ভারসাম্য প্রকৃত পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে শ্রেণীর কার্য্যের সময় না থাকিলে চলে না। এ দিকে শিশুর ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ, এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে শিশুর স্বয়ং-কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষাদান করা সম্ভব কিনা তাহা বিবেচ্য।

শিশু স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে কাজ করে বা যে কাজের অবতারণা করে, তাহাই হইতেছে শিশুর পক্ষে **অনির্দ্দেশিত কাজ**। ওদিকে যে সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন বেশী করিয়া অনুভূত হয়, সেই সব ক্ষেত্রে শিক্ষকের নির্দ্দেশ দান এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম্মকে নির্দ্দেশিত কাজ বলা হয়। সঙ্গীত অভিনয় ইত্যাদি কর্ম্ম 'নির্দ্দেশিত কর্ম্মের' অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে নির্দ্দেশিত ও আদিষ্ট কর্ম্মের মধ্যে যে ব্যবধান বর্ত্তমান, তাহা বুঝিয়া দেখিবার প্রয়োজন। শিক্ষক যখন আদেশ দিয়া কর্ম্মের প্রতি অংশ শিশুদের দ্বারা সম্পাদন করাইয়া লন, তাহা হইতেছে আদিষ্ট কর্ম্ম; কিন্তু নির্দ্দেশিত কর্ম্মের মধ্যে এইরূপ আদেশের স্থান নাই। নির্দ্দেশিত কর্ম্মের মধ্যে শিশুর স্বাধীনতা একেবারে ক্ষুণ্ণ হয় না; কিন্তু আদিষ্ট কর্ম্মের মধ্যে শিশুদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে না, শিশুরা যন্ত্রচালিতের মত শিক্ষকের আদেশ মানিয়া চলিতে শিক্ষা করে। নির্দ্দেশিত কর্ম্মে শিশুদের কর্ম্ম হয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং শিশুরা স্বীয় কর্ম্মে শিক্ষকের ইঙ্গিত দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া নিজেদের সৃজনী শক্তিতে সমৃদ্ধ হইতেছে বলিয়া অনুভব করিতে শিক্ষা করে। এদিকে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিশু যদি শিক্ষকের নিকট কর্ম্ম সম্পর্কিত সর্ব্বদা নির্দ্দেশ ও আদেশ পায়, তাহা হইলে তাহার কর্ম্মের উৎস বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু সত্যিকারের কর্ম্মের উৎস বন্ধ হয় আদিষ্ট কর্ম্মের মধ্যে, যেখানে শিক্ষক বা শিক্ষিকাই শিশুর কর্ম্মের অর্দ্ধেকের উপর সম্পাদন করেন, নিজের পরিকল্পনা শিশুর উপর চাপাইয়া দিয়া। নির্দ্দেশিত কর্ম্ম ও আদিষ্ট কর্ম্ম এক জিনিষ নয়। নির্দ্দেশিত কর্ম্মের মধ্যে শিক্ষকের নির্দ্দেশ বর্ত্তমান

সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই নির্দ্দেশের মধ্যে শিশুর সৃজনী শক্তি জাগ্রত করিবার মত মালমসলা রহিয়াছে। কিন্তু আদিষ্ট কর্ম্মের মধ্যে প্রতি ধাপে নির্দ্দেশ থাকার দরুণ শিশুর মৌলিক শক্তিও ঐরূপ আদেশের দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, তাহারও আশঙ্কা রহিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শিশুর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আদিষ্ট কর্ম্মের কোন স্থানই একেবারে নাই। বস্তুতঃ পক্ষে তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে যে, দুইপ্রকার কর্ম্ম শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসৃত হইতে পারে। প্রথম হইতেছে অনির্দ্দেশিত কর্ম্ম এবং দ্বিতীয় নির্দ্দেশিত কর্ম্ম। উভয়েরই প্রয়োজন আছে, স্তর ভেদে ঐরূপ কর্ম্মের স্থল নিরূপিত হইবে।

কিরূপ অবস্থায় ও কিরূপ ক্ষেত্রে অনির্দ্দেশিত কর্ম্ম চলিতে পারে, তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ৬+ এবং ৭+ এর জন্য অনির্দ্দেশিত কর্ম্ম চলে। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি শিশু কর্ম্ম-চঞ্চল, সে সর্ব্বদাই কাজ করিতে চায়। কর্ম্মদ্বারা যে তাহার কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাহা নয়, তাহার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও নানাভাবে পরিচালনার দ্বারা কর্ম্মপ্রবণ হয়, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, আবেগময় জীবন স্থিত হয় ও তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়। তাহাই যদি হয় তবে অনির্দ্দেশিত কর্ম্ম ও নির্দ্দেশিত কর্ম্মের মধ্যে এইরূপ বিভাগ সৃষ্টি করার তাৎপর্য্য কি, এই প্রশ্ন আসিতে পারে। ৬+ বৎসরে শিশু গৃহ হইতে প্রথম যখন বিদ্যালয়ে আসে, তখন তাহার মানসিক অবস্থা দানা বাঁধে নাই। এই অবস্থায় তাহার আবেষ্টনীর মধ্যে এত জিনিষ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন হয় যে, সে একটার পর আর একটা কাজ দ্রুত করিয়া যাইতে উন্মুখ হয়। এমন সময়ে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার সীমা রেখার মধ্যে তাহার মানসিক উন্মুখতাকে সীমাবদ্ধ করা সমীচিন নয় বলিয়াই শিক্ষকগণ এই বয়সে অনির্দ্দেশিত কর্ম্মের সুপারিশ করিয়াছেন। শিশুরা এই বয়সে নানাবিধ কাজ সম্বন্ধে স্বীয় প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে শিক্ষা করুক, তাহাদের দেহ ও মন কর্ম্মে প্রবণ হউক, তাহার পরে শিশু শিক্ষকের নির্দ্দেশ অনুসারে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

তাহা হইলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, একটা বিশেষ বয়সের জন্য অনির্দ্দেশিত কাজ বিশেষভাবে উপযুক্ত। কিন্তু অনির্দ্দেশিত কর্ম্ম শিশুর বিশেষ বয়সের উপযোগী হইলেও, তাহাকে কিভাবে সেইরূপ কর্ম্মে নিয়োজিত করা যায়, তাহা আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। শিশুর জন্য প্রয়োজন

কর্ম্মে স্বাধীনতা, সেই হেতু তাহাকে সমস্ত ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। তাহা করিলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতায় যাইয়া দাঁড়াইবে। তাহা হইলে শিশুর স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার জন্য উপযুক্ত আবেষ্টনী তৈয়ারী করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সেই আবেষ্টনীর মধ্যে শিশু স্বীয় ইচ্ছামত যাহা খুসী করিতে পারে, এইরূপ স্বাধীনতা শিশুকে অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। আবেষ্টনীর মৃদু চাপ অজানিতে যেন শিশু মনোবৃত্তিকে সুব্যবস্থিত করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

অনির্দ্দেশিত কর্ম্মের সুপরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা শিক্ষককে করিতে হইবে।

প্রথমতঃ শ্রেণী কক্ষ থাকিবে বেশ বড়। শিশুরা যাহাতে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে, কর্ম্মের জন্য নানা বস্তু সম্মুখে রাখিবার স্থান পায়, এইরূপ প্রচুর স্থান সম্বলিত হইবে শ্রেণীকক্ষ। দ্বিতীয়তঃ শ্রেণীর দেওয়ালে কতকগুলি সেল্ফ থাকিবে, তাহাতে থাকিবে শিশুর কর্ম্মের উপযোগী নানা জিনিষ। সেল্ফগুলির উচ্চতা হইবে শিশুর দৈর্ঘ্য অনুযায়ী, অর্থাৎ এমন ভাবে সেল্ফ গুলিতে জিনিষপত্রাদি সজ্জিত থাকিবে, যাহাতে শিশুরা অল্পায়াসে জিনিষগুলি বাহির করিতে এবং পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতে পারে। সেল্ফগুলির কোন ঢাকনা থাকিবে না। শিশু যেন তাহার চোখের সম্মুখে সমস্ত জিনিষ গুলি স্পষ্টভাবে দেখিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেল্ফে অবস্থিত বস্তুগুলি যেন শিশুর মনে আগ্রহ জন্মায়, এইজন্যই খোলা সেল্ফে জিনিষগুলি রাখা প্রয়োজন। সেল্ফ ছাড়াও দেওয়াল ঘেষিয়া বা ঘরের কোণে কোন কোন জিনিষ রাখা যাইতে পারে। যে জিনিষগুলি শিশুরা নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য বাহির করিয়া আনিবে, সেগুলি সাধারণতঃ থাকিবে সেল্ফে, আর বাকী জিনিষগুলি যেগুলি অন্যত্র বহন করিয়া লইয়া যাওয়া একটু অসুবিধাজনক, সেই জিনিষগুলি ঘরের কোণায় বা দেওয়াল ঘেসিয়া রাখা যায়। প্রয়োজন বোধে শিশুরা সেইস্থানে যাইয়া এই জিনিষগুলি সহযোগে খেলিতে পারে।

শ্রেণীকক্ষে শিশুদের কর্ম্মের জন্য যে যে জিনিষ প্রয়োজন, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। মাটি—একতাল পরিষ্কার কাদামাটি শিশুদের জন্য শ্রেণীকক্ষে

রাখা প্রয়োজন, কারণ শিশুরা কাদামাটি দ্বারা নানারকম সৃজনাত্মক কর্ম্ম করিতে সক্ষম।

২। বালু—একটা লম্বা কাঠের বড় অথচ নীচু পাত্রে কিছু বালি রাখা যাইতে পারে। কাঠের পাত্র না পাওয়া গেলে দেওয়াল ঘেষিয়া ইটের বেড়ের মধ্যে বালি রাখা সম্ভব। শিশুরা সেখানে যাইয়া বালু দ্বারা নানারকম জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে শিশুরা শুকনো বালিতে জল ঢালিয়া বালুর মণ্ড করিবার উপযোগী করিয়া লইতে পারে।

৩। দেওয়ালের কাছে বড় একটি টিনের নীচু টবে কিছু জল রাখা আবশ্যক। জলের সাহায্যে শিশুরা নংনাপ্রকার খেলা করিয়া থাকে। শিশুরা জল খুব পছন্দ করে।

৪। কাঠের ছোট ছোট টুকরা এই শ্রেণীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত। হাতুরী, করাত, পেরেক ইত্যাদির দ্বারা কাঠের কাজ করিতে শিশুরা বাস্তবিক খুবই ভালবাসে।

৫। নানারকম কাগজ যথা সাদা, লাল, নীল, সবুজ বেগুনি ইত্যাদি নানা রংএর কাগজ শিশুদের জন্য সেল্‌ফে সজ্জিত থাকিবে। খবরের কাগজ, সেলোফিন কাগজ ইত্যাদিও শিশুদের কাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

৬। পাতলা কার্ড বোর্ড শিশুদের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে, অতএব কার্ড বোর্ডের ব্যবস্থা থাকিতেই হইবে।

৭। তুলি রং, কাঁচি ছুরি ও ব্লেড, সূঁচ সুত, চক, পেইণ্ট ইত্যাদিও শ্রেণীর কাজের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

৮। কয়েকটি ছোট ছোট বোর্ড।

উপরে যে সমস্ত জিনিষের নাম করা হইল, তাহা ছাড়া আরও নানারকম জিনিষের প্রয়োজন। কিন্তু জিনিষগুলি বয়স্কদের নিকট মূল্যহীন হইলেও উহারা শিশুদের কাছে অমূল্য। জিনিষগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ফেলিয়া দেওয়া জিনিষ।

ছেঁড়া ছবির বই, ক্যাটালগ, রেলওয়ে টাইমটেবিল, ছেঁড়া মাসিক পত্রিকা, সুতার রেল অবশ্য সুতা ছাড়া, ফেলিয়া দেওয়া কার্ডবোর্ডের বাক্স, যথা—জুতার বাক্স, ঔষধের বাক্স ইত্যাদি। বোতাম, তেতুল বিচি, দড়ি, ন্যাকড়া, পাথরের টুকরা ইত্যাদি। ভাঙ্গা ঘড়ির অংশ, ভাঙ্গা শামুক, ঝিনুক, কর্ক, ছোট ছোট পাথর, খালি ম্যাচ বাক্স ও সিগারেটের বাক্স ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে যে যে জিনিষপত্রের উল্লেখ করা হইল, সেই সম্পর্কিত মূলনীতি একটু বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। যে সমস্ত বস্তু শিশুদের জন্য কিনিয়া রাখা হইবে, তাহা স্বল্প দামের হউক তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু গরীব দেশ গরীব দেশ বলিয়া তাহাদের জন্য কিছুই কেনা হইবে না, তাহা চলে না। বিনা পয়সায়, শুধু ব্যবহৃত বাজে জিনিষ দ্বারা কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদান সম্ভব নয়। শিশুদের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ জন্মাইবার জন্য নতুন জিনিষ আমদানী করিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পরের ধাপে যে সব জিনিষের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের বাস্তবিক পক্ষে কোন দাম নাই। এইগুলি শিশুদের অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ। শিশুদের এই প্রিয় জিনিষগুলি দ্বারা অন্যান্য বস্তুর সহযোগে শিশুদের কর্ম্ম পরিচালনা করা সম্ভব হয়। একেবারে খরচ হইবে না, এটাও যেমন সমীচিন নয়, সেইরূপ খরচও খুব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

শিশুরা স্বাধীনভাবে অনির্দ্দেশিত কাজ কিভাবে আরম্ভ করিবে, তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। দুইরকম ভাবে কাজ আরম্ভ করা যায়। শিশুর সংখ্যার চেয়ে বেশী কাজের ইউনিট শিক্ষক বা শিক্ষিকা শ্রেণী কক্ষে সাজাইয়া রাখিয়া আসিতে পারেন। যে কাজ শিশুরা পছন্দ করিবে, সেই কাজ তাহারা করিতে সুরু করিতে পারে। আর এক রকম পন্থা হইতেছে, শ্রেণী কক্ষের সেল্‌ফে বা র‍্যাকে বা কোণায় বিভিন্ন জিনিষগুলি সাজান রহিয়াছে, শিশুরা নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী কাজগুলি বাছিয়া নিতে পারে। কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নির্দ্দেশ না থাকিলেও, কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিশুদিগকে শিক্ষক অবহিত করিতে চেষ্টা করিতে পারেন ; যথা,—কাজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিতে, এবং জিনিষপত্রাদি গুছাইয়া রাখিতে। নিজের প্রয়োজনেই ঐসব অভ্যাস শিশুর জন্মিবে, এইরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। ভিত্তিগত জ্ঞান থাকিলেই উহাকে অন্যক্ষেত্রে প্রয়োজনে লাগাইতে শিশুরা নিজেরাই প্রেরণা বোধ করিবে ; কিন্তু শিশুকে প্রথম অবস্থায়ই যেখানে কর্ম্মে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে, সেইখানে তাহার স্বাধীনতার মধ্যে কর্ত্তব্য কাজটুকু সম্বন্ধেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। তবে সেই সকল নির্দ্দেশগুলির মধ্যে নেতিবাচক নির্দ্দেশ না থাকাই ভাল।

প্রথম অবস্থায় অনির্দ্দেশিত কাজে শিশুদের হয়ত বিশেষ দক্ষতা দেখিতে

পাওয়া গেল না। হয়ত দেখা গেল এক এক দলের প্রায় সমস্ত শিশুরাই একই কাজ করিতেছে। যদি কেহ একটি মাটির ঘোড়া বানাইল, দেখা গেল অনেকেই তাহা বানাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিংবা যদি কেহ একটি গাছ আঁকিল, সকলেই গাছ আঁকিতে আরম্ভ করিল। প্রথম অবস্থায় এইরূপ কাজ দেখিয়া হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। তাহার কারণ শিশুর জীবন বিদ্যালয়ে আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আদিষ্ট কাজের মধ্যে অতিবাহিত হইয়া আসিয়াছে। কাজ, খেলা, বেড়ান, খাওয়া ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই পিতামাতা অভিভাবকের আদেশ শিশুকে অনুসরণ করিতে হইয়াছে। অতএব বিদ্যালয়ে আসিয়া এইরূপ বিভিন্ন কাজের সুযোগের মধ্যে সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে. কোন্ কাজটি সে করিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কাজের সম্ভাব্যতাগুলিও তাহার সৃজনাত্মক কাজ না করার দরুণ মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে না। এই অবস্থা শিশুর বেশী দিন থাকে না, হস্ত ও মস্তিষ্ক একযোগে চলিবার কালে শিশুর ভাব ও কর্ম্মরাজ্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সে নানারূপ কাজ করিতে শিক্ষা করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশু শ্রেণী কক্ষে যাইয়া কোন কাজ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইহা তাহার কাজ করিবার অনিচ্ছা বা অপারকতার লক্ষণ নাও হইতে পারে। সে কি করিবে, কি ভাবে করিবে, এইরূপ চিন্তাও সে চুপ করিয়া থাকিয়া করে। এই স্তরকেও কর্ম্মের স্তর বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, তাহা না হইলে শিশুর প্রতি অবিচার করা হয়, কারণ কাজ সম্বন্ধে চিন্তা করাও কার্য্যেরই অঙ্গ। এইরূপ চুপ করিয়া চিন্তা করার মধ্য দিয়াই একদিন কাজের প্রতি শিশুর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

যে সমস্ত জিনিষ শিশুদের দ্বারা এই সময়ে তৈরী হইবে, সেগুলির ব্যবস্থা কিভাবে হইবে? প্রতিদিন এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা কাজের মধ্য দিয়া একেবারে নেহাৎ কম জিনিষ তৈরী হইবে না। শিক্ষক সেই সমস্ত জিনিষ যে শ্রেণী কক্ষেই রাখিতে পারিবেন, এইরূপ প্রচুর স্থান হয়তো শ্রেণী কক্ষে নাই। যদি থাকে তবে সেই জিনিষগুলি ঘরের একদিকে সারি করিয়া সাজাইয়া রাখিতে পারেন. শিশুরা তাহাদের জিনিষগুলি প্রয়োজন বোধে আনিয়া উহাদ্বারা খেলা করিয়া পরে আবার সেগুলি যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে পারিবে। কিন্তু সেইরূপ প্রচুর স্থান যদি শ্রেণী কক্ষে না থাকে, তবে শিক্ষক

সেই সকল জিনিষগুলি সুবিধামত অন্যত্রও রাখিতে পারেন, তবে শিশুদের নিজেদের কাজ যাচাই করিবার জন্য এবং তাহাদের মধ্যে কাজে উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য জিনিষগুলি প্রতি মাসে একবার বিদ্যালয়ের সকলের দেখিবার জন্য একটি ছোট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারেন। বলা বাহুল্য এইরূপ ভাবে শিশুদের কাজ অন্যদের চোখে মর্য্যাদা লাভ করিলে শিশুরা কাজে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিবে। প্রথম অবস্থায় শিশুদের মধ্যে কাজ না করার যে ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন তখন লক্ষ্য করা যাইবে। শুধু একটি জিনিষই তাহারা করিতে চাহিবে না, নূতন নূতন জিনিষ তাহারা করিবে, এবং একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াও তখন কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে 'দোকানঘরের কথা'। শিশুরা নিজেরাই দোকানঘর তৈয়ারী করিয়া তাহার বেচা কেনা, জিনিষপত্রের আমদানী ইত্যাদি করিবে। 'দোকান ঘরের' সঙ্গে একটি 'পুতুলের সংসার' থাকিলে প্রয়োজনের দিক হইতেই দোকানকে সমৃদ্ধ করা শিশুদের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইবে। দোকানঘরে ডল-শিশুদের জন্য কাপড় জামার অভাব হইলে শিশুরা কাপড়-জামা তৈয়ারী করিতে বসিয়া যাইবে। দোকানঘরে ছোট ডল-শিশুদের জন্য টানাগাড়ী না থাকিলে শিশুরা নিজেরাই তাহা তৈয়ারী করিবে। ডল-পুতুলের বনভোজন হইবে, দোকানদারদের বনভোজনের সমস্ত জিনিষ জোগাইতে হইবে। পক্ষান্তরে ডল-পুতুলদের অসুখ করিলে ঔষধের ব্যবস্থাও দোকান হইতেই হইবে। শিশুদের মধ্যে যদি কেহ ডাক্তার হয়, তাহা হইলে ত বেশ ভাল কথা ; রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ষ্টেথিস্কোপ চাই, ইন্‌জেকসেন দিবার সমস্ত জিনিষও ত অপরিহার্য্য ; ডাক্তারের আবার নিজস্ব গাড়ী ছাড়া চলে না, তাহার জন্য আবার একটা খেলার গাড়ীও তৈরী করা চাই।

শিশুরা যখন অনির্দ্দেশিত কর্ম্মে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন দেখা যায় তাহারা এমন সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করিতে আরম্ভ করে, যাহা বয়স্কেরা শিশুদের দ্বারা করা সম্ভব বলিয়া ভাবিতেও পারে না। বলা বাহুল্য এই শিশুদের এই সমস্ত কাজ বয়স্কদের কাজের অনুকরণমাত্র। শিশুরা অভিভাবকদের যাহা করিতে দেখে, তাহা অনুকরণ করিতে স্বাধীনভাবে সুযোগ পাইয়া তাহারা সেই ভাবধারার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে।

অনির্দ্দেশিত স্বাধীন কাজের মধ্যে শিক্ষকের করণীয় কিছুই নাই, একথা

বলিলে ভুল বলা হয়। প্রথম কথা হইতেছে, শিশুদের স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ দেওয়া হইতেছে তাহাদের অন্তর্নিহিত কর্ম্মের উৎসকে খুলিয়া দিয়া শিশুজীবনকে স্থিত করিবার উদ্দেশ্যে। শিশুরা কর্ম্মচঞ্চল, তাহারা কাজ করিবে, খেলিবে ইত্যাদি। কিন্তু প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে যাহা শ্রেয় ও প্রেয় তাহাই তাহাদিগকে করিতে হইবে, তাহার সীমার বাহিরে যাওয়া চলিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ শিশু সকল সময়ে সকল ক্ষেত্রে যে স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে সক্ষম হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই, কোন স্থানে যাইয়া সে হয়ত অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, এমনও হইতে পারে। অতএব তাহার সেখানে সাহায্যের প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ অনেক সময় দেখা যায় শিশু শিক্ষককে তাহাদের খেলার মধ্যে অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। অতএব দেখা যাইতেছে শিশুদের অনির্দ্দেশিত কাজের মধ্যেও শিক্ষকের বিশেষ স্থান আছে, তাঁহাকে একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কোন কাজ শিশু করিতেছে না এমন অবস্থা যদি হয়, তখন শিক্ষক কোন্ কাজটা শিশুর ভাল লাগে তাহা বাহির করিতে বিভিন্ন কার্য্যের ইউনিট গুলি শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া শিশুকে কার্য্যে উৎসাহিত করিতে পারেন। বিভিন্ন শিশুর মধ্যে যদি জিনিষ লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়, কিংবা এক শিশু যদি অন্য শিশুর উপর বস্তু সম্পর্কে আধিপত্য বিস্তার করিতে চায়, তাহা হইলে শিশুদের বস্তুর উপর অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নে শিক্ষকের মনস্তত্ত্ব বিশেষ পরিচালনার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। শিশুরা কাজ করিতে করিতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইয়া শিক্ষকের কাছে সমস্যার সমাধান জানিতে চায়। সেই ক্ষেত্রে শিশুদের সাহায্য করা শিক্ষকের একান্ত-ভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সাহায্য করার মধ্যে তারতম্য থাকিবে ; শিক্ষক স্বীয় বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কোনক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করিবেন, কোনও ক্ষেত্রে বা ইঙ্গিত দ্বারা শিশুকে সাহায্য করিবেন। শিশুর প্রশ্নের উত্তর দিতেও তিনি একইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন, শিশু নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই যেন বাহির করিয়া লইতে পারে, এইরূপ অবস্থার যদি সৃষ্টি করিয়া দেন তাহা হইলেই সব চেয়ে ভাল। তাহা ছাড়া শিশুর অনির্দ্দেশিত কাজের মধ্যে, নূতন কিছু শিশুদের দ্বারা করাইবার জন্যও শিক্ষকের প্রচেষ্টা থাকিবে। প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষভাবে তিনি নূতন আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া শিশুকে নূতন নূতন কাজে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। আরও এক ক্ষেত্রে শিক্ষকের

সাহায্য প্রয়োজন হয়। শিশু যখন কোনও কাজ করিবার সময় কোন যন্ত্রপাতি ভুলভাবে ব্যবহার করে, তখন শিক্ষকের হস্তক্ষেপ করিতেই হয়। যন্ত্রপাতি নির্ভুলভাবে ব্যবহার করিলে কাজ করা সহজ হয়, অতএব শিশুকে নির্ভুলভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে অনির্দ্দেশিত কাজের মধ্যেও শিক্ষক সাহায্য করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, যে-শিশু কাজের মধ্যে যে-যন্ত্র ভুলভাবে ব্যবহার করিতেছে, তাহারই ব্যবহার শিক্ষক দেখাইয়া দিবেন, সাধারণভাবে সমস্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিবেন না। পক্ষান্তরে শিশু যেন তাহার খেলনা বা মডেল তৈয়ারী করিতে যাইয়া বড় বড় জিনিষ তৈয়ারী করে, সেদিকেও শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন। তাহার কারণ ছোট জিনিষ তৈয়ারী করিতে যে দক্ষতার প্রয়োজন হয়, বড় জিনিষ তৈয়ারী করিতে তাহার চেয়ে কম দক্ষতার পরিচয় দিলেও চলে, অথচ একটি পুর্ণ জিনিষও তৈয়ারী হয়। শিশুরা কাজ করিয়া আনন্দিতও হয়, অথচ ছোট জিনিষ দক্ষতার সঙ্গে করিতে না পারিলে নৈরাশ্যও তাহাদের আসে না। ট্রাম, বাস, মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন, বাড়ী, বাক্স, ইত্যাদি বড় বড় করিয়া কোন রকম ভাবে তৈয়ারী করিতে হয়ত শিশুরা পারে। ঐ সকল জিনিষের বস্তুগত আকৃতির সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকিলেও শিশুরা আনন্দের সঙ্গে উহাদের গ্রহণ করিবে, কিন্তু ছোট জিনিষ তৈয়ারী করিলে যে হস্ত চাতুর্য্যের প্রয়োজন হয়, তাহা ঐ শিশুদের না থাকায় উহা করিতে আরম্ভ করিলে শিশুরা তাহা করিতে পারিবে না। ফলে তাহাদের মধ্যে নৈরাশ্য আসিবে।

সকল কাজে শিশুদের সাহায্য দান করিতে হইলে শিক্ষকদের এই সকল সৃজনাত্মক কাজ সম্পর্কে নিম্নতম জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। মাটির কাজ, কিছু কাঠ ও কার্ড বোর্ডের কাজ, অঙ্কন, খেলনা তৈয়ারী ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকদের কাজ করিবার মত জ্ঞান থাকা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

অনির্দ্দেশিত কাজ শিশুদের কাজ করিবার দক্ষতা অর্জ্জন ও শরীর চালনার দিক দিয়া কতটা প্রয়োজনীয়, তাহা সংক্ষেপে পুর্ব্বেই কিছু বলা হইয়াছে। এই কাজের সঙ্গে পড়া লেখা ও অঙ্ক কি ভাবে যুক্ত করা যায়, তাহাই বিচার্য্য। তাই একথা পরিষ্কার ভাবে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, সমস্ত কাজের সঙ্গেই যে পড়া লেখা ও অঙ্ককে যুক্ত করিতেই হইবে, তাহারও কোন কথা নাই। শুধু কাজ করিয়া আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যেই শিশুরা কাজ করিতে পারে।

তবে বর্ত্তমানে এইখানে শিশুদের 3 R সম্বন্ধে কতটুকু জ্ঞানলাভের সম্ভাব্যতা আছে, তাহাই শুধু বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

শিশুরা যখন দোকানঘর বা ডলপুতুলের সংসার লইয়া খেলা করে, তখন তাহারা নানারকম কাজ করে। দোকানঘরের জিনিষগুলির লেবেল সাজান, জিনিষের দামের চার্ট তৈয়ারী, দোকানের জিনিষ মজুদ করিবার জন্য বিভিন্ন শিশুর কাছে চিঠি লেখা, ইত্যাদি কাজ ত শিশুদের লাগিয়াই আছে, তাহা ছাড়া যে সকল শিশু এককভাবে কোন কাজ করিতেছে, তাহাদের জিনিষগুলি অন্যের জিনিষের সঙ্গে মিশিয়া যাহাতে না যায়, তাহার জন্য জিনিষে নামের লেবেল লাগান এবং তাহার নীচে নিজের নাম লেখা ইত্যাদি ত প্রতি দিনের কাজ। তারপর প্রতিদিন শিশুরা যে যে কাজ করে তাহার একটি তালিকা তাহাদের 'খবরের' মধ্যে স্থান পায়। দোকানের খবর, ডল পুতুলের সংসারের খবরও সেই খবরের কাগজে লিখিত থাকে। বাস ট্রেন বা এরোপ্লেন তৈয়ারী করিয়াই হয়ত অনেক শিশু ক্ষান্ত থাকে না। কোথা হইতে কোথায় ট্রেন বা বাস যায়, তাহার পরিচয় পত্র, কার্ডবোর্ডে টিকিটের দাম লেখা, মাইল প্লেট লেখা ইত্যাদিও শিশুরা আপনা আপনি করিতে চেষ্টা করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই শিশু সাধারণতঃ শিক্ষকের সাহায্য প্রার্থনা করে। যদি শিশু শিক্ষকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা নাও করে, তবুও শিক্ষকেরা সেখানে অগ্রণী হইয়া যাইয়া শিশুকে সাহায্য করিতে প্রয়াসী হইবেন। ইহার দুইটি প্রয়োজনীয় দিক আছে। প্রথম দিক হইতেছে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। কারণ শিশু কাজ করিতে যাইয়া ভুল পথেও পরিচালিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক তাঁহার ইঙ্গিত দ্বারা শিশুর জ্ঞানলাভের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে আলোড়ন করিয়া দেখিতে সাহায্য করিতে পারেন। শিক্ষক শুধু প্রয়োজন বোধেই সাহায্য করিবেন, এবং ইঙ্গিত দ্বারা কোন কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে যাইবার মত পথের সন্ধানও দিবেন।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

প্রীতিসম্মেলন: গত ৩১শে জানুয়ারী রবিবার 'উজ্জ্বলভারত' পত্রিকার সপ্তম বর্ষারম্ভ উপলক্ষে তাহার গ্রাহক অনুগ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা ও সহানুভূতি-শীল ব্যক্তিদের লইয়া ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে একটী প্রীতি-সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন। সভাপতি মনোনীত হইবার পর শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'স্বরগ এল ধূলির আঙিনায়' গান করেন। পরে 'উজ্জ্বলভারত' পত্রিকার সহসম্পাদক শ্রীমতী রেণু মিত্র 'নববর্ষের প্রণতি' ও 'আমাদের কথা' পাঠ করে। ইহার পর সভাপতি মহোদয় তাঁহার মনোজ্ঞ অভিভাষণ পাঠ করেন। উহা এই সংখ্যার প্রথমেই যথাযথভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি অনিবার্য্য কারণে অন্য কোনও সভায় যোগদানের জন্য চলিয়া যাইতে বাধ্য হওয়ায় শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন রায়কে সভাপতির কার্য্য পরিচালনার্থ অনুরোধ জানাইলে প্রিয়দারঞ্জনবাবু সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। সভাপতির অনুরোধক্রমে প্রথমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেশ চন্দ্র গুহ বলেন, 'কলিকাতার মাসিক পত্রিকার প্রায় ৯০ খানাই পড়িবার মত নয়। উজ্জ্বলভারত বিশেষ একটী চিন্তাপ্রণালীর বাহক। উজ্জ্বলভারত নিজ বৈশিষ্ট্যে ও সহ-সম্পাদকের অনলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতায় ফলেই ছয় বৎসর চলিয়া আসিয়াছে। আমি এই পত্রিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।' ইহার পর 'সংহতি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন নিয়োগী মহাশয়ও 'উজ্জ্বলভারতের' চিন্তায় একটী মৌলিকত্ব ও সহসম্পাদকের অক্লান্ত পরিশ্রমের উল্লেখ করিয়া উজ্জ্বলভারতের দীর্ঘায়ু কামনা করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত জগন্নাথ সাহা কিছু বলেন। তাহার পর বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন ঘোষ বলেন, 'উজ্জ্বলভারত সমন্বয়ের কথা বলে। কিন্তু ইহার মধ্যে দ্বৈতবাদের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এখানে দ্বৈত অদ্বৈতের সমন্বয় সাধিত হয় নাই। তবুও উজ্জ্বলভারতকে আমি ভালবাসি। উজ্জ্বলভারত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।' শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'উজ্জ্বলভারত বর্ত্তমান চিন্তা প্রণালীর ধারক ও বাহক। ইহাতে সমভাবেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সমর্থিত হইতেছে। উজ্জ্বলভারত সর্ব্বক্ষেত্রে এক সামগ্রিক বিপ্লব ছড়াইয়া দিয়া এক

নূতন সৃষ্টি গড়িয়া তুলিতে চায়।' তাহার পর উজ্জ্বলভারত সম্পাদক পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে উজ্জ্বলভারত সম্বন্ধে 'দর্শবর্ষান্ তাড়য়েৎ' নীতি অনুযায়ী ইহার কল্যাণ কামনায় যাহা যাহা বলিয়াছেন এবং উপস্থিত বক্তাগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, সম্পাদক হিসাবে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে যাইয়া বলেন, 'পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জড়াজড় সমন্বয়ের জীবন ও দর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বলভারত পুরুষোত্তম জীবন কথা বলিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। এই জীবনের প্রয়োজন হইয়াছিল সেদিন সমাজের যে অবস্থায়, আজিকার সমাজের অবস্থাও তাহাই। ভাগবতে ধরণী ধর্ম্মকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, আজিকার ধরণীও ধর্ম্মকে তাহাই বলিতেছেন,

আত্মানং চানুশোচামি ভবন্তং চ অমরোত্তম।
দেবান্ ঋষিন্ পিতৄন্ সাধুন্ সর্ব্বান্ বর্ণাংশ্চাশ্রমান্॥

ভাগবত ১।১৬।৩২

হে অমর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আমার নিজের জন্য অনুশোচনা করি, আপনার জন্যও। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, সাধুগণ, সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বাশ্রমের জন্য অনুশোচনা করি। ধরণী-ধর্ম্ম-দেব-ঋষি-পিতৃ-সাধু-বর্ণ-আশ্রমের মধ্যে যে গ্লানি পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, সেই গ্লানি দূর করিবার জন্যই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলে রম্য বপু ধারণ করিয়া প্রকট হইয়াছিলেন। এই ভরসার কথাও ধরণী ধর্ম্মকে জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণজীবন এমন একটী সর্ব্বাঙ্গীণ বৈপ্লবিক জীবন ও দর্শন রাখিয়াছে, যাহা অনুসরণ করিয়া চলিলে বর্ত্তমান বিশ্ব নবীন জীবন্ত বিশ্বে গড়িয়া উঠিবে। বর্ত্তমানের গ্লানি এমনই ব্যাপক ও গভীর যে, এখানে কোনও জোড়াতালি (patch work) দেওয়া চলিবে না, আংশিক ভাবে সংস্কার করিলে তাহা আরও বিপদের সৃষ্টি করিবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ একটী সার্ব্বভৌম বিপ্লবের খোঁজ দিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বলভারত তাই চায় যুগপৎ সর্ব্বক্ষেত্রে বিপ্লব ছড়াইয়া দিতে—ধর্ম্মে, দর্শনে, ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে। উজ্জ্বলভারতের ইষ্ট তাই জড়-অজড় সমন্বয়মূর্ত্তি। বর্ত্তমানের সর্ব্ববিধ গ্লানির মূল রহিয়াছে জড় ও অজড়ের সঙ্ঘর্ষের মধ্যে। কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে গ্লানিগ্রস্ত জড়কে কেন্দ্র করিয়া, আবার কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে গ্লানিগ্রস্ত অজড়কে কেন্দ্র করিয়া। জড়াজড় সমন্বিত হইলে উভয় ক্ষেত্রের গ্লানি মুছিয়া যাইবে। তাই উজ্জ্বলভারত

সর্ব্ববাদবিবর্ত্তপ্রতিরূপশীল নর-নারায়ণের প্রতিষ্ঠা চায়। একান্ত নারায়ণ বা একান্ত নর বিশ্ব সমস্যার ষোল আনা সমাধান দিতে পারে না, যেমন পারে না একান্ত প্রজ্ঞা বা প্রাণ। প্রজ্ঞা সমাধান দিতে পারে জীবনের ভাব-অংশের, চৈতন্য-অংশের; আর প্রাণ দিতে পারে রস-অংশের, অচৈতন্য অংশের। নারায়ণের দৃষ্টি রহিয়াছে জীবনের ভাবুকতার উপর, তিনি উহাকেই পুষ্ট করেন। আর নরের ক্ষেত্র হইতেছে জীবনের রসের ক্ষেত্র, নর তাহাকেই বাড়াইতে পারে। এই প্রজ্ঞা-প্রাণ, এই নর-নারায়ণ একতনু না হইলে জীবনের একদিক উপবাসী থাকিবেই। যে-দিক উপবাসী থাকিবে, তাহাই শুষ্ক হইবে, গ্লানিগ্রস্ত হইবে। সর্ব্ব রোগের নিদান রহিয়াছে এইখানেই, এবং ইহার চিকিৎসাও করিতে হইবে এই দিক লক্ষ্য রাখিয়া।

তাই উজ্জ্বলভারত দ্বৈত-অদ্বৈত, আস্তিক-নাস্তিক প্রভৃতি পরস্পর বিরোধীর সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলিবে। সে অদ্বৈতবাদের উপর জোর দিয়া কখনও দ্বৈতবাদকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, বা দ্বৈতবাদকে বাড়াইয়া অদ্বৈতবাদকে ছোট করে নাই। শ্রীকৃষ্ণ 'চিৎ', তাই তিনি অদ্বৈত, শ্রীকৃষ্ণ 'অহম্ শৈলোঽস্মি' বলিয়াছেন বলিয়া তিনিই অচিৎ, জড়। আজ বিশ্বে এই চিৎ-অচিৎ সমন্বয় বা জড়-অজড় সমন্বয় দর্শন আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈতবাদ না অদ্বৈতবাদ? তিনি জীবন্ত সমন্বয়—তাঁহার মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ মৃত -ism-এ পরিণত হয় নাই। উজ্জ্বলভারত তাই শ্রীকৃষ্ণচরণ হইতেই তাহার যাত্রা সুরু করিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে এই দর্শনকে দার্শনিক ভাষায় উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন একমাত্র শ্রীনিত্যগোপাল। ব্রহ্মেরই মত মায়ারও নিত্যতা স্বীকার করিবার দুঃসাহস একমাত্র নিত্যগোপালেই দেখিয়াছি। তাঁহার মতে ব্রহ্ম যেমন অনাদি অনন্ত, মায়াও তেমনি অনাদি অনন্ত। তাই উজ্জ্বলভারত তাঁহার জীবনের গৌরবে ভরপুর হইয়া ঐ সমন্বয়ের আস্বাদনকে ছড়াইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাই উজ্জ্বলভারত তাঁহাকে তাহার সকল সত্তা দিয়া নমস্কার জানাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপকে বাস্তবজীবনে কার্য্যকরী করিবার বাস্তব পথের খোঁজ মহাত্মাজী দিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বলভারত বুঝি বা তাঁহার তিরোভাব দিনেই তাই তাহার যাত্রা সুরু করিয়াছিল। উজ্জ্বলভারত মহাত্মাজীর আশীর্ব্বাদ শিরে বহন করিয়া চলিবে।

সভাপতি মহাশয় উজ্জ্বলভারতের উন্নতির জন্ত যে দুই-একটী হিতবাক্য কহিয়াছেন, তাহার উপযোগিতা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি। এই সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, কতকটা কৈফিয়ত স্বরূপ তাহা আমি নিবেদন করিব। আনন্দ মানুষ চায় এবং যে কোনও দর্শন ও নীতি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াই দিতে হয়। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহা কাজে লাগানো হইতেছে, ইহাও খুব সত্য কথা। কিন্তু আমরা যে-আবেষ্টনের মধ্যে যে-দর্শন বলিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছি, তাহাও তো বুঝিয়া দেখিতে হইবে। অতি সহজ ভাষায় জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া আনন্দের পরিবেশে দিতে পারিলে যে পত্রিকার প্রসার বৃদ্ধি হইত, তাহাও আমরা বুঝি। কিন্তু উপায় নাই। ইহা বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্তের আশ্রয় নিব। আজ 'One world' গড়িয়া তুলিবার কথা উঠিয়াছে। 'One world'-এর কথা ছাড়িয়াই দিলাম, 'One-India'-র পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিতে হইলে কি বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা আলোচনা করিয়া আমি দেখাইব যে, উজ্জ্বলভারতকে জনসাধারণের স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে আরও অনেক সময় লাগিবে। 'এক-ভারত' সৃষ্টি করিতে হইলে প্রথমতঃ শঙ্কর-বুদ্ধের সমন্বয় দার্শনিক ভাবে সাধন করিতেই হইবে। অথচ ইহাদের মতবাদ পরস্পরস্পর্দ্ধী। শঙ্কর না হইলে ভারত চলে না, বুদ্ধকে বাদ দিলেও ভারত ভারত হয় না। কেহ কেহ বলিবেন, 'কেন আমরা তো বুদ্ধকে মানিয়া লইয়াছি, জাতীয় পতাকার মধ্যে পর্য্যন্ত অশোক-চক্রের স্থান দিয়াছি।' কিন্তু মানিলেই মানা হয় না। 'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় তো নাস্তিক' যখন বৈষ্ণবদের বেদতুল্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, তখন কি কোনও বৈষ্ণব প্রাণ খুলিয়া বৌদ্ধকে স্বীকার করিতে পারিবে? বাহিরের মিলনে, রাজনৈতিক মিলনে প্রাণের মিল হয় না। দার্শনিকভাবে ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। বুদ্ধদেব বলেন, 'ক্ষণিকেষু অপি একত্বাদি ভ্রান্তিঃ অবিদ্যা'। ক্ষণসমূহের মধ্যে একত্বাদিরূপ ভ্রান্তিই অবিদ্যা। পক্ষান্তরে শঙ্করাচার্য্য বলেন—একত্বদর্শনই বিদ্যা, বহুদর্শনই অবিদ্যা। বিদ্যা সম্বন্ধে এই পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কি করিয়া সামঞ্জস্য হইবে? আর সামঞ্জস্য না করিতে পারিলেই বা কি করিয়া বুদ্ধ-শঙ্কর সমন্বয়, 'One-India' গঠন সম্ভবপর হইবে?

উজ্জ্বলভারত যখন এই বুদ্ধ-শঙ্কর সমন্বয়ের কথা বলে, তখন সাধারণ লোক তো দূরের কথা, দার্শনিকবৃন্দও অঠাই জলে পড়েন। কেননা বুদ্ধ-শঙ্কর সমন্বয়

যে হইতে পারে, একথা আজ পর্যন্ত কেহ ধারণাও করেন নাই। এই ধারণার কথা যখন আমরা বলি, তখনই আমাদের লেখায় 'আড়ষ্ট' ভাব থাকে, তাই তাহা বুদ্ধিমানদেরও কাছে অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। যে গুরুতর বিষয় লইয়া আমরা চলিয়াছি, তাহার গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা ক্ষমা পাইবার যোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি। তবে ইহাকে যতদূর সহজ করা যায়, সেজন্য আমরা প্রাণপণ করিব। যাহারা বুদ্ধদর্শন জানে না, শঙ্করদর্শন জানে না, তাহাদের কেমন করিয়া বুদ্ধ-শঙ্কর সমন্বয় সহজ করিয়া বুঝাইব? আমাদের পত্রিকার আলোচনাকে তুলনা করিয়া বলিতে হইলে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ট্রেনিং-এর মত। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রথমে যেমন শিক্ষকদিগকেই নূতন ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত করা দরকার, তেমনি উজ্জ্বলভারত চায় এতদিনকার static দর্শনের ছাঁচে গঠিত দার্শনিকদের, সমাজপতিদের নূতন করিয়া বৈপ্লবিক দর্শনের সঙ্গে পরিচিত করাইতে। বর্তমান যুগের শিক্ষার বৈপ্লবিক দর্শনের সঙ্গে পরিচিত শিক্ষকগণই এই দর্শনকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিকে সক্ষম হইবেন। রামপ্রসাদ যখন গাহিলেন, 'ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত, কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত'; তাহার পূর্বে একদল মায়াবাদী দার্শনিক এই মতবাদকে একদল শিক্ষিতদের বুদ্ধির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহারা তখন মায়াবাদের ছাঁচে সাহিত্য লিখিলেন, কথকতা সৃষ্টি করিলেন, গান বাঁধিলেন। তখনই শুধু সেই মায়াবাদ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। জড়-অজড় সমন্বয়ও একদিন জনসাধারণ গ্রহণ করিবে। সেই দিনকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য উজ্জ্বলভারত সাহিত্যিক, কবি, লেখক আহ্বান করিতেছে, করিবে।

বিষয়বস্তুর দৈন্য আছে—সভাপতি মহাশয়ের এই উক্তিও সত্য। আমরা সর্বক্ষেত্রের সর্ব বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করি। আমাদের সামর্থ্য সর্বদিকে বিস্তার করিয়া দিবার মত হয় নাই বলিয়া সর্ব বিষয়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতে পারিয়া উঠি না। এই প্রবন্ধ সংগ্রহ বিষয়ে আমরা সকলের নিকট হইতে আরও অধিক পরিমাণে সহযোগিতা প্রার্থনা করি। আর জড়-অজড় সমন্বয়ের অনুকূল সাহিত্য, কবিতা, গান ও গল্প ছাড়া কোন ঐকদেশিক কিছু কি আমরা লইতে পারি? এইরূপ সমন্বয়-দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যিক, লেখক সৃষ্টি হউক, ইহাই আমাদের বাসনা। আনন্দ ছাড়া মানুষ কিছুই চায় না, কিন্তু জ্ঞানদর্শন ব্যতীত আনন্দ দিতে গেলে তাহাই কি জীবনের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হয়?

উজ্জ্বলভারতের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা ও সহানুভূতিশীল যাহারা এখানে অনুগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। উজ্জ্বলভারতের গতিপথে আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাইব, ইহাই আমাদের আশা রহিল। ঠাকুর উজ্জ্বলভারতের গতিপথ নিষ্কণ্টক করুন'।

ইহার পর সভাপতি মহাশয় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় উজ্জ্বলভারত পরিচালক-দের সৃজনীশক্তির কথা বারবার উল্লেখ করিয়া উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে উজ্জ্বলভারতকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য নানাবিষয়ক প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করিবার পথে সাহায্য করিবার কথা বলেন।

ইহার পর কিঞ্চিৎ জলযোগের পর প্রীতিসম্মেলনের পরিসমাপ্তি হয়। বন্দেমাতরম্

শিক্ষক ধর্ম্মঘট : শিক্ষক ধর্ম্মঘট আজ যে এই পরিণতি লাভ করিবে, তাহা তখনই বুঝা গিয়াছিল, যখন উহার সমর্থন করিয়া বাঙ্গলার বামপন্থী নেতৃবর্গ বড় বড় বিবৃতি দান করিতেছিলেন। শিক্ষক-ধর্ম্মঘটকে উপলক্ষ করিয়া গত মঙ্গলবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী বৈকালে কলিকাতার রাজপথ মৃতের রক্তে রঙ্গিন হইয়াছে। শিক্ষকদের দাবী ৩৫৲ টাকা ভাতা বৃদ্ধি। কিন্তু যাহাদের জীবনযাত্রা পবিত্রতার সঙ্গে যুক্ত থাকিবে বলিয়া এ দেশের সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়াছে, আজ তাঁহাদের এই ৩৫৲ টাকার দাবী এইরূপ ভাবে কলিকাতার রাজপথে রক্তরঞ্জিত হইবে, ইহা ভাবিতে শিহরিয়া উঠিতেছি। তাঁহাদের দাবী সঙ্গত ; কেননা সৎ শিক্ষকগণের দারিদ্র্য চির প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহারা যে-পথে এই অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা করিয়াছেন, সে পথ এ দেশের হিংস্র-আন্দোলনে নিযুক্ত শ্রমিকের পথ। মহাত্মাজী সত্যাগ্রহের কথা বলিয়াছিলেন। শিক্ষকগণ যদি কলিকাতার রাজপথ অবরুদ্ধ না করিয়া, ট্রামের রাস্তা না আটকাইয়া অবস্থান করিয়া পড়িয়া থাকিতেন, তবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, তাঁহাদের গৃহীত পথে পবিত্রতা রক্ষিত হইত, শিক্ষার প্রচেষ্টার সঙ্গে সত্যাগ্রহের সামঞ্জস্য হইত। কিন্তু প্রথমেই তাঁহারা আইন ভঙ্গ করিয়াছেন রাস্তায় লোকজনদের যাতায়াত পথ রুদ্ধ করিয়া, যাহার জন্য ঐ পথে ট্রাম চলাচল বন্ধ ছিল। ইহা হিংসারই রূপান্তর মাত্র। শিক্ষকদের গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে আরও অবহিত থাকা উচিত ছিল। সত্যাগ্রহীর পক্ষে চিন্তায় ও আচরণে অহিংস ও পবিত্র হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, একথা

তাঁহাদের জানা উচিত ছিল। তাঁহারা বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছেন, তাঁহাদের আন্দোলনের বিশুদ্ধতা আজ আর নাই। তাঁহারা রাজনৈতিক অভিসন্ধিপূর্ণ লোকদের হাতে যন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত না হইয়া তাঁহারা যদি এই আন্দোলন শুধু শিক্ষকদের দ্বারাই চালাইতেন, তবে ইহার পবিত্রতা রক্ষিত হইত। তাঁহারা যদি রাজপথ আটকাইয়া ট্রাম বন্ধ না করিয়া, বে-আইনী-কাজ দ্বারা জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি না করিয়া শুধু নিজেরাই দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা বরণ করিয়া উন্মুক্ত আকাশতলে দিনের পর দিন পড়িয়া থাকিবার কৃচ্ছ্রতাকে সহ্য করিয়া লইতেন, বামপন্থীদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই না রাখিতেন, তবে সমস্ত আন্দোলনের রূপই বদলাইয়া যাইত, শিক্ষকদেরও মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। তাঁহারা সমস্ত দোষ সরকারের উপর চাপাইলেও তাঁহাদের ৩৫৲ টাকা যে রক্তমলিন হইল, সে কথা মুছিয়া যাইবে না। এ পথে না গেলেও, মহাত্মাজীর পথ ধরিয়া চলিলেও ঐ টাকা আদায় হইত। অথচ পথ অবরোধকরারূপ হিংসার পথ প্রথম লওয়ার কলঙ্ক তাঁহাদের হইত না। বামপন্থী নেতৃবর্গ শিক্ষকদের ধর্ম্মঘট অহিংস থাকুক, ইহা চাহিতেই পারে না। তাহারা সর্ব্বদাই ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে যে কোন একটা ছুঁতায় কলিকাতায় অনাচার সৃষ্টি করিবার জন্য, শিক্ষকগণ তাহাদের সেই সুযোগ দিয়াছেন। কলিকাতায় যে অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আজ তাহাদের উপর বর্ত্তাইয়াছে। পুলিসের নিকট হইতে বাধা পাইবার সঙ্গে সঙ্গে যে আগুন জ্বলিল, ট্রাম পুড়িল, স্টেটবাস পুড়িল, ইহা কি সত্যাগ্রহ? গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আমাদিগকে ইহাই শিখাইতে চাহিয়াছিল যে, বিরুদ্ধ পক্ষের শত অত্যাচারও অসীম ধৈর্য্য ও অহিংসার সহিত সহিতে হয়—সত্যাগ্রহী মার খাইবে, মার দিবে না। শিক্ষকদের অন্ততঃ গান্ধীজীর এই অহিংসনীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত ছিল। সকলের পক্ষে সব পন্থা সাজে না—রাজনীতিক্ষেত্র এবং শিক্ষাক্ষেত্র এক নয়। বামপন্থীরা যে আগুন জ্বালাইবেই, তাহাদের সহিত হাত মিলাইবার আগেই শিক্ষকদের ইহা জানা উচিত ছিল। বামপন্থীরাই ইঁহাদের আন্দোলনের শক্তি ও গৌরবকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনীতির কুৎসিৎ আবর্ত্তকে জড়াইয়া ফেলিয়া এবং তাহারই মধ্যে ছাত্রসমাজকেও টানিয়া আনিয়া তাঁহারা নিজেদের মর্য্যাদা নিজেরাই নষ্ট করিয়াছেন। শিক্ষক ও শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যে-কিছু আন্দোলন করিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল, কিন্তু তাহার

পথ কি হইবে? এ বিষয়টা আরও ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহাদের কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল।

এই ঘটনাদ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল, তাহা কেবল ছাত্রসমাজের নৈতিক চরিত্রকেই স্পর্শ করিতেছে না, আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে যে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, এ কথা শিক্ষকগণ চিন্তা করিলেন না কেন? তাঁহারা এসেমব্লীর অধিবেশনের তারিখ লক্ষ্য রাখিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ সম্বন্ধে তাঁহারা সজাগ রহিলেন না! অর্থের বিনিময়ে তাঁহারা ছাত্রদের শিক্ষার প্রচুর ক্ষতি সাধন করিলেন। আমাদের ভয় হয় তাঁহাদের রাস্তায় ফেলিয়া রাখিয়া বামপন্থীগণ সরিয়া পড়িবে। তাই শিক্ষকগণ নিজেরা অগ্রসর হইয়া এই ঘটনার সমাধান করুন, ইহাই আমাদের তাঁহাদের নিকট নিবেদন। তাঁহারা তাঁহাদের পবিত্র শিক্ষা জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়াই তাঁহাদের চলার ধারা ঠিক করুন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে শিক্ষক ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে। তাঁহাদের এই সুবিবেচনার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। বন্দেমাতরম্

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

চৈত্র ১৩৬০

উজ্জ্বলভারত

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল *

রেণু মিত্র

বিশ্বের অখণ্ডত্বকে যে খণ্ডিত করে, দ্বিধাবিভক্ত করে, সে-ই অসুর। খণ্ডিত হওয়াই পাপবিদ্ধ হওয়া। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ দেবাসুর সংগ্রামের কাহিনীর মধ্য দিয়া অখণ্ডত্ব হননকারী এই অসুরের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নাসিকাধিষ্ঠাতা প্রাণ উদ্গাতৃরূপে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে অসুরদের দ্বারা তাহা পাপবিদ্ধ হইয়াছিল, খণ্ডিত হইয়াছিল। নাসিক্যপ্রাণের অখণ্ডত্ব নষ্ট হওয়ার জন্যই গন্ধধর্ম্ম সুগন্ধ ও কুগন্ধ এই দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেল। এই ভাবে পাপবিদ্ধ হওয়ায় সে জয়ী হইতে পারিল না। এমনি করিয়াই পরপর বাগিন্দ্রিয়, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন খণ্ডিত হইয়া পাপবিদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা কেহই অসুরের কাছে নিজেদের অখণ্ডত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। তাই অসুরকে জয় করিতেও তাহারা সমর্থ হয় নাই। দ্বিধাবিভক্ত বাক্ সত্য ও মিথ্যা উভয়ই বলে, একরকম সে বলে না; চক্ষু ভাল মন্দ দুই রকম দেখিয়া থাকে, সে-ও একরকম দেখে না। এমনি করিয়াই শ্রোত্র ভাল ও মন্দ দুই রকম শুনিয়া থাকে; আর কূটনীতি বিশারদ মনের স্বরূপই তো হইতেছে সংকল্প-বিকল্পাত্মক ভেদ ঘটান। নিজের মধ্যে নিজে যে খণ্ডিত হয়, সে জয় করিবে কাহাকে? এ জয়ের গৌরব আছে শুধু সেই মুখ্য প্রাণের, অখণ্ড যে প্রাণ কোন কিছুরই দ্বারা বিভক্ত হয় না, খণ্ডিত হয় না। এই মুখ্য

---

* আগামী ২৭শে চৈত্র বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত মহানির্ব্বাণ মঠে শ্রীনিত্যগোপালের শতবার্ষিকী উৎসব সাত দিন ধরিয়া উদ্‌যাপিত হইবে।

প্রাণ যখন উদ্গীথ গান করিল, অসুরেরা তাহাকে খণ্ডিত করিতে পারিল না। পাষাণের গায়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে উহা যেমন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, এই 'আখণ' প্রাণকে আঘাত করিতে আসিয়া অসুরেরা তেমনিভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এই প্রাণকে অন্যত্র 'মধ্যম প্রাণ'ও বলা হইয়াছে।

যে কোন পরাজয়ের পিছনে রহিয়াছে এই বিভক্ত হওয়ার, খণ্ডিত হওয়ার কাহিনী। মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টায় বাক্যের আশ্রয় লইয়া দেখিয়াছে—বাক্য বাক্যজাল সৃষ্টি করিয়াছে, সমাধানের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মনের দ্বারাই আজও বিশ্ব সংসার চালিত হইতেছে। মন কাহাকেও আপন কাহাকেও পর করিয়া তুলিয়াছে—কোথাও অখণ্ডত্ব রক্ষিত হইতে দেয় নাই—পরস্পর-বিরোধী ব্লক সৃষ্টি করিয়াই কাজ করিবার রীতি তাহার—ইহাই তাহার ধর্ম্ম। আজিকার দিনের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দিকে চাহিলে মনের কার্য্যকলাপের বহু দৃষ্টান্তই মিলিবে। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত বিশ্বের কোন সমস্যাই বাক্যের বোলচালে কিংবা বুদ্ধির মারপঁ্যাচে সমাধান লাভ করিতে পারে নাই।

নিজ কল্যাণলাভাসক্ত বাক্য বা মন কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই সঙ্ঘ গড়ে না, সঙ্ঘ গড়ে অপহতপাপ্মা মুখ্য প্রাণের আঠায়। বিশ্ব হইতে সঙ্ঘশক্তি মুছিয়া গিয়াছে বলিয়াই ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র বাদবিসম্বাদ এমন উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সংগ্রামশ্রান্ত বিশ্ব আজ ভিতরে ভিতরে একটা এক-বিশ্বের মিলন ক্ষেত্রের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। পারস্পরিক দ্বন্দ্বভূমি মনের স্তর হইতে বিশ্ব আজ প্রাণের সুশীতল তরুচ্ছায়ে আশ্রয় চায়। উপনিষদ্ বলিতেছেন, এই কোন বিশেষ আশ্রয়হীন মুখ্য প্রাণ সর্ব্বম্ভরি, সকলকে ভরণ করিয়াই নিজে তিনি বাঁচিয়া থাকেন—'তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি।'—মানুষ এই মুখ্য প্রাণ দ্বারা যাহা কিছু আহার করে, যাহা কিছু পান করে, তাহা দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়সমূহকে বাঁচাইয়া রাখে। আর অপর ইন্দ্রিয়গণ আত্মম্ভরি, নিজের বিশেষ স্থানে বাস করিয়া তাহারা প্রত্যেকে আত্মপোষণে রত। অথচ মুখ্য প্রাণ বাঁচিলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি বাঁচিতে পারে। সর্ব্বম্ভরি এই প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠও বটে—biologically এবং psychologically উভয়তঃই ইহা অপর সকল অপেক্ষা বড়। এই প্রাণ সর্ব্বান্ন—আ শ্বভ্যঃ আ শকুনিভ্যঃ (শকুনি হইতে কুকুর পর্য্যন্ত) প্রত্যেকের অন্নই এই প্রাণের অন্ন। এই প্রাণই সব কিছুকে নূতন

করিয়া তুলিয়া মৃত্যুর কবল হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতেছে। 'যদ্যপি এতৎ শুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াৎ জায়েরন্ এতস্মিন শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি ইতি'— যদি কেহ শুষ্ক স্থাণুতেও এই প্রাণদর্শন বলে, তবে সেখানেও শাখা জন্মাইবে ও পত্র পুষ্প গজাইয়া উঠিবে।

শুষ্ক স্থাণুবৎ পরিবার সমাজ রাষ্ট্রকে আজ এই প্রাণের সঞ্জীবনী স্পর্শে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। নিজেকেই বাঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া অন্যকে বাঁচাইয়া যে নিজেকে বাঁচায়, সেই প্রাণই বিশ্ব সঙ্ঘ গঠন করিতে সক্ষম। এই প্রাণই বিশ্বশান্তি আনিতে সক্ষম এবং ইহাই ভারতের বিশেষ দান। বিশ্ব আজ এই প্রাণকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

এই প্রাণকেই অঙ্গীকার করিয়া, স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় ১২৬১ সনের ১৩ই চৈত্র রবিবার বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে শ্রীনিত্যগোপাল আলোবাতাসের এই সুন্দর ধরণীতলে প্রকট হইয়া ছিলেন। বিশ্বের মননশক্তি ব্যর্থকাম হইয়া যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, বিশ্বের অগ্রগমন স্তব্ধ হইয়া যখন সে শূন্যের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সেই প্রলয় পয়োধি জলে অখণ্ড প্রাণের বেদ ও চরিত্র লইয়া নিত্যগোপাল আবির্ভূত হইলেন। কোনো একটা অবস্থা নিজের মধ্যে নিজে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে এবং তাহার পরবর্ত্তী পদক্ষেপ পরিবেশের মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতে খানিকটা সময় লাগে। এই প্রাণতত্ত্ব ও তাঁহার জীবন নিত্যগোপাল রাখিয়া গিয়াছেন অনেকদিন আগেই—কিন্তু আবেষ্টনের মধ্য দিয়া তাহার প্রয়োজন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে আজ। বিশ্বের এতদিনকার সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতির সব-isms-ই আজ আত্মম্ভরি ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—আজ প্রাণের স্নিগ্ধ শান্তি মানুষ চায়।

এই প্রাণের চলার পথের ধারাও নিত্যগোপালের জীবনের মধ্যে পাওয়া যাইবে। যাহা কিছু প্রাণের ধর্ম্ম তাঁহার জীবনে সে সকলেরই দৃষ্টান্ত মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণ সর্ব্বাত্ম, প্রাণে উচ্চনীচ শ্রেণীবিভাগ নাই, প্রাণ পরস্পর বিরোধী বা বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট বৃত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, প্রাণ প্রত্যেককে স্বয়ংমূল্যবান ও স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দিয়া অপরের সঙ্গে মিলিত হয়, প্রাণ পরকীয়। প্রাণের এই প্রত্যেকটী ধর্ম্ম শ্রীনিত্যগোপালে পাওয়া যাইবে। আশ্বভ্যঃ আ শকুনিভ্যঃ উক্তির দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে রহিয়াছে। কাদা, বেলপাতা বা দুর্ব্বার রস তাঁহার আহার্য্য ছিল অনেকদিনই। কুকুরের সঙ্গে

একপাতে আহার করিতেও তাঁহার কোন অসুবিধা হয় নাই। গুণ কর্ম্ম রস বা যে কোন ক্ষেত্রে সিঁড়িতন্ত্র প্রাণ মানে না। নিত্যগোপালও ইহাদের প্রত্যেকটীর বিভাগ স্বীকার করেন, কিন্তু দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ কাহারও উচ্চনীচ কৌলীন্য স্বীকার করেন না। বুদ্ধির দর্শন পরস্পর বিপরীতের একই সময়ে একই স্থানে অবস্থান স্বীকার করিতে পারে না। সে বলে হয় এটা, নয় ওটা; Law of Excluded Middle (নির্ম্মধ্যমনীতি)-এর ভাষায় ছাড়া সে কথা বলিতে পারে না। হয় আলো নয় অন্ধকার, হয় ভালো নয় মন্দ, হয় সাদা নয় কালো— বিশ্বটাকে এমন স্থুলভাগে বিভক্ত করা যায়ই না। পরস্পর বিপরীত মিলিয়াই জগতের সৃষ্টি—কেবল কাহার মধ্যে কোন্‌টা কত মাত্রায় আছে, তাহা দ্বারাই তাহার পরিচয়। আজিকার বিজ্ঞানের কথাও তাহা-ই—'A second difference......arises out of the philosophical practice of depicting the world entirely in black and white, and so ignoring all the halftones, gradualness and vagueness which figure so prominantly in our experience of the actual world. The obivious example of this is provided by the law of excluded middle, which has dominated formal logic with devastating result, from the time of Aristotle on. The law asserts that everything must be either A or not-A, whatever A may be. The scientist, on the otherhand, knowing that everything will generally possess some A-ness and some not-A-ness, is very little concerned as to whether an object is classed as A or not-A; what he wants to know is how much A-ness it possesses.'— Physics & Philosophy by James Jeans. কোনো জিনিষ সাদা কিংবা কালো বিজ্ঞানের মত প্রাণের কাছেও প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন জিনিষটা কতটা অর্থাৎ কি মাত্রায় সাদা কিংবা কালো। এই মাত্রাস্পর্শের কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন। এই প্রাণের তত্ত্ব লইয়াই শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন।

সেই সেদিনই বাংলাদেশের একজন মাত্র পুরুষ নিত্যগোপালকে চিনিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্যগোপাল যতদিন প্রকট ছিলেন ততদিন অত্যন্ত সযতনে পণ্ডিতকুলীনধনী এড়াইয়া চলিতেন। কাহারও কাছে তিনি

নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন নাই, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাঁহাকে জানিতেন। তাঁহারা যে মিলিত হইয়াই আসিয়াছিলেন একই সমন্বয়ের দুই অৰ্দ্ধেক দুইজনে বলিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যগোপালকে বলিয়াছিলেন, 'তুই এসেছিস, আমিও এসেছি।' সহজ সরল জীবনের সমন্বয়ের কথা নিজে বলিয়া জটিল কুটীল জীবনের, পরস্পর বিপরীতের সমন্বয়ের কথা বলিবার ভার শ্রীরামকৃষ্ণ রাখিয়া গেলেন শ্রীনিত্যগোপালের উপর। তাই তিনি নিত্যগোপালের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'ট্যাঁকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব।' সমস্ত বিপরীতের সমন্বয়মূর্ত্তি, প্রাণপ্রজ্ঞানঘন নিত্যগোপাল বিশ্বজীবনে জয়যুক্ত হউন।

এই চৈত্রমাসের বাসন্তী অষ্টমী শ্রীনিত্যগোপালের জন্মের শতবর্ষ আরম্ভ তিথি। স্বামী বিবেকানন্দকে নিত্যগোপাল একসময়ে বলিয়াছিলেন, 'বিলে, আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁথা মুড়ি দিয়েই যাব।' সত্যিই কাঁথা মুড়ি দিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। দেহযন্ত্রের মধ্যে অতি পরিচিত প্রাণ যেমন নিজের অস্তিত্বকে সর্ব্বদেহে লুকাইয়া রাখে, অতি পরিচিত প্রাণ-পুরুষ নিত্যগোপালও নিজের অস্তিত্বকে তেমনি করিয়া লুক্কায়িত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্রকাশ তিনি ও তাঁহার তত্ত্ব কালের প্রয়োজনেই মানুষের পরিচয়ের মধ্যে, ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িবেন। ঐকদেশিকতার শ্রমশ্রান্ত বিশ্বের পক্ষে আজ তাঁহার সামগ্রিক জীবনবাদ বড় প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পরিচয় ছড়াইয়া দিবার এই শতবার্ষিক উৎসব জয়যুক্ত হউক। তাঁহার জীবন ও দর্শন আমাদের জীবনকে সুস্থ ও স্বস্থ করুক, আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে ত্যাগে সর্ব্ব বৃত্তিতে বৃত্তিমান হইয়া সামগ্রিক জীবনধর্ম্মী হইয়া উঠি—তাঁহার এই জন্মবাসরে তাঁহার শ্রীচরণতলে ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আজ তিনি আমাদের সকল সত্তার প্রণাম গ্রহণ করুন।

———

যাত্রাগান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জয়দেব রায়

যাত্রার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে—যাত্রা লোকে ঠিক দেখ্‌ত না, আসলে যাত্রা গান শুন্‌ত ; দর্শন-ইন্দ্রিয়কে প্রাধান্য দেওয়া হ'ত না, আসলে শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করা হ'ত। সেজন্যে যাত্রাপালা-গুলোকে সাহিত্যের অঙ্গে ধরা হয় না, সঙ্গীতের ইতিহাসেই তাদের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। ক্রমে পরিবেষণ প্রণালীতে আধুনিকতা এলো। সঙ্গীতকে তো বাদ দিলে যাত্রার বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হয়ে যায়—কাজেই সে চেষ্টা না করেও অভিনয়কলারও প্রাধান্য দেওয়ার একটা চেষ্টা হয়। রসেরও ব্যতিক্রম হতে লাগ্‌ল, করুণরসের স্থান নিল ক্রমে বীররস। দেশের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও ইতিহাসের ছায়া পড়ল যাত্রাতেও ; স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণ-আন্দোলন, সমাজ সংস্কার, আইন অমান্য প্রভৃতির প্রভাব জন মনের পরিচায়ক এই আনন্দ বিতরণী আসর এড়াতে পারে নি। সরাসরি অবশ্য সেটার প্রকাশ সে সময়ের দেশের অবস্থার ফলে নাট্যাভিনয়ে প্রকাশ পেতে পারেনি, তবে করুণরসের পালার স্থান বীররসের যুদ্ধবহুল পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক পালা খুব সত্বরই দখল করে নিয়েছিল। কর্ণবধ, মেঘনাদবধ, যদুবংশধ্বংস, শক্রসিংহ, ধর্ম্মপরীক্ষা, বনবীর, প্রতাপসিংহ, কালাপাহাড়, কেদার রায় প্রভৃতি যাত্রার সমাদর হ'ল। উত্তর বঙ্গের মুকুন্দ দাসের রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে লেখা পালা তো ইংরেজ সরকারকে আইনের সাহায্যে রোধই করতে হয়েছিল।

অভিনেতাদের ব্যক্তিগত কলাকুশলতারও আদর দেওয়া হ'ল। আগে যাত্রায় যে ভীম সাজ্‌ত, সেই আবার পরের দিন সীতা সেজে নেমে পড়ত ; ক্রমে তাদের কলা চাতুর্য্যের দিকে নজর পড়্‌ল। দেখা গেল যে, এক একজন অভিনেতা এক একটি বিশেষ অঙ্গের ভূমিকাই চমৎকার ফুটাতে পারেন।

আগে স্ত্রীভূমিকা কিন্তু কোনদিনই মেয়েরা অভিনয় করত না। ছোট ছেলেরাই সাধারণতঃ সে অংশের রূপ দিত। কেবলমাত্র সে কারণেই যাত্রায়

কোনোদিন স্ত্রীভূমিকা সাফল্য অর্জ্জন করেনি। মেয়েরা অংশ গ্রহণ করলে রুচিবাতিক জনগণ যাত্রা হয়ত জোর করে উঠিয়ে দিত।

একটা কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীচৈতন্যের সময়ে কিন্তু যে সব যাত্রা হোত, তাতে অনেক সময়ে মেয়েরাই স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করত। রায় রামানন্দ নির্বিকার চিত্তে অভিনেত্রীদের তালিম দিতেন বলে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে।

যাত্রার জমজমাটের শেষ যুগে কয়েকজন স্ত্রীলোক নিজেরাও যাত্রার দল পরিচালনা করে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চন্দন নগরের মদন মাষ্টারের পুত্রবধূ একটি দল চালাতেন—সে দলের নামই ছিল 'বৌমাষ্টারের দল'। নবদ্বীপের নীলমণি কুণ্ডুর যাত্রার দলও তাঁর বউই আসলে চালাতেন, সে দলের নাম ছিল 'কুণ্ডুবউয়ের দল'। থিয়েটারের প্রথম যুগে যেমন অন্ত্যজ মেয়েরাই অংশ গ্রহণ করত, অনেক যাত্রার দলেও সে সময়ে তাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল বলে জানা যায়।

ক্রমে আর একটা দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। দেখা গেল একই গল্পের অভিনয় করছে বিভিন্ন দল, কিন্তু বিশেষ একটি দলই সাফল্য অর্জন করছে। অভিনয়, সঙ্গীত সব কিছুই ভালো হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো পালা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে। এর কারণ কবিত্বময় রচনা ও সংলাপের অস্বচ্ছতাই যে, তা' অধিকারীরা বুঝলেন। তখন ডাক এলো কবিদের, সুন্দর সুন্দর পালা রচনার আমন্ত্রণ গেল। যাত্রার জন্যে এক 'বিদ্যাসুন্দর' পালাই রচিত হয়েছিল শতাধিক, কিন্তু আদর পেল গোপাল উড়ের পালা; সে রকম এক একজন কবির এক একটি পালা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

তারপর সুরের বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করা হ'ল। উচ্চাঙ্গের কৌশলের গান—নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি রীতিমতো আসর জমাচ্ছে দেখে সে সব গানেরই আয়োজন করা হ'ল, কীর্ত্তনগানকে যাত্রার আসর থেকে একরকম বাদই দেওয়া হ'ল। অভিনেতাদের গান ছাড়া নেপথ্যে গানের ব্যবস্থা হ'ল। অর্কেষ্ট্রার বিশেষ উন্নতি করা হ'ল, নূতন বিলিতি বাজনা হারমোনিয়াম এবং ক্লারিওনেটকে দলে আনা গেল।

গান ছাড়া লোক মনোরঞ্জনের জন্যে যাত্রার আরো দুটি অনুষঙ্গ ছিল। তার মধ্যে একটি নাচ, আর একটি রঙ্গ-রসিকতা। যাত্রাদলের সবাইকেই নাচতে হয়, কেউ না নাচলে তার ভূমিকা হয়ে যেত নাকি আধুনিক

সমালোচনার ভাষায় প্রাণহীন! পাত্রপাত্রী তো অভিনয়ের সময়ে নাচ্‌তই, তা ছাড়াও একদল ছোট ছেলেমেয়েকে মাঝে মাঝে আসরে এসে নেচে যেতে হ'ত। পায়ে তাদের মলের ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ হ'ত বলেই সে সব নাচের গানের নাম হয় 'ঝুমুর'। পরবর্ত্তী সময়ে ঝুমুরের জন্যে পৃথক দলই তৈরী হয়ে যায়।

তার সঙ্গে ছিল রঙ্গরসিকতার ছড়াছড়ি! যাত্রার ভাঁড়ামির তো এক রকম প্রসিদ্ধিই আছে। সার্কাশের clown-এর মতো একদল সময় পেলেই আসরে এসে চূড়ান্ত ভাঁড়ামি করে যেত। বলা বাহুল্য এ সব রঙ্গরসিকতা অধিকাংশ সময়েই সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করত। যাত্রার সঙ-এর নাম ছিল মটরু, কেলুয়া ভলুয়া, মাসী কিংবা ভাঁড়। পাত্রপাত্রী makeup না করলেও এ সব সঙরা রঙ্‌চঙ্‌ মেখে কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার চেষ্টায় কসুর করত না। এ ছাড়া মুখোস প্রভৃতি লাগিয়ে যাত্রার আসরে নাচার জন্যে একটা পৃথক দল থাকৃত। এ ধরণের মুখোস নাচ তবে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত আছে।

যাত্রার আর একটা দল থাকে তাদের নাম 'জুড়ী'; এরা পাশ থেকে পাত্র-পাত্রীর গানের সঙ্গে ধূয়া দিত, আর দরকার হলে অবসর সময়ে যাত্রার মূল গল্পটাকে গান গেয়ে শ্রোতাদের শুনিয়ে দিত। চন্দন নগরের মদন মাষ্টার এই জুড়ী গানের প্রবর্ত্তক। প্রথম প্রথম কবি গানের সুর ভেঙ্গেই এই জুড়ী গান গাওয়া হ'ত।

আমাদের দেশের যাত্রার একটা ঐতিহাসিক back groundও আছে। আসলে যাত্রা কথাটার অর্থ হচ্ছে 'উৎসব'; মহাভারতের ঘোষযাত্রা কিংবা হরিবংশের বনযাত্রা প্রভৃতিতে ঐ অর্থই প্রয়োগ করা হয়েছে। ক্রমে উৎসবের প্রধান অঙ্গই দাঁড়ালো অভিনয়; ভবভূতির 'মালতী মাধব' নাটকে সেই অর্থই প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে। ঐতিহাসিক যুগে প্রথম যাত্রার দেখা মেলে গ্রীক পর্য্যটক 'মেগাস্থিনিসের ভারত ভ্রমণে'। তারপর থেকে প্রাচীন সাহিত্য এবং ইতিহাসে প্রচলিত অর্থে যাত্রার প্রয়োগ বহুবার হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেব তো ছিলেন যাত্রার বিশেষ অনুরাগী, চন্দ্রশেখর এবং শ্রীবাসের আঙ্গিনায় তিনি নিজে যাত্রায় অংশ গ্রহণ করতেন।—

বিজয় দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানর সৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে॥

হনুমান বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চাড়, ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহারে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্বলোক জয় জয় বলে বার বার॥
এই মত রামযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থান দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি॥　—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আগেই বলা হয়েছে তিন রকম যাত্রা সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল—কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা এবং শিবযাত্রা। কৃষ্ণযাত্রার প্রচলিত নাম ছিল 'কালিয় দমন'। শ্রীকৃষ্ণ নামাঙ্কিত যে কোনো পালাই ঐ নামে পরিচিত হ'ত।

কালিয়দমনের পালা অভিনয় করে সবচেয়ে নাম করেন কেন্দিলী গ্রামের শিশুরাম অধিকারী। ঢাকার কৃষ্ণকমল গোস্বামী কৃষ্ণযাত্রার পালায় অপূর্বতার সৃষ্টি করেন; তাঁর রাই উন্মাদিনী ছিল সুপ্রসিদ্ধ গীত-অভিনয়। তাঁর রচিত অন্যান্য প্রসিদ্ধ পালার মধ্যে নাম করতে হয়—স্বপ্নবিলাস, নন্দহরণ, সুরথ সংবাদ, ভরত মিলন, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি। তাঁর যাত্রার একটি বিখ্যাত গানের উল্লেখ করছি,—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন চিরতরে, বৃন্দাবন আজ অন্ধকার। যশোদা জননী ঘরে ঘরে তাঁর নীলমণিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সখা সুবলকে ব্যাকুল হয়ে শুধাচ্ছেন—

"ও সুবলরে! এ দুখিনী নয় কাঙ্গালিনী।
এখন আমায় চিনবিনে বাপ,
তোদের রাখাল রাজার আমি হই জননী।
সবে মাত্র জন, ছিল কৃষ্ণধন,
হারায়ে সে ধন, হইলেম কাঙ্গালিনী।
আর কি আছে বল, জানিস্‌নে সুবল;
এ জীবনের বল কেবল নীলকান্ত মণি॥"

কৃষ্ণযাত্রার অন্য প্রসিদ্ধ দল ছিল সুবল অধিকারী, লোচন অধিকারী এবং গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি। গোবিন্দ অধিকারী ছিলেন হুগলী জেলার লোক, তাঁর দলে তিনি দূতী সাজতেন। তাঁর শিষ্যদের অনেকে সে সময়ে খুব নাম করে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ দাস

প্রভৃতির নাম সুপ্রসিদ্ধ। রামলীলা নিয়ে যে সব পালার অভিনয় হ'ত সে গুলো 'রাম যাত্রা' নামে বিখ্যাত। প্রেমচাঁদ অধিকারী, বেণীমাধব, বর্ধমানের মতিলাল রায়, বিষ্ণুপুরের রামেশ্বর শর্মা প্রভৃতি রামযাত্রায় নাম করেছিলেন। রামযাত্রায় সাধারণতঃ সীতাহরণ, রাবণ বধ, ভরত মিলন, মায়ামৃগ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি অভিনীত হ'ত।

বিদ্যাসুন্দর পালার মতো কিন্তু অন্য কোনো পালাই এতো জমতো না। এ পালায় সবচেয়ে নাম কিনেছেন গোপাল উড়ে এবং ঠাকুরদাস দত্ত। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"গোপাল উড়ে এই দলে মালিনী সাজিয়াছিল। তার হাবভাব বিলাসে ও সুমধুর কণ্ঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। গোপাল উড়ে ছিলেন জোড়াসাঁকোর মল্লিক মহাশয়ের যুগপৎ ভৃত্যকে ভৃত্য, বয়স্যকে বয়স্য। স্ত্রীলোক সাজিলে কেহ তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না। ইহার দলের নামডাক খুব রটিয়াছিল। গোপাল উড়ের দলে উমেশ ও ভুলো গান করিত। প্রথমে রূপো, তারপর কাশী মালিনী সাজিত, ভুলো সাজিত বিদ্যা এবং উমেশ সাজিত সুন্দর।"

দক্ষযজ্ঞ ছিল শিব যাত্রার সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত পালা। চন্দন নগরের মদন মাষ্টার, ভূষণ দাস, যাদব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই শ্রেণীর পালায় নাম করেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র, প্রহ্লাদ চরিত্র এবং অভিমন্যু বধ ছিল সেকালের আরো তিনটি জনপ্রিয় যাত্রাভিনয়। পটল ডাঙ্গার নীল কমল সিং-এর প্রহ্লাদ চরিত্র, বর্দ্ধমানের লাউসেন বড়ালের হরিশ্চন্দ্র এবং কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারীর অভিমন্যু বধের পালা শুনতে দূর দূরান্ত থেকে লোক ভিড় করে আসত।

যাত্রার সঙ্গে কথকতা এবং পাঁচালীর বেশ সম্বন্ধ আছে। অনেক পাঁচালীকার আবার নিজের দল ছেড়ে যাত্রাদলে যোগ দিতেন, তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় ব্রজমোহন রায়ের। ব্রজমোহন রায়ের যাত্রার পালাগুলির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ—তারকাসুর বধ, সাবিত্রী সত্যবান, লক্ষ্মণ বর্জন, রামাভিষেক প্রভৃতি। ব্রজমোহনের পরে যাত্রার দল তাঁর ছোট ভাই গোপীমোহন রায় চালাতেন। মতিলাল রায়ের যাত্রাদলের নামটি বেশ গুরুগম্ভীর দেওয়া হয়েছিল—'নবদ্বীপ বঙ্গগীতাভিনয় সম্প্রদায়'। তাঁর প্রসিদ্ধ পালার মধ্যে নাম করতে হয়—ভীষ্মের শরশয্যা, ব্রজলীলা প্রভৃতির। মতিলালের যাত্রার একটু নিদর্শন দেওয়া যাচ্ছে—

অমরের সনে তোরা হলি যে সমরে জয়,
তা'ওত অমরের বলে বুঝ নাকি দুরাশয়।
আর না সয়, শত্রু নাশ না হয়, ন সংশয়, ন সংশয় ;
আজ বর্ম চর্মধরা দেহ কি   ধরা স্পর্শন

যাত্রার কোনো কোনো অংশ গান না করে বক্তৃতার দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় করানো হয়; এ অনেকটা কীর্ত্তনের আখরের মতো সুরাশ্রিত ব্যঞ্জনাও বটে। যাত্রার ভাষায় এ রকম অঙ্গের নাম করণ করা হয়েছে 'ঘটকালী'। এই ঘটকালীর দ্বারা যাত্রার এক অংশের সঙ্গে পরের অংশ গ্রথিত হ'ত।

থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে যাত্রার আদর কমে গেল, এভাবেই বাঙ্গালীর এক কালের অতিপরিচিত আসরের অবসান ঘট্‌ল।

আমার অলংকার

শান্তশীল দাশ

দুঃখ সে যে আমার অলংকার।
তোমার দেওয়া ব্যথার বোঝা,
নয় কো সে তো ভার।
দুঃখ যতই পাই জীবনে,
তোমায় স্মরি ততই মনে ;
দুঃখ বিনে প্রেমের পরশ
পেতাম না তোমার।
আঘাত তোমার জীবনে মোর
সে-যে পরম লাভ ;
দুঃখের সাথে হয় যে তোমার
নিত্য আবির্ভাব।
দিও আমায় দুখের বোঝা,
শেষ হবে মোর তোমায় খোঁজা,
দুঃখ নিয়ে তোমায় আমি
করবো যে আমার।

প্রাণপুরুষ শ্রীনিত্যগোপাল

প্রতিভা রায়

নানা ইষ্ট এবং নানা মতবাদের পরস্পর কাড়াকাড়িতে যেদিন ভারতবর্ষ গভীর তমসাচ্ছন্ন, তাহার সকল বৈশিষ্ট্য হারাইয়া যেদিন ডুবিতে বসিয়াছিল, সেইদিন প্রকৃতির সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে বুকে করিয়া নামিয়া আসিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ। তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিতর দিয়া, সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের ভিতর দিয়া, শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক করিবার জন্য শুনাইয়া ছিলেন সমন্বয়ের বাণী। কিন্তু কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, প্রভৃতি রূপের নিজস্ব মূল্য তাঁহারা স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা দিলেন অরূপের গৌরব।

কলিকাতা দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ী হইতে আবার এই সমন্বয়ের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করিয়াও কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম প্রভৃতি রূপের স্বয়ং মূল্য প্রদান করিলেন। এই স্থানে ব্রাহ্ম সমাজের সমন্বয় হইতে পরমহংসদেব সমন্বয়কে একস্তর আগাইয়া দিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের সমন্বয়ই আজ সর্ব্বত্র প্রচারিত। এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে সমন্বয় তো রামকৃষ্ণদেব দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে কলিকাতা মহানির্ব্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনিত্যগোপালদেব কোন্ সমন্বয় দিলেন? দুইজনই অবতার পুরুষ, দুইজনই সম সাময়িক, অথচ দুইজনই দিয়া গেলেন সমন্বয়। নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে কোন গূঢ় রহস্য, কিছু পার্থক্য আছেই।

সমন্বয়ের প্রথম অধ্যায় দিয়া গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। দ্বিতীয় অধ্যায় দিয়া গেলেন সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল। যখন শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান যে যার মতকে বলবৎ মনে করিয়া অন্য মতাবলম্বীকে স্বমতে আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এক ব্রহ্মময়ী মায়েরই যে সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরূপের ঘণীভূত মূর্ত্তিই এক ব্রহ্মরূপা মা, এই বাণী বিশ্ববাসীকে শুনাইলেন। কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, আল্লা, যীশু সবাই এক ব্রহ্মময়ী মায়ের বিভিন্ন মূর্ত্তির বিকাশ, অতএব বিশ্ববাসী তোমরা মত লইয়া

মারামারি কাটাকাটি করিও না। যত মত তত পথ, কিন্তু গন্তব্যস্থান একই। এই কথা বলিয়া তিনি ব্রহ্মরূপের মাঝে সমন্বয় বিধান করিলেন বটে কিন্তু পথের কোন নিজস্ব মূল্য বা গৌরব তিনি দিলেন না। এইস্থানে সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপালের প্রয়োজন রহিয়া গেল। পরমহংসদেব পথের কোন সমন্বয় দিলেন না, দিলেন গম্যস্থানের, তাই তাঁহার সমন্বয় সমন্বয়ের প্রথম অধ্যায়ের দিক দর্শন করিল। সকল পথের সমন্বয় করিয়া, সমন্বয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় দান করিলেন শ্রীনিত্যগোপাল। তিনি লিখিয়াছেন—'সমন্বয়। নিত্যানিত্য সমন্বয় বা আত্মানাত্ম সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার আকার নিরাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়।' শ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয় দিলেন সর্ব্ব-পথের, সর্ব্ব গম্য স্থানের, সর্ব্ব রূপের, সর্ব্ব নামের, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের। তিনি ছিলেন অখণ্ড মানুষ, সমগ্রের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, আস্তিক, নাস্তিক, বৌদ্ধ জৈনের সকল পথের সমমূল্য স্বীকার করিয়া যে সমন্বয়—সেই সর্ব্ব সমন্বয় স্থাপন করিবার দর্শন এবং জীবন রাখিয়া গিয়াছেন তিনি বিশ্ববাসীর সামনে।

গম্য এক, গমন পন্থা বহু, কালীঘাটের কালীবাড়ী এক, পথ তো বহু আছে, যে কোন পথ দিয়াই গেলেই মাকে দেখা যাইবে। মাকে দেখাই আমার প্রয়োজন, উহাই আমার মুখ্য, পথ আমার গৌণ। তাই পথের খবর দিয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই; তাড়াতাড়ি যেমন করিয়া হউক গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত। এই যে পথকে, ঘটনাকে বাদ দিবার মনোবৃত্তি নিয়া রওনা হইলাম, উহার ভিতরেই রহিয়া গেল জীবনের মস্ত ফাঁক এবং ফাঁকি। যেমন গম্য স্থানের নেশায় পথকে অস্বীকার করিয়া তাড়াতাড়ি গন্তব্য স্থানে যাইয়া পৌঁছিলাম, তেমনি এই অস্বীকারের ফলে পথের টানে শীঘ্রই আবার গন্তব্য স্থান ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়া রহিল।

শ্রীনিত্যগোপালের সমন্বয় সর্ব্বপথের সমন্বয়, শুধু গম্যস্থানের সমন্বয় নহে, পথ ও গম্যস্থান দুই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে যেখানে সেই সমন্বয় তিনি দিয়া গিয়াছেন। সকল জড়ের বুকে, সকল অচৈতন্যের বুকে অজড় ও চৈতন্যের মিলনবার্ত্তা শুনাইয়া ধরার গৌরব দান করিয়া গিয়াছেন শ্রীনিত্য-গোপাল। তাঁহার সমন্বয়ে জগৎ সত্য, ব্রহ্মের মতই সত্য। পথের সমন্বয় না দিলে জগৎ যে মিথ্যা ইহাই তো প্রমাণিত হয়, এখানেই তো আবার

মায়াবাদ আসিয়া দাঁড়ায়। পথের ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া পথকে মিথ্যা বলিয়া পথের ওপারে গন্তব্য স্থান—এই কথাই এতদিনের দর্শন শাস্ত্র বলিয়া আসিয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল দেবই পথ ও গন্তব্য স্থানের সমন্বয়ের এই অভিনব শাস্ত্র বর্ত্তমান জগতের সামনে রাখিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির লড়াইয়ে পথের মাঝে মানুষ শ্রান্তক্লান্ত দিশেহারা, দিশারী শ্রীনিত্যগোপাল এই মৃত বিশ্বের সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন তাঁহার পথ ও গম্যস্থানের সমন্বয়ের ভিতর দিয়া। সর্ব্বপথের সমন্বয়ের ভিতরেই জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির লড়াই মিটিয়া গিয়া, তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব গৌরব লইয়াই এক মিলনমঞ্চ গড়িয়া উঠিতে পারে। সর্ব্বপথের সমন্বয়েই বাস্তবের ক্ষেত্র এই জগত ব্রহ্মমূল্যে স্বীকৃত হয়। প্রাণঘন শ্রীনিত্যগোপালের জড়াজড় সমন্বয়ই খণ্ডিত বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান দান করিতে সক্ষম।

যখন আমাদের দেশে রেলগাড়ী ছিলনা, পুরীতে জগবন্ধু দেখিতে হইলে কিম্বা বৃন্দাবনে রাধাগোবিন্দ দেখিতে হইলে মানুষ হাঁটা পথে রওনা দিত, মাসের পর মাস তাহার পথ চলার ভিতর দিয়া তাহার গন্তব্য স্থান তাহার জীবনে নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসের সঞ্চার করিত। প্রতি পদক্ষেপে প্রিয়তমকে পাইবার লালসা তাহার জীবনের উদ্দাম গতিকে আকুলিত রসায়িত করিয়া তুলিত। বর্ত্তমানের আরামে রেলগাড়ীতে ঘুমাইয়া যে জগবন্ধু দর্শন করিতে গেল, তাহার যাওয়া আর পথ হাঁটিয়া যে গেল তাহার যাওয়া কি এক? পথই গন্তব্য স্থানকে গড়িয়া তোলে। পথ চলার সকল ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়া পথ চলার সকল আবেষ্টনের ভিতর পথিক যখন পলে পলে গন্তব্য স্থানের প্রিয়তমের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে করিতে চলে, তখনই পথের ফাঁকে ফাঁকে গন্তব্য আসিয়া ধরা দেয়, পথ আর গন্তব্য স্থান তখন এক হইয়া যায়। পথিক তখন অনন্ত পথে অনন্ত কাল চলিতে থাকে, তাহার পথের মোহ, গন্তব্য স্থানের মোহ আর থাকে না, তাহার জীবনে পথই গন্তব্য স্থান, গন্তব্য স্থানই পথ হইয়া যায়। তখনই মানুষ পথ ও গন্তব্য স্থানের হুড়াহুড়ি হইতে মুক্ত হয়।

'পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা,
আনন্দে তাই এক হলো তার পৌঁছানো আর চলা।'

দার্শনিক ভাষায় ইহাই দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয়। এই সমন্বয়ের ভিতর রহিয়াছে সকল সম্প্রদায়ের মুক্তি, এই মুক্তির মন্ত্রই লইয়া আসিয়াছিলেন

সমন্বয়ঘন শ্রীনিত্যগোপাল। তাঁহার সমন্বয় জড়-অজড়ের সমন্বয়, তাঁহার সমন্বয় চৈতন্য-অচৈতন্যের সমন্বয়। পথের সমন্বয় না দিলে, পথের গৌরব না দিলে, পথের মাঝে জড়-অচৈতন্য তাহার জড়ত্ব অচৈতন্যত্বের যে চাপ দিবে তাহার হাত এড়াইয়া অনন্তকালেও তাহার অজড়-চৈতন্যের সন্নিধানে পৌঁছাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিলেন 'নিত্যযুক্তা উপাসতে'; তাঁহার সহিত নিত্য যুক্ত থাকিয়াই অনন্ত উপাসনার পথে চলিতে হইবে। উপাস্য এক, উপাসনা বহু, গম্য স্থান এক, গম্য স্থানে পৌঁছিবার পথ বহু, এই এক ও বহুর ঝগড়া মিটাইয়া দিবার জন্যই শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়াছেন—'একই বহু এবং বহুই এক—এই প্রকার বোধ হইলে অভেদ বোধ ও প্রভেদ বোধ দুইই থাকে। আমি অভেদবাদীও বটে, প্রভেদবাদীও বটে'। আবার লিখিতেছেন—'আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবান্ এক ও বহুর অতীতও বটেন'। বহুর অতীত এক ইহাই আমরা এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজ শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীমুখের বাণী শুনিতেছি ভগবান প্রচলিত একবাদেরও অতীত। এক ব্রহ্ম এবং বহু প্রকৃতির সমন্বয় যে সুরে, যে বস্তুটীর ভিতর হইয়াছে সেই সুরই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সুর, সেই বস্তুই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই বলিতে পারেন 'সমগ্রং মাং বিজানত'।

শ্রীনিত্যগোপাল আর একস্থানে লিখিয়াছেন—'এক ব্যক্তি কখন হাসে, কখন কাঁদে। হাস্য ক্রন্দন পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ দুই যদি একাধারে থাকিতে পারে তবে দ্বৈতাদ্বৈতবাদই বা একাধারে থাকিতে পারিবে না কেন?'—সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার ৮৯ পৃষ্ঠা। শ্রীনিত্যগোপালই 'সর্ব্ব', তাই সর্ব্ব-পথের সমন্বয়ে যে গম্য স্থানের আস্বাদন, সেই আস্বাদন-কৌশলই তিনি শিখাইতে আসিয়াছেন। তাঁহার সমন্বয়ে এক ব্রহ্ম বহু প্রকৃতির বুকে অবতরণ করিয়া খণ্ড প্রকৃতির খণ্ড আমির কাঠিন্য তাঁহার প্রেমের পরশে গলাইয়া দিয়া অনন্ত ঝঞ্ঝাটময়ী খণ্ড প্রকৃতির প্রতি আবেষ্টনকে পরা প্রকৃতিতে গড়িয়া তুলিয়া তাহাদের পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া, সমন্বিত করিয়া এক মধুর রসময় লীলায় গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার জড়াজড় সমন্বয়। সর্ব্বপথের সমন্বয়ের ভিতরেই থাকে পথই ইষ্টরূপে, পথিকের গম্য স্থানকে সর্ব্বপথের সমন্বয়ের ভিতরে পথই গড়িয়া তুলিতেছে ইষ্টরূপে, তখনই হয় পথ চলার সার্থকতা, অফুরন্ত আনন্দ লইয়া অনন্ত পথ চলা। পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনার ভিতর দিয়া এবং তাঁহার লিখিত দর্শনের

ভিতর দিয়া বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ব পথহারা আমাদের সামনে সর্ব্বপথ সমন্বয়ের এক নূতন আলো রাখিয়া গিয়াছেন, তিনিই আমাদের জীবনের প্রাণপুরুষ। তিনি আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউন।

নারী

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

অনন্ত সৃষ্টির মূলে গরবিণী নারী,
হে বিশ্ব-নায়িকা, তুমি আনন্দ সঞ্চারি
অপূর্ব্ব কল্পনাজাল করিয়া বিস্তার
খেলিছ ভাবের খেলা রচিয়া সংসার
বিশ্ব-নায়কের সনে। বিলাসের লাগি,
আপন আনন্দে তৃপ্ত নির্লিপ্ত বিবাগী
উদাসী পুরুষে সুখে রাখিলে বাঁধিয়া
সোহাগে আদরে প্রেমে। যাচিয়া সাধিয়া
যতনে বসায়ে তারে হৃদয়-আসনে,
চুম্বনে চুম্বনে স্নেহে প্রণয়শাসনে
আলিঙ্গিয়া সর্ব্ব অঙ্গ, লীলারসভারে
অলিপ্তে করিয়া লিপ্ত প্রেমের সংসারে
প্রসবিলে চরাচর প্রাণস্পন্দে ভরা
লীলা-অভিনয়মঞ্চ—মূর্ত্ত বসুন্ধরা।
আপন মহিমা ভুলি, বিলাস-বিভোর
পুরুষ বরিল তব বন্ধনের ডোর
স্বেচ্ছায় সাদরে সুখে। যুগলে মিলিয়া
এ তিন ভুবন ভরি বেড়াও খেলিয়া
অনন্ত বিচিত্র বেশে—অর্দ্ধ-নারীনর
পুরুষ-প্রকৃতিরূপে, যুগ-যুগান্তর

স্বষ্টির অন্তরে গুপ্ত থাকি। সে অবধি
পুরুষ বন্ধন বরি ভ্রমে নিরবধি
মুগ্ধ জীবরূপে নিজ আনন্দ খুঁজিয়া
প্রকৃতির দ্বারে দীন ভিখারী সাজিয়া
প্রেমের পরশ মাগি। তাই ভ্রান্ত সুখে
তোমারে তুষিতে চায় পরম কৌতুকে
সাজাইয়া তব অঙ্গ কত-না যতনে
নিজ মনোমত ভাবে ভূষণে রতনে
তোমারি প্রেমের লাগি। তুমিও তাহারে
বাঁধিবারে বাহুপাশে ফির অভিসারে
নিত্য নব বেশ ধরি।

মিটিলে তিয়াষ,
শিথিল হইয়া যবে খসে মায়াপাশ
মোহনিদ্রা ত্যজি সুপ্ত জীব দেখে জাগি—
বিভিন্ন মূরতি মাত্র বিলাসের লাগি
স্ত্রী-পুরুষ ভাব ভেদে মাগিয়া মিলন
ত্রিসংসারে পরস্পরে করে আকর্ষণ
খেলিতে প্রেমের খেলা—লীলা-অভিনয় ;—
মূলে উভয়েই এক, দোঁহে ভিন্ন নয়।
টুটিলে বন্ধনডোর ঘুচিলে সংশয়
তখনি সে জানিবারে পারে সুনিশ্চয়,—
পুরুষেরি শক্তি তুমি, প্রকৃতি তাহারি—
আনন্দ-রূপিনী দৃপ্তা বিজয়িনী নারী।

———

'হাসুবানু'

গৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী

হাসুবানুতে প্রবোধবাবুর প্রধান চরিত্র তিনটি সার্থক সৃষ্টি। মীরার চরিত্রে আমরা পাই সনাতনী বাঙলা তথা ভারতবর্ষ। এরা একটা সরল পরিবেশ ধারণা করে নিয়ে উপর থেকে সমাজকে সংস্কার করতে চায়। পরিবেশ গঠনে এরা অসমর্থ এবং সেই জন্য তার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে না। এদের চিন্তাধারায় বাস্তবের কম্‌প্লেক্‌সিটির প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাস্তবকে যখন এরা ছক্‌কাটা পরিকল্পনার মধ্যে বাগ মানাতে পারে না তখন দোষ দেয় হয় যাদের নিয়ে কাজ করছে তাদের, আর নচেৎ ধরে-নেওয়া পরিবেশের অনুপস্থিতিকে। মীরার জীবনে হিরণ ছিল এমনি এক ধরে নেওয়া পরিবেশ। হাজিপুরের পরিবেশে তৈরী তার জীবন যাত্রার পরিকল্পনার যে ব্যতিক্রম কলকাতায় ঘটে, তার জন্য সে দোষ দেয় হিরণকেই '......আমাকে বেঁধে রাখোনি কেন তুমি ?' রিফর্মিষ্টের দল এই রকম বন্ধনের মধ্যেই কাজ করতে পারে।

হিরণের অভাবে মীরা শেষ পর্য্যন্তও দাঁড়াতে পারে নি। প্রবোধবাবু হিরণকে অর্থাৎ মীরার স্বপ্নময় রাজত্বে মীরাকে ফিরিয়ে এনে তবে বাঁচিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান সমস্যায় হিরণের ফিরে আসার নিশ্চয়তা কোথায়! গতিশীল ঘটনাবলীর সঙ্গে স্থিতিশীল চিন্তাধারার বিরোধ আজ প্রায় সর্ব্বত্রই প্রকট হয়ে উঠ্‌ছে।

হাসনুর মধ্যে আমরা ফিরে পাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের বাঙ্গালী বৈপ্লবিকদের। এরা ভাঙ্গার নেশাতেই মত্ত। এদের চিন্তাধারাতেও বাস্তবতার অভাব। ভাঙ্গা আর গড়া এ' দুটোকে এরা সম্পূর্ণ দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে ভাঙ্গার কাজটা শেষ করে গড়ার পথ পরিষ্কার করতে চায়। এদের উদ্দেশ্য মহান, কিন্তু চিন্তায় অবাস্তবতা। কেননা ভাঙ্গা আর গড়া কাজ দুটোকে চুলচেরা ভাগ করতে যাওয়া নিছক্ পাগলামি ছাড়া আর কি! এরা যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি খপ্ করে নিভে যায়।

কিন্তু হাসনু ছিল এদেরও কিছু উপরে। সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল পুর্ব্ববঙ্গের সমস্যাকে। হিন্দু বিতাড়ন ও করাচী-সভ্যতার আগমনকে লাভ ক্ষতির ছকে ফেলে হিসেব মেলাতে গিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানকে আজ যে সমস্যায় পড়তে হয়েছে, বুড়ো হারু মিঞা আর হাসনুর মুখ দিয়ে প্রবোধ বাবু তা' যথার্থভাবেই ব্যক্ত করেছেন। নিছক ভাঙ্গার মনোবৃত্তি খারাপ; কিন্তু সেই মনে যখন গভীরতর অনুভূতির সঞ্চারণ হয় তখনই সম্ভব নতুন করে ঢেলে-সাজা।

পুর্ব্ববঙ্গে এই সমস্যার অস্তিত্ব খুবই খাঁটি; কিন্তু এর ব্যাপকতা ও গভীরতার পরিমাপ এখন সম্ভব নয়। কেননা সেখানে সবার উপরে ছড়িয়ে আছে যাদুময় 'পাকিস্তান' শব্দটি। কয়েক শতাব্দীর লালিত বিষবৃক্ষের উৎপাটন কি এত চট্‌ করে সম্ভব হয়! তাই যে 'ছোড়দিকে' দেখামাত্র লোকে পাগল হয়ে যায়, তাকে খাবারের সঙ্গে বিষ দেওয়া হচ্ছে জেনেও কোনও দাঙ্গা বেঁধে ওঠে না। সমস্যার এই দিকটা উপন্যাসে চমৎকার ফুটে উঠেছে।

এরপর হচ্ছে হিরণ-চরিত্র। আমার নিজের ধারণা এই চরিত্রটী অঙ্কনেই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। হাসনুর কমরেড্‌ আবার মীরার সঞ্জীবনী —১৯০৫—'১০-এ বাংলায় গুপ্ত বিপ্লব আবার ১৯২০—'২১-এ নিষ্ক্রিয় প্রতি-রোধ ও লবণ তৈরী—বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সর্ব্বত্রই তুমুল আলোড়ন তুলেছে। বৃটিশ সিংহের টনক নড়াতে পেরেছে এই আত্মপ্রসাদের রসে আত্মহারা হয়েছে। হাসনুর খাপছাড়ামিতে ক্লান্ত হয়নি আবার ডুবে যাওয়া মীরার দিকে নিঃসঙ্কোচে বাড়িয়ে দিয়েছে বলিষ্ঠ হাত (অবশ্য প্রবোধবাবুকে নানাছলে হিরণের কাছে মীরার দৈহিক শুদ্ধতার প্রমাণ দিতে হয়েছে)। অরবিন্দ ও গান্ধী, গান্ধী ও দেশবন্ধু, গান্ধী ও সুভাষ এবং শেষকালে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট ও আরও সহস্ররকমের মতবাদ বাংলার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে যে লোফালুফি করেছেন এবং করছেন, হিরণের চরিত্র তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাহান্ন ইঞ্চি ফুলপেড়ে ধুতি আর হাটুভর্ত্তি ধুলো দু'টোই বাঙ্গালীতে সম্ভব।

বাঙ্গালী হিন্দুর দুর্দ্দশা, বাঙ্গালী মুসলমানের সমস্যা, ঘটনার গতিশীলতা কুটীলতা আর তার মধ্যে নিছক গঠনবাদী, নিছক ধ্বংসবাদী ও দিশাহারা কর্মীর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা—সমস্তই প্রবোধ বাবু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্চে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি নিয়ে। হাসনুর নিছক ধ্বংসবাদ বাঁচতে পারে না কাজেই তাকে মারতে হোল। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখলে, হাসনুর মধ্যে অনুভূতির যে বিরাট বেদনা ছিল—হামিদের মধ্যে যার ক্রমঃপ্রকাশ দেখা দিয়েছিল—তার মৃত্যু কি করে সম্ভব। বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে পাকিস্তানী শব্দের মোহ আর সত্যকার লাভক্ষতির হিসাবের যে বিরোধ অর্থাৎ ইয়াসিন ও হামিদের বিরোধে হামিদের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রবোধবাবু কি করে নিশ্চিত হলেন!

দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমি আগেই তুলেছি—হিরণের প্রত্যাবর্ত্তন। হাসনু একা বাঁচতে না পেরে মরে গেল কিন্তু সে হামিদকে বদলাতে পেরেছিল। মীরা তার একক জীবনে চুপ করে ত' রইলই না বরঞ্চ ডেকে আনলো আত্মনাশ। দুই বিভিন্ন প্রকৃতিতে ও মতবাদে দার্ঢ্যের এইই সবচেয়ে বড় তুলনা। যে না পারলো বিমলাক্ষকে বদলাতে বা নিজকে দৃঢ় রাখতে তাকে কেন প্রবোধবাবু বাঁচিয়ে তুললেন তা' বোঝা গেল না। আর সেই বাঁচিয়ে তুলতে গিয়ে হিরণকে ফিরিয়ে এনে তিনি এই মতবাদের দুর্ব্বলতাকে অধিকতর পরিস্ফুট করে দিয়েছেন। তারপর হিরণের ফিরে আসার বাস্তবতা। মীরাপন্থী লোকদের কাজ করাতে হিরণকে ফিরিয়ে আনার এই যে সর্ত্ত তার দায় আজ কে গ্রহণ করবে? আর গ্রহণ করলেও তার সম্ভাব্য কতটুকু?

হিরণ ও মীরার চোখের সামনে হামিদাবানুর তিল তিল মৃত্যু—দিশাহারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও রিফর্মিষ্টদের সম্মুখে বিপ্লবের সুপ্তবীজের পরিকল্পিত হত্যা সত্যই একটী আদর্শ। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে প্রবোধবাবুর হাসনু মীরার মিলন ঘটাবার প্রচেষ্টা নিয়ে। প্রথমত: হাসনুর মধ্যে মীরা যদিও বেঁচে থাকতে পারে, মীরার মধ্যে হাসনুর বাঁচা অসম্ভব। কারণ, যে বুঝতে পারছে যে সমাজের কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তনই প্রধান ও প্রথম কাজ, আর যার ধারণা উদ্বাস্তুদের সেবা করলেই জনগণের মধ্যে মিশে যাওয়া যায়—তাদের মিলন কি প্রকারে সম্ভব! দ্বিতীয়তঃ, হিরণ হয়েছে এদের মিলনসেতু। বড়ই নড়বড়ে। কারণ, শ্রমিক ও ধনিক সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি সব দলগুলোর ক্রমে দুইদলের যে কোন একদলে মিশে যাওয়ার যে মার্ক্সীয় ফর্মুলা, তার সত্যতা সম্বন্ধে এযুগের অনেকে যে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তা একেবারে মিথ্যে নয়। কেউ কেউ একথাও বলেন যে শ্রমিকদের সত্যকার মনোভাব হচ্ছে ক্রমে বুর্জোয়া হয়ে ওঠা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর ধ্বংসপ্রায় অর্থনৈতিক

কাঠামো সেখানকার মধ্যবিত্তশ্রেণীকে শ্রমিকে পরিবর্তন করতে পারে নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসন্তোষের ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আরব্যোপন্যাসের নাজী দানব।

প্রবোধবাবু বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন—নিছক্ গঠনবাদীদের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তার বর্তমান গতিপথ দেখিয়েছেন। কিন্তু হামিদাবানুর শেষ ইচ্ছার অছি করে তার গতিশীলতায় এনে দিয়েছেন এক প্রচ্ছন্ন অবাস্তবতা। যে বিপ্লবের অনুপ্রেরণা হামিদের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছিল, তার ধারক হতে গেলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আরও বহু অগ্নি রক্ত পরীক্ষায় নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে হবে। এটা খুব সত্য যে বাস্তব পরিবেশের পরিবর্তনের বহু পরে মানসিক স্তরে পরিবর্তন ঘটে। উভয় বাঙ্গলার উদ্‌গত সমস্যাকে তাদের খাঁটি পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে সমাধানের জন্য এগিয়ে যাওয়া সময় ও পুঙ্খানুপুঙ্খঃ প্রস্তুতি সাপেক্ষ। কিন্তু এখানে অতি চট করেই হিরণ ও মীরা হামিদাবানুকে হজম করে নিয়ে তাদের পূর্ব্বের পথেই এগিয়ে চললো।

ইতিহাসকে শুধু গতিশীল বললে সবটা বলা হয় না—ইতিহাস প্রগতিশীল। তার গতিতে অনেক বাধা আসে, অনেকসময় উল্টোমুখে চলতে সুরু করে। হাসনুর মৃত্যুই তার প্রমাণ—পাকিস্তানের চোরাবালিতে হারিয়ে গেল বিপ্লবের ধারা। কিন্তু ধারা হারিয়েই যায়, মরে যায় না—তা না হলে গতি আবার প্রগতিমুখী হয় কি করে। উপন্যাস যখন বাস্তবের ভিত্তিতে তৈরী হয় তখন তাতে পাওয়া যায় হয় ঘটনার পরিষ্কার ফটোগ্রাফ, আর না হয় ঘটনার গতিশীলতার মধ্যে প্রগতির লুকায়িত ধারার অনুসন্ধান। প্রবোধবাবুর উপন্যাসের ভিত্তি অত্যন্ত কঠোর বাস্তব—কিন্তু প্রগতির সুপ্তবীজ—ফল্গুধারা—হামিদের মৃত্যু ঘটিয়ে তিনি কিসের ইঙ্গিত করতে চান?

রাজনৈতিক দল ও ভূদান

আচার্য বিনোবা ভাবে

[পাটনায় কংগ্রেস কর্মীদের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ]

আমার নিকট বিভিন্ন দলের লোক আসিয়া মন খুলিয়া কথা বলেন, ইহা আমার সৌভাগ্য। আমি তাঁহাদের বলি যে, তাঁহাদের আত্মশুদ্ধিরও কার্যক্রম থাকা উচিত। এইরূপ কোন সংস্থা হইতে পারে না যেখানে লোভী, স্বার্থপর, দ্বেষপরায়ণ লোক আসিবে না। এই জন্য, বৃহৎ দলগুলির পক্ষে ত্যাগ করিবার কার্যক্রম থাকা উচিত।

শক্তি সঞ্চয়ের পথ

লোকেরা নিজ নিজ দলকে শক্তিশালী করিবার কথা বলেন। কিন্তু শক্তিশালীর অর্থ কি, ইহা কেহ চিন্তা করেন না। শুদ্ধিকরণ করিলেই শক্তি বাড়িবে। কিন্তু আজকাল শক্তির এই অর্থই হইতেছে যে, নিজের দলে যদি খারাপ লোক থাকে তবে তাহাদের রক্ষা করা আর অন্য দলে ভাল লোক থাকিলেও তাহাকে বিনাশ করিবার মনোবৃত্তি থাকে। এমন কি বিরোধী সংস্থায় দুর্জন থাকিলে আনন্দ হয়, কিন্তু সজ্জন ব্যক্তি থাকিলে দুঃখ হয়। ইহাতে হিংসার ভাব আছে। যে সকল সংস্থা আছে, তাহারা যদি গণতান্ত্রিক পথে নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে, তবে উহাতে আনন্দিত হওয়া উচিত। আমাদের এইরূপ বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে, বিরোধী সংস্থা শক্তিশালী ও পরিশুদ্ধ হইলে আমরা কিছুই হারাইব না, বরং উহা শুদ্ধ হইলে আমাদেরও শুদ্ধ হইবার প্রেরণা মিলিবে। কিন্তু ইহাই হইয়া থাকে যে, অন্য সংস্থায় শক্তি বৃদ্ধি হইলে নিজেদের শক্তি ক্ষুণ্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ তো হওয়া চাই যে, অপরকে শুদ্ধ দেখিব এবং নিজের সংস্থাকেও শুদ্ধ করিব। গণতন্ত্রে সংখ্যার প্রতি লোভ আছে। ইহাকে আমি সংখ্যারূপী অসুর বলিয়াছি। ইহা এরূপ হয় বলিয়া আমরা অবাঞ্ছনীয় লোকেদেরও গ্রহণ করি। যাহাই হউক, জানিয়া শুনিয়া যিনি এইরূপ করিবেন তিনি প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করিবেন। কিন্তু না জানিয়া এরূপ করা হইলেও যদি শুদ্ধিকরণের খেয়াল না থাকে তবে দল শক্তিশালী হইবে না।

ভূদানের সমান ভূমিকা

কংগ্রেসের পক্ষে শুদ্ধির অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রজা সমাজবাদীদের পক্ষেও তাহা প্রয়োজন। আর গঠনকর্মী বলিয়া যাহারা কথিত হন তাহাদেরও খুব প্রয়োজন। যদি কেহ এরূপ মনে করেন যে, তিনি চরখা কাটেন, মসলা খাওয়া ত্যাগ করিয়াছেন, পদব্রজে ভ্রমণ করেন তবে এজন্য তিনি শ্রেষ্ঠ, আর অন্যে সূতা কাটেন না বলিয়া তাঁহা অপেক্ষা হীন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার পতন হইয়াছে। সকল দলেই এরূপ ভয় আছে, কিন্তু গঠন-কর্মীদের মধ্যে এরূপ ভয় বেশী। কারণ তাঁহারা গান্ধীজীর বিশিষ্ট অনুগামী। গান্ধীজীকে বিশেষভাবে অনুসরণ করেন, এরূপ দাবি তাঁহারা করিতে পারেন, কিন্তু অহংকার প্রবেশ করিতে পারে। এজন্য শুদ্ধিকরণের আবশ্যকতা আছে। এরূপ বলার অর্থ ভূদানযজ্ঞের দ্বারাই উহা হইবে এবং সকলের শক্তি বাড়িবে। সকলের শক্তি বৃদ্ধি হইলে দেশেরও শক্তি বৃদ্ধি হইবে। মনে করুন আমার একটি দল আছে, উহার ১৫ সের শক্তি এবং আপনার দলের শক্তি হইল ৫ সের। তাহা হইলে দুইজনের মিলিয়া ২০ সের শক্তি হইল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে যদি দোষ ও পরশ্রীকাতরতার সৃষ্টি হয় এবং কোন সার্বজনীন ক্ষেত্র (কমন গ্রাউণ্ড) না পাওয়া যায় তবে, পরিণাম ইহাই হইবে যে, আমাদের মধ্যে সকল সময়ে সংঘর্ষ হইবে। কিছু লোক সংঘর্ষের তত্ত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু সংঘর্ষ হইলে ২০ সেরের স্থানে ৫ সের শক্তিই মিলিবে। অধিক শক্তিশালী দলের সম্মান হইবে কিন্তু মোট হিসাব করিলে দেশের ক্ষতিই হইবে। দেশের জয় উভয়েরই মিলন হইলেই হইবে। ইহা তখনই হইতে পারে যখন এরূপ কোন কার্যক্রম থাকিবে যাহাতে সকল দলের লোক এক হইয়া কাজ করিতে পারিবেন। আমার মনে হয় ভূদান সম্পর্কে সকল দোষারোপ হইয়া গিয়াছে, ভাবধারার পরীক্ষাও হইয়াছে, এবং সকলেই বুঝিয়াছেন যে, ইহা একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। এমন কি কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীগোপালনও বলিয়াছেন যে, যদিও ভূদানযজ্ঞের দ্বারা ভূমিসমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না, তথাপি তাঁহারা ইহার বিরোধিতা করিবেন না। যখন আমি তেলেঙ্গানায় ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন তাঁহারা এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাতে লেখা ছিল যে, এই ব্যক্তি কংগ্রেস অপেক্ষাও বেশী বিপজ্জনক। ইহাকে সত্য পুরুষের ন্যায়

দেখায় বটে কিন্তু ইহা আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। অতএব ইহার নিকট হইতে দূরে থাক! আমি তেলেগু ভাষা কিছু কিছু জানি। এই জন্য ঐ বিজ্ঞপ্তি আমি পড়িতে পারিয়াছিলাম। আমি এক সভায় বলিয়াছিলাম যে, আমি তাঁহাদেরও বন্ধু। তাঁহারা আমাকে শত্রু মনে করিতে পারেন কিন্তু একদিন আসিবে যখন তাঁহাদের স্পষ্টদর্শন হইবে এবং তাঁহাদেরও হৃদয় পরিবর্তন করিতে পারিব, এবং তাহা আমার চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই হইবে। দুই বৎসর পরে শ্রীগোপালন অন্য কথা বলিতেছেন। ইহা হৃদয় পরিবর্তনের উদাহরণ। আমি কম্যুনিষ্টদের বলিয়াছিলাম, আপনারা বুদ্ধি বদলাইতে চান না, মাথাই কাটিতে চান। আপনারা হৃদয় পরিবর্তন স্বীকার করেন না। আমি প্রশ্ন করি, মার্কস্ কি আপনাদিগকে মারিয়া কম্যুনিষ্ট করিয়াছেন? আপনারা তাঁহার পুস্তক পড়িয়াছেন এবং আপনাদের ভাবধারার পরিবর্তন হইয়াছে। আপনারা নিজেরাই তো হৃদয় পরিবর্ত্তনের উদাহরণ। ভাবধারার প্রতি আমার বিশ্বাস খুব আছে। ঈশ্বর কিছু এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা সাধুপুরুষকেও পরীক্ষা করেন। কিছু শুদ্ধ হৃদয়ের লোক আছেন। তাহাদের আমি ঈশ্বরের উপর সমর্পন করিয়া দিই। কিন্তু সাধারণ মানুষের হৃদয় পরিবর্তন হইতে পারে। এই কথা আমি কম্যুনিষ্টদের বলিয়াছিলাম। তাহার দর্শন শ্রীগোপালনের বলিবার পর আমার হইয়াছে।

কংগ্রেসেও কিছু লোক রহিয়াছেন, যাহারা মনে করেন যে, আমি কম্যুনিষ্টদের জন্য ক্ষেত্র তৈয়ারী করিতেছি। 'হিন্দু' (মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা) লিখিয়াছে যে, বড় বড় লোকেরা আমার গুণে মুগ্ধ হইয়া আমাকে সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু আমি সংবিধানের বিরোধী কাজ করিতেছি। সংবিধানে ব্যক্তিগত মালিকানার মান্যতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমি মালিকানার বিনাশ চাহিতেছি। অতএব আমি সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। এইরূপ চিন্তা করেন এমন লোকও কিছু আছেন। প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যদের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। তাঁহাদের ইহার উপর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু এখন তাঁহাদের মনোযোগ এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং নূতন বিবরণে তাহারা এইরূপ লিখিয়া দিয়াছেন যে, ভূমি বণ্টনের জন্য ভূমিদান যজ্ঞ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত কার্যক্রম। কিছু লোকের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়। হৃদয় পরিবর্তনের উদাহরণ হইলেন শ্রীগোপালন

আর চিন্তাধারার পরিবর্তনের উদাহরণ হইলেন প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যগণ। কংগ্রেস ও সমাজবাদিগণের মধ্যে এরূপ কিছু লোক আছেন। জয় প্রকাশজীর মত কেউ কেউ আছেন যাহারা বলেন যে, ভূদানের কাজে তো পুরাপুরি যোগ দেওয়া উচিত। কেহ কেহ এমন আছেন যাহারা বলেন যে, কাজ তো ভাল তবে ইহার এক নিজস্ব পদ্ধতি আছে। তাহারা সংঘর্ষ করিতে চান। তৃতীয় প্রকারের লোক আছেন, যাহারা মনে করেন যে এই কাজের দ্বারা কিছু হইবে না, তবে ইহার বিরোধিতা করিতে তাঁহারা চান না। এই ধরণের লোক খুব কম। যাহাদের হৃদয় পরিবর্তনের প্রয়োজন তাহাদের উহা হইতেছে আর যাহাদের ভাবধারা পরিবর্তনের প্রয়োজন তাহাদেরও হইতেছে।

পাক-আমেরিকা সম্পর্ক

আমেরিকার সহিত পাকিস্তানের যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে সাবধান হওয়া প্রয়োজন, এই বিষয়ে নিশ্চয় আপনাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা যদি কেবল সৈন্য বাড়াইতে থাকি তবে আমেরিকার তুলনায় তাহা কিছুই হইবে না। কিন্তু আমাদের 'ইনিসিয়েটিভ্' (আরম্ভশক্তি) থাকিবে না। ইহার অর্থ হইল এই যে, আমরা আমাদের দেশকে পাকিস্তানের হস্তে সমর্পন করিতেছি। পাকিস্তান ইচ্ছা করিলে আমাদের দুর্জন করিতে পারে আবার ইচ্ছা করিলে সজ্জনও করিতে পারে। পাকিস্তান ইচ্ছা করিলে দেশকে সবল অথবা দুর্বল করিতে পারে। সাবধানতার অর্থ হইল যে, সেনাশক্তি সম্পর্কে সরকারের যাহা করিবার উহা তাঁহারা করিবেন। উহাতে বেশী জোর দিবার নাই। আসল কথা হইল, দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি হওয়া চাই। বিদ্বেষও থাকিবে আর সঙ্কটের সময় এক হইতে চাহিবেন। আমি বলি, সঙ্কট আসিবার পূর্বেই সৌহার্দ্য রাখুন, এক থাকিলে ভয় কিসের? ভারতবর্ষের শক্তিবৃদ্ধির কথা আমরা চিন্তা করি। কিন্তু ইহা তখনই হইবে, যখন আমরা অসাম্য দূর করিব। আমাদের মধ্যে হরিজন প্রভৃতির যে বিভেদ তাহা দূর করিতে হইবে। ভূমিহীনদের নিজের করিয়া লইতে হইবে। এরূপ না করিয়া কেবল সৈন্য সামন্ত বাড়াইলেই ভারতবর্ষ বাঁচিবে বলিয়া যিনি মনে করেন, আমি বলি, তিনি রাজনীতির এ, বি, সি,ও জানেন না। আমাদের জাগ্রত হইতে হইবে। দলগুলির

মতভেদ কম করিতে হইবে। যদি আমরা কেবল সংকট দেখিয়া নিজেদের মতভেদ লুকাইয়া রাখি, তবে আমার মনে হয় এই যুগে এইভাবে আমাদের জয় হইবে না। আগেকার যুগে ছোট ছোট দলে যুদ্ধ হইত। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ রাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্রের সম্মুখীন হয়। কৃষককেও দেশের জন্য মরিতে হইবে। ষ্টালিনগ্রাডের জন্য ঐ স্থানের বহু কৃষক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। আমাদের দেশে কি সেরূপ হইবে? যে দেশের কৃষক শক্তিশালী সেই দেশও শক্তিশালী। এজন্য আমাদের দোষগুলি না লুকাইয়া তাহাদের সংশোধন করা উচিত। একজন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পাক আমেরিকার ঘটনায় লোকের মন অন্যদিকে যাইবে এবং ভূদানের কাজ কিছু কম হইবে। আমি বলিয়াছিলাম যে আমার মনে হয়, ভূদানকে শীঘ্র সফল করিতে লোকেরা চেষ্টা করিবে। আমি বলিতে পারি যে, ভূদানের দ্বারা এমন সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আমি গণিত হইতে এইকাজ শুরু করি নাই। তখন আমার কাছে গণিত ছিল না, যদিও আমি বলিয়াছিলাম যে, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার পর আমার শ্রদ্ধা গণিতের উপর অর্পিত আছে। আজ পর্যন্ত ইহার যতটা কাজ হইয়াছে তাহা কেবল অবসর সময়ে। এমন পরিস্থিতি দৃষ্ট হইয়াছে, লোকে দিবার জন্য প্রস্তুত। আমরা ইচ্ছা করিলে চারি মাসেই এই কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারি। এই বিরাট নির্বাচনপর্বও চারি মাসে সম্পূর্ণ হইয়াছে। বিশ্ববাসী আশ্চর্যান্বিত হইয়া যায় যে, এই বিরাট দেশে যেখানে অশিক্ষিত জনসংখ্যাও বিরাট, সেখানে এরূপ শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন কি ভাবে সম্পন্ন হইল। সকল লোক মিলিয়া যেভাবে চারি মাসেই ঐ কাজ শেষ করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, ঐ ভাবে আমরাও অন্ততঃ ভাবধারা প্রচারের কাজ চারি মাসে সম্পূর্ণ করিতে পারিব। (শ্রীভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক "ভূদানযজ্ঞ বিহার" হইতে অনূদিত)।*

———

* বাংলা 'ভূদানযজ্ঞ'—২রা ফাল্গুন, ১৩৬০ সংখ্যা হইতে গৃহীত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১০।১

(সপ্তম ও নবমাধ্যায়ে ভগবানের তত্ত্ব ও বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে; এখন যে যে পদার্থে তাহা ধরা যাইতে এবং জীবনের ক্ষেত্রে উহার পোষণময় জীবন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহাই বলিবার জন্য পূর্ব্বে উক্ত হইলেও দুর্জ্ঞেয়ত্ব নিবন্ধন পুনর্ব্বার বিস্তারিত ভাবে বলিতেছেন) ভূয়ঃ এব [পুনরায়] হে মহাবাহো শৃণু [শোন] মে [আমার] পরমং [উৎকৃষ্ট] বচঃ [নিরতিশয় বস্তুর প্রকাশক বাক্য] যৎ [যে পরম বাক্য] তে [তোমাকে] অহম্ প্রীয়মাণায় [আমার বাক্য সেইরূপ প্রীতিযুক্ত, যেমন অমৃত পান করিয়া লোক অতীব প্রীতিলাভ করে] (অতএব) বক্ষ্যামি [বলিব] হিতকাম্যয়া [হিতের ইচ্ছায়]।

শ্রীভগবান কহিলেন, হে মহাবাহো, মদ্‌বাক্যে প্রীতিযুক্ত তোমার কাছে হিতেচ্ছায় যে বাক্য আমি বলিব, সেই পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। ১০।১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ১০।২

(অন্য কেহও এই পরম বাক্য আমাকে বলিতে পারেন এবং তাহাতেই আমার জ্ঞান হইতে পারে, ভগবদ্বাক্যের প্রতি এইরূপ সংশয় জাগ্রত হইতে পারে মনে করিয়াই শ্রীভগবান বলিতেছেন) মে [আমায়] ন বিদুঃ [জানেন না] সুরগণাঃ [সুরগণ] প্রভবং [প্রভুশক্তির আতিশয্য অথবা উৎপত্তি] ন মহর্ষয় [মহর্ষিগণও জানেন না] হি [যেহেতু] অহম্ আদিঃ [আদি কারণ] দেবাণাং [দেবগণের] মহর্ষীণাং চ [এবং মহর্ষিগণের] সর্ব্বশঃ [সর্ব্ব প্রকারে]।

সুরগণ ও মহর্ষিগণ আমার প্রভাব ও উৎপত্তি অবগত নন, যেহেতু আমি দেব ও মহর্ষিগণের সর্ব্ব প্রকারে আদি কারণ।১০।২

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম্।

অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০।৩

(আরও) যঃ [যিনি] মাম্ [পুরুষোত্তম আমাকে] অজম্ [বহু দিব্য জন্মবান্, রাগ দ্বেষ স্তরের জন্মহীন, অজ] (যেহেতু) অনাদিং চ [এবং অনাদি; যাহার আদি কেহ নাই, যিনি সকলের আদি, তিনিই অনাদি] বেত্তি [জানেন] লোকমহেশ্বরম্ [লোক সমূহের মাধুর্য্যঘন পরম ঈশ্বর] অসংমূঢ়ঃ [সম্মোহবর্জ্জিত] সঃ [তিনি] মর্ত্ত্যেষু [মর্ত্ত্যগণের মধ্যে] সর্ব্ব-পাপৈঃ [জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত সকল প্রকার পাপ হইতে] প্রমুচ্যতে [মুক্ত হন]।

যে ব্যক্তি মোহপরবশ না হইয়া অজ, অনাদি, সর্ব্বলোকমহেশ্বর আমাকে জানেন, মর্ত্ত্যগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন। ১০।৩

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।

সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ১০।৪-৫

(নিজের লোকমহেশ্বরতা পরিস্ফুট করিতেছেন) বুদ্ধিঃ [সূক্ষ্মাদ্যর্থাববোধন-সামর্থ্য] জ্ঞানং [আত্মানাত্ম সমন্বয় বিষয়ক গুহ্যতম জ্ঞান] অসম্মোহঃ [বোধের যোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাকে তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করিয়াও জীবনে হজম করিয়া তাহাকে কার্য্যাত্মক রূপে ফুটাইয়া তুলিবার অব্যাকুল প্রবৃত্তিই অসম্মোহ] ক্ষমা [কেহ আক্রোশ বা তাড়না করিলে তাহাকে সেই কার্য্য হইতে বিরত হইবার উপযুক্ত ক্ষমতা বা শক্তিদানের কৌশল-প্রকাশক যে অবিকৃতচিত্ততা, তাহাই ক্ষমা] সত্যং [সত্যদর্শন; আত্মদৃষ্টি ও সর্ব্বভূত-দৃষ্টিতে যাহা সত্য, তাহাই পুরুষোত্তম দর্শনে বাস্তব সত্য] দমঃ [ইন্দ্রিয় সংযম] শমঃ [বুদ্ধির মন্নিষ্ঠতা—"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ] সুখং [মনস্তরের সুখদুঃখাত্যয়] দুঃখম্ [বাধনা লক্ষণ কামসুখাপেক্ষা] ভবঃ [উদ্ভব] অভাবঃ [তদ্বিপর্য্যয়] ভয়ং [দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ ত্রাস] অভয়ং এব চ [এবং অভয়] অহিংসা [প্রাণিগণের অপীড়া] সমতা [রাগদ্বেষাদি রাহিত্য, মিত্রামিত্রতুল্যতা, পরস্পর সমচিত্ততা] তুষ্টিঃ [লোভে স্বয়ংপূর্ণতা বুদ্ধি, সন্তোষ] তপঃ [কাম ত্যাগ, কৃচ্ছ্রাদি নয়] দানম্ ['দণ্ডন্যাসঃ পরঃ দানম্'] যশঃ [ধর্ম্ম নিমিত্ত কীর্ত্তি] অযশঃ [দুষ্ট কীর্ত্তি] ভবন্তি [উদিত হয়] ভাবাঃ [বুদ্ধি

জ্ঞানাদি এবং তদ্বিপরীত অবুদ্ধি অজ্ঞানাদি ভাব সমূহ] ভূতানাং [প্রাণিগণের] মত্তঃ এব [আত্মানাত্ম সমন্বিত পরমেশ্বর পুরুষোত্তম আমা হইতেই সম ও সাক্ষাৎ ভাবে] পৃথগ্‌বিধাঃ [পৃথক্ পৃথক্, গুণ কর্ম্মানুসারে নানাবিধ] (বুদ্ধি—অবুদ্ধি, জ্ঞান—অজ্ঞান, সুখ—দুঃখ, ভয়—অভয় ইত্যাদি সব ভাবই সম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষোত্তম হইতে উদ্ভূত। যাহারা দুঃখাদিকে মায়ার ভাগে ফেলিয়া সুখাদিকে ভগবানের গুণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চান, তাঁহারা গোড়াতেই দ্বন্দ্ব মোহে পড়িয়াছেন। মায়া যেন ব্রহ্মকে আড়াল করিবার জন্য, ভগবানের সর্ব্বকার্য্যে বাধা দিয়া পণ্ড করিবার জন্যই অশুচি দুঃখ প্রভৃতি সৃষ্টি করিতেছেন। আর ভগবান যেন সেই মায়াকে পরাস্ত করিয়া নিত্য নির্ম্মল বৈকুণ্ঠে বাস করিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন। কিন্তু মায়ার হাত হইতে তো তাঁহার নিত্য নির্ম্মল বৈকুণ্ঠও রেহাই পাইল না। সেখানেও সনকাদি ঋষিগণ উপস্থিত হইয়া এক ঝগড়ার সূত্রপাত করিলেন। ব্রহ্মকে একান্ত নির্ম্মলরূপে স্থাপন করিয়া, অশুচি-দুঃখ প্রভৃতিকে কোনও দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত শক্তির খেলা মনে করিয়া সৃষ্টির কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হয় নাই। অনাদি অথচ বিনাশশীল বলিয়া মায়াকে শুধু চাপা দেওয়া যায় মাত্র। ব্রহ্ম-মায়ার এই আত্মহত্যাকর লড়াইয়ের মধ্যে মূর্ত্তিমান দ্বন্দ্বসমাস পুরুষোত্তম বুদ্ধিকে এই দৈন্য ও পরাজয়ের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য একই অখণ্ড জীবনের দ্বিবিধ আস্বাদনরূপে, প্রাণ রূপে ও প্রজ্ঞা রূপে যোগের দিক ও মায়ার দিকের সমান মূল্য দিয়া নিজ সম দর্শন প্রচার করিলেন। অনিত্য, অবুদ্ধি, অজ্ঞান, দুঃখ, ভয় প্রভৃতির ভিতরে রহিয়াছে ভগবানের প্রাণ বা রস, আর বুদ্ধি, জ্ঞান, সুখ প্রভৃতির রহিয়াছে প্রজ্ঞা বা ভাব ; পরস্পর বিপরীত দ্বন্দ্ব সমন্বিত হইয়াই দিব্য অখণ্ড পুরুষোত্তম ভাব। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন, 'নিত্য জ্ঞানও ভাল, নিত্য অজ্ঞানও ভাল')।

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশ ও অযশ প্রাণিগণের এই সকল পৃথক পৃথক ভাব আমা হইতেই সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১০।৪-৫

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ১০।৬

(আরও) মহর্ষয়ঃ সপ্ত [মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সাত মহর্ষি] পূর্ব্বে [পূর্ব্ববর্ত্তী] চত্বারঃ [বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও

অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ চারি পুরুষ] মনবঃ তথা [সেইরূপ সায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, রৈবত চাক্ষুষ পূর্ব্ববর্ত্তী এই ছয় মনু। সপ্তম বৈবশ্বত মনুর যুগ বর্ত্তমানে চলিতেছে] (তাহারা) মদ্ভাবাঃ [মদ্ভাবনাপর] মনসাঃ [মনের দ্বারাই] জাতাঃ [উৎপন্ন হইয়াছে] যেষাং [মনু ও মহর্ষিগণের] লোকে [এই সৃষ্টি লোকে] ইমাঃ [স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সব] প্রজাঃ [প্রজা]।

আমার প্রতি ভাববিশিষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তর্ষি, বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এই চারি পুরুষ, সেইরূপ মনুগণ আমারই মন হইতে উৎপন্ন। এই লোকে এই প্রজা তাঁহাদেরই জাত। ১০।৬

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০।৭

এতাং [যথোক্ত এই] বিভূতিং (মায়াবিভূতি, বিস্তার ও শক্তি কেন্দ্র] যোগং চ [এবং যোগঃ ; মায়াবিভূতির সঙ্গে মূর্ত্তিমান 'পোষণ' আমার যোগ। এই মায়া ও যোগের মিলিত শক্তিই যোগমায়া, যাহা দ্বারা পুরুষোত্তম যোগ-মায়া সমাবৃত] মম [আমার] যঃ [যে জন] বেত্তি [জানেন] তত্ত্বতঃ [পুরুষোত্তম তত্ত্বদৃষ্টিতে] সঃ [তিনি] অবিকল্পেন [নির্ব্বিকল্প ; একান্ত মায়া বা একান্ত যোগ দুইই জীবকে বিকল্পের মাঝে নিক্ষেপ করে ; যোগমায়ার সমন্বয়ই অবিকল্প]। যোগেন (যোগদ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হন) ন অত্র সংশয়ঃ [এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই]।

যে ব্যক্তি আমার এই বিভূতি ও যোগ তত্ত্ব দৃষ্টিতে জানেন, তিনি অবিকল্প যোগ দ্বারা যুক্ত হন, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ১০।৭

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাম্ বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ১০।৮

(কীদৃশ অবিকল্প যোগ দ্বারা যুক্ত হয়, তাহাই বলা হইতেছে) অহম্ [পুরুষোত্তম আমি] সর্ব্বস্য [সর্ব্ব জগতের] প্রভবঃ [আদর্শগত উৎপত্তি স্থান] মত্তঃ [আমা হইতেই] সর্ব্বং [স্থিতিনাশ ক্রিয়াকলাপ ভোগ লক্ষণ বিবিধ রূপ সর্ব্ব জগৎ] প্রবর্ত্ততে [সহজ ভাবেই কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে স্বাধীন ভাবে প্রবৃত্ত হয়] ইতি [এইরূপ] মত্বা [মনে করিয়া] ভজন্তে [ভজনা করেন] মাং পুরুষোত্তম আমাকে] বুধা [অবগততত্ত্বার্থ] ভাব সমন্বিতাঃ [পুরুষোত্তম তত্ত্বে অভিনিবেশময় ভাব-প্রেম দ্বারা সমন্বিত, সম্যকরূপে অন্বিত অনুগত]।

আমি-পুরুষোত্তম সর্ব্বজগতের আদর্শগত উৎপত্তি স্থল ; আমা হইতেই সব-কিছু সহজ ভাবে প্রবর্ত্তিত হয়—ইহা মনে করিয়া বুধগণ প্রেম সমন্বিত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ১০।৮

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০।৯

(আরও) (প্রীতিপূর্ব্বক ভজনের কথা বলিতেছেন) মচ্চিত্তাঃ [আমাতেই চিত্ত যাহাদের] মদ্গতপ্রাণাঃ [মদ্গতজীবন, আমাকেই গত (প্রাপ্ত) হইয়াছে প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও স্পন্দনাত্মক দশ প্রাণ যাহাদের] বোধয়ন্তঃ [পরস্পরের বোধ জন্মাইয়া ; এই যোগ্যতাই ভক্তজীবনের বিশেষ ভাবে অনুশীলনের যোগ্য ; সংঘ রচনা করিয়া, বিশ্বনাগরিক জীবন যাপন করাই ভক্তজীবনের লক্ষ্য] কথয়ন্তঃ চ [এবং পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান মূলক কথাবার্ত্তা বলিয়া] মাং [জ্ঞান বলবীর্য্যাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট, লীলাবিগ্রহ, 'মণ্ডল মণ্ডণ', 'গো-গোপ সংঘাবৃত' আমাকে] নিত্যং [সর্ব্বকালে] তুষ্যন্তি [পরিতোষ প্রাপ্ত হন] রমন্তি চ [এবং প্রিয় সংগম দ্বারা রতি প্রাপ্ত হন]

মচ্চিত্ত, মদ্গতজীবন (সেই বুধগণ) পরস্পরের বোধ জাগ্রত করিয়া এবং আমারই গুণ কীর্ত্তনাদি করিয়া সর্ব্বকালে পারতোষ লাভ করেন এবং প্রিয় সংগম দ্বারা রতি অনুভব করেন। ১০।৯

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০

(প্রাণের টানে ভজনা করিলেও যে তাঁহাদের পক্ষে প্রজ্ঞালাভ সহজেই হয়, তাহাই বলিতেছেন) তেষাং [পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ভজনা করেন যাহারা, তাঁহাদের] সততযুক্তানাং [প্রাণের টানে সতত যুক্ত, নিত্যাভিযুক্ত] ভজতাং [ভজনাকারীদের] প্রীতিপূর্ব্বকম্ [যেমন করিয়া অহৈতুকী প্রীতি অর্থাৎ স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগ-অনুরাগ-ভাব-মহাভাবকে পূর্ব্বে রাখিয়া ভজন করা হয়, তেমন ভাবে] (প্রাণ প্রজ্ঞাঘন আমি) দদামি [প্রদান করি] বুদ্ধিযোগং [সমপ্রদর্শনময়ী বুদ্ধির সঙ্গে যোগ] তং [সেই] যেন [সমপ্রদর্শনলক্ষণ যে বুদ্ধিযোগ দ্বারা] মাম্ [প্রাণপ্রজ্ঞাঘন আমাকে] উপযান্তি [আমাকে অন্তরতম প্রদেশে অন্তরতম রূপে প্রাপ্ত হন, "আমি"ময় হন] তে [তাহারা] (বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ-যদহৈতুকম্—

'ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলে তাহাই বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান উৎপাদন করে)।

প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাকারী সেই সতত যুক্ত ভক্তগণকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহা দ্বারা আমাকে অন্তরতম রূপে প্রাপ্ত হন। ১০।১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১

(তোমাকে পাইবার প্রতিবন্ধ হেতু কিরূপ বস্তুর নাশক সেই বুদ্ধিযোগ তোমার ভক্তগণের মধ্যে কাহাকে কিসের জন্যই বা দান করিয়া থাক, এই আকাঙ্ক্ষার সমাধান করিয়া বলিতেছেন) তেষাং এব [তাহাদেরই ; তাহাদের কি প্রকারে মৎপ্রাপ্তি সহজও সম্ভব হইবে, এইরূপ ভাবনায়ই] অনুকম্পার্থং [অনুগ্রহ করিবার জন্য] অহম্ [আমি] অজ্ঞানজং [আমি-পুরুষোত্তম, আমার শক্তি ও শক্তিকার্য্য এই জগৎ সম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞানজনিত] তমঃ [অন্ধ মোহান্ধকার] নাশয়ামি [নাশ করি] আত্মভাবস্থঃ [আত্মার যে ভাবসমূহ, তাহাতে স্থিত হইয়া, দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সব-কিছুতে আত্মার যে সত্তা—স্বভাব—অভিপ্রায় রহিয়াছে, তাহাদের বুকে স্থিত হইয়া] (কিসের দ্বারা আঁধার নাশ কর ?) জ্ঞানদীপেন [আত্মানাত্মসমন্বয়-দর্শনরূপ জ্ঞানদীপ দ্বারা, যে জ্ঞানদীপের স্নেহ হইতেছে জ্ঞানজনিত প্রসাদ ; পুরুষোত্তমাভিনিবেশময় বায়ুদ্বারা সেই প্রদীপ চালিত হইয়াও অচঞ্চল রহিতেছে ; পুরুষোত্তমাচারের অনুবর্ত্তন-সংস্কার জনিত প্রজ্ঞাই সেই প্রদীপের সলিতা ; রাগদ্বেষ-স্তর হইতে বিরক্ত এবং পুরুষোত্তম স্তরে অনুরক্ত অন্তঃকরণই সেই দীপের আধার ; রাগদ্বেষ দ্বারা অকলুষিত চিত্তরূপই যে আবৃত গৃহ, সেই স্থানে সেই দীপ নিষ্কম্প ভাবে জ্বলিতে থাকে] ভাস্বতা [নিত্যপ্রবৃত্ত একাগ্রতারূপ ধ্যান দ্বারা জ্বলিত যে সমপ্রদর্শনরূপ ভাঃ, দীপ্তি আছে যাহার, এমন ভাস্বান্ জ্ঞানদীপদ্বারা]।

তাহাদের উপর অনুগ্রহার্থ আমি তাহাদের জীবনের সবটুকু আত্মায় স্থিত থাকিয়া তাহাদের মিথ্যাজনিত আঁধার দীপ্তিময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রদীপ দ্বারা নাশ করি। ১০।১১

ক্রমশঃ

দায়ী কে ?

ডাঃ জে, সি, মুখার্জী

মাণিক দাস, বয়স ২৭ কি ২৮ হবে, বেলগাছিয়া সরকার বাগানে একখানি পাকা ভিটের বস্তিবাড়ীতে থাকে। ভাড়া ৮৲ টাকা। ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর অপিসে ৪৫৲ টাকা মাইনেতে তার কাজ। মাট্রিকুলেশন পাশ করার পর পয়সাকড়ির অভাবে আর তার পড়ার সুযোগ হয়নি। একজন উকীলের বাড়ী আহার ও বাসস্থানের বিনিময়ে ছোট ছোট ছেলেকে পড়িয়ে অনেক চেষ্টা করেও আই. এ পাশ করা সম্ভব হয়নি। ছেলে দুটি একটু বড় হয়ে গেলে মাণিকের আর কাজ রইল না। তখন থেকেই জীবিকার অন্বেষণে তাকে ভাগ্য পরীক্ষা করতে বের হতে হল। কিছুদিন পর ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে ৩০৲ টাকা বেতনের একটী কাজ তার ভাগ্যে জুটেছিল। আত্মীয় স্বজন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠার ফলেই বোধ হয় মানিক বাধ্য হয়ে একটী বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার এ অল্প বেতন নিয়ে জীবনের সাধারণ গতিকে চালু রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। স্ত্রী কমলা স্বামীর ক্লান্ত অবসন্ন জীবনকে শান্তিময় করে তোলবার চেষ্টা করেও তেমন কিছু করে উঠতে পারে নি। কমলার নিজের কিছু করবার যোগ্যতা ছিল না, মাণিকের আয়ে বাড়ী ভাড়া দিয়ে কোন রকম ভাবে জীবনযাপন করেও একটী মাত্র শিশুর জামাকাপড় ও দুধ সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। আপিসের আগে পরে ছোটখাট যখন যা পায়, তেমন কিছু কাজ করেও অস্বচ্ছলতা দূর করা সম্ভব ছিল না। তার উপর এমনই দুর্ভাগ্য যে মাণিক পীড়িত হয়ে পড়ল। একে ক্লান্তি অবসাদ তার উপর এই অল্প জ্বরে অল্প দিনের মধ্যেই মাণিককে শয্যাগত হতে হল।

এমনই সময়ে আমাকে একদিন ঐ বস্তির পাশের বাড়ীতে একটী রোগী দেখতে যেতে হয়েছিল। তখন ঐ বস্তিবাড়ী থেকে তিনচারজন ভদ্রলোক

মাণিকের চিকিৎসা বিষয়ে আমার সাহায্য চাইলেন। আমিও পরিবারটীর সমূহ বিপদের কথা শুনে মাণিককে দেখতে গেলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম তার প্লুরেসী হয়েছে, মাণিকেরও সন্দেহ ঐরকমই ছিল। মাণিক আমাকে অনুরোধ করলে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে নেওয়ার জন্য। হাসপাতালে আজকালকার দিনে একটী স্থান সংগ্রহ করা খুবই কষ্ট। আবার স্থান পেলেও অনির্দিষ্ট কালের জন্য পাওয়া খুবই খরচ সাপেক্ষ। পারিবারিক ব্যবস্থা না করে মাণিক হাসপাতালে গিয়েও শান্তিতে চিকিৎসা করাতে পারবে না। ভেবে আমি দেশে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেই মাণিক কোন স্পষ্ট জবাব দিতে অসমর্থ হচ্ছিল। তা আমি জোর করে বলার পর কমলা এগিয়ে এসে বললে, আমি বলছি, শুনুন। যত যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন আর লুকোচুরী করে কি হবে। বলেই মাণিকের আশৈশব কাহিনী বিবৃত করলে।

মাণিকের পিতা ঘাটালের একটী বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চলে নাপিতের কাজ করতো। তার নাম ছিল ভরত। ভরত লেখাপড়া খুব কমই জানতো কিন্তু তার চাল চলন ব্যবহার খুব ভাল ছিল বলে স্থানীয় জমিদার বাড়ীর বাবুরা ভরতকে খুব ভাল চোখেই দেখতেন। মাণিকের যখন বয়স পাঁচছয়, তখন সে যেত বাবার সঙ্গে বাবুদের বাড়ীতে। বাবুরা এবং বাড়ীর মেয়েরা সবাই মাণিককে খুব স্নেহ করতেন—খাওয়া, দাওয়া, জামা, কাপড় পুজা ষষ্ঠী বিয়ে প্রভৃতিতে মাণিকের অনেক সময়ে বাবুদের ছেলেমেয়েদের মতই জুটতো। মাণিকের চেহারা ভাল ছিল এবং সে বুদ্ধিমান ছিল। বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে খেলা ধূলো করতো এবং ছেলেদের পড়াশুনার সময় মাণিকও মাষ্টারের পাশেই বসে থাকত। কিছুদিন পর মাষ্টার মশাই দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন যে তিনি তাঁর ছাত্রদের যা পড়াতেন, তা বাবুদের ছেলেদের আগেই মাণিকের শেখা ও মুখস্ত হয়ে যেত। বাবুদের বড় কর্ত্তা মাষ্টার মশায়ের কাছ থেকে এ খবর শুনে ভরতকে বললেন যে; তোর ছেলেটা তো বেশ চালাক আছে। বইটই ছাড়াই শুনে শুনে অনেক পড়া শিখছে। তা ওকে তুই স্কুলে ভর্ত্তি করে দে। ভরত কিন্তু আপত্তি করে ছিল। সে বলেছিল যে, লেখাপড়া শিখে বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে থেকে মাণিকের চালচলন বদলে গেলে তার মত গৃহস্থর পক্ষে মুস্কিল হবে। হলোও তাই। অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে মাণিক প্রথম হয়ে উঠেই তার চালচলন বদলে গেল। ভাল জামা ভাল কাপড়

চাইই। বাড়ীতে একরকম থাকতই না। বন্ধুদের বাড়ীতে বন্ধুদের সঙ্গে থেকে পড়াশুনা করে তার বাপের সঙ্গে তার ২।৩ তিন মাসেও দেখা হত না। ক্রমে বাপ ও ছেলের মধ্যে দূরত্বটা বাড়তে লাগল দেখে তার মা খুবই চেষ্টা করতো যাতে সেটা দূর হয়। একদিন মা খুব পীড়াপীড়ি করাতে মাণিকের মনের কথা বেরিয়ে পড়ল। সে বলে ফেলল, 'একটা নাপিতকে বাপ বলতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।' একথা শুনে মা খুবই আহত হন এবং ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম ছেড়ে কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়েন। এমন সময় ভরত বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে সব বিবরণ শুনলেন। সে দিন রাত্রিতে মাণিককে বেদম প্রহার দেন। মাণিক সেই রাতেই বাড়ী ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে এবং এই দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত তার বাড়ীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ হয় নি। সন্তানকে নিয়ে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে ভরত মৃত্যুর পূর্বে তার জায়গাজমি বাড়ীঘর যা কিছু ছিল, তা তার ভাইপোদের দিয়ে যান।

এদিকে মাণিক ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরে ফিরে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পৌছেছে। মাণিকের এই মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি বিবাহের পর কমলার পিতার সঙ্গেও বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। আজ মাণিক বাপ মা বাড়ীঘর হারিয়ে এমন কি শ্বশুরালয়ের সঙ্গেও বিভেদ সৃষ্টি করে যে বিপর্য্যস্ত হয়েছে, এর জন্যে দায়ী কে ?

মাণিকের জীবনের এই দুর্য্যোগের জন্য দায়ী মাণিক, তার পিতা, তার শিক্ষা, তার সামাজিক ব্যবস্থা—দায়ী সকলেই। পিতাকে ত্যাগ করার অধিকার মাণিকের ছিল না। কিন্তু নূতন শিক্ষা তাকে যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, তার সমাধান সে নিজেও করতে পারেনা, তার পিতাও পারে না। নাপিত বলে সমাজ তাকে যে সামাজিক সম্মান দিয়েছে, নূতন শিক্ষায় তাকে বরদাস্ত করে নেওয়া চলে না—সেখানে মানুষের মানুষ হিসাবে সম্মান পাওয়ার প্রাথমিক প্রাপ্যটুকুর জন্য মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু সে শিক্ষা এ শিক্ষা দেয় না যে, সমাজ যেখানে মানুষকে মানুষ হিসাবে সম্মান দেয় নি, সমাজকে সেখানে প্রতিবাদ জানিয়েও কি করে সেই সমাজকে সম্মান না দেওয়ার দৈন্য থেকে মুক্ত করা যায়। পিতাকে পরিত্যাগ করে এলে তা কেবল অর্থনৈতিক দুর্গতিই এনে দেয় না, তা যে মনস্তাত্ত্বিক বিপর্য্যয় ঘটায়, মাণিক তা জানবে কি করে ? তার পিতাই বা পুত্রের কাছ থেকে এতবড় অপমান আর দুঃখ সহ্য করবে কোন্ শিক্ষায় ? প্রহার

করা উচিত ছিল না, কিন্তু যা উচিত ছিল সেই ব্যবহার চালানর শিক্ষা তো ভরতের ছিল না।

তাই মাণিকের অনেক কিছু করার ছিল, ভরতেরও ছিল, গ্রামের জনসাধারণের ছিল আর ছিল সমাজের। আজ প্রত্যেককেই তার যা করার ছিল, তা শিক্ষা দিতে হবে। এর খানিকটা দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ব্যাপার—অর্থাৎ সমাজকে বদলে মানুষকে মানুষ হিসাবে সম্মান দেবার যে ব্যবস্থা করতেই হবে, সেটা সময়সাপেক্ষ। মাণিককে তার পিতা ত্যাগ না করবার শিক্ষাদেওয়াটা খানিকটা সহজ। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যখন বেশ একটা দলকে এইভাবে তার এতদিনকার চিন্তাধারা থেকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে, তখন শিক্ষাব্যবস্থার ভিতরে মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার ধারা এনে এই উপড়ে-পড়া ছাত্রদিগকে পিতা ও পিতার ভিটে ত্যাগ না করে পিতার কোলে থেকেই কি করে নিজেকে বদলান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, সে শিক্ষা দিতে হবে।

শব্দের কথা

শঙ্করপ্রসাদ বসু

পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের কাছে প্রথমে উদ্ভট, অসম্ভব বলে বোধ হয়। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—সব কিছুর না হোক, অনেক কিছু আপাতঃ অসম্ভব ব্যাপারের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা করা যেতে পারে।

আমার এক বন্ধুর পিসীমা একবার বলেছিলেন—"ওরে, তোরা হারমনিয়াম বন্ধ কর, আমার গরম হচ্ছে।" সে কথায় হাসির ধূম পড়েছিল—আমিও ছিলুম এবং হেসেওছি। কিন্তু আজকে বুঝেছি পিসীমার উক্ত কথায় হাসির প্রকৃত কারণ কিছু নেই ; অর্থাৎ কথাটা খুবই সত্য !

বহুকাল আগে, আকবরের সভায় বিখ্যাত গায়ক তানসেন নাকি দীপক রাগে আগুন ধরিয়ে দিতেন, আবার মেঘমল্লারের সুরে চতুর্দিকে বারিপাত ঘটিয়ে সে আগুন নির্বাপিত করতেন।

প্রায় দু-বছর আগে সংবাদপত্রে অনেকে দেখে থাকবে অনুরূপ আর একটি খবর। খবরটি হলো—গুজরাট অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হেতু স্থানীয় জনসাধারণ পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরকে গুজরাটে আমন্ত্রণ করেন—সঙ্গীতের সাহায্যে বারিপাত ঘটানোর আশায়! ওঙ্কারনাথজী শিষ্যসমভিব্যাহারে দিন তিনেক বিরামবিহীন রাগরাগিনী আলাপ করে চতুর্থ দিনে বারিপাত ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি, গান বাজনার মধ্য দিয়ে তান, লয়, মান প্রভৃতির সঠিক সমন্বয় ঘটলে আবহাওয়া উষ্ণতর হয়ে ওঠা সম্ভব। কিন্তু সুরের সঙ্গে উত্তাপের কি সম্বন্ধ! কি ভাবেই বা গানের সুরে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি করা যায়?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমাদের ছোট্ট একটুখানি আলোচনা করতে হবে—শব্দ কি ও শব্দ কি ভাবে সৃষ্ট হয়!

প্রথমেই বলে রাখি শব্দ একটা শক্তি! তাপশক্তি, আলোকশক্তির মত শব্দও শক্তির কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। আলোকরশ্মির মত শব্দও বাতাসের মধ্য দিয়ে ঢেউয়ের মারফৎ সঞ্চারিত হয়। তবে পার্থক্য একটু আছে। আলোক-তরঙ্গের জন্যে বাতাসের উপস্থিতি বাধারই সৃষ্টি করে—কিন্তু শব্দ-তরঙ্গের অভিন্ন বন্ধু বাতাস। বাতাস না থাকলে শব্দ-তরঙ্গ নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে—অর্থাৎ বায়ুশূন্য স্থানে আমরা কোন শব্দই শুনতে পাই না—তা চিৎকারই করি—আর অ্যাটম বোমাই ফেলি।

শব্দের গুণাগুণ অধিকাংশই আলোক আর তাপ শক্তির মত। অন্যান্য শক্তির মত শব্দও সঞ্চারিত হয় তরঙ্গ সৃষ্টি করে—একথা আগেই বলেছি। প্রতিফলন, প্রতিসরণ আলোকরশ্মির এই দুইটি সাধারণ গুণের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। শব্দ-তরঙ্গও এই নিয়মের অধীন। প্রতিধ্বনির যে সব কৌতুককর কাহিনী আমরা শুনি এবং যা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির মনে অশরীরীর উপস্থিতি সম্বন্ধে বিশ্বাস ধরিয়ে দেয়, সে সবই শব্দ-তরঙ্গের প্রতিফলনের ফলে ঘটে থাকে। ইটালির একটি গুহার সামনে দাঁড়িয়ে নাতিদীর্ঘ একটি কবিতা আবৃত্তি করে দেখা গেছে—আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে গুহা থেকে গম্ভীর স্বরে কেউ যেন সেই কবিতাটি আবৃত্তি করছে এবং ভয় না পেয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে সম্পূর্ণ কবিতাটি শোনা যাবে! লণ্ডনের "হুইস্‌পারিং গ্যালারী"তে বসে দর্শকদের পক্ষে অনুচ্চ স্বরে কথা বলায় বিপদ আছে। কারণ বক্তার

অস্ফুট কণ্ঠস্বর প্রতিফলনের সাহায্যে বহুগুণে শব্দায়মান হয়ে সকলেরই কর্ণগোচর হওয়ার সম্ভাবনা।

এখন শক্তিমাত্রেরই একটা বিশেষ ধর্ম এই যে, তার বিনাশ নেই! শক্তি সৃষ্টি করাও অসম্ভব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময়ে মোট যে পরিমাণ শক্তি সৃষ্ট হয়েছিল—আজও বলা যেতে পারে, চিরকালই সমুদয় শক্তির পরিমাণ সেই একই আছে এবং থাকবে! কথাটা এখন বুঝতে একটু দেরী হলেও বড় হয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে। তোমরা শুধু জেনে রাখ শক্তির বিনাশ নেই।

আমি জানি তোমরা প্রশ্ন তুলবে—একি কথা! তাপ-শক্তিকে তো হামেশাই দেখি বিনষ্ট হতে। জল গরম করে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়, অর্থাৎ তাপ নষ্ট হয়ে যায়। প্রতি মাসে লাইট, ফ্যান, রেডিও বাবদ আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করি ও তার দাম দিই—সেই বিদ্যুৎ কি আর ফিরে পাওয়া যায়? যতটা কারেন্ট খরচ হয় সে সবই তো নষ্ট হলো—ফুরিয়ে গেল।

তোমাদের এ প্রশ্নের উত্তরে বলব—নষ্ট হওয়া কথাটা আপেক্ষিক। সাধারণ হিসাবে জলের তাপ, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নষ্ট হলেও ফুরিয়ে যায়নি মোটেই! একটু লক্ষ্য করলে দেখবে—ঐ তাপ বা বিদ্যুৎ-শক্তি কেবল স্থান, আধার বা রূপ পরিবর্তন করেছে। কেটলির জল যখন ঠাণ্ডা হয়ে গেল—ঘরের আবহাওয়ার মধ্যে সেই জলের তাপ সঞ্চারিত হলো। আবার ওদিকে বিদ্যুৎ-শক্তি নষ্ট হলো বটে—তবে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তির বিকাশ ঘটলো অন্য-ভাবে—বিজলী বাতির আলোয়, ফ্যানের যান্ত্রিক শক্তি আর রেডিওর তাপ ও শব্দ শক্তির মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপায়িত হল মাত্র, ফুরিয়ে গেল না। তোমার হাতের হাতুড়ি দিয়ে একটা লোহা পিট্‌লে দেখবে, লোহাটা গরম হয়ে উঠেছে। এই উত্তাপ কোথা হতে এল?

ফুটবলের ব্লাডারের সিরিঞ্জের মারফৎ হাওয়া ভর্তি করতে করতে অন্যমনস্ক ভাবে তুমি সিরিঞ্জের মুখটা ধরেই মুখ বিকৃত করেছ কয়েকবার, নয় কি? তোমার অন্যমনস্কতার ফলে হাতে ছেঁকা লেগেছে—কেমন? কিন্তু তুমি কি ভেবেছ কখনো—কি করে এই উত্তাপ এলো?

লোহা পিটতে ও ফুটবলে হাওয়া ভর্তি করতে তোমার হাতের পরিশ্রম হয়েছে। সেই পরিশ্রম হলো যান্ত্রিক শক্তি। ঐ যান্ত্রিক শক্তি উপযুক্ত ক্ষেত্রে

আত্মপ্রকাশ করল তাপ-শক্তিতে। এক কথায়—তুমিই ঐ তাপের সৃষ্টিকর্তা!

শব্দের বেলাতেও ঠিক এই কথাই খাটে। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে—প্রথমে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই তাপ-শক্তিকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে আবার যান্ত্রিক ও রাসায়নিক শক্তিতেও রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এখানে একটা কথা বলে রাখি—সব শক্তিই পরিণামে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শব্দের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

আমরা শব্দের বিশিষ্ট গুণ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন শব্দ কি ভাবে সৃষ্ট হয় সে কথা জানতে পারলে—শব্দ-শক্তি থেকে তাপের সৃষ্টি কেমন করে ঘটে তা অনায়াসেই বুঝতে পারবো।

আমরা জানি শব্দ বিভিন্ন প্রকার। কোনও শব্দ শ্রুতিমধুর, কোনটি বা নিতান্তই বেসুরো কর্কশ। উঁচু, নীচু, একটানা, বিলম্বিত, দ্রুত, মোলায়েম, মধুর, কম্পিত, এসব শব্দ প্রায়ই শুনি। সাইরেনের প্রাণঘাতী শব্দ আর রেডিও শিল্পীর মনোমুগ্ধকর কণ্ঠস্বর—দুই-ই শব্দ, কিন্তু পার্থক্য কি ভয়ানক! তবে পার্থক্য যতই থাক, শব্দ সৃষ্টির গোড়ার কথা এক ও অদ্বিতীয়! কোনও দ্রব্যের দ্রুত স্পন্দনের ফলে বাতাসে যে তরঙ্গ সৃষ্ট হয়, সেই তরঙ্গসমষ্টি আমাদের কানের পর্দায় অনুরূপ স্পন্দন জাগিয়ে তোলে; ফলে শব্দ শ্রুত হয়।

কিন্তু কথা হচ্ছে, বস্তুর দ্রুত স্পন্দন ছাড়াও শব্দ-তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটতে পারে এমন স্থিতিস্থাপক বস্তুরও প্রয়োজন। বাতাস এমনি এক স্থিতিস্থাপক পদার্থ। তাই আমরা আগেই বলেছি—আলোকের পক্ষে বাতাস কিছুটা বাধারই সৃষ্টি করে; পক্ষান্তরে শব্দ-তরঙ্গের অভিন্ন বন্ধু এই বাতাস।

আমরা জানি সেতার কিংবা এস্রাজের তারে আঘাত করলেই একটা বিশেষ সুর ধ্বনিত হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—অঙ্গুলীর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তারের দ্রুত স্পন্দন ঘটে। অতি দ্রুত এই স্পন্দন বাতাসের মধ্যে একবার ঘন পরের বার হাল্কা, এই রকম অনেকগুলি ঢেউ তোলে। বাতাসের সেই ঢেউ স্থানচ্যুত না হয়েই যে আলোড়ন তোলে তার আঘাতে আমাদের কানের পর্দায় সেতারের তারের সেই স্পন্দনের অনুরূপ কম্পন জাগে। এই স্পন্দন কানের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থের মধ্যেও অনুরূপ আলোড়ন জাগায়। ফলে, মস্তিষ্কের মধ্যে শব্দ-সঙ্কেত উপলব্ধি হয়। শব্দের

গতি অত্যন্ত দ্রুত—সাধারণতঃ সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট হওয়ায় এই ব্যাপার ঘটতে এক সেকেণ্ডের একশ' ভাগেরও কম সময় লাগে। ফলে, সেতারে টঙ্কার দিলেই আমরা তার মধুর সুরে মুগ্ধ হই।

মানুষ যখন কথা বলে, গান গায় তখন তার গলায়, বুকে অথবা পিঠে হাত দিলে বা একটু লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়—অভ্যন্তরে কোথাও দ্রুত কম্পন সংঘটিত হচ্ছে। ব্যাঙের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে তার গলার দিকে লক্ষ্য করে দেখবে—গলার কাছটা দ্রুততালে কাঁপছে! মশার ডাক আমরা রোজ রাত্রেই শুনি; কিন্তু আমরা যা শুনি তা মশার ডাক নয় মোটেই—দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনের ফলে ঐ শব্দ সৃষ্ট হয়।

আমরা দেখেছি, আলো ও শব্দের একটা বিশেষ পার্থক্য। মহাশূন্যে আলোকের গতি স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু বায়বীয়, জলীয় বা কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আলোর গতি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। খোলা মাঠে রাত্রে যে টর্চের আলো দু'শো হাত দূরের বস্তুকে দৃষ্টির গোচরে আনে—পরিষ্কার পুকুরের জলে সেই আলোতে জলের মধ্যে মাত্র কয়েক হাত অবধি দেখা যাবে। আবার কঠিন পদার্থ হিসাবে একখানা খুব পাতলা খাতার কাগজ সেই আলোর সামনে ধরলে অপরদিকে মোটেই আলোর রশ্মি দেখা যাবে না—কাগজখানাই শুধু আলোকিত হবে।

শব্দ ঠিক এর বিপরীতধর্মী। বাতাসের মধ্যে শব্দের গতিবেগ, তরল পদার্থের মধ্যকার গতিবেগের প্রায় অর্ধেক ও কঠিন পদার্থের ভিতরের এর গতির চেয়ে প্রায় একচতুর্থাংশ মাত্র; অর্থাৎ বস্তু যত ঘন হবে—তার মধ্য দিয়ে শব্দের গতিও বেড়ে যাবে। আবার একেবারে শূন্যস্থানে—মহাব্যোমে—শব্দের গতি কিছু নেই; অর্থাৎ সেখানে শব্দের অচলাবস্থা!

আমরা দেখেছি, শব্দ সৃষ্টির জন্যে চাই দ্রুত স্পন্দনশীল উৎস (বস্তু) ও স্থিতিস্থাপক মাধ্যম (বাতাস, জল প্রভৃতি)। এখন উৎসটি যত দ্রুত স্পন্দিত হবে—বাতাসের মধ্যে ততই দ্রুত পর পর ঘন ও পাত্‌লা চাপের তরঙ্গ সৃষ্ট হবে। এই শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগের ফলে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, সেই শক্তি ক্রমশঃ তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। ফলে শব্দের সমাপ্তিতে তাপের আবির্ভাব ঘটা বিচিত্র নয়। অবশ্য বাতাসে আগুন জলে ওঠবার মত তাপের সৃষ্টি যে ঘটবেই, এমন কথা বলা যায় না; কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সঠিকভাবে রাগ-রাগিণীর আলাপজনিত সুর সংঘাতে

গায়কের নিজদেহ উত্তপ্ত হবেই এবং দর্শকবৃন্দেরও বেশ উত্তাপ অনুভূত হওয়া খুবই সম্ভব।

আরও একটি মজার কথা এই যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে সময়বিশেষে বিভিন্ন শব্দের সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ স্তব্ধতা সংঘটিত হতে পারে। 'আবোল তাবোল' বইটিতে ৺সুকুমার রায় বলেছেন—

"আলোয় ঢাকা অন্ধকার
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।"

কথাগুলি সত্যই আজগুবি নয়। দুটি অলোকরশ্মিকে বিশেষ অবস্থায় একত্রীভূত করে জোরালো আলোর বদলে একেবারে অন্ধকার সৃষ্টি করা সম্ভব। অনুরূপভাবে, দুটি শব্দের ঢেউকে বিশেষ অবস্থায় এক করে স্তব্ধতার সৃষ্টি করা যায়—এটি বৈজ্ঞানিক সত্য। তাছাড়া এমন শব্দ আছে যাতে মোটেই আওয়াজ হয় না; অর্থাৎ যে শব্দের কোনও শব্দ নেই! কথাটা হঠাৎ শুনতে অদ্ভুত নয় কি? কিন্তু তোমরা এতক্ষণে দেখেছ—বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা অনেক কিছু রহস্যময়, তথাকথিত অসম্ভব, অদ্ভুত ব্যাপারের সহজ ব্যাখ্যা করতে পারি! ধ্বনির এবম্বিধ আরও অনেক বৈচিত্র্য আছে যা খুবই বিস্ময়কর; কিন্তু শিক্ষাপ্রদ!

'শব্দের কথা' প্রবন্ধটী জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৬ষ্ঠ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা—ডিসেম্বর ১৯৫৩ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সাময়িকী

পাকিস্থান ও পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ নির্ব্বাচন : পাকিস্থান মুসলীম লীগের সৃষ্টি। ইহা গড়িয়া উঠিয়াছিল হিন্দু-মুসলিম এই দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর। মুসলিম লীগ সৃষ্ট এই পাকিস্থানকে পাকা-পোক্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল পাশপোর্ট ও ভিসা, প্রয়োজন হইয়া পড়িল ভারত-ইউনিয়ন হইতে মুদ্রাহার বিষয়ে ব্যতিক্রম, আরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল বাঙ্গলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত করার। যদি হিন্দু-মুসলমানকে যাতায়াতের মধ্য দিয়া পৃথক্ করিয়া না ফেলা যায়, অর্থাৎ ভূগোলকে যদি স্বীকার করা না যায়, তবে পাকিস্থান-গঠন সম্পূর্ণ হয় না। যদি একই ভাষায় পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান কথা নয়, তবে যোগসূত্র থাকিয়া যায়, অর্থের বিনিময় যদি সহজ সফল হয় তবে তাহাতেও হিন্দু-মুসলমানের যোগসূত্র থাকিয়া যায়—মুসলিম লীগের এই ব্যবস্থা মূলে তাহাদিগের দিক হইতে যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমানকে যদি দুই জাতিতে পরিবর্ত্তন করিবার কাহারও প্রয়োজন হয়, তবে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে বলিবার কিছু থাকে না। যদিও এই ব্যবস্থাগুলি বাঙ্গলার ইতিহাস ও ভূগোল আদৌ অনুমোদন করে না। ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। ইতিহাস ও ভূগোলের বিরুদ্ধে চলিবার ক্ষমতা যে পাকিস্থানের নাই, তাহা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আজ পূর্ব্ব পাকিস্থানের মধ্যেই পাকিস্থানস্রষ্টা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একদল প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান সৃষ্ট হইয়াছে। আজ পূর্ব্ব বঙ্গে মুসলিম জনসাধারণ মুসলিম লীগওয়ালাদের বিরুদ্ধে। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থিগণ এমন ভাবে যুক্তফ্রন্টের কাছে মার খাইয়াছে যে, ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টী নাই। ২৩শে মার্চ্চ রাত্রি পর্য্যন্ত ২৩৭টী মুসলমান আসনের মধ্যে যুক্ত ফ্রন্ট ২০৬টী ও মুসলিম লীগ মাত্র আটটী আসন দখল করিয়াছে। যুক্ত ফ্রন্টের নেতৃবর্গ—মৌলভী ফজলুল হক, জনাব সুরাবর্দ্দি ও মৌলানা ভাসানী নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাহাদের দল নির্ব্বাচিত হইলে পাশপোর্ট-ভিসা তুলিয়া দিবেন, বাঙ্গলা ভাষাকে

পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবেন, পূর্ব্ব-পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করিবেন। অর্থাৎ পাকিস্থানকে কায়েম করিবার পথে মুসলিম লীগের যাবতীয় ব্যবস্থা তুলিয়া দিবেন। কিন্তু 'পাকিস্থান'-রক্ষা সম্বন্ধে তাঁহারা দুই দলই একমত।

দ্বিজাতিতত্ত্বই ছিল মুসলিম লীগের আখট। এই জিদকে রূপায়িত করিবার জন্য তাহার পক্ষে অনিবার্য ছিল 'direct-action'। যুক্তিযুক্ত যাহা, তাহা পাইবার জন্য পারস্পরিক আলোচনা ও অহিংস পন্থাই যথেষ্ট। মানুষের অন্যায় জিদ পূরণের জন্যই প্রয়োজন হয় হিংসার। হিংসার পথে পাওয়া গিয়াছিল যে পাকিস্থান, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যও মুসলিম লীগ প্রবর্ত্তন করিয়াছিল এমন সব হিংসাত্মক পন্থা, যাহার ফলে জনসাধারণ এমনই উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে পাশপোর্ট ও ভিসা করিতে হয়, বাঙ্গালা ভাষাকে বাদ দিতে হয়, দুই রাজ্যের অর্থের 'মান' ভিন্ন করিতেই হয়, পারতপক্ষে ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে বানিজ্যের যোগ না রাখাই কর্ত্তব্য হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। পূর্ব্ববঙ্গে যাতায়াত সীমাবদ্ধ হওয়ায়, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যোগ ছিন্ন হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান চরম দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে। জিদের পথ ধরিয়া চলিলে এই দুর্দ্দশাই হয়। দ্বিজাতিতত্ত্ব লইয়া জিদ, পাশপোর্ট লইয়া জিদ, উর্দ্দু লইয়া জিদ, ভারত-ইউনিয়ন হইতে কয়লা প্রভৃতি না নেওয়ার জিদ প্রভৃতি জিদই পাকিস্থানকে ডুবাইতে বসিয়াছে। রক্ষা পাওয়ার শেষ পন্থা হিসাবে মুসলিম লীগ আজ আমেরিকার শরণাপন্ন। আমেরিকাকে লইয়া এই খেলা ছাড়া পাকিস্থানের সামনে আর কোনও পথ নাই। এমন ভাঙ্গাই পাকিস্থান নিজেকে ভাঙ্গিয়াছে, আমেরিকাকে দিয়া তাহা জোড়া লাগাইবার আশা অচিরাৎ নিরাশায় পরিণত হইবে। আমেরিকার কাছে পাকিস্থান আত্মবিক্রয় করিল। যুক্ত ফ্রণ্ট আজ দ্বিজাতিতত্ত্ব ছাড়া আর সব জিদ ছাড়িতে প্রস্তুত। কিন্তু পাশপোর্ট প্রভৃতি জিদের মূল কারণ যে দ্বিজাতিতত্ত্বের জিদ, তাহা যে পর্য্যন্ত না মুসলমান সাধারণ ছাড়িতেছে, সে পর্য্যন্ত পাকিস্থান রক্ষা পাওয়াও দুষ্কর হইবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শাসক-শাসিতের ভেদ বুদ্ধি যদি পাকিস্থানের মুসলমান ত্যাগ করে এবং গণতন্ত্রে সত্যই বিশ্বাসী হয়, তবেই শুধু পাকিস্থান টিকিবে। পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল হিন্দু হইতে পারিবে

না, পাকিস্থান শরিয়াতী শাসনে চলিবে—এইরূপ মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা আজ অচল। আজ 'মানুষের মহিমা' প্রতিষ্ঠিত,—হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়, খ্রীষ্টানেরও নয়। আজ মানুষের বিধি বিধান চলিবে—সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র আজ ঝড়ের মাঝে উড়িয়া যাইবে। অথচ মুসলিম লীগ তাহাই করিতে চাহিয়াছিল। 'মানুষের' চেয়ে বড় ধর্ম্ম নয়, সমাজ নয়, রাষ্ট্র নয়। অবিভক্ত বাঙ্গলায়ও বিভক্ত বাঙ্গলায় অনেক নর-হত্যা মুসলিম লীগ করিয়াছে। আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'। অন্য সব জিদ ছাড়িয়া দিয়া যদি ইহার পর যুক্ত ফ্রণ্ট শাসনযন্ত্র হাতে পাইয়া দ্বিজাতিতত্ত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া শাসন চালাইতে প্রয়াসী হয়, তবে সেও শীঘ্র মহাকালের বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। হিন্দু-মুসলমান এক মানুষ জাতি। মানুষ জাতি ছাড়া অন্য কোনও জাতি বর্ত্তমান যুগ সহ্য করিবে না। মানুষের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হইলে, সে রাষ্ট্রের গোড়ায় হিন্দু প্রাধান্যই থাকুক বা মুসলমান প্রাধান্যই থাকুক, মানুষ হিসাবে সকলেই সমান মর্য্যাদা, অধিকার পাইবে। ভারত ইউনিয়নে এই সম-অধিকারই স্বীকৃত হইয়াছে। সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পাকিস্থান টিকিত। মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ বলিয়া অনেক সুযোগ সুবিধা স্বাভাবিক ভাবেই পাইত। কিন্তু অতি-লোভের সঙ্কটে আজ পাকিস্থান পড়িয়াছে। ভগবান যদি অতি লোভের সঙ্কট হইতে পাকিস্থানী নেতাদের বাঁচান, তবেই পাকিস্থান রক্ষা পাইবে। সব জিদ ছাড়িয়া, সব জিদ হইতে পিছনে সরিয়া দ্বিজাতিতত্ত্বের জিদের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে চাহিলে যুক্ত ফ্রণ্টের রক্ষা নাই। মানুষকে মানুষের মর্য্যাদায় দেখিলে পাকিস্থান রক্ষা পাইবে—ইহাই গত সাধারণ নির্ব্বাচনের শিক্ষা।

———

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্মশতবার্ষিকী আবেদন :

সর্ব্ব ধর্ম্মকে যিনি নিজ ধর্ম্ম বলিয়া আস্বাদন করিয়াছেন, নিজেকে যিনি সর্ব্ব সম্প্রদায়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, আমি শাক্ত শৈব বৈষ্ণব গাণপত্য, আমি মুসলমান খ্রীষ্টান—I am a cosmopolitan, যিনি আপাতঃ পরস্পরবিপরীত জড়বাদ ও অজড়বাদকে সমন্বয় করিয়া একটী সামগ্রিক জীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, যখন যে দেবদেবী বিষয়ক গান হইত, সমাধি অবস্থায় যাঁহার সেই সেই দেবদেবীর মূর্ত্তি অনুযায়ী দেহের রূপান্তর হইত, সেই নিত্যগোপালের (ইঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব) শুভ শতবার্ষিকী জন্মোৎসব আগামী চৈত্রমাসের বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে আরম্ভ হইবে। পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে মিটাইয়া যিনি একটী মহামিলনভূমি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শুভ আভির্ভাবকে সফল করিয়া তুলিতে সর্ব্ব মতাবলম্বী জনসাধারণ অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। হিংসাজর্জ্জরিত পৃথিবীর আজ একটি কৃষ্টিগত সাধারণ মিলনক্ষেত্র দরকার, যাহা রাজনীতির বিভেদকে অতিক্রম করিয়া মানুষকে এক করিতে পারে। এই এক করিবার কথাই শ্রীনিত্যগোপাল দিয়া গিয়াছেন। আমরা জনসাধারণকে যিনি যাহা পারেন দান করিয়া এই পবিত্র অনুষ্ঠানকে সফল করিয়া তুলিতে অনুরোধ করি।

শ্রীনিত্যগোপাল শতবার্ষিকী কমিটী যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে তাঁহার জড়াজড় সমন্বয়ের জীবন ও দর্শন সভা সমিতি আলোচনা ও লেখার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করা, তিনি যে সকল স্থানে গিয়াছিলেন সে সকল স্থানের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ ও সে সকল স্থানে স্মৃতি ফলক রাখিবার ব্যবস্থা করা, তাঁহার রচিত এযাবৎ অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ ও প্রকাশের বন্দোবস্ত করা, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটী লাইব্রেরী ও রিডিং রুম স্থাপন করা, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা এবং ভক্তমণ্ডলী ও বহিরাগত অতিথিদের বাসস্থানের জন্য একটি ভক্তাবাস নির্ম্মাণ করা প্রভৃতি পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই সকল পরিকল্পনাকে সম্ভব করিয়া তুলিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। জনসাধারণ

যথোপযুক্ত দান করিয়া এই পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলুন এবং শ্রীনিত্যগোপালের মহামিলনতত্ত্ব সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতে সহযোগিতা করুন, আমরা ইহাই আবেদন জানাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া টাকাকড়ি সম্পাদক, শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্মশতবার্ষিকী কমিটী, মহানির্ব্বাণ মঠ, ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। ইতি ১লা পৌষ, ১৩৬০

ডাঃ কালিদাস নাগ এম. পি.
সুনীতিকুমার চ্যাটার্জ্জী
অতুলচন্দ্র গুপ্ত, উকীল, হাইকোর্ট
সত্যেন্দ্রনাথ মোদক
(অবসরপ্রাপ্ত) আই. সি. এস,
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
এম. এল. এ, (নদীয়া)
ভি ভট্টাচার্য্য
উপেন্দ্রনাথ দত্ত
ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ অধ্যক্ষ,
নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ
সদানন্দ ভাদুড়ী
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা
যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ
অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

এস এন ব্যানার্জ্জী
ভাইস চ্যান্সেলার, কলিঃ বিশ্বঃ
জি সি রায় চৌধুরী এম. এ., বি.এল.,
পি এইচ ডি (লণ্ডন),
প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি বিভাগ,
কলিঃ বিশ্বঃ
সুশীলকুমার মৈত্র
এম. এ, পি এইচ ডি
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ ,, ,,
পি, সি, গুপ্ত
এম, এ, পি, এইচ ডি (লণ্ডন)
ইতিহাস বিভাগ কলিঃ বিশ্বঃ
প্রকাশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী
সহকারী রেজিষ্টার ,, ,,
প্রিয়রঞ্জন সেন
(গবেষণা বিভাগ)

শ্যামসুন্দরানন্দ অবধূত
হরিস্মরণানন্দ অবধূত
নিত্যপদানন্দ অবধূত
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়

শ্রীনিত্যগোপাল শতবার্ষিক জন্ম মহোৎসবের কর্ম্মসূচী

২৬শে চৈত্র ৯ই এপ্রিল শুক্রবার	অধিবাস রাত্রে জয়নগর মজিলপুরের দল কর্তৃক দাশরথি রায়ের পাঁচালী
২৭শে চৈত্র ১০ই এপ্রিল শনিবার	মঙ্গল আরতি, উষা কীর্ত্তন, আচমন, বেদীস্নান, বাল্যভোগ, পূজা, বেদপাঠ, চণ্ডী-পাঠ, গীতা-পাঠ, হোম, মধ্যাহ্ন ভোগ, প্রসাদ বিতরণ, কীর্ত্তন ৫টা—৭টা : সাধারণ সভা প্রধান অতিথি : মহামান্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু ৭॥০—আরতি ৮টায়—ছায়া-চিত্রে শ্রীশ্রীগৌরলীলা : শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য
২৮শে চৈত্র ১১ই এপ্রিল রবিবার	বাল্যভোগ, কীর্ত্তন, পূজা জন্মেজয় উৎসব ৪॥০ টায়—'হাওড়া সমাজ' কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের নীলাচল লীলা অভিনয়
২৯শে চৈত্র ১২ই এপ্রিল সোমবার	কীর্ত্তন পূজা পাঠ। ৬টা—৭টায় সাধারণ সভা : জৈনধর্ম্ম : শ্রীপূরণচাঁদ শামসুখা রাত্রে কীর্ত্তন
৩০শে চৈত্র ১৩ই এপ্রিল মঙ্গলবার	কীর্ত্তন পূজা পাঠ ৪॥০টায় সভা : ভাগবত ও কোরাণ : শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর রাত্রি ৭॥০ টায় মহাভারত পাঠ : শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী

১লা বৈশাখ (১৩৬১) ১৪ই এপ্রিল বুধবার কীর্ত্তন পূজা পাঠ ৪॥ টায়—সভা গুরুগ্রন্থ কীর্ত্তন ; নির্গুণ বালিক সংসঙ্গ মণ্ডল কর্ত্তৃক রাত্র ৭॥ টায় মহাভারত পাঠ : শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী

২রা বৈশাখ ১৫ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার কীর্ত্তন পূজা পাঠ ৪॥ টায় সভা ও বক্তৃতা রাত্রে কীর্ত্তন

৩০শে ফাল্গুন ১৩৬০ সাল
মহানির্ব্বাণ মঠ,
১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা ২৯

শ্রীনিত্যগোপালজন্মশতবার্ষিকী কমিটি

প্রয়োজনবোধে উপরোক্ত কর্ম্মসূচী পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা যাইতে পারিবে এবং উহা সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে।

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরোষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৬১

১লা বৈশাখ ১৩৬১

আবার একটা বৎসর ঘুরে এল। এত দুঃখ, এত গ্লানি তবু আবার নূতন করে আরম্ভ করবার, নূতন করে জগৎ ও জীবনকে দেখবার এ প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আসল কোথা থেকে? এই নূতন বছরের নূতন দিনে কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ বলে,

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি॥

জীবন ও জগৎ এমন করে যে নূতন থেকে আসছে তার কারণ বিশ্বটা প্রাণময়। সেই জন্যেই কিছুতেই সে পুরণো হয় না। বছরে বছরে ঋতুতে ঋতুতে নূতন চোখে তার নূতন রূপ এই জন্যেই চোখে পড়ে। এই প্রাণ যার মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক, রোজ সকালে শিশুর চোখের নূতন বিস্ময় নিয়ে প্রাতঃ-সূর্যকে সে প্রণাম করতে পারে। নূতন বছরের পয়লা বৈশাখে এই প্রাণময় বিশ্বকে আমরা ধ্যান করি—সেই প্রাণ আমাদেরকে সঞ্জীবিত করুক।

এই বৈশাখেই এই গতি-ধর্মাত্মক প্রাণের বার্তাই নিয়ে এসেছিলেন প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে ভগবান বুদ্ধ; আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও

এই প্রাণের কথাই বলে গেছেন। তাই বৈশাখী পুর্ণিমা আর পঁচিশে বৈশাখ আমাদের বড় আদরের। প্রজ্ঞাধর্মী সনাতন ভারতকে এই ইতিহাসের যুগে প্রাণের মহিমা ভগবান বুদ্ধই প্রথম শুনিয়েছিলেন আর আজকেকার সভ্যতার মধ্যে সাহিত্যের বিজয় শঙ্খে সেই প্রাণকেই উদ্‌ঘোষিত করে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। ভগবান বুদ্ধকে আমরা আজ আমাদের প্রণতি জানাই—তাঁর ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি বাণী আমাদের জীবনে সত্য হোক। আর প্রণাম জানাই বিশ্বকবিকে যিনি গাইলেন,

ভালোবাসিয়াছি এই ধরণীর আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

বৌদ্ধদর্শনের তাৎপর্য্য*

'যে আবেষ্টনে বৌদ্ধদর্শন ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আবেষ্টন যোগাইয়াছে বৌদ্ধদর্শনের এক অংশ, এবং বৌদ্ধগণ যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতেছে পুর্ণ সত্যের অপর অংশ। এই দুই অংশের সমন্বয়ই পরিপুর্ণ বৌদ্ধ দর্শন। বৌদ্ধদর্শন দীক্ষিত হইয়াছে 'স্থিরতা'র অত্যাচারের হাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিয়া চঞ্চলতার গৌরবে তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে, 'অখণ্ডে'র নির্য্যাতন হইতে খণ্ডকে উদ্ধার করিতে, 'একে'র হাত হইতে বহুকে বাঁচাইতে, 'চেতনে'র শোষণ হইতে জড়কে মুক্তি দিতে, 'ভোক্তা'র বলাৎকার হইতে ভোগ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে, স্থির চেতন 'ঈশ্বর'-শাসকের শাসন ও শোষণ হইতে শাসিত-শোষিত জীবকে মুক্তিদান করিতে, 'সনাতন' বেদের সনাতনত্বের নিষ্ঠুর পীড়ন হইতে সনাতনেরই একটী বিচিত্র আস্বাদন রূপে বর্ত্তমানের মর্য্যাদা দান করিয়া নূতন বেদ সৃষ্টি করিতে, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা মুছিয়া ফেলিয়া এই মাটীর বুকে সঙ্ঘ সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যক্তিকে মুক্তি দান করিতে, উৎপাদ-নিরোধের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার শক্ত ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দিয়া উৎপাদকে উৎপাদের মূল্যে এবং নিরোধকে নিরোধের মূল্যে আস্বাদন করিতে, 'সনাতনে'র চাপ হইতে মুক্ত করিয়া নিতুই নব ক্ষণকে স্বয়ং

* শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত।

মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে, 'পূর্ণে'র সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত হইতে শূন্যকে রক্ষা করিতে, 'জরা'র জ্বালা হইতে জুড়াইবার জন্য চিরনির্ব্বাণের মহিমা কায়েম করিতে। যে স্থির চেতনের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁহাদের অভিযান, তাহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তে না থাকাটা একান্ত দোষের নয়। কিন্তু তাঁহারা তখনই অসমদর্শী হইলেন, যখন উহাদিগকে একান্তভাবে অস্বীকার করিলেন এবং ভাবিলেন উহাদিগকে বাদ দিয়াই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হইবে। উহাদিগকে খোলা প্রাণে নিজেরই অপরার্দ্ধরূপে অঙ্গীভূত না করিলে নিজেরাই পরিণামে উজাড় হইবেন, একথা তখন তাঁহাদের বুঝিবার সুযোগ ছিল না, থাকিতেও পারে না। কেননা, যখন কোনও নূতন কথা ধরার বুকে আসে, তাহাকে 'একান্ত' করিয়া প্রচার না করিলে মানুষ উহাকে ধরিতেই পারে না। সমন্বয়ের কথা উঠে পরবর্ত্তী কালে। তাঁহারা অতি মাত্রায় চঞ্চলের দিকে, বহুর দিকে, জড়ের দিকে, নবীনের দিকে, ক্ষণের দিকে, শূন্যের দিকে, নির্ব্বাণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, সেদিকে মানুষকে আকর্ষণ করিলেন, এবং ইহাদিগকেই 'একান্ত' করিয়া তুলিলেন।

*　　*　　*　　*

ভগবান বুদ্ধ 'Golden mean'-এর তত্ত্বই জীবনে আস্বাদন ও প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু তাহা গড়িয়া উঠে নাই। 'If we accept the momentariness view, we have to admit causation and continuity with their correlates of permanence and identity or resolve the world into a devil's dance of wild forms and give up all attempts at comprehending it.'—Indian Philosophy—Part I, p, 377, Radhakrishnan.—ক্ষণিকবাদের জগৎ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহারই অপরার্দ্ধ ঐ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, সাতত্য-ধারা, স্থিরতা ও তাদাত্ম্যকেও তাহার সাথে সমন্বিত করিয়া এক অখণ্ড পুরুষোত্তম দর্শন আস্বাদন করিতে হইবে। *　*　*　*

Matter is less material, mind is less mental—ইহা বর্ত্তমান যুগদর্শনে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এক প্রান্তে রহিয়াছে ভূতভৌতিক বিরাট বিশ্ব (macrocosm), অপর প্রান্তে চিত্তচৈত্তিক স্বরাট্ চেতন জগৎ। এই দুইকে সমন্বিত করিয়া যোগসূত্র রূপে সন্ধিতে রহিয়াছে জীবন্ত atomic microcosm ঐ পুরুষোত্তম-লীলাতরঙ্গ। এই পুরুষোত্তম জীবনেরই একটি 'ক্ষণ' বৌদ্ধদর্শন। ইহা ক্ষণিকবাদ, উৎসববাদ। পুরুষোত্তম জীবনের পরম

প্রয়োজন হইতেছে স্বরাট্ চৈতন্য ও বিরাট জগৎকে সমষ্টি দর্শন দ্বারা পুরুষোত্তম বিশ্বে গড়িয়া তোলা।

'অঞ্চলের অমৃত বরিষে চঞ্চলতার নাচে
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলই যে নেই নেই করে আছে,
ভিৎ ফেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল
তারা বুঝিল না,—অনন্তকাল অচির কালেরই মেলা।

*   *   *

বনের প্রবাহ তব তীরে তীরে
সবুজ পাতার বন্যার নীরে—
কভু ঝড়ে কভু শান্ত সমীরে তোমারি ছন্দ যাচে।
তোমারি ছন্দে পাখীর ওড়া সে
তোমারি ছন্দে ফুল ফোটে ঘাসে
অনিত্য তারা তব ইতিহাসে
নিত্য নাচন নাচে॥

*   *   *

যুগ যুগ ধরি জেনো মহাকাল
চলার নেশায় হয়েছে মাতাল
ডুবিছে ভাসিছে আকাশ পাতাল
আলোক আঁধার বহি।
দাঁড়াবে না কিছু তব আহ্বানে
ফিরিয়া কিছু না চাবে তোমা পানে
ভেসে যদি যাও যাবে এক সাথে
সকলের সাথে রহি। —পলাতকা, রবীন্দ্রনাথ

অচঞ্চল যখন সর্ব্বভূতের 'চঞ্চলতা'র মাঝে নিজকে ও চঞ্চল সর্ব্বভূতকে নিজের মাঝে হোম করেন, নিজকে মুছিয়া ফেলেন, তখনই অচঞ্চলতার 'অমৃত বরিষে চঞ্চলতার নাচ' সুরু হয়, তখন বিশ্বলীলা কেবলই 'নেই নেই করেই' থাকে, তখনই সব অনিত্য 'নিত্য নাচন নাচে,' তখনই অনন্তকাল ধরিয়া এই 'অচির কালেরই মেলা' চলে।

ক্ষণিকের মধ্যে নিরপেক্ষ 'প্রবৃত্তি'র কোনও স্থান আচার্য্য শঙ্কর দেখিতে

পান নাই। কেননা, একবার প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে তাহার আর উপরম সম্ভব হয় না। উপরম সম্ভব না হইলে তো ক্ষণিকবাদই আর দাঁড়ায় না। অথচ একটী ব্যাপার সৃষ্টি করিতে হইলে 'সমদায়' চাই-ই। তবেই দেখিতেছি যে, ক্ষণকে প্রকৃত হইতে হইলে চাই 'সমুদায়'; আবার সমুদায়কে দাঁড়াইতে হইলে চাই 'ক্ষণ'। ক্ষণ ও সমুদায়ের মধ্যে এই vicious circle আসিয়া পড়ে। ক্ষণ ছাড়া সমুদায় হয় না, সমুদায় ছাড়াও ক্ষণ হয় না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের 'ভেসে যদি যাও যাবে এক সাথে সকলের সাথে রহি'।

বর্ত্তমানে চলিতেছে বুদ্ধযুগ; প্রাণসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই ক্ষণিকবাদের ভিতর দিয়া সমাজকে মুক্তিক্ষেত্ররূপে, পুরুষোত্তমক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পুরুষোত্তমজীবন-প্রচারে ভাগবত ক্ষণিকবাদেরই মূর্ত্ত দৃষ্টান্ত। ইহাকে ভারতীয় দার্শনিকগণ একরূপ বর্জ্জনই করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী শাস্ত্রজ্ঞানে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশও করিয়াছেন। ক্ষণিকবাদের যুগে আমরা কোন কিছুর প্রাচীনত্ব নবীনত্ব লইয়া খুব বুদ্ধির কসরত করিব না। কেননা প্রাচীনের আবেষ্টনে যে সত্য প্রাচীন, সেই সত্যই নবীনের আবেষ্টনে নবীন। 'সত্য' এই ভাবে প্রাচীনকে প্রাচীনের মত সত্য করিয়া নিজেও প্রাচীন সত্য হইয়া, নবীনকে নবীনের মত সত্য করিয়া এবং নিজেও নবীন সত্য হইয়া ক্ষণিকবাদের মহিমাই ঘোষণা করিতেছে। এই ভাবেই অনন্ত রূপ ধরিয়া অনন্ত এক নবীন সত্য ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। সত্যকে প্রাচীন-নবীনে টানাটানি করিয়া লম্বা করিয়াও আমরা এক, সনাতন সত্যকে আস্বাদন করিতে পারি নাই। 'যুগ যুগ ধরি জেনো মহাকাল চলার নেশায় হয়েছে মাতাল।' 'চলার নেশায় মাতাল হয়ে' চলাই ক্ষণিকবাদের গূঢ় অর্থ। এইখানেই জীবনের রস-আস্বাদন। প্রতিক্ষণের স্বয়ংমূল্য ও স্বয়ম্পূর্ণত্ব স্বীকার করাই ক্ষণিকবাদের প্রাণ।

'শেষপ্রশ্নে' সমাজকে বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের সমন্বয়-আদর্শে বাস্তবরূপে গড়িয়া তুলিবার গভীর প্রেরণা উপলব্ধি করিয়াই শরৎচন্দ্র একটী কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শেষপ্রশ্নের আগা গোড়া বুদ্ধের ক্ষণিকবাদে পূর্ণ। ইহা সনাতনীদের দৃষ্টিতে এক বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানে আমরা যে 'বুড়ো মনের' কথা শুনিয়াছি, যাহা ক্ষণিকবাদকে অস্বীকারই করে, সেই বুড়ো

মনকে ভগবানে অর্পণ করিবার কথাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, 'মন্মনা ভব' —'ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ'—'ময্যেব মন আধৎস্ব' ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের কমলের মুখে আমরা বুদ্ধের ক্ষণিকবাদের মোটামুটি সব কথাই শুনিতে পাইব—

'তখন আশুবাবু মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল, বুড়ো মন তুমি কাকে বল ? ... কমল বলিল, মনের বার্দ্ধক্য আমি তাকেই বলি, যে মন সুমুখের দিকে চাইতে পারে না, যার অবসন্ন জরাগ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। আর যেন তার কিছু করবার, কিছু পাবার দাবী নেই,—বর্ত্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক ; অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্ব্বস্ব। তার আনন্দ, তার বেদনা—সেই তার মূলধন। তাকেই ভাঙ্গিয়ে খেয়ে জীবনের বাকি দিন কয়টা টিকে থাকতে চায়।' 'কোন দেশেই মানুষের পূর্ব্বগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারে না। তা'হলে সৃষ্টি থেমে যেতো। এর চলার কোন অর্থ থাকত না।' 'কোন্ আদিমকালে কুহেলিকা সৃষ্টি হয়েছিল আজও সে তেমনি বিদ্যমান আছে। সূর্য্যকে সে বার বার আবৃত করেছে এবং বার বার আবৃত করবে। সূর্য্য ধ্রুব কি না জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয় নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়তো ও দুটোই নিত্য কালের। তেমনি হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও তো মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের সত্য নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে। মালতী ফুলের আয়ু সূর্য্যমুখীর মত দীর্ঘ নয় বলে তাকে মিথ্যে বলে কে উড়িয়ে দেবে ?' 'কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না, এবং তার পরিবর্ত্তনেও লজ্জা নেই, এই কথাটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।' '... এ জীবনে সুখ দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু, সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই তো সত্যিকার পাওয়া।'

..... বৌদ্ধদর্শনের যে রূপ বর্ত্তমান যুগে পুরুষোত্তমদর্শন রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শরৎচন্দ্রের তুলিকায় সুন্দর হইয়া তাহাই জমিয়া উঠিয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান যুগে দর্শনশাস্ত্রের চরম পরিণতির ইঙ্গিত। শরৎচন্দ্রের কমল ব্রজধামের রাধাচরিত্রেরই আভাস মাত্র। সীতা চরিত্রের 'মহিমা'ময় ঐ একনিষ্ঠার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পরই ফুটিয়া উঠিবে কোথায় সীতাচরিত্র নারী

জীবনের পরিপূর্ণ মীমাংসা দিতে পারে নাই, কেমন করিয়া সীতা পাতাল প্রবেশের ছলেই রাধা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। নিষ্ঠার ভিতর ফুটিয়া উঠে continuity-র মনোবৃত্তি। একনিষ্ঠার মূর্ত্তি সীতাও একদিন রামচন্দ্রের বার বার পরীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া প্রতিবাদস্বরূপ পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন। সীতা যেখানে পাতাল প্রবেশ করিলেন, রাধা সেখান হইতেই ফুটিয়া উঠিলেন। অখণ্ড জীবনে সীতার জীবন একটি ক্ষণ, রাধার জীবনও অপর একটি ক্ষণ। সীতার সংযম ঘন হইলেই হয় রাধার সংযম, যাহা বাহ্যতঃ নিম্নস্তরের নারীদের উচ্ছৃঙ্খলার মতই দৃষ্ট হয়। সীতাচরিত্রই যে নারীজীবনের শেষ চরিত্র নয়, রাধাচরিত্রের প্রয়োজনীয়তাও যে সমাজকে, বিশেষভাবে নারীজীবনকে স্বীকার করিতে হইবে, শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' তাহারই পথ দেখাইয়া দিয়াছে। 'শেষপ্রশ্ন' বৌদ্ধ-দর্শনঘন, ক্ষণিকবাদাত্মক পুরুষোত্তমদর্শনেরই একটি সাহিত্যিক সুস্পষ্ট চিত্রমাত্র।

* * * *

'Uncompromising devotion to the moral law is the secret of the strength of Buddhism, and its neglect of the mystical side of man's nature the cause of failure.'—Indian philosophy. p. 608. জীবনের বাহিরে যে বেদ ও ঈশ্বর ছিলেন, তাঁহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া বুদ্ধ চাহিয়াছিলেন মানুষকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে, ঘরের মধ্যে peace, holiness ও enlightenment খুঁজিতে; তাহাতে তিনি সক্ষমও হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘর বাহিরের দ্বন্দ্বের ভিতর একান্ত ঘরের সাধনায় ঘর উজার হইল, জীবনের বাহিরেই আবার তাঁহাকে নির্ব্বাণ খুঁজিতে হইল। * * * যে প্রাণ লইয়া বুদ্ধ আসিলেন, তাঁহার শক্ত morality-র কঠিন পেষণে সে প্রাণ অন্তর্হিত হইল। কর্ম্মাভাবের দিকটাই কর্ম্মের mystic দিক। বুদ্ধ এই দিকটীকে বাদ দিয়া ব্যর্থই হইয়াছেন। পুরুষোত্তম দর্শনে morality হইতেছে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে ভাগবত জীবনেরই 'প্রকাশ' মাত্র। ভিতর হইতে স্বচ্ছন্দে বাহিরের ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়া জীবনের পক্ষেই morality সহজ, অবাধ; তখন সংযম আর নিগ্রহ নহে। যে-সংযম নিগ্রহেরই নামান্তর মাত্র, 'শেষ প্রশ্ন' তাহারই উপর কটাক্ষ করিয়াছে। সত্য বাস্তব জীবনস্বরূপ 'সংযম' সকলেই মানিতে বাধ্য।

* * * *

কিন্তু এই পুরুষোত্তমজীবনকে, পুরুষোত্তমজীবনের ঘটনাপুঞ্জকে বরণ না করিলে বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণিকবাদ পূর্ব্বক্ষণের নিরোধের ভিতর দিয়া পরক্ষণের

উৎপত্তি মাত্রও প্রমাণ করিতে পারে না। বিচ্ছিন্ন ক্ষণপুঞ্জ কোন্ যোগে যুক্ত হইয়া বিশ্বসংহতিরূপে গড়িয়া উঠিল বলিয়া অনুভূত হইবে? সেইজন্যই বলিতে হয় যে, ক্ষণিকবাদ ও সন্ততধারা যখন একান্ত ভিন্ন, তখন বিশ্বের উৎপত্তিমাত্রও অসম্ভব হয়। বৌদ্ধদর্শন যখন পুরুষোত্তম দর্শনের একটী বিচিত্র ক্ষণ, তখনই তাহার বাস্তবের উপব্যাখ্যান সত্য বাস্তব; অন্যথা সে নিজের মধ্যেই নিজে ফাঁকি, শূন্য। উৎপাদ-ক্ষণ ও নিরোধ-ক্ষণের তরঙ্গে তরঙ্গে দোল খাইতে খাইতে অনন্ত কাল চলিয়াছে। পুরুষোত্তমস্বভাব কোন একটি আস্বাদনেই আটকাইয়া যাইবে না। সে একান্ত উৎপাদও নয়, সে একান্ত নিরোধও নয়; সে একান্ত সৎও নয়, একান্ত অসৎও নয়। সে দুইয়ের অতীত, অথচ দুইয়ের সমন্বিত সচ্চিদানন্দঘন রসবস্তুও।'

নতুন দিন

সন্তোষ কুমার অধিকারী

সামনে আঁধার, আকাশধূসরে দৃষ্টি নেই,
কোথা আসে দিন? নতুন দিনের পদধ্বনি কি শুনতে পাও?
তিমিরোত্তর আকাশে রক্তসূর্য্যের বাণী
জ্যোতির্লেখায়। হাওয়ার সেনানী
করে কানাকানি মেঘে মেঘে। আর ধূসর নীলের
ছায়ালোকে কত গোধূলিশীর্ণ ভীরু হৃদয়ের
শোণিত কাঁদে;

মেঘের ওপারে বীতরাত্রির
অযুত স্বপ্ন! তবু পৃথিবীর
হৃদয়ে আঁধার, . . . সে আঁধারে মন কি নীড় বাঁধে?
তবু আকাশের পথে হৃদয়ের আশা উধাও?

সামনে আঁধারে পৃথিবী রক্তসমুদ্রে রাখে
আকাশ প্রদীপ। শান্তির ছবি আজকে কে আঁকে ?
এই বিশীর্ণ বাঁচার আশাকে
নিত্য কে আর টান্‌বে বলো ?
অন্ধকারের প্রাকার গুঁড়িয়ে কে চিরনবীন
নতুন আলোর পথে পথে দিন আনবে বলো ?

দেখেছি যে হায় আজও জীবনের দারিদ্র্য ম্লান লজ্জার ভারে
চুপি চুপি কাঁদে, দেখেছি সময় পৃথিবীর পারে
অসহায়, আর
তিমিরোত্তর ধূসর আকাশে রঙ্ ঝরা মেঘে নামলো আঁধার,
দিন নিভে যায়, নিভে যায় আলো ; অযুত স্বপ্ন মরে যায়
হায় !

তবু আশাজাল বুন্‌তে চাও ?
সব গোধূলির রঙ্ ঝরে যদি আকাশের গায়
তবু এ আঁধারে নতুন দিনের
পদধ্বনি কি শুন্‌তে পাও ?

———

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের

শততম জন্মোৎসব*

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুশ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহম্ ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্ত্ব অনিরাকরণমস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্ত্তয়ে শ্রীনিত্যগোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্মপরমাত্মভগবৎপুরুষোত্তমায় ॥

মহামান্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল, মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ এবং মায়েরা,

আজ যাঁহার শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা এইখানে সমবেত হইয়াছি, সেই পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের পবিত্র দেহ সম্মুখস্থিত ঐ মন্দিরের নীচে সমাহিত রহিয়াছে। নিজেকে তিনি 'বিশ্বনাগরিক' বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাই বিশ্বনাগরিক শ্রীনিত্যগোপালের এই শতবর্ষারম্ভ জন্মোৎসব বিশ্বের সকলেরই আনন্দ উৎসব। আপনাদের সকলকে আজ এই আনন্দ উৎসবে সাদর সম্ভাষণ জানাই।

শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন। শতবর্ষ পুর্ব্বে ১২৬১ সনের এমনই এক চৈত্রমাসের বাসন্তী অষ্টমী তিথির প্রকৃতির দুর্যোগময়ী রজনীর শেষ যামের পুণ্য লগ্নে তিনি পচাগলা এই ধরার মাটীকে পরম মূল্য দানের অভিপ্রায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যগোপাল আপনাদের নিকট অপরিচিত। বাংলাদেশে বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে যে সকল মনীষী ও মহাপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন, নিত্যগোপাল বোধ হয় তাঁহাদের সকলের অপেক্ষাই কম পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দকে নিত্যগোপাল একসময়ে বলিয়াছিলেন, 'বিলে, আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁথা মুড়ি দিয়েই যাব।' অতি-পরিচিত প্রাণ যেমন আমাদের এই দেহযন্ত্রে বিশেষ কোথাও না থাকিয়া নিজের অস্তিত্বকে সারা

* ২৭শে চৈত্রে মহানির্ব্বাণ মঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় জন্মোৎসব কমিটীর সহ-সভাপতি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের অভিভাষণ।

দেহে লুক্কায়িত করিয়া রাখে, প্রাণপুরুষ শ্রীনিত্যগোপালও নিজের অস্তিত্বকে লুকাইয়া রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্যই নিজেকে তিনি গোপন করিয়াছিলেন, যেমন করিয়া বীজ নিজেকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য মাটীর নীচে আত্মগোপন করে। নিজেকে তিনি যতই গোপন করুন, সেই সে দিনই বাংলাদেশের একজন তাঁহার 'আসা'কে জানিতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। নিত্যগোপালকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তুই এসেছিস? আমিও এসেছি।'* তাঁহারা দুইজনে মিলিত হইয়াই আসিয়াছিলেন, বিশেষ একটী উদ্দেশ্য লইয়াই আসিয়াছিলেন। সমন্বয় তত্ত্বের প্রথম অর্দ্ধেক শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়া পরের ব্যাপকতর ও গভীরতর অর্দ্ধেক দিবার ভার শ্রীনিত্যগোপালের উপর রাখিয়া গিয়াছিলেন। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়েই শ্রীনিত্যগোপালের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াসী হইতেন, কিন্তু নিত্যগোপালের আকুল নিষেধে তাহা পারিয়া উঠেন নাই। নিত্যগোপাল তাই অপরিচিতই রহিয়া গেলেন। স্বপ্রকাশ সত্যও কালের অনুকূলতাতেই বাহিরে আলোর মধ্যে আসিতে পারে। অপরিচিত তিনি আজ মানুষের কাছে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার শতবর্ষারম্ভ উৎসবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের এইরূপ এক সাধারণ সভায় মিলিত হইবার অবসর মিলিয়াছে। সর্ব্ব লোকের নিকট উপস্থিত করিবার মত তাঁহার যে বিশ্বজনীন জীবন ও বৈপ্লবিক দর্শন রহিয়াছিল, আজ তাহাই অত্যন্ত সংক্ষেপে আপনাদের নিকট বলিতে চাই।

প্রত্যেক অভিব্যক্তির একটা পিছনের দিকের ইতিহাস আছে, আর একটা আছে তাহার সামনের দিকের। যে ধর্ম্ম ইতিহাসকে স্বীকার না করিয়া মানুষের কাছে আসে, তাহা মানুষের বাস্তব জীবনকে তৃপ্ত করিতে পারে না। Religion without history is a misnomer. নিত্যগোপাল কোন্ ইতিহাসের অভিব্যক্তির ধারা অবলম্বন করিয়া কি কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলে তাঁহার শতবর্ষ পর্য্যন্ত নিজেকে গোপন রাখার অর্থও বুঝিতে পারা যাইবে।

সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে আর একদিন এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রাধাভাব অর্থাৎ পরাপ্রকৃতিভাবদ্যুতিসুবলিত হইয়া যে পুরুষপ্রবর এই বাঙ্গালা দেশেরই মাটীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আরব্ধ ব্রতকেই শতবর্ষ পূর্ব্বের এই মানুষটী আগাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

* শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৪শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একাধারে রাধা-কৃষ্ণ ব্রহ্ম-মায়া সমন্বয়মূর্ত্তি বলিয়াই তিনি 'ভুবি বৃন্দাবন' স্থাপন করিবার জন্য উন্মাদ ছিলেন। গৌরসুন্দর মায়াবাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বলিয়াছেন, 'মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী। ব্রহ্ম-আত্মা-চৈতন্য বলে নিরবধি।' মায়ার সঙ্গে ব্রহ্মকে, অনাত্মার সঙ্গে আত্মাকে, অচৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্যকে সমন্বিত করিতে না পারিয়া তাহাদের পারস্পরিক বিবাদ যাহারা রাখিয়া দেন, তাঁহারাই মায়াবাদী। কিন্তু নূতন কথা বলিতে আসিয়াও কাল ও আবেষ্টনকে গৌরসুন্দরকে খানিকটা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। সামনের দিকে লম্ফ প্রদান করিতে হইলে যেমন খানিকটা পিছনের দিকে সরিয়া লইতে হয়, তেমনই নূতন কথা বলিতে আসিয়াও পুরাতনকে এইজন্যই তাঁহাকে খানিকটা মানিতে হইয়াছিল। তাই যিনি আসিয়াছিলেন 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ' হইয়া, তিনিই মায়াবাদীর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, 'অতএব মুঞি করিমু সন্ন্যাস'। তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়াই তাঁহাকে নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী হইতে হইয়াছিল —নহিলে তাঁহারই ভাষায়—

'কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যবে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন' ॥

মায়ের জন্য এত বেদনা একজন নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসীর পক্ষে কি সঙ্গত না শোভন? তিনি কাহাদের জন্য জগন্নাথের প্রসাদ লাল শাড়ী ও সাদা কাপড় পাঠাইতেন? আসল কথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিয়াছিলেন সহজ জীবন লইয়া যাহার মধ্যে গার্হস্থ্য-সন্ন্যাসের কোন প্রশ্নেরই স্থান ছিল না। প্রেম যাহার নিজ-ধন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতির ভিতরে থাকা বা প্রকৃতির ওপারে থাকা দুই-ই সমান। প্রেমে পরম পুরুষ ও পরা প্রকৃতির গলিয়া গিয়া এক হওয়ার মূর্ত্তিই তো তিনি।

পরাপ্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া আসিলেও তাহাকে মহাপ্রভু দার্শনিক ভাবে স্বতন্ত্র মূল্যে স্বীকার করিয়া যাইতে পারেন নাই। সেই কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন শ্রীনিত্যগোপাল। মায়াকে তিনি ব্রহ্মের মত সমান সত্যে স্বীকার করিয়া লিখিতেছেন, 'মায়া সত্য'। জগৎটাকে মিথ্যা বলিতে অভ্যস্ত ভারতবর্ষের একজন সন্ন্যাসী হইয়াও তাঁহার সিদ্ধান্তদর্শন গ্রন্থে তিনি লিখিতেছেন, 'আমরা স্পষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমরা কি প্রকারেই বা আমাদের অবস্থিতির স্থান এই বিশ্বকে কল্পিত বা মিথ্যা

বলি ? আমাদের এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে সত্যই বলিতে হইতেছে, এই বিশ্ব দর্শন স্পর্শন এবং বোধদ্বারা অবধারিত হইতেছে !' ইহারই প্রমাণ সাপক্ষে অন্যত্র বলিয়াছেন, 'প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে প্রত্যক্ষের সহিত যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে আমরা সেই যুক্তিকেই বিশ্বাস করি।' এই জন্যেই ব্রহ্মেরই মত পরাপ্রকৃতিকেও একই সঙ্গে অনাদি এবং অনন্ত স্বীকার করিয়া নিত্যগোপাল দর্শনের জগতে যে বিপ্লবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, অধ্যাত্মজগতে তাহার গুরুত্ব বুঝিতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। প্রকৃতিকে, বাস্তবকে, জড়কে এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংমূল্য দিয়া তাহাকে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত করিয়া দেখার এতবড় দুঃসাহসকে বস্তু বা জড় সম্বন্ধে আজিকার বিজ্ঞানের পটভূমিকাতেই আমরা বুঝিতে পারিব। হেগেল mind হইতে matter-এর সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মার্কস্ matter হইতে mind-এর সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাচ্যের দার্শনিকগণের মধ্যেও আচার্য্য শঙ্করের দৃষ্টির সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের দৃষ্টি মেলে না, রামানুজের মেলে না, নৈয়ায়িকের মেলে না, বৈশেষিকের মেলে না, সাংখ্যের মেলে না—কাহারো সাথেই কাহারো মেলে না। প্রকৃতিকে কেহই পরমার্থমূল্যে স্বীকার করেন নাই। শ্রীনিত্যগোপাল এইখানে যুগান্তরকারী মীমাংসা দিয়া গিয়াছেন। তিনি জড় সম্বন্ধে এতদিনের প্রচলিত ধারণা বদলাইয়াছেন, অজড় সম্বন্ধেও এতদিনের ধারণা রক্ষা করেন নাই। দুইকেই নূতন দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখিয়া তিনি জড়-অজড়ের আত্মা-অনাত্মার চৈতন্য-অচৈতন্যের সমন্বয় করিয়া লিখিতেছেন, 'নিত্যানিত্য সমন্বয় বা আত্মানাত্ম সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়।' পরস্পর বিপরীতও যে জীবনের ক্ষেত্রে মিলিতে পারে—দর্শনের জগতে এত বড় মিলনের কাহিনী অভিনব, অপূর্ব্ব। এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যগোপাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'ট্যাঁকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব। নিত্যগোপালের ভাব মহাভাব হয়, কিন্তু তাতে তাঁর কোমরের কাপড় খসে না।' সমাজের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যদি মিলন চাই, যদি একটী অখণ্ড ভারতবর্ষ রচনা করিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন দর্শনের জগতে মিলন। দর্শনের ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী ভাবধারার মিলনক্ষেত্র আবিষ্কার

সকল দর্শন সমন্বয়

করিতে না পারিলে অখণ্ড ভারতবর্ষের আশা কল্পনামাত্র। শঙ্করকে বাদ দিলে ভারতবর্ষ চলে না, বুদ্ধকে বাদ দিলেও ভারতবর্ষের অনেকখানিই বাদ পড়িয়া যায়। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে ইঁহাদের তো মিল নাই। বৌদ্ধ দর্শন ও জৈন দর্শনকে তো অপর সকল দার্শনিকগণ অবৈদিক বলিয়া বাদ দিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল এই সকল পরস্পরবিরোধী-ভাবসম্পন্ন দার্শনিকগণের মহা মিলনের ব্যবস্থা করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব বৈপ্লবিক চিন্তাধারা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জড় দর্শনের শেষ পরিণতি মার্ক্সবাদকে অজড় দর্শনের চরম পরিণতি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মধ্যে পরিপাক করিতে হইলে শ্রীনিত্যগোপালের এই অগ্নিময় সমন্বয়দর্শন ব্যতীত আর পথ নাই।

দর্শনের জগতে এই মিলন সম্ভব করিয়াই তিনি সর্ব্ব ধর্ম্মের মিলনও সম্ভব করিয়াছেন। তাই বলিতে পারেন, 'আমি কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত নহি, আমার ইষ্ট যখন শিব হন, আমি তখন শৈব; তিনি যখন বিষ্ণু হন, আমি তখন বৈষ্ণব, তিনি যখন অন্য কোন সাম্প্রদায়িক হন, আমিও তখন সেই সাম্প্রদায়িক হই। ... আমি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান। ... I am a cosmopolitan. প্রকৃত জ্ঞানীর কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ তাঁহার সকল সম্প্রদায়।' সর্ব্ব ধর্ম্মকে রক্ষা করা সম্বন্ধে তিনি যে কতখানি সচেতন তাহা বুঝি যখন তিনি লেখেন, 'সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা করে যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাঁরই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী কোন ধর্ম্ম নষ্ট করেন না।' সর্ব্ব ধর্ম্ম বলিতে অদ্বৈতধর্ম্ম, দ্বৈতধর্ম্ম, শাক্তধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম; সর্ব্ব ধর্ম্ম বলিতে বাল্যের ধর্ম্ম, কৈশোরের ধর্ম্ম, যৌবনের ধর্ম্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রভৃতি মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের যত রকমের ধর্ম্ম রহিয়াছে, সেই সর্ব্ব ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে হইবে। কোন না কোন ধর্ম্মকে তথা সত্যকে নষ্ট করিয়া যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা পরিপূর্ণ নহে, প্রকৃত নহে, তাহা শ্রীনিত্যগোপালের অভিপ্রেত নহে।

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়

জাতি বর্ণ কর্ম্ম বা রস কোন কিছুরই উচ্চনীচ ভেদবাদের সর্ব্ব দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ একান্ত কৌলীন্য নিত্যগোপাল স্বীকার করেন না। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর আগে যখন অস্পৃশ্যতা আন্দোলন সুরু হয় নাই, তখনই তিনি অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণকৌলিন্য যে শাস্ত্রবিরোধী, ইহা দার্শনিকভাবে প্রমাণ করিয়া তাঁহার 'জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন' নামক পুস্তকে লিখিয়া গেলেন, 'ভবিষ্যতে

সর্ব্ব জাতি সমন্বয়

সকল জাতি এক জাতি হইবে, সকল জাতি এক ধর্ম্ম মানিবে। তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারো প্রতি কাহারো কোন বিদ্বেষ থাকিবে না।' প্রত্যেক জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, কর্ম্ম সবই প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও কি করিয়া অপরেরও বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতে পারে, সেই সংবাদ শ্রীনিত্যগোপাল রাখিয়া গিয়াছেন।

নিত্যগোপাল ধনীর সন্তান হইয়াও কখনও পিতার বিষয় ভোগ করেন নাই। পরবর্ত্তী কালেও কখন ভোগ তাঁহার নিকট আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেও তিনি তাহা বিশ্বসেবায় ছড়াইয়া দিয়াছেন, কখনও নিজের ভোগে লাগান নাই। জড় জগৎকে স্বীকার করিয়াও বিষয়কে যে বিশ্বসেবায় লাগাইয়া 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' এই মন্ত্রকে সার্থক করিয়া ভোগ করা চলে—তাহা হইলেই যে শুধু ধন কেন্দ্রীভূত হইয়া অত্যাচারের যন্ত্র হইয়া উঠে না, ইহাই নিত্যগোপাল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

বিকেন্দ্রীকরণ

জীবনযাত্রার মান বাড়ানর দ্বারা সভ্যতার পরিমাপ করা হয়। কিন্তু মান বাড়ান মানেই বস্তুকে অনন্তায়িত করাই যদি শুধু হয়, তবে তাহা শেষপর্য্যন্ত সম্ভব হয় না। বস্তুকে বাড়ানর একটা সীমা আছে—কারণ সীমাবদ্ধতাই জড় বস্তুর ধর্ম্ম। জমি সসীম, গরু সসীম, গরুর দুধ সসীম—যতবড় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই কাজে লাগান যাক না কেন, সর্ব্বসাধারণের জন্য রসগোল্লার ব্যবস্থা কোনমতেই কোনদিনই সম্ভব করিয়া তোলা যাইবে না। দুধকে মানদণ্ড রাখিয়া যদি ব্যক্তিকে কেন্দ্র না করিয়া বিশ্বসেবার ব্যাপক মনোবৃত্তি বা সমষ্টিবোধ সমাজের মধ্যে আনিয়া দেওয়া যায়, তবেই শুধু সত্যিকারের মান উন্নয়ন সম্ভব। মান উন্নয়ন ব্যাপারটাকে যদি শুধু দৈহিক বা জড়গত করা যায়, তবে তাহা যেমন শেষ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় না, তেমনই তাহাতে কালচারও নষ্ট হইয়া যায়। বিকেন্দ্রীকরণকে সমাজের ক্ষেত্রে আনিতে হইলে যে বৈরাগ্য ও সহজ সরল জীবনযাপনকে গ্রহণ করিতেই হইবে—নিত্যগোপাল নিজ জীবন দিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। জগৎকে যাহারা মিথ্যা বলে, ভারতবর্ষের এমন অনেক সন্ন্যাসীর মঠে টাকার অঙ্ক কেমন ভাবে স্ফীত হইয়া উঠিয়া এক একজন মোহন্তকে কোটীপতি করিয়া তুলিতেছে, আমরা তাহা জানি। নিত্যগোপাল ইহার প্রতিবাদ। আবার জগৎকে যাহারা সত্য বলে, ধনকে নিজের ভোগে লাগাইবার প্রচেষ্টায় তাহারা

বিশ্বটাকে লইয়া কি ছিনিমিনি খেলিতেছে, আমরা তাহাও দেখিতেছি।—নিত্যগোপাল ইহারও প্রতিবাদ। সমস্ত জগৎময় বিভিন্ন স্তরে রাজায় প্রজায়, নরে নারীতে, ধনিতে শ্রমিকে, গোলোকে ইহলোকে, অধ্যাত্মবাদে জড়বাদে সর্ব্বত্র যে পারস্পরিক শোষণ চলিতেছে, নিত্যগোপাল সে সকলেরই মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ। তিনি জীবনের সকল দিককে পোষণের রসে সঞ্জীবিত করিবার মন্ত্র লইয়াই আসিয়াছিলেন।

পোষণমূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল

পোষণমূর্ত্তি এই শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার মাতুলালয় ২৪ পরগণার অন্তর্গত পানিহাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জন্মেজয় বসু কলিকাতার আহিরীটোলার ধনী অথচ পরম ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন। পুণ্যশীলা জননী গৌরীমণি ও দিদিমাতা আনন্দময়ীর কোলে পানিহাটীতে নিত্যগোপালের শৈশব অতি আনন্দেই কাটিয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণের মতই শ্রীনিত্যগোপালের জন্ম—শুধু জন্ম কেন সারাজীবনই—অলৌকিক ঘটনা দ্বারা আবৃত। লৌকিক ও অলৌকিক, বাস্তব ও বাস্তবাতীত এই দুইটী জগৎকে তিনি মিলাইতে আসিয়াছিলেন; তাই তাঁহার বাস্তব জীবন যেমন ছিল একটি সর্ব্বাঙ্গীণ জীবন, তেমনই নির্ব্বিকল্প সমাধি হইত তাঁহার শিশুকাল হইতেই। পরস্পর-বিপরীতের সমন্বয় যেমন তাঁহার প্রচারিত দর্শনে ছিল, তেমনই তাঁহার জীবনের ঘটনার মধ্যেও সেই শিশুকাল হইতেই ছিল। শৈশবের পাঠশালার শ্রেণীতে যেমন তিনি প্রথম হইতেন, তেমনি আবার চঞ্চলতাতেও ছিলেন প্রথম। তাঁহার আটবৎসর বয়সে তাঁহার মাতা একদিন অকস্মাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহরক্ষা করেন। ইহার পরই নিত্যগোপাল পানিহাটী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসেন এবং জেনারেল এ্যাসেম্ব্লী ইনস্টিটিউসনে পড়িতে থাকেন। এই সময় হইতে তাঁহার স্বভাবেও কিছু পরিবর্ত্তন হয়। আগে তিনি সাধারণতঃ সদাপ্রফুল্ল ছিলেন, এখন একটা আত্মভোলা অবস্থা সর্ব্ব ক্ষণের জন্য তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। জেনারেল এ্যাসেম্ব্লীতে পাঠ কালে একদিন টিফিনের সময় একটি নিরালা স্থানে বসিয়া নিত্যগোপাল এরূপভাবে ধ্যানস্থ হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে, কখন ক্লাশে যাইবার ঘণ্টা পড়িয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। সকলে ঠিকমত ক্লাশে গিয়াছে কি না ইহা দেখিবার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় বিদ্যালয় ঘুরিয়া ফিরিবার কালে ঐ অপরূপদর্শন

কিশোর বালককে ঐ ভাবে ধ্যানস্থ থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিছুই না বলিয়া তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে কিছুক্ষণ পর নিত্যগোপাল ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া তাকাইলেন। নিত্যগোপালের নিকট সকল শুনিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়াছিলেন, যে দেশে একটী বালকের পক্ষে এরূপ হওয়া সম্ভব, সেদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসা নিতান্তই মূর্খতা।

১২৭৭ সালে ১৬ বৎসর বয়সে বেলুচিস্থানের অন্তর্গত হিঙ্গুলার আশ্রম-অধ্যক্ষ বাঙ্গালী পরমহংসাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ মহারাজ নিত্যগোপালকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব। নিত্যগোপাল ভারতের প্রাচীনতম ঋষভপন্থী অবধূত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ঐ সম্প্রদায়ের একনবতিতম পুরুষ। দীক্ষাগ্রহণ কালে গুরুদেবকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আপনি অনুমতি করুন, আমার যখন যে বেশ পরিবার প্রয়োজন হইবে, আমি তখন সেই বেশ পরিব।' গুরুদেব বলিয়াছিলেন, 'তোমার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই রহিল।' নিত্যগোপাল দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত সাদা কাপড়েই ছিলেন, পরবর্ত্তী কালেও বহুবারের মত একদিন হুগলী-মিউনিসিপ্যালিটীর ভোট দিতে যাইবার সময় সাদা ধুতিচাদর পরিয়াই গিয়াছিলেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর নিত্যগোপাল ছয় বৎসর কাল সমস্ত ভারতবর্ষ ও হিমালয়ের গভীর প্রদেশ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া ছিলেন। সেই সময় এবং তাহার পরবর্ত্তী কালেও তিনি যে কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়াছিলেন, কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

তাঁহার জীবনের ছাপ্পান্ন বৎসরের বেশির ভাগ সময়ই বোধহয় কাটিয়াছে সমাধি অবস্থায়। পর্য্যটনান্তে সমাধি অবস্থায় বৃন্দাবনে দশবারো দিন পর্য্যন্ত মৃতের মত পড়িয়া থাকিলে সেই দেহের উপর শিশুদের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া নেপালের রাজসেনাপতি নিত্যগোপালের বুত্থান পর্য্যন্ত সৈন্যদ্বারা সে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। এমনি কতদিন কতরকম ভাবেই গিয়াছে। মুহুর্মুহুঃ তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন, নির্ব্বিকল্প সমাধি, দেহ অঙ্গার স্পৃষ্ট করিলেও চেতনা ফিরিয়া আসিত না। ভগবানের নাম বা গান শোনামাত্রই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। পর্য্যটন শেষে তিনি কিছুদিন কাশীতে ও কিছুদিন কলিকাতায়—এইভাবে কাটাইয়াছেন। কাশীতে থাকা কালে সেইসময় তিনি ৯১খানা তন্ত্র পড়িয়াছিলেন। এই সময় এবং পরবর্ত্তী সময় মিলাইয়া তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া

গিয়াছেন। তন্মধ্যে ত্রিশখানা মত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, কিছু শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম্ম পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, বাকি বহু লেখা এখনও অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। সিদ্ধান্তদর্শন, ভক্তিযোগদর্শন, সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার, জাতিদর্পণ প্রভৃতি দার্শনিক মীমাংসাগ্রন্থ। ইহা ছাড়াও নিত্যগীতি, পদ্যাবলী, প্রার্থনাগীতা, প্রভাবতী (দৃশ্যকাব্য), দিব্যদর্শন প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রহিয়াছে।

এই সময় কলিকাতা থাকা কালীন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে নিত্যগোপালের প্রথম দেখা হয়। কিন্তু দেখা গেল তাঁহাদের পরিচয় এবং সম্পর্ক আজিকার নহে—তাহা অনন্ত কালের। সকলে বিস্মিত হইল।

ক্রমে বিভিন্ন স্থান হইতে নানা স্তরের লোকেরা নিত্যগোপালের নিকট আসিতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদাই পণ্ডিতকুলীনধনীকে যতদূর সম্ভব এড়াইয়া একেবারে জনসাধারণকে কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের মূর্ত্ত বিগ্রহ—আহারে বিহারে স্বভাবে ব্যবহারে সকল বিষয়ে তিনি সাধারণ মানুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন; দেহের মনের বা সাধনার কোন কৌলীন্য তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে নাই। যাহাদের কোথাও স্থান ছিল না, তাহাদেরই তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। জেলে মুচী কিংবা জারজ তারাপদ বা চরিত্রহীন গোলাপ গয়লানী প্রভৃতি তথাকথিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় যাহারা পতিত, তাহারা তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাজা গোবরে ঘুঁটে দিবেন, আর নিত্যগোপাল আসিয়াছেন পচা গোবরে ঘুঁটে দিতে। নিত্যগোপাল চিন্তায় বাক্যে পুরাপুরি গণতান্ত্রিক ছিলেন বলিয়াই এত ছোট মানুষকেও তিনি এত ভাল বাসিতে পারেন। তাঁহার দর্শনেই ইহার দার্শনিক কারণ তিনি রাখিয়াছেন, 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ।' অধিক অগ্নিও পূর্ণ; পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ।' ছোট মানুষ, ছোট ঘটনা, ছোট বস্তু— সব ছোটই তাঁহার কাছে পূর্ণ মূল্য ও সম্মান পাইয়াছে। গণতান্ত্রিক নিত্যগোপাল অত্যন্ত ব্যবহারকুশল ছিলেন। প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে মানিয়া লইয়া, তাহার মর্য্যাদাকে পূর্ণ মূল্য দিয়া তিনি মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। এজন্য গুরু হইয়াও তিনি কখন গুরুগিরি করেন নাই। নিজ শিষ্যদের প্রতিও তিনি কখনও অনুজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার কথা বলার ভাষাই ছিল, 'ইহা করা ভাল' কিংবা 'ইহা না

করাই ভাল।' তিনি ছিলেন মানুষের বন্ধু, Divine Companion। এইভাবেই তিনি জীবনের সকল দিকে একদিকে যেমন আধুনিকতম, আর একদিকে তেমনই তিনি চিরকালের। তিনি তাই নবীন, তিনি চির পুরাতন। আজিকার মানুষ নিত্যগোপালের মধ্যে তাহাদের সকল ভাবধারার শেষ সমাধান পাইবে, আবার পাইবে ভবিষ্যত মানুষের পায়ের চিহ্ন।

কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া নিত্যগোপাল নবদ্বীপ যাইয়া আশ্রম করিয়াছিলেন। সেখানেও বহুলোক তাঁহার চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছিল। নবদ্বীপে থাকাকালীনই ৫ই আষাঢ় ১৩০১ সালে তিনি বর্ত্তমান মহানির্ব্বাণ মঠের এই স্থানটুকু কিনিয়া এইখানে মহানির্ব্বাণ মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পর নবদ্বীপের লোক-সংঘট্ট এড়াইবার জন্য নিত্যগোপাল হুগলীর চকবাজারে ভূদেববাবুর পুরাণ হাসপাতাল বাড়ীটি কিনিয়া দেহরক্ষা পর্য্যন্ত সেইখানেই ছিলেন। তাঁহার দেহরক্ষার পরে সে দেহ এই মহানির্ব্বাণ মঠে সমাহিত করিবার নির্দ্দেশও তিনিই দিয়া গিয়াছিলেন।

কখনও কোন দলের বা বিশেষের উপাধি সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত ও সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল নিত্যগোপালের উপর প্রয়োগ করা যায় না। তিনি লিখিতেছেন, 'আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলভির নিকট কলমা পরে মুসলমান হই নাই, মুসলমানের দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। বাহ্যিক জপতপ পূজা অর্চ্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কানে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহি না—ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা অর্চ্চনা জপই আস্তিকের কার্য্য তাঁহারা বলেন। এখন কোন দলে তো আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে ডোবাতেই, পঙ্কিল পঙ্ক পরিপূর্ণ পুতিগন্ধযুক্ত পল্বলেই হইয়া থাকে, স্বচ্ছ সরোবরে প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি?—আমি সকল দলে ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেমভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই, সেইজন্য আমার এক সকল দল লয়ে অখণ্ড দল। শাক্ত শৈব গাণপত বৈষ্ণব খ্রীষ্টান মুসলমান সকল জাতি সকল সম্প্রদায়ই আমাকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন। হিঁদুর বাড়ী মুসলমানেও ভিক্ষা করেন। মুসলমানের বাড়ীতে

হিঁদুতে ভিক্ষা করেন না।'—দল লইয়া আজ চারিদিকে যে কুৎসিৎ হানাহানি চলে, সেই পটভূমিকায় দল না করার এই যে উদার মনোবৃত্তি, ইহা আজ আমাদের বড় প্রয়োজন। বিশ্বে একের সঙ্গে অপরের মিলিত হইতে হইলে, একটী এক-বিশ্ব রচনা করিতে হইলে এই সর্ব্ব দল লইয়া এক অখণ্ড দল গঠন করিবার মন্ত্র আমাদিগকে লইতে হইবে।

নিত্যগোপালের সমস্ত জীবনখানাই ছিল বিপ্লবাত্মক, সংগঠনাত্মক—তাঁহার সামগ্রিক সমন্বয় দর্শনের সামগ্রিক জীবনখানা দিয়া তিনি জীবনের সমস্ত দিককে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে আসিয়াছিলেন। আমরা এতদিন মায়াবাদের ভাষায় কথা কহিয়াছি, গান গাহিয়াছি, মিথ্যা এই জীবনের দুর্ভোগ্ কবে কাটিবে, কি করিয়া কাটিবে সারা জীবন তাহারই প্রচেষ্টা করিয়াছি—আবার তাহারই প্রতিক্রিয়ায় আজিকার দিনে আমরা জীবনের সকল দিকে শ্রদ্ধাহীন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া জীবনের সৌন্দর্য্য হারাইয়াছি। এই আবেষ্টনের মধ্যে নিত্যগোপাল যে কথা লইয়া আসিয়া ছিলেন মনীষী হোয়াইটহেডের ভাষায় তাহা '......It is as true to say that the World is immanent in God, as that God is immanent in the world. It is as true to say that God transcends the world, as that the World transcends God. It is as true to say that God creates the World, as that the World creates God.' আর মনীষী জেমস্ জিনস্ও সেই আশার বাণী শুনাইতেছেন, 'The old physics showed us a universe which looked more like a prison than a dwelling place. The new physics shows us a universe which looks as though it might conceivably form a suitable dwelling-place for free men, and not a mere shelter for brutes—a home in which it may at least be possible for us to mould events to our desires and live lives of endeavour and achievement.' এই নূতন চিন্তাধারায় বিশ্ব সংগঠন করিতে শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন। এজন্য চাই নূতন করিয়া দর্শনকে মানুষের কাছে উপস্থিত করা, নূতন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করা, নূতন সাহিত্য রচনা করা, নূতন করিয়া গান বাঁধা। ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনে আলীপুর জেলে থাকাকালীন দশখানা উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা—

এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য শ্রীনিত্যগোপালের সমন্বয় দর্শনের আলোকে রচনা করিয়াছিলাম। এই আলোকে নূতন স্মৃতি, নূতন সাহিত্য, নূতন গান রচনার কাজে আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়াছেন, "এক ব্যক্তি হীরক পাইয়াছে, অথচ সে হীরক চেনে না; সুতরাং সে হীরকের মর্ম্মও বোঝে না। ছদ্মবেশী ভগবান পাইয়াছ, অগ্রে তাঁহাকে চেন, তবে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবে।' আমরা হীরক পাইয়া ছিলাম, ছদ্মবেশী ভগবান পাইয়াছিলাম। পাইলেই পাওয়া হয় না। তাঁহার অনন্ত স্নেহের ভিতর আমরা ডুবিয়া ছিলাম, চিনিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। একদিন বসুদেবও শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইয়াও না পাওয়ার বেদনায় নারদের নিকট বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণকে তো পাইয়াছি, কিন্তু মুক্তি তো আসে নাই, প্রাণ তো জুড়ায় নাই। কি করিয়া কৃষ্ণকে পাই তাহা বলুন। পাইয়াও না পাওয়ার বেদনা যে অপরিসীম, আজ তাহা বুঝিতেছি। বেদনা আমাদের প্রচুর, অযোগ্য আমরা, দীন আমরা। তাঁহার স্নেহের তাঁহার অনন্ত করুণার সম্মান দান আমরা করিতে পারি নাই, ইহা স্মরণ করিলে আমরা বেদনায় অভিভূত হই। আজ বুঝিতেছি আপনাদের না পাইলে, বাঙ্গলাকে না পাইলে, বিশ্বকে না পাইলে তাঁহাকে পাওয়া হইবে না। তাঁহাকে আরও নিবিড় করিয়া পাইবার জন্যই আজ আপনাদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ তিনি এই শতবার্ষিকীর মধ্য দিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ও দর্শন আমাদের দায়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আজ আমাদের শ্রীনিত্যগোপাল দায়, আপনারা আমাদের এই দায়মুক্ত করুন। আবার আমি মহানির্ব্বাণ মঠের পক্ষ হইতে ও শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্ম-শতবার্ষিকী কমিটীর পক্ষ হইতে আমাদের প্রাণের সকল বেদনা ও আনন্দ লইয়া আপনাদের সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি। শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব সার্থক হউক, তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শে ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ। বন্দেমাতরম্

বাসন্তী অষ্টমী তিথি, ২৭শে চৈত্র, ১৩৬০।

মহানির্ব্বাণ মঠ, ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯

জয়া কস্‌মোডেমিনস্‌কয়া

ধীরেন্দ্র চৌধুরী

পেট্রিস্টসেভো একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, মস্কো থেকে যে পথ গিয়েছে মাঝোইসক সহরের দিকে তার ধারে। এই গ্রামের নামও বড় একটা কেউ শুনে নাই ১৯৪১ সনের আগে, কিন্তু ঐ অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামখানাই আজ পরিণত হয়েছে এক মহাতীর্থে জয়ার জন্মস্থান বলে। এখন কতশত নরনারী আসে প্রতিদিন ঐ গ্রামে, দূরদূরান্তর হতে, জয়ার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

গত মহাযুদ্ধে সহস্র সহস্র রুশ যুবক ও যুবতীকে হত্যা করেছে জার্মাণরা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে; কিন্তু মাত্র অষ্টাদশ বর্ষীয়া জয়ার আত্মত্যাগ যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্রে তেমনটি আর দেখা যায় নাই কোন ক্ষেত্রে। এর কারণ, রুশীয় আদর্শের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, জয়া ছিল তারই প্রতীক। তাই দেখতে পাই কতই না চলছে আয়োজন রাশিয়ার দিকে দিকে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার জন্য জয়ার জীবনাদর্শে। জয়ার জীবন অবলম্বন করে রচিত হয়েছে নাটক ও গীতিনাট্য, সৃষ্টি হয়েছে উপন্যাস, কাব্য আর ছায়াচিত্র। তার ব্যবহৃত জিনিষগুলিও রাখা হয়েছে রাশিয়ার নানা ম্যুজিয়মে, আর কত রাস্তা, কত কারখানার নাম করণ হয়েছে নূতন করে জয়ার নামে।

এখন যে শক্তিপ্রভাবে গোটা রাশিয়ার মনপ্রাণ হরণ করে বসেছে জয়া এমনি করে, তা যদি বুঝতে হয় জানতে হয়, তবে প্রয়োজন একটু আলোচনা করে দেখা তার জীবনধারা নিয়ে।

১৯২৩ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে জয়া জন্মগ্রহণ করে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে। তার শৈশব ও বাল্য কেটে গেছে প্রকৃতির কোলে— গ্রামের শান্ত পরিবেশে, কখনও মুক্ত আকাশ বা বার্চবীথির ছায়া তলে, অথবা কৃষিক্ষেত্রে বা নদীসৈকতে; আবার কখনও চিরতুষারাবৃত দুর্গম সাইবেরীয়ার নানা হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত পাহাড় পর্ব্বতে বা অরণ্যে। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যময় প্রভাব যে রয়েছে অনেকখানি জয়ার মানসিক

গঠন মূলে, তাতে আর সন্দেহ নেই ; তাই দেখি জয়া কালী ও কমলা একাধারে।

আট বছর যখন বয়স তখন ভর্ত্তি হল জয়া স্কুলে এবং যোগ দিল যথানিয়মে শিশু-সংঘ পাইওনিয়ার্সে। যুব সংঘ কম্‌সোমলের আদর্শের ন্যায় এই সমিতিরও আদর্শ হল 'সত্যের সাধনা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, পরিবার ও সমাজের সেবা' ইত্যাদি। এই আদর্শ যে শুধু একটা কথা মাত্র ছিল জয়ার কাছে তা নয়, সে তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ করে যেত ঐ আদর্শ নিয়ে।

জয়ার মা বলেন—"ন্যায় চাই এই ছিল ওর কাছে পুর্ণতার বিকাশ। অতি অল্প বয়স থেকেই ওর স্বভাব ছিল যেমন স্পষ্ট তেমনই অকপট। মিথ্যাবাদী ও ভণ্ডকে সে ঘৃণা করত। লেখা পড়াতেও সে ছিল খুব ভাল। রাশিয়ার স্কুলের সর্ব্বোচ্চ সম্মানজনক শব্দ 'চমৎকার' এই মন্তব্য নিয়ে সে পাশ করত পরীক্ষায়।" কেবল লেখা পড়া, খেলাধূলা আর পাইওনিয়ার্সের কাজ নিয়েই যে ব্যস্ত থাকত জয়া তা নয়, গৃহ কর্ম্মের প্রতিও তার দায়ীত্ব বোধ ছিল তুল্য রকমে। তার মা বলেন "এক সময়ে আমাকে ২।৩টি কারখানায় কাজ করতে হত। ঘরে ফিরে দেখতাম জয়া সব কাজ সেরে রেখেছে, বাজার করা, রান্না করা, ঘর সাফ করা, সব কিছু।"

জয়ার যখন বয়স হল মাত্র দশ বছর তখন মারা গেলেন তার বাবা। তদবধি জয়া যেন আরও অনুরক্ত হয়ে পরল তার মার। মাকে সাহায্য করা সকল কাজে, মায়ের মনোবেদনার ভার লাঘব করা নানা প্রবোধ বাক্যে এবং তারই সঙ্গে ছোট ভাই স্বরাকে দেখাশুনা করা—এই হয়ে দাঁড়াল তার কাজ সংসারে।

পনর বছর বয়সে জয়া ভর্ত্তি হয় কম্‌সোমলে। বলা বাহুল্য এই সমিতির কাজও সে করে যেতে লাগল প্রশংসা নিয়ে। এবার স্থরু হল জয়ার সমাজ সেবার কাজ বৃহত্তর ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়ে। এই বয়সেই সে বুঝতে পেরেছিল নারীজাতি স্থশিক্ষিতা না হলে উন্নতি হবে না দেশের কোন কালে। তাই জয়া লেগে গেল তার সাধ্যমত স্ত্রীশিক্ষার কাজে, আর তার পরিচিতা মেয়েদের দিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে প্রত্যেককে শিক্ষা দিতে হবে অন্ততঃ দশটি মেয়েকে। এই ভাবে নিজের প্রতি, সংসার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব বোধ জেগে উঠতে লাগল জয়ার মনে নানা গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে

এবং তার ঐ বোধ বেড়ে যেতে লাগল দিনের পর দিন বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

কাজের ন্যায় পড়াশুনার দিকেও বেশ ঝোঁক ছিল জয়ার, তাই বলে তথা-কথিত প্রগতিপন্থীদের মত কতগুলা বাজে বই নিয়ে সে পরে থাকত না আধুনিকতার ভান করে।

জয়া বুঝেছিল, দেশের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন যে, সে কখনও বড় হতে পারে না জীবনে। তাই সে পড়ত বেশীর ভাগ রাশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, লোকসাহিত্য, উঁচুদরের সব উপন্যাস ও সমালোচনা। এর মধ্যে আবার রুস ইতিহাস ও লোক সাহিত্যই ছিল তার বিশেষ প্রিয় এবং তা থেকেই প্রকৃত দেশাত্মবোধ দানা বেঁধে উঠতে লাগল তার মনে ধীরে ধীরে। মহৎ লোকের জীবনী পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে। তাই দেখি সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে জয়া পড়ত রুশ মহাপুরুষ, সাহিত্যিক ও বীর বৃন্দের জীবনী এবং তা থেকে সে আহরণ করত নিজ জীবন গঠনের মাল মসলা আর লেখত প্রবন্ধ তাই নিয়ে। হাই স্কুলের যখন ছাত্রী, তখনই সে যে-প্রবন্ধ লিখেছিল রুশ লোক-সাহিত্যের নায়ক মুরোমেজকে জাতীয় আদর্শের প্রতিমূর্ত্তিরূপে চিত্রিত করে, তা আজিও পড়ান হয় নিয়মিত ভাবে রাশিয়ার সব স্কুলে স্কুলে। কেবল যে রুশ সাহিত্যের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল জয়ার আকর্ষণ তা নয়। তার মন ছিল যেমন উদার তেমনই জ্ঞান-পিপাসু। তাই দেখতে পাই অন্যান্য দেশের প্রখ্যাত লেখকদিগের লেখা বই যখনই যা বেরিয়েছে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে, তখনই তা পড়ে ফেলেছে জয়া আগ্রহ নিয়ে। ঋষি টলষ্টয় ও পুস্‌কিনের মত বায়রণ ডিকেন্সও ছিল তার শ্রদ্ধার পাত্র।

বর্ত্তমান জগৎ যে বহুদূর এগিয়ে গেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে, তা সত্য কিন্তু এ কথাও তুল্যরূপে সত্য যে, মনের দিক দিয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে বর্ত্তমানের অধিকাংশ লোকই পিছিয়ে পরে আছে প্রায় আদিম যুগে। এখন এই নিম্নস্তর অতিক্রম করে উন্নত স্তরে উঠতে গেলে প্রয়োজন ভোগের উপকরণ বৃদ্ধি নয় সভ্যতার ছদ্ম নামে, চাই মানবতার উচ্চ আদর্শ চোখের সামনে ধরে চলা প্রতিপদক্ষেপে। জয়া যে উচ্চ আদর্শ নিয়ে চলেছিল তার একটু আভাষ আমরা পেতে পারি তার ডায়েরীর পাতা, যা পাওয়া গেছে তার মৃত্যুর পরে, তাই থেকে। তাতে লেখা আছে, "মুখ, পরিধেয়, চিন্তা ও

আত্মা মানুষের সব কিছুই সুন্দর হওয়া চাই।" অন্যত্র লেখা আছে "সেক্সপীয়রের ওথেলোর বিষয় বস্তু নৈতিক পবিত্রতা ও সুউচ্চ আদর্শের জন্য মানুষের সংগ্রাম—মানুষের উচ্চ অনুভূতির বিজয়।" কোথাও বা লেখা রয়েছে—"নিজকে সম্মান কর। নিজকে খুব বাড়িয়ে ভেবো না। কূপমণ্ডুক হয়ে থেকোনা, এক ঘেয়ে হয়ো না। লোকে আমাকে শ্রদ্ধা করে না, চিনল না বলে চেঁচিও না। নিজকে তৈরী করার চেষ্টা কর, তা হলেই নিজের মধ্যে অধিকতর বিশ্বাস সঞ্চয় করতে পারবে।" এই থেকে বুঝা যায় না কি, কত উন্নত ছিল জয়ার জীবন আদর্শ আর তার নৈতিক বোধ?

সমাজ সেবার কাজে জয়াকে আসতে হয়েছে অনেক যুবক কমরেড্‌দের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে; কিন্তু তাই বলে সে প্রগতি আর ব্যক্তি স্বাধীনতার অছিলায় তার আত্মসম্মান বোধ ও সংযমকে এতটুকু ম্লান হতে দেয় নি। তার মা বলেন "পুরুষ বন্ধুদের কাছে চিঠি পাঠানোর পক্ষপাতি সে ছিল না। এই ধরণের বেহায়াপনার সে বিরোধী ছিল। তবুও আমার মনে একটা উৎকণ্ঠা ছিল। শেষে এক দিন ওর স্কুলে গিয়ে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওকে দেখি। সর্ব্বপ্রথম আমি ওর চোখে আগুন দেখলাম। অনেকটা স্বস্তির ভাব মনে নিয়ে ফিরে এলাম। বুঝলাম ও মাছ নয়, স্ত্রীলোকের রক্তই ওর দেহে প্রবহমান।"

উচ্চ আদর্শ ও সুবুদ্ধি সম্পন্না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সমাজ ও গৃহসেবাপরায়ণা, ভক্তিমতি, বিদুষী মেয়ে—এই ছিল পরিচয় জয়ার বিগত রুশ জার্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বক্ষণে। কিন্তু যুদ্ধ বাঁধবার কিছু দিনের মধ্যেই দেশের স্বাধীনতা যখন হয়ে পরল বিপন্ন আর জার্মাণ বর্ব্বরতাও পৌছল গিয়ে চরমে, তখন ভাবান্তর ঘটল জয়ার মনে। কমলা এবার কালীরূপে অবতীর্ণা হল জীবন নাট্যে। জার্মাণ বর্ব্বরতা ধ্বংস করে দেশ ও মানবতাকে রক্ষা করার মহান ব্রত গ্রহণ করল জয়া। যদিও তখন পর্য্যন্ত কোন বাধ্য বাধকতাই ছিল না যুদ্ধে যাবার, তবুও জয়া যোগ দিল গেরিলা বাহিনীতে, স্বেচ্ছায় মানবতার আহ্বানে। মায়ের অপার স্নেহ, চোখের জল কোন কিছুতেই টলাতে পারল না জয়াকে তার সঙ্কল্প থেকে।

একদিন অতি প্রত্যুষে জয়া বেড়িয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে, দুর্গম কর্তব্য পথে তার এত আপনার, এত শ্রদ্ধার 'মা মণি'র কাছে বিদায় নিয়ে। কে বুঝেছিল তখন এই তার শেষ বিদায় মায়ের কাছে, দেশের কাছে! চারদিকে তুষার

পাত ঝড়বৃষ্টি, তাতে আবার অনাহার, অর্দ্ধাহার; নাই নিদ্রা, নাই কোন আশ্রয়। কখনও অরণ্যে কখনও গুহায় গহ্বরে বাস, তারপর শত্রুর গুলির আঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা পদে পদে; কিন্তু জয়া নির্ভিক, অচল তার প্রতিজ্ঞায়। সে হাসিমুখে করে যেত লাগল তার কর্ত্তব্য সকল বিপদ সকল দুঃখ উপেক্ষা করে।

অবশেষে একদিন ধরা পড়ে গেল জয়া জার্মাণদের হাতে। প্রথমে তারা কতই না ভয় দেখাল তাকে নানা রকমে গোপন তথ্য জানবার জন্য; কিন্তু কোন ফল হল না দেখে জার্মাণরা সুরু করে দিল নৃশংস অত্যাচার জয়ার উপরে দু' তিন দিন ধরে। উলঙ্গপ্রায় করে জয়ার আপাদ-মস্তক ক্ষতবিক্ষত করে দিল তারা বেত্রাঘাতে। জয়া তবুও রইল নির্ব্বাক, অটল প্রতিজ্ঞায়—অন্যায়ের কাছে সে মাথা নত করবে না কিছুতে। নিরুপায় হল তখন জার্মাণ বর্ব্বরতা। স্থির হল এই নৈতিক আদর্শবাদকে দূর করে দিতে হবে জয়াকে হত্যা করে।

১৯৪১ সন, ৫ই ডিসেম্বর। ফাঁসির মঞ্চ তৈরী হয়েছে গ্রামের সাধারণ পার্কে। এ দিকে গ্রামের সবাইকে বাধ্য করা হয়েছে ভয় দেখিয়ে ঐ নারকীয় দৃশ্য দেখবার জন্য। তাই সবাই এসেছে গ্রামের। কেউবা আবার সরে পড়েছে অলক্ষ্যে, কেউবা কাঁদছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল চোখে দিয়ে। ছিন্নবসনা, রক্তাক্তকলেবরা জয়া সান্ত্রী প্রহরায় এসে দাঁড়াল মঞ্চের উপরে অতি কষ্টে ধীর পদক্ষেপে। মুখমণ্ডল সেই দৃঢ়তা ব্যঞ্জক, নেই এক ফোঁটা জল তার চোখের কোণে—যেন মূর্ত্তিমতি নৈতিক প্রতিবাদ পশুবলের বিরুদ্ধে।

এবার বিজয়-মাল্য (ফাঁসির রজ্জু) পরান হল জয়ার কণ্ঠে। এখন ফটো তোলা হবে তার। ঠিক এই মুহূর্ত্তে জয়া বলে উঠল দৃঢ়স্বরে ফাঁসির দড়িটি একটু সরিয়ে হাত দিয়ে—'এত বিষণ্ণ হয়ে আছ কেন বন্ধুগণ! চিরবিদায়।'

তারপর সব শেষ হয়ে গেল চোখের পলকে।

জয়ার পার্থিব দেহ নিঃশব্দ, নিস্পন্দ ঝুলতে লাগল ফাঁসির মঞ্চে, জনহীন ঐ তুষার প্রান্তরে অনেক দিন ধরে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে বাত্যা প্রবাহে। আর তার মুক্ত আত্মা যেন বলে যেতে লাগল দিকে দিকে বিশ্বমানবেরে ডেকে 'পরাজিত হল পশুবল নৈতিক বলের কাছে।'

পুস্তক পরিচয়

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র :—১ম ও ২য় খণ্ড। সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ বঙ্গানুবাদ ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, এম্. এ, পি. এইচ্-ডি। প্রকাশক—জেনারল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইম্পিরিয়াল সাইজ, পৃষ্ঠা ১ম খণ্ড ৩১+২৬৫ ; ২য় খণ্ড ২৮৮ ; মূল্য ৬৲+৬৲=১২৲

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দেশে এবং বিদেশে বহুদিন একটা কথা শিথিলভাবে মুখে মুখে প্রচারিত হইতে হইতে এখন প্রায় সত্যের মর্যাদাই লাভ করিতে বসিয়াছে,—তাহা হইল এই, ভারতবর্ষ মায়াবাদের দেশ—বেদান্তের দেশ—সাধু সন্ন্যাসীর দেশ। কথাটায় আপত্তি করিবার তেমন বিশেষ কিছু থাকিত না যদি না ইহার পিছনে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপাত্মক ব্যঞ্জনা না থাকিত। সে ব্যঞ্জনাটি হইল এই যে, ধর্মের নামে চিরদিন পাগল থাকাতে জাতীয় জীবনে, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে আমরা যেন কোন দিনই কোনও দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম না। কোনও কোনও ইংরেজ পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে ক্ষীর-সমুদ্র এবং দধি-সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নাই। আমরাও একটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অভিমান লইয়া মোটামুটিভাবে এই সকল কটূক্তির সঙ্গেই প্রায় মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই সকল শিথিল ভাষণ এবং অপ-ভাষণের একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হইল কৌটিলীয়ের অর্থশাস্ত্র। ডক্টর আর্, শ্যামশাস্ত্রী মহাশয় এই কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া প্রাচীন ভারতেবর্ষের ইতিহাসের উপরে অপ্রত্যাশিত আলোকপাত করিলেন। কৌটিলীয়ের অর্থশাস্ত্রখানি নামে 'অর্থশাস্ত্র' মাত্র বটে ; কিন্তু একটি জাতির তৎকালীন জীবন সম্বন্ধে এমন সর্বাঙ্গপূর্ণ গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও চলে।

এই কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র হইল মৌর্য বংশের সংস্থাপক এবং নন্দবংশের ধ্বংসকারী কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কুটিল্যের রচিত গ্রন্থ। এই কুটিল্যেরই অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত বা প্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত। কুটিল বা বক্রবুদ্ধির জন্যই চাণক্য কুটিল্যরূপে খ্যাত ছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তবে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

বলিয়া আমরা যে গ্রন্থখানি পাইতেছি তাহা মৌর্যযুগের স্বয়ং চাণক্য পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত না পরবর্তী যুগে কৌটিল্যের সিদ্ধান্তসমূহকে অবলম্বন করিয়া কোনও নীতিজ্ঞ সমাজতত্ত্ববিদ্ বা তজ্জাতীয় ব্যক্তি সংঘ কর্তৃক লিখিত—পণ্ডিত মহলে এ-সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী দুইটি মতবাদ রহিয়াছে। গ্রন্থের বর্ত্তমান অনুবাদক এবং সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ ভূমিকায় এসকল বিতর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক হিসাবে এই বিতর্কে প্রবেশ না করিয়া আমরা যদি মৌর্যযুগের কিছু পরবর্তী কালের এক বা একাধিক ব্যক্তির রচনা বলিয়া গ্রন্থখানিকে গ্রহণ করি তবেও ইহার মূল্য বিশেষ হ্রাস পাইবে না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র শুধু অর্থশাস্ত্রই নয়, ইহার মধ্যে তৎকালীন রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি—প্রত্যেকটি জিনিষেরই প্রায় সমস্ত সমস্যার আলোচনা দেখিতে পাই এবং সেইসকল সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন বৃহত্তর জাতীয় জীবনের একটি ব্যাপক চিত্র পাইতেছি। একদিকে যেমন রাজতন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া রাজার স্বরাষ্ট্রনীতি এবং পররাষ্ট্র-নীতি—এবং বিশেষ করিয়া উভয়ক্ষেত্রেই গূঢ়পুরুষ নিয়োগাদি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা পাইতেছি, অপর দিকে আবার পারিবারিক জীবনের কর্তব্যা-কর্তব্যের খুঁটিনাটি সম্পর্কেও আমরা বিস্তারিত আলোচনা পাইতেছি। সুযোগ্য অনুবাদক মহাশয়ের ভাষায়ই বলা যাইতে পারে,—"তিনি যে এই অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি—এই বিদ্যাচতুষ্টয়েই নিজের অধিকারের প্রমাণ দিয়াছেন তাহা নহে, ইহাতে তিনি শুল্বশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভূগোল ও ইতিহাস-বেদ প্রভৃতি নানা বিদ্যা ও নানা শাস্ত্রের প্রকৃষ্ট জ্ঞানেরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।" মোটের উপরে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজতন্ত্রের অন্তর্গত একটি বিরাট আঞ্চলিক জীবনের বাস্তব ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থখানি একটি তথ্যের খনি; তেমনই আবার অন্যদিক হইতে দেখিতে পাই, এইগ্রন্থে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহার ভিতরে এমন একটি লোক ব্যবহারের উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞার পরিচয় আছে, যাহার ফলে এ সকল সম্বন্ধে যে সব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই, তাহা আজিকার দিনেও সর্বাংশে না হইলেও কিয়দংশে প্রযোজ্য। এই গ্রন্থ মধ্যে আরও একটি লক্ষণীয় সত্যের সন্ধান পাই; তাহা হইল এই যে কৌটিল্য বা তাঁহার পরবর্তীকালের অনুগামী

ব্যক্তি বা সংঘই যে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের এই বাস্তবদিকটি লইয়া এমন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নহে, ইহার প্রাচীন অনবচ্ছিন্ন ধারা বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চলিত ছিল। নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে কৌটিল্য ভারদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি, বাহুদন্তিপুত্র, পরাশর, পারাশর প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের মতবাদ একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছেন। এই উল্লেখের দ্বারাই পূর্বধারার অনুমান করা যাইতে পারে।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের ন্যায় একখানি গ্রন্থের বহুল প্রচারের নানাদিক হইতেই প্রয়োজন; কিন্তু মূল গ্রন্থখানি শুধু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাহা নহে, যেরূপ সংক্ষিপ্তাকারে দুরূহ ভাষায় লিখিত, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও তাহার ভিতরে প্রবেশ লাভ বিশেষ কষ্টসাধ্য। আমাদের বাঙলা দেশে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রবীণ পণ্ডিত ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় সেই দুরূহ কর্মের ভার নিজে গ্রহণ করিয়া সকলেরই শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সুষ্ঠুরূপে এই গ্রন্থের অনুবাদের জন্য অনেক মানসিক এবং কায়িক শ্রমেরও প্রয়োজন ছিল, অনুবাদটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে ডক্টর বসাক ইহার কোনটিরই কোনও ত্রুটি করেন নাই। গ্রন্থখানি মূল সংস্কৃতে যেরূপ ভাবে লিখিত তাহার ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া গেলে তাহা কাহারও নিকট ভাল করিয়া বোধগম্য হইত বলিয়া মনে হয় না; সেই সত্যটি সম্বন্ধে প্রথমাবধি সচেতন থাকার জন্য গ্রন্থকার সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়াস পান নাই; তিনি মূলের কোনও কথাকে কোনও রূপে বিকৃত না করিয়া যথাসম্ভব ব্যাখ্যা মূলক অনুবাদের দ্বারা মূলের অর্থ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথমে তিনি একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা দ্বারা গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের সঙ্গে একটি পরিশিষ্ট সংযোজনা করিয়া তাহার ভিতরে লেখক প্রাচীন দণ্ডনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের একটি চমৎকার অভিধান দিয়াছেন। বর্তমানে এই সকল বিষয়ে বাঙলা ভাষায় পারিভাষিক শব্দের বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং এই পারিভাষিক শব্দের অভিধানও যথেষ্ট কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থশেষে উভয় খণ্ডেই একটি শব্দ নির্ঘণ্টও সংযোজিত হইয়া গ্রন্থের প্রয়োজন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক মাত্রের নিকটেই গ্রন্থখানি পরম সমাদরের বস্তু হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দশমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১০।১২

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১০।১৩

(ভগবানের বিভূতি ও যোগ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন) পরং ব্রহ্ম [পরব্রহ্ম] পরং ধাম [পর জ্যোতি, পর দিব্য ধাম] পবিত্রং [পাবন] পরম্ [প্রকৃষ্ট] ভবান্ [তুমি] পুরুষং [পুরুষ] শাশ্বতং [নিত্য] দিব্যম্ [স্বর্গে অবস্থিতঃ ক্রীড়াময়, জ্যোতির্ম্ময়] আদি দেবম্ [সর্ব্বদেবগণের আদিতে ভব] অজম্ [অজ] বিভুং [ব্যাপকস্বভাব] (এইপ্রকারেই) আহুঃ [বলিয়াছেন] ত্বাম্ [তোমাকে] ঋষয়ঃ সর্ব্বে (সর্ব্ব ঋষি) দেবর্ষিঃ নারদঃ [দেবর্ষি নারদ] তথা [সেইরূপ] অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ স্বয়ং চ এব [তুমি নিজেও] ব্রবীষি [এই প্রকার বলিলে] মে [আমাকে]।

অর্জ্জুন বলিলেন—তুমি পরব্রহ্ম, পরমধাম, পরম পবিত্র। ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবতা ও ব্যাসও তোমাকে শাশ্বত পুরুষ, দিব্য, আদিদেব, অজ বলেন ; তুমিও আমাকে এইরূপ বলিলে। ১০।১২-১৩

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১।১৪

সর্ব্বং এতৎ [ঋষিগণ ও তোমাদ্বারা যথোক্ত এই সব] ঋতং [সত্য বলিয়াই] মন্যে [মনে করি] যৎ [যাহা] মাং [আমার কাছে] বদসি [বলিতেছ] হে কেশব. হি [যেহেতু] তে [তোমার] হে ভগবান, ব্যক্তিং [সর্ব্বব্যক্তি সমন্বিত অব্যক্ত ব্যক্তিত্ব] ন বিদুঃ [জানেন না] দেবাঃ [দেবগণ] ন দানবাঃ [দানবগণও জানেন না]।

হে কেশব, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই আমি সত্য মনে করি; কেননা হে ভগবান, তোমার অব্যক্ত ব্যক্তি দেবগণও জানেন না, দানবগণও নন্। ২০।১৪

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১০।১৫

(যেহেতু তুমি দেবগণেরও আদি, অতএব) স্বয়ম্ এব [নিজেই] আত্মনা [নিজকে দিয়া] আত্মানং [নিজকে] বেত্থ [জান; পুরুষোত্তমস্তরে কর্ত্তা—কর্ম্ম—করণ—সম্প্রদান—অপাদান—সম্বন্ধ—অধিকরণ সবই পুরুষোত্তম, "স্ব্"—ইহাই এই স্তরের অপূর্ব্বত্ব] হে পুরুষোত্তম [ক্ষর-অক্ষর অতীত ও ক্ষরাক্ষরানুগ, লোকে ও বেদে প্রথিত ঐতিহাসিক ও পারমার্থিক ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবৎ সমন্বিত] ভূতভাবন [হে ভূতভাবন, ভূত যাহার ভাবন এবং ভূতের যিনি ভাবন (জন্মদাতা)] ভূতেশ [ভূতই যাহার ঈশ, এবং ভূতের যিনি ঈশ] হে দেব দেব [সর্ব্বদেব সমন্বয়, দেবগণেরও দেব] হে জগৎপতে [জগতের যিনি পতি এবং জগতের মধ্য দিয়া নন্দনরূপে যিনি জন্মান, তিনিই সত্য বাস্তব জগৎপতি]।

হে ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতি, পুরুষোত্তম, তুমি নিজকে দিয়াই নিজে নিজকে জান। ১০।১৫

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।

যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১০।১৬

বক্তুম্ [বলিতে] অর্হসি [যোগ্য হও] অশেষেণ [শেষ না রাখিয়া সম্পূর্ণ ভাবে] দিব্যাঃ [দিব্য] হি আত্মবিভূতয়ঃ [পুরুষোত্তম-পরমাত্মার বিভূতি সমূহ] যাভিঃ [যে সব] বিভূতিভিঃ [আত্ম মাহাত্ম্যবিস্তার সমূহের দ্বারা] লোকান্ ইমান্ [এই লোকসমূহ] ত্বং [তুমি] ব্যাপ্য [ব্যাপিয়া] তিষ্ঠসি [অবস্থান করিতেছ]।

তুমি যে সকল বিভূতিদ্বারা এই লোক সমূহ ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই সকল দিব্য বিভূতি শেষ না রাখিয়া বলিবার তুমি যোগ্য বটে। ১০।১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১০।১৭

কথং [কি করিয়া] বিদ্যাম্ [জানিতে পারিব?] অহম্, হে যোগিন্ [হে কুশল] ত্বাং [তোমাকে] সদা পরিচিন্তয়ন্ [চিন্তা করিলে] কেষু কেষু চ

[এবং কোন্ কোন্] ভাবেষু [বস্তুতে] চিন্ত্যঃ অসি [ধ্যেয় হইতেছ] হে ভগবন্, ময়া [আমাদ্বারা]।

হে যোগিন্, সর্ব্বদা কি প্রকারে চিন্তা করিলে তোমাকে জানিতে পারিব ? এবং হে ভগবান্ কোন্ কোন্ বস্তুতে আমি তোমার ধ্যান করিব ? ১০।১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১০।১৮

বিস্তরেণ [বিস্তার পূর্ব্বক] আত্মনঃ [নিজের] যোগং [পোষণঘন যোগ, মায়ার বিভূতির সঙ্গে, শক্তি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। বিভূতির ক্ষেত্রে শক্তিতে যেটী ছোট সেইটীর চেয়ে শক্তিতে যেটী মহান্ সেইটীর মূল্য দেওয়া হয়। এই বিভূতিই যদি এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে একান্ত সত্য হয়, তবে ছোটগুলি বড়দের চাপে নিজ সত্তা পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারে না। তাই পুরুষোত্তম পোষণঘন 'সম সাক্ষাৎ' সম্বন্ধযুক্ত 'যোগের' উপদেশ দিতেছেন। অতি ছোটও যে বিশ্ব সভ্যতায় কোনও না কোন দৃষ্টি কোণে শক্তিমানের চেয়ে বড়, সেও যে এক ও অদ্বিতীয়, ছোট হনুমান, ছোট পাষাণী অহল্যা, ছোট বিল্বমঙ্গল, ছোট কুব্জা, রবীন্দ্রনাথের ছোট পোষ্ট মাষ্টার, ছোট নাবিকও যে কলাপূর্ণ সভ্যতার সামনে দাঁড়াইবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাহাই পুরুষোত্তম-যোগ প্রচার করিয়াছে। ছোট ব্রহ্ম-কৈবর্ত্তকই ব্রজে নৌকালীলা করেন; ছোট গোপ গোপী ব্রজে ব্রহ্মময়, ব্রহ্মময়ী। বড়র মহিমা বাড়ায় বিভূতি দর্শন, ছোটর মাধুর্য্য বাড়ায় যোগ-দর্শন] বিভূতিংচ [মায়াবিভূতি, শক্তিকেন্দ্র] হে জনার্দ্দন [বিশ্বরূপকে ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য যত্নপর জনসমূহকে অর্দ্দন করেন, অথবা ভক্তজনসমূহদ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন্য অর্দ্দিত বা পূজিত হন যিনি, তিনিই জনার্দ্দন] ভূয়ঃ [পুনরায়, যদিও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে] কথয় [বল] হি (যেহেতু] তৃপ্তিঃ [পরিতোষ] নাস্তি [নাই] শৃণ্বতঃ [শ্রবণকারী আমার] অমৃতম্ [তোমার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যামৃত] (এই মায়া-বিভূতির ক্ষেত্রে শক্তি ছড়ানো রহিয়াছে ; এই শক্তি কোথায়ও কোথায়ও জমাট বাঁধিয়া কেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছে। যে রূপে পুরুষোত্তম হন একান্ত ঈশ্বর, সেই রূপ-ভাবনায় বিভিন্ন শক্তি-কণাগুলি পরস্পরকে দাবাইয়া চলিতেছে, কাজেই শক্তি কেন্দ্র গুলি ছড়ানো শক্তিনিচয়কে শোষণই করিতেছে, স্বয়ংমূল্য কাড়িয়া লইতেছে। কিন্তু যে রূপে তিনি পোষণের কৌশলে প্রতিটী শক্তি কণা ও শক্তি কেন্দ্রের

সহিত সমভাবে যুক্ত, সম-যোগে যুক্ত, সেই রূপই 'যোগ'। যোগহীন একান্ত বিভূতি ঈশ্বরের শোষণময় ঐশ্বর্য্য, পুরুষোত্তমের মাধুর্য্য নয়]।

হে জনার্দ্দন, তুমি পুনরায় বিস্তারপূর্ব্বক নিজের যোগ ও বিভূতি বল, যে হেতু তোমার অমৃতবাণী শুনিতে শুনিতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। ১০।১৮

শ্রীভগবান উবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১০।১৯

হন্ত [হর্ষ সূচক অব্যয়] (এইবার) তে [তোমাকে] কথয়িষ্যামী [বলিব] দিব্যাঃ [দিব্য] আত্মবিভূতয়ঃ [নিজের বিভূতি সমূহ] প্রাধান্যতঃ [যেখানে যেখানে যে যে প্রধান বিভূতি আছে, সেই সেই প্রধান বিভূতিরই প্রাধান্য দিয়া। আমার যোগ-রূপ ভুলিয়া প্রধান শক্তিকেন্দ্রগুলির চতুর্দ্দিকে অপ্রধান ভাবে ছড়ানো, ভাবের দৃষ্টিতে অপ্রধান (অথচ রসদৃষ্টিতে প্রধান) শক্তিকণা সমূহের শোষণপূর্ব্বক সংঘর্ষ আনয়ন করিও না। শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, প্রাধান্য লাভ করিয়াছে শুধু অপ্রধান ভাবে ছড়ানো শক্তিকণাগুলিকে স্বয়ম্পূর্ণ করিবার জন্য, সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া প্রধানের সমকক্ষ করিবার জন্য। পোষণের দেশে প্রধান কুলীন এবং অপ্রধান অস্পৃশ্য নয়; সেখানে প্রধান অপ্রধানেরই সেবক মাত্র। 'আমি ব্রজধামে শক্তিকেন্দ্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বরুণের দম্ভ চূর্ণীকৃত করিয়াছি, তাহাদের শক্তিকে বিকেন্দ্রীভূত করিয়াছি তাহাদিগকে বিশ্ব সেবক রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য'।] হে কুরুশ্রেষ্ঠ, ন অস্তি অন্ত [শেষ নাই] বিস্তরস্য মে [আমার বিস্তীর্ণ বিভূতির; ইহা অনন্তকাল রহিয়াছে এবং ফুরাইয়াও যাইবে না। 'গুণাত্মনস্তেঽপি গুণাং বিমাতুম্, হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য। কালেন যৈবা বিমিতাঃ সুকল্পৈঃ, ভূপাংশবঃ খে মিহিকাঃ দ্যুভাসঃ'॥ ভাগবত ১০।১৪।৭]।

শ্রীভগবান বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমার দিব্য আত্মবিভূতি সমূহের মধ্যে যে গুলি প্রধান, সেইগুলিই তোমাকে বলিব; কারণ আমার বিভূতি বিস্তার অনন্ত। ১০।১৯

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথ

রেণু মিত্র

রবীন্দ্রনাথকে আমরা এত ভাল বাসি কেন?

—এর উত্তর দেওয়া আজকের দিনের আমাদের পক্ষে কিছু মুস্কিল। আজকের দিনে আমরা চারদিকে যে মনোভাব বা ধারণাকে দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ যে যুগে জন্মেছিলেন, সে যুগে সামাজিক চিত্ত এ থেকে একেবারেই অন্যরকম ছিল। স্থিতিধর্মী অজড়ীয় সভ্যতার পীঠস্থল ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ গতিচঞ্চল পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যখন হাবুডুবু খাচ্ছিল, সেই দ্বন্দ্বসংঘাতে জর্জর বাংলাকে রামমোহন রায় দেবেন্দ্রনাথের ধারা অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ এমন এক স্তরে এনে উত্তরণ করালেন সাহিত্যের তরী বেয়ে, যেখানে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধ বাঙ্গালী দেখতে পেয়েছিল ভারতীয়ত্বের সনাতন ধারা থেকে সে বিচ্যুত হয় নি, অথচ জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তার এতদিনের ধারণা গেছে বদলে, গতিচঞ্চল জড়বাদের সঙ্গে স্থিতিধর্মী অধ্যাত্মবাদকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের মোহন তুলিস্পর্শে এমন ভাবে মিলিয়ে দিয়ে গেলেন যে, পরিবর্ত্তনটা যে কোথায় কেমন করে ঘটল, মানুষ যেন তা ঠিক বুঝতেই পারল না।

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় জগন্নাথ আর জগত এমন ভাবে মিলেমিশে গেছে যে, সে কী ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মবাদ না অভারতীয় জড়বাদ তা বোঝা যায় না। ভুবনকে রবীন্দ্রনাথ মধুর করে পেয়েছেন, কিন্তু সেটা জড়সর্বস্ব বিষয়ীর ভুবন নয়; আবার জগন্নাথকে যখন তিনি পেলেন তখনও সে জগন্নাথ জগত-নিরপেক্ষ হয়ে বিশেষত্বহীন নির্বিশেষ হয়ে দাঁড়ান নি—তিনি সর্ব বিশেষ সমন্বিত নির্বিশেষ জগন্নাথরূপে রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন

> বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার'
> সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
> নয়কো বনে নয় বিজনে,
> নয়কো আমার আপন মনে,

সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
　　সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যেথায় বাহু পসার'
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।
　　গোপনে প্রেম রয়না ঘরে
　　আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
　　আনন্দ সেই আমারো।

রবীন্দ্রনাথ যখন জগন্নাথকে ভালবাসেন তখন তিনি ভারতীয়; আর যখন তিনি জগতকে ভালবাসেন তখন তিনি অভারতীয়। জগৎকে তো তথাকথিত অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ ভালবাসে নি—জগৎকে নিয়েই যে তার সব বিবাদ। এইজন্যই তো গীতাঞ্জলির লেখক রবীন্দ্রনাথকেও ভারতবর্ষের ধার্মিকদের দলে ফেলান গেল না। ধর্মতত্ত্ব অধিগত করেও রবীন্দ্রনাথ তথা-কথিত ভারতবর্ষের ধার্মিক হতে পারলেন না যে কারণে, সেই কারণেই তিনি অভারতীয়। অথচ তাঁর সুর মহাভারতীয় ঔপনিষদিক প্রাণবাদের সঙ্গে মেলে। তাই রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে কোথায় কেমন করে তিনি ভারতীয়, কেমন করে তিনি ভারতীয় নন; পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে কোথায় তাঁর সজাতীয়ত্ব রয়েছে, আবার কেমন করে সেখানেও তিনি বিজাতীয়; এরও পরে রয়েছে কেমন করে কোথায় তিনি দুটোকে মেলালেন। এমন করে না বুঝলে ঔপনিষদীয় প্রাণের মহামহিমা জীবনে জগতে ও জগতাতীত সত্তায় কেমন করে তিনি কীর্তন করে গেলেন, তা-ও বোঝা যাবে না। দুটো বিরুদ্ধ সভ্যতাকে তাঁর সাহিত্যের রসাস্বাদনের মধ্য দিয়ে তিনি কেমন করে এক করলেন—এই পটভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হবে। তা না বুঝলে রবীন্দ্র-রচনাবলী অতি মনোরম বাঁধাই হয়ে সুন্দর সুন্দর আলমারীতে স্থান পেতে পারবে, মানুষের মুখেও তা নানাভাবে কথিত হতে পারবে, কিন্তু তা হবে প্রাণহীন পুতুল রবীন্দ্রনাথের পূজা—নিছক পৌত্তলিকতা সেইটেই। রবীন্দ্রনাথের সেটা মৃত্যু। ধর্মের অন্তর্নিহিত আত্মবস্তুকে বিস্মৃত হয়ে আজকে যেমন অনেকেই আমরা শুধু মন্ত্র জপে যাই, রবীন্দ্র-তত্ত্বকে বিস্মৃত হয়ে শুধু রবীন্দ্র-বাক্য আমাদের মুখে তেমনি

ভাবে যদি উচ্চারিত হতে থাকে, তবে সে যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কতবড় বেদনাদায়ক, তা বলে শেষ করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জগৎকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন, ভালবাসতে শিখিয়েছেন জীবনকে, ভালবাসতে শিখিয়েছেন জগন্নাথকেও, জীবনের নাথকেও। তাই তাঁকে আমরা এত ভালবাসি।

কর্ম্মকৈন্দ্রিক শিক্ষা—নির্দ্দেশিত কাজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

অনির্দ্দেশিত কাজ যখন শিশুরা করিয়াছে, তখন দেখা গিয়াছে যে শিশুরা তাহাদের স্ব স্ব কাজ নিয়া ভয়ানক ব্যস্ত, কিন্তু ব্যস্ততার ভিতরও দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করা গিয়াছে। প্রথমতঃ একদল শিশু কাজ হইতে কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে, আবার কিছুক্ষণ পরেই সেই কাজ হইতে নিজেকে ছিনাইয়া আনিয়া হয়ত অন্য কোনও কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আর একদল শিশু কাজ করিয়াছে অন্যভাবে। তাহারা কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে মনোনিবেশ করে নাই, বরং তাহারা একটি কাজের মধ্যেই নিজেদের নিয়োজিত রাখিয়াছে। এবং সেই কর্ম্মকে যথাসম্ভব নানা দ্রব্যাদির দ্বারা রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বলা বাহুল্য এই দুইদল শিশু একই প্রয়োজনের তাগিদে দুইটি বিভিন্ন রূপ ধরিয়া নিজেদের চাহিদার আবেদন জানাইতেছে। আসল কথা হইতেছে শিশুদের কর্ম্মরাজ্য ও ভাবরাজ্য এই দুইয়ের গতি বিভিন্ন বেগসম্পন্ন হইলেও দুইই গতিপ্রধান। ভাব কখনও কর্ম্মকে ছাড়াইয়া যায় আবার কর্ম্মও কখনও ভাবকে ছাড়াইয়া যায়। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন, কারণ অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারে যে শিশু হয়ত ভাবরাজ্যে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু শিশু সেখানে তাহার কর্ম্মকে রূপ দিতে মানুষের অসাধ্য কর্ম্ম কি করিয়া সম্পন্ন করিবে

কাজ হয়ত মানুষের অসাধ্য. কিন্তু শিশুর পক্ষে অসাধ্য কি? শিশু হয়ত একটি ছোট পাটখড়ির টুক্‌রার দুইদিকে দুই পা রাখিয়া পাটখড়িকে পক্ষীরাজ ঘোড়া বানাইয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া গেল। অতএব শিশুদের ভাব ও কর্ম্মের গতি বিভিন্ন হইলেও শেষ পর্য্যন্ত উহারা সমান্তরাল ও সমব্যাপ্ত। কিন্তু ক্রমে শিশুদের ভাবরাজ্যে ভাঙ্গন ধরে, কর্ম্মের যে কোনও রূপকে কর্ম্মের নামকরণ করিতে শিশুদের মন সায় দেয় না। তাই যখন দুইদল শিশুকে দুইভাবে চলিতে দেখা যায়, তখনই মনে হয় শিশুরা আর নিজেদের ধ্যানধারণা নিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না, তাহারা নূতন নূতন ভাবধারা দ্বারা পুষ্ট হইতে চায়। বলা বাহুল্য তাহারা যখন বস্তুতে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই, কিংবা একই বস্তুকে বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভারে সাজাইয়াছে, তখনই তাহাদের ভাবধারার দৈন্য প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষকের নির্দ্দেশের সাহায্যে তখন তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করিতে তাহারা চাহিয়াছে। অতএব শিশুর মঙ্গলই যখন অভিপ্রেত তখন শিক্ষকই শিশুর সমস্ত ঔৎসুক্য নিরসন করিয়া তাহার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবার জন্য নানাভাবে প্রয়াস পাইবেন। বয়সের অনুপাতে শিশুর কর্ম্মের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা আছে, যাহার বাহিরে শিশুর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়; শিশু ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার ধারণার অধীন কৃত কর্ম্মের মধ্যেই সন্নিবেশিত থাকিতে চায়। তাহার চিন্তা ধারা সেই সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারে না তাহার কারণ প্রথমতঃ তাহার অভিজ্ঞতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মের ধারার ইঙ্গিত না পাওয়ার ফলে কর্ম্মের পথ তাহার কাছে রুদ্ধ। এই অবস্থায় শিক্ষক যদি কর্ম্মে শিশুকে সাহায্য না করেন, নূতন কর্ম্মের সন্ধান শিক্ষক শিশুকে না দেন, কিংবা নূতন কর্ম্ম হইতে উপলব্ধ জ্ঞানের পুর্ণ প্রয়োগ করিয়া শিশুমনকে সমৃদ্ধ না করেন, তাহা হইলে শিশুকে কোনওভাবে অগ্রসর করান আর সম্ভবপর হইবে না। এই কারণেই শিশুকে অনির্দ্দেশিত কাজ করিতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দেশিত কাজ করিতে দেওয়ারও বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে শিশুর অনির্দ্দেশিত কাজের ভাবধারা শিক্ষকের নির্দ্দেশ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অভিজ্ঞতা আহরণে দানা বাঁধিবে।

তাহা হইলে শিক্ষক নির্দ্দেশিত কর্ম্মের ব্যবস্থা কিরূপ ভাবে করিবেন, তাহাই এখন আলোচনার বিষয় বস্তু। আমরা অনির্দ্দেশিত কর্ম্মের আলোচনা কালে নির্দ্দেশিত কর্ম্ম ও আদিষ্ট কর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন

করিয়া আসিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে আদিষ্ট কর্ম্মের মধ্যে শিক্ষক কর্ম্মের প্রতিক্ষেত্রে শিশুকে আদেশ দ্বারা কর্ম্মের সরল গতিকে শুষ্ক করিয়া দিয়াছেন, শিশুমনে সেইরূপ কর্ম্ম আর কোনওভাবে রেখাপাত করিতে পারে নাই, কিন্তু নির্দ্দেশিত কর্ম্মে শিশু শিক্ষকের নিকট হইতে ইঙ্গিত পাইয়া কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে, কর্ম্মের পরিকল্পনা করিয়াছে, কর্ম্মকে নূতন খাতে বহাইতে শিক্ষা করিয়াছে, পথ যেখানে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, সেখানে সে শিক্ষকের সাহায্য লাভ করিয়াছে। অতএব শিশুকে নির্দ্দেশিত কর্ম্মের মধ্য দিয়া পরিচালনা করিবার সময়ে শিক্ষক যদি শিশুমনকে উপযুক্ত খোরাক দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলেই শিক্ষকের উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

শিক্ষক কিভাবে অগ্রসর হইবেন? তিনি প্রথম শ্রেণী হইতেই অনির্দ্দেশিত কাজের সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দেশিত কাজের ব্যবস্থা করিবেন। ঐরূপ নির্দ্দেশিত কর্ম্ম যে পুরাপুরি প্রজেক্টের* আকার ধারণ করিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। উহা যে কোন কর্ম্মের রূপ ধারণ করিতে পারে, তবে ঐরূপ কর্ম্ম শিশুদের প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত হইলে ভাল হয়। কিন্তু 'প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত'—ইহাকে একান্ত নির্দ্দেশ হিসাবে মানিয়া না নেওয়াই ভাল, কারণ শিশুদের শিক্ষনীয় এমন অনেক জিনিষই হইতে পারে, যে সম্বন্ধে শিশুরা তখনও কোন আভ্যন্তরীণ তাগিদ অনুভব নাও করিতে পারে। সে যাহা হউক, যদি সম্ভব হয় তবেই প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত কর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন চলিতে পারে। ইহার সবচেয়ে বড় কারণ শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি। কিন্তু শিক্ষকের নির্দ্দেশে যদি কোনও কর্ম্মের ইউনিট আরম্ভ হয়, তাহা হইলে শিশু মনকে আগ্রহান্বিত করা যাইবে না, এমন কথা বলা চলে না।

সে যাহা হউক, শিক্ষক প্রথমতঃ শিশুদের নিজেদের আগ্রহ বা প্রেরণা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন। শিশুদের দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়কেই যে কর্ম্মের ইউনিট ধরিয়া কার্য্যে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। শিশুদের প্রস্তাবিত বিষয় যদি শিশুর নূতন জ্ঞান আহরণে সম্পূর্ণ সহায়ক না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ কর্ম্মের ইউনিট পরিহার

*প্রজেক্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রবন্ধান্তরে হইবে।

করা একান্ত কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় শিক্ষক নিজেই কর্ম্মের ইউনিট বাছিয়া দিবেন।

এই প্রসঙ্গে Dewey তাঁহার The School and the Child নামক পুস্তকে বলেন যে শিশুদের কাজের ইউনিট শিশুরাই একান্তভাবে দায়িত্ব লইয়া স্থির করিতে পারে না, এবং শিক্ষকের পক্ষে শিশুদের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকাও সমীচিন নয়। শিক্ষক শ্রেণীতে কিছুকাল যাবৎ শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার পক্ষে শিশুর মনের চাহিদাকে উপলব্ধি করিয়া তাহাদের জন্য কর্ম্মের বিষয় স্থির করা শিশুদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হওয়া ছাড়া শিশুর পক্ষে অমঙ্গলজনক কিছুতেই হইবে না।

কিন্তু বিষয় বা ইউনিট নির্দ্ধারণ ব্যাপারে শিক্ষক যদি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া স্বীয় ইঙ্গিতকে শিশুদের মুখ দিয়াই প্রকাশ করাইতে চান, তাহা হইলে দুই কুলই রক্ষা পায়, শিক্ষকও শিশুর প্রয়োজন ও সুসম্বদ্ধ জ্ঞান বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মের ইউনিট স্থির করিয়া দেন, পক্ষান্তরে শিশুর দলও তাহাদের পরিকল্পিত কর্ম্মের বিস্তার ও সম্পাদনা দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়। তবে কর্ম্মের ইউনিট স্থিরীকরণে লক্ষ্যনীয় বিষয় হইতেছে শিশু সেই ইউনিটকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছে কি না তাহা লক্ষ্য করা। শিশুরা যদি শিক্ষকের ইঙ্গিতকে নিজেদের পরিকল্পিত কাজ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়া বিস্তৃত ভাবে কর্ম্মের পরিকল্পনা করে, কর্ম্মের বিভিন্ন দিক সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে এবং স্বীয় কর্ম্মের সমালোচনা করিয়া কর্ম্মের সুষ্টু সম্পাদন করে, তবেই কর্ম্ম শিশুজীবনকে সমৃদ্ধ করিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

শিক্ষক যেমন শিশুদের ইচ্ছা অনিচ্ছার হিসাব লইয়া সেই ইচ্ছা অনিচ্ছাকে কেন্দ্র করিয়াই কর্ম্মের ইউনিট স্থির করিবেন, সেইরূপ শিক্ষক বা শিক্ষিকা অন্য নানরূপ বিশেষ অবস্থারও সুযোগটুকু গ্রহণ করিলে শিশুর পক্ষে উহা বিশেষরূপে মঙ্গলপ্রদ হইবে। গ্রামের মেলা, কোনও রূপ আনন্দ-উৎসব, কোনও বিশিষ্ট লোকের জন্ম বা মৃত্যু তিথি, ইত্যাদি শিশু জীবনকে যথেষ্ট ভাবে আলোড়িত করিতে পারে এবং শিশুর অভিজ্ঞতার প্রবাহ নূতন খাতে চলিতে পারে।

শিক্ষকদের আরও একটি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য এখানে রহিয়াছে। শিক্ষক যদি কাজের পূর্ণ নির্দ্দেশ না দিয়া কর্ম্ম সম্পাদনের উপযুক্ত যথাসম্ভব সমস্ত

দ্রব্যাদির ব্যবস্থা রাখিতে পারেন, তবে শিশু শিক্ষকের ইঙ্গিত দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়া সুষ্টু ভাবে কর্ম্মসম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইবে।

শ্রেণীতে কর্ম্ম আরম্ভের পুর্ব্বে শিক্ষক কতকগুলি কাজ করিলে শিশুদের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় এবং শিশুরাও কর্ম্মানুসরণ করিতে যাইয়া নূতন নূতন কর্ম্মের পথের সন্ধান পায়। প্রথমতঃ শ্রেণীতে শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আলোচনাগুলি শিশুদের বয়স এবং গ্রহণ করিবার পক্ষে উপযুক্ত মানসিক অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইলে উহা যে শিশুদের অগ্রগমনের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সব আলোচনা কালে সত্যি কি হয় তাহা একবার সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। শিক্ষক যখন আলোচনা করেন, তখন তাহার সঙ্গে শ্রেণীর অন্যান্য শিশুরা আলোচনায় যোগদান করে। অবশ্য তাহাদের বক্তব্য খুবই অপর্য্যাপ্ত হয় একথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শিক্ষকের আলোচনা এবং তাহার সঙ্গে কয়েকটি শিশুর অংশ গ্রহণ আলোচ্য বিষয়টিকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে এবং শিশুর আগ্রহের ও ঔৎসুক্যের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তোলে। ফলে কর্ম্মের পথ শিশুদের কাছে সুগম হইয়া উঠে, যাহারা কাজ করে বা কর্ম্ম পরিচালনা করে, তাহারাও জ্ঞান আহরণের পথকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে।

শিক্ষক আলোচনাকে নীরস জিনিষের মধ্যে কখনও সীমাবদ্ধ রাখিবেন না। শিশুর পরিবেশের রূপ রস মাধুর্য্য শিশুর নিকট আলোচনাচ্ছলে সুন্দর করিয়া পরিবেশন করিলেই শিশুর আগ্রহকে আকর্ষণ করা সম্ভব হইবে। শিক্ষক প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতির ইন্দ্রজাল বা অনির্ব্বচনীয়তা সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত করিবেনই, তাহা ছাড়া, তিনি শিশুদের কাছে নানা চিত্তাকর্ষক গল্প বলিতে পারেন। গল্পের গাঁথুনি যেমন করিয়া শিশু-মনে রেখাপাত করে, সেইরূপ বস্তু বিষয়ক কথার জাল ততটা প্রভাব বিস্তার শিশু মনে করিতে পারে না। শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে আদায় করিয়া তাহাদের উপর দাবী জানাইতে পারে অধিক পরিমাণে গল্প। গল্পকে কর্ম্মে রূপায়িত করাও শিশুদের পক্ষে হয় সহজ। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। কথাটি হইতেছে শিশুর পক্ষে কোন বস্তুকে কর্ম্মে রূপায়িত করা সম্পর্কে। যে জিনিষ শিশু প্রতি ধাপে ধাপে বুঝিয়া অগ্রসর হইবে, সেই কর্ম্মকে রূপায়িত করা শিশুর পক্ষে কষ্টজনক। কিন্তু

যে বিষয়ের আগাগোড়া উপলব্ধি শিশুর হইয়াছে, তাহাকে কর্ম্মে রূপায়িত করা, দেখা গিয়াছে, অত্যন্ত সহজ। গতিপ্রধান গল্প কর্ম্মের ক্ষেত্রে আসিয়াও দ্রুতগতি লাভ করে। সেইখানে শিক্ষকের সামান্য নির্দ্দেশ শিশুর মনোজগতকে বিশেষ ভাবে আলোড়ন করিয়া দেয়, কর্ম্ম সম্পাদন করিবার কুশলতা, শিশুর কর্ম্ম জগতের কাছে যেন হার মানিতে চায়, কর্ম্ম করিবার প্রেরণা আর কর্ম্মের দক্ষতা এই দুইয়ের গতি তখন সমান তালে যেন চলিতে চায় না, এমনই হয় শিশুদের কর্ম্মের গতি। কিন্তু যে নির্দ্দেশটুকুর সাহায্যে শিশুদের কর্ম্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই নির্দ্দেশটুকু শিক্ষকের নিজস্ব দান, সেখানে শিশুরা মাথা খুঁড়িয়াও অনির্দ্দেশিত কাজের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া পথ খুঁজিয়া পায় না। অতএব শিশুকে সাহায্য দানের প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষ স্পষ্ট ভাবেই মানিয়া লইতে হয়, না হইলে শিশুর গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

শিশুর পরিবেশকে কর্ম্মে রূপায়িত করিয়া তুলিতেও সর্ব্বদা দেখা গিয়া থাকে। অনির্দ্দেশিত কর্ম্মের ক্ষেত্রে পরিবেশ শিশুদের কর্ম্মের অধীন হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমস্ত কর্ম্মাধীন বিষয়গুলির মধ্যে যোগসূত্র সংস্থাপিত হয় নাই। শিশুরা কর্ম্মের খাতিরেই কর্ম্ম করিয়া গিয়াছে। তাহারা মাটি, বালি, জল, রং তুলি ইত্যাদি লইয়া কাজ করিয়াছে এবং খেলিয়াছে। শিশুর দেহ মন কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছে, মাংসপেশীগুলি কাজের মধ্য দিয়া একটা বিশেষ ছন্দ আয়ত্ত করিয়াছে, ক্ষুদ্র মাংসপেশীগুলি দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে। শিশুর দেহ-মন কর্ম্মের প্রবণতা অর্জ্জন করিয়াছেন সত্য কিন্তু সমগ্র বস্তুর ক্ষেত্রে তাহাদের অর্জ্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়া উঠিতে সুযোগ পায় নাই। এইখানে প্রয়োজন শিক্ষকের নির্দ্দেশ। পরিবেশের অনেক জিনিষকে ভিন্ন ভিন্ন ইউনিটে ভাগ করিয়া শিশুদের দ্বারাই কর্ম্মের ইউনিট গুলি গ্রহণ করাইয়া তাহাদের দ্বারাই ইউনিটের কর্ম্ম সম্পাদন করাইতে পারা যায়। উদাহরণ স্বরূপ পরিবেশের "ঘরবাড়ী", "স্কুল বাড়ী", "বাজার" "গ্রাম" "কৃষকের বাড়ী ও গোলা" ইত্যাদি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট শিশুরা গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য এই সমস্ত কর্ম্মের ইউনিটগুলির সুষ্ঠু সম্পাদন এবং তাহা হইতে শিশুদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করাইতে পারা যায় নির্দ্দেশিত কাজের মধ্য দিয়া। প্রতি ইউনিটের জন্য নির্দ্দেশ দান করিয়া, কর্ম্মেরও বিভিন্ন ভাগগুলির মধ্যে যথার্থ যোগাযোগ স্থাপন করিয়া বিষয়বস্তুর সমগ্রতা

সংস্থাপন করিতে পারিলেই শিশুদের অভিজ্ঞতা লাভ সহজ হইয়া আসিবে। এই ছোট ছোট ইউনিটের দু-একটি সম্পাদন করাইতে পারিলেই শিশুদের দ্বারা বৃহত্তর ক্ষেত্র আলোড়ন করিয়া দেখা সম্ভব হইবে। ভিৎ শক্ত হইলে তাহার উপর যে কোন কাঠামো গড়িয়া তোলা যায়। গ্রামের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই শিশুরা গ্রামের সংযোজক রাস্তা গুলি গ্রামের বাহিরের জগতের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহা আয়ত্ত করিতে অগ্রসর হইতে পারিবে, কিন্তু গ্রামই যদি শিশুর কাছে অপরিচিত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে শিশু কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করিবে? শিশু-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যদি শিশুর কর্ম্মের বিভিন্ন ব্যবস্থা করা যায়, শিশুকে যদি স্তরে স্তরে নির্দ্দেশিত কাজের মারফত পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে শিশুর কর্ম্মদক্ষতা ও তাহার মানসিক কর্ম্ম রাজ্য উভয়ের সীমাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া চলিতে বাধ্য।

স্বয়ং কর্ম্মের উদ্দেশ্যে শিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধিকরণের জন্য শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করিবেন, শিশুদের কাছে গল্প বলিবেন এবং পরিবেশের বাহিরে যাহা কিছু নূতন ও জানিবার উপযুক্ত বস্তু আছে, সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি শিশুদের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি ইত্যাদি শিক্ষক করাইবেন। এইরূপ প্রচেষ্টার ফলেই শিক্ষক শিশুদের সমস্ত কর্ম্মগুলিকে উপযুক্ত খাতে প্রবাহিত করিয়া শিশুদিগকে নূতন নূতন জ্ঞানের অধিকারী করিতে পারিবেন এবং শিশুজীবনকে সহজ ও সরল করিতে সক্ষম হইবেন। পূর্ব্বে শিশুদের যে সমস্ত খেলাগুলি ছিল Make believe, সেইগুলিই এখন বাস্তবের ক্ষেত্রে রূপ নিতে ধীরে ধীরে চেষ্টা করিবে।

শিশুদের মনে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জন্মান সম্পর্কে শিক্ষকের প্রতি একটু সাবধান বাণী উচ্চারণ এই ক্ষেত্রে করা যাইতে পারে। শিক্ষক শিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার মত দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন একথা ধরিয়া লওয়া হইল। কিন্তু এই দক্ষতা প্রয়োগ-ক্ষেত্র বিশেষে হ্রাস বৃদ্ধি পাইবে, ইহাও জানা শিক্ষক বর্গের আবশ্যক। যখনই দেখা যাইবে যে শিক্ষকের ইঙ্গিতে শিশু সঠিকভাবে কর্ম্মের ধারা অবলম্বন করিয়া যাইতেছে, তখনই শিক্ষক সক্রিয়-সাহায্য হইতে বিরত হইবেন। শিশুকে বেশী সাহায্য করিলে আপাতঃ দৃষ্টিতে কর্ম্ম অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইলেও, শিশু তাহার নিজস্ব সত্তা বিসর্জ্জন দেয় এবং শিশুর সৃজনী প্রবণতা নষ্ট হইয়া যাইতে আরম্ভ করে।

এই সম্পর্কে কর্ম্মের ইউনিট স্থির করিয়া দেওয়া সম্পর্কে সামান্য আলোচনা পুনরায় করা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে কর্ম্মের ইউনিট শিশুরা অনুভূত প্রয়োজন লইতে স্থির করিতে চাহিলেও, সেই কর্ম্মের ইউনিট শিশুদের দেহ বয়স ও মনের পক্ষে উপযুক্ত নাও হইতে পারে, সেইজন্য শিশুর সুসমঞ্জস জ্ঞানবৃদ্ধি ও সমগ্র বৃদ্ধির জন্য কর্ম্মের ইউনিট শিক্ষকই যদি স্থির করিয়া দেন তবে ভাল হয়। কথাটা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কর্ম্মের ইউনিট অনুসরণ করিতে যাইয়া যদি শিশুরা সেই ইউনিটের সমান্তরাল আরও একটি ইউনিটকে পছন্দ করিয়া উহা করিতে আগ্রহান্বিত বোধ করে, তাহা হইলে শিক্ষক সেইস্থানে কি করিবেন? এখানে একটি উদাহরণ দিয়া জিনিষটি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

তৃতীয় শ্রেণীর শিশুরা একটি 'বাস' প্রজেক্ট করিবে স্থির করিয়াছে। বাসের রাস্তা শিশুদের বিদ্যালয়ের ঠিক সম্মুখভাগে। আর স্কুলের পিছন দিকে রেলের লাইন। শিশুদের পরিবেশের ও তাহাদের চলাচলের সীমার মধ্যেই রেললাইন ও বাসের রাস্তা উভয়কে ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শিশু বাস দেখে এবং রেল লাইন ও রেল গাড়ীও প্রতিদিন দেখিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় যদি শিশুরা বাসের রাস্তা তৈয়ারী করিতে যাইয়া দুইবার রেলের লেভেল ক্রসিং তৈয়ারী করে এবং পরে 'রেল প্রজেক্ট' করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, বাস প্রজেক্ট করিতে মোটেই আর উৎসাহ বোধ না করে, তাহা হইলে কি করা যাইবে? শিক্ষক তাঁহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত স্থির রাখিবেন, না শিশুর আপাত আগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া প্রজেক্টটি পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন? বাস প্রজেক্ট পরিবর্ত্তন করিলে শিক্ষক যে উদ্দেশ্য লইয়া জ্ঞানদানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বরবাদ হইয়া যায়, কিন্তু ইউনিটের পরিবর্ত্তন করিলে পাইতেছেন শিশুদের সহযোগিতা, মনোযোগ, আগ্রহ ও ঔৎসুক্য। এদিকে নূতন ইউনিটে শিশুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং তাহার সম্ভাব্যতা বাস প্রজেক্ট হইতে কোন অংশেই কম নয়। কিন্তু যদি শিশুরা বাস প্রজেক্ট আরম্ভ করিয়া এমন একটি ইউনিটের দাবী জানাইত, যাহার শিক্ষামূলক সম্ভাব্যতা একেবারেই নাই, সেই ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুদের ইউনিট পরিত্যাগ করিতে নানারূপ পন্থা অবলম্বন করিতে নিশ্চয়ই সচেষ্ট হইবেন।

———

ক্রমশঃ

সাময়িকী

শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্মশতবার্ষিকী ঃ বিগত চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী (বাসন্তী অষ্টমী) তিথিতে (২৭শে চৈত্র) শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের শুভ জন্মের শততম বর্ষারম্ভ উৎসব সাতদিন ধরিয়া বিশেষ সমারোহ সহকারে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত মহানির্ব্বাণ মঠে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই শতবার্ষিকী উৎসব এক বৎসর ধরিয়া চলিবে। ২৬শে চৈত্র শ্রীনিত্যগোপালদেবের অধিবাস হয় এবং রাত্রিতে জয়নগর মজিলপুরের দল কর্ত্তৃক দাশরথী রায়ের পাঁচালী গীত হয়। ২৭শে চৈত্র ভোরে মঙ্গল আরতি, ঊষা কীর্ত্তন, আচমন, বেদীস্নান, হোম, পূজা ভোগ প্রভৃতি সহ শ্রীনিত্য-গোপালের পূজা সম্পন্ন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি অতি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছিল। সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। দুপুরে প্রায় ছয় হাজার নরনারী খিচুরী প্রসাদ পায়। বিকেল পাঁচটায় সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। প্রধান অতিথিরূপে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী এবং সভাপতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত প্রেস রিপোর্টারগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রিয়দা-রঞ্জন রায়, শ্রীসুহৃৎ চন্দ্র মিত্র, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রী জে, সি, মুখার্জ্জী, শ্রীমন্মথনাথ দাস, শ্রীগোপালদাস অধিকারী, শ্রীমণিলাল ব্যানার্জ্জী, শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন রায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীজগদীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীমল্লিনাথ রায়, শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত, শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযোগেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ও সভাপতিকে জন্মশতবার্ষিকী কমিটীর সহ-সভাপতি শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত অভ্যর্থনা করিলে তাঁহাদিগকে বরণ ও মাল্যদান করা হয়। তখন সহ-সভাপতির মুদ্রিত অভিভাষণ জন্মশতবার্ষিকী কমিটীর সম্পাদক শ্রীজনরঞ্জন রায় খানিকটা পাঠ করেন। উহা সকলের মধ্যে বিতরিত হয়। ইহার পর উদ্বোধন সঙ্গীতে শ্রীনিত্যগোপাল-প্রশস্তি গীত হয়।

তাহার পর পবিত্র বাইবেল হইতে পাদরী টমাস সাহেব, পবিত্র কোরাণ হইতে জনাব মঈনুদ্দিন সাহেব এবং পবিত্র গুরুগ্রন্থ হইতে শ্রীহরজিৎ সিং অংশবিশেষ পাঠ করেন। শ্রীনিত্যগোপাল নিজেকে সর্ব্ব সম্প্রদায়ী ও বিশ্বনাগরিক বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। যীশু খ্রীষ্টের নাম করিয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন, নিজের চুল ছিঁড়িয়া, দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া রক্তাক্ত হইয়াছেন, কোরাণ শুনিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন—তাই তাঁহার প্রীত্যর্থে এই সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রার্থনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহার পর শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে একটী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ইহার পর রাজ্যপাল মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন, ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে যত অধর্ম্ম হইয়াছে, অধর্ম্মের নামে তাহা হয় নাই। তাই যে ধর্ম্মগুরু সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন, তিনি আমাদের নমস্য। শ্রীনিত্যগোপাল সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের, পতিতদের আশ্রয় দিয়াছিলেন—রাজ্যপাল ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলেন এবং অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন মানুষের বিশেষভাবে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া কিছু বলেন। শ্রীনিত্যগোপাল-প্রশস্তি গাহিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

রাত্রিতে হাওড়ার শ্রীযুত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির সাহায্যে গৌরলীলা কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কিন্তু অতিরিক্ত ভীড়ের চাপে বাতি নিভাইয়া ছবি প্রদর্শন সম্ভবপর হয় নাই। এ জন্য সকলে বড়ই বেদনা বোধ করিয়াছে।

তৃতীয় দিনে সকালবেলায় পূজা কীর্ত্তন ইত্যাদির পর জন্মেজয় উৎসব হয়। বিকেল ৪॥০টায় হাওড়া সমাজ কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের নীলাচল লীলার চমৎকার অভিনয় হয়। সহস্র সহস্র মুগ্ধ জনসাধারণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকাতর এই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছেন। সাড়ে চারিশতবর্ষ আগে যে তত্ত্ব প্রচার করিতে পরাপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই তত্ত্বঘন জীবন লইয়া তাহার দার্শনিক ভিত্তি প্রস্থাপন করিতে শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের

ক্রমবিবর্ত্তিত রূপে শ্রীনিত্যগোপালকে পাইয়াছি। চতুর্থ দিনে বৈকালে এক সাধারণ সভায় শ্রীপুরণচাঁদ শামসুখা মহাশয় জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ তথ্যপুর্ণ ভাষণ দেন। জৈনধর্ম্ম ও অবধূত সম্প্রদায়ের মধ্যে সজাতীয়ত্ব বা তাহারা যে সমগোত্রীয়, ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলেন যে, ভগবান ঋষভদেব জৈনদের আদি তীর্থঙ্কর এবং ভাগবতেও তিনি বিষ্ণুর অষ্টম অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত। শ্রীনিত্যগোপাল ঋষভপন্থী অবধূত সম্প্রদায়ের ৯১-তম পুরুষ। ঋষভদেব হইতে জৈন ও বেদান্ত এই যে পরস্পরবিরোধী দুই ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রীনিত্যগোপালে তাহা মিলিত হইয়াছে। তিনি জৈন-বেদান্ত সমন্বয় মূর্ত্তি। রাত্রিতে কীর্ত্তন হয়।

৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার বৈকাল ৪॥০টায় শ্রীপুর্ণেন্দুমোহন ঘোষঠাকুর ভাগবত ও কোরাণের কয়েকটী শ্লোকের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সেই সময় সভায় কয়েকজন মৌলভী উপস্থিত ছিলেন। এই দিন এবং তাহার পরের দিন রাত্রি ৭॥০টায় শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাভারতীয় ধর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভূতকল্যাণই মহাভারতের ধর্ম্ম। মানুষই গুহ্য ব্রহ্ম। তাই মানুষের সেবাই ভাগবতীয় ধর্ম্মের শেষ পরিণতি। দ্বিতীয় দিনে ত্রিপুরারিবাবুর ভাষণ শেষ হইলে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলেন যে, আজ যাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসবে এই মহাভারতীয় অমৃতকথা আলোচিত হইল, সেই শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার শেষ উপদেশে লিখিয়াছেন, 'আমার শিষ্যগণের প্রতি আমার এই শেষ উপদেশ যে তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিপদে পড়িলে অন্য সকলে তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবেন ও পরস্পর সাহায্য করিবেন। অনাথ আতুর দেখিলে সাহায্য করিবেন, পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। সকল ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান ভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিবেন।' —ব্রহ্মজ্ঞান যে ভূতকল্যাণের মধ্যে চরম পরিণতি লাভ করে, মানুষের সেবাতেই যে তার শেষ পরিণতি—শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন ও দর্শন ইহাই বলিয়াছে। মহাভারতের নায়কের ছবি আমরা শ্রীনিত্যগোপালজীবনে দেখিতে পাইয়াছি।

১লা বৈশাখে শ্রীত্রিপুরারিবাবুর দ্বিতীয় দিনের ভাষণের পূর্ব্বে বিকাল ছয়টাতে নির্গুণ বালিক্ সৎসঙ্গ মণ্ডল কর্ত্তৃক শ্রীগুরুগ্রন্থ কীর্ত্তন হয়। কয়েকজন

বালিকা কীর্ত্তনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীঈশ্বরদাসজী কীর্ত্তন পরিচালনা করেন। সুরতাললয় সহযোগে সকলের এই সমবেত কণ্ঠের ভজনগান সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ২রা বৈশাখ বৃহস্পতিবারের সভার সভাপতি শ্রীসজনিকান্ত দাস অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় মহানির্ব্বাণ মঠের শ্রীদাশরথী মুখোপাধ্যায় স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীনিত্য-গোপালের জীবন ও দর্শন আলোচনা করিয়া শ্রীমৎ বিজ্ঞানানন্দ ও শ্রীমৎ নিত্যপ্রকাশানন্দ অবধূত বক্তৃতা করেন। শ্রীনিত্যগোপালের দর্শন যে ব্রহ্ম ও মায়ার সমন্বয়ের, সর্ব্ব সমন্বয়ের ভিত্তির উপর স্থাপিত, নিত্যপ্রকাশানন্দ ইহা তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

২৬ শে চৈত্র শুক্রবারের বিভিন্ন পত্রিকায় উৎসবের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ২৭শে চৈত্র শনিবারের যুগান্তর, আনন্দবাজার, বসুমতী, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় উৎসবের সংবাদসহ শ্রীনিত্যগোপালের ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। ২৮শে ও ২৯শের কয়েকটী পত্রিকাতে শনিবারের সভার বিবরণ ও শতবার্ষিকী কমিটীর সহ-সভাপতির অভিভাষণের অংশ বিশেষ প্রকাশিত হয়।

সাতদিন ধরিয়া এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার পশ্চাতে রহিয়াছে বহু দিনের বহু জনের সহযোগিতা। মেদিনীপুরের দশগ্রাম সতীশ চন্দ্র শিক্ষা সদনের অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর ১২টী ছেলে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তাহাদের মাস্টার মহাশয় শ্রীপুর্ণেন্দুমোহন ভৌমিকের নেতৃত্বে ৬ দিন ধরিয়া সমস্ত মঠটীর সাফাইর কাজ করিয়া এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। সাফাইর কাজ করিবার ব্রত লইয়াই তাঁহারা আসিয়াছিলেন। অবশ্য সাফাইর কাজ ছাড়াও অন্যান্য সকল কাজেই তাঁহারা সহযোগিতা করিয়াছেন। তাঁহাদের সেবা প্রত্যেককে মুগ্ধ করিয়াছে। সময়মত আহার নিদ্রার অসুবিধার মধ্যে এরূপ মুখ বুজিয়া দিন-রাত্রি সেবা করার দৃষ্টান্ত বিরল। পুর্ণেন্দুবাবু তাঁহার দুই মেয়েকেও স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে আনিয়াছিলেন। উক্ত স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিকও উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বড় ছেলেও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আসিয়াছিল। মেদিনীপুরের শ্রীগোপালদাস অধিকারী এম, এল, এ মহাশয়ও উৎসবের প্রথম তিন দিন উপস্থিত থাকিয়া আমাদের কর্ম্মে সহযোগিতা করিয়াছেন। মেদিনীপুরের ছেলেমেয়েদের এই সেবাবুদ্ধি তাহাদের জীবনকে কল্যাণময় করুক, শ্রীনিত্য-

গোপালের নিকট ইহাই প্রার্থনা। শনিবার দিন সাধারণে প্রসাদ বিতরণের জন্য শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া সুন্দর ভাবে তাহাদের কাজ সমাধান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীবেণুভূষণ সোম ও শ্রীমুরলীধর বসুর নেতৃত্বে পাড়ার যুবকবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবকরূপে কয়দিন ধরিয়া এই কার্য্যকে সুসম্পন্ন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও পরিশ্রুত জলের ট্যাঙ্ক প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করায় তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীনিত্যগোপাল বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যে খান পঁচিশ বই মুদ্রিত হইয়াছে সেই বইগুলি এবং তাঁহার জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে যে সকল বই প্রকাশিত হইয়াছে সেই বইগুলি লইয়া উৎসবের সাত দিন একটি বই-র স্টল খোলা হইয়াছিল।

বরিশাল হরিজন পাড়ায় শ্রীনিত্যগোপাল জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানঃ— বরিশাল হইতে হরিজনসেবক শ্রীসুরেশ গুপ্ত মহাশয় লিখিতেছেন— 'শ্রীনিত্যগোপাল দেবের শুভ জন্ম ও জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপনের জন্য বরিশাল হরিজন আশ্রমে ২৬শে চৈত্র সন্ধ্যায় ও ২৭শে চৈত্র প্রভাতে স্মরণানুষ্ঠান হইয়াছে।

রামধুন গান, স্তোত্র ও সঙ্গীতাদি সহিত শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ, শ্রীমিনতি গুপ্তা উজ্জ্বলভারত পত্রিকা হইতে নিত্যগোপাল বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তদীয় ভাষণে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশরৎকুমার ঘোষ (স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ) মহাশয় তাঁহার গুরুদেব এই শ্রীনিত্যগোপাল সম্পর্কে যে ভাব, আলোচনা, উৎসবাদির মাধ্যমে প্রচার করিয়াছেন এবং ২০ বৎসর পূর্ব্বে হরিজন আশ্রমের পাঠশালা এই জন্মতিথিতে যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহার বিবরণ ও বিশ্বগ্রাসী সর্ব্ব সমন্বয়বাদের অব্যাহত অগ্রগতির ইঙ্গিত করিয়া ঠাকুর নিত্যগোপাল ও ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণতি জানাইয়া প্রার্থনা করেন।

হরিজন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রী ও কতিপয় কর্ম্মী ও ভক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ৬০ জনের অধিক আগন্তুককে প্রসাদ জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।'

———

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৭ম বর্ষ | ৫ম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

'মিথ্যার প্রাচীর'

পরিবর্ত্তনশীল জগতে পট পরিবর্ত্তন ক্রমাগতই হইয়া চলিয়াছে। পোষণ-ধর্ম্মী বিশ্বকে তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতে যে কেহ আঘাত করিবে, পোষণ-ধর্ম্মকে যে কেহ বিস্মৃত হইবে, তাহার মৃত্যু ঠেকাইবে এমন সাধ্য স্বয়ং বিধাতারও নাই। এই পোষণধর্ম্মকে বিস্মৃত হয় বলিয়াই আজকের প্রবল প্রতাপশালী কালকের ধূলায় মিশিয়া যায়। যে মুসলীম লীগ একদিন সত্য ধর্ম্ম ন্যায়কে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে সমূলে পদাঘাত করিয়া মানুষের আত্মার ভীতি-উৎপাদক হইয়া উঠিয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গে সেই মুসলীম লীগ আজ কোথায়? তাহার শোষণ প্রবৃত্তি পরকে শোষণ করিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই। এমনিই হয়—যে কোন প্রবৃত্তির কাছে একবার নিজেকে ছাড়িয়া দিলে আর রাশ টানিয়া ধরিবার ক্ষমতা মানুষের থাকে না। মুসলীম লীগ হিন্দু-শোষণ দিয়া আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু তাহা তো হিন্দুতেই সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে নাই—পূর্ব্ববঙ্গের মুসলীম লীগ পূর্ব্ববঙ্গকে শোষণের দ্বারা এমন অবস্থায়ই আনিয়া ফেলিয়াছিল যেখানে দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান নির্ব্বাচণের ফল সম্ভব হইয়াছে। সেখানে শোষণের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক মানবধর্ম্ম প্রতিবাদ জানাইয়াছে মাত্র।

এই প্রতিবাদকে, এই ধূমায়িত অসন্তোষকে যাহারা স্পষ্ট রূপ দিয়া তুলিয়াছেন, জনাব ফজলুল হক তাঁহাদের প্রধান একজন। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিনিধির মুখে এমন কথা যে আবার শুনিতে পাইব—তেমন আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম। কিন্তু প্রবল নিদাঘের পর এক পসলা বৃষ্টি মানুষকে যেমন তৃপ্তি ও শান্তি দিয়া থাকে,

পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দুঃখ ও বেদনার টাটানির পর ফজলুল হকের পারস্পরিক হৃদ্যতাপুর্ণ যুক্তি ও বাস্তববোধ-সম্পন্ন কথাগুলি আমাদের তাপিত প্রাণকে তেমনি করিয়াই যেন শান্ত করিয়াছে। দুই বঙ্গ একটা অখণ্ড সত্তা, একটা অখণ্ড জীবন্ত দেহ—ইতিহাসে ভূগোলে ব্যবসায়ে বাণিজ্যে এমন অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দুইটী খণ্ডকে যে এমনভাবে বিজাতীয় করিয়া রাখা যায় না—এই সহজ সত্যকে বিস্মৃত হওয়ার কুফল যে পূর্ব্ববঙ্গকে কোন্ মরণের মুখে লইয়া গিয়াছিল তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। তাই ফজলুল হকের উদার প্রাণ বলিতে পারিল 'উভয় বঙ্গের মধ্যে যে মিথ্যার প্রাচীর রচিত হইয়াছে, তাহা দূর করার কাজ যদি তিনি তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে আরম্ভ করিয়া যাইতে পারেন, তবেই তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিবেন।' মুসলীম লীগ দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফল সম্বন্ধে ফজলুল হক বলিতেছেন যে 'মুসলমানদের এইরূপ চিন্তা করিতে বাধ্য করা হইয়াছে যে, তাহারা আকাশ হইতে কিছু পাইয়া গিয়াছে, অতএব নিকট প্রতিবেশীদের ব্যাপারে তাহাদের কিছুই করিবার নাই।'

ফজলুল হক মহাশয়ের বিগত কয়েকদিনের কথা গুলির মধ্যে এমন একটা বাস্তব বোধের পরিচয় আছে, যাহার মধ্যে আমরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি। এমন একটা মিথ্যার ও অবাস্তবতার জাল আমাদের চারিদিকে বুনিয়া তোলা হইয়াছিল যে, হাতীকে হাতী বলিতে না পারিয়া এবং তাহাকে থাম কুলা ইত্যাদি বলিতে শুনিয়া শুনিয়া আমরা জীবন্তে দগ্ধ হইতেছিলাম। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম হইতেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, পাকিস্তান একমাত্র তখনই বাঁচিতে পারে যখন শাসক হিসাবে সে তাহার স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে যখন সে আন্তরিক সদ্ভাব সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। শাসক হিসাবে পাকিস্তানের স্বধর্ম্ম হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজাকে সমান করিয়া দেখা। স্বধর্ম্মত্যাগী কেমনভাবে বিনষ্ট হয় সে সম্বন্ধে একটী সুন্দর কাহিনী আছে।

লঙ্কার রাজা রাবণ মহাদেবের পূজা করিতেন। বার বার এজন্য মহাদেব তাঁহাকে নানা বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছেন। যেবার রাবণ মারা যান, গৌরী দেবী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এতবারই রাবণকে বাঁচাইলে এবার আর বাঁচাইলে না কেন? মহাদেব বলিলেন, এবার রাবণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, এবার আর তাহাকে বাঁচাইবার ক্ষমতা আমার নাই। রাবণ

রাক্ষস—নারীহরণ করার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু সে তো রাক্ষসবেশে নারীহরণ করে নাই, সে তপস্বী সাজিয়া ভণ্ডামীর আশ্রয় লইয়াছে। যদি সে রাবণ বেশেই নারীহরণ করিত—তবে তো সে ভণ্ড হইত না, তবে তো তাহার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা হইত না, তবে এবারেও তাহাকে বাঁচান যাইত।

পাকিস্তানও শাসক হিসেবে তাহার স্বধর্ম্ম রক্ষা করে নাই। রাজার কাছে সকল প্রজা সমান—মানবধর্ম্মের আর গণতন্ত্রের এই স্বধর্ম্ম যখন সে রক্ষা করে নাই, তখন সে টিকিবে কোন্ বিবেচনায়? শাসক হিসাবে তাঁহারা স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিবেন, রক্ষা করা তাঁহাদের অস্তিত্বের পক্ষেই অপরিহার্য্য—এই দুই সত্যকে স্বীকার করিয়া ফজলুল হক মহাশয় সত্যধর্ম্মকে মানিয়া লইয়াছেন। বহুবারের মত এবারেও আমরা বলি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শাসক-শাসিতের ভেদ বুদ্ধি যদি পাকিস্তানের মুসলমান ত্যাগ করে এবং গণতন্ত্রে সত্যই বিশ্বাসী হয়, তবেই শুধু পাকিস্তান টিকিবে। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিন্দু হইতে পারিবে না, পাকিস্তান শরিয়াতী শাসনে চলিবে—এইরূপ মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা আজ অচল। আজ 'মানুষের মহিমা' প্রতিষ্ঠিত—হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়, খ্রীষ্টানেরও নয়। আজ মানুষের বিধি বিধান চলিবে—সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র আজ ঝড়ের মাঝে উড়িয়া যাইবে। 'মানুষে'র চেয়ে বড় ধর্ম্ম নয়, সমাজ নয়, রাষ্ট্র নয়। ফজলুল হক মহাশয় পূর্ব্ব পাকিস্তানে এই মানুষের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করুন—উহা মানুষের সমাজ হউক, মানুষের রাষ্ট্র হউক—ইহাই দেখিবার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতে থাকিলাম। আর মানুষের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব স্বভাবতঃই স্থাপিত হইবে—সেইখানে পূর্ব্ব পাকিস্তানও নিরাপদ, ভারত ইউনিয়নও সুস্থ। প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ করিয়া ছোট কেন বড়ও বাঁচিতে পারে না, ফজলুল হক সাহেব পাকিস্তানের মুসলমান জনসাধারণকে এই সত্যটি মর্ম্মে মর্ম্মে শিখাইতে পারিবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, সমস্ত ব্যাপার তাঁহাদের একটা ব্যাপক পটভূমিকায় দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে—ক্ষুদ্র প্রাদেশিক মনোভাব লইয়া দেখিলে চলিবে না। এই ব্যাপক পটভূমিকায় ব্যাপক মনোবৃত্তি ছাড়া বর্ত্তমান বিশ্বে বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ব্যাপক মনোবৃত্তি সম্পন্ন পাকিস্তানে যে কোন মানুষ শান্তিতে ও সুখে বাস করিতে পারিবে—আমরা ইহা আশা করিব।

জীবনের ঋক্ মন্ত্র গান

গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায়

একটু উত্তাপ দাও দেহ ও মনের,
হিরণ্ময় প্রাণ-তীর্থে অবগাহনের
যে-পথ রয়েছে আজো হয়তো এখনো অপাবৃত।
সৌর কলঙ্কের লেখা আকাশে আস্তৃত
থাক, তবু কোনো ক্ষতি নেই।
আমাদের নিষ্কলঙ্ক প্রাণ-সত্তা যুক্ত জীবনেই
মুক্তির আদিম ঋক্—অগ্নিময় বাজে যে স্বরিতে
ধমনীর শংখে শংখে ঢেউ-তোলা দেহের শোনিতে!
এসো আজ বলি,—
আকাশের প্রাণ-শব্দ, বাতাসের নৃত্যকথাকলি
অরণ্যের স্নিগ্ধছায়া, এ মাটির অন্ন ও আশ্রয়
হোক মধুময়।
সমুদ্র প্রশান্তি আনো, নদী বরাভয়,
আমাদের হৃদয়ে হৃদয়
রাখো, সূর্য আলো দাও; অগ্নি—তাপমান;
তারারা বিস্ময় আনো, চাঁদ—প্রেমগান।
মৃত্তিকায় জীবকোষে বলিষ্ঠ অংকুর
উদ্গত ভূমিষ্ঠ হোক। এ দেহ ভংগুর
অন্তহীন বিচিত্রায় এসো তুলে ধরি—
জীবনের ঋক্ গেয়ে আলো করি মৃত্যুর শর্বরী।

———

ঔপনিষদিক রবীন্দ্রনাথ

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রকাব্যের কবিপুরুষ বলেছেন :

> "জীবনের দুঃখে শোকে তাপে, ঋষির একটি বাণী
> চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
> 'আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ'।"

* * * *

রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনায় যে আদর্শ ও ভাবকল্পনা অভিব্যক্তি লাভ করেছে, তাকে ভারতের অতিশয় প্রাচীন সাধনসংস্কারের এক নবরূপায়ণ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বস্তুত: সভ্যতার প্রত্যুষলগ্নে ভারতবর্ষের আর্য্য ঋষিগণ জগৎ ও জীবনকে—তার অন্তর্নিহিত পরমার্থ সত্যকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে যে সকল পন্থার অনুসরণ করেছিলেন, সেই বৈদিক যাগযজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ, তপশ্চর্য্যা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে নানাবিধ কল্পনার ধ্যানচিন্তা বহু শতাব্দীর ফল্গুধারায় প্রবাহিত হওয়ার পর উনবিংশ শতাব্দীতে যেন নতুন ভাবতরঙ্গ উচ্ছ্বাসে পুনরায় প্রকাশিত ও উৎসারিত হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ যেন সেই তরঙ্গউচ্ছ্বাসের মূর্ত্তবিগ্রহ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রামমোহনের মধ্যে এই ভাবের প্রথম স্ফুরণ হলেও তাঁর জীবনের আধার ভিন্নরূপ হওয়ায় এই সংস্কার সফলতা লাভের সুযোগ পায় নি। পরে রামমোহনেরই মন্ত্রশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ এই সংস্কারকে জীবনে প্রথম গ্রহণ করেন এবং আপনার অভিজাত দৃষ্টিভঙ্গী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসাকে নিবারণ করার জন্যে সাধনার পথে অগ্রসর হন। অতঃপর তাঁরই সুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথ পিতার প্রদর্শিত ধারার অনুশীলন করে জগৎসভায় কীর্ত্তির উচ্চআসন প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্বের ছাপ অঙ্কিত করে দেন।

অধ্যাত্ম সাধনায় দীক্ষাগ্রহণ করার আগে রবীন্দ্রনাথ ১১ বৎসর বয়সে (১২৭৯ চৈত্র) পিতৃদেবের সঙ্গে ডালহৌসী পাহাড়ে গমন করেন। সেখানে প্রত্যহ নির্ভুল উচ্চারণে উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করা ছিল তাঁর প্রত্যুষের

প্রধান কর্ম্ম। গায়ত্রী মন্ত্র পাঠকরার সময় জ্যোতিষ্ক লোকের বিরাট স্বরূপও তাঁর ধ্যানের বিষয় ছিল। বলাবাহুল্য এ বিষয়ে তিনি ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য সংস্কারেরই অনুবর্ত্তন করেছিলেন। নিজেদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌ পৌরাণিকযুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাধারণতঃ বাংলাদেশে ধর্ম্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে, আমাদের বাড়ীতে তা প্রকাশ পায়নি। পিতৃদেব প্রবর্ত্তিত উপাসনা ছিল শান্ত এবং সমাহিত।" কৈশোর এবং যৌবনের বয়ঃসন্ধিকাল উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সুদূরপ্রসারী কল্পনা ও সুকর্ষিত চিন্তাধারা অধ্যাত্ম সাধনার নিজস্ব পথে বিকাশলাভ করেছে। অর্থাৎ কবি তখন কেবলমাত্র পারিবারিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ না করে বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর ভাবজীবনকে মিলিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবি-পুরুষের হৃদয়ারণ্য থেকে নিষ্ক্রমণের পালাও এই খানে সুরু হয়। অর্থাৎ 'বনফুল' থেকে 'শৈশব সঙ্গীত' পর্য্যন্ত কাব্যধারা অতিক্রম করে কবি এখন 'মানসী'র চলিষ্ণুতার, 'সোনার তরীর' প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের, 'চিত্রা'র দ্বৈতকল্পনা ও লিরিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের সার্থক চিত্র অঙ্কণের আনন্দ উপভোগ করছেন। এরপর 'চৈতালী' কাব্যে প্রথম রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার আস্বাদ লাভ করেন। মানুষ-প্রকৃতি, জগৎ-জীবন এখানে পূর্ণতার সুরে বাঁধা। সমস্তই যেন এক অখণ্ড সৃষ্টিরূপ। এই কাব্যে কল্পনার আবেগ যেমন শান্ত, তেমনি কবির সত্তাও বাস্তব জগতের রঙহীন আবেশ শূন্য ছবির প্রতি অধিক মুগ্ধ। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে বিবর্ত্তিত হয়ে 'নৈবেদ্য' কাব্যে নিজের বাঞ্ছিত পথ খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতের সাধনা সর্ব্বপ্রথম 'নৈবেদ্য' কাব্যে লক্ষিত হয়। বাল্যকালে পিতৃদেবের কাছে শেখা উপনিষদের বাণী-ব্রহ্মের বিরাট স্বরূপ কল্পনার মাধ্যমে ঈশ্বর, রাজেন্দ্র, বিশ্বভুবনরাজ, মহারাজ ইত্যাদি নামে কাব্যে রূপায়িত হয়। যে সংসারী ব্রহ্মজ্ঞানী জনকরাজার আদর্শ দেবেন্দ্রনাথ তথা সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই জীবনের সত্য হিসেবে শিরোধার্য্য করেন। মানুষের নিত্য ও শাশ্বত ধর্মকে, সৌন্দর্যময়ী ধরণীর ভালোবাসা ও অনুরাগকে তিনি প্রাচীন ভারতের উচ্চ আদর্শের অনুপন্থীরূপে বিশ্বাস করেন এবং বৈরাগ্য সাধনা কৃচ্ছ্র সাধনা যে মোক্ষের পথ নয় বা জীবের কাম্য নয়, তাও তিনি অকপটে ঘোষণা করেন। বস্তুতঃ তাঁর জীবনের বাণী—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচয়িতাও বলেছেন—"জ্ঞান ও ভাব, রূপ ও রস, সৌন্দর্য্যের বিচিত্র নিবিড় অনুভূতি, জগৎকে জীবনকে নানা কল্পনায় চেতনায় শাশ্বতের পটে সত্য করিয়া জানিবার জানাইবার প্রয়াসই তাঁহার জীবনের মূলগত সাধনা। এই সাধনার মধ্য দিয়াই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ণরূপ তাঁহার অধ্যাত্মজীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছে। অন্তরে বাহিরে, ধ্যানে কামনায় কর্ম্মকে সত্যের বিপুল মহিমা দান করিয়াছে।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে কোনও দিকের বিচার কালে সর্ব্বাগ্রে তাঁর কবি-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে হবে। কেননা রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকাশ মূলত: কাব্যসৃষ্টিকেই কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়েছে এবং তার দীপ্তি কাব্যের আলোকেই দেদীপ্যমান। কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে রবীন্দ্র-সত্তার অন্তর প্রকৃতি ছাড়া বাইরেরও একটা প্রকৃতি আছে, যা থেকে তাঁর কাব্য ব্যতীত সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এবং যা তাঁর সত্তাকে অখণ্ডতা ও অবিচ্ছিন্নতার শক্তি প্রদান করেছে। বস্তুত: রবীন্দ্রনাথের অন্তর ও বাইরের সত্তার দ্বন্দ্বই তাঁর সৃষ্টিকর্ম্মের মূল কথা। এই কথা স্মরণ রেখেই আমরা বর্ত্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

১২৯৮ সালে (১৮৯১) শান্তিনিকেতনের মন্দির স্থাপিত হয় এবং মহর্ষির দীক্ষাদিবসে (৭ই পৌষ) পৌষ উৎসব ও মেলার প্রবর্ত্তন হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সম্পাদক। ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে যে ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম 'ব্রহ্মমন্ত্র' নামে একটি উপদেশ পাঠ করেন। শান্তিনিকেতন মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের এইটিই প্রথম ব্যাখ্যান। পরের বৎসর উৎসবে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের মানবকদের ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করেন। বাইরের কর্ম্মময় জীবন এবং অন্তরের আধ্যাত্মিক আকুতি কবিকে পথ নির্দ্দেশ করে। অবশেষে 'খেয়া' কাব্যের মধ্যে তিনি তাঁর আরাধ্য ও প্রেয়কে আবিষ্কার করলেন। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন ঘনীভূত হয়ে 'খেয়া'য় আত্মপ্রকাশ করেছে এবং কবি মুগ্ধ হয়ে সেই রূপ, সেই চিত্র দেখেছেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক এষণা জীবনদর্শন এবং জীবনানুভূতির মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে উন্মার্গগামী মননশীলতার প্রমাণ দিয়েছে। 'খেয়া' কাব্যে যে কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে পরবর্ত্তী যুগে 'গীতাঞ্জলি'তে তার সুর আরও সুপ্রতিষ্ঠ এবং মধুর ঝঙ্কারে

পুর্ণতা লাভ করেছে। কবি যেন তাঁর জীবনলব্ধ সত্যের অর্ঘ্য সাজিয়ে জীবন দেবতার চরণে নিবেদন করছেন। ভক্তের হৃদয়রস যেন উথলে উঠে ভগবানের দিকে ধাবিত হয়েছে। গীতা যেমন ভগবানের বাঙ্ময়ীরূপ, গীতাঞ্জলি তেমনি ভক্তের হৃদয় নিঃসৃত রসরূপ। নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃতি থেকে উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য যাচাই করা যায়।—

"প্রেমেগানে গন্ধে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভুলোকে
তোমার সকল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া॥"

আত্মার জ্যোতিরূপ এবং জগতের আনন্দরূপ উপনিষদের মূলকথা। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'তে সেই ব্রহ্মের অমৃতময় স্বরূপ এবং আত্মার আনন্দরূপ নিরাবরণ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদ বলেছেন— 'এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃত'। অর্থাৎ এই আত্মাই তোমার অন্তর্যামী এবং অবিনাশী। বস্তুতঃ কবি রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই বিশ্বের আনন্দরূপকে দেখেছেন এবং এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণামে 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' এই বাণী বারবার তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেছেন :

"সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।"

উপনিষদের ঋষিগণের প্রার্থনা মন্ত্র ছিল : 'অসতো মা সদ্ গময়ঃ; তমসো মা জ্যোতি র্গময়ঃ আবিবারির্ম্ম এধিঃ।' একই মন্ত্রের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন :

"হে সবিতা, তোমার কল্যানতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।"

রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক চিন্তা কেবলমাত্র ছন্দবন্ধনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, গদ্যের সহজ বোধ্য ও সাবলীল ভাষায়ও তার স্ফুরণ হয়েছে। ১৯০৯ সালে

'ধর্ম্ম' নামে তাঁর যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তাতে যে কয়েকটি প্রবন্ধ আছে তার মধ্যে অধিকাংশই উপনিষদের ভাব সম্পদে সমৃদ্ধ। 'ধর্ম্মের সরল আদর্শ' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তাতে উপনিষদের যুগে আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও আদর্শের প্রচলন সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। কেননা—"এই বিচিত্র সংসারকে উপনিষদ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ কোনও লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্ত্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকল প্রকার জটিলতা, সকল প্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়াছেন।" এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম্ম' গীতাঞ্জলিরও পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধগুলি—'প্রাচীন ভারতের এক' 'ধর্ম্মপ্রচার', 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' 'আনন্দরূপ' ইত্যাদিও তাঁহার ঔপনিষদিক চিন্তার পরিণাম।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনা 'শান্তিনিকেতন' নামক গ্রন্থমালায় যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্যের আর কোথাও তেমন হয় নি। ১৩১৫ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ থেকে ১৩২১ সালের ৭ই পৌষ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ছয় বছরের রবীন্দ্রনাথের নানা বিষয়ের ভাষণ এই 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। কবি এখানে উপনিষদের বিলুপ্ত ও বিস্মৃত ভাব-সম্পদকে পুনরুদ্ধার করে তার উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। বস্তুতঃ স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যেন এখানে উপনিষদের ব্যাখ্যাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে তিনি যেন জাতির চিত্তকে তার স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। 'শান্তিনিকেতনে'র আলোচনাগুলি এমন নিপুণ রচনা প্রণালীতে লিখিত যে, সেগুলি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়ে যায়। একটা বড় আশ্রয় এবং মহৎ ভাবের রাজ্য চোখের উপর ভেসে উঠে। যাঁদের অন্তরে বিশ্বাস আছে তাঁরা এগিয়ে চলবার একটা প্রেরণা অনুভব করেন। এবং এগিয়ে যাওয়ার পথের পাথেয় স্বরূপ এই আলোচনাগুলি তাঁদের হাতে এসে পড়ে। 'শান্তিনিকেতন'-এর 'উত্তিষ্টত জাগ্রত' প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের মতই আমাদের নিদ্রিত চিত্তকে জাগিয়ে তোলে এবং যে জীবনের জটিলতায় আজকের মানুষ বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত, সেই-জীবনকে 'অন্তরতর শান্তির' সন্ধান বলে দেয়, যে-জীবনে প্রাণরসের

লেশমাত্র নেই তাকে প্রাচুর্য্যে ভরিয়ে দেয় এবং যে-জীবনে নিঃস্বতা ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করে তাকে জীর্ণ শীর্ণ করে দিচ্ছে, সেই জীবনকে এমন সম্পদ পাইয়ে দেয় 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'।

'শান্তিনিকেতন' থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে উপরোক্ত মন্তব্যকে সত্য বলে প্রমাণিত করা যাক। মানুষের জীবনের প্রতিদিনের যে সমস্যা—অভাব, দুঃখ, রোগ, শোক, দারিদ্র্য, মূঢ়তা, শঙ্কা ইত্যাদি থেকে পরিত্রাণ না পেলে তার মুক্তি অসম্ভব। কিন্তু এগুলি জীবনের এমনই নিত্যসঙ্গী যে আমৃত্যু মানুষকে এই সকল বাধা এবং প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে চলতে হয়—কখনই সে এদের বর্জ্জন করতে পারে না। অর্থাৎ এগুলির অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ এদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকবে; কিসে তার মুক্তি হবে, সে চিন্তার অবকাশ পাবে না। এখন প্রশ্ন উঠে এই যে, তবে কি এই সকল প্রতিকূল শক্তিকে বিদূরিত না করলে আমাদের মুক্তিলাভ হবে না? রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন—"নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ! সুখকরকে নমস্কার, কল্যাণকরকে নমস্কার। কিন্তু আমরা সুখকরকেই নমস্কার করি, কল্যাণকরকে সব সময় নমস্কার করতে পারি না। কল্যাণকর যে শুধু সুখকর নয়, তিনি যে দুঃখকর। আমরা সুখকেই তাঁর দান বলে জানি, আর দুঃখকে কোন দুর্দৈবকৃত বিড়ম্বনা বলেই জ্ঞান করি। দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয়, সুতরাং তাতে কখনোই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না, সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওয়া পেলে না—তার পাথেয় কম পড়ে গেল।"

ইহজগতে থেকে মানুষের সুখলাভ হয় কিসে? এর উত্তরে উপনিষদের ঋষি বলেছেন—'ভূমৈবসুখং'। অর্থাৎ ভূমাকে না জানলে, বৃহৎকে না অনুভব করলে সুখ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কথায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে—"মানবাত্মা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাজ বল, রাজ্য বল, যা কিছু সৃষ্টি করেছে, তার ভিতরকার একটি মাত্র মূল তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ একাকিত্ব পরিহার করে বহুর মধ্যে, বিচিত্রের মধ্যে আপনার নানা শক্তিকে নানা সম্বন্ধে বিস্তৃত করে দিয়ে নিজেকে বৃহৎক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে—এই তার যথার্থ সুখ।

এইজন্যেই বলা হয়েছে—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'—ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নেই। তার কারণ অল্পে আত্মাও অল্প হয়।"

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—"চলার দ্বারাই মানুষ আপনাকে জানতে থাকে, কেন না চলাই সত্যের ধর্ম্ম। যখন আমাদের সীমারূপী অহংকেই আমরা চরম বলে জানি, তখন কিছুই আমরা ছাড়তে চাইনে; সমস্ত উপকরণকে তখন দু'হাতে আঁকড়ে ধরি; মনে করি বস্তুপুঞ্জের যোগেই আমরা সত্য হব, বড়ো হব। আর যখনই কোন বৃহৎ প্রেম, বৃহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, তখনই আমাদের কৃপণতা কোথায় চলে যায়। তখন আমরা রিক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠি, মৃত্যুর দ্বারা অমৃতের আস্বাদ পাই। এইজন্য মানুষের প্রধান ঐশ্বর্য্যের পরিচয় বৈরাগ্যে, আসক্তিতে নয়; আমাদের সমস্ত নিত্যকীর্ত্তি বৈরাগ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত।" এই কারণেই ঋষিদের মন্ত্র ছিল 'ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য'—ভূমাকেই জানতে হবে।

মানুষ যদি সবসময় কেবল অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তাহলে সে তার বড় প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। একদিন তপোবনে ঋষি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিশ্বসৃষ্টিতে বিরোধ বা বিচ্ছিন্নতা সত্য নয়—সত্য হ'ল এক অবিচ্ছিন্ন অবিরোধী আত্মা এবং বলেছিলেন 'অমৃতস্যৈষ সেতুঃ'—ইহাই অমৃতের সেতু। এই আত্মাকে জানতে হলে তাকে মৃত্যুর শোকের ও ভয়ের মধ্য দিয়ে দেখলে হবে না—সংসারের মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে, অহঙ্কারের মধ্যে জড়িত করে দেখলেও হবে না—পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "আত্ম সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে জানবে, সেই পরম উপলব্ধি দ্বারা সে বিনাশকে একেবারে অতিক্রম করবে। সে জ্ঞান জ্যোতির নির্ম্মলতার মধ্যেই নিজেকে জানবে। আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে লাভ করাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য, এই লক্ষ্যটিকে একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে স্থির করে নিতে হবে।"

উপনিষদ বলেছেন 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ আত্মাকে জানো। এই আত্মা ব্রহ্মের থেকে আলাদা নয়। অতএব যিনি আত্মাকে জেনেছেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মেরও স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। এই ব্রহ্ম আবার আনন্দময় প্রেমময়। অর্থাৎ ব্রহ্মকে পেতে হলে আনন্দের মধ্য দিয়ে, প্রেমের মধ্য দিয়ে পেতে হয়। ব্রহ্মবাদী বলেছেন 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়—"ব্রহ্ম

আনন্দ স্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে। আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া; আনন্দ স্বতঃই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। কর্ম্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাদ্বারা জীবনে অমৃত লাভ করে। ব্রহ্মহীন কর্ম্ম অন্ধকার এবং কর্ম্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। আনন্দের ধর্ম্ম যদি কর্ম্ম হয়, তবে কর্ম্মের দ্বারাই সেই আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই বলে কর্ম্মযোগ।" উপনিষদ আরও বলেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। আত্মাকে লাভ করতে হলে বলহীন হলে চলবে না। আত্মার স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি মহৎভয় অর্থাৎ মৃতুভয়কেও অস্বীকার করবেন। কেননা ভয়ের মধ্যে দিয়েই অভয়বাণী উচ্চারিত হয়, যেমন কর্ম্মের মধ্যে মানুষ অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করে তুলছে—যেমন অনির্দ্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে আত্মা নতুন নতুন কর্ম্ম সৃষ্টি করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথও প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: "কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমা—কর্ম্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুর রূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপুর্ণ করে জেনেছেন, তাঁরা কোনো দিন দুর্ব্বল মুহ্যমান ভাবে বলেন না জীবন দুঃখময় এবং কর্ম্ম কেবলই বন্ধন। কর্ম্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করছে, বহুভার লাঘব করছে। কর্ম্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেলছে, অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা ধ্যানযোগে এই উপলব্ধি করেছেন যে, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। শান্ত-শিব এবং সুন্দর এই তিন রূপেই অদ্বৈত ব্রহ্ম বিরাজমান। আমাদের দেশের যে তিন আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ—তা ব্রহ্মের তিন স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা জীবনে শান্ত স্বরূপকে লাভ করলে তবে গৃহধর্ম্মের মধ্যে শিবস্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়; নতুবা গার্হস্থ্য অকল্যাণের আকর হয়ে ওঠে।...যখন তা সম্পূর্ণ বুঝি তখনই যিনি অদ্বৈতম্, সেই ঐক্যরূপী পরমাত্মার সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার বাধাহীন প্রেমের মিলন সম্ভবপর হয়। আরম্ভে সত্যের পরিচয়, মধ্যে মঙ্গলের পরিচয়, পরিণামে আনন্দের পরিচয়। প্রথমে জ্ঞান,

পরে কর্ম্ম, পরে প্রেম। ...সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ। জগৎপ্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজ প্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী।" রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের এই অদ্বৈত স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—"কবি যেমন ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নিজের ইচ্ছার অধীন, নিজের শক্তির অনুগত করে সুন্দর ছন্দ বিন্যাসের ভিতর দিয়ে একটি আশ্চর্য্য অর্থ উদ্ভাবিত করে তুলছে, তিনিও (ব্রহ্ম) তেমনি 'বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থোদধাতি', অর্থাৎ শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত করে, বহুর সঙ্গে যুক্ত করে অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তুলছেন—নইলে সমস্তই অর্থহীন হয়।"

উপনিষদের ঋষিরা যে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন তার মূল উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি'। রবীন্দ্রনাথ 'আত্মার দৃষ্টি' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—"ধীর ব্যক্তিরা সর্ব্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্ব্বত্রই প্রবেশ করেন। এই সর্ব্বত্র প্রবেশ করার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া।......চেতন ভাবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন তো আমাদের বুঝতে হবে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশ পথ খুলে যাচ্ছে, আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্ছে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে আসছে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্ম্মের মধ্যে ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে।"

তপোবন একটি শান্ত রসের আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ এই রস সম্বন্ধে বলেছেন—"শান্ত রস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণ রশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রঙ হয়, তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভ'রে তোলে, তখনই শান্ত রসের উদ্ভব হয়।"

'শান্তিনিকেতন' প্রকাশের পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম্ম' নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তাকে যদি রবীন্দ্র-সাহিত্যর অধ্যাত্ম দর্শনের প্রবেশিকা বলা যায়, তবে 'শান্তিনিকেতন'কে রবীন্দ্রনাথের নবসূক্তের ব্যাখ্যান বা সটীক অনুবাদ বললে ভুল বলা হবে না। কারণ পরবর্ত্তীকালে একমাত্র 'মানুষের ধর্ম্ম' ব্যতীত আর কোনও গদ্য গ্রন্থে তিনি সাক্ষাৎ ভাবে উপনিষদের অমৃতময়ী বাণীর

রসবিশ্লেষণ করেন নি। আর কোনও গ্রন্থে তাঁর মৌলিক চিন্তা ও প্রজ্ঞা দৃষ্টি জীবনের এমন গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ লাভ করে জাতির চিত্তকে আন্দোলিত করতে সমর্থ হয়নি। অপর পক্ষে কাব্যের ক্ষেত্রে 'গীতাঞ্জলি' যেমন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান, তেমনি গদ্যের ক্ষেত্রে 'শান্তিনিকেতন' তাঁর অতুলনীয় সৃষ্টি। তবুও একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত উপনিষদের আলোকে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই উপনিষদের ঋষিরা যেমন বলেছিলেন—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ", তেমনি আধুনিক যুগের ঔপনিষদিক রবীন্দ্রনাথও উদাত্ত কণ্ঠে এই বাণী উচ্চারিত করেছেন—

"ধূলির আসনে বসি
ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অনীয়ান্
মহৎ হইতে মহীয়ান্,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার
পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি
দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।"

———

ব্যর্থ সাধনা

প্রতিভা রায়

হস্তিনানগরের বিরাট ময়দানে একদিন অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ রাজগুরু দ্রোণাচার্য্য তাঁহার প্রিয় শিষ্য ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু পুত্রগণের সহিত সমবেত হইয়াছেন। গুরুর উদ্দেশ্য রাজপুত্রগণকে অস্ত্র পরিচালনা করিবার শিক্ষা দান করা। সেইরূপ আয়োজন চলিতেছে এমন সময় এক কিশোর বালক করজোড়ে গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গুরু প্রশ্ন করিলেন বালক তুমি কে? কেনই বা আমার নিকট আসিয়াছ, কি তোমার মনোগত অভিলাষ আমাকে ব্যক্ত করিয়া বল।

বালক অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, গুরু আমি শূদ্র পুত্র, নাম একলব্য, আমি আপনার সকাশে আসিয়াছি আপনাকে গুরু পদে বরণ করিবার এক দুর্ব্বার বাসনা লইয়া, আপনি আমাকে দয়া করিয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাদান করুন, এই আমার কাতর নিবেদন।

গুরু বলিলেন, বৎস তোমার মনোগত ভাব ও তোমার নম্র ব্যবহারে আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। কিন্তু তোমার মনের অভিলাষ পুর্ণ করিতে আমি অক্ষম। আমি রাজগুরু রাজার অন্নে পালিত, রাজপুত্রগণের সহিত তোমাকে অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে তো সম্ভবপর নয়। আমি আশীর্ব্বাদ করি একলব্য তুমি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ কর।

কিশোর বালক একলব্য দৃঢ়চেতা, তাহার সঙ্কল্প অটুট। তিনি দ্রোণাচার্য্যকেই মনে মনে গুরুত্বে বরণ করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। 'সঙ্কল্পময়ঃ পুরুষঃ—একলব্য সেই সঙ্কল্পের মূর্ত্ত বিগ্রহ। একলব্য নিজ গৃহে ফিরিয়া গুরু দ্রোণাচার্য্যের এক প্রতিমূর্ত্তি তৈরী করিয়া তাহারই সম্মুখে বসিয়া অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বলে অল্পদিন মধ্যেই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

বহুদিন গতে গুরু দ্রোণাচার্য্য তাঁহার শিষ্যগণসহ বহু সৈন্য সামন্ত ও হাতি ঘোড়া ইত্যাদি লইয়া মৃগয়া ভ্রমণে বাহির হইয়া এক বন মধ্যে যাইয়া শিবির স্থাপনা করিলেন। একদিন বৈকালে গুরু তাঁহার শিষ্যগণকে লইয়া শিবির

সম্মুখে বসিয়া কথা বলিতেছেন, এমন সময় একটি কুকুর মুখে বাণ বিদ্ধ অবস্থায় তাঁহাদের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরু এবং রাজপুত্রগণ তো কুকুরের অবস্থা দেখিয়া অবাক্! এমন কৌশলে এই কুকুরের মুখে বাণগুলি বিদ্ধ করিয়াছে যে, কুকুরের একটু আওয়াজও করিবার সামর্থ্য নাই।

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন—বৎসগণ চল, এই বনমধ্যে কে এমন অসাধারণ ধনুর্দ্ধর রহিয়াছেন, তাঁহার অন্বেষণ করি। এই বলিয়া গুরু শিষ্যগণ সহ তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। অনেকক্ষণ খুঁজিবার পর দূরে একটী কুটীর দেখিতে পাইয়া সকলে সেইদিকে অগ্রসর হইলেন, কিছু দূর যাইতেই এক রাজপুত্র বলিলেন—গুরুদেব, কুটীরে যে আপনার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি, এই বলিয়া সকলেই কুটীর সমীপে সমবেত হইলেন।

গুরু দ্রোণাচার্য্যকে দেখিতে পাইয়া সেই কুটীর হইতে একজন যুবক আসিয়া গুরুকে প্রণাম করিলেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি, তোমার পরিচয় জানিবার ইচ্ছা করি। যুবক করজোড়ে বিনীতভাবে বলিলেন, আমি আপনার শিষ্য একলব্য, আপনার প্রত্যক্ষ সাহচর্য্য না পাইয়া আপনার আশীর্ব্বাদকে সম্বল করিয়া আপনার এই প্রতিমূর্ত্তি তৈরী করিয়া আমি তাঁহার নিকটেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। একলব্যের কথা শুনিয়া গুরুর হৃদয় স্নেহরসে বিগলিত হইয়া উঠিল, তিনি তাঁহাকে সাদরে কাছে টানিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাজপুত্রগণ ইহা দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইলেন এবং একজন শূদ্রপুত্র তাঁহাদের অপেক্ষা অস্ত্রবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষিণা স্বরূপ একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীটি চাহিবার জন্য গুরুকে প্ররোচিত করিলেন। গুরু একলব্যের নিকট তাঁহার গুরু দক্ষিণা স্বরূপ তাহাই চাহিলেন। একলব্য দ্বিরুক্তি না করিয়া আঙ্গুলটী কাটিয়া গুরুকে দক্ষিণা দান করিলেন। ঐ অঙ্গুলী না থাকায় একলব্যের তীর ছুড়িবার আর উপায় রহিল না, চিরতরে তাঁহার এত সাধনালব্ধ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ব্যর্থ হইল।

এই ঘটনা অবলম্বনে গুরুশিষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা আমরা করিব না। জগতে আদর্শ নর নারী এক একটী আদর্শ স্থাপনা করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। সঙ্কল্প সাধনার যে দৃঢ়তা—একলব্য তাহারই আদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সাধনায় তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। কেন সাধনায় তিনি ব্যর্থ হইলেন, ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ভারতবর্ষে দুইটী সাধনার ধারা চলিয়া আসিতেছে, একটী আনুমানিক সাধনা, অপরটী প্রত্যক্ষ সাধনা। আনুমানিক ব্রহ্ম সাধনা তো শুধু ভাবের সাধনা—বাস্তবের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। ভাবের সাধনা কর্ত্তৃতন্ত্র আমির সাধনা। সে সাধনা আরম্ভ হয় মানুষের জৈব ছোট আমিকে কেন্দ্র করিয়া ; তাহার ইষ্ট, তাহার শ্রেয় তো তখন তাহারই মনগড়া। জৈব আমির সাধনায় অহঙ্কারই হয় প্রবল, তাই তাহার পরিণামে আসে ব্যর্থতা। এই আনুমানিক সাধনার ফলে বর্ত্তমান ভারতবর্ষ সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যর্থ, শূন্যের আরাধনা করিয়া আজ সে সর্ব্বক্ষেত্রে শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আনুমানিক সাধনায় থাকে ফাঁকি; যেমন রাধাগোবিন্দের বিছানার নীচে টাকা রাখিয়া আমরা বলি ঠাকুর, আমার টাকা পয়সা তোমার, আমিও তোমার। কিন্তু যখন নিজের মনে যাহাই উঠিতেছে, তাহাই করিতেছি। রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ তো কিছু বলেন না, তিনি যদি বলিতেন, টাকা আমাকে দিয়াছ উহা আমার ইচ্ছামত খরচ করিব, তুমি তোমাকে তো দিয়া দিয়াছ আমাকে ; আমি যাহা বলিব তাহাই তোমার করিতে হইবে, তবে মানুষ কি বিপদেই না পড়িত। ঠাকুর ভোগের এত আয়োজন, ঠাকুর যদি খাইতেন, তবে তাঁহার ভাগ্যে ভোগ জুটিত কিনা সন্দেহ। আনুমানিক সাধনায় জীবন শুদ্ধ নির্ম্মল হয় না, ফাঁকিতেই ভরিয়া উঠে, অহঙ্কারই পুষ্ট হয়। তাই অবতারবাদ আসিয়া দিয়া গেলেন প্রত্যক্ষের সাধনা। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন—'প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে প্রত্যক্ষের সহিত যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে আমরা সেই যুক্তিই বিশ্বাস করি।'

প্রথমেই লইতে হইবে প্রত্যক্ষের নিকট আমির লয় সাধনা। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে দাঁড়াইয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ দেবতার নিকট আত্মসমর্পণের কথা, মন বুদ্ধি লয়ের কথা। প্রত্যক্ষ জীবনের সামনে মানুষ যখন তাহার জাগ্রত ইন্দ্রিয়ের ভাল মন্দ সব কিছু লইয়া আসিয়া দাঁড়ায় এবং একে একে তাহার মনবুদ্ধি অহঙ্কারের ভালমন্দ সেই প্রত্যক্ষ জীবনের মাঝে আহুতি দেয়, তখনই সে ব্রহ্ম অনলে জারিত হইয়া, বিশুদ্ধ হইয়া জাগ্রত বিশ্বের বুকে ভাগবতী ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি অহঙ্কার লইয়া গৌরবের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয়, সে প্রতিষ্ঠা তাহারও বটে, সে প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ দেবতারও বটে। বিরাট আমির ভিতর ছোট আমির লয় সাধনাই প্রত্যক্ষের সাধনা। এই অদ্বৈতজ্ঞানই বাস্তব জগতের কষ্টিপাথরে ঘর্ষিত হইয়া পরীক্ষিত হয়,

আনুমানিক সাধনার মত ব্যর্থতা তাহার আসিবার অবসর আর থাকে না।

একলব্যের গুরুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ব্যতীত আনুমানিক গুরুর নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা তাই কোন বাস্তব জগতে কার্য্যকরী ভাবে রূপ লইতে পারিল না, তাহার শিক্ষা বিশ্ব সেবার কাজে লাগিল না। অর্জ্জুনই জগতে বিজয়ী বীর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। একলব্যের গুরুভক্তি ও সঙ্কল্পের একটা গৌরব রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সাধনা বাস্তব জগতে ব্যর্থই হইয়াছে, কেন হইয়াছে তাহার তত্ত্ব ইহাই। অনুমানের ভিতর তো প্রত্যক্ষের কোন স্পর্শ থাকে না, তাই বাস্তবের ক্ষেত্রে আসে ব্যর্থতাই। প্রত্যক্ষের ভিতর থাকে অনুমান ও প্রত্যক্ষের সম্মিলন। মানুষের সমগ্র জীবনের সার্থকতা আসে তাই প্রত্যক্ষ সাধনায়।

অনুমান সাধনায় এই জগত এবং নিজের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার সমস্তই অনুমানের ভিতর মুছিয়া ফেলিয়া যে লয় সাধনা করে, আপাতত: তাহাতে মনে হয় সব ছাড়িয়া বুঝি ব্রহ্মে লয় হইয়াছে; কিন্তু দেখা যায় যাহাদের ছাড়িয়াছি ভাবিয়া ছিলাম, তাহারা ছাড়ে নাই। কলমী লতা যেমন গ্রীষ্মের প্রখর তাপে শুকাইয়া মাটীর ভিতর থাকে, একটু বৃষ্টি পাইলেই আবার গজাইয়া ওঠে; সেইরূপ অনুমান সাধনার বৈরাগ্যের তাপে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার লুকাইয়া থাকে বটে, সময় পাইলে তাহারা আবার জাগিয়া ওঠে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাহারা ছাড়িবে কেন, তাহারা তোমাকে যে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের ভিতর পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ঋণ শোধ না করিয়া তুমি কোথায় পলাইয়া যাইবে, তাহারা তাইতো পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে।

প্রত্যক্ষ সাধনায় এই ঋণ শোধ হয়। প্রত্যক্ষ সাধনার ভিতর বাদ দিবার ভুল থাকে না, প্রত্যক্ষের সাধনায় আনুমানিক ব্রহ্মই আসেন এই জগতের মাঝে, মানুষের সকল ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কারের মাঝে, তখন ফাঁকি দিবার সম্ভাবনা আর থাকে না। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের ভিতর ব্রহ্ম বস্তুকে অবতরণ করাইয়া সকলের ঋণ ব্রহ্ম স্পর্শে শোধ করিয়া সে তখন ব্রহ্মসাগরে ডুবিয়া যায়, এ পথে বাধা দিবার কেহ আর তখন থাকে না, সবাই তাহাকে সাহায্যই করে। মানুষ তখনই জীবনের মাঝে বিশ্বের মাঝে অনুমানকে পায়। ইহাই সমগ্রের সাধনা। শ্রীকৃষ্ণের 'সমগ্রং মাং' বাণীর ইহাই ইঙ্গিত, এই সাধনায়ই মানুষ সার্থক হয়। বর্ত্তমান যুগস্রষ্টা সমগ্রের দেবতা পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার জড়াজড় সমন্বয়ের ভিতর এই সমগ্রের পথ আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউন।

আদিবাসী গারোদের নৃত্য

সুধীরচন্দ্র দে

আসামের পশ্চিমাঞ্চলের অখ্যাত জিলা গারো পাহাড়ের কথা মনে পড়লে চোখ দু'টো জলে ভরে ওঠে। অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে প্রকৃতির লীলাভূমি গারোপাহাড়। সৌন্দর্য্যের রাণী—গারোপাহাড়। কিন্তু ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এক অনার্য্য ও অশিক্ষিত জাতির বাস এ বনানীর বুকে। আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে—কিন্তু আজও ইতিহাসের বুক থেকে এ কথাগুলি ম্লান হয়ে যায়নি।

যদিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অনার্য্য অশিক্ষিতদের বাসভূমি এ গারোপাহাড় —কিন্তু এ গারোপাহাড়ের বুকেই জন্ম নিয়েছেন Capt. Williamson Sangma'র মতো রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি। Mr. Sangma-র চেষ্টায়ই আজ গারোপাহাড়ের পূর্ব্বাকাশ উজ্জ্বল করে তপনদেব উদিত হচ্ছেন।···

গারোদের নৃত্যের আদি ইতিহাস বের করা একেবারে অসাধ্য। গারোদের জাতীয় জীবনের কোন ইতিহাস না থাকায় প্রাচীন বৃদ্ধদের মুখে যা জানতে পেরেছি তা দিয়েই গারোদের নৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

গারোদের নৃত্যতে যে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেগুলির পরিচয় দিচ্ছি। এদের নৃত্যে নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলিরই প্রচলন বেশী দেখা যায়—(গারো কথায় সেগুলির নাম) (১) দমা (২) আদল্ (৩) রাংরাং (৪) বাংশী (৫) চিত্রিং। এসব বাদ্যযন্ত্রের হদিশ ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে অনার্য্যগণ যুদ্ধ যাত্রার সময় এসব বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহার করতো। বাদ্যযন্ত্রগুলির বাংলা নামও পাঠকদের সুবিধার্থে দিচ্ছি—
(১) দমা = মাদল, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ ফুট, প্রস্থে ২ ফুট; ওজন প্রায় ১৫ সের।
(২) আদল = সিঙ্গা, দৈর্ঘ্যে হাত দুয়েক। ইহার শব্দ বেশ গম্ভীর শোনা যায়।
(৩) রাংরাং হলো কাঁসি, তবে ঠিক কাঁসি নয়; এগুলি দেখতে প্রায় গামলার মতো। (৪) বাংশী হলো বাঁশী। বাঁশীর পরিচয় দেবার নিশ্চয় প্রয়োজন হবে না। (৫) চিত্রিং হলো মোটা বাঁশ দিয়ে তৈয়ারী একপ্রকার হারমোনীয়ম। বড় সুমিষ্ট স্বর আসে এ যন্ত্রটি বাজালে। হারমোনীয়মকে হার মানায় এ যন্ত্রটির শব্দ।

গারো নৃত্যে সর্বমোট তিনটি তাল আছে। (১) সুক্কু দামা (২) জাক আরু ব্যান চিত্রিং (৩) জাচোক আদল্। সংখ্যা গরিষ্ঠ লোক প্রথম তালটি

জানে—সেটির বাংলা নাম দেওয়া যেতে পারে "মাদল বাজনার তালে মাথার নৃত্য"। দ্বিতীয়টির বাংলা নাম—"সমস্ত শরীরের ভাবভঙ্গি বাঁশের হারমোনীয়মের তালে দেখান" এবং তৃতীয়টির নাম করা যেতে পারে—"শিঙ্গার তালে পা নাচান"।

গারোদের নৃত্যের তাল নির্দ্দেশ করে দেয় দলের সর্দ্দার—সে সর্ব্ব প্রথম নৃত্যের উদ্বোধন করে এবং অন্যান্য সব্বাই তাকে অনুসরণ করে। সর্দ্দার এ সময় এক অদ্ভুদ পোষাক পরিধান করে—ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে বা স্থানীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করলে জানা যায় যে গারোরা যুদ্ধের সময় দলের সর্দ্দারকে বা সেনাপতিকে এ পোষাক পরাতো। সর্দ্দার মাথায় পাগড়ী বেঁধে কুক্কুটের পালক দিয়ে প্রথম মাথাকে বেশভাবে সজ্জিত করে নেয়; তারপর হাতে ঢাল এবং তরোয়াল নেয়। এ দু'টি অস্ত্রকে এরা সেনী ও মোলাম্ বলে। তারপর কানে, পায়ে, হাতে ও গলায় যথা ক্রমে নিম্নলিখিত জিনিষ গুলি পরিধান করে (এ জিনিষ গুলির বাংলা নাম পাইনি তাই গারোরা যে নামে ডাকে তাই দিচ্ছি) নাদিরাং, সেংগ্রাং, জাকছাপ্ ও খাথাম্। নৃত্যের আগে এরা দু' সারিতে দণ্ডায়মান হয়—একসারিতে থাকে স্ত্রীলোক, অন্য সারিতে থাকে পুরুষ। প্রত্যেকে মাথায় কুক্কুটের পালক পরিধান করে।

নৃত্য আরম্ভ হলে এদের বাজনার তাল ওঠে "তুরে-তুরে ধা-ধিং—ধা-ধিং—স্রু রু-রু"। দূর থেকে শুনলে মনে হয় কোথায়ও তাণ্ডব বয়ে চলছে। কিন্তু কাছে এলে দেখা যায় বাজনার সাথে নৃত্যের অপুর্ব সাদৃশ্য—বেশ লাগে। নৃত্যের আগে এরা মদ ও বেশ পিয়াজ খেয়ে নেয়। নৃত্য করলে এরা পুণ্য হয় বলে মনে করে। মদকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে যথা (১) চুবোক (২) চুরেংমা। চুরেংমা হলো সাত বৎসরের পুরানো মদ। এরা মদ তৈরীতে অদ্ভুদ পারদর্শী। সাত বৎসর মদ ঘরে রাখলেও নষ্ট হয় না, বরং ভাল পানীয় বলে গণ্য করা চলে।

সহরবাসী আমরা; কাজেই গারোনৃত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারিনে। কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া গারোনৃত্য দর্শন করবার সৌভাগ্যও হয় না। 'অয়ান গালা' বলে এদের আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে মূর্ত্তি পুজো হয়। এসময় নোতুন ধান গৃহে আসে; বাঙ্গালীর 'নবান্ন ভোজের' মতো উৎসব আয়োজন করে থাকে। এসময় গ্রামে গেলে দেখা যায় এদের নৃত্যের পারদর্শিতা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দশমোঽধ্যায়ঃ

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ১০।২০

(আমার প্রথম বিভূতি শ্রবণ কর) অহম্ আত্মা [পুরুষোত্তম আমি-আত্মা ; আত্মাই পুরুষোত্তমের সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বপ্রধান বিভূতি] হে গুড়াকেশ, [গুড়াকা অর্থাৎ নিদ্রার ঈশ, জিতনিদ্র ; অথবা ঘনকেশ] সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ [সর্ব্বভূতের আশয় অর্থাৎ অন্তর্হৃদয়ে স্থিত ; 'আমি আত্মা' এইরূপেই এই মায়াবিভূতির দেশে পুরুষোত্তম ধ্যেয়] (লীলারত পুরুষোত্তম আত্মা সর্ব্বভূতাশয় স্থিত হইয়া যে ভাবে 'স্বয়মাত্মানম্ অকুরুত', সুকৃত হইলেন, সেই ক্রম ও পরিপাটী বলিতেছেন) অহম্ আদিং চ [পুরুষোত্তম-আত্মারূপে আমি আদিকারণ] মধ্যং চ [এবং মধ্য অর্থাৎ স্থিতি] ভূতানাং [ভূত সমূহের] অন্তঃ এব চ [এবং অন্তও, প্রলয়]।

হে ঘনকেশ, আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা, আমিই ভূতসমূহের আদি, মধ্য ও অন্ত ১০।২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ১০।২১

আদিত্যানাং [দ্বাদশ আদিতের মধ্যে] অহম্ বিষ্ণুঃ [আমিই বিষ্ণু] জ্যোতিষাং [প্রকাশকারী পদার্থ সমূহের মধ্যে] রবিঃ [সূর্য্য] অংশুমান্ [রশ্মিমান] মরীচিঃ [মারীচি নামক মরুদ্গণ আমি] মরুতাং [মরুৎ নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত মরুদ্গণের মধ্যে ; অথবা উনপঞ্চাশৎ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি] অস্মি [আছি] নক্ষত্রানাং [নক্ষত্রসমূহের মধ্যে] অহং শশী [আমি চন্দ্র]।

আমি দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, প্রকাশক বস্তুনিচয়ের মধ্যে আমি রশ্মিমান সূর্য্য, মরুৎ নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরুৎ, নক্ষত্র-সমূহের মধ্যে আমি চন্দ্র। ১০।২১

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ১০।২২

বেদানাং [বেদসমূহের মধ্যে] সামবেদঃ অস্মি [আমি সামবেদ ; কেননা, 'সাম' শব্দের অর্থ বৃহদারণ্যক শ্রুতি দিতেছেন : যত প্রকৃতিবাচক শব্দ সব 'সা', যত পুরুষবাচক শব্দ সব 'অম', একাধারে 'সাম', পুরুষ-প্রকৃতির সমন্বয় শাস্ত্রই সামবেদ ; বিশেষতঃ সামবেদ গীতিপ্রধান বেদ ; আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও গান।—'এষ উ এব সাম বাগ্ বৈসামৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ সামত্বম্। যদ্বেব সমঃ প্লুষিনা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ] দেবানাম্ অস্মি বাসবঃ [দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র] ইন্দ্রিয়াণাং [একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে] মনঃ চ অস্মি [আমি সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন] ভূতানাম্ অস্মি চেতনা [ভূতসমূহের মধ্যে চেতনা ; কেননা, চেতনাকে সরাইয়া লইলে ভূতসমূহ নিতান্ত জড়, অশুচি, মৃত]।

বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে মন, ভূতসমূহের মধ্যে চেতনা। ১০।২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ১০।২৩

রুদ্রাণাং [একাদশ রুদ্রের মধ্যে] শঙ্করঃ চ অস্মি [আমি শঙ্কর] বিত্তেশঃ [কুবের] যক্ষরক্ষসাম্ [যক্ষ ও রক্ষোগণের মধ্যে] বসূনাং [অষ্টবসুর মধ্যে] পাবকঃ চ অস্মি [আমি অগ্নি] মেরুঃ [মেরু পর্ব্বত ; কেননা, সূর্য্য সর্ব্বগতিসমন্বিত হওয়ার ফলে মেরু পর্ব্বত হইতেই সর্ব্বদা সমভাবে, সমব্যবধানে দৃষ্ট হন্] শিখরিণাম্ [শিখরযুক্ত পর্ব্বতসমূহের মধ্যে]।

আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রক্ষোগণের মধ্যে কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে আমি পাবক, পর্ব্বতসমূহের মধ্যে আমি সুমেরু। ১০।২৩

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ১০।২৪

পুরোধসাং [রাজপুরোহিতগণের মধ্যে] মুখ্যং [প্রধান] মাং বিদ্ধি [জান] হে পার্থ, বৃহস্পতিঃ [বৃহস্পতি ; বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রের পুরোহিত, তাই প্রধান] সেনানীনাম্ [সেনাপতিগণের মধ্যে] অহম্ স্কন্দঃ [দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়] সরসাং [যে সকল দেবজাত জলাশয় সমূহ আছে, তাহাদের মধ্যে] অস্মি সাগরঃ [আমি সাগর]।

হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে। আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর। ১০।২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ১০।২৫

মহর্ষীণাং [মহর্ষিগণের মধ্যে] ভৃগুঃ অহম্ [আমি ভৃগু] গিরাম্ [পদলক্ষণ শব্দনিচয়ের মধ্যে] একম্ অক্ষরম্ [ওঙ্কার] যজ্ঞানাং [যজ্ঞসমূহের মধ্যে] জপযজ্ঞঃ অস্মি [আমি জপযজ্ঞ] স্থাবরাণাং [স্থিতিমান পদার্থসমূহের মধ্যে] হিমালয়ঃ [হিমালয়]।

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, পদ সমূহের মধ্যে আমি ওঙ্কার, যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়। ১০।২৫

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ১০।২৬

অশ্বত্থঃ [আমি অশ্বত্থ] সর্ব্ববৃক্ষাণাং [বৃক্ষসমূহের মধ্যে] দেবর্ষীণাং চ [এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে ; দেবতা হইয়াও যাহারা ঋষি (মন্ত্রদর্শী) তাঁহারা দেবর্ষি] নারদঃ [আমি নারদ] গন্ধর্ব্বাণাং [গন্ধর্ব্ব সমূহের মধ্যে] চিত্ররথঃ [আমি চিত্ররথ] সিদ্ধানাং [জন্মকাল হইতেই অধিগত পরমার্থতত্ত্বে সিদ্ধগণের মধ্যে] কপিলঃ মুনিঃ [কপিলমুনি]।

বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে মুনি কপিল। ১০।২৬

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ১০।২৭

উচ্চৈঃশ্রবসম্ [উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বকে] অশ্বানাং [অশ্ব সকলের মধ্যে] বিদ্ধি [জান] মাম্ [আমাকে] অমৃতোদ্ভবম্ [অমৃত নিমিত্ত সমুদ্রমন্থনের সময় উদ্ভূত] ঐরাবতম্ [ইরাবতীয় অপত্য ক্ষীরোদ-সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত ঐরাবতকে] গজেন্দ্রাণাং [হস্তি শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে] নরাণাং চ [এবং নরগণের মধ্যে] নরাধিপম্ [রাজা বলিয়া জানিবে]।

অশ্বগণের মধ্যে আমাকে অমৃতোদ্ভব উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব বলিয়া জানিবে, গজশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, নরগণের মধ্যে আমি রাজা। ১০।২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ১০।২৮

আয়ুধানাং [অস্ত্র সমূহের মধ্যে] অহম্ বজ্রম্ [দধীচি মুনির অস্থি হইতে

জাত বজ্র আমি] ধেনূনাং [প্রচুর দুগ্ধবতী গাভীগণের মধ্যে] আমি কামধুক্ [সর্ব্বকামের দোগ্ধ্রী বশিষ্ঠের কামধেনু, অথবা সাধারণ কামধেনু] প্রজনঃ চ [এবং উৎপত্তিহেতু] অস্মি কন্দর্পঃ [আমি কাম ; কেবল সম্ভোগমাত্র-প্রধান কাম আমি নই] সর্পাণাং অস্মি [সবিষ সর্পগণের মধ্যে] বাসুকিঃ [আমি রাজা বাসুকি]।

অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, পয়স্বিনী গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু, লোক-সৃষ্টিকারণ কাম আমি, সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি। ১০।২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥১০।২৯

অনন্তঃ চ অস্মি [এবং আমি রাজা অনন্ত শেষ] নাগানাং [নির্ব্বিষ নাগ বিশেষ গণের মধ্যে] বরুণঃ [আমি রাজা বরুণ] যাদসাং [জল দেবতাগণের মধ্যে] পিতৄণাং [পিতৃগণের মধ্যে] অর্য্যমা চ অস্মি [আমি পিতৃ রাজ অর্য্যমা] যমঃ [আমি যম] সংযমতাং [সংযমনকারীদের মধ্যে]।

আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জল দেবতাগণের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, নিয়ন্তৃগণের মধ্যে আমি যম।১০।২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥১০।৩০

প্রহ্লাদঃ চ অস্মি [এবং আমি ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদ] দৈত্যানাং [দিতি বংশধরগণের মধ্যে] কালঃ [আমি গণনাত্মক সংবৎসর শতাদি আয়ু স্বরূপ কাল] কলয়তাং [গণনাকারীগণের মধ্যে] মৃগানাং [মৃগগণের মধ্যে] মৃগেন্দ্রঃ অস্মি [আমি সিংহ কিম্বা ব্যাঘ্র] বৈনতেয় চ [এবং বিনতা সুত গরুড়] পক্ষিণাং [পক্ষিসমূহের মধ্যে]।

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারীর মধ্যে কাল, মৃগগণের মধ্যে আমি মৃগেন্দ, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়।১০।৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥১০।৩১

পবনঃ [বায়ু] পবতাম্ [পবিত্রতাকারীদের মধ্যে] অস্মি রামঃ [ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ করুণাময় দাশরথি রাম আমি] শস্ত্রভৃতাং [শস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে] ঝষাণাং [মৎস্যগণের মধ্যে] মকরঃ চ অস্মি [আমি মকর] স্রোতসাং [নদীগণের মধ্যে] জাহ্নবী [পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা]।

পবিত্রতাকারীদিগের মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর, নদী সমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা।১০।৩২

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥১০।৩২

সর্গানাং [সৃষ্টি সমূহের] আদিঃ অন্তঃ চ মধ্যং চ এব অহম্ [আমিই উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়; পূর্ব্বে 'আমি জীবাধিষ্ঠিত ভূতগণের আদি, অন্ত' ইত্যাদি বলিয়াছেন; এখানে বলিতেছেন, আমি সৃষ্টির আদি-অন্ত-মধ্য] অধ্যাত্মবিদ্যা [আত্মানাত্মসমন্বয়বিদ্যা, 'বিদ্যাত্মনি ভিদা বাধঃ'] বিদ্যানাং [পরস্পর দ্বন্দ্ব যুক্ত বিদ্যাসমূহের মধ্যে] বাদঃ [অর্থনির্ণয় হেতু বাদ] প্রবদতাং [প্রবক্তৃগণের সম্বন্ধে] অহম্ [বাদ-জল্প-বিতণ্ডার মধ্যে আমি বাদ, 'যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতস্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে পরপক্ষাশ্ছল জাতি নিগ্রহৈ-দূর্ষ্যতে সঃ জল্পো নাম যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি, অন্যস্ত ছলজাতি নিগ্রহ স্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি সা বিতণ্ডা নাম কথা; তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমানয়োর্ব্বাদিনোঃ শক্তি পরীক্ষা ফলে, বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্যয়োর্ব্বা তত্ত্বনিরূপণ ফলশ্চ; অতঃ অসৌ শ্রেষ্ঠত্বাৎ মদ্বিভূতিঃ।']

আমি ভূত সমূহের আদি; অন্ত মধ্য আমিই। হে অর্জ্জুন, বিদ্যাসমূহের আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, আমিই বাদিগণের বাদ-জল্প-বিতণ্ডা এই ত্রিবিধ কথার মধ্যে বাদ।১০।৩২

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥১০।৩৩

অক্ষরাণাং [বর্ণ সমূহের মধ্যে] আকারঃ অস্মি [আমি 'অ' বর্ণ]—'অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্ সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি'—শ্রুতিঃ] দ্বন্দ্বঃ [উভয় পদার্থপ্রধান দ্বন্দ্ব; কেননা, দ্বন্দ্বের মাঝে উত্তরপদার্থ-প্রধান তৎপুরুষও থাকে, পূর্ব্বপদার্থ-প্রধান অব্যয়ীভাবও রহিয়াছে এবং উভয়পদার্থ প্রধান বলিয়া পরপদার্থ-প্রধান বহুব্রীহিও রহিয়াছে। পুরুষোত্তম-জীবনই সর্ব্বদ্বন্দ্বের সমাস-সীমা] সামাসিকস্য চ [এবং সমাস সমূহের মধ্যে] অহম্ এব [আমিই] অক্ষয়ঃ [প্রবাহরূপে অক্ষয় অসীম] কালঃ [কাল অথবা কালেরও কাল মহাকাল] ধাতা অহম্ [পুরুষোত্তম-বিধানের প্রবর্ত্তক আমি] বিশ্বতোমুখঃ [বিশ্বতঃ অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুর মধ্যেই যিনি মুখরূপে, মুখ্য রূপে রহিয়াছে, তিনিই বিশ্বেতোমুখ]।

সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে আমি অকার, সমাস সমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, আমিই অক্ষয় কাল, আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা।১০।৩৩

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥১০।৩৪

মৃত্যুঃ [মৃত্যু] সর্ব্বহরঃ [সংহারকগণের মধ্যে সর্ব্বহরণকারী] উদ্ভবঃ চ [উৎকর্ষ, অভ্যুদয় এবং তৎপ্রাপ্তি হেতু আমিই] ভবিষ্যতাং [উৎকর্ষ-প্রাপ্তি-যোগ্য ভাবি কল্যাণ সমূহের] কীর্ত্তিঃ [ধার্ম্মিকত্ব নিমিত্ত খ্যাতি] শ্রীঃ [লক্ষ্মী] কান্তিঃ [শোভা] বাক্ [সর্ব্ব-প্রকাশিকা প্রাণময়ী বাণী] স্মৃতিঃ [চিরানুভূত স্মরণ শক্তি] মেধা [গ্রন্থ ধারণ শক্তি] ধৃতি [ধৈর্য্য] ক্ষমা [মান-অপমানে অবিকৃতচিত্ততা। এই কয়টী স্ত্রীস্বভাব রূপে আমিই বর্ত্তমান রহিয়াছি, যাহার সহিত আভাষ মাত্র সম্বন্ধ হইলেও লোক আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী ইত্যাদি শব্দে সেই সেই দেবতাই বিবক্ষিতা] নারীণাং [নারী সমূহের মধ্যে)। মহাভারতে বর্ণিত আছে, ইহাদের মধ্যে বাণী ও ক্ষমা ছাড়িয়া পাঁচ এবং অপর পাঁচ (পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, লজ্জা মতি) উভয় মিলিয়া দক্ষের কন্যা মোট দশ। ধর্ম্মের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার জন্য ইহাদিগকে ধর্ম্মপত্নী বলা হয়।]

আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, উৎকর্ষপ্রাপ্তি-যোগ্য ভবিষ্যৎ কল্যাণসমূহের আমি উৎকর্ষ, আমিই নারীগণের শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা।১০।৩৪

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী চ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥১০।৩৫

বৃহৎসাম ['ত্বাম্ ইন্দ্র হবামহে' এই ঋক্ মন্ত্রে গীয়মান বৃহৎসাম আমি; এই মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রই সর্ব্বেশ্বর রূপে স্তুত হন, এই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে] তথা সাম্নাং [সামবেদীয় মন্ত্র সমূহের মধ্যে] গায়ত্রী [আমি গায়ত্রী ছন্দোযুক্ত মন্ত্র] ছন্দসাং [গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দোযুক্ত মন্ত্র সমূহের মধ্যে] অহম্ মাসানাং [মাস সমূহের মধ্যে] মার্গশীর্ষঃ অহম্ [আমি অগ্রহায়ণ মাস] (যখন মৃগাদি নক্ষত্রগণনার প্রচার ছিল, তখন মৃগ নক্ষত্র প্রথম অগ্রস্থান লাভ করিয়াছিল, এই কারণেই মার্গশীর্ষ মাসও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকিবে। সে সময়ে বার মাস মার্গশীর্ষ হইতেই গণনা করিবার রীতি ছিল) ঋতূনাম্ [ঋতু সমূহের মধ্যে] কুসুমাকরঃ [রমণীয় বসন্ত]

আরও সামমন্ত্র সমূহের মধ্যে আমি বৃহৎসাম নামক মন্ত্র, ছন্দঃ সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, মাস সমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতু সমূহের মধ্যে বসন্ত।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।

জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ১০।৩৬

দ্যূতং [দ্যূতক্রীড়া] ছলয়তাং [সর্ব্বস্বাপহরণের জন্য অন্যায়ের ছলে পরের অভিপ্রেত হনন করিয়া নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য ছলনাকারীদের সম্বন্ধী] তেজঃ [প্রভাব, অপ্রতিহতাজ্ঞা] অহম্ জয়ঃ [আমি জেতাগণের জয়, উৎকর্ষ] ব্যবসায়ঃ অস্মি [আমি ফলহেতু উদ্যম স্বরূপ] সত্ত্বং [ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদি সত্ত্ব কার্য্য কিম্বা বল] সত্ত্ববতাম্ [সাত্ত্বিক পুরুষগণের অথবা বলবান পুরুষগণের]

আমি ছলনাকারিগণের দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বিগণের তেজ, আমি জয়, আমি উদ্যম, আমি সাত্ত্বিক পুরুষগণের সত্ত্ব কার্য্য ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি অথবা বলবানের বল।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥১০।৩৭

বৃষ্ণীনাং [বৃষ্ণিগণের মধ্যে] বাসুদেবঃ অস্মি [যিনি বাসুদেব বলিয়া পরিচিত, সেই এই বাসুদেব তোমার সখাও আমি; বাসুদেব পুরুষোত্তমের বিভূতি; কেননা বাসুদেব চিত্তের অধিষ্ঠাতা, 'সর্ব্ব'; 'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্'। আর পুরুষোত্তম আত্মা ও সর্ব্বের সমন্বয়; মহত্তত্ত্বেরও পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর] পাণ্ডবাণাং [পাণ্ডবগণের মধ্যে] ধনঞ্জয়ঃ [ধনঞ্জয় তুমিও আমার বিভূতি] মুনীনাং অপি [মননশীল, সর্ব্বপদার্থ জ্ঞানিগণের মধ্যে] ব্যাসঃ [আমি ব্যাস] কবিনাং [অতীত বস্তুনিচয় দর্শিগণের মধ্যে] উশনাঃ [শুক্রাচার্য্য] কবিঃ

বৃষ্ণিকুলের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥১০।৩৮

দণ্ডঃ [অদান্তদের দমন কারণ দণ্ড] দময়তাং [দমনকারিগণের সম্বন্ধা; পুরুষোত্তম স্তরের দণ্ড নিগ্রহমূলক নয়, কেন না সে দণ্ড ব্যর্থ হয়। আদর্শ জীবনের টানে অদান্তের জীবনকে আকর্ষণ করার কৌশল যে দণ্ডের প্রাণ, সেই দণ্ডই পুরুষোত্তম দণ্ড; 'ছেড়েই রাখ দাসে'—দণ্ড দিবার এই অপূর্ব্ব কৌশল পুরুষোত্তমের। যে দণ্ডে সাম দান ভেদ দণ্ড সমন্বিত, সেই দণ্ডই পুরুষোত্তম দণ্ড] নীতিঃ অস্মি [আমি নীতিঃ] (যে জয়ের পশ্চাতে কোনও আদর্শ বা

নীতি নাই, গায়ের জোরের সেই জয় পুরুষোত্তম স্তরের জয় নয়।) জিগীষতাম্ [জয়াভিলাষীদের] মৌনং [গোপন হেতু মৌন বচন] গুহ্যানাং [গোপনীয় বিষয় সমূহের] জ্ঞানং [তত্ত্ব জ্ঞান] জ্ঞানবতাং [জ্ঞানিগণের] অহম্।

দণ্ড দাতাগণের আমি দণ্ড, বিজয়াভিলাষিগণের আমি নীতি, গুহ্য সমূহের মধ্যে আমি মৌন, জ্ঞানিগণের আমি তত্ত্ব জ্ঞান।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥১০।৩৯

যৎ চ অপি [এবং যাহা কিছুও] সর্ব্বভূতানাং [সর্ব্বভূতের] বীজং [আত্মানাত্ম সমন্বিত প্ররোহ কারণ] তৎ অহম্ [তাহা আমি] হে অর্জ্জুন। (প্রকরণের উপসংহার করিবার জন্য বিভূতির সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন) ন তৎ অস্তি [তাহা নাই] ভূতং চরম্ অচরম্ [চর এবং অচর বস্তু] ময়া বিনা [আমি ছাড়া, আমার বাহিরে, যাহা আমাদ্বারা পরিত্যক্ত, তাহা নিয়াত্মক, শূন্য] যৎ স্যাৎ [যাহা কিছু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হইতে পারে।]

হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্বভূতের বীজ, তাহা আমিই ; আমি ভিন্ন যাহা থাকিতে পারে, এই চরাচর ভূত তেমন কিছু নাই।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥১০।৪০

ন অন্তঃ অস্তি [অন্ত নাই, ইয়ত্তা নাই] মম [আমার] দিব্যানাং বিভূতীনাং [দিব্য বিস্তার সমূহের] হে পরন্তপ, এষঃ তু [ইহা কেবল] উদ্দেশতঃ [একদেশ ধরিয়া সংক্ষেপে] প্রোক্ত [বলা হইল] বিভূতেঃ [বিভূতির] বিস্তরঃ [বিস্তার] ময়া [আমাদ্বারা]

হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতি সমূহের ইয়ত্তা নাই ; বিভূতির বিস্তার এইমাত্র সংক্ষেপে আমি বলিলাম।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥১০।৪১

(বিভূতির মূল রহস্যদ্বারা উক্ত-অনুক্ত সব-কিছুর সংগ্রহ করিতেছেন) যৎ যৎ [যাহা যাহা] বিভূতিম্ [শক্তি বিভূতি যুক্ত] সত্ত্বং [বস্তু] শ্রীমৎ [সমৃদ্ধিমান্, শোভাযুক্ত বা কান্তি যুক্ত] উর্জ্জিতং এব বা [প্রভাব-বলাদি গুণে শ্রেষ্ঠ, সপ্রাণবলযুক্তই উর্জ্জিত] তৎ তৎ এব [সেই সেই বস্তুকেই] অবগচ্ছ [জানিয়া রাখ] ত্বং মম [উরুক্রম ঈশ্বর আমার] তেজোঽংশ সম্ভবম্ [তেজের

(শক্তির) অংশ (একাদশ) সম্ভব (উৎপত্তি স্থল) যাহার, তাহা] (এইরূপে বিভূতি অবগতির ফল হইতেছে সমাজের মধ্যে জনসাধারণ হইতে বাছা বাছা সর্ব্বস্তরে কতগুলি নেতা, ঈশ্বর ; ইহারাই পথ দেখাইয়া জনসাধারণকে লইয়া চলে। কিন্তু একান্ত বিভূতিই যদি হয় একমাত্র উপাস্য, তবে এই ঈশ্বরের দল হন অত্যাচারী, স্বাধিকারপ্রমত্ত, শোষক (dictator)। শোষণের স্থানে এই শক্তিমানদের পোষণঘন জ্ঞান বুদ্ধি স্থাপন করিবার জন্য প্রয়োজন যোগ, সমতা, democracy ; একান্ত সমত্বের উপাসনায় পুরুষের প্রজ্ঞা শুদ্ধ হয়, জাগ্রত থাকে প্রাণই ; পক্ষান্তরে একান্ত বিভূতির পূজায় প্রজ্ঞা হয় জাগ্রত, প্রাণ থাকে সুপ্ত। শ্রীভগবান তাই বিভূতি ও যোগের সমন্বয় প্রচার করিয়া সমাজের বিভূতি উপাসনার দান সমাজের অগ্রগমন এবং যোগের দান সমত্বকে তুল্য রূপেই অব্যাহত রাখিলেন।)

যে যে বস্তু বিভূতি সম্পন্ন, শ্রীমৎ, প্রভাব ও বলাদি গুণে শ্রেষ্ঠ, তৎসমস্তই আমার শক্তির অংশ সম্ভূত বলিয়া জানিয়া রাখ।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥১০।৪২

বিভূতিযোগোনাম দশমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

(সর্ব্ব শেষে বিভূতি দর্শনের চরম সূত্রের উপদেশদ্বারা অবিচ্ছিন্ন বিভূতি দর্শনের মধ্যে একদর্শন স্থাপন করিতেছেন) অথবা বহুনা এতেন [এইরূপ পরিচ্ছিন্ন বহু পৃথক পৃথক বিভূতি] কিং জ্ঞাতেন [জানিয়া কি ফল সিদ্ধ হইবে ?] হে অর্জ্জুন [পৃথক্ পৃথক্ বিভূতি দর্শনের মধ্যে চরম একবিভূতি-দর্শন বলিতেছি, শ্রবণ কর] বিষ্টভ্য [বিশেষভাবে স্তম্ভন করিয়া, ব্যাপিয়া] অহম্ ইদং কৃৎস্নং জগৎ [এই সমগ্র জগৎ] একাংশেন [সর্ব্বভূতাশয়স্থিত আত্ম-স্বরূপ এক অবয়ব দ্বারা, এক পাদ দ্বারা] স্থিতঃ [পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি—এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ—পুরুষসূক্ত।

অথবা হে অর্জ্জুন, এইরূপ পরিচ্ছিন্ন বহু বিভূতি জ্ঞাত হইয়া কি তোমার লাভ হইবে ? আমি আমার একাংশদ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছি।

দশমাধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত

দেশ-মাতৃকা

শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

গোধূলির মলিন-ছায়ায়,
বিছায়ে অঞ্চল খানি জনহীন প্রান্তর-সীমায়—
ব'সে আছ একাকিনী!
তোমার অন্তর-রূপ মোরা নাহি চিনি,
নাহি বুঝি হৃদয়ের অব্যক্ত-বেদনা!
তুমি যেন ধ্বংস-স্তূপ, তুমি যেন নিঃশেষ-চেতনা!
করুণ আকুতি তব ভেসে যায় সময়ের অন্তহীন স্রোতে,
নিভে যায় দীপ্তি তব অস্তোন্মুখ প্রক্ষীণ আলোতে!
দিগন্তের বক্ষ হ'তে মুছে যায় অতীতের সমুজ্জ্বল-স্মৃতি,
বাজে না কণ্ঠের মাঝে আর তব সীমাহীন জীবনের গীতি!

তুমিই ত' ছিলে একদিন,
বিশ্বের অন্তর মাঝে গৌরবের আসনে আসীন!
পর্বতে, সাগর-কূলে, অরণ্যে, প্রান্তরে
তোমার রূপের ছটা জাগাইয়ে দুর-দূরান্তরে,
জেগেছিলে তুমি নিরুপমা,
সূর্য-কর-কিরীটিনী রাজরাণী সমা!
অন্তর-বৈভব তুমি যোগায়েছ অসংকোচে সেইদিন হ'য়ে অকৃপণা,
ত্যাগের মহিমা ল'য়ে বিলায়েছ নিঃশেষে আপনা!

আজ তুমি দীনা হীনা রিক্তা সংকুচিতা,
একান্তে বসিয়া শুধু রচিতেছ জীবনের অশ্রুময়ী গীতা!
দীনতার এই আবরণ,
এই ম্লান গোধূলি-লগন,
পরিচ্ছিন্ন মূক অন্ধ এই কালো সংক্ষুব্ধ আকাশ,
দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত এই মহা মৃত্যুর আভাস,
মনে হয় সত্য যেন নয়!
চিরন্তন সত্তা তব একদিন ফিরে পাবে বুঝি তব দিব্য-অভ্যুদয়!
বুঝি তা'রি লাগি',
ধ্বংসের স্তূপের মাঝে আজো আছে জাগি'
অনাগত দিবসের উজ্জ্বল-প্রকাশ!
ব্যথাহত বক্ষ মাঝে তাই কি এখনো জাগে মুক্তির আশ্বাস?

———

স্বাক্ষর

স্যমন্তক

প্রাচীন পত্র আর ঢোলসহরতে সভার সংবাদ সারা সহরে ছড়িয়ে গেল।

কালীপুরের হরিলাল আর তুফান্নু বর্মা হাট করতে আসছিল, তরিতরকারী বিক্রি ক'রে যা হয় কিনবে, দূরাগত ঢোলের শব্দে বুঝতে পারল একটা কিছু হবে; কিন্তু কি হবে, কোথায় হবে তা আগে জানতে পারে নি। যাক্, যেতে যেতে ঢোল বাদককে জিজ্ঞেস করলেই হবে।

হন্তদন্ত হ'য়ে এক ভদ্রলোক আসছেন এদিকে, চেনা চেনা মনে হয়।

—কি হবে বাবু? ঢোল কেন?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রলোক থেমে যান।—ঐ দেয়ালে কাগজে লেখা আছে, প'ড়ে দেখতে পার না?

হা কপাল! প'ড়তে কি পারি আমরা?—হরিলাল দুঃখের হাসি হাসে।

তোমরা যাঁদের ভোট দিয়েছ সেদিন, তাঁরাই জিতেছেন, তাই সভা হবে।—ভদ্রলোক সংক্ষেপে উত্তর দেন।

কে জিত্‌ল বাবু, কি জিত্‌ল?—বুঝতে পারে না তুফান্নু। হরিলাল বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

তোমার মাথা জিতেছে! বেয়াকুব কোথাকার? কেন, ভোট দিয়েছ, জান না জেতা হারা কি? অত কথা বলবার আমার সময় নেই।—পকেট চিরুণী বার ক'রে চুলগুলো পালিশ করে নেন কুমার ঘোষ।

গণমঙ্গল সংঘের সভ্য কুমার ঘোষ। অতি উৎসাহী সভ্য হিসেবে সংঘের কারও কারও কাছে নাম করেছেন। অবশ্য অতি সাবধানী কয়েকজন সভ্য ওঁকে এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে নি। গণমঙ্গল সংঘের সভ্য হ'য়েছেন সম্প্রতি, তার আগে অন্য দলে, তারও আগে আর এক দলে। পুলিশের লাঠির সাথে পরিচিত হবার আশঙ্কা দেখলেই পৈতৃক প্রাণের মায়া প্রবলতর হয় ওঁর। আপাততঃ এই সংঘের সভ্য হওয়া নিরাপদ মনে হয়েছে ওঁর কাছে।

—কিন্তু কাকে যে ভোট দিয়েছিলাম তা তো মনে নেই। আপনি বললেন, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সাহেব বললেন, অমুক ছবি আঁটা বাক্সে

ভোট দিতে, তাই দিলাম। তা, বললেই ত মিটে যায়। হাটের বেলা হ'য়ে এল।

—শুভ্রজ্যোতি চট্টরাজ আর বিপ্রমুখ মণ্ডল। হ'ল এবার? তোমাদের অভাব অভিযোগ আছে ত?

তার কি আর শেষ আছে বাবু?—সমস্বরে বলে ওঠে হরিলাল আর তুফানু।

সেই সব শুনবার জন্যে তাঁরা শীগ্‌গির আসবেন—

একটু তাড়াতাড়ি পাঠাবেন বাবু, তুফানু কুমার ঘোষের কথার মাঝখানে বলে ওঠে,—বড্ড অন্যায় আর অবিচার সুরু হয়েছে, এর একটা প্রতিকার—

আসবেন, আসবেন, সময় পেলেই আসবেন, মেম্বর তো আর সোজা কথা নয়। শুধু তোমাদের গ্রাম দেখলে হবে না, সারা দেশের সব রকম সুব্যবস্থা যাতে হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় মেম্বরদের। আচ্ছা, সে সব কথা আর একদিন হবে। হাত ঘড়িটা দেখে নেন কুমারবাবু। প্রায় পাঁচটা বাজে। নাঃ, এত সময় নষ্ট করা ঠিক হয়নি। কতক গুলো বাজে লোকের সাথে সময় কাটানো কোন মানে হয়?

হন্ হন্ ক'রে ছুটে চললেন কুমার ঘোষ। আজকের সভায় সুযোগ পেলে একটা মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেবার ইচ্ছা আছে।

হাটের পাশ দিয়ে যেতে গতি মন্থর হ'য়ে আসে। গরুর গাড়ী, মোটর বাস, রুটি বিস্কুটের দোকান, সাড়ে বত্রিশ ভাজার আধার ও বহুপ্রকার মশলাসজ্জিত তাম্বুলের বৃত্তাকার বাক্সের পাশ কাটিয়ে যেতে হচ্ছে। নাঃ, এ চলবে না। গোটা রাস্তাটাই যদি ওরা দখল ক'রে বসে, লোক যাবে কোন্ দিক দিয়ে? স্থায়ী ঘর নিয়ে দোকান বসাতে পারে না লোকগুলো? দোকান ভাড়া দেবার অত পয়সা নেই তো ব্যবসায়ে নেমেছিল কেন?

বাম পাশে খানিকটা খাদের মত জায়গা। ক'দিন আগে বৃষ্টির জল জমেছিল। লোক যাতায়াতে এখন কাদা হ'য়ে গিয়েছে জায়গাটায়; অপর দিক থেকে একটা জীপ আসছে। কুমারবাবু কোন মতে খাদ পেরিয়ে দাঁড়ালেন ফুফু মিস্ত্রিরের ফলের দোকানের পাশে। জীপের দিকে তাকিয়েই চীৎকার ক'রে উঠলেন, নমস্কার স্যর, নমস্কার। মোটর দাঁড়িয়ে গেল। দৌড়ে এলেন কুমারবাবু কাদার ভেতর দিয়েই। পাজামা নোংরা হ'য়ে গেল—যাক গে।

কেমন আছেন? তারপর আমার সেটার কি খবর?—মাথাটা গাড়ীর ভেতর থেকে বার করলেন বড় দরের কোন সাহেব। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আশে পাশে ছড়িয়ে গেল।

হ'য়ে যাবে স্যর, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কি, সোজাসুজি তো বলা যায় না। তবে দাদাকে বলেছি, কাগজে রিপোর্টটা যেন একটু রেখে ঢেকে পাঠান। বিপদ হয়েছে ইন্দুবাবুকে নিয়ে, তাঁকে আভাষ দিতেই ক্ষেপে ওঠেন। তা আপনি ঘাবড়াবেন না। বড় চাক্‌রের শত্রু অনেক, কারণ থাক আর না-ই থাক।—এগিয়ে দেওয়া সিগারেট ধরিয়ে নেন কুমার বাবু।—ভাল কথা, নীরেনবাবুর ছেলের ডি, পি এজেন্সির কতদূর হ'ল?

নীচু গলায় আলাপ চলতে থাকে কিছুক্ষণ।

রাস্তার এধারে ফুফু মিত্তির আর রাম লাহিড়ী এতক্ষণ উৎসুক হ'য়ে তাকিয়ে ছিল। ভাল শোনা যাচ্ছেনা, এবার লাহিড়ী পাশ কাটিয়ে জীপের পেছনে ওঁদের আড়ালে দাঁড়াল।

নীচু গলায় বলছেন সাহেব,—এই ত হ'ল ডি, পি এজেন্সির খবর। আপনার কয়লার এজেন্সি কিন্তু হ'য়ে গিয়েছে। দেখবেন, আমার অনুরোধটা—

নিশ্চয়, নিশ্চয়, আশা করছি সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তবে নীরেনবাবুর ছেলের এজেন্সিটা একটু তাড়াতাড়ি ক'রে দিতে হবে, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে—

কি দেরী হ'য়ে যাচ্ছে ঘোষ মহাশয়?—রাম লাহিড়ী আত্মপ্রকাশ করল।

—আজকের মিটিং-এর কথা বলছিলাম ওঁকে। নমস্কার স্যর, বড্ড দেরী হ'য়ে গেল।

রাম লাহিড়ীর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে এগিয়ে চললেন কুমার ঘোষ। ইলেকশনে হেরে গিয়ে রাম লাহিড়ীর দল পাগলা কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার পেছনে গোয়েন্দার মত লেগেছে, তা লাগুক। অনেক কিছু ভাবতে থাকেন কুমার ঘোষ।

ফুফু মিত্তির আর রাম লাহিড়ীও রওনা হ'ল সভার দিকে।

কুমার ঘোষের হয়ত মনে পড়ছে, ক'মাস আগেও তিনি ফুফু মিত্তিরদের দলে ছিলেন। গ্রামোফোনের হর্ণ নিয়ে ভিন্ন দলের সভায় বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করেছেন নিজেই, গণমঙ্গল সংঘের নিন্দায় মুখর হ'য়ে উঠেছেন। তারপর

এই সংঘে ঢুকে তাঁকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি দুর্ভিক্ষের চাঁদার হিসাবের—আরও অনেক টাকার। বেঁচে গিয়েছেন মিত্তিরদের দল ছেড়ে দিয়ে।

* * * *

ফুফু মিত্তির, রাম লাহিড়ী, আর এ দলের ভগলু কাহার, যদু সূত্রধর, আরও অনেকে সভায় এসেছে। দড়ির বেড়া দিয়ে সীমানা নির্দিষ্ট হ'য়েছে মেয়েদের বসবার স্থানের। যদু এপারে প্রায় দড়ি ঘেঁসে বসেছে। ধীরা চ্যাটার্জি দাঁড়িয়ে মেয়েদের কলকাকলি থামাচ্ছে। পানের একটা বড় পিক ফেলবার অসুবিধায় গিলে নিয়েই তরফদার গিন্নী রসাল গল্প শোনাতে লাগল মজুমদার গিন্নীকে।

কৌটা থেকে একটা পান মুখে দিয়ে পেছনের দিকে মাথা হেলিয়ে আলগোছে খানিকটা দোক্তা ফেলে দিলেন মজুমদার গিন্নী।

দেখুন, সভায় এসে লোকের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে আলোচনাগুলো না-ই বা করলেন, পাড়ায় পাড়ায় যখন বেড়াতে যাবেন, তখনকার জন্যে ওগুলো মুলতুবী রাখলে ভাল হয় না?—বিরক্ত হ'য়ে বললেন এক বর্ষিয়সী মহিলা।

আপনার বড় লেগেছে কথাগুলো দেখছি?—একটু উঁচু গলাতেই বলে ওঠে মজুমদার গিন্নী। মুখোমুখি হ'য়ে ঘুরে ব'সে তরফদার গিন্নী জিজ্ঞেস করে,—আপনার কেউ হয় নাকি ওরা, বড় যে দরদ দেখছি!

ব্যঙ্গ বুঝতে পারে ভদ্রমহিলা। চীৎকার ক'রে ওঠেন,—বেরিয়ে যান না এখান থেকে?

কাকে কে বার করে দেখি? গণমঙ্গল সংঘের মেম্বর হয়ত আপনি, আমরাও হয়েছি জানবেন,—সমস্বরে ব'লে ওঠে গিন্নীদ্বয়।

বক্তৃতা মঞ্চ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অনেকে এই গুটি কতক কলহমানা মহিলার ওপর।

ধীরা চ্যাটার্জি ছুটে এল,—ব্যাপার কি, বলুন না আমাকে?

ফোপর দালালি যে অঞ্চলে করছিলেন, সে দিকেই থাকুন না,—আঙ্গুলের ইসারায় দিকটা দেখিয়ে দেয় বরুণা চৌধুরী। স্পষ্ট কথা বলবার ক্ষমতা রাখে বরুণা চৌধুরী, আর এই নিয়ে গণমঙ্গল সংঘের কারও কারও সাথে কথা কাটাকাটি হয় মাঝে মাঝে।

ধীরা আর দাঁড়াতে পারে না, আপন স্থানে ফিরে আসে। কলরব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল, সভাপতি এখনও আসেন নি, সভার কাজও সুরু হয় নি। মজুমদার গিন্নী অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তরফদার গিন্নীর কানে কানে অস্বস্তির কারণ জানাবার চেষ্টা করে,—সভা শেষ হ'তে সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে কিনা কে জানে দিদি, ওদিকে সন্ধ্যের সময় কর্তার ওষুধটা বার ক'রে না দিলে ভারী রাগ করবেন। কি যে করি?

আলমারীর চাবিটা কর্তার কাছে দিয়ে এলেই পারতে—তরফদার গিন্নী হেসে বলে।

*　　*　　*　　*

……ভিন্ন পার্টির লোক সমীরশঙ্করবাবু সভাপতির অভিভাষণে বলছেন,—বিদ্রূপ করেন, গণমঙ্গল সংঘের সভ্যের দুটো পরিচয়—আসল আর মেকী। এর সত্যতা কিছুটা আছে, অস্বীকার করি না। কিন্তু শুভ্রজ্যোতি চট্টরাজ আর বিপ্রমুখ মণ্ডলের কথা আমরা সবাই জানি। আদর্শ পুরুষ তাঁরা। কঠিন অত্যাচারেও তাঁরা কোনদিন সংকল্পচ্যুত হন নি। আমি চাই, আমরা সবাই তাঁদের মত হই, আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অন্যে কেন সন্দিহান হবে?—

কুমার ঘোষ, নীরেন বাবু বক্তৃতা দিয়ে গা এলিয়ে বসে ছিলেন, সমীরবাবুর কথা শুনে সোজা হ'য়ে বসলেন। ধীরা চ্যাটার্জি চোখ ফিরিয়ে মঞ্চের দিকে তাকাল, মজুমদার গিন্নীর পান চিবানো থেমে গেল।

যত বড় পাপই হ'ক না কেন,—সমীরশঙ্করবাবু দৃপ্তকণ্ঠে বলে যাচ্ছেন,—তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। গণমঙ্গল সংঘের নামে যাঁরা পরিচিত হ'তে চান, তাঁদের জানানো প্রয়োজন মনে করছি, প্রায়শ্চিত্ত শুধু মুখের কথা আর সভ্যের তালিকায় নাম ওঠানোয় চলবে না, নিজের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর দিতে হবে,—গণমঙ্গল সংঘের সেবক হিসাবে আমরা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হব না, দৃঢ় চরিত্রের ভিত্তিতে বিবেকের নির্দেশমত চলতে না পারলে, সেবাকে ধর্ম ব'লে মানতে না পারলে আত্মহত্যা ক'রতেও পরাঙ্মুখ হব না—

হারাকিরি?—ফুফু মিত্তির চেঁচিয়ে ওঠে।

—হারাকিরি বা যে নামেই একে অভিহিত করুন, আদর্শবিচ্যুতি হ'লেই দাঁড়াতে হবে খাঁটি সোণায় গড়া সংঘনেতাদের বিচার সভায়, তাঁদের রায়ে অভিযুক্তরা হয় মুক্তি পাবে নয় প্রাণ দেবার নির্দেশ পাবে। এর অন্য কোন

বিচার নেই, মধ্যপথ ব'লে কিছু নেই, দলত্যাগ ক'রে যাওয়া চলবে না, সুবিধাবাদীর অস্তিত্ব গণমঙ্গলসংঘে থাকবে না।—

নীরেনবাবু পুনঃ পুনঃ সমীরবাবুর পাঞ্জাবীর ঝুলেপড়া অংশ টানতে থাকেন, বোধ হয় গণমঙ্গলসংঘের সভ্যসম্বন্ধে এই চরমপন্থা উল্লেখের প্রতিবাদে।

মৃদু গুঞ্জন শোনা যায় মঞ্চের একধারে, সমীরবাবুকে না ডাকলেই হ'ত।

না ডেকে কি উপায় আছে? ফুফু মিত্তির আর রাম লাহিড়ীর দল সব সভায় উপস্থিত হয় আর জনতার ভেতর থেকে টিপ্পনী কাটতে থাকে। সমীরশঙ্করবাবুর তবুও কিছুটা ক্ষমতা আছে ওদের থামিয়ে রাখবার।

—সহ্য ক'রতে পারি না সেই সমস্ত বর্ণচোরা সুবিধাবাদীদের গণমঙ্গল-সংঘের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে বিফলমনোরথ হ'য়ে রাতারাতি দল বদলিয়ে যাঁরা সংঘের নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠেন। তাঁদের চিনবার সময় এসেছে, তাঁদের—

আপনাদের গণমঙ্গলসংঘে তেমন লোক নেই?—কৈফিয়ৎ চায় ফুফু মিত্তিরের দল।

—স্বীকার করছি, আছে। ঠুন্‌কো পুঁজি নিয়ে তারা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের মাঝে। তাদের কার্যকলাপে লোকে ভাবছে, গণমঙ্গল-সংঘের সভ্য হওয়া মানে সুবিধা আদায় করা। তাই তো আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন, আজ আমরা রক্তাক্ষরে লিখে দিই আমাদের সংকল্পের কথা।

হাট ক'রে বাড়ী ফিরবার পথে হরিলাল আর তুফানু দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বক্তৃতা শুনতে। বড় ভাল লাগছে কথাগুলো। গণমঙ্গলসংঘের ওরাও সভ্য। এগিয়ে আসে ওরা, ওদের বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করবে। তাড়াহুড়ো প'ড়ে যায় আরও অনেকের ভেতর। এগিয়ে আসতে থাকে তারাও মঞ্চের দিকে।

গোলমাল আর হট্টগোল সুরু হয় জনতার এখানে সেখানে। ধীরা চ্যাটার্জি মেয়েদের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে। সত্ন সূত্রধরের রক্তলিখনের তাগিদ নেই, তবুও ধীরার সাথে সেও ভীড়ের পেছনে চলে আসে। আধো অন্ধকারে অস্পষ্ট প্রেতমূর্তির মত দেখা যায় অনেককে; সমীরবাবুর ভীষণ স্বাক্ষরের কথা শুনে দূরে স'রে দাঁড়িয়েছে তারা, কেউ বা চলে যাচ্ছে। সমীরশঙ্করবাবু চুপ ক'রে দেখতে লাগলেন সব। হঠাৎ দাঁড়িয়ে নীরেনবাবু সমীরবাবুর কানে কানে কি বললেন।

শুনুন আপনারা,—সমীরশঙ্করবাবু চেঁচিয়ে বললেন,—না, আজই স্বাক্ষর দিতে হবে না, সারাদেশের সংঘের লোকদের দিতে হবে এই স্বাক্ষর, তাই ওপর থেকে নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু প্রস্তুত থাকবেন আপনারা, এ নির্দেশ আসবেই।

এগিয়ে এল পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রেতমূর্তির কতক অংশ।

কিন্তু মঞ্চ বা জনতার কোনখানেই কুমার ঘোষকে দেখা গেল না।

শ্রীনিত্যগোপাল
ও
সর্বপথসমন্বয় *

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৬০ সালের চৈত্র মাসের বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে শ্রীনিত্যগোপালদেবের আবির্ভাবের শতবর্ষ আরম্ভ হয়েছে। আজ তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবে, বিশ্বের দরবারে কি অমূল্য বস্তু তিনি দিয়ে গেছেন, তার একটু আলোচনা আমরা করব।

মহামানব জগতে যা কিছু দিয়ে যান, সমকালের সাধারণ মানুষ হয়ত তা বুঝতে পারে না। কিন্তু কালের গতিতে মহামানবের দার্শনিক চিন্তাধারা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়। আজ তাঁর দার্শনিক তত্ত্বগুলি বুঝবার সময় হয়েছে, কারণ যে-সকল সমস্যার সমাধানের নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন, সেই জটিল সমস্যাগুলিই আজ বিশ্বসভ্যতার বিভিন্ন দিকে, তার ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্রে সুস্পষ্ট আকারে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

বর্তমান বিশ্বজীবনের চারিদিকেই দেখছি একটা দ্বন্দ্ব চলছে—নরনারীর দ্বন্দ্ব, ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, শিক্ষক-ছাত্রের দ্বন্দ্ব, ইহকাল-পরকালের দ্বন্দ্ব, জড়াজড়ের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। মানুষের এই যে যুযুৎসু মনোবৃত্তি তা প্রশমিত

* ১৯৫৪ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মহানির্বাণ মঠে শ্রীনিত্যগোপালদেবের জন্ম-শতবার্ষিকী-উৎসবে পঠিত।

করবার জন্য দিকে দিকে আয়োজন চললেও, সে-সব সমাধান যেন স্থিতিলাভ করতে পারছে না। এই বিপরীতধর্মী দুইটী অবস্থার দ্বন্দ্ব নিয়ে মানুষ আজ বড়ই বিভ্রান্ত।

যে দার্শনিক চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে এই দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছে তা একটু না বুঝলে, আমরা বুঝতে পারব না কোন্ দার্শনিক তত্ত্বকে ভিত্তি করলে এই সব দ্বন্দ্বের সমাধান হতে পারে।

এতদিনকার দর্শনশাস্ত্র ঘোষণা করেছিল আলো ও অন্ধকার পরস্পর বিপরীতধর্মী, এরা একসঙ্গে যুগপৎ থাকতে পারে না। অধ্যাত্মজগতে ঠিক সেই রকম হয় ব্রহ্ম না হয় জগৎ, হয় স্থিতি না হয় গতি, হয় অজড় না হয় জড়—এরা পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী বলে, দুইই সত্য হতে পারে না। আচার্য শঙ্কর প্রচার করলেন ব্রহ্মই সত্য আর বিশ্বপ্রকৃতি মিথ্যা, মায়ার কুহক। যা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয় তা সত্য হতে পারে না। একান্তভাবে একটীকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করার ফলে উদ্ভব হ'ল চার্বাকের। চার্বাক প্রচার করল—অনাত্ম-বস্তুই সত্য, গতিই সত্য। আত্মা-অনাত্মা, ব্রহ্ম-মায়ার দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা হ'ল না।

ভারতের শঙ্করপন্থী অধ্যাত্মবাদীগণ হলেন দেবতা, আর ভোগবাদী চার্বাকপন্থীগণ হলেন অসুর। দেবতারা বললেন—ভোগে সুখ নেই, তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই, মুক্তিও নেই। সব প্রয়োজন কমিয়ে দিয়ে আত্মায় স্থিত হও।

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

জড়বাদী অসুর বললেন—ব্রহ্ম মিথ্যা, জগতই সত্য। বাস্তবক্ষেত্রে যার কোন মূল্য নেই, প্রয়োজন নেই, তার কোন অস্তিত্বই নেই, তা স্বপ্নবিলাসীর খেয়াল। ভোগেই সুখ, মানুষের অনন্ত বাসনা-কামনা তৃপ্তির উপকরণ সংগ্রহে তৎপর হও। একান্তভাবে অজড়বাদ গ্রহণের ফলে, প্রতিক্রিয়া সুরু হ'ল, ভোগবাদী চার্বাকের উদ্ভব হ'ল। মূল সমস্যার কিন্তু কোন সমাধান হ'ল না। পরন্তু অনন্ত বাসনা তৃপ্তির জন্য বিশ্ব আজ দুর্নীতির চরম অবস্থায়, মানুষ আজ পশুর স্তরে নেমে এসেছে।

মানুষের বাসনা-কামনার কি কোন শেষ আছে? মানুষ যদি নিজের মধ্যে নিজে তুষ্ট না হয়, কে তাকে তুষ্ট করতে পারে? যে আত্মতুষ্ট নয় তাকে

সারা দুনিয়ার ভোগের উপকরণ দিলেও—যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ—তার কামনার অনল নিভবে না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে নিস্তার নেই, ভোগ করেও তো নিস্তার নেই। এ অবস্থায় পথ কোথায়? এ অন্ধকারে আলো কোথায়?

শ্রীনিত্যগোপালের প্রয়োজন এইখানে। তাঁর মহাদান এই দুই বিপরীত-ধর্মী দুই পক্ষের স্বতন্ত্র দাবী স্বীকার করে তাদের সমন্বয় বিধান করা।

যদি বল দ্বৈত-অদ্বৈত, ভোগ-ত্যাগ, সাকার-নিরাকার, ব্রহ্ম-মায়ার, সর্বধর্মের সমন্বয় তো শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়ে গেছেন, তাঁর "যত মত তত পথ" বাণী প্রচার করে। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে সেটা পূর্ণ সমন্বয় নয়, সমন্বয়ের প্রথম অধ্যায়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—যত মত তত পথ, কিন্তু গন্তব্যস্থান এক। সব পথ দিয়ে ভগবানের কাছে যাওয়া যায়, যে কোন একটা পথ দিয়ে তাঁর কাছে পৌছুলেই হ'ল—পথ নিয়ে দ্বন্দ্ব করার প্রয়োজন নেই। সকল মত সত্য, সকল পথ সত্য, যে যার মত ও পথ নিয়ে থাক, বিবাদ মিটে যাক। সেদিনকার সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জর, পাশ্চাত্য ভোগবাদের বিলাস-ব্যসনে নিমজ্জিত স্বধর্মভ্রষ্ট মৃতপ্রায় জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা বোধ হয় খুব কঠিন নয় যে শুধু এইটুকু স্বীকার করলেই বিবাদ মেটে না। এতে গন্তব্যস্থানের সমন্বয় হয়, কিন্তু এক গন্তব্যস্থানে পৌছিবার যে বহু পথ সেই বহু পথের সমন্বয় হয় না। শুধু মতসহিষ্ণুতার (toleration) নাম সমন্বয় নয়। উপাস্য এক, উপাসনা বহু, গন্তব্যস্থল এক, সেখানে পৌছিবার পথ অনেক, এই এক ও বহুর যে বিবাদ—তার মীমাংসা হবে কেমন করে?

মায়াবাদী সন্ন্যাসী যদি মনে করেন তাঁর মত ও পথ উপাদেয়, দ্বৈতবাদীর মত ও পথ হেয়, তবে সন্ন্যাসীর পক্ষে এ বোধও তো বন্ধন, এমন সন্ন্যাসীর অন্তরও তো শুদ্ধ হয় নি। পরের মত ও পথকে অন্তরের অন্তরতম স্থলে সত্য বলে গ্রহণ করতে না পারলে, শুধু বাইরের সম্মান দেখানোতে সমন্বয় হবে কেমন করে?

শ্রীনিত্যগোপাল বললেন—তোমার পথ তোমার কাছে সত্য, আমার পথ আমার কাছে, একথা আংশিকভাবে সত্য, সমগ্র সত্য নয়, সমন্বয়ও নয়।

নিত্য-অনিত্য, চৈতন্য-অচৈতন্য, সাকার-নিরাকার, দ্বৈত-অদ্বৈত যখন সমান ভাবে পরস্পরের অনুগমন করে, তখনই হয় সমন্বয় সিদ্ধি। সমগ্র পথের সত্য মিলিত হয়েই হয় সমগ্র সত্য।

গন্তব্য স্থানই লক্ষ্য, মুখ্য—পথ গৌণ। চোখকানবুজে যেমন করে হোক তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করে চলে যাও, পথের শেষে অবস্থিত গন্তব্যস্থানই সত্য, পথ মিথ্যা ঝঞ্ঝাট মাত্র, কোন মূল্য নেই তার।—কিন্তু সত্যই কি পথের কোন মূল্য নেই, পথ নিয়ে মাথা ঘামাবার কি কোন প্রয়োজন নেই? আরামে ট্রেনে চেপে আট ঘণ্টা নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রা দিয়ে আমরা আজকাল শ্রীজগন্নাথ দর্শনে পুরী যাই, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরী গিয়েছিলেন তিন মাস ধরে প্রতি পদক্ষেপে প্রিয়তমের সাথে মিলিত হবার তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে হা জগন্নাথ হা জগন্নাথ বলে। এই যে দুই পথ তারা কি এক রকমের? মহাপ্রভুর জগন্নাথ দর্শন সার্থক, আর আমাদের নিষ্ফল হয় কেন? পথের একটা মূল্য আছে বলেই এমনিতর পার্থক্য ঘটে। পথের কোন মূল্য নেই মনে করে গন্তব্য স্থানের নেশায় যেমন তেমন করে পথ চলা, পথকে উপেক্ষা করার এই-ই পরিণাম। পথ চলার সকল আবেষ্টনের মধ্যে, সকল ঘটনার মধ্যে পথিক যখন গন্তব্যস্থানে অবস্থিত প্রিয়তমের নিকট আত্মসমর্পণ করতে করতে চলে, তখন পথের প্রতি অণু পরমাণুতে গন্তব্য এসে ধরা দেয়। পথই গন্তব্য-স্থলকে গড়ে তোলে, রূপায়িত করে। পথিকের তখন না থাকে পথের মোহ, না থাকে গন্তব্যস্থানের মোহ। তাঁর মোহশূন্য জীবনে গন্তব্যস্থানই পথ, পথই গন্তব্যস্থান।

পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা,
আনন্দে তাই এক হলো তার পৌঁছানো আর চলা। —রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনিত্যগোপালের সমন্বয় শুধু গন্তব্যস্থানের সমন্বয় নয়, পথ ও গন্তব্যস্থানের সমন্বয়। তাই বলেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন সমন্বয়ের প্রথম অধ্যায়, শ্রীনিত্যগোপাল দিয়েছেন শেষ অধ্যায়।

শ্রীনিত্যগোপালের বাণী আমরা এতদিন বুঝি নি, কিন্তু কতগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আমাদের কাছে এখন তা সহজবোধ্য হয়েছে।

এতদিনকার ন্যায়শাস্ত্রের মূল ভিত্তি ছিল আলো-অন্ধকার পরস্পর বিপরীত-ধর্মী বলে তারা একসঙ্গে যুগপৎ থাকতে পারে না—হয় আলো সত্য, নয় অন্ধকার সত্য। কিন্তু এখন আমরা জেনেছি, আলো-অন্ধকার যুগপৎ একসঙ্গে

থাকে, কেবল কার মধ্যে কোন্‌টা কত মাত্রায় (degree) আছে তা দিয়েই তাদের পরিচয় হয়। একান্ত আলো বা একান্ত অন্ধকার বলে কিছু নেই এ জগতে। আমরা যাকে আলো বলি, তাতে অন্ধকারের মাত্রা খুবই কম, তাই তা আমাদের কাছে আলো। আমরা যাকে অন্ধকার বলি, তাতে আলোর অংশ একেবারে নেই বললেই হয়, তাই তাকে আমরা বলি অন্ধকার। তেমনি একান্ত (absolute) জড়, একান্ত অজড় বলে কিছু নেই, আছে প্রতিস্তরে কতখানি (how much) জড় ও কতখানি অজড়ের স্পর্শ। একান্ত নর বা একান্ত নারী বলেও কোন মানুষ নেই। আমরা যে মানুষকে নর বলি তাতে নারীমাত্রা খুবই কম, আমরা যাকে নারী বলি তাতে নরমাত্রা খুবই কম। একান্ত ধনিক বা একান্ত শ্রমিক বলেও কোন মানুষ নেই, প্রতি মানুষেই আছে ধনিকত্ব ও শ্রমিকত্বের মাত্রা। একান্ত কর্ম ও একান্ত জ্ঞান বলেও কিছু নেই। তাই শিখতে হবে কোন্ মাত্রায় কর্ম করলে জ্ঞানের সঙ্গে তার বিরোধ না ঘটে, কোন্ কৌশলে কর্ম করলে উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই এই মাত্রাস্পর্শের পরিপুর্ণ দৃষ্টান্ত, তিনি সমগ্রতার মূর্ত বিগ্রহ। তাইতো তিনি অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু— আমাকে সমগ্রভাবে যেমন করে জানবে তা শোনো। তাঁর চরণে শরণ নিয়ে শ্রীমতী একদিন সমগ্র দৃষ্টিপথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ওদুটী কমল পায়॥

সংসারের কুলে বা সন্ন্যাসের কুলে, ভোগের কুলে বা ত্যাগের কুলে, ব্রহ্মের কুলে বা মায়ার কুলে—কোন একদিকে একান্তভাবে আসক্ত হয়ে আটকে পড়েন নি শ্রীরাধা। অনাসক্ত হবার এই যে শক্তি, তা তিনি পেয়েছিলেন সমগ্রতার পরিপুর্ণ মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল আশ্রয় করে।

আর এ যুগে ষাট বৎসর পুর্বে এই সমগ্রদৃষ্টির তত্ত্ব প্রচার করেছেন শ্রীনিত্যগোপাল। পরস্পরবিপরীত জড়বাদ ও অজড়বাদকে সমন্বয় করে তিনি একটি সামগ্রিক জীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন— "সমন্বয়। নিত্যানিত্য সমন্বয় বা আত্মানাত্ম সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়। সাকার আকার

নিরাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়।"

আবার লিখলেন—"পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞানের একশাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান।"

ধর্মজগতে বহু মত ও বহু পথ। প্রত্যেকটাই কোন মহাপুরুষের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। প্রত্যেক মতই সত্য—কেউ ছোট নয়, কিন্তু কেউ বড়ও নয়; তবে কোনটাই সমগ্র সত্য নয়, সত্যের আংশিক প্রকাশ। সমস্ত পথের সত্য মিলিত হয়েই একটা সমগ্র সত্য। কোনটাকে বাদ দিয়ে যে মুক্তি, তা মুক্তির সত্যিকার রূপ নয়। মানুষ যখন এই প্রতিটি সত্যকে নিজ জীবনে আস্বাদন করে কোনটিতে আটকে না পড়ে, সব পথের সমন্বয়ে সেই সমগ্র ব্রহ্মবস্তুকে আস্বাদন করে থাকে, তখনই তার পরিপূর্ণ সার্থকতা। এই সমগ্র দৃষ্টির তত্ত্ব শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর জীবনে আচরণ করেছিলেন। জগতের সর্ব-ক্ষেত্রে আজ যে এই দ্বন্দ্ব, তা সম্ভব হয়েছে মানুষ সমগ্রদৃষ্টি হারিয়ে কোন একটী দৃষ্টিকোণকে সমগ্রদৃষ্টিরূপে মেনে নিয়েছে বলে।

শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে আচরণ করে দেখিয়েছেন সংসারের সঙ্গে সন্ন্যাসের কোন বিরোধ থাকতে পারে না। সন্ন্যাসী হয়েও পিতার পরিচয় দিতে তাঁর মুক্তিতে আটকায় নি। বিশ্বপিতাকে ভালবাসতে গিয়ে তাঁর পিতামাতাকে একটুও কম ভালবাসেন নি তিনি। তাঁর সন্ন্যাস তাঁর রক্তমাংসের সম্পর্ককে ছিন্ন করতে পারে নি, তাঁর রক্তমাসের সম্বন্ধও তাঁর সন্ন্যাসকে নষ্ট করতে পারে নি। তিনি ছিলেন সর্বসংস্কারমুক্ত, সর্বসম্প্রদায়সমন্বিত স্বাধীনতার জীবন্ত বিগ্রহ, তাই তিনি অবধূত। তিনি নিজ জীবনের সকল সংস্কারকে নির্মূল করে পরমানন্দস্বরূপ দ্বিতীয় শিবতুল্য হয়ে বিরাজ করতেন।

রাজতে অবধূতঃ দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥

শ্রীনিত্যগোপালের মতে সব রকম অবস্থাই মায়িক। সংসারও একটি অবস্থা, সন্ন্যাসও একটি অবস্থা, অতএব উভয়ই মায়িক। এই সর্বাবস্থার মধ্য দিয়ে জীবনকে পরিচালিত করে, এদের মধ্যকার বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব হতে যে মুক্তি, সেই মুক্তির সংবাদ রেখে গেছেন শ্রীনিত্যগোপাল। পারস্পরিক দ্বন্দ্বে উন্মত্ত বিশ্বে আজ পরম প্রয়োজন এই মুক্তির সংবাদ পরিবেশন করা।

সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপালকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, তাঁর চরণে অকিঞ্চনের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিলাম।

প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠান

রেণু মিত্র

মহাসমারোহে দুর্গাপুজা কালীপুজা আর সরস্বতীপুজাই কেবল হয় না, এটা ওটা নানা উপলক্ষে পথের ধারের ছোট্ট শিব মন্দিরখানাতে প্রচুর ডাবের জল আর ফলফলারী দিয়ে একটা না একটা পুজা হচ্ছে প্রায় রোজই। দেশটা কম্যুনিষ্ট হয়ে গেল, এ-ও যেমন সত্য, তেমনি আবার দেশ-জোড়া ভক্তি না থাক পুজা পার্বণের যে সংস্কার ছিল, তা-ও তেমনিই আছে—এ কথাও তেমন ভাবেই সত্য। এ দুটোর সামঞ্জস্য হবে কেমন করে? কম্যুনিষ্ট হওয়া মানে জড়বাদী হওয়া—জড়বাদী হওয়া মানে এক কথায় কর্মী হওয়া—শৃঙ্খলা মেনে চলা। কেননা ভগবানের পরিবর্তে একমাত্র কর্মশৃঙ্খলাই জড়বাদকে আধৃত করে রাখে। কিন্তু কর্মী আমরা হই নি, শৃঙ্খলা বোধ আছে—দৈনন্দিন জীবনে এমন কোনো পরিচয়ও দেই নি। এ দিকে পুজা পার্বণের জন্য দরকার যে ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা—সেগুলির বালাই আজ একেবারে আমাদের নেই। কম্যুনিষ্টও হলাম না—অথচ বাবা মা শিক্ষক গুরুজন দেশ অতীত প্রভৃতি সব কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে বসে আছি। আসলে জীবনের জন্য যা দরকার ছিল তা হচ্ছে সংস্কার মুক্তি—শ্রদ্ধাহীন বাচালতা জীবনকে আমাদের কোন দিক দিয়েই পুষ্ট করবে না। আমাদের তর্ক করার প্রবৃত্তি অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে—অধিকারের দাবীতে যোগ্যতার পরিচয় না দিয়ে শিশু পর্যন্ত অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করতে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে যে, বয়স বা যোগ্যতানুযায়ী যে প্রত্যেকেরই একটা সীমা আছে, সেই সীমা-বোধ গেছে একেবারে লোপ পেয়ে। যে-কেউকে যে-কোন ভাষা আমরা অনায়াসে প্রয়োগ করে যেতে পারি অকুণ্ঠ ভাবে। পিতামাতা শিক্ষক গুরুজন—এঁদের সঙ্গে এখন আমরা যে ভাবে কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা সবাই বন্ধুস্থানীয়—মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের অধিকার সমান।

—বেশ কথা। কিন্তু সমান অধিকারের সঙ্গে শ্রদ্ধার অভাব থাকবে কেন? সমান অধিকারের সঙ্গে আমার মত অপরকেও তার অধিকারের স্বাভাবিক মর্যাদা দানের শক্তির অভাব আমাদের থাকবে কেন? অথচ এমনই আজকাল আমরা হয়েছি। এই আমাদের তো পুজার অধিকার স্বতঃই বিলুপ্ত হয়ে

গেছে। জীবনের মধ্যে শ্রদ্ধা হারিয়ে পূজার আচরণে কোন সার্থকতাই তো নেই। কী একটা গভীর অসামঞ্জস্যে ভরে গেছে আমাদের জীবন।

আসল কথাটা হচ্ছে যা আমরা হয়েছি তা নয়, আর একটা বৃহত্তর হওয়ার দিকে এই ভাঙন ইঙ্গিত করছে। সে ইঙ্গিতটার রূপ আমাদের স্পষ্ট করে জানা দরকার। এতদিন নানাবিধ বিধি নিষেধ দিয়ে যে একটা সঙ্গতি ও সৌন্দর্য আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে আনবার প্রয়াস করা হয়েছিল, সেখানে আজকের দিনে সেই কিংবা ততোধিক সঙ্গতি ও সৌন্দর্য আমাদের জীবনের প্রত্যেক স্তরে আনা দরকার একটা স্বাধীনতার আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে। তফাৎ সেইটুকু—একদিকে ছিল কতকগুলি প্রাণহীন বিধি নিষেধ আইন কানুনের অসমতার অত্যাচার—আজ তার স্থান অধিকার করবে স্বাধীনতার মুক্তি। গণতন্ত্র আর ব্যক্তি স্বাধীনতা আজকের দিনের যুগধর্ম হওয়ার মানে তো এই নয় যে, আমরা কতকগুলি শ্রদ্ধাহীন বাচালে পরিণত হব? পুলিশ বা আইনের ভয়ে চুরী করা থেকে বা অপরকে ঠকানো থেকে বিরত না হয়ে জীবনের পারস্পরিক সহযোগিতার সৌন্দর্য নষ্ট হয় বলে স্বেচ্ছায় অসঙ্গত কাজগুলি থেকে বিরত থাকা—এইটেই আজকের দিনের বিশিষ্ট চাওয়া। কিন্তু কয়েকশত বৎসরের পরাধীন একটা জাতি নিজের ওপর দখল এমনভাবে হারিয়ে ফেলেছে যে, মুক্ত আবহাওয়ার সম্মান সে রাখতে পারে নি, পারতে বোধ হয় এখনও দেরী আছে অনেক। অবশ্যই শুধু দীর্ঘ দিনের পরাধীনতাই এজন্য দায়ী নয়—মানুষের মধ্যে একটা অমানুষ বা পশু-মানুষ আজও যতখানি আছে, শাসন দণ্ড ছাড়া তাকে শায়েস্তা করা যায় না। এই সঙ্গে এই কথাটাও সমান সত্য যে সভ্যতার আজকের স্তরের সমস্যাটা বড় বেশী জটিলই হয়ে পড়েছে। জটিলতার কারণ সব্যসাচীর মত দুই হাতে বান ছুড়তে শিখতে হবে—আজকের যুগধর্ম এই দাবী প্রত্যেকের কাছে করে বসে আছে। ব্যক্তিগত জীবন চালাব সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে—আজ তা সম্ভব নয়; তেমনি মানুষের অন্তর্জীবনের যেটুকু কাহিনী মানুষ জানতে পেরেছে তাতে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তাটাকে যে বেমালুম বাদ দেওয়া যায় না—সে দেওয়ার প্রচেষ্টা যে মিথ্যাচারমাত্র—আজকের মানুষ তা-ও জানতে পেরেছে। সত্যের এই দুই দিকের আহ্বানই আজকের সমস্যাকে এমন জটিল করল। জাতশুদ্ধ ঐ শ্রদ্ধাহীনতা বা চরিত্রহীনতার মূলেও রয়েছে সত্যের দুই দিকের আহ্বানের সংঘাত।

বিধি নিষেধের চাপ থাকবে না—কিন্তু নূতন যাত্রীকে পথ দেখাবার জন্য অবশ্যই থাকবে পথের নিশানা। বিধি নিষেধের চাপ থাকবে না বটে তবে আগেই বলেছি মানুষের মধ্যে যে পশু-মানুষটী আছে, আজও শাসন দণ্ডের প্রয়োজন তার জন্য আছে! তবে সেটা ব্যবহারের কৌশল ও সীমা আজ জানা দরকার। আজকের দিনের মুক্ত আবহাওয়ায় শ্রদ্ধা আর পারস্পরিক প্রীতি শত বিপর্যয় শত বিরুদ্ধতার মধ্যেও রক্ষা করতে হবে—এই মূল মন্ত্র আজকে আমাদের নিতেই হবে। এ ছাড়া বাঁচবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কেননা যে কোন অবস্থায় বা যে কোন ক্ষেত্রে আমি এবং আমার অপর পক্ষ এই দুই মিলিয়ে একটা সমগ্র বস্তু এবং বস্তুর বা আইডিয়ার সে সমগ্রত্বকে কখনও নষ্ট হতে দেওয়া চলতে পারবে না। তাহালেই পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ধ্বংস হয়। স্বাধীনতার মধ্যেও সে যাতে বিকৃত হতে না পারে সেই জন্যই সমগ্রত্বের এই ধারণাকে কখনই ব্যাহত করা চলবে না। আজকের চারদিকে চেয়ে হতাশ না হয়ে এমন করে ভাবতে সুরু করলে আমরা পথ পেতে পারব। এই সাধনা নিয়ে বিধিনিষেধের চাপ আমাদের মানুষ হওয়ার পথ থেকে সরে গেলেও আমরা উচ্ছৃঙ্খল না হওয়া থেকে বাঁচতে পারব। আগে একটা পারিবারিক সমগ্রত্ব বোধ ছিল কিংবা ছিল একটা সামাজিক: কিন্তু আজকের দিনে আমাদের বিচরণ ক্ষেত্রটা বেড়ে গেছে বলে সমগ্রত্বের বোধ যে কারও সংস্পর্শে কর্ম জগতে বা জ্ঞান জগতে আমরা আসব, তারও সঙ্গে রক্ষা করতে হবে।

পূজা করি অথচ শ্রদ্ধা নেই—শ্রদ্ধা নেই নিজেরও ওপরে, শ্রদ্ধা নেই অপরেরও উপরে। কম্যুনিজম্ করি অথচ দিতে শিখিনি কর্মের মর্যাদা, জীবনে আনতে পারিনি এতটুকু শৃঙ্খলা। এই অসঙ্গতি আর অসামঞ্জস্য থেকে বাঁচতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি আর সমগ্রত্ব বোধ—এই তিন মন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আচরণ করতে হবে।

পূজা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বা দলবদ্ধভাবে যে অসঙ্গতি চলছে, তার সমাধান কোন্খানে? পূজা করব আমরা কোন্ মনোবৃত্তি নিয়ে? জড়বাদীর পক্ষে পূজা নেই—প্রত্যক্ষের বাইরে সে আর কিছু স্বীকার করে না। কিন্তু ঐ অর্ধ সত্যকে সমগ্রতার উপাসক ভারতবর্ষ কিছুতেই মেনে নেবে না; আবার এতদিনের মত প্রত্যক্ষকে বাদও সে দেবে না আর। তার আজকের ভাবনা অনুমান যেখানে প্রত্যক্ষের সঙ্গে মিলে যায় সেই স্তরের খোঁজ করা। সেখানে

বাস্তব আর বাস্তবাতীত উভয়ই সার্থক হয়। আমার ব্যক্তিসত্তাটুকুই তো জগতে ও জীবনে শেষ কথা নয়—আমার বাইরে যে সমষ্টি সত্তা, শ্রদ্ধার মধ্য দিয়েই তার সাথে আমার জীবনগত সম্বন্ধ। পূজা করব আমরা সেই সত্তাকেই আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিয়ে—এ ছাড়া সমষ্টি সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার আর কোন পথই তো নেই। সেই শ্রদ্ধা নিয়ে এবং সমষ্টি সত্তার ভগবত্তাকে নিজের জীবনের মনোবৃত্তিতে আর ব্যবহারে রূপ দেবার প্রচেষ্টা নিয়েই আমরা যেন পূজা করি। বৃহৎকে, বড়কে পূজা করতে করতে আমরা যেন বড় হই, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতা যেন যায়—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জীবনে তোমারে পূজিতে'—এ যেন আমরা বলতে পারি। জীবনের সঙ্গে পূজার কোন সম্পর্ক রইল না, আমার ক্ষুদ্রতা, আমার মাৎসর্য, আমার পরশ্রীকাতরতা, আমার লোভ, আমার বিবাদ প্রবৃত্তি, আমার স্বার্থবোধ যেমন তেমনই রইল—অথচ পূজাও করি রোজই—পূজার এমন অর্থহীন সংস্কার আমাদের যাক্। মানুষ হিসাবে আমরা যেন সুন্দর হই—সংস্কার বা আচার দিয়ে মানুষের পরিচয় নয়।

শিক্ষা ও সমাজাদর্শ

মৃত্যুঞ্জয় বক্সী

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান গলদ তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেই এর অগ্রগতি ও পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রতিযোগিতায় তারাই সাধারণতঃ পায় বরমাল্য, যারা শিক্ষার রস উপভোগ করার জন্য কোনও সময় অপব্যয় করেনা—অযথা চিন্তায় মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে না—পরিবর্ত্তে পরীক্ষায় অধিকতর নম্বর সংগ্রহে সমস্ত উৎসাহ ও প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করে। যার বুদ্ধি সত্যই তীক্ষ্ণ এবং চিত্তের রসপিপাসাও তদনুযায়ী জাগ্রত, তেমনি মুষ্টিমেয় সার্থক ছাত্র হয়তো একাধারে পরীক্ষার বরমাল্য ও শিক্ষার অমৃত রস দুইএরই অধিকারী হয়—কিন্তু অধিকাংশকেই ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত ও আরামপ্রদ জীবনের প্রত্যাশায় রসের পিপাসাকে অতৃপ্ত রাখতে হয়। ফলে শিক্ষার

সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ অবদান হ'তেই তারা বঞ্চিত হয়। কৃতকার্য্যতার জন্য এই প্রাণান্তকর কসরতি তাদের মনের স্বাভাবিক রসবোধকেও দেয় শুকিয়ে এবং প্রতিযোগিতা যে রূপ নেয়, তাকে কদাচই healthy competition বলা যায় না। কারণ উক্ত লোভনীয় পুরস্কার সংখ্যা—নিশ্চিত আরামের সম্ভাবনা সংখ্যা—মুষ্টিমেয় এবং তা লাভ করার জন্য শিক্ষার্থীরা একটী প্রতিযোগিতার দৌড় সুরু করেছে এই জ্ঞান প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যেই সঞ্জীবিত থাকে। তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে fair play হওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকে এবং এজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ প্রবেশ করেছে জাল জুয়াচুরী শঠতা। এই শিক্ষা যে-মানুষ সৃষ্টি করবে, তারা যে-সমাজ ব্যবস্থার ধারক হ'বে, তার প্রগতি কল্পনা করা শক্ত। অবস্থাও দাঁড়িয়েছে তাই। যেখানে প্রতিটী উচ্চ স্তরের নাগরিকের মন প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষে ভরপুর, সেখানে গণতান্ত্রিক আদর্শ বিকৃতরূপ নিতে বাধ্য। শিক্ষায় প্রতিযোগিতার এই প্রাধান্য না দূর হ'লে গণতন্ত্র কদাচ বাস্তব হয়ে উঠবে না। বই মুখস্থ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না—প্রতিযোগিতা তাই বল্গাহীন হতে পারে; কিন্তু কাজ কর্ম্ম খেলাধূলা প্রভৃতি জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বল্গাহীন হ'তে পারে না—কারণ ঐগুলির সাফল্য সহযোগিতার দ্বারাই সম্ভব। এজন্য শিশুকে সহযোগিতা শিক্ষা দিবার জন্য কর্ম্মকেন্দ্রী শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই উপযোগী। আমেরিকার শিক্ষাবিদ ডিউই তাই গণতন্ত্র সম্মত শিক্ষার উদ্দেশ্যে জীবন ও কর্ম্মকেন্দ্রী শিশুশিক্ষার উপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

কিন্তু আজকের দিনে সহযোগিতা ও গণতন্ত্রের আদর্শে আমরা সকলকে একসাথে উদ্বুদ্ধ করতে কখন সক্ষম হ'তে পারি? আজ যে ধন ও সুযোগ সুবিধার অসাম্য রয়েছে, তাকে বজায় রাখার ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত রেখে সর্ব্বসাধারণকে গণতন্ত্রের মহিমা কখনোই উপলব্ধি করান যায় না। এজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এমন এক ভাবগত সাধারণ ভিত্তি রচনা করা—যার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্ব্বসাধারণ একই সামাজিক মহৎ উদ্দেশ্যে মিলিত হতে পারবে। এটাই মতবাদ। মতবাদ বাদ দিয়ে জীবনকেন্দ্রী শিক্ষা গড়ে তোলা যায় না। সেখানে মতবাদের অভাব বর্ত্তমানকে বজায় রাখা বা কনজারভেটিজম্-এরই নামান্তর।

দেশনায়ক গান্ধীজী এই সত্য উপলব্ধি করে ছিলেন—তাই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষাকে মতবাদ বর্জ্জিত শিক্ষারূপে দেখেন নি—একে তার

মতবাদের পরিপোষক রূপেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। গান্ধীবাদের একটী প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ। সুতরাং তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনা জনচেতনায় আগ্রহ জাগিয়েছিল।

নানা ঘটনা ও জনসাধারণের চিন্তাধারা দ্বারা এই সত্য আজ সুপ্রমাণিত হয়েছে যে গান্ধীবাদের বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে বিরোধীভাব সংযুক্ত। সুতরাং তাকে পরিবর্ত্তন করতে হ'বে। বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েই সামাজিক ন্যায় বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পন্থা নির্ণয় করতে হ'বে। তাই হ'বে নূতন সমাজ দর্শন। আর এই সমাজ দর্শনের পরিপোষক রূপেই বুনিয়াদী শিক্ষাকে রূপায়িত করতে হ'বে। তবেই এই শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের, শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের পূর্ণ সহযোগিতায় মূর্ত্ত হয়ে উঠবে ও পুরাতন শিক্ষার গলদ দূর হ'বে। আদর্শ— অর্থাৎ মতবাদ সংযুক্ত না হ'লে তা কদাচই সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবে না। যাঁরা শিক্ষাকে মতবাদ নিরপেক্ষ রাখতে চান, তাঁরা এই সত্য বুঝতে চান না ও প্রচ্ছন্ন ভাবে গতানুগতিকতাকেই প্রশ্রয় দেন।

সাময়িকী

শ্রীনিত্যগোপালজন্ম শতবার্ষিকী—শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিগত ৯ই মে রবিবার ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত মহানির্ব্বাণ মঠে একটী জনসভার অধিবেশন হয়। আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শতবার্ষিকী কমিটীর পক্ষে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সভাপতিকে অভ্যর্থনা করিলে শ্রীমতি শান্তি সেন শ্রীনিত্যগোপাল প্রশস্তি উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন। ইহার পর 'শ্রীনিত্য-গোপাল ও সর্ব্বজাতি সমন্বয়' সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীনিত্যগোপাল দেব লিখিত 'জাতিদর্পণ বা নিত্য দর্শন' নামক পুস্তকের উল্লেখ করেন। সেখানে চারি বর্ণ সম্বন্ধে শ্রীনিত্যগোপাল পঞ্চাশবৎসর পুর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছিলেন, '...শাস্ত্রানুসারে চারই এক পিতার সন্তান, যেহেতু চারেরই উৎপত্তি ব্রহ্মার কায়া হইতে। চারের প্রকাশের পুর্ব্বে চারই

ব্রহ্মকায়স্থ ছিলেন। ·· এক পিতারই চারি পুত্র হইলে সেই চারি পুত্রই কি ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ এক জাতি হয় না? অবশ্যই হয়।' ... 'এক পিতার চারি সন্তান হইলে অবশ্যই চারি সন্তানেরই একই জাতি স্বীকার করিতে হইবে। অতএব একই ব্রহ্মার চারি আত্মজের চারি প্রকার জাতি নির্দ্দেশ করা যাইবে কেন? এক প্রকার বৃক্ষের সমস্ত ফলই অবশ্যই সেই বৃক্ষ হইতে জাত; অতএব সেই সমস্ত ফলই কি এক জাতীয় নহে? অবশ্যই সেই সমস্ত ফলই একজাতীয়। ··· 'এক ভ্রাতার অন্ন অপর ভ্রাতা গ্রহণ করিতে পারেন না, এ কি প্রকার তোমাদের কুসংস্কার? ··· এক রক্ত এক প্রাণ যে চারিবর্ণের মধ্যেই প্রবাহিত হইতেছে। এক হইতে ঐ চারের উৎপত্তি বলিয়া একেই চার, চারেই এক যে, তাহা কি তোমরা জান না? সত্য করিয়া ঈশ্বর সমক্ষে বল দেখি, একই শরীরের কোন্ অংশটা অশরীর? কোন্ অংশটা সেই একই শরীর নহে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিবর্ণই কি সেই একই ব্রহ্মার শরীরের চার প্রকার অংশ বা বিকাশ নহে? তবে চারিবর্ণের জাতিতত্ত্ব লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন?' জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীনিত্য-গোপালের এই চিন্তাধারাকে অনুসরণ করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আজিকার দিনের সর্ব্ব জাতি সমন্বয়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের গুরুত্ব বর্ণনা করেন এবং দার্শনিক ভাবে সর্ব্ব জাতি সমন্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতি ভেদ মানে না ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ গৌরব করা অর্থহীন —ভারতবর্ষের ব্যবহারিক জীবনে জাতিভেদের বিষময় কুফল কোন্ দুর্ভাগ্য জাতীয় জীবনে আনিয়াছে এবং ব্যক্তিগত ভাবে মানুষকে অপমান করা যে কেবল মনুষ্যধর্ম্মবিরোধী নয়, উহা যে ভগবানের প্রতি অবিচার— ভাগবৎ ধর্ম্মকে অস্বীকার করা—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এই কথা সবিস্তারে আলোচনা করেন।

তাঁহার পর হিন্দুমহাসভার সম্পাদক শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ী তাঁহার ভাষণে শ্রীনিত্যগোপাল যে মানবধর্ম্ম লইয়া আসিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বলেন। অধ্যাপক ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মের সঙ্গে প্রত্যেক জাতির যে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ—শ্রীনিত্যগোপাল প্রদত্ত এই চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া কিছু বলেন। অতঃপর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার ইউজেনিকস্ ও এ্যানথ্রোলজির আবিষ্কারগুলি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত জাতিদর্পণ পুস্তকে পাওয়া যে কিরূপ বিস্ময়কর, তাহা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও যে সকল জাতি একই

জাতি—যোগেন বাবু ইহা আলোচনা করেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার এক মনোজ্ঞ ভাষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রত্যেক জাতি বা বর্ণই যে স্বয়ংপূর্ণ এবং স্বয়ংপূর্ণ প্রত্যেকের মিলন ছাড়া যে কোন রাষ্ট্র বা সমাজ বাঁচিতে পারে না—ভারতরাষ্ট্রে এই কথা যে ফুটিয়াছে এবং মহামানব শ্রীনিত্যগোপাল যে ইহা দার্শনিকভাবে প্রস্থাপন করিয়া বর্ত্তমান যুগকে পথ দেখাইয়াছেন—ইহা আলোচনা করেন। ইহার পর সমাপ্তি সঙ্গীতদ্বারা সভা ভঙ্গ হয়।

পল্লী পুনর্গঠন : আজ মাটীর উপর উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা:'—মন্ত্র সার্থক হইতে চলিয়াছে। ভূমি যে কাহারও একচেটিয়া নয়, উহা যে বিশ্বনাথের, কিম্বা বিশ্বের, এবং এই ভূমি যে সকলের সঙ্গে এক হইয়াই ভোগ করিতে হয়, নহিলে ভূমিমালিক ও ভূমিহীনদের সজ্ঘর্ষে ভূমির ব্রহ্মরূপতাই যে নষ্ট হইয়া যায়, ভূমি বিষাক্ত হয় এবং ভূস্বামী ও ভূমিহীন মজুরদল সেই বিষে জর্জ্জরিত হয় এবং তাহার ফলে যে কম্যুনিজম এদেশে বিস্তার লাভ করিবার সুযোগ পায়, এবং এ কম্যুনিজমকে রোধ করিতে হইলে যে একটী অহিংস ভূমি বণ্টন প্রণালীর মধ্য দিয়া ভূমির ব্রহ্মরূপ প্রকাশিত হইয়া মানুষকে স্বস্থ করিতে পারে, তাহা আজ আচায্য বিনোবাভাবের ভূদান যজ্ঞের ভিতর দিয়া প্রকট হইতেছে। উড়িষ্যায় এরূপ একটী মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। আমরা ইহার মধ্যে উপনিষদের ঋষিকুলের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেছি। এই ধরার ধূলি ব্রহ্ম ধূলি হইবে, ধরার মাটীতে গড়িয়া উঠিবে ব্রহ্ম মানব। ভোগ ও ত্যাগ সমন্বিত হইয়া ধরাকে ব্রহ্ম লোকে গড়িয়া তুলিবে। উড়িষ্যার এই ঘটনাটী সম্পর্কে আনন্দবাজার ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১-র কাগজে লিখিতেছেন, 'গতকল্য পুণ্য বুদ্ধ জয়ন্তী দিবসে উড়িষ্যায় মানপুর গ্রামে সর্বোদয় ভিত্তিতে পল্লী পুনর্গঠনের সূচনা হইয়াছে। ভূদানযজ্ঞে এই গ্রামের সমগ্র জমি পূর্বেই দান করা হইয়াছিল। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনাপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মধ্যে এই সমস্ত জমি পুনর্বণ্টন কার্য সম্পন্ন হয়। প্রবীণতম গান্ধীপন্থী নেতা আচার্য হরিদাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রীগোপবন্ধু চৌধুরী, শ্রীমতী রমা দেবী, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এন কে চৌধুরী, শ্রীমতী মালতী চৌধুরী, পণ্ডিত কৃপাসিন্ধু হোতা, শ্রী এন কে হস্তিয়া, শ্রীমনোমোহন চৌধুরী, শ্রীশরৎচন্দ্র মহারাণা প্রভৃতি ছিলেন। শ্রীগোপবন্ধু চৌধুরী আচার্য ভাবের এক বাণী পাঠ করেন ও সর্বোদয়

সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন। শ্রীভাবে তাঁহার বাণীতে পল্লীবাসিগণকে একটি যৌথ পরিবার হিসাবে বাস করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সমগ্র পল্লীর ৫৫০ একর জমি প্রত্যেক পরিবারকে মাথাপিছু এক একর হিসাবে দিয়া ৪৪ একর জমি সমবায় কৃষির জন্য পল্লীবাসিগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। কটক ও বালেশ্বর জেলার সীমান্তে অবস্থিত মানপুর গ্রামে ১১৪টি পরিবারে ৬২০ জন লোকের বাস—ইহারা সকলেই হরিজন। পল্লীর ভূস্বামিগণ সমগ্র পল্লীর ৬০০ একর জমি ভূদানযজ্ঞে দান করেন। এক্ষণে সমগ্র জমি পুনর্বণ্টন করিয়া সমবায় কৃষির জন্য যে জমি সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে, উহার আয় হইতে সমগ্র পল্লীর খাজনা ও পল্লী উন্নয়নকার্য করা হইবে। এজন্য এবং পল্লীর সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি পল্লী সমিতি গঠন করা হইয়াছে। পল্লীতে একটি সমবায় ভাণ্ডার স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।'

রাষ্ট্র ক্ষেত্রে গীতার সাধনা ঃ ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু রাষ্ট্র ক্ষেত্রে গীতার 'সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে রথং স্থাপয় মে অচ্যুত'—হে অচ্যুত, যুযুৎসু উভয় সৈন্যদলের মাঝখানে আমার রথ স্থাপন কর, যাহাতে আমাদের পক্ষের এবং বিপক্ষের কথা পক্ষপাত বিনির্মুক্ত হইয়া আলোচনা করিতে পারি, উভয় পক্ষের কল্যাণ মূলক পন্থা অনুসরণ করিতে পারি, কোনও একদিকে এমন কি আমাদের নিজেদের দিকে আটকাইয়া না গিয়া সত্যপক্ষ বিশ্বপক্ষ (Einstein-এর World-Line) অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি—গীতার এই সাধনা ভারত বর্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীনেহরুর নেতৃত্ব যে ভারতকে এই পথের খোঁজ দিয়াছে, ইহা অর্জ্জুনের রথের সারথি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ নেতৃত্বের আস্বাদন মাত্র, এই পথে চলিয়া ভারতবর্ষ যে বিশ্বের বুকে সর্ব্বক্ষেত্রে নায়কত্ব লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, বিশ্বের চিন্তা প্রণালীর মধ্যে একটী জীবন-বিপ্লব আনিতে যে সে সক্ষম হইবে, সে সম্বন্ধে আমরা ধীরে ধীরে নিঃসন্দেহ হইতেছি। ইহা যে পাশ্চাত্যের রাজনীতিবিদের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহা লণ্ডনের ১৫ই মে-র রয়টারের সংবাদে অনুভব করিতেছি। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রগণের সভায় বক্তৃতা কালে পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ জন বেয়ার্ড বলিয়াছেন, 'ইতিহাস হয়ত একদিন এমনই বলিবে যে, নৈতিক ক্ষেত্রে ভারত যে শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জন করিয়াছে, ইহাই পৃথিবীকে আর একটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছে'।

ভারতবর্ষ পক্ষপাত বিনির্মুক্ত থাকিতে চায়। সে নিজের পক্ষেও নয়. সে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর পক্ষে; তাহার বুকে বাজিতেছে গীতার বাণী 'সমোঽহম্ সর্ব্বভূতেষু ন মে দেষ্যোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ।' সত্যের মানদণ্ডে আমিই যদি দোষী হই, তবে আমিই আমার দ্বেষ্য; সত্যের মাপ কাঠিতে যদি আমার চিরদিনের শত্রুও নির্দ্দোষ হয়, তবে সে-ই আমার প্রিয়। আমি আমার কাছে সব সময়েই প্রিয় এবং আমার শত্রু সর্ব্ব সময়েই দ্বেষ্য—ইহা ভারতের রাষ্ট্রনীতি নয়। ভারতের প্রাণ-পুরুষ ঐ নীতিতে তৃপ্ত, উহা যে তাঁহারই নীতি। আজ সমগ্র বিশ্ব দুইটী ব্লকে বিভক্ত, একদিকে রাশিয়া, অপর দিকে ইঙ্গ-মার্কিন, ইহারা যুযুৎসু মনোবৃত্তি লইয়া পারস্পরিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আমেরিকা নিজের দলে এক একটী করিয়া দেশ ভিড়াইতেছে, ভারতবর্ষ দুর্জ্জয় সঙ্কল্প লইয়াছে মাঝখানে থাকিবার, সে আমেরিকার কাছ হইতে দেশকে গঠন করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতেছে ও আমেরিকার কর্ম্মের সমালোচনা, শুধু সমালোচনাই নয়, প্রয়োজন হইলে তাহার বিপক্ষে কার্য্যাত্মক পথ গ্রহণ করিতেও ভয় পাইতেছে না,—এই নির্ভীকতাই মানুষকে গুরু পদে অধিষ্ঠিত করে। ভারতবর্ষ কাহারও নয়, অথচ সকলের সংযোগিতা তাহার কাম্য। ভারতবর্ষ যদি এই পথে স্থির থাকিতে পারে, সকল যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। গত মহাযুদ্ধে ভারত নিষ্ক্রিয় থাকিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তখন ব্রিটিশ ছিল শাসনকর্ত্তা; কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভারতের সৈন্য যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। ভারতকে কেহই একান্তভাবে এড়াইতে পারে না। ভারতের নৈতিক সমর্থনকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সাহস কাহারও নাই। আগত প্রায় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সক্রিয় ঔদাসীন্য আস্বাদন করিবার মত। পুরুষোত্তম ভারতের এই 'সমঃ অহম্ সর্ব্বভূতেষু' সাধনা জয়যুক্ত করুন।

বন্দেমাতরম্।

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৬১

জড়াজড় সমন্বয়

সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল জড়াজড় সমন্বয় দর্শন নিজ জীবনে আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ যুগসমস্যার সমাধান কল্পে ইহাকে বিশ্ব মানবের সামনে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। পরস্পর বিরোধী জড় ও অজড় সমন্বয়ও যাহা, গতি ও স্থিতির সমন্বয়ও তাহা। অজড় অপরিণামী (immutable) তাই স্থিতিপ্রধান, জড় পরিণামশীল, তাই গতিপ্রধান। জড়াজড় সমন্বয় প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল স্থিতি-গতি সমন্বয় দর্শনই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিশ্বসভ্যতা আজও মূলতঃ স্থিতিপ্রধান; তাই ইহাদের লক্ষ্য একটী স্থিতিধর্ম্মী অপরিণামী ব্রহ্মবস্তু, যিনি সকল পরিণামকে অতিক্রম করিয়া স্থির, অচঞ্চল; সকল বহুকে ডিঙ্গাইয়া এবং সকল কালকে মুছিয়া ফেলিয়া নিত্য সনাতন। স্থিতি দর্শনে ব্রহ্ম তাই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'— ব্রহ্মে স্বগত ভেদ নাই, সজাতীয় ভেদ নাই, বিজাতীয় ভেদ নাই। যিনি স্বরূপতঃ দেশাতীত কালাতীত বহুর অতীত, তাঁহার অস্তিত্ব কথনও দেশ-কালের কিম্বা বহুর পরমার্থরূপ স্বীকার করিতে পারে না। তিনি দেশ-কাল-বহুকে— এক কথায় মায়াকে অবিদ্যাকে ব্যবহারিক ভাবেই স্বীকার করিতে পারেন মাত্র; কেননা, উহারা না হইলে তাঁহার অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না। নিজ অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যাহাদের প্রয়োজন আছে, অথচ যাহাদের পারমার্থিকত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন তাঁহার নাই, তেমনই বহুদ্বেষী, দেশ-কালাতীত এক ব্রহ্মবস্তু দেশ-কাল-বহুকে শোষণ করিয়া চলিয়াছিলেন, এবং এই শোষণের উপর দাঁড়াইয়া মাটীকে, মাটীর মানুষকে, মাটীর দর্শনকে, মাটীর সমাজ ব্যবস্থাকে

একটী উচ্চ-নীচ বিভাগের ভিতর গড়িয়া তুলিয়া পারমার্থিক দৃষ্টিতে উহার মিথ্যাত্বই স্থাপন করিতেছিলেন।

স্থিতীধর্ম্মী 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর, আল্লাহ্, God বা ব্রহ্ম যে বিশ্বের ইষ্ট, সে বিশ্বে যে ক্রমে ক্রমে একের চাপে বহু পিষ্ট হইবে, নিত্য সনাতনের কবলে ক্ষণ কবলিত হইবে, মানুষ যে সেখানে ঈশ্বরের দাসানুদাস, খেলার পুতুল বনিয়া যাইবে, উচ্চবর্ণের শোষণে সে দেশে যে নিম্নবর্ণ জর্জ্জরিত হইবে, সত্ত্বগুণের দাপটে, ব্রাহ্মণ-সভ্যতার দাপটে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও রজঃ তমোগুণ নির্ব্বীর্য্য ক্লীব, সমাজগঠনে একেবারে অকেজো হইয়া পড়িবে, পুরুষ-স্বাতন্ত্র্যের মাঝে যে 'স্ত্রী ন স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি' হইবে, প্রজ্ঞার চাপে প্রাণ যে কোন্-ঠেসা হইবে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বর্ণ কৌলিন্যের বিভীষিকায় জড়ীয় অন্ন বস্ত্র ভীত সন্ত্রস্ত প্রাণ লইয়া বিশ্ব হইতে উধাও হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে, —তাহা নিঃসন্দেহ।

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের যত রকমের সমস্যা আজ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার মূল কারণ রহিয়াছে অজড়ের উপর, স্থিতির উপর অতি মাত্রায় মূল্য আরোপ করার মধ্যে। এমনিই হয়। মানুষ যখন নিজের সমগ্রত্ব হারাইয়া, প্রজ্ঞা ও প্রাণের মধ্যে শক্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া, প্রজ্ঞাকৈন্দ্রিক হইয়া বিশ্ব সমস্যা সমাধানের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, তখন 'মানুষের' চেয়ে ঈশ্বরের মূল্য বাড়িয়া গেল, মাটীর পুজার চেয়ে আকাশের পুজা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিল, আদর্শের কাছে বাস্তবকে বলি দেওয়া হইল, পতিই নারীর একমাত্র গুরু হইল এবং প্রাণদর্শনে নারীও যে পতির গুরু তাহা ভুলিয়া গেল, অন্ন-বস্ত্রের মর্য্যাদা স্বর্ণ কাড়িয়া লইল, অন্নমানের স্থলে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইল, নিম্নবর্ণ গুণে কর্ম্মে ব্রাহ্মণের কাছে অস্পৃশ্য হইল। এইভাবে ঈশ্বরশাসন একদিন কোন রকমে বেশ চলিয়াছিল। কিন্তু মানুষের সংশয় ও অবিশ্বাস আসিয়া বিশ্ব সমস্যার বাস্তব বীভৎস রূপ মানুষের সামনে ধরিয়া দিল, মানুষ মহা সংশয়ে পড়িল—ঈশ্বর আছেন কি নাই। ঈশ্বর কি দয়াময়, শিব, সুন্দর? যদি তিনি শিব ও সুন্দর, তবে এত অশিবত্ব, অসুন্দরত্ব কেন? তিনি কি ইহার কোনও প্রতিকার করিতে পারেন না? তবে কি তিনি অশিব-অসুন্দরের সঙ্গে, মায়ার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছেন না? তবে কি তিনি মায়ার অধীন যে, মায়াকে সামলাইতে পারিতেছেন না? জড়ের দাবী কি একান্তভাবে অজড়ের দাবীর কাছে বলি দেওয়া চলে? যাহারা বলি দিবার জন্য প্রাণপণ করিলেন, তাঁহারাই

কি শেষ পর্য্যন্ত সেই জড়ের হাতে নাজেহাল হন নাই? এই সব সমস্যায় প্রপীড়িত সামাজিক মানুষ তাই দ্বন্দ্বের অপর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ডাইলেক্‌টিকের ধারা বহিয়া চিন্তাধারা চলিল।

কেহ বলিলেন—ঈশ্বর নাই; কেহ বলিলেন—ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। মানুষ আছে, মানুষের শান্তি চাই। মানুষ কৃপার দিকে না চাহিয়া কর্ম্মের ভিতর দিয়াই শক্তিলাভ করিতে পারে। অদৃষ্ট এমন শক্তিশালী নয় যে, কর্ম তাহার গতি রোধ করিতে পারে না। কেহ বলিলেন—বাস্তবই সত্য, আদর্শ বাস্তবেরই সৃষ্টি। আদর্শ যদি বাস্তবের অনুসরণ করিয়া না চলে, সে আদর্শ মানা চলিবে না। 'Beware of those whose God is in the skies.'—আকাশের আদর্শকে লইয়া আমরা মাটীর বুকে হোঁচট খাইতে প্রস্তুত নহি। জড়ই একমাত্র Reality; অজড় জড়েরই সৃষ্টি। আর একদল ঈশ্বরের আসনে মানুষকে বসাইলেন। মানুষকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বসমস্যা সমাধানের জন্য বসিয়া গেলেন। নারীর স্বাতন্ত্র্য বিশ্বময় ঘোষিত হইল। কাস্তে কোদালের সভ্যতা স্বর্ণ-সভ্যতাকে পদদলিত করিবার জন্য গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ-সভ্যতাকে উৎখাত করিয়া 'Ye the workers of the world, unite' ধ্বনি দেশে দেশে ধ্বনিত হইল। ধনিকের গদি শ্রমিক কাড়িয়া লইল। বুদ্ধির আসনে শ্রম বসিল। শ্রমিকের চরণতলে ধনিককে টানিয়া নামানো হইল। স্থিতিধর্ম্মী সমাজ বলিল ঘোর কলিকাল।

দ্বন্দ্বের (dialectic) এক প্রান্ত ঈশ্বর, অপর প্রান্ত নিরীশ্বর, মানুষ, জীবজগৎ; দ্বন্দ্বের এক প্রান্ত অজড়, অপর প্রান্ত জড়; এক প্রান্ত নিত্য, অপর প্রান্ত অনিত্য; এক প্রান্তে স্থিতি, অপর প্রান্তে গতি; এক প্রান্তে করুণা, অপর প্রান্তে কর্ম; এক প্রান্তে বুদ্ধি, অপর প্রান্তে শ্রম; এক প্রান্তে ব্রাহ্মণ-সভ্যতা, অপর প্রান্তে কৃষক-কিষান সভ্যতা; এক প্রান্তে নর, অপর প্রান্তে নারী। দ্বন্দ্বের কোন এক প্রান্তকে একান্ত করিয়া তুলিলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই অপর প্রান্ত নূতন বলে বলীয়ান হইবে। এই ভাবে প্রান্তে প্রান্তে যখন সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, বিশ্বের organic সত্তা, সামাজিক সত্তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়। তখন thesis antithesis-এর সংগ্রামের ভিতর দিয়া জন্মগ্রহণ করে সমন্বয় বা synthesis. 'Synthesis is thesis on a higher plane.' অক্ষর ব্রহ্ম হইতেছেন thesis, মায়া হইলেন anti-thesis, জড় হইল anti-thesis'

Synthesis বা সমন্বয় হইবে তখনই, যখন অক্ষর ব্রহ্মকে উন্নততম এক স্তরে মায়ার সঙ্গে, জীবজগতের সঙ্গে সমন্বিত করা যাইবে। এই সমন্বয় সাধিত হইলে ব্যবহারিক পারমার্থিকের ভেদ কাটিয়া যায়, সংসার সংসার থাকিয়াই সন্ন্যাসের সঙ্গে হাত মেলায়, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী হইয়াই সংসারী বনিয়া যান, গার্হস্থ্য ও সংসার গলিয়া একাকার হয়। তখন যিনি mystic, তিনিই বৈজ্ঞানিক হন।

শ্রীনিত্যগোপাল synthesis-এর দুরূহ কার্য্য দার্শনিকভাবে সমাধান করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সমাজে রাষ্ট্রে ইহাকে রূপদান করিবার উপযোগী গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এতদিন এই সমন্বয় সম্ভবপর হয় নাই। কেননা লজিকের ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটেলের Law of Excluded middle-এর অবাধ রাজত্ব চলিতে ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান ন্যায়শাস্ত্র প্রমাণিত করিয়াছে যে এই নির্ম্মধ্যম নীতি আজ অচল।

শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্ম-মায়ার সমন্বয়, জড়-অজড় সমন্বয়, সনাতন-নবীনের সমন্বয়, স্থিতি-গতির সমন্বয়, দ্বৈত-অদ্বৈতের সমন্বয়, এক-বহুর সমন্বয়, করুণা-কর্ম্মের সমন্বয়, আদর্শ-বাস্তবের সমন্বয়, শঙ্কর-চার্ব্বাকের সমন্বয়, শঙ্কর-বুদ্ধের সমন্বয়, ব্রহ্ম-বিদ্যার এবং তাহার চরম পরিণত রূপ ব্রহ্ম-অবিদ্যার সমন্বয়—এক কথায় পরস্পর-বিরোধী সব-কিছুর সমন্বয়—সর্ব্বসমন্বয়বাদ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে লজিক-এর পুরাতন নীতি Law of Excluded middle পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, আচার্য্য শঙ্করের যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সমূহের চুল-চেরা বিচার করিতে হইয়াছে। তিনি বিচার-বিশ্বাসের সমন্বয় বিধান করিয়া ভক্তি-জ্ঞানের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনে জ্ঞান-কর্ম্ম সমন্বিত। এতদিন ইহার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল নির্ম্মধ্যম নীতি। জেমস্ জিন্স্ তাঁহার 'ফিজিকস্ এণ্ড ফিলসফি' গ্রন্থে লিখিতেছেন : 'A second difference of idiom......arises out of philosophical practice of depicting the world entirely in black and white and so ignoring all the half-tones, gradualness and vagueness which figure so prominently in our experience of the actual world. The obvious example of this is provided by the law of the excluded middle, which has dominated formal logic, with

devastating results, from the time of Aristotle on. The law asserts that everything must be either A or-not -A, whatever A may be. The scientist, on the other hand, knowing that everything will generally possess some A-ness and some not-A-ness, is very little concerned as to whether an object is classed as A or not-A ; what he wants to know is how much A-ness it possesses.'

এই বিশ্বে দ্বন্দ্বের কোনও একটীই একান্তভাবে সত্য নয়—একান্ত ব্রহ্ম বলিয়া কিছু নাই, একান্ত মায়া ও জীবজগৎ বলিয়া কিছু নাই ; একান্ত অজড় বলিয়া কিছু নাই, একান্ত জড় বলিয়া কিছু নাই, একান্ত স্থিতি বা একান্ত গতি বলিয়া কিছু নাই, একান্ত এক বা বহু বলিয়া কিছু নাই, একান্ত নর ও নারী বলিয়া কিছু নাই, একান্ত আদর্শ বা বাস্তব বলিয়া কিছু নাই, একান্ত শ্রম ও ধন বলিয়া কিছু নাই। আমরা দেখিব 'how-much' ব্রহ্মত্ব মায়ার মধ্যে আছে, how-much মায়াত্ব ব্রহ্মের মধ্যে আছে, how-much স্থিতি গতির মধ্যে আছে, how-much গতি স্থিতির মধ্যে আছে। এই how-much-nessই গীতায় ভগবান 'মাত্রাস্পর্শ' পদ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল এই 'মাত্রার' দর্শন উপস্থাপিত করিয়া বিশ্বে দ্বন্দ্বমোহের নিবৃত্তি ঘটাইয়াছেন। ব্রহ্ম-মায়ার সমন্বয়ই, ক্ষর-অক্ষরের সমন্বয়ই, স্থিতি-গতির সমন্বয়ই, ধনিক-শ্রমিকের সমন্বয়ই পুরুষোত্তম। উপনিষদের 'আসীনঃ দূরং ব্রজতি'—এই synthesis-এর বার্ত্তাও শ্রীনিত্যগোপালই পৌঁছাইয়া গিয়াছেন। 'আসীন'-র দর্শন ও 'ব্রজতি'-র দর্শন সমন্বয় বিধান করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল এক অপূর্ব্ব দার্শনিক।

তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তদর্শন নামক অমূল্য দার্শনিক গ্রন্থে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর অন্তর্গত 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' শব্দগুলিকে 'higher plane'-এ তুলিয়া অজড়বাদী আচার্য্য শঙ্কর প্রমুখ অদ্বৈতবাদীদের প্রদত্ত স্থিতি অর্থের সহিত গতি-অর্থের সমন্বয় করিয়াছেন, নিরাকার শব্দের negative অর্থের সঙ্গে positive অর্থ সমন্বিত করিয়াছেন। 'পূর্ণ' শব্দের গতি-অর্থ প্রদান তিনিই করিয়াছেন। তাঁহার মতে পূর্ণ শব্দ অদ্বৈত বাচক নহে। 'পূর্ণ কুম্ভ' বলিলে অপর কিছু দ্বারা কুম্ভ পূর্ণ—ইহাই বুঝিতে হয় ; ব্রহ্ম পূর্ণ বলিলেও ব্রহ্ম অপর কিছু দ্বারা অর্থাৎ মায়াদ্বারা পুরিত বুঝিতে হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদও বলিতেছেন, 'আকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যতে'। ব্রহ্ম মায়াপূর্ণ হইয়াই পূর্ণ ব্রহ্ম, অদ্বৈত

দ্বৈতপূর্ণ হইয়াই পূর্ণ অদ্বৈত, এক বহু-পূর্ণ হইয়াই পূর্ণ এক—এবং তখনই ইহারা পরিপূর্ণ পুরুষোত্তম। ব্রহ্ম-পুরুষোত্তমে পূর্ণ-অপূর্ণের সমন্বয় জমিয়া উঠিয়াছে। পুরুষোত্তমই সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জ্জিত ও সর্ব্বদ্বন্দ্ব সমন্বিত। তিনি সর্ব্বস্তরের thesis ও anti-thesis কে higher plane-এ তুলিয়া সমন্বিত করিয়া, synthesis করিয়া বিশ্বমন্থন ধন রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাই তিনি একাধারে সনাতন ও নিতুই নূতন। শ্রীনিত্যগোপাল এই সনাতন-নবীন পুরুষোত্তম তত্ত্বের ঘন বিগ্রহ। বর্ত্তমান বিশ্বশক্তি শ্রীনিত্যগোপালকে সারাবিশ্ব মন্থন করিয়া, পরস্পর-বিরুদ্ধ সকল দ্বন্দ্ব, সকল জটিল কুটিল সমস্যা মন্থন করিয়া দিব্যরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। বিশ্ব তাঁহাকে বুকে পাইয়া এইবার 'এক বিশ্বে' গড়িয়া উঠিবার পথ পাইল। আজ বিশ্বের বুকে আমরা বিশ্বাতীতের গড়াগড়ি প্রত্যক্ষ করিয়া গতির বুকে স্থিতির জমাটবাঁধা রূপ আস্বাদন করিব। ধরার ধূলি হইবে ব্রহ্ম ধূলি, ধরার মানুষ হইবে ব্রহ্ম মানুষ। শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক। বন্দেমাতরম্

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ভূদান-যজ্ঞ

সুরেশচন্দ্র দেব

"ভূদান-যজ্ঞ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার এক খণ্ড আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তাহার জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী মহাশয়কে। তাঁহার সংগে প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিবার অপরাধে যখন সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরিত হই। প্রায় ১০০ শত জন আইন অমান্যকারীর মধ্যে শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় ছিলেন প্রধান এবং প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও ছিলেন।

চারুবাবু একজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক; আবার তাঁহার রাজনীতি জীবনে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মন্ত্রীত্বের আমলে তিনি ছিলেন খাদ্য মন্ত্রী। ডায়মণ্ডহারবার মহাকুমায় তাঁহার প্রভাব প্রতি-

পত্তির কথা আজ সর্ব্বজনবিদিত। সারাজীবন কৃষকের সুখ-দুঃখ ও অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। ওকালতী ব্যবসা উপলক্ষে তাঁহার সে জ্ঞান অর্জ্জিত হয়।

আজ তিনি আচার্য্য বিনোবা ভাবে পরিচালিত ভূদান-যজ্ঞের প্রধান প্রচারক এই পশ্চিমবঙ্গে। তৎসহ এই আন্দোলনের মুখপত্র "ভূদান-যজ্ঞ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। এই পরিণতি স্বাভাবিক। দেশের চিন্তাশীল নর-নারী ভূমি সমস্যার সমাধান না হইলে দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা জমিদারের হাত হইতে জমি নিয়া কৃষকের মধ্যে বণ্টন করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সে আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের চেষ্টায় সমস্যার সমাধান হইবে না। আচার্য্য বিনোবা ভাবে যে ব্রতে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাহা এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়; প্রকৃষ্টতম উপায় কিনা তাহা ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিবে।

কিন্তু ভবিষ্যতের হাতে সব ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; বর্ত্তমানের নর-নারী পরীক্ষা দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করিতে পারেন।

এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতিবেশী বিহার রাজ্যের অগ্রগতি অনেকখানি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বাহিরের জমিদার শ্রেণী এই ভূমিদান ব্যাপারে যে উদাহরণ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন বলিয়াই মনে হয়।

আজ প্রায় ৩ বৎসর আচার্য্য বিনোবা ভাবে ভূদান যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন হায়দরাবাদ রাজ্য হইতে। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গে আনিবার মত সুযোগ আমাদের ঘটিল না। আমাদের রাজ্যের কৃষক-শ্রেণী তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সেই প্রতীক্ষা কবে পূর্ণ হইবে! তিনি আসিলে এই পরীক্ষা হইয়া যাইবে যে বাঙ্গালী জমিদার ও বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ দেশের অগণিত নরনারীর জন্য কি ও কতোখানি ত্যাগ স্বীকার করিবেন। সেই অগণিত জনমণ্ডলীর মধ্যে আমিও একজন আচার্য্য বিনোবা ভাবের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি।

এখন যে সমস্যার সমাধানকল্পে দেশের ও বিদেশের সাধু-সন্ত চিন্তা-নায়কগণ যুগ যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন দুঃখী ও দরিদ্রের কষ্টের লাঘব করিবার জন্য, বঞ্চিত ও মূকের মুখে ভাষা দিবার জন্য—তাহারও সমাধান

বোধ হয়, এই পথে সহজ হইবে। Henry George 'Progress & Poverty'-তে এই সমাধানের ইংগিত প্রদান করিয়াছিলেন একশত বৎসর পূর্ব্বে।

পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্মজীবন দরিদ্রের জন্য নয়"—এই দ্ব্যর্থবোধক কথাটি রামকৃষ্ণ মিশনের মূলমন্ত্র হইয়া আছে। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের, যেমন ইসলামের জাকাৎ, খৃষ্টধর্ম্মের Poor Box, হিন্দুর দান-ধ্যান "বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ"—এই সমস্তই ছিল দেশের নিরন্নের মধ্যে ধন বিতরণের উপায়। জমিদারী প্রথার ক্রমবর্দ্ধিত আয়তন ও তাহার উগ্র সঞ্চয়শীলতার ফলেই ক্রমে ক্রমে দেশের মধ্যে দান-খয়রাতের স্রোতটি রুদ্ধপ্রায় হইয়া পড়ে। তাহার সংশোধনের চেষ্টা ও উপায় প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছে—বড়লাট ক্যানিং এর আমল হইতে। কিন্তু আজিও সেই সমস্যার সমাধান কোনো পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণ করিতে পারে নাই।

কোনো কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন—এই সমস্যা, এই ধন-বৈষম্য বিশ্ব-বিধানের অন্যতম রহস্য; এই সৃষ্টি যতদিন থাকিবে ততদিন এই রহস্য বা সমস্যা মানব সমাজকে বিভ্রান্ত করিবে। যুগে যুগে এই অসম ব্যবস্থা দেখা দিবে; এবং সংগে সংগে তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও চলিবে। হয়তো এই চেষ্টার সংগে সংগেই মানব সমাজ তাহার যুগব্যাপী আকাঙ্ক্ষিত আশার সার্থকতা লাভ করিবে—এবং এই ভূদান যজ্ঞ সেই ফলপ্রসূ চেষ্টারই ইংগিত বহন করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

'যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা দলাদলি ও দলগতভাবে চিন্তা করা ছাড়িয়া না দিবেন, ততক্ষণ তাঁহাদের হৃদয়শুদ্ধি হইবে না। তাঁহারা ক্রান্তির দূতও হইতে পারিবেন না এবং জনতার হৃদয়েও তাঁহাদের জন্য কোন সম্ভ্রম অবশিষ্ট থাকিবে না। যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে ভূদান প্রাপ্তি অথবা ভূমি বিতরণের অছিলায় আমরা নিজেদের দলের কোন স্বার্থ সাধন করিতে পারিব, তবে তাঁহারা ভুল করিতেছেন। আমার কাজ পক্ষাতীত জনশক্তি জাগ্রত করার কাজ—এ কথা জনসাধারণ বুঝিয়া গিয়াছে।' —বিনোবা

জাতির জীবন মরণ

দুর্গামোহন সেন

"শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল-সাগর কম্পন দর্শে।" ভারতীয় জাতীয় তরণীর সকল যাত্রী আজ ভীত সন্ত্রস্ত। "Child is the father of the man"—শিশুরাই মানবজাতির জনক। সে শিশু যদি উদ্ভ্রান্ত—উচ্ছৃঙ্খল হয়, তবে জাতি বাঁচিবে কেমনে। তাহার অর্থ প্রত্যেক মানুষ আজ অনুভব করিতেছে—জীবন যাপন সুখাবহ নহে। পুত্র কন্যা ভাই ভগ্নী পাড়াপ্রতিবেশী সকলের ব্যবহার এমন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, মনে মনে তাহা ত্যাগেন ভুঙ্গীথার সমপর্য্যায়ে পৌছিয়াছে।

কেন এমন হইল? তাহার কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া ইতিহাস খুঁড়িলে দেখা যাইবে অন্ততঃ স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে প্রায় শেষ অবধি এমনটী ছিল না। তখনকার দিনে সকলে হইয়াছিল দেশভক্ত—ত্যাগে, বীরত্বে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, আদেশানুবর্ত্তিতায়, চরিত্রে, পরিশ্রমে তাহারা শুধু দেশবাসী নহে, দেশশত্রুদেরও শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু আন্দোলনের শেষাংশে—'মারি অরি পারি যে কৌশলে' নীতি অবলম্বন করিতে গিয়া যে ভুল করা হইল, তাহাই সর্ব্বনাশ ঘটাইল। মহাত্মাজিও সে কর্দ্দম-গর্ত্ত হইতে দেশকে সম্পূর্ণ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তাই বলি "যো খোদেগা বহ্ গিরেগা" বাক্য সত্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশ কি হইয়াছে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক, কারণ তাহা সর্ব্বজনবিদিত ও সর্ব্বত্র আলোচিত। দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া গিয়াছে। দেশবাসী বালক বালিকাদিগকে মনের মতন মানুষ করিয়া তুলিবার ভার শাসনকর্ত্তা ও রাষ্ট্র পরিচালকগণের উপর। যাইতে হইবে ফিরিয়া সহস্র বৎসর পশ্চাতে। গুরু প্রস্তুত করিতে হইবে—যাহাদের উপর আজীবন ভক্তি রাখা চলিবে। সন্দীপন মুনি চাই—আর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ছাত্র চাই। গুরু গৃহেই বাস করিতে হইবে, গুরু গৃহই আপন গৃহ বলিয়া মান্য করিতে হইবে। আজিকার শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতি বাড়িবে না। বহু শিক্ষকের ছাত্র কোনও শিক্ষককে গুরু বলিয়া মনে করে না। সহস্র সহস্র শিক্ষকের মধ্যে দু একজনই ছাত্রদের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে। গুরুর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিলে এবং তাহার সহিত আপন জনের মত মিশিতে পারিলে তবে তো শ্রদ্ধাবান্—তবেই তো সত্য হইবে "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" বর্ত্তমান কালের শিক্ষকগণ

দুচার বৎসরেই ছাত্রের নিকট অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে। এইখানে শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কে তাহা করিবে? পরাধীন অবস্থায় শিক্ষিত শিক্ষক তাহার শিক্ষাদীক্ষা ভুলিয়া নূতন প্রথায় নিজদিগকে সহজে শিক্ষা মণ্ডিত করিতে পারিবে না। সে পশ্চাদপসরণের পথ দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। তথাপি চেষ্টা করিতে হইবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণকে। আজও ছাত্রদের যে উচ্ছৃঙ্খলতা তাহা বড় বড় সহরে যত— মফঃস্বলে তত নহে। শিক্ষা পদ্ধতি জটিল হইয়াছে—বহু ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। অতএব যেখানে অর্থের প্রাচুর্য্য, সেই রাজধানীতেই হইয়াছে শিক্ষা গাঢ় আর সেই সহরগুলি কুশিক্ষার নরককুণ্ডও বটে। ছাত্র পায় না শিক্ষকের সাহচর্য্য—সে দেখিতে পায় না শিক্ষকের দৈনন্দিন জীবনের মাধুর্য্য। তথা সে পায় না অভিভাবকের সঙ্গ—অভিভাবকও পুত্র কন্যার সহিত একত্র থাকিতে পারে না বহুক্ষণ। তাই ছাত্র-জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা আনে অসংখ্য অসৎ আদর্শ।

সেই আবহাওয়া উল্টাইতে হইবে। "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ" এখন কথার কথা। তাহারা সিনেমার নগ্ন চিত্র, সিগারেটের তপ্ত ধূম, রেঁস্তোরার বীভৎস আবহাওয়া হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না। তথাপি বলি স্কুলে স্কুলে অন্ততঃ একজন হেডমাষ্টার দেবচরিত্র থাকা দরকার। তাহারা অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন ধর্ম্ম কথা—সন্নীতির কথা ছাত্রদিগকে শুনাইবে। অতএব ভারতে যত শিক্ষিত সন্ন্যাসী হইয়াছে তাহাদিগকে ডাকিতে হইবে। তা ছাড়া এখনও আদর্শ শিক্ষক আছে যাহারা গৃহী হইয়াও পবিত্র জীবন যাপন করে। তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে হইবে এবং তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার সরকার গ্রহণ করিবে, আর তাঁহারা "ছাত্রজপ ছাত্রতপ ছাত্র চিন্তামণি" করিয়া দিন মাস বর্ষ যাপন করিবেন। এইভাবে ক্রমে হাওয়া বদল করিতে হইবে। জাতির জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করিয়াছে—ভাল রোজা দিয়া সে পাপ ক্ষালন করিতে হইবে।

রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে যাহারা আদর্শ চরিত্র, তাঁহারাও স্বধু রাজনীতিতে নিমজ্জিত না থাকিয়া জাতির ভিত্তি পোক্ত করিতে যুবকদের মধ্যে নীতি শিক্ষা প্রদান করিতে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করিবেন। স্বধুই রাজনীতির বুলি কপচাইয়া দিন না কাটাইয়া তাঁহারা সভা সমিতি করিয়া পবিত্র জীবনের মাহাত্ম্য বর্ণন করিবেন। আর পণ্ডিত সন্ন্যাসীগণ কেবল রোগীর সেবা লইয়া দিন না কাটাইয়া জাতির এই ভবরোগ নিরসনের কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিবেন। তবেই যাবে এ দুর্দ্দিন আসবে স্বদিন।

'পরমাণুবাদ'

গৌরচন্দ্র সাহা

(১)

'কণাদ'-এর যুগে

হেরিনু অনন্ত শূন্য যতদূর দৃষ্টি মোর চলে।
শেষ কোথা? শেষ নেই। নীলাকাশে হাসিতেছে রাকা;
হাসিতেছে গ্রহতারা, হাসে রবি রক্ত অস্তাচলে।
আকাশের শেষ নেই, এ সুনীল সীমাহীন ফাঁকা।
উত্তাল তরঙ্গময় ফেনিল সাগর বেলা পরে
দাঁড়াইনু একদিন দৃষ্টি হানি দিগন্তের পানে;
নীলাম্বুর পরপার খুঁজিলাম অতি যত্নভরে,
মিলিলনা; দুই কান ভরি গেল তরঙ্গ নর্ত্তনে।
সীমা নাই আকাশের, সীমাহীন সাগর উতালা,
সীমা নাই পৃথিবীর, সীমাহীন বিশ্ব রঙ্গশালা।

ব'সে আছি আনমনা জড়জগতের মাঝখানে
আমার গণ্ডীর মাঝে নীথর বস্তুরে পুঞ্জ করি।
মাটি ছাড়ি কেন ধাই মসীময় আকাশের পানে,
স্থল ছাড়ি জলে কেন, সীমা ছাড়ি অসীমেরে বরি!
বস্তুরে ছড়াই আমি, চূর্ণ করি রেণু রেণু রূপে,
এ বিশ্বের সৌষ্ঠবের প্রাণ কণা এই পরমাণু।
চূর্ণিত ব্রহ্মাণ্ড মোর মুঠি মাঝে পরমাণুরূপে;
এই অণু গড়িয়াছে স্থল, জল, শশী, তারা, ভানু।
সীমার মাঝারে আছে অসীমের অন্তহীন ছাপ;
তারে না খুঁজিয়া তাই পেয়েছিনু এত মনস্তাপ।

(২)

'অটোহ্যান্'-এর যুগে

অনন্ত শক্তিরে আজি লভিয়াছি মোর গণ্ডী মাঝে,
এ পৃথিবী কত ছোট, কত ক্ষুদ্র গ্রহ চন্দ্রতারা !
মহাপ্রলয়ের দূত আজি মোর হৃদয়ে বিরাজে,
ভাঙ্গিবে সে সভ্যতারে কত শত শতাব্দীর গড়া।
পরমাণু মারণাস্ত্রে হিরোসিমা নাগাসাকি জ্বলে।
জ্বলিবে সমস্ত পৃথ্বী, জ্বালায় সমাপ্তি হবে তার।
রোগজীর্ণা বসুন্ধরা, কীট জন্মিয়াছে স্থলে জলে ;
এ শল্য চিকিৎসা বলে জলে স্থলে হবে একাকার।
ক্ষুদ্র পরমাণু ফুল সুবিশাল বিশ্বদেহ গড়ে ;
মহান্ প্রতাপ তার অশ্রুজল আনে ঘরে ঘরে।

আরো চাই আরো চাই শক্তিরে আমার মুঠি পরে ;
ক্ষুদ্রের কতেক বল দেখাবার এসেছে যে কাল।
ভাঙ্গো ভাঙ্গো আরো ভাঙ্গো ভাঙ্গনের বজ্র গড়িবারে।
দেখিছনা ওই হোথা মহারুদ্র বাজাইছে গাল ?
স্থবিরা ধরার আজি ঘনায়িত মরণের দিনে
আগুন জ্বালাতে হবে দিগন্তেরে রক্তিমে উজলি।
মহাচিতা জ্বালাও হে উপবনে প্রাসাদে পুলিনে
মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হবে ব্যোমে যথা ঝলকে বিজলি।
অমরতা লভিবার আমার এ মহা যজ্ঞখানি
পূর্ণ হোক্ এইবার ধরণীরে করিয়া অরণি।

---

(১) কণাদ—বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। পরমাণুবাদের আদি প্রতিষ্ঠাতা।

(২) অটোহ্যান্—পরমাণু বোমা আবিষ্কর্ত্তাদের অন্যতম।

বাঙ্গালা জীবনীসাহিত্যে 'জীবনস্মৃতি'র স্থান

মঞ্জু মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যে জীবন-চরিত রচনা আধুনিক ঘটনা' চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে কোন জীবনী সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। চৈতন্যদেবের আমল হইতে যে জীবনী ধারা লেখা আরম্ভ হয়, তাহা উনিশ শতকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল। তাহার পর উনিশ শতকে সাহিত্যিক কৌলিন্যে বাঙ্গালা গদ্যের যখন উন্নয়ন হইল, তখন হইতেই একটী একটী করিয়া জীবনী ও আত্ম-জীবনী দেখা দিয়াছে।

চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী জীবনী সাহিত্যে মানবরসের পরিচয় সামান্য। মানুষ বলিয়াই মানুষের জীবনী তখন লেখা হইত না। মানুষের মধ্যে অলৌকিকতা দেখা যাইলেই তাহা জীবনচরিতের উপাদানরূপে গণ্য হইত। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কথা লিখিতে গিয়া বৃন্দাবনদাস তাই সেই অতি-মানবের কথায় মগ্ন হইয়াছেন। মহাপ্রভু যে রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, চৈতন্যজীবনীর মধ্য ও অন্ত্যপর্ব্বের রূপায়নে লেখকেরা তাঁহাদের পাঠকের সেই কথাটাই ভুলাইয়া দেওয়ার যৌথ সাধনায় নামিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের আদি লীলায় অথবা জয়ানন্দের লেখায় এই মনোভাবের ব্যতিক্রম আছে বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মহাপ্রভুর জীবনীগ্রন্থ গুলির মধ্যে বিভিন্ন লেখকের মনোভাবের ঐক্যই দেখা যায়। তাঁহারা সকলেই ভক্তিরসে আপ্লুত—সেই ভক্তিরসের নির্ঝরে মহাপ্রভুর মধ্যকার মানুষটী কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

কিন্তু উনিশ শতকে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে জীবনী-সাহিত্যের প্রবর্ত্তন হইল, তাহাতে সাধারণ মানুষের পরিচয় দিবার, ভালয়-মন্দয় মিশাইয়া 'গোটা' মানুষটীর ছবি ফুটাইবার প্রচেষ্টা দেখা দিল। সাধারণ মানুষের জীবনে যে রহস্য ও বিস্ময় আছে, তাহাই স্বীকৃতি পাইল—রেনাসাঁস প্রভাবিত ইউরোপীয় ভাবধারার আগমনে। সুতরাং তখন 'memoirs' প্রভৃতি লেখা আরম্ভ হইল। ১৮০১ সালে 'প্রতাপাদিত্য চরিত' প্রকাশিত হইল। প্রথম বাঙ্গালীকৃত গদ্য-গ্রন্থ হিসাবে ইহার মূল্য থাকিলেও আসলে ইহা ইতিহাস।

কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া জীবনীসাহিত্যে প্রেরণা আসিল। বিদ্যাসাগর, মহর্ষি, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির আত্মচরিত এই ধারারই ক্রমোন্নতি।

এই ধারার অনুসরণ করিয়া ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশিত হইল। 'জীবনস্মৃতির' প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির আত্মজীবনী। পুর্ব্ববর্ত্তী যাহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা কেহই কবিগুরুর মত অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক বোধসম্পন্ন নহেন। তাঁহাদের সামনে কোন আদর্শ ছিলনা, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা রচনায় হাত দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' এই দিক দিয়া একটী আদর্শ স্থাপন করিল। পরবর্ত্তী রচনাকারীদের হাতড়াইয়া বেড়ান লক্ষ্যহীনতা দূর করিয়া 'জীবনস্মৃতি' একটী সহজ ও স্বচ্ছ মডেল স্থাপন করিল। এই 'মডেল'ই যে চূড়ান্ত, তাহা বলা হইতেছেনা, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস ও ডায়েরীর ভারসাম্য রক্ষা করিয়া ইহা নিঃসন্দেহ ভাবে সাহিত্যের ইতিহাসে একটি land mark স্থাপন করিল। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার স্থান অনন্যসাধারণ।

ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়াও এ গ্রন্থে অন্যান্য দিকটীও দেখিতে হইবে। 'জীবনস্মৃতি' নাম হইতেই বোঝা যায় যে ইহা আত্মজীবনী নহে। বাল্য জীবনস্মৃতিই এই গ্রন্থের চারিভাগের তিনভাগ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যতদূর পর্য্যন্ত একান্ত নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে বলা যায় ততদূর পর্য্যন্ত কবি অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু যেখানেই তাঁহার নিজের রচনার কথা আসিয়াছে সেইখানেই একটী সসঙ্কোচ কৌতুকলীলা ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু খাঁটী জীবন-চরিতের স্বাদ না পাইলেও যাহা ইহার মধ্য দিয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে কোন ভাষায় অতুলনীয়। কবি গ্রন্থের আরম্ভেই বলিয়াছেন যে, স্মৃতির পটে জীবনের যে ছবি অঙ্কিত হয় তাহা ইতিহাস নয়; অর্থাৎ যাহা বাহিরে ঘটিতেছে, তাহার যথাযথ নকল নহে, তাহা 'এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তে রচনা।' জীবনের সেই নানা বিচিত্র স্মৃতিচিত্রের আনন্দ রসে এই গ্রন্থখানি ভরপুর, সেইজন্য ইহা এমন আশ্চর্য্য। মানুষের জীবনের সকলপ্রকার স্মৃতির মধ্যে যে এমন অপুর্ব্ব একটী চিত্র-রস থাকিতে পারে, এই গ্রন্থ না পড়িলে তাহা মনে করাই সম্ভব নহে।

কবি এ গ্রন্থের মধ্য দিয়া বলিতে চাহিতেছেন যে তাঁহার অন্তর্লোকে উপকরণের বৈচিত্র্য ম্লান হইয়া গিয়াছে। সেখানে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে

নিরবচ্ছিন্ন একটী অখণ্ডতার ধ্যান। জীবন স্মৃতিতে তাই তিনি এই একটী উপকরণ সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। জীবনের দৃশ্য ক্ষেত্রের সম্পর্কে কোন দিনই কবির বিরাগ ছিলনা। কিন্তু দৃশ্যকে তিনি অদৃশ্যের প্রতীক হিসাবে দেখিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনে তথ্যের সমারোহের তুলনায় সত্যের অভিসার হইয়াছে বেশি উপভোগ্য। খণ্ড দৃশ্যের উত্তেজনা অপেক্ষা সুদূরের প্রসন্ন উপসংহারটি হইয়াছে বেশি কাম্য। তিনি বলিয়াছেন সৃষ্টিতে বস্তুরূপী তথ্য ছাপাইয়া আছে সমগ্রতার ঐক্য। তত্ত্বের পাত্র আশ্রয় করিয়া সত্যের স্বাদ নেওয়াতেই তাঁহার ছিল চিরতন আগ্রহ। এই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন ফুলে যেখানে সৌন্দর্য্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন।

তথ্যকে সত্যের অধীনস্থ করিয়া বাস্তবকে বিশ্ব ও ব্যক্তির যোগানন্দরূপে দেখিবার এই বিশেষ আগ্রহের মধ্যেই রহিয়াছে তাঁহার জীবন ও জীবনস্মৃতির শিল্প-প্রকরণ।

ঘটনার বা বিষয়ের বৈচিত্র্যের তুলনায় অনুভূতির গভীরতাই যে 'জীবন-স্মৃতি'র অধিক স্বীকৃত, শ্রেয়তর উপাদান, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার তালিকা অপেক্ষা বিস্ময়ে আনন্দে বেদনায় স্পন্দ্যমান বিশেষ কয়েকটী মানসোপলব্ধির উল্লেখ দ্বারাই যে কবিজীবনীর আন্তরিকতর, সার্থকতর অভিব্যক্তি সম্ভব, কবি নিজেই সেইকথা বলিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মানসধারা অনেকাংশে গ্যেটের সঙ্গে এক। কিন্তু গ্যেটের আত্মজীবনী আর রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ভিন্ন সুরে বাধা। রবীন্দ্রনাথের জীবনের রূপকল্প গ্যেটের মত symphonic নয়, melodic. Symphony-র বৈশিষ্ট্য হইল সুর-বৈচিত্র্য, melody-র লক্ষ্য সুরৈক্য। রবীন্দ্রনাথ গানে লিখিয়াছেন "এক মনে তোর একতারাতে একটী যে সুর, সেইটী বাজা।" 'জীবনস্মৃতি'র আলাপে, ঝঙ্কারে, মীড়ে, মূর্চ্ছনায় একটী কথাই ফিরিয়া ফিরিয়া ধরা দিয়াছে। তাঁহার সারাজীবনের সকল ঘটনায় সেই একটী বাণীর একক ব্যঞ্জনাই যেন একমাত্র লক্ষ্য। সেই একটী কথা কোন্ কথা? তাহা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বমুখ্যতা। জীবনচরিত লিখিবেন না বলিয়া কবি 'জীবন-স্মৃতি' লিখিতে বসিয়াছিলেন। তাই তিনি শুধু তাঁহার বাল্যজীবনের চিত্র নয়, বাড়ীর

চিত্র, পরিবার মণ্ডলীর চিত্র ও তৎকালীন সমাজের চিত্র, নানা লোকচিত্র ও প্রকৃতির দৃশ্যচিত্রে গ্রন্থখানি পূর্ণ করিয়া আমাদের হাতে আনিয়া দিয়াছেন গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে বর্ণনার যে একটী মোহরস কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়াছে, সেই মোহের স্বপ্নাঞ্জন তুলিকায় মাখাইয়া অনতিস্ফুট বিভাসে কবি তাঁহার প্রত্যেকটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে 'আইডিয়াল' যে চিত্রগুলি —তাহাই বা কি সুন্দর। "হেলা ফেলা সারা বেলা একি খেলা"—এই গানটীর চিত্রটী যেমন। দুপুর বেলায় আলস্য জড়ান যে একটী ঔদাস্য আছে, বহুদূরের স্বপ্ন যখন মনকে উতলা করিয়া তোলে, ঐ গানটীতে সেই উদাস আকুলতার একটী সুর আছে। এমন একটী সুরকে রূপে ধ্যান করা সহজ নহে। এই ছবিটী তাই কল্পছবি—মানস-বনের লীলাপুষ্পের গন্ধখচিত ছায়াছবি।

জীবনস্মৃতিতে কবির বাল্যস্মৃতি গ্রন্থের চারিভাগের তিনভাগ স্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক বয়স্ক পাঠক ইহাতে মনে মনে আপত্তি করিয়াছেন যে, ছেলে বয়সের কথার মধ্যে এমনকি লিখিবার বিষয় থাকিতে পারে? বৃন্দাবনের গোষ্ঠলীলায় ভগবান বালকবেশে সখাদের সঙ্গে খেলা করেন; বৈষ্ণবসাহিত্যে তাহার বর্ণনা আছে। ইহার অর্থ ভগবান শিশুর সঙ্গে শিশু হইয়াই খেলা করেন—তাঁহার এতবড় বিপুল জগৎ একটী শিশুর খেলাঘর ছাড়া আর কিছুই নয়। সকল মানবের শৈশবের আনন্দের লীলাকে যদি সেই অনন্তের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেখা এদেশের সত্য হইয়া থাকে, এবং আমাদের হৃদয় সেইরূপেই যদি তাহাকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তবে কবির বাল্যজীবনের মাধুর্য্যময় চিত্ররস আমাদের উপভোগ্য হইবেনা কেন? বৃদ্ধবয়সে কবি নিজে যে সেই বাল্যের স্মৃতিগুলি আঁকিতেছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার নিজের কি একটা নিগূঢ় উপভোগ নাই? সেই তাঁহার সুকুমার 'আমি'টীকে তিনি কি কোমল, কি সুন্দর করিয়াই না দেখিতেছেন।

'জীবনস্মৃতির' সম্পর্কে অনেকে বলিয়াছেন যে ইহাতে পরিপূর্ণ আত্মোদ্ঘাটন নাই, রুশোর মত স্বীকৃতি নাই। ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথের মানসধারার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রুশোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এবং ব্যক্তিত্বের পার্থক্য যদি অসত্য না হয়, তাহা হইলে দুইজনের আত্মজীবনী কেন এক ছাঁচে গড়া হইবে? তবে রুশোর আত্মজীবনী যেমন বহু দুঃখভোগী বিপ্লবী রুশোর ব্যক্তিত্বে সুবিশিষ্ট, রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

তেমনি রবীন্দ্রনাথের উদাসব্যাকুল কবিত্বমুখ্য ব্যক্তিত্বের সুরে বিশিষ্ট। ষোড়শ শতকের সেলিনী, বিশ শতকের নৃত্য-পটিয়সী ইসাডোরা ডান্‌কান এবং মহাত্মা গান্ধী—তিনজন তিন মার্গের সাধক। ইঁহাদের তিনজনের তিনখানি জগদ্বিখ্যাত আত্মজীবনী এক ছাঁচে গড়া হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী-মূলক রচনাও তেমনি পৃথক ছাঁদের সামগ্রী। তাঁহার সার্থকতা অন্যান্য লেখকের অনুসৃত পথের অনুসারিতায় নহে।

বাহির হইতে ও ভিতর হইতে কি কি কারণ একত্র হইয়া কবির চিত্তের বিকাশের পক্ষে সহায়তা করিতেছিল, এই গ্রন্থ হইতে তাহার ইতিহাসের নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিতেই হইবে। কবির জীবন তাঁহার নিজের ভিতর হইতেই একটী স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ—বাহির তাঁহাকে অল্পই সাহায্য করিয়াছে। সারাল জমিতে বৃক্ষের বাড়িবার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু আপনার অন্তর্নিহিত প্রাণ শক্তির দ্বারাই সে বড় হইয়া উঠে। Wordsworth যে বলিয়াছেন—"Genious is the introduction of a new element in the intellectual universe."—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে কথা খুবই সত্য। দুঃখের বিষয় যেখান হইতে সেই new element এর সূচনা হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার গ্রন্থের সূত্রও কবি ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। কবে একদিন অকস্মাৎ নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, তাহার ইতিহাস ইহাতে আছে; কিন্তু সেই নব-জাগ্রত নির্ঝর যখন লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল, তখনই 'জীবনস্মৃতির' রচয়িতা। তাহার পর সে যে কেমন করিয়া আপনার জন্ম-সংস্কারগত বিশ্বানুভূতিকে নানা বাস্তব সত্যের সঙ্গে ক্রমশঃ সংযুক্ত করিয়া দেশীয় প্রকৃতি ও দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে এবং একদা দেশের প্রাচীনতম সাধনার মূল ধারার সঙ্গে মিশিয়া বৃহৎ ও বিপুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ইতিহাস এ গ্রন্থে নাই। এই ক্রমাবর্ত্তনের ধারা হয়ত ভাবী কবি-জীবন রচয়িতার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল—কিন্তু কবির অন্তরতর জীবনের ভাঙ্গাগড়া জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া যে একটী বড় অভিপ্রায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার রহস্য উদ্ঘাটন কবি ভিন্ন কে করিবে?

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একাদশোঽধ্যায়ঃ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১১।১

(পূর্ব্বাধ্যায়ে ভগবান আত্মবিভূতিসমূহের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ, ইহা শুনিয়া ভগবানের আদ্য ঐশ্বর জগদার্থরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য) অর্জ্জুন উবাচ [অর্জ্জুন বলিলেন] মদনুগ্রহায় [আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য] পরমং [নিরতিশয়] গুহ্যম্ [গোপনীয়] অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ [আত্মানাত্ম-সমন্বয় পুরুষোত্তম-আত্ম বিষয়ক] যৎ [যে বাক্য] ত্বয়া উক্তম্ [তোমাদ্বারা উক্ত হইয়াছে] তেন [তাহা দ্বারা] মোহঃ অয়ম্ [আত্মানাত্ম এই দ্বন্দ্ব মোহ] বিগতঃ [নষ্ট হইয়াছে] মম [আমার]।

অর্জ্জুন বলিলেন তুমি আমাকে অনুগ্রহ করার জন্য যে পরম গোপনীয় আত্মানাত্ম সমন্বয় বিষয়ক বাক্য বলিয়াছ, তাহা দ্বারা আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে। ১১।১

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ১১।২

(মোহাপগমের হেতু বলিতেছেন) হি [যেহেতু] ভবাপ্যয়ৌ [উৎপত্তি এবং প্রলয়] ভূতানাম্ [ভূতসমূহের] শ্রুতৌ [শ্রুত হইয়াছে] বিস্তরশঃ [বিস্তৃতরূপে] ময়া [আমা দ্বারা] ত্বত্তঃ [তোমার নিকট হইতে] হে কমলপত্রাক্ষ [কমলের পত্রের মত অক্ষিযুগল যাহার তিনি, সেই তুমি] মাহাত্ম্যম্ অপি [বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কর্ত্তৃত্ব সত্ত্বেও অধিকারত্ব. শুভাশুভ কর্ম্মের প্রেরক হইলেও অবৈষম্য, বন্ধমোক্ষাদি বিচিত্রফলদাতা হইয়াও অসঙ্গত্ব, ঔদাসিন্য এবং অন্যান্য মহিমাও] অব্যয়ম্ [অক্ষয়]।

হে পদ্মপলাশলোচন, তোমার নিকট হইতে ভূতসমূহের উৎপত্তি ও প্রলয় বিস্তররূপে শুনিয়াছি, এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্যও শুনিয়াছি। ১১।২

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ১১।৩

এবম্ এতৎ [তাহা সেই রূপই ; ইহার অন্যথা হইতে পারে না] যথা আত্থ (যেরূপ বর্ণনা করিয়াছ] ত্বম্ [তুমি] আত্মানং [আত্ম স্বরূপ] হে পরমেশ্বর (তোমার বলা তখনই কার্য্যাত্মক হইবে, সার্থক হইবে, যখন আমি প্রত্যক্ষ দেখিব ; তাই তো) দ্রষ্টুম্ [দেখিতে] ইচ্ছামি [ইচ্ছা করি] তে [তোমার] ঐশ্বরং রূপম্ [জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজঃসম্পন্ন রূপ] হে পুরুষোত্তম।

হে পরমেশ্বর, তুমি যে প্রকারে নিজকে বর্ণনা করিলে, তাহা সেইরূপই, হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার সেই ঐশ্বররূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ১১।৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ১১।৪

মন্যসে যদি [যদি মনে কর] ময়া [অর্জ্জুনের দ্বারা] তৎ [সেইরূপ] শক্যং দ্রষ্টুম্ [দেখিবার শক্তি আছে] ইতি [এইরূপ] হে প্রভো (হে স্বামিন্) হে যোগেশ্বর [সকল ক্ষেত্রের সকল যোগের সকল কৌশলের যিনি ঈশ্বর, তিনিই যোগেশ্বর] ততঃ [তাহা হইলে] মে [আমাকে] ত্বম্ [তুমি] দর্শয় [দেখাও] আত্মানম্ অব্যয়ম্ [অব্যয় আত্মা]।

হে প্রভু, যদি সেইরূপ দেখিবার শক্তি অর্জ্জুনের আছে মনে কর, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর, তুমি আমাকে অব্যয় নিজরূপ দর্শন করাও। ১১।৪

শ্রীভগবান্ উবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ১১।৫

(অর্জ্জুনদ্বারা এইরূপে প্রার্থিত হইলে) শ্রীভগবান্ উবাচ [শ্রীভগবান বলিলেন] পশ্য [দেখ] মে [আমার] রূপাণি [রূপ সমূহ] শতশঃ [শত শত] অথ সহস্রশঃ [সহস্র সহস্র রূপ] নানাবিধানি [অনেক প্রকার] দিব্যানি [দিব্য] (অপ্রাকৃত) নানাবর্ণাকৃতীনি চ [এবং নানাবর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট ; বিলক্ষণ নীল পীতাদি প্রকার বর্ণ সমূহ এবং আকৃতি সমূহ (অবয়বসংস্থান-বিশেষ) যাহাদের তাহারাই নানাবর্ণাকৃতীনি]।

শ্রীভগবান কহিলেন—হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট আমার নানাবিধ শত শত ও সহস্র সহস্র দিব্য রূপ দর্শন কর। ১১।৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ১১।৬

পশ্য [দেখ] আদিত্যান্ [দ্বাদশ আদিত্য] বসূন [অষ্টবসু] রুদ্রান্ [একাদশ রুদ্র] অশ্বিনৌ [অশ্বিনীকুমার দ্বয়] মরুতঃ [সপ্ত সপ্তগণা মোট উনপঞ্চাশৎ বায়ু] তথা বহূনি অপি [বহু বহু] অদৃষ্টপূর্ব্বাণি [এই মনুষ্য লোকে যাহা তোমাদ্বারা বা তোমাছাড়া অপর কাহারও দ্বারা পুর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই] পশ্য আশ্চর্য্যাণি [অদ্ভুত] হে ভারত।

আমার দেহের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ এবং অনেক অদৃষ্টপুর্ব্ব আশ্চর্য্য বস্তুসমূহ দর্শন কর। ১১।৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ১১।৭

(কেবল যে ইহাই, তাহাও নহে, আরও বলি শুন) ইহ [এই আমার দেহে] একস্থং [এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া স্থিত] জগৎ কৃৎস্নং [কৃৎস্ন জগৎ] পশ্য অদ্য [ইদানীং] সচরাচম্ [চর (জঙ্গম) ও অচরের (স্থাবরের) সহিত] মম দেহে [আমার দেহে] যেমন ক্ষুদ্র একটী বীজের ভিতর সমগ্র বৃক্ষটী থাকে] হে গুড়াকেশ [ঘনকেশ] যৎ চ অন্যৎ [জয় পরাজয়াদি আর যাহা কিছু তুমি শঙ্কা করিতেছ] দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি [দেখিতে ইচ্ছা কর]।

হে গুড়াকেশ, এই আমার দেহে সচরাচর জগৎ একত্রে সমাবেশিত রহিয়াছে দেখ, এবং জয়পরাজয়াদি যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও দেখ। ১১।৮

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ১১।৮

তু [কিন্তু] মাং [বিশ্বরূপধর আমাকে] ন শক্যসে [সক্ষম হইবে না] দ্রষ্টুম্ [দেখিতে] অনেন এব স্বচক্ষুষা [নিজের এই রাগদ্বেষস্তরের চক্ষু দ্বারাই] (অতএব পুরুষোত্তম স্তরের যে দিব্য চক্ষু দ্বারা তুমি তাহা দেখিতে সক্ষম হইবে সেই) দিব্য [দিব্য] দদামি [দান করিব] তে [তোমাকে] চক্ষুঃ [পুরুষোত্তমস্তরের দিব্য চক্ষু] পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরং [ঈশ্বর আমার অলৌকিক যোগমায়া শক্তির খেলা দেখ]।

তুমি তোমার এই লৌকিক নিজচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ

হইবে না; তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, আমার ঈশ্বর যোগমায়া রূপ দেখ। ১১।৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ১১।৯

সঞ্জয় উবাচ [সঞ্জয় বলিলেন] এবং [এই রূপ, পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা] উক্ত্বা [বলিয়া] ততঃ [তাহার পর] হে রাজন্ [হে ধৃতরাষ্ট্র] মহাযোগেশ্বরঃ [মহান্ এবং যোগেশ্বর] হরিঃ [পুরুষোত্তম-নারায়ণ] দর্শয়ামাস [দেখাইলেন] পার্থায় [অর্জ্জুনকে] পরমং [পরম] রূপং ঐশ্বরম [বিশ্বরূপ]।

সঞ্জয় বলিলেন, হে মহারাজ, সেই মহান ও যোগেশ্বর হরি-পুরুষোত্তম এই রূপ বলিয়া তাহার পর অর্জ্জুনকে পরম ঈশ্বর বিশ্বরূপ দেখাইলেন। ১১।৯

অনেক-বক্ত্র-নয়নমনেকাদ্ভুত দর্শনম্।
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১১।১০
দিব্য মাল্যাম্বরধরং দিব্য গন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১০।১১

(কেমন রূপ দেখাইলেন?) অনেকবক্ত্রনয়নম্ [অনেক বক্ত্র (মুখ) ও নয়ন (চক্ষু) যাহাতে] অনেকাদ্ভুত দর্শনম্ [অনেক অদ্ভুত (বিস্ময়কর) দর্শন যে রূপে, তেমন] অনেক দিব্যাভরণং [অনেক দিব্য আভরণ সকল যাহাতে, তেমন রূপ] দিব্যানকোদ্যতায়ুধম্ [দিব্য অনেক উদ্যত আয়ুধ (শস্ত্র সমূহ) যাহাতে তেমন রূপ] দিব্যমাল্যাম্বরধরং [দিব্য পুষ্পমালা এবং অম্বর (বস্ত্র সমূহ) ধৃত হইয়াছে যাহার দ্বারা, তেমন] দিব্যগন্ধানুলেপনম্ [দিব্যগন্ধ দ্বারা অনুলেপন যাহার] সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং [সর্ব্ব-আশ্চর্য্যের প্রাচুর্য্যময়] দেবম্ [জ্যোতির্ম্ময়, আলোময়] অনন্তং [অন্ত নাই যাহার, এমন] বিশ্বতোমুখং [সর্ব্বভূতাত্মত্ব বশতঃ সর্ব্বতোমুখ] (নবম শ্লোকের দর্শয়ামাস ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ)।

অনেক মুখ ও নয়ন বিশিষ্ট, নানাবিধ অদ্ভুত দর্শন সম্বলিত, নানারূপ অলৌকিক আভরণ সুশোভিত, নানা দিব্যঅস্ত্রধারী, দিব্যমাল্য বস্ত্রধারী, স্বর্গীয় গন্ধ দ্রব্য ও অনুলেপনার্চ্চিত, সর্ব্ববিধ আশ্চর্য্যময়, প্রকাশাত্মক, অনন্ত এবং সর্ব্বতোমুখ (রূপ অর্জ্জুনকে দেখাইলেন।) ১১।১০-১১

দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১১।১২

(সেই বিশ্বরূপ-ভগবানের যে প্রভা তাহার উপমা দেওয়া হইতেছে) দিবি [অন্তরীক্ষে অথবা দ্যৌঃ নামে প্রসিদ্ধ সর্ব্বোপরি স্থিত তৃতীয় আকাশে] সূর্য্যসহস্রস্য [সূর্য্যগণের সহস্র সহস্র, তাহার] ভবেৎ [হয়] যুগপদুত্থিতা [সমকালে উত্থিত] ভাঃ [প্রভা] সা যদি [সেই প্রভা যদি] সদৃশী স্যাৎ [সদৃশ হয়] তস্য [সেই] মহাত্মনঃ [বিশ্বরূপের] (অথবা সদৃশ হয়-ই না অর্থাৎ তাহা হইতেও বিশ্বরূপে প্রভা ছড়াইয়া যায়)।

আকাশে যুগপৎ সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি উত্থিত হয়, তাহা সেই মহাত্মার প্রভাব সদৃশ হইতে পারে। ১১।১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।

অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১১।১৩

(আরও) তত্র [সেই বিশ্বরূপে] একস্থং [একে স্থিত] জগৎ কৃৎস্নং [সমস্ত জগৎ] প্রবিভক্তম্ [বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্বয়ংমূল্যবান ভেদে বিভক্ত) অনেকধা [দেব পিতৃ মনুষ্যাদি ভেদযুক্তরূপে ; এক ও বহুর, সামান্য-বিশেষের, অভেদ-প্রভেদের সমন্বয়ই বিশ্বরূপ পুরুষোত্তম ; কৃৎস্ন জগৎ 'একস্থ ও প্রবিভক্ত' ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়] অপশ্যৎ [দেখিলেন] দেবদেবস্য [সর্ব্বদেবময় হরির শরীরে] পাণ্ডবঃ [অর্জ্জুন] তদা।

সেই সময় অর্জ্জুন সেই দেবদেবের শরীরে নানা প্রকারে বিভক্ত জগৎ একস্থ দেখিলেন। ১১।১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্ট রোমা ধনঞ্জয়ঃ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১১।১৪

ততঃ (তাহার পর বিশ্বরূপ দেখিয়া) সঃ [অর্জ্জুন] বিস্ময়াবিষ্টঃ [বিস্ময়দ্বারা আবিষ্ট বিহ্বল] হৃষ্ট রোমা [রোমাঞ্চিতাঙ্গ ; হৃষ্ট হইয়াছে রোম সমূহ যাহার, সে] ধনঞ্জয়ঃ [অর্জ্জুন] প্রণম্য [প্রকৃষ্টরূপে নমন করিয়া, বিনীত হইয়া] শিরসা [মস্তকদ্বারা] দেবং [বিশ্বরূপধর] কৃতাঞ্জলিঃ [নমস্কার জন্য হাত জোড় করিয়া অভাষত [বলিলেন]।

তারপর বিস্ময়াবিষ্টো রোমাঞ্চিত-কলেবর অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দেবকে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন। ১১।১৪

(ক্রমশঃ)

মেয়েদের কথা*

রেণু মিত্র

মেয়েদের কথা বলে পৃথক একটা কথা না থাকলেই ভালো হতো—মেয়েদের কথা, হরিজনের কথা, নিম্নবর্ণের কথা, শ্রমিকের কথা—এমনি করে পৃথক পৃথক কথা না থেকে যদি একমাত্র মানুষের কথা থাকত—যে কথা সকলের কথা—তবেই সেটা সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হতো—কিন্তু আজও আমরা সে অবস্থায় পৌঁছাই নি। তাই মেয়েদের কথা বলে পৃথক করে কতকগুলি কথা আছে। আছে বটে কিন্তু সেগুলি আলোচনা করবার সময় আমরা সর্ব্বপ্রথমে মানুষ, তারপর আমরা মেয়ে—এই পটভূমিকাতেই আলোচনা করতে হবে। তা না হলে এর কোনো সত্যিকারের সমাধান নেই।

আমরা মেয়েরাও মানুষ—একটী সমগ্র মানুষ—আমাদের এই ভাবেই ভাবতে হবে। আজকের দিনে আমাদের রাষ্ট্র আমাদেরকে যে সব অধিকার দিচ্ছে, সে সবও আমাদেরকে মানুষ বলে ধরে নিয়েই দিচ্ছে। কালের অনুকূলতায় যে সব অধিকার আজ মেয়েরা পেয়ে গেছি, তা-ও আমরা মানুষ এই কথাটী পিছনে আছে বলেই পেয়েছি।

কিন্তু নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে আমরা কি মানুষ হয়েছি? কিংবা যাতে করে মানুষ হতে পারা যায় আমরা কি তার সাধনা নিয়েছি—আমরা কি সেই মানুষ হওয়ার পথে চলেছি? আমাদের কি কি দরকার সে কথাটা আলোচনা করবার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি আমরা সেই দরকারকে সার্থক করতে, সম্ভব করতে কতটুকু যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছি—কিংবা দিতে পারার প্রচেষ্টা অন্ততঃ কতটুকু করছি—এই আত্মজিজ্ঞাসাটুকুও আজ বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ জিজ্ঞাসা যেমন ব্যক্তিগতভাবে নিজেদেরকে আমরা রোজ করব যে, এই যে আলোবাতাসরূপরসগন্ধে ভরা ভগবানের এই সুন্দর বিশ্বভুবনে আমরা এসেছি—এমন সৌন্দর্য্যকে আমার সকল সত্তা দিয়ে অনুক্ষণ পান করে এই যে আমি বেঁচে আছি—এর জন্য আমি

---

* নিখিলবঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে বিগত ২৯শে মে, ১৯৫৪ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে প্রধান অতিথির অভিভাষণ।

কতটুকু যোগ্য হলাম ? বিশ্বভুবন থেকে এই সব যা কিছু আমি পেলাম, তার জন্য আমি কি দিলাম বিশ্বভুবনকে ? এ প্রশ্ন যেমন আমরা ব্যক্তিগত-ভাবে করব—তেমনি সম্মিলিতভাবে দশজনে যখন আমরা মিলেছি—তখনও করব।

অর্থাৎ এই যা কিছু আমরা পেয়েছি বা যা কিছু আমরা চাইছি তার জন্য আমাদেরকে যোগ্য হতে হবে। মূল্য না দিয়ে যে পাওয়া তা ভিখারীর দান। আমরা যেন ভিখারী না হই।

যোগ্য হওয়া মানে কি ? যোগ্য হওয়া মানে বাইরে চলাফেরা করতে শেখা কিংবা চাকুরী করে অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হওয়াকে শুধু যোগ্য হওয়া বলি নে। যোগ্যতার সেও একটা মাপকাঠী বটে। কিন্তু বিশ্বভুবনের আর সব কিছুর মত নারীও সব কিছুর কাছে যেমন অপেক্ষমান তেমনি একই সঙ্গে সে সব কিছু নিরপেক্ষও বটে—নারীর এই যে মুক্ত আত্ম-চেতনা বোধ বা স্বাতন্ত্র্য বোধ—এই বোধকে জীবনে জাগিয়ে তোলাই যোগ্য হওয়া। নারীর এই আত্মস্বরূপের উপলব্ধি না থাকলে আমরা যা কিছু হতে যাই তাতে আমাদের সৌন্দর্য নষ্ট নয়, কেননা তা ঐকদেশিক ব্যক্তিত্বকে শুধু ফুটিয়ে তোলে, সমগ্র মানুষ হিসাবে নারীকে সুন্দর করে তোলে না। আজকের আমরা তাই বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে নানা যোগ্যতা অর্জন করেছি—কিন্তু আমরা সবশুদ্ধ সুন্দর হই নি। অতীতের প্রতিক্রিয়ায় এবং তার সঙ্গে বর্ত্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতিতে নারী সমাজে যে বিকৃতির অসৌন্দর্য আজ প্রকাশ পেয়েছে, তার কথা ছেড়ে দিয়েই বলা যায় যে, সাধারণ ভাবেই আমরা সুন্দর হই নি—যদিও আমরা অনেক বিষয়ে কুশলতা অর্জন করেছি। সুন্দর হইনি যেহেতু আমরা সামঞ্জস্য হারিয়েছি। অথচ জীবনে ও জগতে সামঞ্জস্যই, মাত্রাবোধই সৌন্দর্য। আজকের দিনে আমরা বুদ্ধির অনুশীলন করেছি, কিন্তু প্রাণের স্নিগ্ধতা আর তার মাধুর্য আমরা হারিয়েছি। কিন্তু যুগের আত্মা নারীর জন্য এই হওয়ার সম্ভাবনাকেই উন্মোচিত করে ধরে নি। সে বলেছিল নারীর যে সৌন্দর্য ছিল তার সাথে নূতন সম্ভাবনার সৌন্দর্যটুকু যোগ করে নিতে। আমাদের ঠাকুমা দিদিমাদের জীবনে যে সৌন্দর্য ছিল, তাকে রক্ষা করেই বর্তমান যুগধর্মে মেয়েদের যে দিকটা আত্ম-প্রকাশ করছে তাকেও গ্রহণ করতে হবে। ঠাকুমা দিদিমারা ছিলেন বিনীতা, আমরা হয়েছি বিদগ্ধা। কিন্তু শুধু বিনীতা হলে মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় না—

সে মর্যাদাহীনতার ইতিহাস আশাকরি আমরা ভুলে যাই নি। যদিও নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে গেলে বিদগ্ধা হওয়াও দরকার, কিন্তু বিনয় বা শ্রদ্ধাই যদি জীবন থেকে চলে যায়—তবে সে শুষ্কতার ঝাঁজে জীবনের মাধুর্য নষ্ট হয়। এ দুটো বিপরীত ধর্ম—দুটো বিপরীতধর্মকে একই সঙ্গে জীবনে ফুটিয়ে তোলা কষ্টসাধ্য সন্দেহ নেই—কিন্তু উপায় কি? আমরা পরের হাতের পুতুলও হতে পারব না, আবার শ্রদ্ধাবিনয় আর মাধুর্যহীন ঝাঁঝালো পণ্ডিতও হতে পারব না। আমাদের সমস্ত হওয়ার পিছনে সমগ্রতার এই ধারণাটুকু রাখতে হবে—তা না হলে বুদ্ধিহীনতার জন্যে ঘরে বাইরে অন্যের দ্বারা অনায়াসেই আমরা শোষিত হই, আর না হলে আমাদের পাণ্ডিত্য আমাদের প্রাণকে শুকিয়ে ফেলে। ঘরে বাইরে মেয়েরা আজ যা হয়েছেন আর আগে মেয়েরা যা ছিলেন—তা দেখে মেয়েদের জন্য এই সমগ্রতার সাধনাই সবচেয়ে প্রয়োজন, সে কথা বার বার মনে হয়।

আমরা যদি সমগ্রভাবে মানুষ হয়ে না উঠি, তবে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি ও পাচ্ছি তা আমরা রক্ষা করতে পারব না। যোগ্য না হলে কেউ কোনদিন অধিকার বজায় রাখতে পারে না—মেয়েদের যোগ্য হতে হবে সেজন্যও বটে এবং আরও এক কারণেও বটে। আমরা যে মুক্তিটুকু পেয়েছি সেটা খানিকটা কালের অনুকূলতায় আকাশ থেকে পাওয়া আর খানিকটা রাষ্ট্রক্ষেত্র থেকে দেওয়া। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজজীবনে রাষ্ট্রই শেষ সমাধানদাতা নয়। যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদ্বারা ভারতবর্ষের সমাজজীবন আধৃত হয়ে আছে, সেখানে নারীর জন্য নূতন কিছু সংযোজিত করতে হলে সেই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে। তা না হলে সমাজ জীবনের গভীরতর প্রদেশে তাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। কেন এবং কেমন করে হয় না, তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

অস্পৃশ্যতা ভারতের সমাজ জীবনের একটা অতি মারাত্মক গ্লানি—এ আমরা সবাই জানি। এই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হয়েছে ভগবান বুদ্ধদেব থেকে—তাই নটীও তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধদেব যে গ্লানি দূর করবার কাজ সুরু করেছিলেন—একদিন নয় দুদিন নয় আড়াই হাজার বৎসর পরে এই সেদিন মহাত্মা গান্ধীকে আবার সেজন্যই লড়তে হয়েছিল কেন, আর তাতেও না পেরে রাষ্ট্রক্ষেত্র থেকে আইনই বা করতে হল কেন? কিন্তু আইন করেও তো সমাধান হল না। আজও তো অভিজাত

ব্রাহ্মণের সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণেতর জাতির সম পর্যায়ে বসে আহার করার সম্ভাবনা এতটুকু হয় নি। অথচ আইন তো হয়েছে। কিন্তু রান্নাঘরের দুয়ারে তো পুলিস বসান যায় না—তাই মনোবৃত্তিকে বদলাতে হয়। মনোবৃত্তি বদলাতে প্রথম প্রয়োজন—যে শাস্ত্র-ব্যবস্থা দ্বারা অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল, শাস্ত্রকে সেইখানে বদলে দেওয়া।

ভাল করে না ভেবে কেউ কেউ এইখানে একটা কথা বলতে চান যে অস্পৃশ্যতা হিন্দুর শাস্ত্র-ব্যবস্থা নয়, কালের গতিতে বিকৃতির ফলে সেটা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সত্ত্বগুণকে কুলীন আর তমোগুণকে অস্পৃশ্য করার ফলেই সত্ত্বগুণীকে কুলীন আর তমোগুণীকে অস্পৃশ্য করে তোলা হয়েছে। সেইখানে না বদলে দিলে রাষ্ট্রক্ষেত্রের বদলানতে শেষ রক্ষা হবে না। মেয়েদের বেলাতেও তাই। হিন্দুর শাস্ত্র-ব্যবস্থাদ্বারা মেয়েদেরকে যেখানে মেরে রাখা হয়েছে—সেইখানে বদলে নিতে না পারলে রাষ্ট্রক্ষেত্রের স্বাধীনতা মেয়েদেরকেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবে না। শাস্ত্রে নারীকে এতদিন পর্যন্ত যে দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে—এক কথায় যেটা হচ্ছে—নারীকে শিক্ষা দিতে হবে, সম্মান দিতে হবে, আর সবই দিতে হবে—কিন্তু যেটা তাকে দেওয়া চলে না সেটা স্বাতন্ত্র্য—নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য থাকবে না—ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি—সব কিছু নিরপেক্ষ নারীর একটা অবস্থা কখনও হতে পারবে না, একজনের অধীন তাকে থাকতেই হবে—এই দৃষ্টি যদি থেকেই যায়, তবে শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্র থেকে আইন প্রণয়ন নারীকে তার যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। তাই মেয়েদের সমস্যা নিয়ে যখন আমরা ভাবি বা তাদের সম্বন্ধে যখন আমরা গুরুতর ও গভীরতর একটা পরিবর্তন আনতে চাই, তখন যেন পিছনের এই পটভূমিকাটা আমরা মনে রাখি এবং অপরকেও সে সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে প্রয়াস পাই। এটা আমাদের একটা মস্ত বড় কাজ।

আজ আমরা মেয়েদের কতকগুলি সমস্যা আলোচনা করবার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। আমাদের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে এ সকল ভাবনার দরকার আছে—সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে যদি একটা সমাধানের পথ ভেবে রাখি—তবে রোজকার চলার পথে সেটা নিশানার কাজ করবে। তাই সমবেতভাবে এই সমস্ত আলোচনারই যথেষ্ট মূল্য আছে। আপনাদের সঙ্গে এ আলোচনায় যোগ দিতে পেরে আমি সুখী হয়েছি। তবে মেয়েদের সমস্যাকে যে আরও একটা দিক থেকে দেখার প্রয়োজন রয়েছে, আমি সেই দিকটাকে

আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়—আমি শুধু আভাস দিয়ে গেলাম। আর নিজেদেরকে যে আমাদের একটা সামগ্রিক ভাবধারাকে লক্ষ্য রেখে যোগ্য করে তুলতে হবে, নইলে ভেতরে ভেতরে যে আমরা কেবলই দীন হতে দীনতর হয়ে যাচ্ছি—সে কথাটাও যে আমাদের খুব বেশী করে মনে রাখতে হবে—এই কথাটাই আমি মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

আরও একটা কথা—অর্থনৈতিকই হোক বা সামাজিকই হোক—যে কোন বিষয়েই আমরা আলোচনা করি না কেন কিংবা আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে প্রস্থাপন কবতে প্রয়াস পাই না কেন, আমরা যেন কখনও সংঘর্ষের পথে না যাই। সামাজিক সমস্যার আলোচনায় পুরুষকে যেন না আমরা আমাদের বিরুদ্ধ বা বিপক্ষ বলে মনে করি—তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বা অপর পক্ষকেও যেন আমরা বিপক্ষ বলে ধরে না নেই। উভয় পক্ষ মিলেই একটি সমগ্র পক্ষ, সমগ্র বস্তু—এই কথাটা গোড়ায় মনে রেখে যেন আমরা সমস্ত আলোচনা চালাই। সংঘর্ষের পথে কোন সত্যিকারের সমাধান নেই।

যাই হোক, মানুষের সামগ্রিক পরিচয় নিয়ে মেয়েদের দাঁড়াতে হবে—তাই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনের সাথে সাথে পরিপূর্ণ প্রাণের মাধুর্যকে সঙ্গে রাখতে হবে। আমরা শুধু নারী হব না—আমরা পুর্ণ মানুষ হব—পুর্ণ মানুষ হতে ঐ দুটোরই সমান প্রয়োজন। দুর্বল হয়ে, বুদ্ধিহীন হয়ে আমরা সহজেই অন্যের দ্বারা শোষিত হব না, আবার বুদ্ধিমান হয়ে উঠে শোষণ করার মনোবৃত্তিও যেন আমাদের পেয়ে না বসে। শোষিত হওয়ার আর শোষণ করার—এই দুই মনোবৃত্তি থেকেই যেন আমরা মুক্ত থাকতে পারি। বর্তমান নারী প্রগতি যে অসৌন্দর্য আর উচ্ছৃঙ্খলাকেও সঙ্গে বহন করে এনেছে, তা থেকে আমাদের উপরে উঠতে হবেই—পেছনে সরে গিয়ে আমরা জড় পিণ্ডবৎ হতে পারবনা—এগিয়ে তাই যেতেই হবে। কিন্তু সব সময় মনে রাখতে হবে জীবন থেকে সামগ্রিকতার সৌন্দর্য যেন কিছুতেই আমরা হারিয়ে না ফেলি। 'পুরুষ কর্ম করে, স্ত্রী শক্তি দেয়। মুক্তির রথ কর্ম, মুক্তির বাহন শক্তি।' শক্তিদাত্রী আমরা যেন নিজেদের আর অপরেরও মুক্তির বাহন হই। 'যা বেঁধে রাখে পশুর মতো প্রকৃতির গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের গড়া দাসত্বের শৃঙ্খলে'—নিজেদের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে তেমন কোন বন্ধনই যেন আমরা সৃষ্টি করে না তুলি বা স্বীকার করে না নেই। বিশ্বভুবনের সব কিছুকে আমরা

যেন বীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি আবার প্রয়োজন হলে বীর্যের সঙ্গেই ত্যাগ করতে পারি—এই গ্রহণ করার ও ত্যাগ করার শক্তি উভয়ই যখন আমাদের থাকবে, তখনই সামগ্রিকতার সৌন্দর্য জীবনে রক্ষিত হবে—তখনই পূর্ণ মানুষ বলে পরিচয় দেওয়া সার্থক হবে, সত্য হবে।

পুস্তক পরিচয়

'পরিচয়'—শ্রীসন্তোষ কুমার দে। মূল্য ২॥০ টাকা। প্রকাশক স্বপ্রকাশ বসু, ৩২ মহেশ বারিক লেন, কলিকাতা ১১।

ছাব্বিশটী গল্পের সংকলন এই 'পরিচয়'। বাংলা ভাষায় গল্পের অভাব নাই, গল্পের বইরও অভাব নাই। গল্প পড়া যাহাদের নেশা বা ব্যবসা—সকল গল্পই বোধ হয় তাঁহারা পড়িতে পারেন, কিন্তু আমরা জানি সকল গল্প পড়া যায় না। কিন্তু এ গল্পগুলি কেবল যে পড়া যায় তাহা নয়, পড়িয়া তৃপ্তি হয়। বিকৃত মনস্তত্ত্বের খচখচি নাই—মানুষের হৃদয় বৃত্তির ছোট বড় খোঁচাগুলি এমন মধুর হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, গল্পটি মিলনান্তই হউক আর বিয়োগান্তই হউক—ভাল লাগে। অনেকগুলি গল্পই বুকের মধ্যের এমন একটা নরম তন্ত্রীকে আঘাত করে যে, তার রণনটুকু বেশ খানিকক্ষণ ঝন ঝন করিতে থাকে। লেখক কেবল গল্প লিখিতেই পটু নহেন, একটা কবি মন তাঁহার সত্তার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে—সে কবিত্ব কেবল তাঁহার সুন্দর ভাষার মধ্যে নাই—যে চোখে তিনি দেখেন, যে মনে তিনি ভাবেন—তাহারা কবিত্বধর্মী—তাঁহার রচনা এই জন্যই এত মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে।

'দুধ' বলে ছোট গল্পটি বাস্তহারার অবচেতন সত্তার মর্ম্মন্তুদ কান্নার ইতিহাস। কিন্তু বাবার বুকের বেদনা যে ছেলের চোখ দিয়া ঝরে, বাবার হৃদয়কে উপলব্ধি করিবার হৃদয় বা দৃষ্টি যে ছেলের আছে—এইটুকু সংবাদ যেন আজিকার হৃদয়হীনতার সাহারার মরুভূমির মধ্যে বুকের মধ্যটা কেমন ভিজাইয়া তোলে।

'রোমন্থন' গল্পটি আরও করুণ। সরোজের অবাধ ব্যবহারটা যে তাহার স্ত্রীকে অবাধ্য করিয়া তুলিবে—এ খবর সে জানিত না। সতেরো বছর পরে

নিজেরই শিক্ষাদানের কিংবা ব্যবহারের দোষে যে দুঃখ সরোজকে আজ পাইতে হইতেছে, তাহা সংশোধন করিবার ক্ষমতা এখন আর তাহার নিজের কাছে নাই। রোগ শয্যায় পড়িয়া এ দুঃখ সে সহ্য করিবে কেমন করিয়া? মাঝে মাঝে বিভেদ যে পথে অন্ত হইবে বলিয়া সে মনে করে, তাহাও তো পথ নহে—সরোজের এই দুঃসহ অসহায় অবস্থাকে লেখক যে ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন—তাহা একই সঙ্গে গভীর বেদনার আর গভীরতর মনস্তাত্বিক দৃষ্টির পরিচয় দেয়। মানুষের সঙ্গের ব্যবহারকে যেমন অবাধ রাখিতে হয়, তেমনি বাধাও তাহাকে দিতে হয়—এই ইঙ্গিতই করিয়া ইহার সমাধানকেও লেখক রাখিয়াছেন। জীবনের বিভিন্ন দিকের এমন কি গভীর দারিদ্র্যেরও যে ইতিবৃত্ত এক একটা গল্পের এধারে ওধারে ছড়ান রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার জন সংযোগের আভাস দেয়।

অনাবিল আনন্দদানে সমর্থ এই গল্প বইটির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

স্মৃতি

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদনাবিধুর সাঁঝে স্মরণের নীহারিকা হ'তে—
ভেসে আসে স্মৃতিগুল্ম স্বপ্নাবেশ স্রোতে—
সন্ধ্যার মন্দ্রেতে আজ সে স্বপ্নে হয়েছি আকুল—
ঝরিয়া পড়েছে যেন স্মৃতি কুঞ্জে বেদনা-বকুল।
শতধৌত সে স্মৃতিমা অতি কান্তি পীযূষ ধারায়—
বিচ্ছুরিত সন্ধ্যালোকে ক্ষণে ক্ষণে সম্বিৎ হারায়
চরণের ছন্দে যেন জেগে আছে ঊর্মিল নাচন—
সে ছন্দে টুটে যায় বেদনার অনন্ত বাঁধন।
মৌনস্মৃতি খুঁজে ফেরে অতীতের স্বপ্ন শত শত—
সুষুপ্তা কেতকীর, নিশীথের বাসনার মত।
ধরণীর ধূলি কণা হবে কভু দিগন্তে নিলীন
স্মৃতির স্পন্দন তবু রবে দীপ্ত চির অমলিন।

নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষায় পাঠদান পরিকল্পনা

সুবোধকুমার সেনগুপ্ত

শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠদান সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রয়োজন বর্ত্তমান সময়ে বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন পুর্ব্ব হইতেই পরিকল্পনার প্রয়োজন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহাই। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রভাব। পুর্ব্ব হইতে পরিকল্পনা না করিয়া চলিলে দেখা যায় কাজগুলি ঠিকমত দানা বাঁধিয়া উঠে না, এবং শেষ রক্ষাও কোন কোন ক্ষেত্রে হয় না। আইন-ব্যবসায়ী তাঁহার 'কেস্' সম্পর্কিত সওয়াল জবাবের জন্য পুর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হন; ইঞ্জিনিয়ার বাড়ী তৈয়ারী করিবার পুর্ব্বে বাড়ীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া থাকেন; সৈন্যাধ্যক্ষ প্রতি-পক্ষকে আক্রমণ করিবার পুর্ব্বে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কথিত আছে নেপোলিয়ন ঘরে বসিয়াই, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পুর্ব্বেই যুদ্ধ জয় করিতেন, অর্থাৎ তিনি নিখুঁত পরিকল্পনা করিয়া পরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। অতএব দেখা যাইতেছে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই পুর্ব্ব পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিকল্পনার স্থান থাকিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি।

পুর্ব্ব হইতেই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনাকে স্থান দেওয়া হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কিভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাই হইতেছে প্রশ্ন। পুর্ব্বে ছিল পুস্তক কেন্দ্রিক শিক্ষা, কতকগুলি পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা ছিল সারা বৎসরের কাজের ইঙ্গিত। পুর্ব্বে বৎসরের ছুটির কয়দিন অর্থাৎ ৫২টি রবিবার ও ৮৫।৯৫ দিন অন্যান্য ছুটি, এই কয়দিন ৩৬৫ দিন হইতে বাদ দিয়া যে কয়দিন থাকিত, তাহাতে আবার শনিবারের অর্দ্ধেক দিনের কথা বিবেচনা করিয়া, বৎসরের মোট সময় বাহির করা হইত। পরে এই মোট সময়কে বিভিন্ন পুস্তকের মোট পৃষ্ঠায় মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। ইহাই ছিল পাঠ পরিকল্পনার গোড়ার কথা। শিক্ষনীয় বিষয়গুলিকে প্রয়োজনীয়তা ও কাঠিন্যের দিক হইতে বিচার করিয়া সময়ের হ্রাসবৃদ্ধি করার নিয়ম ছিল। কিন্তু এইরূপ পরিকল্পনা আজ অনেক কারণে অচল হইয়া পড়িয়াছে। বৎসরের কতটুকু

সময় শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে ব্যয়িত হইবে, তাহা যেভাবে বাহির করা হইয়াছে, সেইভাবে আজও সময় বাহির করিয়া লওয়া হইবে, কিন্তু সে সময়টা পুস্তকের মোট পৃষ্ঠার মধ্যে বিভক্ত হইবে না, তাহার প্রথম কারণ মোট পুস্তক ও মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা আমাদের জানা নাই, অতএব সময়কে পৃষ্ঠানুযায়ী ভাগ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাহা হইলে শিক্ষা-পরিকল্পনার পরিবর্ত্তনের কারণ কি ?

শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তনের ফলেই পাঠ-পরিকল্পনার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা বলিতে কয়েকটি শিক্ষনীয় বিষয়কে আয়ত্ত করা শুধু নয়, প্রকৃত শিক্ষা বলিতে শিশুর সামগ্রিক বিকাশসাধন বুঝায়। এই কারণেই বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিশুর সমস্ত রকম বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। তাই শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্য যখন অত বিরাট, তখন শিক্ষাদান-পরিকল্পনা তথা পাঠদান পরিকল্পনাও যে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি।

দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান সময়ে শিশুর শিক্ষাসম্পর্কীয় ধারণা সম্বন্ধে এক বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে শিশু মানসিক ক্ষমতা পরিচালনা দ্বারা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করিত এবং শিশুর শিক্ষা লাভ বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যেই সম্পাদিত হইত বলিয়া সকল শিক্ষাবিদের ধারণা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সকল শিক্ষাবিদই বিশ্বাস করেন যে, শিশু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ করে এবং অভিজ্ঞতা লাভ বিদ্যালয় কিংবা বিদ্যালয়ের বাহির উভয় স্থানেই হইতে পারে। এই কারণেই শিশুর অভিজ্ঞতা যাহাতে উপযুক্ত ধারায় লাভ হইতে পারে সেই জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের অধীনে শিশু যাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু কোথায় ও কিভাবে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে তাহাও শিক্ষকের পাঠদান পরিকল্পনার বিষয়ীভূত।

তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান নূতন শিক্ষার ধারায় পাঠ্যক্রমের রদবদল হওয়ার ফলে পাঠদান পরিকল্পনা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষায় পাঠ্যক্রম শিশু এবং শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে। এই অবস্থায় শিশুর আগ্রহ, অনাগ্রহ, ইচ্ছা অনিচ্ছা, ঔৎসুক্য ইত্যাদিকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দান করিয়া পাঠ পরিকল্পনা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য

এইরূপ সামগ্রিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব্বে কখনও পাঠ-পরিকল্পনা করা হইত না।

পাঠ-পরিকল্পনাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বেশী দিনের জন্য পরিকল্পনা। শ্রেণীর সমস্ত শিশু সম্পর্কে সমগ্র বৎসরের বা একটি বৎসরাংশের (termএর) জন্য পাঠ পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। যদি বৎসরাংশের জন্য পরিকল্পনা করা যায় তাহা হইলে সমগ্র বৎসরকে কল্পনাধীন রাখিয়া তবে বৎসরাংশের পরিকল্পনা করা যাইতে পারিবে। এইরূপ পরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্ম্মের ইউনিট স্থির করিয়া লওয়া হইবে এবং শ্রেণীর বিভিন্ন দলগুলি কিভাবে সম-অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যাপৃত থাকিবে, তাহার ইঙ্গিত থাকিবে।

দ্বিতীয় প্রকারের পরিকল্পনা হইতেছে প্রথম পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত কোন একটি কাজের ইউনিট সম্পর্কে। প্রথম পরিকল্পনা হইতে ইহার ব্যাপ্তি স্বভাবতঃই ছোট। এইরূপ কাজের ইউনিট কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া শিশুরদল ও শিক্ষক উভয়ে মিলিয়া করিবেন এবং কর্ম্মের বিভিন্ন অংশগুলিকে শিশুর জীবনের ক্ষেত্রে আনিয়া উহাদিগকে উপযুক্তভাবে শিশুদের দ্বারা শিক্ষক সম্পাদন করাইবেন, তবেই শিশুর সামগ্রিক বৃদ্ধির আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে। দ্বিতীয় প্রকারের পরিকল্পনারই অংশবিশেষ হইতেছে তৃতীয় পরিকল্পনা বা দৈনিক পাঠদান-পরিকল্পনা। ইহা কাজের ইউনিটেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

বৎসর বা বৎসরাংশের পরিকল্পনা

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যক্রম (curriculum) জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হেতু পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং উহা শিশুর আগ্রহ, ঔৎসুক্য, কর্ম্মক্ষমতা, বয়স ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইতেছে। শ্রেণীর পাঠ্যক্রম এই হিসাবে অত্যন্ত নমনীয় হইলেও কয়েক বৎসর যাবৎ শিশুদের কাজের ধারা ও তাহাদের ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের সামগ্রিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য কতকগুলি জিনিষের অনুশীলন প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইতেছে ঐ শ্রেণীর সাধারণ পাঠ্যক্রম। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে ঐ শ্রেণীর শিশুদের ঐ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরিচালনা করা প্রয়োজন। নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যযুক্ত আদর্শ ও শিশুর

মধ্যে যে ব্যবধান তাহা পরিপুরণ করিবার জন্য কতকগুলি কাজের ইউনিট সম্পাদন আবশ্যক। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে কাজের ইউনিট সম্পাদিত হইলেই শিশুর প্রয়োজনীয় সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হইবে, কিন্তু অন্যান্য শিক্ষাবিদের মতে কাজের ইউনিট সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে সুসমঞ্জস শিক্ষদানের জন্য পুস্তকের ধারা অনুযায়ী বিষয়-শিক্ষাদানেরও প্রয়োজন আছে। মতভেদ যাহাই হউক না কেন এটা স্থির নিশ্চিত যে, কতকগুলি কাজের ইউনিট সম্পাদনের মধ্য দিয়াই শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের সম্ভাবনা এবং সেই হেতু শিক্ষককে বৎসরের জন্য বা বৎসরাংশের জন্য কাজের বিভিন্ন ইউনিটের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কাজের ইউনিট

কর্ম্ম পরিকল্পনার মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের পরিকল্পনার, অর্থাৎ একটি নির্দ্দিষ্ট ইউনিট সম্পর্কেই আলোচনা এইখানে নিবদ্ধ থাকিবে। কাজের ইউনিট বলিতে কি বুঝিতে পারা যায় এবং তাহার বৈশিষ্ট্য কি সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে পারা যায়।

ইউনিট বলিতে একটা একত্রীভূত ভাবের সমাবেশ—এইরূপ একটা অর্থ প্রকাশিত হয়। পুর্ব্বের শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন পাঠগুলিকে বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া শিক্ষাদান করা হইত, কর্ম্মের ইউনিট অনুসরণের ক্ষেত্রে কিন্তু তাহা নয়। কাজের ইউনিট একটা সামগ্রিক বিকাশ ইঙ্গিত করে এবং উহার সঙ্গে বিজড়িত থাকে কতকগুলি একত্রযুক্ত অর্থপুর্ণ কর্ম্মসমূহ। শিশু প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট কাজ করিতে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করে, এমনই থাকে কাজের ভিতরে গাঁথুনি।

কাজের ইউনিটের মধ্যে আরম্ভ ও শেষ সুচিত করিয়া থাকে। ফলে সমগ্র কাজ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা শিশুদের জন্মিয়া যায়।

কাজের ইউনিটের মধ্যে শিক্ষনীয় উদ্দেশ্য খুবই সুস্পষ্ট। শিশু এই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা করিবার সুযোগ পায়।

কাজের ইউনিটের মধ্যে শিশু কাজ করিতে করিতে অগ্রসর হয় বলিয়া তাহার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রও পরপর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অতএব শিশুর কাছে নূতন অভিজ্ঞতা আনন্দপুর্ণ ভাবে প্রতিভাত হয়।

ইউনিটের স্বরূপ বুঝিতে পারা গেল। এখন কাজের ইউনিটের ব্যবস্থাপনা কিরূপভাবে হইবে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

শিশুদের সঙ্গে সহযোগিতায় একটি সমস্যা উদ্ভাবন করিতে হইবে।* কি প্রণালীতে 'সমস্যা' উদ্ভাবিত হইতে পারে? প্রথমে শিক্ষক শিশুদের কথাবার্ত্তা, আগ্রহ, আলোচনা ইত্যাদি হইতে কি সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। শিশুর ইঙ্গিতকে সমস্যার আকার দিতে যতটুকু আলোচনার প্রয়োজন, তাহা শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে করিবেন।

সমস্যা একবার স্থির হইয়া গেলে শিক্ষক শিশুকে ঐ সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়া কতটুকু শিক্ষা দিতে পারেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই স্থানেও ইহাকে দুইটি বিশেষ দিক হইতে আলোচনা করিয়া দেখিতে পারা যায়। প্রথমে সমস্যা সম্পর্কিত কি কি শিক্ষা শিক্ষক শিশুকে দিবেন, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক কিভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিবেন।

কাজের ইউনিট আরম্ভ করা সম্পর্কে শিক্ষককে নানাদিক বিবেচনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। পুর্ব্বে যে কোনও কাজ শিশুর ইচ্ছা বা আগ্রহ ব্যতিরেকই আরম্ভ করা হইত। এখন কোন কাজের ইউনিটের যে অংশে শিশুর আগ্রহ বা ঔৎসুক্য নিবদ্ধ, সেইখান হইতেই শিশুকে অভিজ্ঞতা দান আরম্ভ করিতে হইবে।

এই কাজের ইউনিট সম্পাদনার মধ্যে শিশু যেসমস্ত কাজ করিবে, তাহার একটা তালিকা শিক্ষকের পক্ষে রাখা উচিত। কাজের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু নানা কাজ, যথা—খবর সংগ্রহের নিমিত্ত পড়া, অভিজ্ঞতা অর্জ্জন সম্বন্ধে রিপোর্ট দান, জিনিষ তৈরী, ছবি আঁকা, লেখা ইত্যাদি বহুরকম কাজ করিতে পারে,—এইগুলি সকলই শিশুর স্বয়ংকর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মের হিসাব শিক্ষক রাখিবেন।

ইউনিটের কাজের সঙ্গে আনুসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার কি ব্যবস্থা করা যায় তাহার সম্ভাব্যতা স্থির করিতে হইবে শিক্ষককেই। ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে সেই কর্ম্মের ইউনিটের সহজ যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাহার মাধ্যমে শিক্ষার বন্দোবস্ত করা যায়।

---

* কিরূপভাবে কাজের ইউনিট স্থির করিতে হইবে, তাহা 'কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা'র অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

শিক্ষক শিশুদের সাহায্য লইয়াই কাজের সমস্যা স্থির করিয়াছেন এবং সেই সমস্যাকেই কেন্দ্র করিয়া কাজের ইউনিট গড়িয়া উঠিয়াছে। এই যে কাজের ইউনিট, ইহার পরিচালন বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে শিশুদের প্রয়োজন, আগ্রহ এবং ক্ষমতার উপর। শুধু তাহাই নয় শিশুদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা, আবেষ্টনীতে কাজ করিবার মত বস্তুসম্ভার ইত্যাদিও কাজের ইউনিটের পরিচালন-সাফল্যকে যথেষ্টভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ শিশুদের কোন একটি কাজের ইউনিটের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইলে আবেষ্টনীগত প্রভাব শিশুদের মধ্যে এতদূর হওয়া উচিত যে, শিশুরা যেন ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াই সেই কাজে অগ্রসর হয়। এই কারণে বিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যেই এমনভাবে সমস্যাকে জিয়াইয়া রাখিতে হইবে যে, শিশুরা যেন স্বাভাবিক আকর্ষণেই সমস্যা সমাধান করিতে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে।

তৃতীয়তঃ কাজের ইউনিট যাহাতে শিশুদের কর্ম্মের উৎসাহকে সর্ব্বদা পরিবর্দ্ধিত করে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মপরিচালনা করিতে হইবে। শিশুরা যেন সুচিন্তিত যুক্তি ও বিচার প্রয়োগ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারে, তাহারা যেন স্বীয় ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের জন্য উপযুক্ত অভ্যাসগুলি গঠন করিতে সুযোগ পায় এবং পরিশেষে শিক্ষনীয় বিষয়গুলিতেও যাহাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেদিকে দৃষ্টিদান করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিশুদিগকেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিবার অবকাশ ও সুযোগ দিতে হইবে। ইউনিটের পরিকল্পনা এমনভাবেই করিতে হইবে যাহাতে কাজগুলিই শিশুদের মনে কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে। শিশু অনুসন্ধান করিতে করিতে এমনভাবে চুলচেরা বিচার করিয়া অগ্রসর হইবে যে কার্য্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশু প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হয়।

কাজের ইউনিট সম্পর্কে একটি উদাহরণ

একটি গ্রামের বিদ্যালয়ে দেখা গেল শিশুরা সকলেই প্রায় পেটের রোগে ভুগিতেছে। চতুর্থ শ্রেণীর শিশুরা, তাহাদের প্রাত্যদিনকার খবরের মধ্যে তাহাদের পেটের রোগের কথা প্রায়ই উল্লেখ করে, যথা—আজ রমা আসতে পারেনি কারণ তার আমাশয় হয়েছে, ইত্যাদি। শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে

নানা আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গ্রামের জলের অসুবিধার কথা শিশুমনে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই তিনি শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া 'সমস্যা' স্থির করিলেন।

সমস্যা—গ্রামে জলের অসুবিধা ও রোগের উৎপত্তি।

সমস্যা স্থির হইলে পর শিশুরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া শিক্ষকের সাহায্যে অনুসন্ধানপত্র তৈয়ারী করিয়া জল সরবরাহ ব্যবস্থা লক্ষ্য করিবে।

পুকুরে একদল শিশু যাইবে এবং কিভাবে পুকুরের জল দূষিত হইতেছে, তাহা অনুসন্ধানপত্রে লিখিয়া আনিবে।

সেই পুকুর হইতে কোন্ কোন্ পরিবার জল নেয় এবং সেই সকল পরিবারে কোনো রোগ হইয়াছিল কিনা, কি জাতীয় রোগ এবং এখনও সে সব পরিবারে কেহ অসুস্থ আছে কিনা তাহার হিসাব একদল শিশু লইবে।

যে যে চিকিৎসক ঐ সকল পরিবারে চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের নিকট একদল শিশু যাইয়া ঐসকল রোগ জলবাহিত কিনা তাহা জানিবে।

সমস্ত দলগুলি তখন শিক্ষকের সঙ্গে বসিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রামে জলের অসুবিধা এবং তাহার ফলে কিভাবে রোগের উৎপত্তি হইতেছে তাহা বিচার করিয়া দেখিবে। জলের অসুবিধা দূর হইলে রোগের প্রাদুর্ভাবও কমিয়া যাইবে এই সিদ্ধান্তে তাহারা আসিবে।

শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে দিবেন।

শিশুরা জল সম্বন্ধে পড়াশুনা করিবে; জল কিভাবে দূষিত হয় তাহা পুস্তক হইতে দেখিয়া লইয়া নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবে; জল বিশুদ্ধ করিবার প্রণালী সমূহ তাহারা বিভিন্ন পুস্তক হইতে পড়িয়া লইবে; তাহারা বিভিন্ন পুকুরের জল কি ভাবে দূষিত হয় তাহা একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করিবে; প্রত্যেকের খাতায় জল সম্বন্ধীয় আরও অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ থাকিবে; জল বিশুদ্ধীকরণের নিয়মাবলীও এই খাতায় থাকিবে; খাতার মলাটে সুন্দর ডিজাইন থাকিবে। শিশুরা এই সমস্যা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয় যথা পড়া, লেখা, অঙ্ক করা ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিবে।

এইবার এই সমস্যা সম্বন্ধীয় কাজ আরম্ভ হইবে। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া শিশুরা বিভিন্ন জল প্রাপ্তির স্থানগুলি, যথা পুকুর, কূয়া ইত্যাদির মডেল তৈয়ারী করিবে ও ছবি আঁকিবে এবং জল কিভাবে দূষিত হয় তাহা

দেখাইবে। একটি ভিন্ন মডেলে সংরক্ষিত পুকুর ও সংরক্ষিত কুয়া হইতে পানীয় জল নেওয়ার উপকারিতা দেখাইবে। প্রতি অবস্থার ছবি অঙ্কিত হইবে।

জল বিশুদ্ধীকরণের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া শিশুরা জল বিশুদ্ধ করিতে শিখিবে। প্রত্যেক কাজের মডেল শ্রেণীকক্ষে থাকিবে। প্রত্যেকটি উপায় সম্বন্ধে শ্রেণীকক্ষে জল বিশুদ্ধীকরণের পরীক্ষাকার্য্য চলিবে।

শিশুরা প্রথম অবস্থায় অনুসন্ধান কার্য্য দ্বারা সমস্যাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে, দ্বিতীয় অবস্থায় চিকিৎসক ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া সমস্যাটি সম্বন্ধে পুস্তকাদি হইতে বিভিন্ন তথ্য আহরণ করিয়াছে। তৃতীয় অবস্থায় শিশুরা মডেল তৈয়ারী করিয়া নানারকম পরীক্ষাকার্য্য চালাইয়া জল বিশুদ্ধ রাখিবার এবং বিশুদ্ধ জল গৃহে কিভাবে ব্যবহার করিয়া রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। চতুর্থ ধাপে শিশুরা তাহাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে গ্রামের সকলের কাজে লাগাইবার জন্য কয়েকটি পোষ্টার তৈয়ারী করিয়া গ্রামের সকলকে এ বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য পুকুর ও কুয়ার কাছে লাগাইয়া রাখিবে।

এইরূপ কাজের ইউনিটের মধ্য দিয়া শিশুরা শুধু জল সম্বন্ধেই নানা তথ্য অবগত হইল না, এই সমস্যার সঙ্গে বিজড়িত আরও নানা বিষয় সম্বন্ধেও তাহারা অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। সংক্ষেপে শিশুদের জ্ঞানের পরিধি কিভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হইতেছে।

শিশুরা বিভিন্ন পুস্তক হইতে **পড়ে** (১) জল সম্বন্ধে (২) জল দূষিত হওয়া সম্বন্ধে (৩) জল বিশুদ্ধীকরণ সম্বন্ধে (৪) জলবাহী রোগ সম্বন্ধে (৫) জলবাহী রোগের প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে ইত্যাদি।

শিশুরা **লেখে** (১) যাহা বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, (২) নিজে হাতে কলমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, (৩) পরীক্ষা-কার্য্যের রিপোর্ট, (৪) অনুসন্ধানসম্পর্কীয় উত্তর, (৫) জলসম্পর্কিত বিভিন্ন গল্প, (৬) জলসম্পর্কিত অভিনয়, ইত্যাদি।

শিশুরা **ছবি আঁকে** (১) বিভিন্ন পরীক্ষাকার্য্যের ছবি, (২) রোগের জীবাণু, (৩) রোগ সংক্রমণ, (৪) বইয়ের মলাট ইত্যাদি।

শিশুরা **অঙ্ক করে** (১) দূরত্ব সম্পর্কীয়, (২) বর্গক্ষেত্র সম্পর্কে ইত্যাদি।

তাহা ছাড়া শিশুরা স্বাস্থ্যরক্ষা, বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি সম্বন্ধেও আংশিক ভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে।

প্রথম দুই প্রকারের পাঠ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এইক্ষণে তৃতীয় প্রকারের পরিকল্পনা অর্থাৎ দৈনিক শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বেও দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষক শ্রেণীপাঠনার সময়কে বিভিন্ন বিষয়ের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া প্রতি বিষয়ের জন্য যতটা সময় নির্দ্ধারিত হইত তাহা বাহির করিয়া বিষয়গুলিকে কঠিন ও সহজ এইভাবে সাজাইয়া দিনের পাঠ পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত করিতেন। দিনের প্রথম অবস্থায় মন যখন সহজ ও সতেজ থাকে তখন দেওয়া হইত কঠিন বিষয়, তারপর সহজ বিষয়। এইরূপ ভাবে শিশুর মস্তিষ্কের উপর চাপ লাঘব করিয়া বিষয়গুলি সাজাইলেই পাঠ-পরিকল্পনার কর্ত্তব্য শেষ হইত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার গতি ভিন্নমুখী হইয়াছে; অতএব পাঠ-পরিকল্পনাকে অত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। শিশুর জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া যে শিক্ষা সেই শিক্ষার জন্য যেমন কাজের ইউনিটের পরিকল্পনার প্রয়োজন, তেমনি দৈনিক কাজেরও ভিন্নরূপ বিলিব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু অনেক শিক্ষাবিদ দৈনিক পাঠদান পরিকল্পনার যৌক্তিকতাকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে যেহেতু শিশুর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া শ্রেণীর কর্ম্ম সম্পাদনা হইবে, সেইহেতু দিনের কর্ম্মকে একটি কাঠামোর মধ্যে বাঁধিয়া রাখা উচিত হইবে না। এইরূপ ভাবে সময়-পত্র পরিহার করা খুব ভাল কিন্তু অভিজ্ঞ শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হইলেও নূতন শিক্ষাব্রতীর কাছে সময়-পত্রের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। সময়-পত্র নমনীয় হউক এবং প্রয়োজনবোধে উহাকে যথাসম্ভব শিথিল করা যাউক, কিন্তু তবুও একটা সময়-পত্র এবং তাহাতে কাজের পরিকল্পনার ইঙ্গিত থাকিলে কাজ সহজ হইয়া আসে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান সময়ে পাঠ পরিকল্পনা শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহের ভিত্তিতেই হইয়া থাকে। শিশুর প্রয়োজন হইতেছে খেলা, খাওয়া, কাজ করা, শিক্ষা করা, ঘুমান, সৃষ্টি করা, ব্যক্তিগত চাহিদাকে অনুসরণ করা ও দলের মধ্যে থাকিয়া আনন্দ অনুভব করা। যখনই শিক্ষক শিশুর পূর্ব্বোক্ত জীবনগত অভিজ্ঞতাকে পাঠ্য ক্রমে যথার্থ মূল্য দিবেন, তখনই দৈনিক পরিকল্পনা শিক্ষকের নিকট সহজ হইয়া আসিবে। সময়-পত্রকেও প্রয়োজনবোধে যেভাবে ইচ্ছা অদল বদল করিতে আর আপত্তি থাকিবে না।

শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে সে সমগ্রভাবে বৃদ্ধি পাইবে, জীবনের কোন অংশের বিকাশই তাহার ব্যাহত হইবে না। অতএব শিক্ষকের পাঠ-পরিকল্পনার মধ্যে শিশু কোন্ লক্ষ্য বস্তুতে যাইয়া পৌছাইবে তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত থাকিবে। শিশুকে দলগতভাবে কাজ করিতে, নাচিতে, গাহিতে, খেলা করিতে এবং ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা কার্য্যে রত থাকিতে, হাতের কাজ করিতে, লিখিত বিষয় পাঠ করিতে, পড়িতে অনুসন্ধান করিতে ইত্যাদি সমস্ত রকম কাজ করিতে দেখা যাইবে। এই সমস্তই শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা ও সময়-পত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। তাহা ছাড়াও শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসম্বদ্ধ বিকাশ এবং গৃহে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে তাহার প্রতিফলন সুনাগরিকত্বের পরিচায়ক হয়, সেইভাবে শিশুকে শিক্ষক গড়িয়া তুলিবেন এইরূপ ইঙ্গিত থাকিবে শিক্ষকের শিক্ষাদান পরিকল্পনায়। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষকের শিক্ষাদান পরিকল্পনায় আরও কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হইয়া প্রতিভাত হইবে। তিনি প্রতি শিশুর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ, অনাগ্রহ, ঔৎসুক্য ইত্যাদিকে মর্য্যাদা দিয়া তাহার নিজস্ব ধারা অনুযায়ী তাহাকে বিকাশ লাভ করিতে সুযোগ দিবেন। শিশুর অভিজ্ঞতার পরিধিকে বৃদ্ধি করিতে শিক্ষক সর্ব্বদাই সচেষ্ট হইবেন। ইহার ফলে শিশু যে পৃথিবীতে বাস করে সেই পৃথিবী সম্বন্ধেই বেশী করিয়া অনুসন্ধিৎসু হইবে এবং তাহার জ্ঞানের পরিধি বেশী করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া শিশুর 3R-এর ভিত্তিকে তিনি যথেষ্ট রকম সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা করিবেন। কারণ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বর্দ্ধিত করিতে হইলে হাতে কলমে কাজের বাহিরেও পুস্তকলব্ধ জ্ঞান আহরণ করিবার প্রয়োজন আছে। 3R-এর ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে শিশুর অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ হইবে। সর্ব্বোপরি শিশুর নীতিগত মানসিক স্তরকে উন্নীত করিতে হইবে। শিশুর উপরে উক্ত সর্ব্বরকম বিকাশের ক্ষেত্রকে আলোড়ন করিয়া শিক্ষক তাঁহার পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার পাঠ-প্রস্তুতি সার্থক হইবে।

পাঠ পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট ছক প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক শিক্ষক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু প্রকৃষ্ট ছক বলিয়া কোন কিছুকে অনুসরণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ কোন একটি ছক কোন শিক্ষকের কাছে মনোগ্রাহী হইলেও উহা অন্য সকলের কাছেই যে মনোগ্রাহী হইবে, এমন কিছু কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ অনেক শিক্ষক মনে করেন যে পাঠের 'প্ল্যান' বা পরিকল্পনা অতিশয়

বিস্তৃতভাবে লেখার প্রয়োজন, এমন কি প্ল্যানের মধ্যে যে বিষয়সম্ভূত প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেই প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তর সেইখানে লেখা থাকিবে। এইরূপ পরিকল্পনার ত্রুটি কোথায় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। সাধারণতঃ যে সকল শিক্ষক পরিকল্পনার উপর বেশী করিয়া নির্ভরশীল, তাঁহারাই ঐরকম প্ল্যান তৈরী করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নের যে উত্তর শিক্ষক শিশুর নিকট হইতে প্রত্যাশা করিয়াছেন, শিশু সেই উত্তর হয়ত না দিয়া অন্য কোন উত্তর দিল, যাহার ফলে সমগ্র পাঠদানের ধারা বদলাইয়া গেল, তখন কি হইবে? বস্তুতঃপক্ষে বিস্তৃত পাঠদান পরিকল্পনায় শিক্ষক পাঠটীকার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন, শিশু তাহার আগ্রহের বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া যেদিকে অগ্রসর হইতে চায়, তাহাতে শিক্ষক বাধাপ্রদান করেন এবং তাঁহার পাঠটীকা বহির্ভূত কোন প্রয়োজনীয় শিক্ষনীয় বিষয়ের উপরেও তিনি আর মনোযোগ দান করিতে পারেন না। যদি বাধ্য হইয়া শিশুর আগ্রহকে কিংবা শিশুর প্রশ্নকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হয় তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে থাকেন, ফলে শিক্ষাদান সাফল্যমণ্ডিত হয় না। শিক্ষাদানের সাফল্য দুই.টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, প্রথমতঃ নমনীয় অথচ সুচিন্তিত পাঠ-পরিকল্পনা, আর দ্বিতীয়তঃ পাঠদান সম্পর্কে শিক্ষকের নির্ভীক মনোভাব।

যে দুইটি বিষয়ের কথা বলা হইল তাহা কি কি উপায়ে শিক্ষক তাঁহার আয়ত্তাধীন করিতে পারেন? প্রথমতঃ শিক্ষক তাঁহার পাঠপরিকল্পনা নিজের সুবিধা ও শ্রেণীর সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তুত করিবেন, পরিদর্শকের সন্তোষার্থে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয় আমদানী করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনার বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে পারম্পর্য্য রক্ষিত হইবে। কাজের ইউনিট হইতে যে কার্য্যগুলির উদ্ভব হইবে, সেই সম্বন্ধে শিশুদের মনে যথোপযুক্ত আগ্রহ উৎপাদিত করিবার মত ব্যবস্থার ইঙ্গিত থাকিবে পাঠ-পরিকল্পনায়। তৃতীয়তঃ পাঠ-পরিকল্পনার পূর্ব্বে যে পাঠ বা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কাজের ব্যবস্থা থাকিবে। চতুর্থতঃ পাঠ-পরিকল্পনার মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন বা আলোচনার বিষয় থাকিবে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া শিশুরা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া নূতন জ্ঞান আহরণ করিতে সমর্থ হয়। পাঠ-পরিকল্পনায় যদি উপরে উক্ত নীতিগুলি শিক্ষক মানিয়া চলেন, তাহা হইলে তিনি যে

পাঠদানকার্য্যে সাফল্য অর্জ্জন করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে আর একটি বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। পাঠদানের মধ্যে শিক্ষক প্রদীপন হিসাবে যেসমস্ত বস্তু ব্যবহার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেইগুলি পুর্ব্বাহ্নেই যোগাড় করিয়া রাখিবেন। শুধু তাহাই নয় শিশুরা যেসব জিনিষ লইয়া কাজ করিবে, তাহারও পুর্ব্বাহ্নে জোগাড় থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ কাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিনিষপত্র খোঁজাখুঁজি করিতে হইলে কাজ পণ্ড হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। পাঠদান পরিকল্পনা সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে শিক্ষক পুর্ব্বদিনের পরিকল্পনার মধ্যে পরের দিনে কি কাজ করা হইবে তাহার একটু ইঙ্গিত দিবেন। কাজের শেষে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ হইল কিনা এবং পরিকল্পনার কোনরূপ অদলবদল করিতে হইল কিনা, তাহা 'আত্মবিশ্লেষণ' শীর্ষক অনুচ্ছেদে লিখিয়া রাখিলে ভাল হয়। Raleigh Schorling তাঁহার Student Teaching নামক পুস্তকে একটি ভাল পাঠ দান পরিকল্পনা করিতে যে কয় প্রকার উপায় অবলম্বন করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহার প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল।

(১) সবচেয়ে ভাল ও উপযুক্ত প্রদীপনের ব্যবস্থা করুন (২) খুব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন পাঠটীকায় লিখুন (৩) উপযুক্ত উদ্দেশ্য স্থির করুন (৪) শিশুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের স্তর ঠিক করুন (৫) শ্রেণী অনুযায়ী পাঠ্যসূচীর প্রতি লক্ষ্য রাখুন (৬) উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করুন (৭) শিশুর পুস্তকের লিখিত অংশের দিকে লক্ষ্য রাখুন (৮) পুর্ব্বজ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে বর্ত্তমান পাঠ যুক্ত করুন (৯) শিশুদিগকে লিখিত কাজের নির্দ্দেশ দিন (১০) শিশুদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়া কাজের বন্দোবস্ত করুন যাহাতে শিশুরা তাহাদের লক্ষ্য বস্তুতে পৌছিতে সক্ষম হয়। (১০) পাঠ পরিকল্পনা নমনীয় করুন (১১) সময়ের উপর দৃষ্টি রাখুন (১২) কাজের পরিমাপের জন্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত করুন।

নূতন শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠদান করিবার পুর্ব্বে শ্রেণীর শিশুদের সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান পত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিত খবরগুলি সংগ্রহ করিয়া তালিকাভুক্ত করিয়া লইবেন। (১) ক্রমিক নং (২) শিশুর নাম (৩) বয়স (৪) বৌদ্ধিক অবস্থা (৫) পড়ার ক্ষমতা (৬) লিখিবার ক্ষমতা (৭) কথা বলার ক্ষমতা (৮) অঙ্ক কষিবার ক্ষমতা (৯) বাড়ীর অবস্থা—কৃষ্টিগত—আর্থিক (১০) সাধারণ স্বাস্থ্য।

এই ভাবে শিশুদের বিস্তারিত খবর লইলে শিশুদের অবস্থা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় এবং সেই ভাবে শিশুদের কাজের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই ভাবে খবর সংগ্রহ ছাড়াও পড়ান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শিশুদের একটি পরীক্ষা লওয়া উচিত। পাঠদান ও কাজ সম্পর্কে প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুদের মধ্যে দল গঠন করিয়া লইলে ভাল হয়।

শিশুদের সময়-পত্র সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত ভাবে হইতে পারে। এই কাঠামো বা ছক ইঙ্গিত মাত্র। ইহার রদবদল শিক্ষক যে ভাবে ইচ্ছা করিয়া লইবেন।

দৈনিক সময়-পত্র

১১—১১'২০—শিশুরা আসিয়া শিক্ষকদের অভিবাদন করিয়া শ্রেণী কক্ষে যাইয়া বিভিন্ন দলে শ্রেণীকক্ষ সাজাইবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবে, জিনিষপত্র গোছাইয়া রাখিবে।

১১'২০—১১'৪৫—সমবেত হওয়া, প্রার্থনা, সঙ্গীত, দৈনিক ঘোষণা, শিশু বা শিক্ষকের কয়েকটি কথা।

১১'৪৫—১২'৩০—নামডাকা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ক্যালেণ্ডারে তারিখ লেখা, শ্রেণীতে আবহাওয়া-পঞ্জী ঠিক করা, খবর পড়া, বলা ও লেখা, দিনের কার্য্য পরিকল্পনা করা।

১২'৩০—১'৩০—অনির্দ্দেশিত বা নির্দ্দেশিত কাজ, (শিল্পকাজ, প্রজেক্ট, ইত্যাদি) ডাইরী লেখা, স্বাঙ্গীকৃত শিক্ষা ইত্যাদি।

১'৩০—২—বিশ্রাম (এই সময়ে স্কুলে খাওয়ার বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হয়; আর যদি একান্তই বন্দোবস্ত না করা যায়, তাহা হইলে খাবার বাড়ী হইতে শিশুরা নিয়া আসিয়া এই সময় খাইবে।

২—২'৪৫—3R (সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম অনুযায়ী)

২'৪৫—৩'১৫—ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান (সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম অনুযায়ী)

৩'১৫—৪—সঙ্গীত, নাটকাভিনয়, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন (সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম অনুযায়ী)।

৪—৪'১৫—জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়া বিদায় গ্রহণ।

*৫—৬—খেলা।

---

* শিশুরা ৪৫ মিনিটের মধ্যেই বাড়ী হইতে বৈকালিক জলযোগ শেষ করিয়া আসিয়া ক্রীড়াকেন্দ্রে খেলা করিবে।

দ্রষ্টা

সুধা দেবজা

সেই আমি মৃত্যুজয়ী
মহাপ্রলয়ের রাত্রে জাগ্রত যে রহি !
মত্ত ঝটিকার বেগে লণ্ডভণ্ড করি চরাচর
সহসা থমকি' রহে নিস্পন্দ, নিথর
হিমানী-কঠিন বিশ্ব, স্তব্ধ, অকম্পিত,
স্তম্ভিত বায়ুর বেগ, সূর্য নির্বাপিত।
মৃত্যু মোহগ্রস্ত সেই মহাস্তব্ধতায়
কে রহে কোথায় ?

আমি সেই মৃত্যুজয়ী
রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যে চিরসাথী রহি।
মহারৌদ্র তালে তার আমি গাহি গান
উন্মাদ উত্তাল রোলে বক্ষে নাচে প্রাণ
নৃত্য অন্তে নটেশের শ্রান্তির নিঃশ্বাস
মোর অঙ্গে লাগে, জাগে শান্তির আভাস।
স্তিমিত, নিঝুম বিশ্ব পড়ি' তন্দ্রাধার
পদতলে তার।

কে সে অনশ্বর ?
অপসারি' গাঢ় নিদ্রা শূন্য ভয়ঙ্কর
হেরে যেই, মৃত্যু যারে না পারে জিনিতে
সেই আমি আপনারে পেরেছি চিনিতে।
সূর্য্যহীন তমসায় বায়ুহীন ক্ষণে
স্পন্দন বিহীন সেই মহাশৈত্য সনে
আমি জাগি আঁখি মেলি' একা অতন্দ্রিত
চির অশঙ্কিত।

নিঃশব্দ নিশ্চুপ
আমি হেরি শান্ত স্নিগ্ধ মৃত্যুঞ্জয়রূপ !
ধীরে ধীরে জীবনের চঞ্চল স্পন্দন
জাগে বিশ্বে। জাগে ক্ষুধা হাসি ও ক্রন্দন।
মেলি আঁখি অনিমেষ আমি দেখি জেগে
ভেসে আসে জন্মস্রোত তীব্র প্রাণ বেগে
নব নব জীবনের লক্ষ কোটি দূত
অপূর্ব অদ্ভুত।

আমি সেই মৃত্যুজয়ী
অকূল কালের ধারা চিরতমোময়ী
ক্ষান্তিহীন বহে রচি ঘূর্ণাবর্ত কত
মহাবেগে তার, একাকার করি যত
জীবন-মরণ লীলা ; আমি সাক্ষী তার
কোটি কোটি জন্মমৃত্যু হয়ে আসি পার।
কোটি গ্রহ নক্ষত্রের ধ্বংস ও সৃজন
জানি চিরন্তন।

অনাদি অসীম
আমি সেই প্রাণ স্রোতে চেতনা আদিম।
আলোক-নন্দিত বিশ্বে জাগে কলরব
চেতনা-জাগ্রত প্রাণে প্রেমের উৎসব।
পুলক-বেদনা ভরে কম্পিত, পীড়িত
নিগূঢ় সম্ভোগ-রসে চিত্ত উদ্বেলিত
নেচে উঠি পুনর্বার সৃজনের লীলায় উছল
আনন্দ-পাগল।

চির মৃত্যু-হীন আমি
জন্ম-মরণের স্রোতে তিলার্ধ না থামি।
ধ্বংসের আবর্তে মোর নাহি অবসান
সে বিক্ষুব্ধ অন্ধ রাতে জ্বলি অনির্বাণ
ঝলকিয়া, পরশিয়া বজ্রাগ্নি হেলায়।

কভু শান্ত সুন্দরের মিলন-মেলায়
বিকশিয়া, সরসিয়া অম্লান শোভাতে
শুভ সুপ্রভাতে।

নব জগতের কাছে
কহিয়াছি বারম্বার 'মোর জানা আছে—
সেই আমি দ্রষ্টা চির নাহি যার ভয়—
জীবনের সর্বমোহ করিয়াছি ক্ষয়।'
জন্ম-মরণের এই রহস্য অপার
রচি লয়ে সুধাবর্ষী ছন্দে কবিতার
শুনায়েছি জগতেরে উচ্চ কণ্ঠে আমি
অমৃতের বাণী।

চীনদেশ ও চীনদেশবাসী

লেখক—লিন্-ইউ-তান্ অনুবাদক—মনোরঞ্জন গুপ্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—৭—

রসিকতা : রসজ্ঞান

রসিকতা মনের অবস্থা বিশেষ। তা ছাড়া রসিকতার ভিতরে জীবন সম্বন্ধে একটা অভিমত, একটা বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি প্রকাশ পায়। রসিকতা ফুলটি তখনই ফোটে, যখন প্রণতি ও সমুন্নতির পথে কোনো জাতের বুদ্ধিবৃত্তির অতিমাত্র অনুশীলন হ'তে থাকে, যার ফলে সে জাত নিজেদের আদর্শের হাস্যকর দিকটাকেও উদ্‌ঘাটন করে দেখাতে পারে। কেননা রসিকতা আর কিছুই নয়—শুধু বুদ্ধির নিজেরই হাতে নিজের পিঠে চাবুক কষা। ইতিহাসের কোনো যুগে যখন মানব-সমাজ নিজের অসারতা ও অকিঞ্চনতা সম্বন্ধে নিজের

মূঢ়তা, মূর্খতা ও অব্যবস্থিত-চিত্ততা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে, তখন চীনের চুয়াংৎসে এর মত, পারস্যের ওমরখৈয়ামের মত ও গ্রীসের আরিষ্ট-ফানিসের মত হাস্যরসিকের সমাজে আবির্ভাব হয়। আরিষ্টফানিসকে বাদ দিলে যে গ্রীসের গৌরবের প্রভূত পরিমাণে লাঘব হবে, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। আর চুয়াংৎসে যদি না জন্মাতেন, তবে চীনের পুরুষ-পরম্পরাগত জ্ঞান-ভাণ্ডার যে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হ'তো তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

চুয়াংৎসের জীবন-কাল ও লেখা প্রকাশের সময় থেকে চৈনিক রাজনীতিবিদ হতে দস্যু-লুটেরা পর্য্যন্ত সবাই হাস্যরসিক ও ঠাট্টা-তামাসায় সুনিপুণ হয়ে উঠেছে। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ তারা সবাই চুয়াংৎসের দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই জীবনটাকে দেখতে শিখেছে। চুয়াংৎসের পূর্ব্বে লায়োৎসেও ঠাট্টা-তামাসা ও রসিকতার হাসি হেসেছেন—সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, অথচ প্রতি-পক্ষ বিচূর্ণকারী প্রলয়ঙ্কর হাসি। তিনি নিশ্চয় আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। তা না হলে তিনি এমন ধূর্ত্ত শয়তানের হাসি হাসতে পারতেন না। অন্ততঃ তিনি যে বিয়ে করেছিলেন, কিংবা তাঁর যে কোনো ছেলেপিলে ছিল, তার কোনো প্রমাণ নেই। লায়োৎসের হাসির শেষ কাশি অর্থাৎ রেশ ধরে নিয়ে চুয়াংৎসে শুরু করেছিলেন তার হাসির অভিযান। তিনি যুবা-বয়স্ক বলে তাঁর সমুচ্চ ঐশ্বর্য্য ছিল অনেক বেশী। তাই তাঁর হাসির ঝঙ্কার যুগ যুগ ধরে দেশের আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ করে রেখেছে। আমরা এখনো রসিকতার হাসি হাসবার সুযোগ পেলে সে সুযোগ ছাড়তে পারিনে, যদিও অনেক সময়ে আমার মনে হয় যে সময় সময় আমাদের হাসি-ঠাট্টার বহরটা আতিশয্যে গিয়ে পৌছায়—কিছুটা অসাময়িক হয়ে পড়ে।

চীন সম্বন্ধে বিদেশীয়দের কি বিপুল অজ্ঞতা! তা যে কত বিপুল, তখনই চীনবাসীরা বিশেষ ভাবে টের পায়, যখন বিদেশীয়েরা জিজ্ঞেস করে—"চৈনিকরা কি হাস্য-কৌতুক রসিকতা জানে?" এ যেন আরব ক্যারাভানকে জিজ্ঞেস করা যে "সাহারা মরুভূমিতে কি বালি আছে?" ভাবতে সত্যই আশ্চর্য্য লাগে যে নিজের দেশ ছাড়া অপর কোনো দেশের বিষয় সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টির সীমানা কত সঙ্কীর্ণ! হাস্য কৌতুক রসিকতায় চীনবাসীরা যে সবিশেষ সিদ্ধহস্ত, সে কথা জানা না থাকলেও যুক্তিবলেই বুঝা যেতে পারে। কেননা হাস্য-কৌতুক-রসিকতা বাস্তব-দৃষ্টি-সঞ্জাত এবং চীনাবাসীরা স্বভাবতঃই বাস্তবদৃষ্টি-সম্পন্ন। রসিকতায় সুনিপুন ব্যক্তির একটা সুস্পষ্ট সাধারণ

বুদ্ধি থাকা চাই। এবং চৈনিকদের তা অতিরিক্ত পরিমাণেই আছে। হাস্য-কৌতুক বিশেষতঃ এশিয়াবাসী সুলভ হাস্য-কৌতুক মানুষের মনের সন্তোষ ও সুপ্রচুর অবসরের ফল এবং চৈনিকদের তা ভূরি ভূরি পরিমাণেই আছে। হাস্য-রসিক ব্যক্তি অনেক সময়ে নিজের পরাজয় ও লাঞ্ছনা নিজেই স্বীকার করে এবং তারই বিশদ বর্ণনায় স্ফূর্তি পায়—চৈনিকরা হচ্ছে তারই সগোত্র—স্থির-মস্তিষ্ক প্রাজ্ঞ পরাজয়-স্বীকার-কারী। রসিকতা জমাতে হলে পাপাচার ও দোষ-ত্রুটী সম্বন্ধে খানিকটা উদার ভাব অবলম্বন করা দরকার—তীব্র নিন্দাবাদের পরিবর্ত্তে সেগুলিকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন এবং এরূপ উদারতা ও হেসে উড়িয়ে দেবার বুদ্ধি চৈনিকদের যথেষ্টই আছে। উদারতার একটা ভাল দিক, একটা মন্দ দিকও আছে এবং চৈনিকদের স্বভাবেও উভয় দিকই বর্ত্তমান। সুস্পষ্ট সাধারণ বুদ্ধি, উদারতা, সন্তোষ ও পরিপক্ক ধূর্ত্তামী—চৈনিক স্বভাবের এই সব বিশেষত্ব সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সব আলোচনা করা হয়েছে, তা যদি সত্য হয়, তবে চৈনিকরা রস-রচনায় ও হাস্য-কৌতুকে সবিশেষ পারদর্শী, একথা স্বতঃসিদ্ধরূপেই সত্য!

চৈনিক হাস্য-কৌতুক ও রসিকতার প্রকাশ কথার চেয়ে কাজেই বেশী হয়ে থাকে। চীন ভাষায় বিভিন্ন রকম রসিকতার বিভিন্ন নাম আছে। খুব সাধারণ একটা রকমের নাম হচ্ছে 'হুয়াচি' (huach'i)। কনফিউসীয় মতের লেখকরা সময় সময় ছদ্ম নামে এই প্রকারের রসিকতা ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এ কথাটার মানে আমি মনে করি 'সরস রচনার প্রয়াস'। এ রূপ রসরচনাকে বলা যায় এমন সাহিত্য, যা অতি কঠোর প্রাচীন ঐতিহ্যের বজ্রমুষ্টি থেকে সাময়িক মুক্তি চেষ্টার ফল। কিন্তু পরিহাস-রসিকতা চীনের সাহিত্যে যথাযোগ্য স্থান লাভ করেনি। অন্ততঃ একথা বলা যায় যে, সাহিত্যে পরিহাস রসিকতার ভূমিকা ও মূল্যের স্পষ্ট স্বীকৃতি চৈনিক সাহিত্যে নেই। তবে চৈনিক উপন্যাসে পরিহাস-রসিকতার অভাব নেই—বরং তার ছড়াছড়িই রয়েছে বলা যায়। কিন্তু চীন দেশের প্রাচীন সাহিত্যপন্থীরা উপন্যাসকে কখনই সাহিত্যের মধ্যে গণ্য করেননি।

কন্‌ফিউসীয় শিকিং (কাব্যাংশ), আনালেফট (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা সংগ্রহ) এবং হান্‌ফেইৎসে—এই সব গ্রন্থে খুব উঁচু দরের হাস্য-কৌতুক ও পরিহাস রসিকতা আছে। কিন্তু যাদের কন্‌ফিউসীয় মতবাদে অটুট নিষ্ঠা ও যারা কন্‌ফিউসীয় শুদ্ধাচারে একান্ত অভ্যস্ত, তারা কন্‌ফিউসিয়াসের লেখায় কোথাও

পরিহাস রসিকতা আছে বলে বুঝতে পারে না। তেমনি শিকিং-এ যে অনেকগুলি অতি চমৎকার প্রেমের কবিতা ও গান আছে, তা তারা বোঝেনা —মন-গড়া সব অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়ে তারা তার কদর্থ করে। তাদের সগোত্র ইউরোপেও আছে। সে দেশের খৃষ্ট-ধর্ম্ম-ধ্বজীরাও বাইবেলের গীতি অংশের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করে। তাও ইউয়ান সিং এর লেখায়ও খুব চমৎকার পরিহাস-রসিকতা আছে—এক রকমের একটা অবসর-সুলভ শান্ত সন্তুষ্টির ভাব—একটা আত্ম-ত্যাগের সুসংস্কৃত পরিমার্জ্জিত বিলাস। এর একটা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে নিজের অযোগ্য সন্তানদের সম্বন্ধে তাঁর লেখা একটা কবিতা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

চুলে আমার পাক ধরেছে, মাংসপেশির নেইকো জোর,
লেখা পড়ায় গণ্ড মূর্খ পাঁচ পাঁচটি সন্তান-ই মোর।
পাঁচ পাঁচটি নন্দন আমার—সবাই অশেষ গুণধর,
স্কুলের নামে গায়ে আসে কম্প দিয়ে প্রবল জ্বর।
যোড়শ বর্ষে আশু আমার যোল কলায় পূর্ণ অলস,
পনেরোতেই আশুয়ানের চলে গেছে পড়ার বয়স।
ইউং আর তুয়ান আমার বছর তেরো করেছে পার,
ছয়ের পরে সাত গুণিতে চক্ষে দেখে অন্ধকার।
আতুং আর তু বছরে এগারোতে পা বাড়াবে,
দিনে রাতে শুধুই কেবল পেয়ারা আর বাদাম খাবে।
এই যদি হয় বিধির বিধান আমার তরে,
হোক তবে তাই—কি হবে আর ভাবনা করে।
যাক তবে সব ভাবনা চিন্তা চুকে বুকে,
এ দিকে মুই শেষ করে দিই পেয়ালাটা এক চুমুকে।

তু ফু এবং লি পো -র কাব্যেও পরিহাস-রসিকতা আছে। কিন্তু তু ফু-র কাব্য একটা তীব্র তিক্ত হাস্য-রসের সৃষ্টি করে এবং লি পো -র ভাব-প্রবণ উদাসীনতায় মানুষ খুসী হয়। তবে এগুলিকে আমরা ঠিক রসিকতা বলিনে। জাতীয় ধর্ম্ম হিসেবে কনফিউসীয় মতবাদকে এদেশের মানুষ যেরূপ শ্রদ্ধাহীন ভীতির চক্ষে দেখে, তার ফলে চিন্তার স্বাধীনতা অনেকটা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং প্রচলিত প্রথা থেকে সম্পূর্ণ নূতন কোনো দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রকাশ এক রকম অসম্ভব ছিল। অথচ লেখকের

একান্ত নিজস্ব অভিনব দৃষ্টি-ভঙ্গি ছাড়া রসিকতাই হয় না। এরূপ গতানুগতিক সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন পরিবেশ হাস্য-রস-পূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল নয়। কেউ যদি চৈনিক রস-রচনার একটা সংগ্রহ পেতে চায়, তবে নানান জায়গা থেকে তাকে তা খুঁজে বের করতে হবে। গ্রাম্য গীতি, ইউয়ান নাটন, মিং উপন্যাস প্রভৃতি, যা কোনো দিনই প্রাচীন সংস্কৃতির ভাবানুগ সাহিত্য বলে গণ্য নয়, তার ভিতরে ঢুড়ে দেখতে হবে। এ ছাড়া, এ বস্তু আর পাওয়া যেতে পারে কোনো কোনো ব্যক্তি বিশেষের, বিশেষ করে সুং ও মিং আমলের কোনো কোনো উচ্চ শিক্ষিত লোকের ব্যক্তিগত চিঠি পত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজে রচনায়। এই সব লেখায় তারা কখনো কখনো অন্যমনস্কভাবে নিষিদ্ধ রসিকতার প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে।

এসব সত্ত্বেও চৈনিকদের এক প্রকারের নিজস্ব পরিহাস-রসিকতা আছে। তারা সাধারণতঃই পরিহাসপ্রিয় জাত। তবে তাদের পরিহাসটা একটু উগ্র ও বিকট রকমের এবং জীবন সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টি হচ্ছে তার ভিত্তি। চৈনিক খবরের কাগজের সম্পাদকীয় ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ধরণে লেখা হয়ে থাকে, পরিহাসের নাম গন্ধও তাতে থাকে না বললেই চলে।

তা সত্ত্বেও কও-মিং-টাং-এর কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনা, সানমিন মতবাদ, বন্যা ও দুর্ভিক্ষে লোক-সেবা, নবজীবন আন্দোলন, অহিফেন-নিবারণী সভা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার-আন্দোলন ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে তারা যেরূপ সহজ ও হালকা ভাবে লেখে, তা দেখে বিদেশীয়েরা বিস্ময় বোধ করে। কিছুদিন পূর্ব্বে এক আমেরিকান অধ্যাপক সাংহাই বেড়াতে এসে কোনো কলেজের ছেলেদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি নবজীবন আন্দোলন সম্বন্ধে উল্লেখ করা মাত্র ছেলেরা সব হো হো করে হেসে উঠলো। তিনি খুব সরলভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কথাটা বলেছিলেন। তাই এরূপ গম্ভীর বিষয়ে ছেলেদের হাসির বহর দেখে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন; যদি তিনি তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে অহিফেন-নিবারণী সভার উল্লেখ করতেন, তাহলে ছেলেদের রৌপ্য শুভ্র হাসির রোলে তিনি বিহ্বল হয়ে যেতেন।

পূর্ব্বেই বলেছি যে পরিহাস-রসিকতা হচ্ছে জীবনটাকে দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ। সেই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমরা কম বেশী পরিচিত।

জীবনটা হচ্ছে একটা প্রহসন নাট্ট এবং আমরা এ দুনিয়ার আসরে নাটকের অভিনেতাদের মতই সাজ-গোজ পরে অভিনয় করে থাকি। যে লোক জীবনটাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গুরু-গম্ভীর দৃষ্টিতে দেখে, যে পুস্তকাগার ও পাঠ-ঘরের নিয়মাবলী নিষ্ঠার সঙ্গে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করে, যে সীমানা-নির্দ্দিষ্ট তৃণাচ্ছন্ন লনের উপর দিয়ে হাটে না; যেহেতু তার সামনে নিষেধাত্মক সাইন-বোর্ড দেওয়া আছে, তাকে সবাই মনে করে একটি আস্ত বোকারাম। সাধারণতঃ সে তার বয়স্ক পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিদ্রূপের পাত্র হয়ে ওঠে এবং তাকে দেখলেই তারা পরিহাসের হাসি হাসে এবং হাসি ছোঁয়াচে রোগের মতই ছোঁয়াচে বলে, সে নিজেও ক্রমে পরিহাস-রসিক হয়ে ওঠে।

এই পরিহাস-রসিকতা ও ঈষৎ ভাঁড়ামীর ভাব চৈনিকদের কোনো কিছুই নিরতিশয় গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে না পারা ও না চাওয়ার ফল। রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে কুকুরের অন্তেষ্টি-ক্রিয়ার মত অতি তুচ্ছ ব্যাপার পর্য্যন্ত—কোনো কিছুতেই তারা তেমন গুরুত্ব আরোপ করে না। মৃতের সৎকার উপলক্ষে চৈনিকরা যে আচার অনুষ্ঠান পালন করে, সে গুলিই এ বিষয়ে এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। চৈনিক সমাজের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর নিরতিশয় জমকাল শব-শোভাযাত্রায় দেখা যায় যে, রাস্তার যত সব নোংড়া-মুখ চ্যাংড়া ছেলে জরি ও চিকনের কাজকরা বিচিত্র রঙিন পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বর্ত্তমান কালে তার সঙ্গে আবার ‘এগিয়ে চলো খৃষ্টান সৈনিক দল’—এই গান বাজাতে বাজাতে ব্যাণ্ড বাদ্যও অনুগমন করে। এই ব্যাপারটাকে ইউরোপীয়েরা চৈনিকদের হাস্য-রসের অভাবের প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করে। কিন্তু আসলে চৈনিক শব-যাত্রাই হচ্ছে তাদের পরিহাস-প্রবণতা ও হাস্য-রসের অতি চমৎকার নিদর্শন। ইউরোপীয়েরাই শুধু শব-যাত্রাকে একটা গুরু-গম্ভীর বিষয় বলে মনে করে এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম্মাড়ম্বরের ব্যাপার করে তোলে। কিন্তু এরূপ ভাব চৈনিকদের স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। ইউরোপীয়দের ভুল এইখানে যে, তারা তাদের আপন সংস্কার বশে মনে নিশ্চিত ধারণা করে রাখে যে শব-যাত্রা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম্মাড়ম্বরের ব্যাপার না হয়ে পারে না, এবং সেরূপ হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। বর-যাত্রার মত শব-যাত্রাও সোরগোলপূর্ণ ও ব্যয়-বহুল হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু কেন যে ধর্ম্মাড়ম্বরপূর্ণ হবে, তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মাড়ম্বরের যা কিছু ব্যবস্থা, তা ধর্ম্ম-যাজকের জমকালো পোষাক

পরিচ্ছদেই করা হয়ে যায়—বাকীটা হচ্ছে গতানুগতিক আচার মাত্র এবং তা একটা প্রহসন বা তামাসা ছাড়া কিছু নয়। আজো আমি শবাধার বা বরের পাল্কী দেখার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুঝতে পারিনে যে শোভা যাত্রাটা শব-যাত্রা না বর যাত্রা।

চৈনিক শব-যাত্রা যে বড় রকমের একটা প্রহসন, এইটেই হচ্ছে তাদের পরিহাস-রসিকতার একটা মস্ত বড় নিদর্শন। তার মানে, চৈনিক পরিহাস-রসিকতার রকমটা হচ্ছে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান অব্যাহত রেখে ভিতরের আসল ভাবটাকে কাজে স্রেফ অগ্রাহ্য করে চলা। চৈনিক শব যাত্রার হাস্য রস যে ঠিক মত বুঝতে পারে, তার পক্ষে চৈনিকদের রাজনৈতিক পরিকল্পনার অর্থ বুঝতে পারাও সহজ সাধ্য হবে। পরিকল্পিত রাজনৈতিক কর্ম্ম-তালিকা ও সরকারী ঘোষণা প্রথাগত ব্যাপার মাত্র। কেরাণীরাই তা রচনা করে দেয়। তারাই হচ্ছে এ সবের পক্ষে উপযুক্ত এক প্রকারের শব্দাড়ম্বরপুর্ণ চটকদার ভাষা লেখা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। চীনদেশে এরূপ বহু দোকান আছে, যেখানে শব-যাত্রায় ব্যবহৃত ধর্ম্মযাজকের পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক জিনিষ-পত্র রাখা হয় এবং যাদের প্রয়োজন, তারা সেখান থেকে ভাড়া করে নিয়ে যায়। এই সব দোকানে কেউ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে যায় না। তেমনি এই সব রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও সরকারী ঘোষণায় কেউ কোনো গভীর অর্থে খোঁজে না—এ সবের তেমন কোনো গুরুত্বই দেয় না। বিদেশী খবরের কাগজের বৈদেশিক সংবাদদাতারা যদি শব-যাত্রার পোষাক-পরিচ্ছদের এই সাংকেতিক অর্থ মনে রাখে তবে আর তাদের এ সব ব্যাপারের অর্থ বুঝতে ভুল হবে না এবং এরূপ অসঙ্গত মনোভাব অবলম্বন করার প্রয়োজন হবে না যে, চৈনিকরা এক অদ্ভুত জাত, যাদের সম্যক্ পরিচয় লাভ অসম্ভব।

বস্তুর বাহ্যিক রূপ ও মুল-তত্ত্ব সম্বন্ধে এই সূত্র এবং জীবন যে একটা প্রহসন, এই দৃষ্টি ভঙ্গী সম্বন্ধে বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কয়েক বছর পুর্ব্বে কুয়োমিংটাং-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিল যে, বিদেশীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়া সাংহাই নগরীর কোনো অংশে কোনো চৈনিক মন্ত্রীর অফিস থাকতে পারবে না। এই আদেশ মানতে হ'লে বহু মন্ত্রীকেই বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। অনেকে ঘর বাড়ীই করে বসেছে সেখানটাতে। তাদের পক্ষে তো আরো মুস্কিল। কারণ তাতে হয়তো তাদের

পরিবারের অন্যান্য অনেকের চাকরীই খতম হয়ে যাবে। কিন্তু আদেশ-পালন অসুবিধাজনক ও এক রকম অসাধ্য এই যুক্তিযুক্ত অজুহাত দেখিয়ে আদেশের রদ-বদলের জন্যে আবেদন করা কিম্বা সেই অজুহাতে আদেশ অমান্য করে চলা—কোনোটাই তারা করলো না। কেরাণীর কাজে সবিশেষ অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি যত চতুরতার সঙ্গেই খসড়া প্রস্তুত করুক না কেন, এরূপ আবেদন তার পক্ষে এমন ভাবে রচনা করা সম্ভবপর নয়, যাতে তা নির্দোষ রীতি-সঙ্গত হয়। কেননা এরূপ আবেদনের অর্থ হচ্ছে বিদেশীয় অধিকারের সীমানার মধ্যেই বাস করা চীনের সরকারী কর্ম্মচারীদের ইচ্ছা। কিন্তু সেরূপ ইচ্ছাকে সবাই দেশ-দ্রোহিতার নামান্তর বলেই মনে করবে। এরূপ অবস্থায় তারা খুব একটা চাতুরী অবলম্বন করে উভয় কুল রক্ষা করলো—তারা শুধু দুয়ারের উপরকার সাইনবোর্ডটা বদলে দিয়ে তার উপরে লিখে দিল—ব্যবসায়-সংক্রান্ত পরিদর্শন অফিস। সাইনবোর্ডটা বদলাতে হয়তো তাদের এক এক জনের ২০ ডলারের মত খরচ করতে হয়েছে, কিন্তু তার ফলে লাভ হল যে কাউকেই চাকরী খুয়াতে হোলো না, কিংবা অনর্থক বিদ্রূপের পাত্রও কাউকে হোতে হোলো না। স্কুলের ছাত্রসুলভ এ দুষ্টুমিতে মন্ত্রীদের অভি-প্রায়ও সিদ্ধ হোলো এবং আদেশ-প্রদানকারী নানকিং কর্ত্তৃপক্ষও খুসি থাকলো। এ কথা বলতেই হবে যে আমাদের নান্‌কিং-এর মন্ত্রীরা খুবই উঁচুদরের পরিহাস রসিক। আমাদের দস্যুরাও তা-ই এবং যুদ্ধ বিগ্রহে রত আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অধিনায়করাও তা-ই। চীনের ঘরোয়া যুদ্ধ বিগ্রহের স্বরূপটা যে পরিহাসাত্মক, সে বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি।

অপর দিকে পাশ্চাত্যদের যে কি রকম পরিহাস-রসিকতার অভাব, তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ খৃষ্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের বিষয় উল্লেখ করা যায়। কয়েক বছর পূর্ব্বে দেশের যাবতীয় স্কুল সম্বন্ধে তাদের নাম রেজিষ্টারীকৃত করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। তাতে মিশন স্কুলের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে মহা হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। রেজিষ্টারী করার সর্ত্ত ছিল এই যে, শিক্ষনীয় বিষয়ের তালিকা থেকে ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়টা বাদ দিতে হবে, তাদের সভা-গৃহে সান্‌ইয়াটসেনের প্রতিকৃতি রাখতে হবে এবং প্রতি সোমবারে স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। চীনের গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃপক্ষ বুঝতে পারে না যে, মিশন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ কেন এরূপ সহজ সাধারণ বিধি পালন করতে পারবে না। অপর দিকে মিশন-স্কুল কর্ত্তৃপক্ষও এরূপ আদেশ তাদের

ধারণানুযায়ী সততা ও সত্যরক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিয়ে গ্রহণ করবার পথ খুঁজে পায় না। এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে এর আর মীমাংসা হয় না। ফলে কোনো কোনো মিশনারী স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ তাদের স্কুল বন্ধ করে দেওয়াও এক প্রকার সাব্যস্ত করে ফেলেছিল। একটা স্কুলের কথা জানি—সেখানকার ব্যবস্থা সবই প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষকালে স্কুলের পাশ্চাত্য অধ্যক্ষ তাঁর বেকুবি সততায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে স্কুলের শিক্ষনীয় বিষয়ের তালিকা থেকে ধর্ম্ম-শিক্ষা-বিষয়ক দফাটা তুলে দিতে কিছুতেই রাজি হলেন না। অধ্যক্ষ প্রবরের দাবী হচ্ছে যে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যাতে তিনি প্রকাশ্য ভাবে স্পষ্ট করে এই সত্য সকলকে বলতে পারেন যে, ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়াই তাঁদের স্কুলের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

ফলে আজও সে স্কুলের নাম রেজিষ্টারী করা হয়নি। এদের মধ্যে হালকা পরিহাস রসের বিন্দু-বিসর্গও নেই। এই স্কুলের যা করা উচিত ছিল, তা হচ্ছে নান্‌কিং মন্ত্রীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সরকারী বিধি সম্পূর্ণ রূপে কাগজ-কলমে মেনে নেওয়া, সান্‌ইয়াটসেনের প্রতিকৃতিও একটা টাঙ্গিয়ে রাখা এবং তারপরে চৈনিকদের প্রথা অনুযায়ী যেমন খুসি নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু তাদের ঐরূপ সততাকে আমি বোকামীর নামান্তর মনে না করে পারিনে।

এই হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে চৈনিকদের পরিহাস-প্রবণ মনোভাব। চীন ভাষায় মানব জীবনের সঙ্গে নাট্টাভিনয়ের উপমা-মূলক বহু শব্দের ব্যবহার আছে। চৈনিক কর্ম্মচারীদের চাকরীতে ঢোকা এবং চাকরী ছেড়ে চলে আসাকে বলা হয় "রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ" এবং "রঙ্গমঞ্চ থেকে নিষ্ক্রমন"। কোনো বিষয় সম্বন্ধে শব্দাড়ম্বরপুর্ণ পরিকল্পনা প্রচার করাকে বলা হয় পরিহাসপুর্ণ গীতি-নাট্টের অভিনয় করা। সত্যিই আমরা জীবনটাকে একটা নাট্ট-মঞ্চ হিসেবে দেখি এবং এই রঙ্গ-মঞ্চে যেরূপ নাটকের অভিনয় আমরা সব চেয়ে বেশী পছন্দ করি তা হচ্ছে ব্যঙ্গ নাট্ট। সে ব্যঙ্গ নাট্টের বিষয় হতে পারে একটা নূতন শাসন-সংস্কার, সাধারণের স্বত্বাধিকার প্রস্তাব, অহিফেন নিবারণী সমিতি, ছোট ছোট স্বেচ্ছাচারী সৈন্য-দলকে ভেঙে দেওয়া সম্বন্ধে কন্‌ফারেন্স, অথবা অন্য যা কিছুই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। সব সময়েই আমরা এসব ব্যাপার নিয়ে স্ফূর্ত্তি করতে ভালবাসি। সময় সময় আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের লোকজনেরা আর একটু গম্ভীর

প্রকৃতি হলে ভাল হোতো। পরিহাস-রসিকতাই সব চেয়ে বেশী চীন-বাসীদের মাটি করে দিচ্ছে। নির্দ্দোষ হাসিরও আতিশয্য সম্ভবপর এবং আতিশয্য কোনো বিষয়েই ভাল নয়। এরূপ হাসি পাকা বুড়োর ধূর্ত্ত বুদ্ধির ফল, যার উষ্ণ নিঃশ্বাসে কর্ম্মোদ্যম ও আদর্শ-বাদের যত্ন-লালিত ফুল শুকিয়ে মরে যায়।

সাময়িকী

ক্ষুদ্রাকার শিল্পের উন্নয়ন: বড় বড়, ছোট ছোট; বড়র উন্নয়নে ছোটর উন্নয়ন হয় না, ছোটর উন্নয়নেও বড়র উন্নয়ন হয় না; সমষ্টির উন্নয়নে ব্যষ্টির উন্নয়ন, ব্যষ্টির উন্নয়নেও সমষ্টির উন্নয়ন হয় না। বড় ও ছোট, সমষ্টি ও ব্যষ্টি পরস্পর-নিরপেক্ষ ও পরস্পরাপেক্ষ। তাহারা co-relative. মনীষী ক্যাণ্ট বলেন: 'The organised being is the being in which all is reciprocally means and end.' Paul Janet আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন, 'In the cell itself, considered as the nucleus of life all the parts are correlatives to the whole and the whole to the parts'. জীবন যন্ত্রে অংশ অংশী পরস্পরের পরিপূরক। ইউক্লিডের 'The whole is greater than the parts' এই বাক্য আজ অচল। বৃহদাকার শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা এতদিন ক্ষুদ্রকার শিল্পগুলির ধ্বংস সাধনই হইয়াছে। বড়র চাপে ছোট এতদিন মরিয়াছে। বৃহৎ শিল্প কোনও দিনই ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজন পুরণ করিতে পারে নাই, যেমন বৃহৎ ঈশ্বর কোনও দিনই ক্ষুদ্র জীব-জগতের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারেন নাই। রেল হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে রিক্সা, গরুর গাড়ী, ট্রাম-বাস-মোটরের প্রয়োজন ফুরায় নাই। ষ্টীমার হইয়াছে; কিন্তু নৌকার প্রয়োজন যেমন তেমনই রহিয়া গিয়াছে। এমন করিয়া বড় কোনও দিনই ছোটর প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে না, পারিতেছেনা। কিন্তু বড়দের দাবী এই যে, তাহারাই সমাজের সব-কিছু কল্যাণ আনয়ন করিতে সমর্থ; তাই তাহারা ছোটদের পায়ের নীচেই দাবাইয়া রাখিয়াছে, ছোটর রক্ত শোষণ করিয়া

সমাজের অকল্যাণই করিয়াছে। কাপড়ের কল ক্ষুদ্র তাঁত শিল্পকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে, ধান ভাঙা কল ঢেঁকির প্রয়োজন ভুলাইয়া দিয়াছে। মানুষ এই বড়র মোহে আচ্ছন্ন হইয়া নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারিয়াছে। ট্রাম-বাসের মোহে পায় হাটা ভুলিয়া গিয়াছে। যাহার সময়ের কোন অভাব নাই, সেও এক মাইল রাস্তা যাইতে ট্রামবাসের ব্যবহার করে। ঐশ্বর্য্য-প্রিয় মানুষ বড় হইতেই চায়, ছোটর জন্য তাহার কোন দরদ নাই। ছোটরা এমনি নিজের মরণ নিজেই আনয়ন করে। জীবন যন্ত্র কিন্তু ছোট বড় সকলের স্বয়ংমূল্য বিধান করিয়া পারস্পরিক মর্য্যাদাদানের উপর গড়িয়া উঠিবার জন্যই ব্যস্ত। আজ সর্ব্বক্ষেত্রে জীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

এই ক্ষেত্রে মহামতি নিউটনের ছেলে বেলার একটী ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়িতেছে। নিউটন ছোট-বড় বহু ইঁদুর ধরিয়া তাহাদের পুষিবার জন্য একটি খাঁচা তৈয়ার করেন। ঐ খাঁচায় তিনি একটী মাত্র 'বড়' ছিদ্র রচনা করেন। কিন্তু বড় ছিদ্র রচনা করিয়া তাঁহার ভাবনা হইল, ছোট ইঁদুরগুলি তবে বাহির হইবে কেমন করিয়া? আমরা নিশ্চয়ই নিউটনকে 'বোকা' বলিব। আমাদের মতে তাঁহার এই খেয়াল থাকা উচিত ছিল যে, যে বড় ছিদ্র দিয়া বড়রা বাহির হইতে পারে, সে ছিদ্র দিয়া ছোটরাও তো বাহির হইতে পারিবে; ছোটদের জন্য পৃথক্ করিয়া ছোট ছিদ্র করিবার কোন প্রয়োজন নাই। নিউটনের বুদ্ধিই বুঝি ঠিক ছিল। মৃত যন্ত্রে (mechanism) বড়দের প্রয়োজন মিটাইলেই ছোটদের প্রয়োজন আপনা আপনিই মিটিয়া যায়। কিন্তু জীবন-যন্ত্রে (organism) তাহা হয় না। বড় যে পথ দিয়া যাতায়াত করে, সে পথে ছোটদের যাতায়াত বড়রা বা বড়দের প্রভাবে গড়া সমাজ ব্যবস্থা কি অনুমোদন করে? সে পথে ছোটরা যে 'পারিয়া'—untouchable. বড়দের পথ ও ছোটদের পথ সম্পূর্ণ পৃথক্ হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। অনন্তের পথ সান্তের হইলে সান্ত সে পথে অনন্ত দ্বারা শোষিতই হইয়া থাকে। জীবনে সান্ত-অনন্ত দুই দুই থাকিয়াই এক হইতে পারে।

ব্রিটিশ শাসনে এদেশের সব ক্ষুদ্রাকার শিল্প বৃহদাকার শিল্পের শোষণে বিলুপ্ত হইয়াছিল। আজ স্বরাজের পরশ পাইয়া সেগুলি আবার সঞ্জীবিত হইবার জন্য আকুপাকু করিতেছে। এতদিন এই দিকে খুব বেশী কিছু করিয়া উঠা যায় নাই। তাই ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের আমন্ত্রণে কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউণ্ডেসনের অর্থানুকূল্যে

একটী আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দল ভারতে আসিয়া এদেশের ক্ষুদ্রাকায় শিল্পগুলির যথাযথ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। এদেশের ক্ষুদ্রশিল্পের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়া উহার উন্নতি বিধানের জন্য ভারত সরকারের নিকট একটী সাত দফার কার্য্য স্থচী পেশ করিয়াছেন। (১) একটী ক্ষুদ্র-শিল্প কর্পোরেশন (small industries corporation) (২) ভারতের ৪টী অঞ্চলে ৪টী কারিগরী পরিষদ (Institute of Technology) (৩) শিল্পের ডিজাইন শিখাইবার জন্য একটী স্কুল (৪) শিল্প দ্রব্য ক্রেতাদের জন্য একটী কাষ্টমার সাভিস কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা (৫) উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানির সাহায্যার্থে একটী করিয়া অফিস গঠন, (৬) একটী মার্কেটিং সাভিস কর্পোরেশন স্থাপন এবং (৭) শিল্পের যন্ত্রপাতি তৈয়ার এবং এইসব যন্ত্রপাতি পরিচালনা সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষাদানের জন্য একটী কারখানা স্থাপন। দেশে শিল্প দ্রব্যের কাটতি বৃদ্ধির সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ দল বলিয়াছেন যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজার জগতের মধ্যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজারের অন্যতম। এদেশের সহর ও পল্লী অঞ্চলের সর্ব্বত্র যদি দেশের ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ের উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে ভারতের শিল্প জগতের একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপ্লব দেখা দিবে এবং যে সব দেশে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন ও কাটতি হয়, ভারত তাহার অন্যতম দেশে পরিণত হইবে।

ভারত সরকার অগৌণে কার্য্যকরী করিবার জন্য বিশেষজ্ঞদলের প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ স্থপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাকী ৪টা তাহাদের বিবেচনাধীন আছে। আজ ক্ষুদ্রাকার ও বৃহদাকার শিল্প সমূহের মধ্যে সমন্বয় বিধানের স্থযোগ আসিয়াছে। বড় বড় থাকিয়া কোন্ কৌশলে ছোটর সাহায্যে বড় হইতে পারে এবং ছোটকেও তাহার যথাস্থানে ও যথামানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এবং ক্ষুদ্রাকার শিল্পগুলিই বা কোন্ কৌশলে সমাজের নিম্নতম স্তরের সেবা করিয়া এবং এই সেবার ভিতর দিয়া বড়দের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে, বড়রও প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারে, সেই কৌশলে আজ ছোট ও বড়কে হাত ধরাধরি করিয়া মিলিতে হইবে। ছোটর মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিয়া বড় বড় হইতে চাহিলে বড় বাঁচিবে না, বড়র চাপে ছোটও মরিবে। ছোট মরিলে বড়ও মরিবে। ছোট বড়র পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দুই-ই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বড়রা ছোটদের প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করুক, ছোট-বড়র

মহামিলনে ভারত-রাষ্ট্র কল্যাণ-রাষ্ট্রে গড়িয়া উঠিবে। আবার বলি ছোট বড় দুই-ই correlative. বৃহৎ শিল্প কখনও সমতা রক্ষা করিয়া উৎপাদন করিতে পারে না। হয় সে বেশী উৎপাদন করিবে, নয় প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পের আত্মনিয়ন্ত্রের যোগ্যতা থাকিলেও তাহা সীমাবদ্ধ। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পরস্পর সংযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিলেই পরস্পর পরস্পরের ত্রুটি দূর করিতে পারে এবং তাহাতেই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ছোট যন্ত্রগুলি নিশ্চিহ্ন হইলে বৃহৎ যন্ত্র নিজের ভারে নিজে অচল হইবে এবং এই অচল যন্ত্রের চাপে দেশ পিষ্ট হইবে, সর্ব্বক্ষেত্রে হাহাকার উঠিবে। বেকারের দল বৃদ্ধি হইবে। ছোটরাই বড়দের dynamic force যোগায়। ছোটদের আলিঙ্গন না পাইলে বড়রা জাতিকে static করিবে, জাতির অগ্রগতি নিরুদ্ধ হইবে। ছোটরাই বড়দের অগ্রগতির দূত। ছোট কাম, ছোট মানুষ, ছোট শিল্প মানুষের জীবনে রস যোগায়, গতিবেগ বাড়াইয়া দেয়। বড়রা যোগায় সমাজের স্থিতি, আর ছোটরা যোগায় গতি, সমাজ একান্ত স্থিতি বা একান্ত গতি কাহারও দ্বারা বাড়িবেনা। ধন যোগায় স্থিতি, শ্রম যোগায় গতি। বৃহৎ যন্ত্র মানুষের সহজ ধর্ম্ম কাড়িয়া লয়, কলে পরিণত করে। ক্ষুদ্র যন্ত্র যদি বৃহৎ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে বড়র সেবা করিয়াও মানুষ মানুষ থাকিতে পারে, যন্ত্রে পরিণত হয় না। বৃহৎ যন্ত্রের আবেষ্টন কিরূপ দূষিত, তাহা বড় বড় কলগুলির মজুরদের জীবনের দিকে চাহিলেই বুঝা যাইবে। বড় একান্ত বড় থাকিলে বড়দের যাহা হয়, কলগুলি আজ তাহাই। বৃহৎ যন্ত্রের উপাসনায় মানুষ আজ যান্ত্রিক জীব বিশেষ। তাহাদিগকে আবার মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে চাই বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষ শিল্পক্ষেত্রে এই সমন্বয় আস্বাদন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বিশ্ব দরবারে সে শিল্প ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। বন্দে মাতরম্।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল জন্ম-শত বার্ষিকী—বিগত ২৩শে মে, রবিবার ১১৩নং রাসবিহারী এভিনিউস্থিত মহানির্ব্বাণ মঠে ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম-উপলক্ষে একটী জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীনিত্যগোপালের একখানি প্রশস্তি সঙ্গীতের পর সভাপতি বুদ্ধদেবের গতিশীল দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু পরিচয় দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান

ফিলসফি' পুস্তকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেন। তৎপর রবীন্দ্রনাথ লিখিত বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পঠিত হয়। তারপর শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সরকার বুদ্ধদেবের জীবন ধারা অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রের উৎপীড়ন হইতে মানুষকে যে তিনি মুক্তি দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তৎপর শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূত বুদ্ধদেবের উপদেশাবলীর সহিত শ্রীনিত্যগোপালদেবের উপাদেশাবলীর সাদৃশ্য দেখাইয়া সেগুলি জীবনে আচরণ না করিলে তাঁহাদিগকে স্মরণ করা যে একেবারেই অর্থ হীন হয়, সে কথা বলেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয় ভারতবর্ষের স্থিতিশীল দর্শনের কাছে ভগবান বুদ্ধদেবই যে প্রথমে গতি দর্শন প্রবর্ত্তন করেন, তাহা বুঝাইয়া দেন। কর্ম্মকাণ্ড ও প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানে প্রপীড়িত আর ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বশাসিত ভারতবর্ষের কাছে ভগবান বুদ্ধ যে মানুষের মহিমা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, সনাতন ভারতবর্ষ আবার তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছিল। আজ আবার বুদ্ধদেবের অবদান আমাদিগকে আন্দোলিত করিতে চাহিতেছে বটে, কিন্তু ভারতর্ষের সমস্ত বেদান্ত ভাষ্য যেখানে বুদ্ধ দর্শনকে খণ্ডন করিয়াছে, সেখানে বেদান্তের মধ্য দিয়া বৌদ্ধ দর্শনকে স্বীকার করিয়া না লইলে বুদ্ধদেবকে ভারতের আত্মার মধ্যে স্থান দেওয়া যাইবে না। শঙ্কর দর্শন আর বুদ্ধ দর্শন একেবারে বিরুদ্ধ। শঙ্কর বলেন—একত্বই বিদ্যা, বহু দর্শনই অবিদ্যা; সেখানে বুদ্ধ বলেন, একত্ব বলিয়া কিছু নাই; 'ক্ষণিকেষ্বপি একত্বাদি ভ্রান্তিঃ অবিদ্যা'। জগৎটা ক্ষণিকের মেলা। শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার জীবনে ও দর্শনে শঙ্করের সাতত্যবাদ (continuity) আর বুদ্ধদেবের ক্ষণ-বিজ্ঞানবাদকে কেমন করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন, সভাপতি তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দেন।

গত ৬ই জুন রবিবার ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত মহানির্বাণ মঠে এক জনসভা হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সহ-সভাপতি ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় সভাপতির আসন গ্রহন করেন। সভাপতি বরণ উপলক্ষে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎ ঘোষ) বলেন যে, শ্রীনিত্যগোপাল আমার গুরু বলিয়াই তাঁহাকে আমি মানুষের কাছে উপস্থিত করিতে চাহি না—বর্তমান বিশ্বসঙ্কটে তাঁহার বিশেষ দান জড়াজড়ের সমন্বয়ের বার্তা মানুষকে পথ দেখাইবে—ইহা বুঝিতে পারিতেছি বলিয়াই সে বাণীকে মানুষের কাছে পৌছাইয়া দিবার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে আমার এই প্রচেষ্টা। অতঃপর ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় বলেন, 'শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের এই শতবার্ষিকী উৎসবে

আসবার কথা আমাকে অনেকবার বলা হলেও না আসবার চেষ্টাই করে আসছিলাম। কিন্তু তাঁর কথা পড়তে গিয়ে যখন দেখলাম তিনি সকলের ঠাকুর—পাপী, তাপী, ভালমন্দ সকলের ওপরেই তাঁর অফুরন্ত স্নেহধারা ঝড়ে পড়ছে, তখন মনে হল তবে তো তিনি আমারও ঠাকুর—তখনই তাঁকে আমার প্রাণের প্রণতি জ্ঞাপন করতে ইচ্ছে হল। আজ এখানে এসে আমি বড় আনন্দ পেয়ে গেলাম। কাউকে তিনি পরিত্যাগ করেননি, সকলের জন্যই পথ খুলে রেখেছিলেন—তাই তিনি সর্বজনের।

সেইজন্যই তিনি সর্বমতের সমন্বয়কারী। মত নিয়ে রক্তারক্তির ইতিহাস আমাদের দেশে আছে, তাই সর্বমতসমন্বয়ের বাণীর এখানে প্রয়োজন ছিল। তিনি গৃহী ও সন্ন্যাসীরও সমন্বয় করেছেন। গৃহ হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লেবরে-টারী, বহুজনের মধ্য দিয়ে এখানে আমাদের সাধনা পরীক্ষিত ও পরিশুদ্ধ হতে হতে চলে। গৃহকে সন্ন্যাসের মনোবৃত্তিতে গড়ে তুলবার কথা তিনি বলেছেন। সন্ন্যাসী যদি গৃহ ধর্মের এইদিকটাকে একেবারেই বাদ দিয়ে যান, তবে জীবনের একটা বড় দিক সম্বন্ধেই তিনি অনভিজ্ঞ রইলেন।

আজকের শ্রান্ত বিশ্বকে শ্রীনিত্যগোপালের সর্বসমন্বয়ের বাণী শুনাবার প্রয়োজন আছে। শব্দ ব্রহ্ম; কোন শব্দ কখনও মরে না। যে শব্দ যে সুরে দাঁড়িয়ে বলা হল, সেই সুরের রিসিভার হলে তাকে ধরে নেওয়া যায়। শ্রীনিত্যগোপালের বাণীকে আপনারা ছড়িয়ে দিন—বিশ্ব থেকে সেই সুরের রিসিভার সে বাণীকে গ্রহণ করে নিয়ে মানুষের জীবনকে শান্তি দেবার কাজে প্রয়োগ করবে।”

———

'প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে ......।'

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৬১

শ্রীনিত্যগোপাল

ও

শ্রীরবীন্দ্র-শ্রীঅরবিন্দ

'নিত্যানিত্য সমন্বয় বা আত্মানাত্ম সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়।'

—শ্রীনিত্যগোপাল (বিবিধতত্ত্ব—পৃঃ ৩৮৪)

'In Physics, as in every other branch of knowledge, the problem of continuity and discontinuity has existed at all times: for in this science, as elsewhere, the human mind has always manifested two tendencies at once antagonistic and complementary......If pushed to an extreme and opposed to each other, the concepts of both the continuous and the discontinuous are unable to give a correct rendering of Reality, which requires a subtle and almost indefinable fusion of the two terms of this antinomy.'—Matter and Light—(1937) —Louis De Broglie.

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :

'ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্য্যন্ত জরিমানার

টাকা গুণে দিয়ে আসতে হচ্ছে। এমন কি তার যথা সর্ব্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে, তার কারণ এই যে, সে একচক্ষু হরিণের মত জানতো না যে, যে দিকে তার দৃষ্টি থাকবে না, সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবান এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিতভাবে কাণা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবান মেরেছে।

একথা যদি সত্য হয় যে, পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তা হোলে একথা নিশ্চয় জানতে হবে একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্যদিক থেকে এসে তার মর্ম স্থানে বাজবে।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্য মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয় তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ টানে যারা আত্মীয় রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয় সংঘাতে আকৃষ্ট হয়।'

রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন—"অর্জ্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত, তা হলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত। সেই মূল বন্ধনটী বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলি বলেছে—'হয় আমি মরব নয় তুমি মরবে।'

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্তভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি, তা হলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে, 'আত্মা মরুক আমি থাকি।' আত্মা বলে, 'প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি।' তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্ম্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়ামায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। ওদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্মের পাট একেবারে তুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্মূল করতে চেষ্টা করে—জানে না, সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত।

এইরূপে যে দুইটি পরস্পরের পরমাত্মীয়, পরম সহায়, মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন ক'রে তাদের পরম শত্রু ক'রে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই—কারণ এই দুই পক্ষই পরম ক্ষমতাশালী"।

মহা কবির শেষ সিদ্ধান্ত এই যে 'প্রকৃতি এবং আত্মা, মানুষের এই দুই দিককে আমরা যখন স্বতন্ত্র ক'রে দেখেছি তখন যত শীঘ্র সম্ভব এদের দুইটিকে পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক। আমরা যেন এই দুটি অনন্ত বন্ধুর বন্ধুত্ব সূত্রে অন্যায় টান দিতে গিয়ে উভয়কেই কুপিত না করি।'

(রবীন্দ্রনাথ—'শান্তিনিকেতন'—২৬শে পৌষ, ১৩১৫)

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সম্পর্কে শ্রীহরিদাস চৌধুরী লিখিতেছেন :

'দার্শনিক যুগের পর হইতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভারতের যে অক্ষমতা ও অধোগতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার একাধিক ঐতিহাসিক কারণ আছে। দর্শনযুগের নিবৃত্তিমূলক সন্ন্যাসাত্মক আধ্যাত্মিকতাকে এই ব্যবহারিক অপটুতার একটি প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করিলে আপত্তি করিব না, শুধু বলিব যে এই অপটুতার জন্য যাহা দায়ী তাহা আধ্যাত্মিকতার অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ রূপ। অবিচ্ছিন্ন অধ্যাত্ম সাধনার পথে ভারতের ইতিহাসে এমন এক সময় আসিল, যখন লীলাকে বাদ দিয়া শুধু লীলাময়কেই জানিবার এক চোখো চেষ্টা হইল,—সাধনার শক্তি সীমাবদ্ধ হইল ভগবানের অনন্ত রূপকে, বহুভঙ্গিম জীবনকে বিস্মৃত হইয়া শুধু তাঁহার অরূপ অনির্দ্দেশ্য সত্তার রহস্য ভেদ করিবার জন্য। পূর্ণতম সিদ্ধিলাভের পথে সময় বিশেষে সাধনাকে সীমাবদ্ধ করিবার, তীব্রতর করিবার হয়ত প্রয়োজন ছিল। এইজন্যই ভারতের অন্তরাত্মা ব্যবহারিক জীবনে পঙ্গুতা বরণ করিয়া লইয়াও বিচিত্র ভঙ্গীতে আত্ম-উপলব্ধির প্রচেষ্টা সম্ভব করিয়াছেন। কিন্তু আজ সময় আসিয়াছে—ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার বিভিন্ন ধারাকে এক সমন্বয় মূলক চরম পরিণতিতে সার্থক করিয়া তোলার, যেন আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতম বিকাশের ফলে আমাদের পার্থিব জীবনও অভিনব ছন্দে গড়িয়া উঠে।'

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা—২য় সংস্করণ, ৯ পৃষ্ঠা

শ্রীনিত্যগোপাল প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে জড়াজড় সমন্বয়ের, ব্রহ্ম-মায়া সমন্বয়ের যে বাণী নিজ জীবনে আস্বাদন করিয়া দার্শনিক ভাষায় সূত্রাকারে যুগের সামনে রাখিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে তাহাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্যে ও সাধনায় এবং শ্রীঅরবিন্দও তাহাই তাঁহার দিব্য অনুভূতি ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। সত্যই আজ সময় আসিয়াছে, যখন অধ্যাত্ম সাধনার বিভিন্ন ধারা—

হটযোগ, রাজযোগ কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান ধারা এক সমন্বয়ের মধ্যে চরম পরিণতি লাভ করিবে; এবং এই অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যে পার্থিব জীবনের আস্বাদন সমন্বিত হইয়া মানুষকে এক 'সমগ্র' মানুষে গড়িয়া তুলিবে। বর্ত্তমান যুগ এই 'মানুষে'র ধ্যানেই বিভোর। দার্শনিক যুগ যে দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আমরা ব্যবহারিক জগতে চরম ক্লৈব্যেরই প্রশ্রয় দিয়াছি। ইহার একটী কারণ শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় হইতেছে 'দর্শন যুগের আধ্যাত্মিকতা নিবৃত্তিমূলক ও সন্ন্যাসাত্মক হওয়ায়ই এই ব্যবহারিক অপটুতার একটী প্রধান কারণ বলিলে আপত্তি করিবার কিছু নাই। আধ্যাত্মিকতার অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ রূপই হইল এই অপটুতার জন্য দায়ী।' শ্রীনিত্যগোপাল এই 'বিকলাঙ্গ' আধ্যাত্মিকতার পূর্ণাঙ্গ বিধান করিবার জন্য লিখিয়াছেন: 'পুর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পুর্ণ জ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব্বজড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান।' সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার, ২য় সংস্করণ, পৃ ১১২। এতদিন এদেশে আত্মজ্ঞান ও পুর্ণজ্ঞান একার্থ বাচকই ছিল। কিন্তু নিত্যগোপাল লিখিতেছেন যে, আত্মজ্ঞান পুর্ণজ্ঞানের 'এক শাখা' ব্যতীত আর কিছুই নয়। পুর্ণজ্ঞানের 'এক শাখা' আত্মজ্ঞান, পুর্ণজ্ঞানের অপর শাখা 'অনাত্মজ্ঞান' বা জড়ের জ্ঞান। এইরূপ বৈপ্লবিক ঘোষণা সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার একজন সমাধিস্থ পুরুষ অদ্বৈতবাদী বেদান্ত-অধ্যুষিত ভারতের বুকে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। উপরে উক্ত বাণীর উপব্যাখ্যান রূপেই যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুললিত সাহিত্যের ভাষায় লিখিয়াছেন: "অর্জ্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত তাহলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত। সেই মূল বন্ধনটী বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলই বলেছে 'হয় আমি মরব নয় তুমি মরবে'। তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি, তা হলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে, 'আত্মা মরুক আমি থাকি'। আত্মা বলে, 'প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি'।...ভারতবর্ষ আজ যে শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে, সে একচক্ষু হরিণের মত জানতো না যে, যেদিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবান এসে তাকে আঘাত করবে, প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্ত ভাবে কাণা ছিল, প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।...একথা যদি সত্য হয় যে,

পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে জয় লাভ করবার জন্য একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তা হোলে একথা নিশ্চয় জানতে হবে যে, একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্যদিক থেকে এসে তার মর্ম্মস্থলে বাজবে"। হেগেলীয়ান কেয়ার্ডও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন : 'Half truth is its own Nemesis. One-sided dogmatism has the opposite dogmatism latent in itself'.—অর্দ্ধ সত্য নিজের প্রতিহিংসা নিজেই নেয়। এক তরফা গোড়ামির মধ্যে অপর তরফের 'গোড়ামি' লুকিয়ে থাকে। আত্মজ্ঞানও অর্দ্ধসত্য, অনাত্মজ্ঞানও অর্দ্ধসত্য, নিত্যজ্ঞানও অর্দ্ধসত্য, অনিত্য জ্ঞানও অর্দ্ধসত্য। আত্মা-অনাত্মা সমন্বিত জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান। নিত্যানিত্য সমন্বিত জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান।

এই পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্যই আজিকার মানুষ অন্তরে অন্তরে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে, যাহার বহিঃ প্রকাশ হইতেছে সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বস্তরে সজ্ঘর্ষ, কেবল সজ্ঘর্ষ। এই সজ্ঘর্ষেরই পজিটিভ দিক হইতেছে সমন্বয়। সমন্বয়ঘন ব্রহ্ম-পুরুষোত্তম এই সমন্বয়কে গড়িয়া তুলিবার জন্যই জাতিতে জাতিতে সজ্ঘর্ষ, নর-নারীতে সজ্ঘর্ষ, রাজা-প্রজায় সজ্ঘর্ষ, ধনিক-শ্রমিকে সজ্ঘর্ষ, স্বর্ণ-অন্নে সজ্ঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছে। পারস্পরিক এই সজ্ঘর্ষ পারস্পরিক সমন্বয়েরই পূর্ব্ব সূচনা মাত্র। Louis De broglie র continuity (সন্ততিধারা) ও discontinuity (ক্ষণিকবিজ্ঞানধারা) fusion-এর মাধ্যমে এক-অনেক সমন্বয়ের রূপে গড়িয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে বুদ্ধ শঙ্কর সমন্বিত হইবে। শঙ্কর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সন্ততিধারা, আর বুদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞান। সন্ততি ধারাই নিত্য, আর ক্ষণ সমূহ অনিত্য। নিত্যানিত্য সমন্বয় প্রবর্ত্তন দ্বারা নিত্যগোপাল বুদ্ধ শঙ্করের fusion-এর কথা, গলিয়া গিয়া এক হওয়ার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। 'Each development is by breaks and yet makes for continuity,'

জড়-অজড়ের সজ্ঘর্ষের ফলে বিশ্বে 'ধ্রুবা নীতি'র কোনও বালাই নাই, সুবিধাবাদীর দল জড়কে বা অজড়কে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া বিপরীত দিক হইতে মৃত্যুবাণকে ডাকিয়া আনিয়াছে। আজ প্রাচ্য সভ্যতা জড়ের কাছে 'জরিমানা' দিতেছে, পাশ্চাত্য জাতি অজড়ের 'জরিমানা' শোধ করিতেছে। এই জরিমানা শোধেরই নামান্তর হইতেছে দুর্নীতি। একান্ত আদর্শবাদীও এক চক্ষু হরিণের মত বাস্তব-ব্যাধের আক্রমনে বিব্রত,

একান্ত বাস্তববাদীও আদর্শ-ব্যাধের বানে বানে জর্জ্জরিত। আদর্শবাদীর কাছে 'বাস্তব' আজ ব্যাধ, বাস্তববাদীর কাছেও আদর্শ ব্যাধ তুল্য। আজ আদর্শ-বাস্তব ব্যাধের কবলে কবলিত। কর্ম্মজ্ঞানের সঙ্ঘর্ষের ফলে ভারতবর্ষ আজ কর্ম্মের অভাবে বেকার। বেকার সমস্যার মূল কারণ হইতেছে রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় 'ভারতবর্ষে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্মের পাট একেবারে তুলে দেয়।'

কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সাধনার ফলে এদেশ আজ নিষ্কর্ম্মা বেকার। বাসনার খোরাক একেবারে বন্ধ করিবার চেষ্টায় আজ এদেশে বাসনাত্যাগীর দল বাসনার 'জরিমানা' শোধ করিতেছে। তাহারা বাসনায় বাসনায় বিব্রত। কর্ম্মের বাসনা এ-দেশকে গ্রাস করিয়াছে, তাই একদল বাসনার চাপে কর্ম্ম করিতেছে বটে ; কিন্তু বুদ্ধিমান দল, vested interest-এর অধিকারী দল কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতন এই কর্ম্মীদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া নিজেদের অধিকার সুখ সুবিধাই আদায় করিতেছে। কর্ম্মত্যাগীদের এইরূপ শাস্তিই হয়, ইহা ভগবানের অমোঘ বিধান।

বর্ত্তমান বিশ্বে যত সমস্যা—বেকার সমস্যা, অন্ন বস্ত্র সমস্যা, বিকেন্দ্রীকরণ সমস্যা প্রভৃতি এই মানব জাতিকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, মূল পর্য্যন্ত যাহার জন্য উৎপাটিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে—তাহার মূল কারণ রহিয়াছে জড় অজড় সঙ্ঘর্ষের মধ্যে, নিত্য-অনিত্য সঙ্ঘর্ষের মধ্যে। জড় অজড় সমন্বয়, নিত্য-অনিত্য সমন্বয় ব্যতীত মূলগত সমস্যার সমাধান অসম্ভব। সমস্যা যখন মূলগত তখন সমাধানও মূলগত হওয়া চাই। সমস্যা যদি শাখা-প্রশাখাগত হইত, তবে সমাধানও সহজ হইত। সমস্যা যখন গভীরতম ও ব্যাপকতম প্রদেশে অবস্থিত, সমাধানও খুঁজিতে হইবে ততখানি গভীর ও ব্যাপকতার মাঝে। এইজন্য বর্ত্তমান বিশ্বকে সুস্থ হইতে সর্ব্বপ্রথমে একটী দার্শনিক বিপ্লবের পথ ধরিয়া তাহাকে চলিতেই হইবে। এই বিপ্লবের স্রষ্টা, ধারক ও বাহকরূপে আমরা নিত্যগোপালকে পাইয়াছি, ভারতের রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ পরবর্ত্তীকালে তাঁহাকেই সুস্পষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই সঙ্ঘর্ষ সমন্বয় রূপে গড়িয়া উঠিবে কোন্ পথে? যাহারা পরস্পর বিলক্ষণধর্ম্মী, তাহারা মিলিবে কি করিয়া একই মৈত্রী বন্ধনে? ইহারা দুই-ই যখন স্বয়ং মূল্যবান ও সমকক্ষ, তখন ইহাদিগকে সমান্তরাল (parallel) বলা যাইতে পারে। সমান্তরাল জড়-অজড় কি করিয়া সমন্বিত

হইবে? তবে কি Two parallel lines meet at infinity এই সূত্র ধরিয়া মীমাংসা খুঁজিতে হইবে? তাহাতেও মীমাংসা আসিবে না। কেননা, আবার সেই infinityতে, অনন্তের দেশে—সান্তের ক্ষেত্রে নয়—গিয়াই সমান্তরাল দুইটার মহামিলনের সিদ্ধান্ত করা হইতেছে। যতদিন সান্তের (finite) বুকে অনন্ত অবতরণ না করিবে, অজড় জড়কে পরমাত্মীয় জ্ঞানে নিজেরই প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্ররূপে স্বীকার না করিবে, ততদিন জড় অজড়ের স্বয়ং মূল্য প্রতিষ্ঠার উপরে সমন্বয় গড়িয়া উঠিবে না। মহামতি হেগেল অজড়ের মাঝে সর্ব্বদ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজিয়াছেন, মিহামত মার্কস্ খুঁজিয়াছেন জড়ের মধ্যে; কিন্তু দুই-ই ঐকদেশিক। কেহই দুইয়ের সমকক্ষতার উপরে, দুইয়ের সমান্তরালতা অটুট বজায় রাখিয়া, দুইকে দুই রাখিয়া দুইকে মহা ঐক্যের মধ্যে মিলাইতে পারেন নাই। এ দেশের অনেক মনীষী মায়াকে ব্রহ্মের মধ্যে মুছিয়া ফেলিয়া, নারীকে নরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তাই 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যং অর্হতি' এই কথা তাঁহারা লিখিতে পারিয়াছেন। কিন্তু আজ যুগের বদল হইয়াছে। আজ দুইকে সমান্তরাল রাখিয়া সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

কি করিয়া ইহা সম্ভব, তাহাই এইবার আলোচনা করিব। জড় পরিণাম ধর্ম্মী, উহা ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। বাল্যক্ষণ মরিয়া গিয়া কৌমার ক্ষণে গড়িয়া উঠে, কৌমার ক্ষণ কৈশোর ক্ষণে গড়িয়া উঠে। প্রতি ক্ষণ অনিত্য, অথচ এই অনিত্য ক্ষণ ভগবান বুদ্ধের মতে সত্য। 'যৎ ক্ষণিকম্ তৎ সত্যম্'। কিন্তু অপরিণামী অজড় ব্রহ্ম নিত্য সত্য। অজড় ব্রহ্মে পরিণাম হয় না, পরিণামী বহু, অপরিণামী এক। বেদান্তের মতে যেখানে পরিণাম ফুরাইয়া যায়, তাহাই অপরিণামী ও অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পরিণামী অপরিণামীর অনন্ত বন্ধু। এতদিনকার বেদান্ত মতে অপরিণামী অনাদি অনন্ত, কিন্তু পরিণামী অনাদি সান্ত; অবিদ্যা বশতঃই সান্ত-অনন্তের মিলন সম্ভব, অবিদ্যা-ঘোর কাটিয়া গেলে পরিণামী ফুরাইয়া যায়, অবশিষ্ট থাকেন অপরিণামী। পরিণামীকে বিনাশশীল, এবং অপরিণামীকে 'অবিনাশী' ধরিয়া লইবার পর কি করিয়া দুইয়ের সমমর্য্যাদায় সমন্বিত করা সম্ভব? তাই শ্রীনিত্যগোপাল প্রথমেই অনুমান (hypothesis) রূপে মায়া ও ব্রহ্ম, অবিদ্যা ও ব্রহ্ম দুইকেই অনাদি ও অনন্ত ধরিয়া লইয়াছেন। যে অনুমান ধরিয়া লইলে অধিকতর ঘটনার ব্যাখ্যান মিলে তাহাকেই 'সত্য' বলিয়া ধরিতে হয়।

চোখের দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, সূর্য্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। এই অনুমান এতদিন চলিয়াছে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে ধরিয়া লইলে অধিকতর ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়, তখন তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল দর্শন মতে ব্রহ্মের মত মায়া—অবিদ্যাও অনাদি অনন্ত। এমন কোন দিনই হইবে না, যে দিন মায়া অবিদ্যা মুছিয়া যাইবে, একমাত্র ব্রহ্মই থাকিবেন। নিত্য দর্শনে সর্ব্বকালে, যাহাকে কালাতীত বলা হয় সেখানেও, ব্রহ্ম আছেন, মায়াও আছেন, অবিদ্যাও আছেন। তাই নিত্যদর্শনে সমাধিও মায়া। নির্ব্বাণও মায়া। যাহাকে এতদিন 'মায়াতীত' ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সেই মায়াতীত থাকাটাও নিত্য দর্শনে 'মায়া'।

এখন এই অনন্ত ক্ষণপরিণাম ও অনন্ত অপরিণামীর সমন্বয় কোন্ যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। যদি প্রতিটী 'ক্ষণ' অনন্ত হয়, স্বয়ংমূল্যবান হয়, এবং প্রতিক্ষণের বুকে যদি ক্ষণাতীত পরিপূর্ণ রূপে বিরাজিত থাকিতে পারে, তবেই ক্ষণ ক্ষণাতীতের সমন্বয় সম্ভবপর হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যেই আছে। গঙ্গার প্রতিটী জল কণাও এক হিসাবে পূর্ণ গঙ্গা ; কেননা, গঙ্গার যে-কোন অংশে স্নান করিলেই পূর্ণ গঙ্গাস্নান হয়। গঙ্গাস্নান করিলাম বলিলে কি কেহ বোঝেন যে, হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার প্রতিটী অংশে, প্রতিটী জল কণায় কেহ স্নান করিয়াছে ? ভারতের যে-কোন অংশে বাস করিলেই তাহাকে 'ভারতবাসী' বলা হইয়া থাকে। আমরা দেশ-কালের পরিচ্ছিন্ন ভাষায় এমনই অভ্যস্ত যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপী বলিলে তৎক্ষণাৎ ইহাই মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ কেমন করিয়া একই সময়ে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে থাকিবেন ? বিস্তৃত দেশের ধারণা ব্রহ্মে অচল। প্রতি সান্তে অনন্ত থাকিতে পারেন এবং 'অনন্ত' বলিয়াই পারেন। অনন্তের কাছে অন্তশীলের যে-কোন পরিণামই তুল্যভাবে সমান। তাই তিনি 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'। তিনি অণুতে মহতে সমান, 'Every moment, nay every situation, is of infinite value ; for it is the representative of the whole of eternity.' প্রতি ক্ষণটী অনন্তের প্রতিনিধি। ক্ষণ ক্ষণ হিসাবেই সত্য, তবে নিত্যগোপাল বলেন 'অনিত্য সত্য'। নিত্য সত্য ও অনিত্য সত্য বলিয়া সত্যের দুইটী রূপের সিদ্ধান্ত তিনি করিয়াছেন।

এইখানে দাঁড়াইয়াই উপনিষদ সর্ব্ব ও বহু শব্দে ভেদ করিয়াছেন। অল্প ও অধিক উভয় ক্ষেত্রেই সর্ব্ব শব্দ প্রযোজ্য। সব দুধটুকু খাও বলিলে এক পোয়াও হইতে পারে, আধ সেরও হইতে পারে, পাঁচ সেরও হইতে পারে। তাই এক পোয়াও 'সর্ব্ব', আধ সেরও 'সর্ব্ব', পাঁচ সেরও 'সর্ব্ব'। ক্ষুদ্রতম দেশও 'সর্ব্ব', বৃহত্তম দেশও 'সর্ব্ব'; ক্ষুদ্রতম কালও 'সর্ব্ব', বৃহত্তম কালও 'সর্ব্ব'—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। 'সর্ব্ব'-শব্দটী অখণ্ড (integral)। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুদ্রতম স্থানে বা কালে থাকিয়াও সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পারেন। এইখানেই শ্রীনিত্যগোপালের আকার-নিরাকার সমন্বয় সাধিত হইতেছে।

ভারতের প্রতিটী অংশে বাস করিলে ভারতবাসী হওয়া যায় সত্য, কিন্তু ভারতবাসী হওয়ার আরও সমগ্র রূপ আছে। ভারতের একটী অংশে ভারতের যে প্রকাশ, অন্য অংশে ভারতের তো ভিন্ন রূপ প্রকাশ রহিয়াছে। বাংলার বুকে অবস্থিত ভারতবর্ষ এবং বিহার বা মাদ্রাজের বুকে অবস্থিত ভারতবর্ষ কি এক ভারতবর্ষ? নিশ্চয়ই নয়। প্রদেশ ভেদে তাই তো ভারতবর্ষ বিভিন্ন হইতেছে। তাই সমগ্র ভারতবর্ষকে চিনিতে ও আস্বাদন করিতে হইলে প্রতিটী প্রদেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভারতবর্ষকে চিনিতে ও আস্বাদন করিতে হইবে। কোনও একটী প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া ভারতবর্ষকে পাইতে গেলে প্রাদেশিকতা অনিবার্য্য, এই প্রাদেশিকতা যদি প্রতি প্রদেশবাসীর শক্ত হইয়া পড়ে, তবে কি মূল ভারতবর্ষই খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া শূন্য বস্তুতে পরিণত হইবে না? ভারতবর্ষকে পাইতে হইলে তাই প্রতি প্রাদেশিককেও সর্ব্ব প্রাদেশিক হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রদেশ সমন্বয়ই প্রদেশাতীত ভারতবর্ষ। প্রতিটী প্রদেশ যখন নিজের হৃদয়স্থিত ভারতবর্ষকে আস্বাদন করিয়া অন্যান্য প্রদেশসমূহের বুকে লুকানো ভারতর্ষকে পাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে, হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইবে, তখনই প্রদেশসমূহদ্বারা সংগঠিত রাসচক্রের মধ্য-মণিরূপে বিরাজ করিবেন সমগ্র পুরুষোত্তম ভারতবর্ষ, উজ্জ্বল ভারতবর্ষ। শ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয়তত্ত্বকে এতখানি বিস্তৃত ও গভীরতম অর্থে আস্বাদন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে অল্প ও ভূমার ভেদ তিরোহিত। তাঁহার দর্শনে অল্প অল্প হিসাবে সত্য, ভূমা ভূমা হিসাবে সত্য। তাই তিনি লিখিতেছেন, 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দ পূর্ণ।' পূর্ণের এই গতিপ্রধান (dynamic) রূপ আঁকিয়া দিয়া বিশ্বের বুকে তিনি অদ্বিতীয় দার্শনিকরূপে এক বৈপ্লবিক দর্শন স্থাপন করিয়া

গিয়াছেন। এই দর্শনের ছাঁচে বিশ্ব গড়িয়া উঠিলে সর্ব্ব সঙ্ঘর্ষ সর্ব্ব সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিবে। ধরার ধূলি হইবে ব্রহ্ম ধূলি, ধরার মানুষ হইবে ব্রহ্ম মানুষ। ধরা ইহারই প্রতীক্ষায় ধ্যানমগ্ন।

শ্রীনিত্যগোপাল-দর্শনে সর্ব্ব সঙ্ঘর্ষের ক্ষেত্রকে সর্ব্ব সমন্বয়ের ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তুলিবার একটী উন্মাদনার শক্তি রহিয়াছে। ইহা শুধু ভাবুকতা নয়। ভাবকে রসরূপে সৃষ্টি করিবার প্রেরণা ইহার মধ্যে ভরপুর রহিয়াছে। শ্রীনিত্য-দর্শনে পরাভক্তি পরম জ্ঞান ও পর কর্ম্মের সমন্বয় থাকায় ইহা নিত্য দর্শনই বটে। এক একজন মহাপুরুষ এই নিত্যদর্শনেরই এক একটা দিকের বিবরণ ও আস্বাদন দিয়া গিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহাদের ক্রমবিবর্ত্তিত সমন্বিত রূপ; তাঁহার দর্শনও ক্রম-বিবর্ত্তিত সর্ব্বদর্শন সমন্বিত দর্শন। তাঁহার আবির্ভাবে বিশ্ব তাঁহার এই পর বৈরাগ্যময় দিব্য জীবনের আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবে। তাঁহার দর্শনই 'creative philosophy।' তাঁহার এই মহান্ আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক।

বন্দেমাতরম্

অহল্যা মাটি-কে

মানবেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কচি কচি পাতাগুলোর সবুজ-সোনা রঙ্
বহু চৈত্রের নিঃশ্বাসের হল্কায়
পুড়ে গিয়ে হ'য়ে গেলো হলুদে।
হে অহল্যা, গৌতমের শাপগ্রস্তা হে অহল্যা মাটি,
তবুয়ো তুমি আকুল প্রতীক্ষায় গুণছো দিন ?
তোমার পলি-মাটির ফসলে বেড়ে-ওঠা
সন্তান আধা-উলংগ দেহের প্রত্যেকটি হাড়
চামড়ার শুকনো পর্দার বাইরে থেকে যাচ্ছে দেখা—
দুঃস্বপ্নের মতো ওদের দিন কাটে উপোষে,
শীতের হিম-বাতাসে, রক্ত-জমে যাওয়া আবহাওয়ায়
ফুটপাথের দুঃসহ পরিবেশে
কাটে ওদের কাল।
বাস্তহারা কুমারী মেয়ের লজ্জা-আটকানোর
মিথ্যে প্রচেষ্টায়
ছিন্ন শাড়ীর আঁচল কাঁদছে গুমরে
দুঃশাসনের হিংস্র নির্লজ্জ আচরণে।
তবু ওগো পাষাণী অহল্যা মা,
বোবা-চোখে দেখে চলেছো
তোমার সন্তানদের দুর্দশা ?

আকাশের রঙ্ শাদা-নীল আভা হারিয়ে
রাত্রির কালো ডানায় পড়লো ঢাকা,
তবু, হে পাষাণী অহল্যা,
তোমার পাথুরে চোখের ডানা রামের খোঁজে
মন-আকাশের সীমানায় দিচ্ছে পাড়ি ?

হে অহল্যা মাটি, তোমার মন আর কতো কাল
মিছেমিছি প্রতীক্ষাতে কাঁপবে থরো-থরো ?
শীতের শেষে সবুজ আগুন লাগলো আবার বনে বনে,
বসন্ত তার রঙ্ লাগালো এই পৃথিবীর কোণে কোণে,
তবুয়ো তুমি, অহল্যা গো, প্রতীক্ষাতেই কাটিয়ে দেবে কাল—
এলো না রাম—আসবে না সে যতোই কাটুক কাল।

কালবোশেখির ঝ'ড়ো ঘোড়ার খুরের নিচে নিচে
ফুল্কি ওঠে রাস্তা থেকে আজ,
সবুজ পাতার দলকে পিষে পিষে
লাগাম ছেঁড়া ঘোড়ায় বাতাস করলো কশাঘাত,
ছুটলো ঘোড়া তীব্রতম বেগে !
তবুয়ো তুমি, পাষাণী মা, প্রতীক্ষাতেই কাটিয়ে দেবে কাল ?
হ্যাখো না চেয়ে,
আকাশ আনে তোমার শোকেই আজ চোখের জলের বান—
রামের পথ আট্‌কেছে যে যুদ্ধবাদীর কাঁটাতারের জাল !
আগুন-জ্বালা রোদে তেতে-ওঠা উত্তাপ ভরা দিনগুলো যায় কেটে,

গরম হাওয়ায় উঠলো ফুলে বেলুন মন—এই বুঝি যায় ফেটে,
আকাশ থেকে অকাল-ঝরা-জল চুপ্‌সে দিলো
সেই আবেগও হায়—
অহল্যা মাটি, রইবে তুমি তবুয়ো প্রতীক্ষায় ?

কাশের বনে শাদা-রূপোর আকাশ থেকে নামলো ঘন ছায়া,—
রূপোর শাদা দিকে দিকে ধরলো তার কায়া
চাঁপা-শেফালিকার গানে,
আকাশ-বাতাস মাঠের ধানে
নতুন প্রাণের লাগে সোনার ছোঁয়া।
এলো না রাম এবারো তো—আর কতো কাল বলো,
তোমার চক্ষু প্রতীক্ষাতেই করবে ছলো ছলো ?

গলে-যাওয়া রাতের শেষে আকাশেতে আলোর কুম্‌কুম্

মাঠের বুকে সোনা-ফসলের স্বপ্নে ভরা-ঘুম।

ফাঁকা গোলার বুকে জাগে পূর্ণ হবার আশা,

তোমার মন তবুয়ো হায়

কাটায় কাল আকুল প্রতীক্ষায় ?

এলো না রাম—আসবে না সে—তবুয়ো সর্বনাশা

প্রতীক্ষার ক্রন্দনেতে তোমার বুকে গুমরে ওঠে ভাষা ?

তার চেয়ে শোনো, ওগো পাষাণী অহল্যা,

শোনো শাপগ্রস্তা মাটি মা,

যৌবনের সতেজ আবেগে

বাধার দেয়াল ফাটিয়ে ওঠো জেগে।

মিছেমিছি কেন বসে বসে তুমি

সময়-পল গুণে চলছো অহল্যা মা ?

তুমি তো জানোই, তোমার বুকেই সকল জোর,

তোমার সারা দেহে মিশে আছে বারুদ,

তোমার বুকে ঘুমিয়ে আছে আগুন-ভরা-লাভা,

যেমন করে ঘুমিয়ে থাকে গিরিগুহায় পশুরাজ সিংহ !

ওগো অহল্যা মাটি,

বাধার পাথুরে পাঁচিল কাটিয়ে

সিংহের মতো কেশর ফুলিয়ে জাগো—

দাও বুকের লাভা ছড়িয়ে চারদিকে,

আর সে লাভার নিচে পুড়ে ছাই হয়ে যাক্

জগতের সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, অশান্তি।

জাগো জাগো পাষাণী মা,

ঘুমের সকল দেয়াল ভেংগে-চুরে

লাভা প্রক্ষেপণের শক্তি নিয়ে

বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতের মতো ॥

———

পথের সঞ্চয়

সনাতনী মুখোপাধ্যায়

এক একটি ঋতু যখন তার এক একটি বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে মানুষের মনের দরজায় নাড়া দেয়—তখন মানুষের সব আগে ইচ্ছা হয় পুরানো যা কিছু তাদের ঝেড়ে নেড়ে উড়িয়ে দিতে। আর এই উৎকট ইচ্ছার বাহন হলো বসন্তের বাসন্তী এবং শরতের শারদীয়া। শান্তশিষ্ট শীতের মন্থর স্পর্শে অলস নিদ্রাভিভূতের দখিনার সহসা চাঞ্চল্যে ইতস্তত: স্বপ্নালু চাহনির সংগে, বর্ষার কাজল করুণ চোখের অশ্রান্ত মিনতির পর শরতের গাঢ় স্নেহসিঞ্চিত ঈষৎ-গর্বিত হাসির কোন উপমা পাওয়া যাবে না সত্যি, কিন্তু উভয়কেই করুণ নাটকের মধ্যেকার এক একটি ট্র্যাজিক রিলিফএর জায়গায় বসিয়ে দিলে সমালোচকরা বোধহয় কটাক্ষপাত কোরবেন না।

প্রাচীন ভারতীয় কাব্য সাহিত্যে দেখা যাবে এই মৃদু হিমেল বায়ুর ছোঁয়াচ লাগা স্নিগ্ধ স্বচ্ছ শরত ঋতুকেই তখনকার রাজারাজরারা তাঁদের প্রমোদ মৃগয়ার উপযুক্ত কাল হিসাবে পছন্দ করে নিতেন। দীর্ঘদিন শাসনদণ্ড ধারণ করে ক্রমাগত পরের চিন্তায় মগ্ন থাকার পরে হঠাৎ এই সময়ে যেন নিজের সত্তাটা এক নজরে পড়ে যেত, ব্যাস্ আর নয়। ফেলো দণ্ড, খোলো ধড়া চূড়া, রাখো পিছনে গুরুগম্ভীর রাজপ্রাসাদ, বয়সের কৌশলেঘটিত নৈরাশ্য দর্শনকে পর্দার আড়ালে রেখে বেরিয়ে আসত রোমান্টিক ভাবচপল চিরতরুণ একটি মন। জমকালো রাজপোষাকের মধ্যে থেকে শিকারীর সরল বেশের আভাষ পাওয়া যেত, যখন রাজচক্রবর্ত্তী তপোবনের আশ্রমকুমারীর সরল অন্তরের সহজ আতিথ্য গ্রহণ কোরতেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে ঋতুর চক্রাবর্ত্তনে মনের পরিবর্ত্তন সর্বযুগের—সর্ব কালের। সত্যযুগের প্রবীণে আর কলিযুগের নবীনে কোন তফাৎ নেই।

তফাৎ নেই বলেই তো আজকের আমরাও সেদিনকার তাদের মত অনুভব করি সেই সর্বকালীন মৃগয়ার উন্মাদনা, প্রতিটি যুগের প্রতিটি বিশেষ ঋতু শিহরণ জাগায় দেহে-মনে, তার হিমসিক্ত শেফালীর গন্ধে, খণ্ড খণ্ড লঘু মেঘের আর কাশের শুভ্রতায়, নির্মল আকাশের গাঢ় নীলিমায় সেই সুদূরের ইসারা আজও সুস্পষ্ট।

মৃগয়া তো সর্বদাই আর মৃগয়া নয়, কেবল নীরস বাঁধাধরা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক যান্ত্রিক জীবন যাত্রা থেকে ক্ষণেকের পরিত্রাণ।

যেহেতু সরল সত্য লঘু হলেও তার চাপল্য নেই—সেহেতু সোজা কথাটা স্বীকার করলে তামাসার সম্মুখীন হবার আশঙ্কা না থাকারই কথা। সহজ ভাষাতেই বলি—সেই চিরন্তন প্রেরণাই অনুভব করে থাকি প্রতি শরতের আগমনে। আগমনীর মধুর রাগিণী শুধু কৈলাসধামে গিরিকুমারীর মানস বেণুতেই প্রমোদ বিহারের ঝঙ্কার তোলে না, তাঁর পুত্রকন্যার মনোবীণাতেও স্বর্ণপর্দায় সুরের রেশ তুলে সৃষ্টি করে মিলিত ঐক্যতানের।

কথা হচ্ছিল আমাদের রাজগীর যাবার। মূল কেন্দ্রস্থলে রাজগীরকে বসিয়ে দিয়ে খানিকটা চক্রবৎ পরিভ্রমণ করতে পারা যাবে অবশ্য।

যেহেতু সবকিছু গণ্ডীবদ্ধতা থেকে মুক্তি আজ—ট্রেণের কঠোর অংগুলী-হেলনকেও মেনে চলা উচিত কাজ হবে না। চারিচক্রযানই উৎকৃষ্ট এ ক্ষেত্রে।

ষষ্ঠীর প্রভাত, গাড়ী ছুটে চলেছে। জানি এ যাত্রা অনন্ত নয়। জানি এই গতির তালে তালে কালের মন্দিরায় শাশ্বতের ধ্বনি উঠবে না, সীমা-হীন লক্ষ্যের পানে এই অভিযান নয়, তবু যাত্রাপথের বিভিন্ন পট পরিবর্তনে, প্রতি মুহূর্তের অতিক্রান্তিতে অসীমকে অন্তরস্থ করার আবেগচঞ্চল আগ্রহ কেন?

প্রভাত ও মধ্যাহ্নের সীমানা পার হয়ে সূর্য আবার স্থলে জলে অন্তরীক্ষে আরক্তিম ছায়া ফেললে; পাহাড়ের ধূসরতা ইতিমধ্যেই গোচরীভূত হচ্ছে। ক্রমশঃ প্রকৃতির রক্তরাগরঞ্জিত মুখের উপর নেমে আসছে করুণ ম্লান আবরণ। জনশূন্য প্রান্তরের আঁধারেই বুঝি সন্ধ্যার যথার্থ প্রশান্ত গম্ভীর রূপ চিত্রিত হয়। সহরের সন্ধ্যা বিদ্যুৎ কটাক্ষমণ্ডিতা লাস্যময়ী হাস্যমুখী তরুণী—দুজনের মাধুর্যে ভিন্নতা যথেষ্ট। মনে হচ্ছে রাত্রি গভীর হয়ে এলো—আস্তানার অবশ্য প্রয়োজন। সংগীদের মধ্যে তো অনেককেই নাবালকের পর্য্যায়ে ফেলা চলে, বাবা মা চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

মধুবনীর ধর্মশালায় যখন পৌছান গেল রাত তখন নটার বেশী হবে না। এই জৈন ধর্মশালাটির পরিবেশ বড়ো মনোলোভা, এই বিশাল ভবনটির ডানদিকে বিহার প্রদেশের সর্বোচ্চ শিখর "পরেশনাথ" আর বাঁদিকে সুন্দর কারু ও চারুকলা শোভিত জৈনমন্দির, চব্বিশজন তীর্থংকর নানাভাবে ও ভঙ্গীতে অধিষ্ঠিত।

পরদিন গয়ার পথে বুদ্ধগয়ার দর্শন পাওয়া গেল। এই বিশুষ্ক বন্ধুর ভূমিতে আর তার মরা নদীর কিনারে কিনারে একদিন পরিভ্রমণ করেছিলেন ভগবান তথাগত, আজ থেকে প্রায় ছাব্বিশ শ' বছর আগে, কে জানে সেদিনও প্রকৃতির চেহারা এমনি ছিল কিনা। থাকবার কথা নয়, হয়তো উদ্দাম বন্য এক মূর্ত্তি ছিল তার, মানুষের সুরুচির প্রভাব তখনো তার উপর পড়েনি।

বহুদিন মাটীর নীচে ঢাকা পড়েছিল এই বুদ্ধমন্দির। খুঁড়ে সংস্কার করার সময় মন্দিরের ও মূর্ত্তির কিছুটা বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু গৌতমের শিশুসুলভ সারল্যমণ্ডিত নিবিড় ধ্যানমগ্ন সর্বসহা প্রশান্ত গম্ভীর অবয়বের কি যথার্থ কোন বিকৃতি ঘটেছে? মন্দিরের মধ্যস্থলে ওই যে ধ্যানের মুদ্রায় লীলায়িত মূর্ত্তি—ওর কারুকার্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণী মনোভাব আনবার অবকাশ এখন কোথায়। ভাবে সংযোজনে, পরিবেশে সবই তো অটুট। তবু কিসের যেন দ্বিধা আর ঘোচে না। প্রবহমান কল্পনার যে অরূপের ব্যঞ্জনা, যে অসীম ভাবের পটভূমিকায় তার বিকাশ—সে প্রবাহকে বদ্ধ করে, সে অসীমকে কঠিন সীমার মাঝে নিহিত করে কি সত্যকার কোন তৃপ্তি পাওয়া যায়? ধ্যানের ধারণাকে চিত্রে সন্নিবেশিত করলে চিত্রিত রূপটিই তো সেখানে উগ্রভাবে প্রকট, রূপাতীতের সন্ধান সেখানে কতটুকু মিলবে? সেই অসীম জ্ঞানের, অনন্ত মাহাত্ম্যের চরম বিকাশ কি এই একটি মাত্র রূপের মধ্যেই, সেই অগাধ ভাবরাশির পরিচয় কি কয়েকটি ভংগিমার মুদ্রায় সঞ্চিত আছে?

মন্দিরের পিছনে বোধিদ্রুম, অশ্বত্থবৃক্ষে বটের ফল। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য কি স্থানের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় হেতু? কোথায় ছিল এই জনকোলাহল, এই শত সহস্র ভাবুক ও ভক্তের পদচিহ্ন, আর কোথায় বা তত্ত্বনির্ণয়ের যথার্থ বিচারের অনুসন্ধিৎসা, যখন ছাব্বিশশ' বছর অতীতে একটি মানুষের সমস্ত হৃদয় মন্থন করে একটি প্রশ্ন উঠেছিল—মানব জিজ্ঞাসার বিশাল প্রশ্ন। স্থির অনিমেষ লোচনে নিবিড় একাগ্রতার মধ্যে তন্ময় হয়ে সেই চরম প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছিল একাদিক্রমে সপ্ত অহনিশ; উত্তরের আকুল তৃষ্ণায় বিহ্বল হয়ে— একই স্থানে শতটি দিন পদচারণা করে বেড়িয়েছে। মাটীর পৃথিবীতে বসে মাটীর মানুষের সমস্যা নিয়ে সেই একা যাত্রী কত উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধতর লোকে ধ্রুবতারার স্থির আলোকে সমাধানের পথ খুঁজে খুঁজে চলেছিলেন। সমস্যার ক্ষেত্রটি কী সঙ্কীর্ণ, সমাধানের পথ কতো বিরাট; ব্যর্থতা মেনেছে সেখানে

অরণ্যের হিংস্র শ্বাপদকুল, দৈহিক অভিযোগ, ইন্দ্রিয়ের সুতীব্র তাড়না। দুশ্চর তপস্যা অন্তে সিদ্ধিলাভে জ্যোতিষ্মান্ সকল নিপীড়ন অস্বীকার করে ক্ষমাসুন্দর হাসিমুখে ধরিত্রীকে সেদিন নিরীক্ষণ করেছিলেন। ধর্মের চেতনা আর জ্ঞানের মহিমার অপরূপ মিশ্রণ সে দৃষ্টিতে স্বর্গের শোভা এনেছিল।

তাই ফিরে যাবার পথে পিছনে তাকাবার বাসনা এখানে জাগে না, মনের মাঝে শেষবারের মত বিলীয়মান দৃশ্যটির ছবি এঁকে নেবার প্রয়োজন হয়না, অলৌকিক মাধুর্যের অসাধারণ গরিমা অস্পষ্ট হয়ে যাবে না কোনদিন। এগিয়ে চলে যাও, সংগে সংগেই চলবে, বহুদূরব্যাপী এর বিস্তার, পিছনটানার প্রয়োজন কই! সমস্ত সম্মুখ তো এই জুড়ে রেখেছে।

গয়ার "ভারতসেবাশ্রম্"। স্বামী প্রণবানন্দজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সেবকদলের পরিচালনায় সহজ সুন্দর একটি আশ্রমিক গার্হস্থ জীবনযাত্রার ব্যবস্থা। গয়া হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রগুলির অন্যতম। তবু স্বীকার না করে উপায় নেই অপরাপর তীর্থস্থানগুলির মত এই ক্ষেত্রেও মানুষের দুর্নীতি ক্রমাগত বড় একটা স্থান দখল করে চলেছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পদচাপ এর উপর কবে পড়বে কে জানে।

সবার শেষে রাজগীর! রাজগীর যাবার পথে এক বাঁকা পথ ধরতে বাসনা জাগলো সকলের। বাঁকা যখন পথ, প্রকৃতিও তার সেই অনুযায়ী হওয়া স্বাভাবিক। তাই পিচঢালা মসৃণতা নেই এ পথে। সরু মেঠো কঙ্করময় পথ রক্তাভ ধূলিতে ধূসর, দুপাশে সবুজের কুলহারা স্রোত। গাড়ী ছুটে চলেছে। কিন্তু নিয়ম ভংগের প্রবল উদ্দীপনা যখন জেগেছে, বিশৃংখল আলোড়নের সম্মুখীন হতেই হবে বৈকি। সামনে পড়েছে আমাদের ফল্গুর ক্ষীণধারা। মানুষ হয়তো হেঁটেই পার হয়ে যাবে কিন্তু এই যন্ত্রদানবটার সবশক্তি যে অচল এখানে। অবশ্য অন্যগুলির চেয়ে তার কিছুটা বিশেষত্ব আছে—তবুও।

আর কিছুদূর এগিয়ে সামনে পড়েছে এক ভগ্ন সেতু, একদিকটা তার একেবারে ভেঙে নদীর মধ্যেই নিমজ্জিত। উপায় কি এখন? যে আমাদের বোঝা এতক্ষণ এতটা পথ বহন করে আসছে তার বোঝা বহন করার সাধ্য আমাদের বিন্দুমাত্র নেই। বিপুল বালুরাশি সামনে, নীচে শীর্ণা কিন্তু খরস্রোতা ছোট্ট পাহাড়ী নদী আর আশেপাশে দুটি চারটি খর্জুর বৃক্ষ; ওয়েসিসের চমৎকার এক মডেল—মাঝখানে তার ক্লান্ত বেদুইনের মত কয়েকটি প্রাণী।

খুবই আশার কথা যে যেমন করে হোক বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় মানুষের স্থান সব আগে। কয়েকটি কাঠুরিয়ার দল চলেছিল কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে, সেই কাঠের বোঝার মাধ্যমে সেই সেতু ও জমির ব্যবধান ঘোচানোর মতলব মাথায় খেলে গেল। আর যায় কোথা ? হৈ হৈ করতে করতে সম্পূর্ণ অদক্ষ কারীগরেরা অপটু হাতে এক দুষ্কর মিলন সাধনে ব্রতী হয়ে পড়লো। কর্ম হলো সমাপন, এখন পরখ করা দরকার এই মিলন স্থায়ী হবে কিনা। ড্রাইভার ষ্টিয়ারিং ধরে জোর দিতেই কাঠের বোঝা সরবে জানালো। অসম্ভব! আবার চেষ্টা এবং বিফলতা। তৃতীয় বারে অবশ্য মানুষের বুদ্ধিই জয়লাভ করলো, অগ্রগতির পথে যথার্থ নিষ্ঠা থাকলে বাঁধা টেঁকে কতক্ষণ!

তবু তো নদী এবং ভগ্নসেতু বহুপদের একটা বিঘ্ন। এবার সুরু হলো প্রতিপদের বিঘ্ন। খাড়াই পাহাড়ের বুক চিরে সরু পায়ে চলা পথ চলে গেছে। সেই পথেই যেতে হবে। পাহাড়ের অপর পিঠে রাজগীর। সে কী পথ, বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই বিরাট বিরাট গহ্বর ও খাদ, উভয়পাশে প্রস্তরময় বনরাজি। উৎরাইয়ের পথে গাড়ী যতটা এগিয়ে যেতে পারছে চড়াইয়ের পথে ঠিক ততটাই পিছিয়ে আসছে। যাত্রীদের মুখ আতঙ্কে বিশুষ্ক। অবশেষে এল এক ভয়াবহ উৎরাই পথ। ড্রাইভার স্পষ্ট জানালে গাড়ী এবং যাত্রী উভয়ের দায়িত্বই তাকে ত্যাগ করতে হবে গাড়ী আর এগিয়ে নিতে গেলে। যাত্রীরা অম্লান বদনে তাকে দায়িত্বভার ত্যাগে সম্মতি জানিয়ে দিলে। কী হবে, হয়তো হোক না সেই মহানির্বাণ লাভ, তার আগমন তো প্রত্যেকের কাছে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে অবস্থায় সে আসে সে সময়কার অনুভব শক্তি অনেক-ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, আজকে যদি এই পুর্ণ সজাগ ইন্দ্রিয়দ্বারা তার সত্তার পরিচয় পেতে পারি,—সমস্ত দেহমন যদি তার রোমাঞ্চকর স্পর্শের উষ্ণতায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে, সচেতন অনুভূতি যদি তাকে উপলব্ধি করতে পারে—তবে তো জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত রয়ে গেল। কিন্তু এই চোখদুটি নিবিড় অনুভূতি মাঝে এতখানি অন্তরায়, সে সকল অনুভূতিকে দুর্বল করে এতখানি প্রধান হয়ে ওঠে···। তাই বুঝি মহাপ্লাবনের দিনে মানুষের অনুভবশক্তির এমন চূড়ান্ত পরাভব ঘটেছিল শুধু এই আঁখি দুটির মোহগ্রস্ত প্রভাবের বলেই। যদি সকল অনুভূতির নিবিড় যোগাযোগ লাভ করতে হয় তবে নয়নযুগল বন্ধ করো, বর্ত্তমানকে উপভোগের সকল পথই রুদ্ধ প্রধানতঃ এই দৃষ্টিশক্তিরই সম্মোহনে। আঁখিপাতা মুদ্রিত করে চেতনা

দিয়ে জেনে নিতে কি পারবে না সেই মহাসত্যের রূপকে, বুঝে নিতে পারবে না তার অমোঘ শক্তি ?

দুর্গম গিরিপথ পার হয়ে এসেছি, মন শূন্য, দেহ ক্লান্ত, কি যেন হারিয়ে এলাম ওই উত্তেজনাময় পথের বাঁকে। "রাজগৃহের" মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আদি সন্ধানীর দৃষ্টিতে খুঁজে দেখছি তার প্রাচীন ঐতিহ্যের সম্পদ, বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর গৌরবময় রাজধানী কি কয়েকটি পাথর আর মৃত্তিকাস্তূপের স্মৃতি হয়েই জেগে থাকবে ? বোধ হয় তাই।

এবার এসেছি নালন্দা, না-ল-ন্দা, ভাবাবেগে মুদে আসে আঁখি, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, চোখ যেন স্বপ্নরাজ্যে নিবিষ্ট হয়ে গেছে। হে নালন্দ, তোমার আয়তনের বিশালতাই কি সূচিত করছে তোমার প্রাণের উদার ব্যাপ্তি, জ্ঞান ও চিন্তাধারার গগণচুম্বী উচ্চতা, মানবীয় মাহাত্ম্য ও উদারতার চূড়ান্ত প্রকাশ তোমার প্রতি প্রকোষ্ঠে, প্রাচীরে, স্তূপের পঞ্জরে ? কী অটল সৌম্যতা আর শান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই প্রাচীন তীর্থংকরদের লীলানিকেতন, অস্তরাগের সর্বশেষ আভাটুকু আঁধারের নিগূঢ় সান্নিধ্যে একীভূত হওয়ার সাথে সাথে সুদূর অতীতের অভিজাত গৌরব এই চরম দৃষ্টান্তটিও পশ্চিমাচলে আঁধার পথের যাত্রী হলো, শুধু একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বর্তমান সান্ধ্যোপাসনার মন্ত্রচ্ছলে সুপ্রাচীন অতীতকে জানাচ্ছে তার ভক্তিভারাবনত হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভূমিপরে আনত হয়ে অভিবাদন করছে তাকেই।

'রুদ্ধ সত্যের করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়ে নি ? সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি ? অপমানে মাথা হেঁট হয় নি ? সইবে না বন্ধন—বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে। সেই উদ্‌বোধনের প্রলয়মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে, সেই ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে।'

— শান্তিনিকেতন, পৃঃ ৩৫৪

ভাববার কথা

(৩)

ধীরেন্দ্র চৌধুরী

বর্ত্তমান যন্ত্রপ্রধান সভ্যতার ক্রমবর্দ্ধমান গতি ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মানব সমাজ, দেহ ও মনে যে সব বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি গত দুই প্রবন্ধে। এখন আমরা আলোচনা করিব এই সভ্যতার অন্তরালে দুর্নীতিপরায়ণতার স্রোত কেমন ভয়াবহরূপে বহিয়া চলিয়াছে ইয়াঙ্কী সভ্যতার স্তরে স্তরে সে সম্বন্ধে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আমাদের উদাহরণস্থল হইলেও একথা মনে রাখিতে হইবে যে যন্ত্রমত্ততার (craze for machinary) তারতম্যানুসারে এই পাপ ন্যূনাধিক সকল দেশেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আমেরিকার দুর্নীতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব অতি সংক্ষেপে। কারণ এ বিষয়ে বিশদভাবে লিখিতে গেলে লিখিতে হয় একখানা বড় বই। যদি কেহ এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানিতে চাহেন তবে যুক্তরাষ্ট্রের Federal Bureau of Investigation-এর "Uniform Crime Report', 'Kefauver Report', 'Report No-307 of the Senate' ইত্যাদি কয়েকখানা বই পড়িলেই যথেষ্ট খবর পাইতে পারিবেন।

আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র প্রামাণ্য উক্তি ও হিসাব উদ্ধৃত করিব, তাহা হইতেই চিন্তাশীল পাঠক মাকাল সদৃশ ইয়াঙ্কী সভ্যতার আভ্যন্তরীণ রূপটি যে কত কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর এবং এখনও সাবধান না হইলে এই যন্ত্রমত্ততার পরিণাম আমাদের দেশেও যে কি ফল সৃষ্টি করিবে তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। দুর্নীতি অনুসন্ধান সমিতির সভাপতি, আমেরিকার সিনেটের সদস্য মাননীয় কেফ্ভার মহাশয় বলিতেছেন—"The big question confronting the American people is whether criminal and political corruption has reached the point where our country must traverse the downward path of so many other once-proud countries, when democracy and national strength

have been lost through criminal and political corruption. I think we are dangerously close to that point."

আমেরিকার লেডারলি বুলেটীন বলিতেছে—"Crime, to day in the United States of America occupies an increasing share of public attention with the passing of each month. The front pages of the newspapers are occupied almost daily with not only the more lurid crimes of violence but also with shocking disclosures concerning a general moral breakdown that is evidenced by the findings of grand juries, legislative investigating bodies and the researches of public spirited groups. The extent to which crime today flourishes in the United States and in certain other parts of the world puts to shame the comparatively amateur efforts of criminals during the pre-prohibition Era.' ঐ বুলেটীন পুনরায় বলিতেছে, "Crime is the largest American industry and represents a multi billion dollar drains upon our national resoures. Burnes and Teeters have given an estimate of the national bill. For crime with the following breakdown: Conventional crime 500,000,000 dollars, organised crime including racketeering 7,500,000,000 dollars, gambling 20,000,000,000 dollars ; total 28,000,000,000 dollars a year." এই পাপ প্রবৃত্তি যে শুধু বয়স্কদিগের মধ্যেই আছে তাহা নহে, আমেরিকার যুবক যুবতীদিগের মধ্যেও এই দুষ্টপ্রবৃত্তি কি ব্যাপকভাবে সংক্রামিত হইয়া চলিয়াছে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। লেডারলি বুলেটীন লিখিতেছে, "The rapidity with which our civilization moves has inevitably produced a sophistication and prococity in our youth that has today been followed by, if not resulted in, the concentration of a very large amount of criminal activity among juveniles or young men and women below the age of 30." ১৯৫০ সনের হিসাবে দেখা যায় চুরি, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড, যৌন ব্যবসায়

প্রভৃতি যতপ্রকার পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রে, তাহার শত করা ৩০ই ভাগই অনুষ্ঠিত হইয়াছে এমন সব যুবক যুবতীদিগের দ্বারা যাহাদের বয়স ২৫ বৎসরেরও কম। চৌর্য্য বৃত্তি ও ডাকাতির হিসাবেই দেখা যায় ডাকাতির শত করা ৫৪.১ ভাগ, গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক চুরির ৬১.৬ ভাগ, সাধারণ চুরির ৪৫.৪ ভাগ এবং গাড়ী চুরির ৬৭.৩ ভাগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে যুবক যুবতীদিগের দ্বারা। সভ্যতায় দ্বিতীয় সহর লণ্ডনের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। ডাঃ জন্ বাউলার বলেন যে লণ্ডনে যতপ্রকার পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার শত করা ৭২ ভাগই হইতেছে চৌর্য্যবৃত্তি এবং ইহার প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক অনুষ্ঠিত হইতেছে এমন সব যুবক যুবতী দ্বারা যাহাদের বয়স ২১এরও কম।

আজকাল বিজ্ঞানের যুগ সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় দুর্নীতির অনুষ্ঠানও আজ আর ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে। এই সব দুষ্কার্য্য এখন চলিতেছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংঘবদ্ধভাবে। এজন্য আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্র নানা সংস্থা (Syndicate) স্থাপিত হইয়াছে। এই সব সংস্থার যাহারা পরিচালক, বলা বাহুল্য, তাহারা কোটীপতি লোক সুতরাং ইয়াঙ্কী সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। দেখা গিয়াছে বড় বড় সরকারি কর্মচারি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লোক সকলেই ভয়ে ও অর্থলোভে তাহাদের বশীভূত; এমন কি অনেক রাজনৈতিক ধুরন্ধর ব্যক্তিও তাহাদের হাতের পুতুল মাত্র।

আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণা এই যে দেশে শিক্ষা বিস্তার লাভ করিলেই দুর্নীতি কমিয়া আসিবে। এ ধারণা ভুল। আমেরিকায় শত করা ৯৬ জন লোকই শিক্ষিত। তারপর আমাদের দেশেও দেখিতে পাই সমাজের নানা স্তরে অধিষ্ঠিত শিক্ষিতদিগের মধ্যেও বেশ একটা মোটা অংশ নানা ছল চাতুরিতে ও কলমের খোঁচায় প্রতিদিন যে পরিমাণ জাতীয় অর্থ আত্মসাৎ করিতেছে তাহার দশমাংশও কি অপহরণ করিতেছে অশিক্ষিতের দল সাবলের খোঁচায়? আসল কথা হইতেছে অভাব। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় একথা অতি সত্য। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলেই আজ অভাবের তাড়নায় অস্থির। কাহারও মোটা ভাত কাপড়ের অভাব, কাহারও বা মোটরকার, এরোপ্লেন, টেলিভিশনের অভাব। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হইল তো আরও অসংখ্য বিলাস দ্রব্যের অভাবের তাড়নায় চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। বর্ত্তমান যন্ত্রপ্রধান সমাজের গোড়ায় কোন

উচ্চ দার্শনিক ভিত্তি নাই, তাই মনুষ্যত্ব অর্জনের কোন প্রশ্নই আজ আর নাই। আছে একমাত্র প্রশ্ন—যে কোন উপায়ে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করা, ইহাতেই প্রতিপত্তি, ইহাতেই সম্ভ্রম, সব কিছু নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক মাপ কাঠিতে বিচার করিয়া আমরা যদি দেখি তবে দেখিব মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের প্রয়োজন খুব বেশী নাই। কলের বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদে, নিত্য নূতন ভোগের উপকরণের অভাব বোধ সৃষ্টি করিতে গিয়াই আমরা বিপথগামী হইতেছি।

বাহিরে এই সীমাহীন ভোগের উপকরণকে সভ্যতার বিকাশ বলিয়া প্রচার করিয়া আমরা ভিতরে ভিতরে দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠিতেছি।

এখানে লেডারলি বুলেটীন হইতে একটি মূল্যবান কথা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। দুর্নীতির মূল কারণ অনুসন্ধান উপলক্ষে লেডারলি বলিতেছে, —' Since crime thrives on a rising economic cycle and tends to pine away in a descending economic cycle, it was natural that crime should flourish with the advents of prosperity during the years of world war II." একথা যুদ্ধকালেও যেমন সত্য তেমনই সত্য শান্তির সময়ে। যদি কোন দেশ ধনোৎপাদনের মত্ততায় জীবন যাত্রার মানদণ্ডকে একটা সীমাহীন ঊর্দ্ধগতির দিকে পরিচালিত করে, তবে দুর্নীতিও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীভূত যন্ত্রব্যবস্থাই হইতেছে ধনোৎপাদন তথা জীবন যাত্রার মানদণ্ড বৃদ্ধি করিবার প্রধান সহায়। সুতরাং এই সভ্যতায় যে মানুষ দিনের পর দিন অধিকতর দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠিতে বাধ্য হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

———

আদর্শচ্যুতি

প্রতিভা রায়

কুরুক্ষেত্রের বুকে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য মিলিত হইয়া দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছে। ইহারা সবাই একই পরিবারের; রাজ্য আজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক পক্ষে দুর্যোধন, একাদশ অক্ষৌহিনী এবং সেনাপতি বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম; অন্যপক্ষে যুধিষ্ঠির সাত অক্ষৌহিনী সৈন্য সহ, সেনাপতি দ্রুপদ রাজ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। এই ভাবে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে কয়েক দিন যাবত দুইপক্ষে লোমহর্ষ ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাগিল। পিতামহ ভীষ্ম ছিলেন বীরত্বে অসাধারণ, তিনি প্রতিদিন দশ সহস্র রথীর প্রাণ সংহার করিবেন এই প্রতিজ্ঞা দুর্যোধনের নিকট করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কথা রক্ষা করিবার জন্য প্রতিদিন দশ সহস্র রথীর প্রাণ সংহার করিয়া সে দিনের মত যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন। এই রূপে নবম দিন যুদ্ধ চলিল, পিতামহ ভীষ্মদেবের প্রবল পরাক্রমে পাণ্ডব সৈন্য বিধ্বস্ত হইতে লাগিল দেখিয়া পাণ্ডব সখা অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি ক্লীবের সামনে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে দ্রুপদ পুত্র ক্লীব শিখণ্ডীকে অর্জ্জুনের রথে বসাইয়া তাহাকে সামনে রাখিয়া নিরস্ত্র পিতামহ ভীষ্মকে অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ বানে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, শরে শরে জর্জ্জরিত হইয়া কুরুকুল-রবি ভীষ্ম দশম দিনের দিন শরশয্যা গ্রহণ করিলেন। ভীষ্মের ছিল ইচ্ছামৃত্যু বর, তাই তিনি মাঘ মাস শুক্লপক্ষ উত্তরায়নে দেহত্যাগ করিবেন ইহা স্থির করিয়া শরশয্যায় শায়িত রহিলেন।

এদিকে কুরুক্ষেত্রের সমরানলে ভারতের রাজন্যবর্গসহ দুই পক্ষের প্রায় সবাই মৃত্যু পথের অনুগামী হইলেন। জীবিত রহিলেন মাত্র পাণ্ডবের পক্ষে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভাই এবং কুরুপক্ষে দ্রোণাচার্য্য পুত্র অশ্বত্থমা ও তাহার মাতুল কৃপাচার্য্য। স্বজন বিয়োগ ব্যথায় যুধিষ্ঠির বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। ভীষ্মের দেহত্যাগের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবেরা ভীষ্মের সমীপে গিয়া দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার চরণে প্রণতি জানাইলেন। যুধিষ্ঠিরের বিষন্ন বদন দেখিয়া পিতামহ স্নেহ ভরে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার শোক অপনোদনের এবং রাজ্য পালনের জন্য বহু সৎ উপদেশ

দান করিতে লাগিলেন। একটা গল্প আছে, দ্রৌপদী ভীষ্মের উপদেশ শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। ভীষ্ম তখন দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দিদি তুমি হাসিতেছ কেন? দ্রৌপদী বলিলেন পিতামহ, দুর্যোধনের রাজসভায় যে দিন দুঃশাসন একবস্ত্রা কুলবধূ আমাকে অপমান করিতেছিল, সেদিন তো সেই সভায় আপনি ছিলেন, সেদিন তো বিপন্ন অসহায় আমি, আমার কাতর আর্ত্তনাদে আপনি কোন সাড়া দেন নাই। আজ আপনার মুখে নীতি কথা শুনিয়া তাই আমার হাসি পাইতেছে। ভীষ্ম বলিলেন সত্যই দিদি, সে দিন তোমার লাঞ্ছনা তোমার অপমান আমি বসিয়া দেখিয়াছিলাম, কোন প্রতিবাদ করি নাই। কেন করি নাই জান? সেদিন আমি দুর্যোধনের অন্নদাস, পাপের অন্ন খাইয়া সেদিন আমি আদর্শচ্যুত হইয়াছিলাম। সেইজন্যই তোমার উপরের অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান করি নাই, করিতে পারি নাই। আজ আমার দেহ হইতে দাসত্বের পাপ অন্নে যে রক্ত হইয়াছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সে সমস্তই ক্ষরিত হইয়া গিয়াছে, আজ আমি দাসত্বমুক্ত স্বাধীন ভীষ্ম, তাই এই নীতি কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছি।

সত্যনিষ্ঠ মহাবীর পিতামহ ভীষ্মের সামনে সে দিন কুরুসভায় এত বড় একটা অন্যায় কার্য্য সংঘটিত হইল, তিনি কোন প্রতিবাদ না করিয়া সেই অন্যায় কার্য্যকে সমর্থন করিলেন। এই কি সত্যনিষ্ঠ ভীষ্মের পক্ষে শোভন হইয়াছিল, না উচিত হইয়াছিল। দাসত্ব মানুষকে এমন করিয়াই আদর্শচ্যুত করিয়া থাকে। সে দিন যদি পিতামহ ভীষ্ম তাহারই কুল বধূ দ্রৌপদীকে কোলে তুলিয়া লইতেন, দুর্যোধনের এমন সাহসই হইত না তাঁহার কোল হইতে দ্রৌপদীকে ছিনাইয়া লয়। সেই জন্যই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভে অর্জ্জুন যখন কেমন করিয়া পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবেন ভাবিয়া বিকল হইয়া পড়িলেন, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তখন ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ বলিয়া অর্জ্জুনকে ধমক দিয়া বলিয়া ছিলেন, তুমি কাহাদের জন্য শোক করিতেছ, ভীষ্ম দ্রোণকে আমি মারিয়াই রাখিয়াছি ; তুমি নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচীন্। যে দিন কুরুসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা তাহারা বিনা প্রতিবাদে বসিয়া দেখিয়াছে, সেই দিনই তাহারা মরিয়াছে ; আদর্শভ্রষ্টতাই মৃত্যু, আদর্শের ক্ষেত্রে তাহারা মরিয়াই আছে ; অন্যায়ের সমর্থক অত্যাচারের সমর্থক ভীষ্ম দ্রোণকে বধ করাই তোমার পক্ষেও কল্যাণ, বিশ্বের পক্ষেও কল্যাণ। তুমি উহাদিগকে বধ কর।

আদর্শ চ্যুতিতেই মানুষের মৃত্যু আনিয়া দেয়। আমরা ইংরাজের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইলেও আমাদের অতীতে যে আদর্শচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহা হইতে আজও আমরা মুক্ত হইতে পারি নাই। সেই জন্যই ভারতের সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্বকর্ম্মে শুধু দুর্নীতি, অবিচার অত্যাচার চলিতেছে। আমাদের কর্ম্ম প্রচেষ্টার অন্ত নাই, সঙ্ঘ সমিতি দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে; কিন্তু মানুষের দুঃখ দৈন্য অশিক্ষাও কি বাড়িয়াই চলে নাই? কর্ম্মের এই ব্যর্থতা কেন? আদর্শহীনতাই ইহার মূল কারণ। আদর্শহীন কর্ম্ম কোন সমস্যারই মীমাংসা করিতে পারে না। মানুষ না হইলে মানুষের দুঃখ দৈন্যের অবসান হইবে কি করিয়া? আদর্শ এবং কর্ম্মের সমন্বয় করিতে না পারিলে কর্ম্মে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতা ও শোষণই বাড়িয়া চলিবে। চাই আদর্শ এবং অন্নের সমন্বয়। আদর্শ চ্যুতিতেই মহাভরতের ভারত ব্যাপী ধ্বংসকারী যুদ্ধারম্ভ, আর আদর্শ স্থাপনাই কুরুক্ষেত্রের বুকে গীতা প্রচারের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপন।

বর্ত্তমান যুগে কেবলই অন্ন বস্ত্রের সমস্যা বলিয়া সর্ব্বত্র যে রব উঠিয়াছে, ইহাই কি মানুষের জীবনে একমাত্র সমস্যা, অন্য কোন সমস্যা কি তাহার জীবনে নাই? অন্ন বস্ত্র সমস্যা তাহার সমস্যার এক অংশ বটে, উহাই মানুষের সবখানি নয়। বাহিরে যেমন অন্ন বস্ত্রের সমস্যা, ভিতরে সেই তেমনি আদর্শের সমস্যা রহিয়াছে। আগে অন্ন বস্ত্রের সমস্যার মীমাংসা করিয়া তবে আর যাহা হয় করা যাইবে, ইহাই হইল বর্ত্তমান যুগের মনোবৃত্তি। কিন্তু মানুষের সমগ্র জীবনে অন্ন বস্ত্র যেমন সত্যের একদিক, আদর্শও তেমনি সত্যের অপর দিক। অন্ন লাভ না হইলে জীবন লাভ হয় না, জীবন লাভ না হইলেও অন্ন লাভ হয় না। কোন এক পথে চলার বিপদ হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে একটি পথ ধরিয়া বিশ্ব সমস্যার সমাধান আসিবে না, বিপদ আমাদের দুই জায়গায় ঘনায়িত—অন্তরে এবং বাহিরে। সমাধানও খুঁজিতে হইবে যুগপৎ দুই স্থানে, পৌর্ব্বাপর্য্য করিলে চলিবে না। আমাদের ভারতীয় একদেশদর্শী শাস্ত্র এবং দীর্ঘদিনের পরাধীনতা দুইটা মিলিয়া আমাদের জীবনের সমগ্রতা রূপ মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সমগ্রের পথ হারাইয়া আমরা মরণের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছি, আমাদের জীবনে জ্ঞান এবং কর্ম্মের, আদর্শ এবং অন্নের প্রশ্ন আজ উঠিয়াছে; কে এই পথের আলোক দাতা, কে আমাদের এ দুর্দ্দিনে পথ দেখাইবে?

এই বাঙ্গলার বুকে এক সহজ মানুষ আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন, রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার সহজ সরল জীবনের ভিতর এক অভিনব তত্ত্ব ; যাঁহার খোঁজ আমরা এত দিন করি নাই কিন্তু আজ প্রকৃতির বিধানে এই লীলাময় সমগ্র মানুষটীর আমাদের বড় প্রয়োজন। শত বিখণ্ডিত ভারতের প্রাণপুরুষ সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল, তিনি আসিয়াছিলেন সহজ সরল সমগ্র জীবন লইয়া ; কেমন করিয়া এই অন্ন ক্ষেত্র, অবিদ্যার ক্ষেত্রকে দিব্য ভগবৎ ভাবে বিদ্যার ক্ষেত্রে আদর্শের ক্ষেত্রে গড়িয়া তোলা যায়, সেই কৌশল দান করিতে। জীবনের সমগ্রতাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, পূর্ণ মানুষ হইতে হইলে বিদ্যার সর্ব্বস্তরকে এবং অবিদ্যার সমস্ত স্তরকে জীবনে আস্বাদন করিতে হয়। এই আদর্শ তিনি জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন এবং দর্শনে রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—'পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণ জ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব্বজড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান।' আমাদের এত দিনকার শাস্ত্র আমাদেরকে এই কথাই শিখাইয়াছেন যে, এই অবিদ্যার ক্ষেত্রকে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া ইহার ওপারে যে বিদ্যার ক্ষেত্র সেইখানে স্থিত হইলে যে জ্ঞান হইবে তাহাই আত্মজ্ঞান এবং এই জ্ঞানই মানুষের চরম জ্ঞান। শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়াছেন উহা পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা মাত্র, এই জগত এবং ঐ জগতের সমস্ত জড় ও অজড় বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই পূর্ণ জ্ঞান। ভারতবর্ষ অন্নের ক্ষেত্র এই জগতকে হেয় মনে করিয়া মিথ্যা মনে করিয়া এখান হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে। এই একদেশদর্শী সাধনার ফলে সে জীবনের সমগ্রতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাইসে আজ এত সমস্যা পীড়িত।

একটী সমগ্র মানুষ হইতে হইলে তাহার হাত পা নাক কান চোখ মুখ মাথা বুক সবটারই প্রয়োজন হয় ; কোন একটা বাদ পড়িলেই মানুষটী নিখুঁত মানুষ হয় না। জীবনেও সেইরূপ জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি প্রেম কোনটা বাদ পড়িলেই সমগ্র জীবন হয় না। আমরা জীবনের সমগ্রতা হারাইয়া ফেলিয়া আজ যে কত রকমের মানুষ হইয়াছি এবং কত রকমের দল গড়িয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ বা আমরা সংসারী, কেহ বা আমরা সন্ন্যাসী, কেহ বা বৈজ্ঞানিক, কেহ বা সাহিত্যিক, কেহ বা দার্শনিক, কেহ বা রাজনীতিজ্ঞ, কেহ বা আমরা কংগ্রেসী, কেহ বা সমাজতন্ত্রী, কেহ বা কমুনিষ্ট ইত্যাদি। ইহার ভিতর বাদ পড়িয়া গিয়াছে শুধু 'মানুষ' বস্তুটী, যাহার মত সহজ সত্য মানুষের জীবনে আর

কিছু নাই। সমগ্র মানুষ বস্তুটী ছাড়িয়া আমরা উপাধিরূপ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছি। আমরা হইয়াছি সবই, হই নাই শুধু মানুষ। পরমহংসদেব বলিতেন একের পর যত শূন্য বসাও দশগুণ বাড়িয়াই যাইবে, কিন্তু এককে বাদ দিয়া যদি শূন্য বসানো যায়, সে কেবল শূন্যই হয়, ফাঁকিই হয়। আমাদের জীবন হইতে সমগ্ররূপ যে পূর্ণ মানুষটী তাহাকে বাদ দিয়া আমরা ভক্ত জ্ঞানী কর্ম্মী কবি বৈজ্ঞানিক কত কিছুই না হইতেছি, কিন্তু জীবনের ফাঁক আর ভরিতেছে না! জীবনের নানা প্রশ্নই কেবল জমিয়া উঠিতেছে, সমাধান তাহার মিলিতেছে না। শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতের বুক হইতে একটা করুণ বেদনার সুর ভাসিয়া আসিতেছে। এই বেদনার স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন সমগ্রের দেবতা সর্ব্বউপাধিবর্জ্জিত সর্ব্বউপাধিসমন্বিত সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল, যাঁহার সহজ সরল জীবনে মানুষ দেখিয়াছে সমাধি আর ট্যাকে টাকা, ব্রহ্ম-মায়ার, বিদ্যা-অবিদ্যার, আদর্শ অন্নের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! আজ বিশ্বে যত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, সকল সমস্যার সমাধান রহিয়াছে তাঁহারই শ্রীচরণতলে।

শ্রীনিত্যগোপাল, আদর্শ ও বাস্তবের সমস্যায় পীড়িত ভারতবাসী আমরা তোমার চরণতলে বসিয়াই জীবনের সমাধান খুঁজিব, আদর্শচ্যুত আমরা মরণের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছি। শ্রদ্ধাহীন আমরা, তোমার চরণস্পর্শে আমাদের জীবনকে শ্রদ্ধাবনত কর। তোমার বিশ্ব সুন্দর হউক, সার্থক হউক, তোমার জয়গানে মুখরিত হউক।

রবীন্দ্রনাথের শিশু শিক্ষা

রেণু মিত্র

জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এমন একটী সহজ অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে, জীবনের সকল সমস্যার মধ্যেই প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে কবি হওয়ার মতই সহজ। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁহার দান যেমন মৌলিক, তেমনি গভীর। আজ শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত আমরা ভাবিয়া দেখিব। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন মোটামুটি ভাবে বলা যায় পঞ্চাশ বৎসর আগে। তাহার বক্তব্য বিদেশীয় শিক্ষাপুস্তকের অনুবাদ নহে কিংবা বিদেশভ্রমণের রিপোর্ট নহে। তাঁহার কথা তাঁহার নিজস্ব এবং বাহির হইতে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাও তাঁহার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য ঘটনার মতো শিক্ষাকেও রবীন্দ্রনাথ এমন একটা ব্যাপক পটভূমি হইতে দেখিয়াছিলেন, যাহা মানুষকে মানুষ হইবার পথ দেখাইয়াছিল, কেবল কতকগুলি বিদ্যা অর্জ্জনের পথ দেখায় নাই। তাই আধুনিক ভাষায় তাহাকে কর্ম্মকৈন্দ্রিক বা শিশুকৈন্দ্রিক ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত না করিয়া এই ভাবে বলিলেই বোধ হয় ভাল হয় যে, ভারতবর্ষের ঔপনিষদীয় যুগ মানুষের 'হওয়া'র যে কল্পনা করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথও মানুষের তেমন হওয়ার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এ হওয়ার মধ্যে অন্যের যাহা ভাল তাহার বর্জ্জন ছিলনা। কেননা তিনি জানিতেন, 'যাহা সত্য তাহার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে, তাহা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয়, তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুতঃ যদি এমন কোনো ভালো থাকে যাহা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো, তবে তাহা ভালোই নয়—একথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন, তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন, কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।'

কাজেই রবীন্দ্রনাথ এমন শিক্ষার কথা বলিয়াছেন যে-শিক্ষা শুধু বিশেষ দেশের বা বিশেষ কালের নয়। তাঁহার শিক্ষা একটা সামগ্রিক শিক্ষা। 'বিশ্বকে বিশ্বাত্মাদ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা।' কেননা 'পোলিটিক্যাল সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর কোনো আকার হইতেই

পারেনা'—একথা তিনি মনেই করিতেন না। তাঁহার মতে 'সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে।' যাহা কিছু সমগ্র-ধর্ম্মী, তাহাই সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আবার 'সৃষ্টির ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে।' সত্যকারের শিক্ষা মানুষকে প্রবল করে না, মানুষকে সমগ্র করে। তিনি লিখিতেছেন, 'প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে ; এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে।' 'যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমন ভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্রের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি।'

রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে কোন কথা শুনিবার আগে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার এই সাধারণ ভূমিকা যেন আমরা মনে রাখি।

শিশুকে রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা ও পরম স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। বিরাট অসীমের বার্ত্তাকে বহন করিয়া সে আসিয়াছে, রহস্যময় জগৎ স্রষ্টারই একটী রহস্যময় কণা সে।

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সম বয়সী
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দ স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি।

এতখানি শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্র যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে সে একটী জীবন্ত বস্তু—প্রাণের সদ্য রসে ভরপুর। তাই তাহার শিক্ষাটাকেও যান্ত্রিক না করিয়া গোড়া হইতে জীবন্ত করার ব্যবস্থার কথাই রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই বনলিয়াছি রবীন্দ্রাথের শিশু-শিক্ষাদর্শন শিশু-কৈন্দ্রিকও নয়, কর্ম্মকৈন্দ্রিকও নয়—তাহা জীবন কৈন্দ্রিক। অর্থাৎ সকল দৃষ্টি ভঙ্গীগুলিই তাঁহার চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যাইবে। শিশু-কৈন্দ্রিক করার পিছনে শিশুকে যে মূল্য বা মর্য্যাদা দিবার অভিপ্রায় থাকে, রবীন্দ্রচিন্তাধারায় শিশুর

সে মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। আবার কর্ম্ম-কৈন্দ্রিক করার পিছনে জীবনের মধ্যে কর্ম্মকে যে মূল্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি দিয়াছেন। শিশুর স্বভাবকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি যেমন শিক্ষাদান কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তেমনি পড়া মুখস্থ করান তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, শিশুর ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা দ্বারা কর্ম্মে স্থিতি লাভ ঘটুক—ইহাই তিনি ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছেন। পড়াশুনা দ্বারা মনন শক্তিকে বাড়ানই তাঁহার বক্তব্য নয়—শিশুর কর্ম্ম-শক্তি তথা জীবনী-শক্তি বাড়াইয়া 'আমি সব কিছু পারব'—শিশুকে এই পারার সাধনায় নিযুক্ত করানতেই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। শিক্ষার আমন্ত্রণ 'চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্য নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে কর্ম্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়; অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্য চর্চ্চায় নয়, পৌরুষচর্চ্চায়।' বিদ্যা যেখানে মনকে ক্রিয়াবান করিয়া তোলে এবং কর্ম্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটায়, সেইখানেই বিদ্যার উৎকর্ষ—একথা তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের মাধ্যমে ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস ভূগোল শিখাইবার পাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত করেন নাই বটে, কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সবটুকু কথা জানিলে দেখিব কর্ম্মকে তিনি যে উচ্চস্থান দিয়াছেন তাহাই শুধু নয়, শিশু সারাদিন ধরিয়া যাহা কিছু করে,—খেলে বা কোন কাজ করে—তাহার মধ্য দিয়া শিশুকে অনেক কিছুই শিখান যায় বলিয়াও তিনি জানিতেন। তাঁহার আশ্রমে বই মুখস্থর পাঠ্য সূচী শুধু ছিলনা বলিয়া সমস্ত কর্ম্ম—খেলাবেড়ান ইত্যাদি সমস্তই—শিক্ষাপ্রদ ছিল।

শিক্ষাকার্য্যে শিশুর স্বভাবকে তিনি কতখানি মানিয়া লইয়াছিলেন, নীচের আলোচনা হইতে তাহা দেখিতে পাইব। শিশুর শিক্ষাদান কার্য্য যান্ত্রিক হইবে না, একথা তিনি নানা ভাবে বলিয়াছেন। শিশুকে শিক্ষাদান কোন বস্তু দান নহে—হাত বাড়াইয়া চাহিলেই হাত বাড়াইয়া দেওয়া যায় না। উপনিষদ বলিয়াছেন, 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা'—(তিনি) হৃদয়ের মধ্য দিয়াই জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিলেন। দীপ হইতে যেমন দীপ জ্বালান হয়, জীবন হইতে যেমন জীবনের সৃষ্টি হয়, শিশুকে শিক্ষাদান কার্য্য তেমনই ভাবে হৃদয়ের মধ্য দিয়া ছাড়া হয়ই না। এ একটা শক্তিদান, অগ্নিদান। তাই শিশুকে একটা সজীব পদার্থ মনে করিয়া তাহার সহিত জীবন্ত

সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। 'শিক্ষা জিনিষটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্য্য প্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণ ক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্ব্বাগ্রে। ইনক্যুবেটার যন্ত্রটা সহজ নয় বলেই কৌশল এবং অর্থ ব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শুনতে খুব মস্ত, কিন্তু মুরগীর জীবধর্ম্মানুগত ডিম পারাটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ্য।' এজন্য 'মানুষের মন পাইতে হইবে, তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকুই পুরা ফল দেয়।' শিক্ষাদান খুশির দান। যিনি দিবেন এবং যে নিবে—এই দুইজনের মধ্যে খুশির সম্পর্ক স্থাপিত না হইলে শিশু কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। এইখানে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শকে স্মরণ করিয়াছেন। এখানে কর্ত্তব্য বোধের দায় নাই। 'গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মধ্যস্থ বলে জেনেছি।' এই গুরু 'যন্ত্র নন, তিনি মানুষ—নিষ্ক্রিয় ভাবে মানুষ নন, সক্রিয় ভাবে; কেন না মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ।

শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিষটি আশ্রমের শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্ত্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।' এই যে গুরু শিষ্যের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক, আনন্দের সম্পর্ক, অদ্বৈত বোধের সম্পর্ক, শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ককেই রবীন্দ্রনাথ বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু আজিকার দিনে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন কালের তপোবনে গুরুর আশ্রমে 'শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন।' 'তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'—বিদ্যা অর্জ্জন করিবার এই তিনটি প্রণালী এতই মনস্তত্ত্ব-সম্মত যে ইহাদের জন্যই প্রাচীন কালের আমরা বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলাম। কিন্তু আজিকার শিক্ষাব্যবস্থায় একেবারে বর্তমান কালে অনেক কিছুই করিবার সংকল্প করা যাইতেছে বটে, কিন্তু সেই গুরু কোথায় যিনি হৃদয়ের মধ্য দিয়া, নিজের তপস্যার মধ্য দিয়া নিজের পবিত্র জীবনের

ব্যাপ্তিকে শিষ্যের জীবনে সঞ্চারিত করিয়া দিবেন? আর সেই শিষ্য কোথায় যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এককথায় শ্রদ্ধা দ্বারা গুরুর জীবনকে নিজের জীবনে গ্রহণ করিবে? নাই বলিয়াই আজিকার দিনে আমরা বিদ্যা অর্জন করি, জ্ঞান লাভ করি না। গুরু শিষ্যের 'উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।' আধুনিক কালে মনস্তত্ত্বসম্মত যত শিক্ষানীতির আমদানী হইতেছে, সেগুলির কোনটাকেই সার্থক করা যাইবে না যদি যাহারা শিক্ষা দিবেন তাহারা মানুষ হিসাবে হৃদয় ও বুদ্ধির সংযোগে পরিপূর্ণতার জীবনের অধিকারী না হন।

শিক্ষাদাতা হৃদয় ও ধৈর্য্য সহকারে যেমন পরিপূর্ণ মানুষ হইবার সাধনা নিবেন, তেমনি 'যে গুরুর অন্তরে ছেলে-মানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণ-ভরা হাসি।'

আশ্রমে প্রাত্যাহিক যে জীবন যাত্রা তাহার মধ্যেই রাখিতে হইবে সমগ্রতার আদর্শ। তপোবনে সন্ধ্যা আসিতেছে শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে, '...গোরু-চরানো, গো-দোহন, সমিৎ কুশ-আহরণ, অতিথি-পরিচর্য্যা, যজ্ঞবেদী-রচনা আশ্রম বালক-বালিকাদের দিনকৃত্য। এই সব কর্ম্মপর্য্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার সখ্য বিস্তারে আশ্রম হতে থাকে প্রতি ক্ষণে আশ্রম-বাসীদের নিজ হাতের রচনা।' নিজের আশ্রমে ইহাই রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন।

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ একটা আনন্দের উৎস হইতে উদ্ভূতরূপে জানিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া ছিলেন। যদি কুশিক্ষা বা শিক্ষার অভাবে বিকৃত না হইয়া যায়, তবে শিশুরা গভীর সম্ভাবনাকে লইয়া জন্মগ্রহণ করে আর সেই অবিকৃত শিশুদের প্রাণে স্নেহভিক্ষু বয়স্কের যে আশ্রয় মেলে, একথাও খুবই সত্য। আনন্দের টুকরা এই শিশুদের শিক্ষা ব্যাপারটাকে যদি আনন্দময় করা যায়, তবেই সেটা সত্যিকারের শিক্ষা হয়—একথা রবীন্দ্রনাথও নিশ্চিত জানিতেন। শিক্ষাদাতার প্রাণের সঙ্গে সম্পর্কের উপর এইজন্যই তিনি এতটা জোর দিয়াছেন।

শিশুর স্বভাবকে মানিয়া হইয়া শিশু-শিক্ষাকে কৃত্রিমতার বন্ধন মুক্ত রাখিবার আবেদন কবি বিশেষ আকুলভাবেই জানাইয়াছেন। 'শিশু যে অ্যালজাব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছে, সে জন্য সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? না জানা হইতে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, আমাদের অক্ষমতা ও বর্ব্বরতা বশতঃ জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দময় করিয়া না তুলিতে পারি, তবু চেষ্টা করিয়া ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই। শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল—সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি, সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি।' 'বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। অতএব আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্রেরা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামের কালে তাহারা সহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।' 'ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম-কেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে।' বাগানের কাজে শিশুদের সক্রিয় সহযোগ কর্ম্মকৈন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজনকেও কিছুটা মেটায়।

দেখা গেল কবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক যদিও প্রধানতঃ

ভাবের, যদিও অলক্ষ্যে সেখান হইতে জীবনরস পরোক্ষে তিনি সঞ্চয় করেন, তথাপি শিশু-শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রকৃত্রির সঙ্গে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ পাতাইবার কথাও তিনি বলিয়াছেন। পুঁথিগত বিদ্যায় নিজেও কোনদিন নিযুক্ত থাকিতে পারেন নাই, ছেলেদের জন্যও সে ব্যবস্থা দিতে পারেন নাই। পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে যে বিশাল পৃথিবীটা পড়িয়া আছে, তাহাকে বাদ দিতে গেলে যে শিক্ষার আনন্দই বাদ পড়িয়া এবং আনন্দ বাদ পড়িয়া গেলে যে সত্যিকারের কোন শিক্ষাই হয় না, একথা তিনি বার বার বলিয়াছেন।

পাঠ্যপুস্তককে আয়ত্ত করিতে হইলে পাঠ্যপুস্তকের বাহিরের এই প্রাকৃত জগতের সঙ্গে সুনিবিড় পরিচয়ের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাও যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলেনা—একথা তিনি বিশেষভাবে বলিয়াছেন। আমরা 'কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটী রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।'

রবীন্দ্রনাথ নিজে বিশেষ একটী শিক্ষা পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জ্জন করেন নাই—তাই বহু পুস্তক পাঠের উপযোগিতা তিনি জানিতেন; নিজেকে খানিকটা বাড়াইয়া না লইলে বৃদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। তাই সব দিক দিয়াই রবীন্দ্রনাথের পটভূমিকাটী ছিল বড়—এই বড়র মধ্যে থাকিয়া তিনি নিজেও আগাইয়া গিয়াছেন—অন্যদের জন্যও সেই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

শিক্ষার মাধ্যমের উপর রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী জোর দিয়া গিয়াছেন। 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।' বাহির হইতে যাহা কিছু আহরণ করিব তাহাকে আপন করিতে না পারিলে তাহা পরগাছা সদৃশ হইয়া থাকে। 'সেই আপন করবার সর্ব্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। পক্ষীশাবক গোড়া থেকেই

পোকা খেয়ে মানুষ; কোনো মানব সমাজে হঠাৎ যদি কোনো পক্ষীমহারাজের একাধিপত্য ঘটে তা হলেই এমন কথা বলা চলবে যে, সেই রাজখাদ্যটা খেলেই মানুষ প্রজাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে?' সাহেবী স্কুলে ছেলে মেয়ে পড়াইবার লোভ এখনও যাহারা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত সহ তাঁহার মত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতব্যক্তির বচন উল্লেখ করি। লিখিতেছেন, 'আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার অভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত।......আমার বার বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল।' অথচ ইংরেজী ভাষার ওপরে রবীন্দ্রনাথের কতখানি দখল লাভ হইয়া ছিল তাহা আমাদের অজানা নয়। বাহির হইতে যাহা গ্রহণ করিব তাহাকে আপন করিবার প্রধান সহায় যেমন মাতৃভাষা, তেমনই যাহা আয়ত্ত করিলাম তাহাকে প্রকাশ করিবারও প্রধান পথ মাতৃভাষা। 'মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য সাধনই সুস্থ প্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোষের ভেতর দিয়ে ভাব প্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোষপরা অভিনয় দেখেছি—তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিকল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজী-বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোষের ভেতর দিয়ে ভাব বাৎলাতে চেষ্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।' বিদ্যাকে যদি সহজ জ্ঞানে পরিণত করিতে হয়, মাতৃভাষা অপরিহার্য্য। রবীন্দ্রনাথের মতে 'মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথা সময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহস পূর্ব্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধেনা।' বর্ত্তমানে ইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরেজী না পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, তবে অনেকেই তাহা মানিয়া চলেন না এবং সাহেবী ইস্কুলে ইংরেজীর মাধ্যমে শিশুকে পড়াইবার মোহ এখনও অনেক অভিভাবকের আছে। বাংলা ভাষার মাধ্যমেই শিশুকে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা

রাখিয়া সেই সঙ্গে ইংরেজীকে একটা বিষয় হিসাবে শুধু রাখিলে খুব বেশী অন্যায় হয় বলিয়া মনে হয় না। আজকাল আবার রাষ্ট্রভাষা হিন্দীও অনেকে প্রাথমিক স্তরে শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে সবশুদ্ধ বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। ইহা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করিবেন না বলিয়াই মনে হয়।

ক্রমশঃ

বাঁশী

অনিলকুমার রায়

অসীম অনাদি হ'তে অনন্তের মাঝে
বাঁশী বাজে
এ জীবন-সাগরের তীরে
প্রভাতে অরুণোদয়ে সন্ধ্যার সমীরে সমীরে।
ঘুম-ভাঙানিয়া ছন্দে প্রাণ-জাগানিয়া গানে গানে
তোমার বাঁশীর ধ্বনি অপূর্ব্ব সুরে-লয়ে-তানে
কি কথা বলিতে চায়
বুঝিতে পারিনা হায়!
এ মনের এ প্রাণের মাঝে
অন্তরগহনতলে নিত্য সুমধুর বাঁশী বাজে।
তোমার বাঁশীর বাণী হাতে
স্বর্গের শিশু নামে জীবনের প্রথম প্রভাতে
সূর্য্য অস্তাচলে
নদীর এ পার হ'তে রেখা টানে ওপারের জলে।
এ বাঁশী নিতুই বাজে এ ধরণী বুকে
নিত্য সুখে-দুঃখে।
শিউলী পড়িছে ঝরি' শেফালী ফুটিছে কুতূহলে
সেখানেও বাঁশী কথা বলে।

আবির মাখানো ভোরে কমলের সরোবরে যবে
কুমুদ ফুটিল কলরবে
বাঁশীর সঙ্গীত সেথা নাচিয়া ফিরিছে শতদলে
শিশির ছড়ানো নদীজলে।
যেখানে নদীর স্রোত হারায়েছে ধারা
বাঁশরীর সুরখানি সেখানেও হয় নাই হারা।
এ বাঁশীর সুরে ফোটে চম্পার দল
কেঁপে ওঠে সাগরের জল
নেচে ওঠে ঢেউ
ওরে তোরা শুনেছিস্ এ বাঁশীর সঙ্গীত কেউ ?
উদয়তোরণদ্বার হ'তে
এ বাঁশীর সুর বাজে আকাশে মাটিতে ওতপ্রোতে
শৈলশিখর হ'তে নেমে-আসা জোয়ারের জলে
সাগরে পাহাড়ে গুহাতলে।
সীমাহীন অনন্ত অবধি
এ বাঁশী বাজিয়া চলে জীবনে জীবনে নিরবধি।

'পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো সেই দিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো—সেই দিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্য্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-রূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বাদে পরিণত হলেন।'

—শান্তিনিকেতন, ২য় ভাগ পৃঃ ১৩৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্‌।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্‌ ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্‌॥ ১১।১৫

(তুমি যে বিশ্বরূপ দেখাইলে, তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতেছি—এই প্রকারে নিজের অনুভব প্রকটিত করিয়া বলিতেছেন) পশ্যামি [উপলব্ধি করিতেছি] তব দেহে [তোমার দেহে] দেবান্‌ [দেব সমূহ] হে দেব সর্ব্বান্‌ তথা [সেইরূপ] ভূতবিশেষসঙ্ঘান্‌ [স্থাবর জঙ্গম নানাবিধ সংস্থান বিশেষসমূহের সংঘ সমূহকে] (আরও) ব্রহ্মাণং [চতুর্ম্মুখি ব্রহ্মাকে] ঈশং [প্রজাগণের ঈশিতা] কমলাসনস্থং [পৃথিবীর পদ্ম মধ্যে মেরুরূপ কর্ণিকাসনে অবস্থিত] ঋষীন্‌ চ [বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে] সর্ব্বান্‌ উরগান্‌ চ [এবং বাসুকি প্রভৃতি উরগগণকে] দিব্যান্‌ [দিব্য]।

অর্জ্জুন বলিলেন—হে দেব, আমি আপনার দেহে সকল দেবতা, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত নিখিল ভূতগণ, নাভি পদ্মে অবস্থিত ঈশ ব্রহ্মাকে, দিব্য সর্ব্ব ঋষি সমূহ ও উরগগণকে দেখিতেছি। ১১।১৫

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্ত রূপম্‌।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১১।১৬

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্‌ [অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র (মুখ) ও নেত্র সমূহ যাহার, তাহাকে] পশ্যামি [দেখিতেছি] ত্বাং [তোমাকে] সর্ব্বতঃ [সর্ব্বত্র] অনন্তরূপম্‌ [অনন্তরূপ সমূহ যাহার, তাহাকে] ন অন্তং [শেষ] ন মধ্যং [দুইটী সীমার মধ্যে ফাঁকে ; সমস্ত অবকাশ জুড়িয়া মধ্যে রহিয়াছ তুমি] পুনঃ [কিন্তু] তব [তোমার] আদিং [আদি] পশ্যামি [দেখিতেছি] হে বিশ্বেশ্বর হে বিশ্বরূপ।

হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, আমি সকল দিকেই বহুসংখ্যক বহু উদর, মুখ ও নেত্র বিশিষ্ট অনন্ত রূপে তোমাকেই দেখিতেছি ; কিন্তু তোমার অন্ত, মধ্য, আদি কিছুই দেখিতেছি না। ১১।১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১১।১৭

কিরীটিনং [কিরীট নামক শিরোভূষণ যাহার আছে, তাহাকে] গদিনং [গদা যাহার আছে, তাহাকে] চক্রিণং চ [চক্রধারীকে] তেজোরাশিং [তেজপুঞ্জ] সর্ব্বতঃ [সকল দিকে] দীপ্তিমন্তং [দীপ্তিমান] পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষং [দুঃখের সহিত নিরীক্ষণ করিতে শক্য] সমন্তাৎ [সর্ব্বত্র] দীপ্তানলার্ক দ্যুতিম্ [দীপ্ত হইতেছে অনল এবং অর্কের দ্যুতির মত দ্যুতি যাহার, সেই তোমাকে] অপ্রমেয়ম্ [কোন প্রমাণের ভিতর যিনি ধরা দেন না, সেই অপ্রমেয় তোমাকে]।

আমি কিরীটিধারী, গদাধর, চক্রধর, সর্ব্বতঃ প্রভাময়, প্রদীপ্ত অগ্নি সূর্য্যতুল্য দ্যুতিমান্ এবং অপ্রমেয় তোমাকে সকল দিকেই অবলোকন করিতেছি। ১১।১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১১।১৮

(তুমি যে যোগমায়া বল দর্শন করাইলে, তাহাতে আমার উপলব্ধি হইতেছে যে) ত্বম্ অক্ষরম্ [ক্ষরিত যাহা হয় না, তাহা অক্ষর] পরমং [পরম ব্রহ্ম ; কেননা তোমাতে ক্ষর-অক্ষর সমন্বিত বলিয়া তুমি শুধু অক্ষর নও, তুমি পরম অক্ষর] বেদিতব্যম্ [মুক্তদের দ্বারা জ্ঞাতব্য] ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য [এই বিশ্বের] পরং [প্রকৃষ্ট] নিধানং [আশ্রয় ; নিধীয়তে অস্মিন্ ইতি নিধানম্] (আরও) ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা [সনাতন নিত্য ধর্ম্মের রক্ষক ও পালক] সনাতনঃ [সনাতন অথচ চির নবীন] ত্বম্ [তুমি] পুরুষঃ [পর পুরুষ পুরুষোত্তম] মতঃ [অভিপ্রেত] মে [আমার]।

তুমি পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর ব্রহ্ম, তুমিই এই বিশ্বের পর আশ্রয়, তুমি অব্যয়, সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক ও পালক ; আমার বিবেচনায় তুমিই সনাতন পুরুষ। ১১।১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্ত বাহুং শশি সূর্য্য নেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্তুং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১১।১৯

(আরও) অনাদিমধ্যান্তম্ [নাই আদি, মধ্য ও অন্ত যাহার, সেই তোমাকে] অনন্তবীর্য্যম্ [বীর্য্যের যাহার অন্ত নাই, সেই তোমাকে] শশিসূর্য্য-নেত্রম্ [চন্দ্র ও সূর্য্য হইতেছে নেত্রদ্বয় যাহার, সেই তোমাকে] পশ্যামি

[দেখিতেছি] ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং [দীপ্ত (প্রজ্বলিত) হুতাশ (অগ্নি) যাহার বক্ত্র, সেই তোমাকে] স্বতেজসা [নিজের তেজের দ্বারা, কাহারও নিকট হইতে ধার করা নয়] বিশ্বম্ ইদম্ [এই বিশ্বকে] তপন্তম্ [প্রতপ্তকারী]।

তোমার আদি, মধ্য, অন্ত নাই ; তোমার বীর্য্য অনন্ত, শশী সূর্য্য তোমার নেত্র, প্রদীপ্ত হুতাশন তোমার মুখ ; আমি দেখিতেছি যে, তুমিই নিজের তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ। ১১।১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।

দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ১১।২০

দ্যাবাপৃথিব্যোঃ [দ্যুলোক ও পৃথিবীর] ইদং অন্তরং [এই মধ্য ভাগ] হি [যেহেতু] ব্যাপ্তং [ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে] ত্বয়া একেন [একমাত্র তোমা দ্বারা] দিশঃ চ সর্ব্বাঃ [এবং সকল দিক] (অতএব) দৃষ্ট্বা [দর্শন করিয়া] অদ্ভুতং [বিস্মাপনকর] রূপম্ ইদম্ [এই রূপ] তব [তোমার] উগ্রং [ক্রূর] লোকত্রয়ং [ত্রিলোক] প্রব্যথিতং [ভীত-প্রচলিত] হে মহাত্মন্ [অক্ষুদ্র স্বভাব]।

হে মহাত্মন্, তুমি একাকীই যেহেতু ঐ দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্য ভাগ এবং সকল দিক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই হেতু তোমার এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রূপ বিলোকন করিয়া ত্রিলোক ভীত, বিচলিত হইতেছে। ১১।২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।

স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ১১।২১

(এক্ষণে পূর্ব্বে 'যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ু'—এই যে অর্জ্জুনের সংশয় জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয়ার্থ জয় যে অবশ্যম্ভাবী তাহা দেখাইব—এইভাবে ভগবান প্রবৃত্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন) অমী হি [নিশ্চয়ই এই সব যুদ্ধমান যোদ্ধৃগণ] ত্বাং [তোমাকে] সুরসঙ্ঘাঃ [বসু আদি দেবসঙ্ঘ, যাহারা ভূভার হরণের জন্য মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া অবতীর্ণ এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত] ত্বাং বিশন্তি [প্রবিষ্ট হইতেছেন, প্রবিষ্ট হইতেছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে] (তাহাদের মধ্যে) কেচিৎ [কাহারা বা] ভীতাঃ [ভীত হইয়া] প্রাঞ্জলয়ঃ [বদ্ধাঞ্জলি হইয়া] গৃণন্তি [স্তব করিতেছেন] (পলায়নে অসমর্থ হইয়া, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বিশ্বরূপ স্তরে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়া এবং উপস্থিত যুদ্ধে নানা ভয় নিমিত্ত দর্শন করিয়া] স্বস্তি ইতি [জগতের মঙ্গল হউক ইহা] উক্ত্বা [বলিয়া] মহর্ষি সিদ্ধসঙ্ঘাঃ [মহর্ষি ও সিদ্ধগণের সঙ্ঘগুলি]

স্তুবন্তি ত্বাং [তোমার স্তব করিতেছেন] স্তুতিভিঃ [স্তুতি সমূহের দ্বারা] পুষ্কলাভিঃ [সম্পূর্ণ, অখণ্ড]।

এই সকল দেবতা নিশ্চয়ই তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে স্তব করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধ সঙ্ঘগুলি স্বস্তি হউক বলিয়া সম্পূর্ণ স্তুতি দ্বারা স্তুতি করিতেছেন। ১১।২১

রুদ্রাদিত্যাবসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।

গন্ধর্ব্বযক্ষা সুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে। ১১।২২

(আরও) রুদ্রাদিত্যাঃ [রুদ্র ও আদিত্যগণ] বসবঃ [বসুগণ] যে চ সাধ্যাঃ (এবং যে সাধ্যগণ) বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ) অশ্বিনৌ [অশ্বিনী কুমার দ্বয়] মরুতঃ চ [মরুৎ নাম দেবগণ] উষ্মপাঃ চ [এবং উষ্মপা নাম পিতৃগণ] গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা [হাহা ও হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, কুবেরাদি যক্ষগণ, বিরোচন প্রভৃতি অসুরগণ, কপিলাদি সিদ্ধগণের সঙ্ঘগুলি] বীক্ষন্তে [দেখিতেছে] ত্বাং [তোমাকে] বিস্মিতাঃ চ এব [বিস্মিত হইয়াই] সর্ব্বে [সকলে]।

যে সকল রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্ব, অশ্বিনী কুমার দ্বয়, মরুৎ নামক দেবগণ, উষ্মপা নামক পিতৃগণ আছেন, তাঁহারা এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলে বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছেন। ১১।২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্র নেত্রং মহাবাহো বহু বাহূরুপাদম্।

বহূদরং বহু দংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ১১।২৩

(যে হেতু) রূপং [রূপ] মহৎ [অতি বৃহৎ] তে [তোমার] বহুবক্ত্র-নেত্রং [বহু বক্ত্র এবং নেত্র যাহার, সেইরূপ] হে মহাবাহো বহু বাহূরুপাদম্ [বহু বাহু, উরু ও পাদ যে রূপে, তাহাকে] বহূদরং [বহু উদর যাহাতে, তাহাকে] বহু দ্রংষ্টাকরালং [বহু (অসংখ্য) দংষ্ট্রা (দন্তরাজি) দ্বারা করাল (ভয়ঙ্কর) তোমার রূপ] দৃষ্ট্বা [দেখিয়া] লোকাঃ [প্রাণিগণ] প্রব্যথিতাঃ [প্রচলিত হইয়াছে] তথা [সেইরূপ] অহম্ [আমিও]।

হে মহাবাহো, তোমার বহু মুখ ও নেত্র বিশিষ্ট, বহু সংখ্যক বাহু, উরু ও পাদ সমন্বিত, বহু উদর যুক্ত, বহু দন্ত বিশিষ্ট হওয়ার ফলে ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়া প্রাণিগণ ভীত হইয়াছে, আমিও ভয় পাইতেছি। ১১।২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।

দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ১১।২৪

নভঃস্পৃশম্ [গগনস্পর্শী] দীপ্তম্ [প্রজ্জলিত] অনেকবর্ণং [অনেক বর্ণ অর্থাৎ ভয়ানক বিবিধাকার রূপ যাহার, তাহাকে ব্যাত্তাননং [ব্যাত্ত (বিবৃত) আসন সমূহ যাহার, তাহাকে] দীপ্ত বিশালনেত্রম্ [দীপ্ত (প্রজ্জলিত) বিশাল (বিস্তীর্ণ) নেত্রসমূহ যাহাতে, সেই তোমাকে] দৃষ্ট্বা হি [দেখিয়া] ত্বাং, প্রব্যথিতান্তরাত্মা [প্রব্যথিত (প্রভীত) হইয়াছে অন্তরাত্মা (অন্তঃকরণ) যাহার, সেই আমি] ধৃতিং [ধৈর্য্য] ন বিন্দামি [নিজকে সামলাইতে পারিতেছিনা] শমং চ [উপশম (মনস্তুষ্টি)] হে বিষ্ণো।

হে বিষ্ণো, গগনস্পর্শী, তেজোময়, নানাবর্ণ সমন্বিত, বিবৃতাস্য, প্রদীপ্ত বিশাল লোচন বিশিষ্ট তোমাকে দেখিয়া সভয় চিত্ত আমি ধৈর্য্য বা শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। ১১।২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ১১।২৫

(কি কারণে শান্তি পাইতেছনা?) দ্রংষ্ট্রাকরালানি [দংষ্ট্রাসমূহের দ্বারা করাল (ভয়ঙ্কর) বিকৃত] তে [তোমার] মুখানি [মুখ সমূহ] দৃষ্ট্বা এব [দর্শন করিয়াই] কালানলসন্নিভানি [প্রলয় কালে লোক সমূহের দাহক যে যে কালানল তাহারই মত] দিশঃ [এইটী পূর্ব্ব, এইটী পশ্চিম এই প্রকার পৃথক্ ভাবে দিক্ সমূহকে] ন জানে [বুঝিতে পারিতেছিনা অর্থাৎ দিশাহারা হইয়াছি] ন লভে চ [এবং লাভ করিতে পারিতেছিনা] শর্ম্ম [সুখ] (অতএব) প্রসীদ [প্রসন্ন হও] হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস।

তোমার দংষ্ট্রাকরাল, প্রলয়াগ্নিতুল্য প্রভাময় মুখ দেখিয়া আমি দিক্‌ভ্রান্ত হইয়াছি, সুখও পাইতেছি না, হে দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। ১১।২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ, সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ১১।২৬

(যাহাদের নিকট হইতে আমার পরাজয়ের আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা এখন অপগত হইয়াছে); (যেহেতু) অমী [এই সব] চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য [ধৃতরাষ্ট্রের] পুত্রাঃ [দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ] (পরবর্ত্তী শ্লোকস্থ 'ত্বরমানাঃ বিশন্তি' এই বাক্যের সহিত অন্বয় করিতে হইবে) সর্ব্বে [সকলে] সহ এব অবনিপাল সঙ্ঘৈঃ [অবনি পালন করে যাহারা, সেই অবনিপালদের সঙ্ঘ সমূহের সহিত] ভীষ্মঃ দ্রোণঃ সূতপুত্রঃ (কর্ণ), তথা অসৌ [এই] সহ অস্মদীয়ৈ আ[illegible] [আমাদের পক্ষাশ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির সহ] যোধমুখ্যৈঃ যোদ্ধাগণের প্রধান]।

রাজাগণ সহ ধৃতরাষ্ট্রের ঐ সমস্ত পুত্রই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও সেই কর্ণ, অস্মৎ পক্ষীয় প্রধান প্রধান যোধগণ সহ ছুটিয়া চলিয়া (প্রবেশ করিতেছে) ১১।২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।

কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ১১।২৭

বক্ত্রাণি [মুখ সকল] তে ত্বরমাণাঃ [ত্বরা যুক্ত হইয়া, ছুটিয়া চলিয়া] বিশন্তি [প্রবিষ্ট হইতেছে] (কিরূপ মুখ ?) দংষ্ট্রাকরালানি [দংষ্ট্রা সকলের দ্বারা করাল] ভয়ানকানি [ভয়ঙ্কর] (আরও) কেচিৎ [তাহাদের মধ্যেই কেহ কেহ] বিলগ্নাঃ [বিশেষভাবে আটকাইয়া গিয়াছে] দশনান্তরেষু দন্ত সমূহের মধ্যে ভক্ষিত মাংস খণ্ডের মত] সংদৃশ্যন্তে [উপলব্ধ হইতেছে] চূর্ণিতৈঃ [চূর্ণীকৃত] উত্তমাঙ্গৈঃ [শির সমূহ দ্বারা)।

ত্বরার সহিত ছুটিয়া তোমার দংষ্ট্রাবিষম ভয়ানক মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে ; কেহ বা তোমার দশনরাজি মধ্যে বিলগ্ন রহিয়াছে, দেখা যাইতেছে উহাদের মস্তক চূর্ণিত হইয়াছে। ১১।২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।

তথা তবামী নরলোক বীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ১১।২৮

(কিরূপে মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন)

যথা নদীনাং [নানাদিকে প্রবাহিত নদী সমূহের] বহবঃ [অনেক] অম্বুবেগাঃ [ত্বরা বিশিষ্ট অম্বুর বেগ] সমুদ্রম্ এব [সমুদ্রেরই] অভিমুখাঃ [অভিমুখ হইয়া] দ্রবন্তি [দ্রুত প্রবেশ করে] তথা [সেইরূপ] তব অমী [ভীষ্ম প্রভৃতি এই সব) নরলোক বীরাঃ [মনুষ্য লোকের মধ্যে শূর সমূহ] বিশন্তি [প্রবেশ করে] বক্ত্রাণি [মুখ সমূহে] অভিবিজ্বলন্তি) [সর্ব্বতঃ-প্রকাশমান]।

যেমন নদীগণের অসংখ্য জলবেগ সমুদ্রের অভিমুখে দ্রুত ধাবমান হয় ও প্রবেশ করে, সেইরূপ এই সকল নরলোক বীরগণ তোমার সর্ব্বতঃ প্রকাশমান মুখ সমূহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ১১।২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ১১।২৯

(পূর্ব্ব শ্লোকে অচেতন নদীবেগের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, বর্ত্তমান শ্লোকে চেতন দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রলোভনের বশে বুদ্ধি পুর্ব্বক প্রবেশের কথা বলিতেছেন)

যথা [যেরূপ] প্রদীপ্তং জ্বলনং [অগ্নির রূপ-প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া] পতঙ্গা ; [পক্ষিগণ] বিশন্তি [ঝাঁপ দেয়] নাশায় [বিনাশের জন্য] সমৃদ্ধবেগাঃ [প্রলোভনের বশে] আকর্ষণে সমৃদ্ধ হইয়াছে বেগ (গতি) যাহাদের] তথা এব [ঠিক সেইরূপই] নাশায় [পুড়িয়া মরিবার জন্য, বিনাশের জন্য] বিশন্তি [জানিয়া শুনিয়াই প্রবেশ করিতেছে] লোকাঃ [প্রাণিসমূহ] তব অপি বক্ত্রাণি [মুখ সমূহ] সমৃদ্ধবেগাঃ [রাগদ্বেষের বশে আশক্তির টানে সমৃদ্ধ (সম্যক রূপে বর্দ্ধিত) বেগ যাহাদের, তাহারা]।

যেমন পতঙ্গগণ বিনাশের জন্য অত্যন্ত বেগে প্রদীপ্ত বহ্নিতে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপই লোকসমূহ তোমার মুখসমূহ মধ্যে অতিবেগে প্রবেশ করিতেছে। ১১।২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ১১।৩০

(যোদ্ধকাম রাজগণের ভগবৎ-মুখ প্রবেশের প্রকার বলিয়া সেই দশায় ভগবান ও তাঁহার প্রভাব-প্রবৃত্তি প্রকার প্রকট করিতেছেন] লেলিহ্যসে [আস্বাদন করিতেছ] গ্রসমানঃ [নিজের অন্তরে প্রবেশ করাইতে করাইতে] সমন্তাৎ [সব দিকে] লোকান্ [লোক সমূহ] সমগ্রান্ [সমগ্র] বদনৈঃ [মুখ সমূহ দ্বারা] জ্বলদ্ভিঃ [দীপ্যমান], তেজোভিঃ [জ্যোতি সমূহের দ্বারা] আপূর্য্য [আচ্ছন্ন করিয়া] জগৎ সমগ্রং [সমগ্র জগৎকে] (আরম্ভ) ভাসাঃ [দীপ্তি সমূহ] তব উগ্রাঃ [কের] প্রতপন্তি [প্রতপ্ত করিতেছে] হে বিষ্ণো।

তুমি চারিদিকে প্রজ্বলিত বদন মণ্ডল দ্বারা লোক সমূহকে গ্রাস করিবার জন্য লেহন করিতেছ। হে বিষ্ণো, তোমার উগ্র প্রভারাশি প্রচণ্ড তেজে সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া প্রতপ্ত করিতেছে। ১১।৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ১১।৩১

(যে কারণে আপনি এত উগ্রপ্রভাব, সেই কারণে) আখ্যাহি [বলুন] মে [আমার কাছে] কঃ ভবান্ [কে আপনি ?] উগ্ররূপঃ [ভয়ঙ্কর রূপ] নমঃ অস্তু তে [আপনাকে নমস্কার] হে দেববর [দেবগণেরও প্রধান] প্রসীদ [প্রসন্ন হও] বিজ্ঞাতুং [বিশেষ ভাবে জানিতে] ইচ্ছামি [ইচ্ছাকরি] ভবন্তং [আপনাকে] আদ্যং [আদ্য পুরুষকে] ন হি (যে হেতু) ন প্রজানামি

[কি কারণে এইরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না] তব প্রবৃত্তিম্ [চেষ্টা]।

এই ভয়ানকরূপ আপনি কে, আমাকে বলুন। হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার। প্রসন্ন হউন, আদি পুরুষ আপনাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি। আপনার চেষ্টা কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। ১১।৩১

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান ও অনির্দেশ্যবাদ*

দিলীপকুমার ভদ্র

বস্তুজগতের সব কিছু খবরাখবরই আমরা পাই পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে এবং পদার্থ বিজ্ঞান সেই সব বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বস্তুধর্মের একটা নিয়মানুগ কাঠামো খাড়া করতে চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে বহিঃ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত এই সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিমাপের উপরেই আমাদের সমস্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ ; এ থেকেই আমরা বিশ্বকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি। এর উপরই নির্ভর করছে মানবিক চেতনার সঙ্গে বাইরের পরিচয় এবং তা থেকেই মানুষের চিরন্তন অনুসন্ধিৎসা নতুন নতুন জ্ঞানোন্মেষের সহায়তা করছে। বিশ্বজগত সম্বন্ধে কোনও পরিচয় লাভ করতে হলে যেখানে পরীক্ষা ও পরিমাপগত জ্ঞানের সর্ব্বাধিক প্রয়োজন সেখানে স্বভাবতঃই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ ও বিভিন্ন গুণাবলী নির্ধারণে এই জ্ঞান ঠিক কতখানি কার্যকরী।

ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানে কার্য-কারণ বাদেরই সর্বময় আধিপত্য ছিল। কার্য্য এবং কারণের ভিতর দিয়েই কোনও অনুমানগত মতবাদ একটা প্রাকৃতিক নিয়মে পর্যবসিত হতো। এই মতবাদের সফলতার প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলি ছিল—জ্যোতির্বিদ্যা, মাধ্যাকর্ষণ, তাপগতিবিদ্যা, (Thermodynamics) ইত্যাদি। প্রকৃতিকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা তখন গতিবিদ্যার নিয়মাবলীর

* জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মে, ১৯৫৪ সংখ্যা হইতে গৃহীত।

ভিতর দিয়ে হতো। এসব নিয়মগুলিকে মনে করা হতো নিভুল এবং বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি কোনও বস্তুর বর্তমান গতি ও অবস্থিতি জানা থাকে তাহলে ভবিষ্যতে তার অবস্থা একেবারে সুনির্দ্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া সম্ভব বলে ধরে নেওয়া হতো। তাছাড়া প্রত্যেক জাগতিক কারণের (cause) দরুণ যে একটা কার্য থাকবেই, তাও অবশ্যম্ভাবী বলে ধরে নেওয়া হতো। যেমন, বস্তুর উপর বলের প্রভাবে ত্বরণের সৃষ্টি হবেই কিংবা যে কোনও বিদ্যুচ্চম্বকীয় বিক্ষোভ ইথারে তরঙ্গরাজির সৃষ্টি করবেই ইত্যাদি। কিন্তু ক্রমশঃ এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যেতে লাগলো যে, কি উপায়ে কোনও বল ত্বরণের সৃষ্টি করে তা বস্তুকণিকা একটা নির্দিষ্ট আকৃতির চেয়ে ছোট হলে (যেমন, পরমাণু বা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে) অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। বোর, হাইসেনবার্গ ও আইনষ্টাইন প্রমুখ মনীষীবৃন্দ কর্তৃক আবিষ্কৃত কোয়াণ্টাম পরিমিতিবাদ এবং আপেক্ষিকতাবাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এবং এডিংটন ও মিল্‌নে সৃষ্ট নতুন দর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কারণ বাদের (Principle of Causality) সার্বজনীনতা ক্রমশঃ কমে আসতে লাগলো। সেই সঙ্গে সমগ্র পদার্থবিদ্যায় অনির্দেশ্যবাদের প্রভাবও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বিজ্ঞানীরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, কোনও পরিমাপ বা পরীক্ষা পরীক্ষিত বস্তু সম্বন্ধে সব সময় সঠিক সংবাদ না-ও দিতে পারে। পরিমাপ বিজ্ঞানী যেটা করছেন সেটা ঠিক সেই বস্তু বা কণিকাটিকে নিয়ে নয়, সেটা হচ্ছে তার অবস্থিতি বা গতি বা অন্য যে কোনও কারণের জন্য উদ্ভূত একটা বিশেষ অবস্থা বা ফলাফলকে নিয়ে। যেমন, একটি ত্বরণশীল ইলেকট্রন থেকে যে বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ নির্গত হয়, আমরা কেবল সেটা পরিমাপ করে ইলেকট্রনটির গতি ও শক্তি সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারি। সুতরাং এখানে আসল ইলেকট্রন কিন্তু অদৃশ্য ও অনির্ণেয়ই থেকে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদ এই অনির্ণেয়তাকে নিয়েই এবং এই মতবাদ পদার্থবিজ্ঞানীকে বস্তুর প্রকৃত সত্তা মানুষের কাছে কতখানি প্রকাশ্য তা বুঝতে সাহায্য করছে।

অনির্দেশ্য বাদ সম্বন্ধে বলবার আগে একটা উদাহরণ দিয়ে জিনিটাকে পরিষ্কার করা যাক। ধরা যাক্, একটা মিটার স্কেল দিয়ে আমরা একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য মাপছি। মিটার স্কেলটি সমান সমান একশত ভাগে বিভক্ত; সুতরাং প্রত্যেক ভাগ এক সেণ্টিমিটারের সমান এবং এক সে. মি. ই. হচ্ছে

ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য যা চোখের কোনও রকম সাহায্য না নিয়ে এই স্কেলের সাহায্যে মাপা যায়। সুতরাং যে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যটি আমরা মাপছি সেটা যদি কোনও পূর্ণসংখ্যক সে. মি.-এর সমান না হয় সে ক্ষেত্রে তার সঠিক পরিমাপ এই স্কেলের সাহায্যে সম্ভব নয়। কেন না, যদি ধরে নি যে, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যটি পুরাপুরি পাঁচ সে. মি. হয়ে আবার পাঁচ ও ছয় সে. মি. নির্দেশক দাগের মাঝামাঝি পড়ছে, তা হলে অতিরিক্ত অংশটুকু চোখের কোনও রকম সাহায্য না নিয়ে মাপা আর সম্ভব হচ্ছেনা। সুতরাং কোনও দৈর্ঘ্য মাপায় যে অনির্ণেয়তা থেকে যাবে তা এই মিটার স্কেলটির বেলায় মোটামুটিভাবে এক সে. মি-এর সমান বলে ধরে নিতে পারি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এই অনির্ণেয়তা যেন এই নির্দিষ্ট স্কেলটি ব্যবহারের দরুণই হচ্ছে। কিন্তু সূক্ষ্মতর পরিমাপের জন্যে যদি আমরা স্কেলের ছোট ছোট ঘরগুলিকে এক সে. মি. এর এক দশমাংশ বা এক শতাংশ ইত্যাদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাগেও ভাগ করি, তাহলেও একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, অনুরূপ একটা অনির্ণেয়তা এখানেও এসে যাচ্ছে। এই হলো একটা দিক। আবার অন্যভাবে দেখতে গেলে জিনিষটা সম্পূর্ণ বিপরীত দাঁড়ায়।

সাধারণ জ্ঞান ও বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিতি থেকে মানুষের কতকগুলি সহজাত বুদ্ধি ও অনুভূতি হয়ে থাকে। এই বুদ্ধি ও অনুভূতি তার সকলরকম অনুসন্ধান ও অনুসন্ধিৎসার গোড়াতেই কার্যকরী থাকে। সব সময় যুক্তি দিয়ে এগুলিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। স্কেল দিয়ে কোনও দৈর্ঘ্য মাপবার বেলাতেও তেমনি একটা সহজাত অনুভূতি আমাদের প্রভাবিত করে। সেটা হচ্ছে—যে সকল দৈর্ঘ্যের পরিমাপ আমরা স্কেলের সাহায্যে করছি সেগুলি যে সব সময়েই স্কেলের ছোট ছোট কতকগুলি পূর্ণ সংখ্যক দাগের সঙ্গে সমান হবে বা স্কেলকে কোনও নির্দিষ্টভাবে ভাগ করতে পারলে তা হওয়া উচিত, এ কিন্তু আমাদের একান্ত অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলে বোধ হয়। আমরা সাধারণতঃ আশা করি যে, মাপবার বেলায় এ রকম একটা অনির্ণেয়তা থাকবেই এবং সে জন্যেই আমরা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর যন্ত্রাদি আবিষ্কারের চেষ্টা করি। এ রকম একটা অনির্ণেয়তা না থাকলে, সত্যি কথা বলতে কি মাপবার কোনও সার্থকতাই থাকতো না। সুতরাং এভাবে দেখতে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই অনির্দেশ্যতা যেন বস্তুধর্মের মধ্যেই অন্তর্লীন হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে এই যে একটা অনির্দেশ্যতা দেখা দিচ্ছে, এটা কিন্তু নির্দিষ্ট কারও

কোনও ত্রুটির জন্যে হচ্ছে না, পরিমাপ ও পরিমেয়র মধ্যে এটা আপনাআপনি হতেই এসে যাচ্ছে।

এই রকমই একটা ধারণা থেকে হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদের জন্ম। তাঁর মতে কোনও জাগতিক কণিকা কিংবা বস্তু সমষ্টির অবস্থান মাপবার অনির্দেশ্যতা এবং তাদের ভরবেগ মাপবার অনির্দেশ্যতার গুণফল মোটামুটি ভাবে প্ল্যাংকের নিয়ত বা 'h' এর সমান। দৈনন্দিন ব্যাপারে আমরা এতটুকু অনির্ণেয়তা গণনার মধ্যে আনি না, কিন্তু পরমাণু ও ইলেকট্রনের বেলায় যেখানে পারস্পরিক দূরত্বের মানই হচ্ছে $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটারের পর্যায়ে, সেখানে এটাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে সব ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনও প্রকার গণনা বা পরিমাপ থেকে পাই যে, ইলেকট্রনকে অনির্দেশ্যবাদ প্রদত্ত ন্যূনতম দৈর্ঘ্যের চেয়েও কম দূরত্বের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, সেক্ষেত্রে তার ভরবেগের অনির্দেশ্যতা ভয়ানক রকম বেড়ে যাবে এবং এরকম একটা পরিমাপ অবাস্তব বা অসম্ভব বলে গৃহীত হবে। প্রকৃতপক্ষে কোনও পরিমাপ বা পরীক্ষা কতখানি বাস্তব বা সম্ভব হতে পারে তা পরিমিতিবাদ ও আপেক্ষিকতাবাদ সুচারুরূপে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং যে হেতু বহির্জগতে নিয়ত পরিবর্তনশীল নানা প্রকার ঘটনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কেবলমাত্র পরীক্ষা ও পরিমাপের ভিতর দিয়েই, সেক্ষেত্রে অনির্দেশ্যবাদ যে কতখানি প্রয়োজনীয় তা সহজেই বোধগম্য। প্রকৃতপক্ষে অনির্দেশ্যতা জাগতিক বিজ্ঞানে আসতেই হবে এবং এটা আধুনিক বিজ্ঞানবাদীর ভুল বা অক্ষমতা কিছুই নয়, এটা তার অগ্রগতিরই পদক্ষেপ। অনেকে বলে থাকেন যে, এই অনির্দেশ্যবাদের দরুণ বিজ্ঞান ধোঁয়াটে হয়ে গেছে এবং সেটা বিজ্ঞানীদের ভুলপথে চলবার জন্যেই হয়েছে। এটা কিন্তু একেবারেই উল্টা, কেননা এই অনির্দেশ্যবাদের সাহায্যে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের যে রূপ গড়ে তুলেছি তা নানাপ্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সাহায্য করছে, যা ক্ল্যাসিকাল বিজ্ঞান পারেনি।

'অনির্দেশ্যবাদ' কথাটা বলতে এরকম একটা ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, বস্তু জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও ঘটনা বা কোনও কিছুর সম্বন্ধেই বিজ্ঞানীর পক্ষে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু নির্দেশ করা বা সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক বিজ্ঞানী সব সময়েই বস্তুর অবস্থিতি সম্বন্ধে বা কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত; কিন্তু সেটা কোনও জাগতিক পরীক্ষা বা পরিমাপের সাহায্যে যে সম্পূর্ণরূপে নির্ণেয় তা তিনি স্বীকার করেন না। তার

কতখানি সম্ভাব্যতা আছে, বিজ্ঞানী কেবল মাত্র সে পর্যন্তই বলতে পারেন। এই সম্ভাব্যধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীই আধুনিক অনির্দেশ্যবাদের মূল কথা। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আধুনিক তরঙ্গ বলবিদ্যা (Wave Mechanics) গড়ে উঠেছে যা পদার্থ বিদ্যায় যুগান্তর আনয়ন করেছে।

প্রকৃত পক্ষে মানুষের অনুসন্ধিৎসা যুগে যুগে প্রাকৃতিক জগতের অন্তরালস্থিত চিরন্তর সত্যের সন্ধান করে এসেছে। চিরন্তন সত্য যে একটা আছে এবং সেটা যে সার্বজনীন হবে তাও মানুষের ভাবনা কল্পনার মধ্যে একটা সহজাত অনুভূতির মতই বিদ্যমান। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে বিজ্ঞানী যদি চিরন্তন সত্যের সন্ধানেই ব্যাপৃত, তা হলে আধুনিক অনির্দেশ্যবাদ (বা অনির্ণেয়বাদ যা-ই বলিনা কেন) প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞেয়বাদেরই প্রশ্রয় দিয়ে কি তাঁর উদ্দেশ্যের সমাধি ঘটাচ্ছে না! এ নিয়ে অনেক দার্শনিক বিতর্ক উঠতে পারে; কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে, জাগতিক বিভিন্ন পরিমাপ থেকে বস্তুর অবস্থান বা তার অন্যান্য ধর্মের যে পরিচয় আমরা পাই, সেটা বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই তবে আমরা আরও নানা রকম অনুসন্ধানে এগিয়ে যেতে পারছি। বস্তু আধুনিক বিজ্ঞানে একটা কিছু অজ্ঞেয়রূপে আসছে না বা সেটা এমন একটা কিছু আমরা বলছি না যা সমগ্র বিশ্বে কার্য-কারণের শৃঙ্খলা বজায় রাখছে অথচ তা নিজে সম্পূর্ণ রূপে আমাদের জাগতিক জ্ঞানের উর্দ্ধে। বস্তুর নিজস্ব কতকগুলি ধর্ম আছে এবং তা জানবার জন্যে যে পরিমাপ বা পরীক্ষা আমরা করছি, এই দুটাকে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়েই বস্তুর বৈজ্ঞানিক সত্তা। তাই এখানে বস্তু যতটা মূল্যবান, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাটিও সমভাবে মূল্যবান এবং ঐ পরীক্ষা বস্তুকে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে কতখানি কার্যকরী হতে পারে তারই একট সীমা নির্দেশ হচ্ছে হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদ।

যে কোনও কিছুর পরিমাপ করতে গেলেই এই অনির্ণেয়তা আসবে। মনে করা যাক, আমরা একটা ইলেকট্রনকে একটা অতি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখছি। সাধারণ আলোর বদলে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমন্বিত গামারশ্মি ব্যবহার করলে সেই ইলেকট্রন দৃশ্য হয়ে উঠতে পারে। ধরা যাক্ গামারশ্মি ইলেকট্রনের গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসছে এবং তা থেকেই আমরা ইলেকট্রনের অবস্থিতি বুঝতে পারছি। কিন্তু এই প্রতিফলনের সময় গামারশ্মির আঘাতে

ইলেকট্রনটি কিছুটা স্থানচ্যুত হয়ে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইলেকট্রনের অবস্থিতি জানতে পারলেও তার প্রকৃত অবস্থান অনির্ণেয় হয়ে যাচ্ছে। অতএব এ রকম একটা পরীক্ষার সাহায্যে কোনও বস্তু-কণিকার অবস্থান সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়; কেন না এই পরীক্ষার ফলে সে তার প্রকৃত অবস্থা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। এ রকম অনেক উদাহরণ আছে যেখানে এ ধরণের অনির্ণেয়তা কত স্বাভাবিক ভাবে আসছে তা সহজেই বোঝানো যায়।

আর একটা প্রশ্ন হতে পারে, সেটা হচ্ছে—যেখানে বস্তু সম্পূর্ণ ভাবে নির্ণেয় হচ্ছে না, সেখানে বস্তুর কোনও রূপকল্পনা বা প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কতখানি আশা করতে পারি? প্রকৃতপক্ষে বস্তুর রূপ কল্পনা অবাস্তব। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রন গোলাকার ক্ষুদ্র বর্তুলের মত একটা বৃত্তাকার পথে কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরছে এ রকমের একটা ধারণা করা অনির্দেশ্যবাদ অনুসারে অবাস্তব। যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যায় যে, এটাই পরমাণুর রূপ তাহলে সেটা কি একটা নিছক কল্পনা হয়ে দাঁড়াবে না? কেন না পরমাণুর এই ছবি একটা তুলনামূলক পরিচিতি মাত্র। ক্ল্যাসিক্যাল বিজ্ঞানানুসারে হাইড্রোজেন পরমাণুকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যদি কতকগুলি নির্দিষ্ট গাণিতিক সূত্র এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া যায় এবং যেহেতু এসব সূত্রগুলি একটা ঘূর্ণায়মান বর্তুলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, সে হেতু সাদৃশ্যটা চলে আসছে। আসলে এই ছবি পরমাণুর কোনও রূপই নয়, কারণ পরীক্ষা দ্বারা তার যাথার্থ্য মিলিয়ে দেখা যায় না এবং পরীক্ষা করতে গেলেই তার প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে নির্ণেয় হতে পারে না। নির্ণেয় যখন সে হচ্ছেনা এবং তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় যখন কেবলমাত্র কতকগুলি পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে, সে ক্ষেত্রে বস্তু কণিকার তথাকথিত বাস্তব রূপায়ণ কি করে সম্ভব? কেবলমাত্র তার গুণাগুণ বা ধর্ম, যার পরিচয় আমরা পাচ্ছি পরিমাপের ভিতর দিয়ে, তাদেরই একটা বস্তুগত রূপায়ণ এবং আমাদের জাগতিক উপলব্ধির সাহায্যের জন্যে একটা তুলনামূলক চিত্রণ আমরা ধরতে পারি, আর বেশী কিছু করা একেবারেই অসম্ভব। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, একই বস্তুকণিকার উপর বিভিন্ন পরীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন তুলনামূলক যে চিত্র খাড়া করা হয়েছে, (যা থেকে পদার্থের দ্বৈতবাদ গড়ে

উঠছে.) সেটা কি করে সম্ভব ? আমরা আগেই বলেছি যে, বস্তুর ধর্ম এবং তাকে জানবার জন্য পরীক্ষা এ দুটাকে নিয়েই বস্তুর বিজ্ঞান সম্মত অস্তিত্ব। সে ক্ষেত্রে যখন পরীক্ষাটি বস্তুর কোনও নির্দিষ্ট গুণাগুণ জানবার জন্যে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হবে, তখন সেই গুণাগুণের ভিত্তিতে গড়ে-তোলা বস্তুর তুলনামূলক রূপায়ণ, বস্তুর সেই নির্দিষ্ট গুণসমন্বিত অবস্থাটাই পরিস্ফুট করবে। উদাহরণ নিয়েই দেখা যাক। ইলেকট্রনের কণিকাধর্ম পরীক্ষা করবার জন্যে আমরা একটা ইলেকট্রন রশ্মি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে পাঠাই যার ফলে রশ্মিটি তার প্রকৃত গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়। এখানে ইলেকট্রনটি একটি সাধারণ বিদ্যুদাহিত কণিকার মতই ব্যবহার করছে এবং আমাদের পরীক্ষাটিও কেবলমাত্র সেটা নির্ণয় করবার জন্যেই বিশেষ ভাবে প্রস্তুত। আবার ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম আছে কিনা, তা পরীক্ষা করবার জন্য আমরা ইলেকট্রনটিকে একটি কৃষ্ট্যালের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে তার বিসরণ পরীক্ষা করি। এখানে কৃষ্ট্যালের সাহায্যে পরিমাপটি বিশেষভাবে তরঙ্গধর্ম নির্ণয় করবার জন্যেই প্রস্তুত। অতএব তুলনামূলক চিত্রণ যেটা এই পরিমাপের পর খাড়া করা যেতে পারে সেটার নিশ্চয়ই তরঙ্গধর্ম পরিস্ফুট করবার দিকে একটা প্রবণতা থাকবে, এটা অনস্বীকার্য। তবে এটা ঠিক যে, কেবলমাত্র একটি তুলনামূলক রূপায়ণের উপর যদি বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত বস্তু কণিকার সমস্ত গুণাবলী আরোপ করা যেত তাহলে সেটাই আদর্শ হয়ে দাঁড়াতো। এর মূলে অবশ্য মানুষের জাগতিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে অক্ষমতা আছে। তবে পদার্থের দ্বৈতরূপের কোন্‌টা সত্য, এ প্রশ্ন উঠলে বলতে হয় যে, পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে উভয় রূপ-চিত্রণ সমভাবে সত্য ; সত্যতার কমবেশী মান নির্ধারণ এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

প্রকৃত পক্ষে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সত্য বহির্জগত থেকে প্রাপ্ত পরিমাপগত বিভিন্ন গুণাবলীর উপর যুক্তিসম্মতভাবে গড়ে তোলা একটা আদর্শায়িত দর্শনমাত্র এবং অনির্দেশ্যবাদ সেই দর্শনের একটা মূলসূত্র। বৈজ্ঞানিক দর্শনের ক্ষেত্রে, কার্য চিন্তাকে প্রভাবিত করছে এবং সেজন্যে এখানে যুক্তিসম্মত চিন্তা ও বিজ্ঞানসম্মত কার্যের (বা পরীক্ষার) মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত যোগসূত্র আছে। অনির্দেশ্যবাদ সেই চিন্তা এবং চিন্তালব্ধ বস্তুর মধ্যে একটা বিজ্ঞান-সম্মত পার্থক্যের নির্দেশ করছে। বৈজ্ঞানিক সত্য বা জ্ঞান কতখানি মৌলিক বা চিরন্তন হতে পারে তা নির্ভর করছে সেই জ্ঞান কতটুকু সংলগ্ন বা বিভিন্ন মুখী, প্রাকৃতিক জগতে সেটা কতদূর প্রযোজ্য, তার উপর এবং সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে অনির্দেশ্যবাদ প্রাকৃতিক নিয়মের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান।

সাময়িকী

মুক্তির আনন্দ : গত ১০ই জুলাই হইতে ভারতের সকল রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার খাদ্য শস্যের উপর নিয়ন্ত্রণনীতি ভারত সরকার প্রত্যাহার করিয়াছেন। খাদ্য শস্যের উপর অনেক প্রকার নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ ছিল—মূল্য নিয়ন্ত্রণ, চলাচল নিয়ন্ত্রণ, পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ; ১০ই জুলাই হইতে এই সমস্ত নীতিই প্রত্যাহার করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল হইতে পূর্ব্বেই চাউলের উপরে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলেও উহা বিলুপ্ত হইল। গত ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী হইতে কলিকাতা অঞ্চলে সর্ব্ব প্রথম চাউলের রেশন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। সুদীর্ঘ সাড়ে দশ বৎসর কাল পর কলিকাতাবাসী নিয়ন্ত্রণ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতেছে। মানুষ সর্ব্বক্ষেত্রে চায় মুক্তি। কিন্তু দুর্দ্দৈব যে, যে-অন্ন একবেলা গ্রহণ না করিলে মানুষের চলচ্ছক্তি রহিত হয়, সেই অন্নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করিতে হয়! কি সামাজিক অধঃপতন মানুষের! মানুষ এমন নির্লজ্জ যে, তাহাদের সমাজ ব্যবস্থারই ফলে মানুষকে তাহার অস্তিত্ব রক্ষার মূল উপকরণটিকে স্বাধীনভাবে সংগ্রহ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অথচ আমরা সভ্য হইয়াছি। অন্নের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে সভ্যতার কোনও নিদর্শন নাই ; অথচ সভ্য সমাজের কাছে ইহা যেন কিছুই নহে! যাক্ মানুষের আজ কি আনন্দ যে, খোলাবাজারে নিজের ইচ্ছানুরূপ অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিবে। শনিবার নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের পর রবিবার বাজারে চাউল পাওয়া যায় নাই, সোমবার যখন বাজার হইতে চাউল কিনিয়া আনা হইল, একটী মুক্তির আনন্দ পাইলাম। বন্ধনের কি বোঝা মানুষের বুকের মধ্যে আছে। এইবারে কালোবাজারের অভাব ঘটিবে, দুর্নীতির প্রসার কমিবে। সহজ চলা-ফেরা যেখানে, সেখানে দুর্নীতি বাসা বাঁধিতে পারে না। যেখানে বিধির চাপ বেশী, সেখানেই দুর্নীতির জন্ম।

কিন্তু মুক্তির এই আনন্দের মাঝেও বেদনা অনুভব করিতেছি সেই সব কর্ম্মচারীদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, যাহারা এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্য সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এতগুলি মানুষ বেকার থাকিতেই পারে না। ইহা রাখাও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। সরকার যত শীঘ্র

পারেন, ইহাদের কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দিন। কেন্দ্র ও প্রদেশ সরকার যেমন সাহসের সহিত সর্ব্ববিধ পরিস্থিতির সন্মুখীন হইতেছেন, সমাধান করিতেছেন, এক্ষেত্রেও তাঁহারা তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন, এ আশা আমাদের আছে।

বিশ্বশান্তির মূল সূত্রাবলী : ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও চৈনিক প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই-এর সংযুক্ত এক বিবৃতিতে শান্তির মূল সূত্রাবলী উল্লিখিত হইয়াছে। (১) পরস্পরের রাজ্য সীমানা এবং সার্ব্বভৌমিকত্ব সম্মান করিয়া চলা, (২) অনাক্রমণ, (৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সমব্যবহার ও পারস্পরিক কল্যাণ সাধন, (৫) শান্তির মধ্যে পাশাপাশি বসবাস। যে বিশ্ব গড়িয়া উঠিবার জন্য আকুপাকু করিতেছে সেই বিশ্বের দর্শন শাস্ত্রেও ঘোষিত হইয়াছে যে, বিশ্বের প্রতিটি অংশ স্বয়ংপূর্ণ; প্রতি স্বয়ংপূর্ণ অংশ অন্য সব স্বয়ংপূর্ণ অংশকে স্বয়ংপূর্ণ বলিয়াই সম্মান করিবে, কেহ কাহারও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করিবে না, প্রত্যেকে প্রত্যেককে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া একটী সমগ্র কল্যাণের পথে নিজকে ও অপরকে গড়িয়া তুলিতে চাহিবে, কেহ কাহারও অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিবার জন্য আক্রমণ করিবে না। ইহাই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়, সর্ব্বজাতি সমন্বয়ের মূলসূত্র। আজি হউক, কালি হউক, ইহা জয়যুক্ত হইবেই; কেননা, ইহাই বর্ত্তমান যুগদর্শন। সৌভাগ্যের কথা, ভারতবর্ষই এই সূত্র সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বের সামনে উপস্থিত করিল। এই সূত্রই 'ব্রহ্ম সূত্র'। এই ব্রহ্মসূত্রে বিশ্ব সংগঠিত হইবে। কিন্তু এই সূত্র কম্যুনিষ্ট চীন খোলা প্রাণে মানিয়া চলিবে, এ আশা অনেকে করে না। কেননা, তাহার দর্শন ও অতীত কার্য্যক্রম কখনও অনাক্রমণ-মূলক নয়। ডাইলেকটিকই (দ্বন্দ্ববাদ) যে আক্রমণ মূলক। সে শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ ছাড়া কিছু বোঝে না, বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চাহিবেও না। কিন্তু কেউ না চাহিলেও অনেক সময়ে দায়ে ঠেকিয়া চলিতে হয়। ভারতবর্ষ আজ বিশ্বের সকলের চাওয়া-না চাওয়ার ইচ্ছাকে সংযত করিবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে। ভারত যাহা আজ চায়, তাহাই একদিন বিশ্বকে চাহিতে হইবে, সেদিন হয়ত দূরে নাই। কম্যুনিষ্ট চীন তিব্বতের উপর অধিকার যে ভাবে লাভ করিয়াছে, তাহা দ্বারা কখনও মনে করা যায় না যে, চীন প্রাণ খুলিয়া এই সূত্র মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু তথাপিও সে স্বাক্ষর করিয়াছে, ইহাও সত্য কথা। ইহা যে চীনের পক্ষে অভিসন্ধি পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই. কিন্তু কি কারণে সে খোলা-খুলি ভাবে ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে নাই, সেই স্থানটুকুই আমাদের

লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিশ্বের চিন্তাধারাকে ভারতবর্ষ এমন এক জায়গায় আনিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহাকে একান্তভাবে ঠেলিয়া ফেলিবার মত দুবুদ্ধি চীনের হয় নাই। এই যেন-সুবুদ্ধিটুকুকে কাজে পাইবার জন্যই শ্রীনেহরু এই চুক্তি করিয়াছেন। ইহাই সত্যাগ্রহীর পথ, সত্যাগ্রহী কাহারও সম্বন্ধে কোনও স্থায়ী ধারণা, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক পোষণ করিতে পারে না। যদিও একদিন মিঃ চৌ এন লাই নাকি বলিয়াছিলেন যে, 'তোমরা ভুলে যেও না যে আমি কম্যুনিষ্ট', তবুও এই becoming-এর দেশে কে যে কি এবং কতদিন কি, তাহা একান্তভাবে স্থির করিয়া রাখা কঠিন। মানুষের ব্যক্তি বিশ্ব-শক্তির চাপের মধ্যে কেমন ভাবে যে বদলায় তাহা আমরা জানি। শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিশ্ব-শক্তির চাপে ব্রিটিশকে সেদিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছে। সত্যাগ্রহী অনন্ত আশাবাদী হইয়া যাহাকে দিয়া যেটুকু ভাল করাইয়া লওয়া যায়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখেন। শ্রীনেহরুর ভারতীয় দৃষ্টি সার্থক হউক।

পাণিহাটীতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল শতবার্ষিকী ঃ বিগত ২০শে জুন, ১৯৫৪ রবিবার বিকালে সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের জন্মলীলাপুত ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত পাণিহাটী গ্রামের কৈবল্য মঠে এক জন সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমৎ নিত্যশ্যামানন্দের উদ্বোধন সঙ্গীতের ডাঃ মণিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে কিছু বলেন। ইহাদের পর শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বলেন যে, শতবর্ষ পুর্ব্বে পাণিহাটীর এই বিশেষ মাটীর উপরে একদিন শ্রীনিত্যগোপাল অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, এই মাটিতেই একদিন তিনি ছুটাছুটি করিয়া গিয়াছেন, এই গঙ্গার ঘাটেই একদিন তিনি জলখেলা খেলিয়া গিয়াছেন—এই কথা মনে করিতে আজ প্রাণ আকুল হইতেছে। যে কথা তিনি দিতে আসিয়াছিলেন তাহা সবিস্তারে বহু পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যথাসময়ে প্রয়োজন হইবে বলিয়া; কিন্তু যতদিন দেহে ছিলেন ততদিন মানুষের বিশেষ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে পণ্ডিত কুলীন ধনীর নিকট হইতে নিজেকে গোপন করিয়া গিয়াছেন। অজড়ের এ্যান্টিথিসিস জড়ের সবটুকু কথা বলা হইয়া যাওয়ার পর অজড় ও জড় উভয়ের স্বয়ংমূল্য স্বীকৃতির উপরে সিনথেসিস-এর বার্ত্তা লইয়া শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন। সমন্বয়েরও কয়েকটী স্তর আছে। শ্রীনিত্যগোপাল একটী

সর্ব্বাঙ্গীণ সমন্বয়ের সংবাদ আনিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার জীবন ও দর্শন কিছুকাল পর্য্যন্ত লোক চক্ষুর অগোচরে থাকাই স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ত্তমান যুগে সমন্বয় শব্দের প্রবর্ত্তক—সর্ব্ব ধর্ম্ম ও সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ইষ্টদের সমন্বয় নিজ জীবনে আস্বাদন করিয়া তিনিই আজিকার মানুষের জন্য তাহা রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল দুই বিরুদ্ধের বিপরীতের যেমন জড় অজড়, নিত্য অনিত্য চৈতন্য অচৈতন্য, দ্বৈত অদ্বৈত প্রভৃতির সমন্বয় প্রস্থাপন করিয়াছেন, সর্ব্ব মতের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব পথেরও সমন্বয়ের কথা কহিয়া গিয়াছেন। আজ এই পাণিহাটীর বুকে দাঁড়াইয়া সেই অপরূপ রূপ আর সেই পরম করুণা পরম আদরের মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপালকে স্মরণ করিয়া আকুল হইতেছি। তিনি যে মাটীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মাটীর সম্পর্কে পাণিহাটীবাসী প্রত্যেকে আমাদের নমস্য। ইহার পর সভাপতি মহাশয় গভীর শ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় বাক্যদ্বারা শ্রীনিত্যগোপালকে প্রণাম জানাইয়া তাঁহার মনোজ্ঞ লিখিত অভিভাষণে শতবর্ষ পূর্ব্বের ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্ম্মীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতরণ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন এবং তাহার পর শ্রীনিত্যগোপালের অবতরণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনকে বিবৃত করিয়া লেখেন, 'এই সুমহান পরিবেশের মধ্যেই শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব ও অংশগ্রহণ এবং উত্তর কালে উহাকেই পূর্ণ রূপদান। ভারতীয় কৃষ্টির প্রাণস্বরূপ উদার আধ্যাত্মিকবাদ যাহা বৈদিকযুগেই ভারতে পূর্ণরূপ গ্রহণ করিলেও উত্তরকালে যুগে যুগে যাহার নব নব স্ফুরণ দেখা গিয়াছে, তাহাই এই যুগে নবতমরূপে বিস্ফুরিত হইয়া পূর্ণতম অবদানে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এক্ষণে জড়বাদকে নিজের উদরে গ্রাস করিয়াছে, তাহাকে নিজ চৈতন্যে সঞ্জীবিত ও মহীয়ান করিয়াছে। আর এই বিরাট কীর্ত্তিকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করিতেই শ্রীনিত্যগোপালের এই মরধামে অবতরণ, শুদ্ধপরমাত্মচৈতন্যের প্রপঞ্চময় নরদেহধারণ। কারণ দেখা যায়, এই সমস্ত শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব সত্যস্বরূপ অমরগণ জন্মাবধিই যেন এই মায়ার রাজ্যের লোক নহেন। ধর্ম্মরাজ্যের কলুষ ও গ্লানি দূর করাই যেন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও কার্য্য। অথচ লোকশিক্ষার মধ্য দিয়াই তাহা করিতে হয় কারণ মানব সাধারণের আচার, ব্যবহার, চিন্তাধারা ও কার্য্যাবলীর মাধ্যমেই ধর্ম্মের প্রকাশ ও অবস্থা নিরূপণ হইয়া থাকে। শ্রীনিত্যগোপালের জীবনেও তাহাই লক্ষিত হয়। বাল্যাবধি তাঁহার শুদ্ধ চরিত্রতা, উদার ধর্ম্মপ্রাণতা,

আধ্যাত্মিক উচ্চানুভূতির লক্ষণ, গভীর তন্ময়তা, জীব সাধারণের প্রতি করুণা, নিজ কর্ত্তব্যের প্রতি মনের দৃঢ়তা, অপূর্ব্ব মেধাশক্তি প্রভৃতি গুণনিচয় তাঁহার চরিত্রে পূর্ণরূপেই প্রকট ছিল। আমাদের মত দেহধারী হইয়াও যে তিনি আমাদের মত বাহ্য জগতের মানুষ ছিলেন না শৈশব হইতে তাহার প্রকাশ ছিল। ধ্যান ধারণা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সম্পদ যে তাঁহার মত দেহধারী পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত্ত থাকে, বাল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যকালেই তাঁহারা অন্তর্জগতে বিচরণ করেন, যাহা বয়সাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত প্রগাঢ় আকার ধারণ করে। শ্রীনিত্যগোপালে এই সমস্ত পূর্ণরূপেই দৃষ্ট হয়। বাল্যেই তাঁহার গভীর সমাধি হইত। আর একটি যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এইরূপ দেবমানবগণ বাল্যেই পরিচিত হয়, যথা বহু অলৌকিক ঘটনাবলির পরপর সমাবেশ, যাহা সাধারণ জীবনে ক্বচিৎ দুএকটি ঘটিয়া থাকে, তাহাও শ্রীনিত্যগোপালের বাল্য জীবনে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, তাঁহার প্রতি ইতর প্রাণীদিগের সক্রিয় অনুরাগ ও সেবা, অলৌকিক শক্তির পরিচয়, ক্রীড়াচ্ছলে গভীর তত্ত্ব কথার প্রকাশ ইত্যাদি।

বাল্যের প্রভাব মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হৃদয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে যাহাকে রূপ দান করিবার জন্য যাহা কিছু সাধনার প্রয়োজন তাহারও প্রবল প্রেরণা তাঁহার অন্তর মনকে একান্ত ব্যাকুলিত করিয়া তুলে, জগতের সমস্ত ভোগ সুখকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করাইয়া সমগ্র কৈশোর ও যৌবনকে সুখ ভোগের পরিবর্ত্তে কঠোর আপাতঃ দুঃখময় সাধনায় ব্যাপৃত রাখিতেই তীব্র প্রেরণা সঞ্চার করে। শ্রীনিত্য-গোপালেরও যৌবনের সাধনা ও তপস্যা লক্ষ্য করিলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই। শ্রীভগবান বুদ্ধের মতই শ্রীনিত্যগোপাল 'ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরম্' বলিয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অদূর ভবিষ্যতেই বোধিসত্ত্ব নির্ব্বাণ লাভ করেন। সেই উৎকট সাধনার নিকট গৃহ পরিজন বিত্ত বৈভব ত্যাগ ত অতি তুচ্ছ কথা। সেই জলন্ত বৈরাগ্যের প্রকোপে সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্যই শুধু তুচ্ছাতিতুচ্ছ নহে, নিজের দেহ যে মানবের এত প্রিয় তাহারও উপর কোন মায়া মমতা থাকে না। কেবল এক চিন্তা তখন, 'বস্তু লাভ না হইলে শরীর ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র।' এ ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, সমস্ত সদ্বস্তু ত তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ, তাহাকে আবার এত অত্যুগ্র কষ্ট স্বীকার দ্বারা লাভ করার অর্থ কি? উত্তরে এই বলা যায় যে, এই সমস্ত লোকোত্তর

পুরুষগণের চরিত্র ও কার্য্যাবলী মানবেতিহাসে সর্ব্বকালের জন্য আদর্শ রূপে অঙ্কিত থাকে যাহা মানবকুলকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা দান করতঃ তাহাকে মহত্তর আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে প্ররোচিত করে, দিগ্‌ভ্রান্ত মানবকে দিগ্ দর্শন করাইয়া দেয়। সাধারণ দেহ ধারীর মত না হইয়াও তাঁহারা সাধারণের দেহাদি ধর্ম্ম গ্রহণ করেন আমাদিগের মত ইতর সাধারণের আশা সঞ্চার ও উৎসাহ দানের নিমিত্তই—'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'। শ্রীনিত্যগোপালের জীবনে ইহার পুর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। যৌবনে তাঁহার সাধন কালেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মত উচ্চতম আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন দেব-মানবই তাঁহাকে সেই উচ্চতম পরমহংস অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বারম্বার স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পর আর অন্য অভিমতের প্রয়োজন কি? কিন্তু আমরা দেখিতে পাই তখনও শ্রীনিত্যগোপালের সাধনার বা তপস্যার বিরাম নাই। ক্রমাগতই উৎকটতর তপস্যা করিয়া চলিয়াছেন তাহা কিসের জন্য? উত্তর কালে তাহার প্রমাণ মিলিবে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাহা আলো অন্ধকারের মতই বিপরীত ধর্ম্মী তাহাদেরই মিলন বা সমন্বয়ের জন্য, যাহা এতদিন অসম্ভব ছিল তাহাকেই সম্ভব করিতে এই প্রয়োজনাতিরিক্ত তপস্যা। অন্ধকারকে আলোকে রূপায়িত করিবার জন্যই এই অত্যদ্ভুত প্রয়াস ও অপরিমেয় ক্লেশ স্বীকার।

উত্তরকালে শ্রীনিত্যগোপাল ছিলেন মানবের সামগ্রিক ও সর্ব্বাঙ্গীণ ক্রমোন্নতি বাদের এক পরিপুর্ণ অধ্যায় ও সমরসমুর্ত্তি, লৌকিক জগতের সহিত অধ্যাত্মিক জগতের অপুর্ব্ব সমন্বয় মূর্ত্তি, জড়বাদকে আধ্যাত্মিকের পুর্ণ স্বীকৃতি ও গ্রহণ। ইহাই যে ছিল যুগ প্রয়োজনে যুগধর্ম্ম। ধর্ম্ম গ্রন্থাদিতে সৃষ্টি প্রকরণের যে নিয়ম ও কার্য্যক্রম বর্ণিত আছে তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মার 'বহুস্যাম্' রূপ ঈক্ষণেই তাঁহা হইতে প্রকৃতি জগতের আবির্ভাব ও উত্তরোত্তর বিকেন্দ্রিত প্রসার। ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ব্রহ্ম-কেন্দ্র হইতে ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থুল, স্থুলতর, স্থুলতম অজ্ঞানময় প্রান্তের দিকে প্রকৃতির জড়রূপে বিস্তার। জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে জ্ঞানলুপ্তির স্থুল চৈতন্যের দিকে অগ্রগতি। ইহাই শ্রীভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের লীলা। সেই নিয়মেই সৃষ্টিকাল হইতেই ক্রমাগত প্রকৃতির এই ব্রহ্মবিরোধী বা বহির্মুখী গতিই এই স্থুল জড় জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া আসিতেছে এবং তাহাকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মানবকুল তাহার

স্থূল ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে উপভোগ্য করিয়া সেই বিষয়রসে মগ্ন হইয়া তাঁহা হইতে বহু দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেছে। আর ইহাই বর্ত্তমান যুগে মানবকে এত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছে যে সে উহাকে ভগবদ্‌বিমুখী অসার বোধে আর পরিত্যাগই করিতে পারে না বরং উহাকেই সারাৎসার নিত্য পদার্থ বোধে ভোগ করিয়া থাকে। এক্ষণে উহা তাহার এতই প্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে যে উহাকে গ্রহণ করিয়া বরং সে ভগবানের নিকট অগ্রসর হইতে সম্মত হইতে পারে—কিন্তু উহাকে ত্যাগ করিয়া সে ভগবানকে লাভ করিতে চায় না! এমতাবস্থায় জড় জগতকে ত স্বীকার করিতেই হয় অথচ ভগবদ্‌মুখী না হইতে পারিলে ত মানব জীবনই ব্যর্থ হয়। তাই উহাকে একেবারে ত্যাগ না করিয়াও কিরূপে সেই পরম শ্রেয়লাভ হয় তাহাই দেখাইবার ও শিখাইবার জন্যই শ্রীনিত্যগোপালাদির এই যুগে আবির্ভাব। ইহাই এক্ষণে সমস্যার সমাধান, ইহাই এক্ষণে যুগধর্ম্ম। ইহাকেই শ্রীনিত্যগোপাল জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা রূপদান করিয়া গিয়াছেন। এখন ইহাকে আমরা যে নামেই অভিহিত করি না কেন, যেমন জড়াজড়বাদ, চৈতন্যাচৈতন্যবাদ, ব্রহ্মমায়াবাদ, নিত্যানিত্যবাদ, আত্মানাত্মবাদ, জ্ঞানাজ্ঞানবাদ ইত্যাদি, ইত্যাদি, সবই সেই একার্থবোধক। বহুকালের সঞ্চিত মূলীভূত এক মহাদ্বন্দ্বের চিরতরে নিরসন সাধিত হইয়াছে। ইহাকে শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরও চরম পুষ্টি বলা যাইতে পারে। এই খানেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতের শ্রীনিত্যগোপালের একাত্মবোধ, একানুভূতি, সমৈকরস। তথাপি তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাধিকেও তিনি মায়িক বলিয়া এক বিরাট দার্শনিক উচ্চ অনুভূতির সন্ধান দিয়াছেন। আর সমাধিকে মায়িক বলিয়া মনুষ্য জীবনের লক্ষ্যকে যে কত উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করাইয়াছেন তাহা ভাষায় অব্যক্ত। অপরন্তু সমাধিকে মায়িক বস্তু বলিয়া উহাকেও নিম্ন হইতে অনেক উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।

নিত্যগোপালের এই অপূর্ব্ব সমন্বয়বাদ তাঁহার গভীর সাধনা ও উৎকট তপস্যা প্রসূত পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের সহজ সরল বহিঃপ্রকাশ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহা কোন সূক্ষ্ম মস্তিষ্কের আলোচনা নহে, ইহা তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানানুভূতির এক তত্ত্ব প্রকাশ, তাঁহার অপরিসীম যোগৈশ্বর্য্যের এক পরিণত ফল স্বরূপ। যে যোগৈশ্বর্য্যের তাঁহার অন্ত ছিল না, যাহাকে তিনি কোন দিনই নিজের স্বার্থে প্রয়োগ করেন নাই, কেবল বিশ্বকল্যাণেই কদাচ

ইহার প্রয়োগ লোকচক্ষের গোচর হইয়াছে, সেই যোগশক্তির তিনি পূর্ণাধার ছিলেন। একদিকে তাঁহার সরলতম, অনায়াসলভ্য, অনাড়ম্বর জীবন, অপর দিকে তাঁহার পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বজীবহিতের প্রতি তাঁহার অযাচিত গভীর করুণা তাঁহাকে মানবপ্রাণের অতি অন্তরতম প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার জীবননাশকারী বিষদাতাকেও তিনি প্রেমদান হইতে বিরত ছিলেন না, এই গভীর অকলঙ্ক বিশ্ব-প্রেম অবতার ব্যতীত অন্যে সম্ভবে না। এই প্রেম সম্বলেই তিনি বর্ত্তমান যুগের সমগ্র মানবকুলের প্রাণকে সামগ্রিকভাবে এক অখণ্ডসত্তায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোন বিশেষ মতেরই লোক তিনি ছিলেন অথচ সমস্ত মতেরই পুষ্টি সাধন করিতেন। তিনি বলিতেন কোনও মতই ঠিক সত্য নয়, আবার সব মতই সমান সত্য। তাঁহার মতে ব্রহ্মও বস্তু হিসাবে মিথ্যা, আবার জড়ও চৈতন্যের আধার হিসাবে সত্য। ব্রহ্মজ্ঞানেরও অহঙ্কার থাকে তাই তাহাও মায়িক। কিন্তু তাহারও উপরে সহজ সরল কেবল প্রাণময় অবস্থা যাহার কোন উপাধি নাই—কেবল শুদ্ধ চৈতন্যময় প্রাণেরই বিকাশ—তৎস্বরূপই ছিলেন তিনি, তাই তাঁহার নাম শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ অবধূত অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানচৈতন্যময় সহজ সরল গগনোপম প্রাণস্বরূপ—উহাতেই তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত। সমস্ত কিছুকেই স্বীকার করিয়াও সমস্ত কিছু হইতে অতীত থাকার সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির এই যে জীবন বোধ, এ শুধু তখনই সম্ভব যখন সমস্ত প্রপঞ্চের বহু উর্দ্ধে ব্রহ্মময় লোকে আত্মাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আবার এই প্রপঞ্চময় বিশ্বকে আত্মপ্রাণে দর্শন করা যায়। ইহাই শ্রীনিত্যগোপালের জীবনব্যাপী সাধনার সিদ্ধির সরল পরিণতি। তাই আজন্ম সন্ন্যাসী হইয়াও তাঁহার পার্থিব জগতের লৌকিক সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করিলেন না। মায়াকে তাহার যথোপযুক্ত স্থান দিলেন ব্রহ্মের ক্রোড়ে। দুইটিকেই তিনি পূর্ণ মূল্য দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজ সত্তা ছিল ঐ দুইয়ের উর্দ্ধে—তিনি ছিলেন শুদ্ধ সহজ জ্ঞানাবতার পরমহংসরূপী পরব্রহ্মণ। আজিকার বিশ্ব এই মুক্তিরই খবর চায়। তাই শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাবের এই শততম বর্ষে আমাদের কর্ত্তব্য ইহাই বিশ্বে প্রচার করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা। বিশ্ব ইহারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। জীবতু জয়তু শ্রীনিত্যগোপালঃ।'

বন্দেমাতরম্

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৬১

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীনিত্যগোপাল

[শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ইষ্ট সম্বন্ধে বহু কবিতা, সাধারণভাবে বহু প্রার্থনাগীতি এবং সামাজিক সমস্যা লইয়া ছোটখাট কয়েকটী নাটিকা লিখিয়া গিয়াছিলেন। এই লেখাগুলি প্রায় সত্তর বৎসর পুর্ব্বের রচনা। আমরা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে দুইটী কবিতা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।]

সত্যবতী প্রজ্ঞা যোগে সত্যের প্রকাশ,
জ্ঞানবতী প্রজ্ঞা যোগে জ্ঞানের বিকাশ।
তুমি নিজে আদি সত্য, অনাদি পুরুষ নিত্য,
প্রেমবতী প্রজ্ঞা যোগে তোমার শ্রীরাস।
ভক্তিমতী প্রজ্ঞা যোগে নাশ মোহরূপ রোগে,
সেই প্রজ্ঞা যোগে কর শুদ্ধ নিজ দাস।
ক্রিয়াবতী প্রজ্ঞা তব, যা দেখি তোমার সব,
সর্ব্বশক্তিমতী প্রজ্ঞা তোমার মহেশ।
তব কৃপাবতী প্রজ্ঞা, পালিছে তোমার আজ্ঞা,
নিজে মহামায়া পালে তোমার আদেশ,
অনাদি অনন্ত দেব তুমি নির্ব্বিশেষ।

হরি ও তাঁহার রূপ

নীরদবরণ হরি মদনমোহন,
অঞ্জন রঞ্জিত কিবা বঙ্কিম নয়ন।
অলকা তিলকা ভালে, সন্তোষ মুখমণ্ডলে,
গলে বনফুল মালা প্রসূন ভূষণ।
সুবিশাল বক্ষস্থল, ফুল্ল কপোল যুগল,
ললিত ত্রিভঙ্গরূপ রাধিকা রঞ্জন।
রতন রাজিত বাস, পরিধান পীতবাস,
কমনীয় অঙ্গকান্তি, শরদিন্দু নিভানন।
কিশোর বয়সে পূর্ণ যৌবন বিকাশে,
নটবর বেশধারী শ্রীরাধারমণ।
পলক রহিত আঁখি, ফিরে ফিরে রূপ দেখি,
নিরখি বদন চাঁদে আহ্লাদ মাখা কিরণ।

[উভয় কবিতাই 'নিত্যগীতি' ১ম ভাগ হইতে গৃহীত]

শ্রীকৃষ্ণ

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ভাগবত ১০।৩৩-৩৬

রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষের দিকে শ্রীকৃষ্ণ কেমন করিয়া 'ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা', তাহার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিতে গিয়া ভাগবতকার লিখিতেছেন: 'ভূতসমূহের অনুগ্রহের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকৃতির বুকে মানুষ-দেহে সকল দিক দিয়া স্থিত হইয়া, স্থিতি লাভ করিয়া সেই সব ক্রীড়ার ভজনা করিয়াছেন, যাহা শুনিয়া ভূতসমূহ তৎপর হইবে, শ্রীকৃষ্ণপর হইবে, শ্রীকৃষ্ণজীবনে জীবন লাভ করিবে, সমানধর্ম্মী হইবে, সাধর্ম্ম্য লাভ করিবে। 'মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ'। শ্রীকৃষ্ণকে ভূতসমূহের প্রতি অনুগ্রহ করিতে হইলে মানুষী তনুই আশ্রয় করিতে হয়, রাসক্রীড়ার ভজনা করিতে হয়। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।'—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। কেন নরবপু তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার নিজরূপ? মানুষের দেহ সর্ব্বভূতের দেহসমূহের মধ্যে জটিলতম (most complex) দেহ। মানুষ-দেহে সকল পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় রহিয়াছে—মানুষ একাধারে মানুষ, পশুপক্ষী, দেবাসুর, জড় অজড়। তাই মানুষ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'আমি যৈছে পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়, রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময়।' দেবতা দেবতা, পশু পশু; কিন্তু মানুষ একাধারে সব-কিছু। কি জটিল মানুষের জীবন! তাই 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—পুরুষোত্তম-মানুষ শ্রীকৃষ্ণ তাই ঈশ্বরের উপর, দেবতার উপর, দানবের উপর, পশুপাখীর উপর। মানুষ সবার উপরে রহিয়াও সব-কিছুকে পরিপাক করিয়া সর্ব্বসমন্বয়মূর্ত্তি হইবার যোগ্য। মানুষ-দেহেই ব্রহ্ম-পুরুষোত্তমের ব্রাহ্মীস্থিতি, পরাস্থিতি। এই মানুষ-দেহে আস্থিত হইয়াই তিনি ভূত সমূহের 'অনুগ্রহ' করিয়া থাকেন। 'অনুগ্রহ' শব্দের মূলগত অর্থ হইতেছে অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ হইতে গ্রহণ করা। 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'—ভগবান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। বিশ্বের পিছনে পিছনে (অনু) তাহাতে প্রবেশ করিবার মত 'প্রাণ' লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সব

কিছু নিরপেক্ষ হইয়াও তিনি তাই সর্ব্বাপেক্ষ। পিছন হইতে বিশ্ব স্থষ্টির পথে ক্রম-বিবর্তিত জীবের প্রতি অণু-পরমাণুকে গ্রহণ করিতে হইলে অবশ্যই তাঁহাকে তেমনই 'শ্রোত্রমনোঽভিরাম' ক্রীড়ার 'ভজনা' করিতে হয়, যাহা শুনিতে ভাল লাগে, যাহা মনন করিয়া সাধ মিটে না, অথচ যাহা বিষয়াশক্তি হইতে মুক্ত, এবং যাহার ভিতর রহিয়াছে বিষয়ের দিব্য রূপান্তর, সর্ব্ববিধ বৃত্তির sublimation (উন্নীতরূপ)। এমনই একটী ক্রীড়া হইতেছে সর্ব্বাঙ্গীণ রাসক্রীড়া। রাসলীলার ভজনায় ভূতসমূহের অস্থিমজ্জাগত, সত্তাগত কামের পরম অর্থ মিলিয়াছে। কামের যে একটী ভাগবত রূপ আছে তাহার খোঁজ বিশ্ব ভুবন পাইয়াছে। 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন' এই কাম যে 'জ্ঞানবিজ্ঞাননাশন' না হইয়া দিব্য জ্ঞান ও দিব্য বিজ্ঞানের পরিপুষ্টিকারকও হইতে পারে, যাহা এক দৃষ্টিকোণে দেখিলে মানুষের বলবীর্য্য সব অপহরণ করে, তাহাই ব্রজদৃষ্টিতে দেখিলে, পুরুষোত্তম-ভঙ্গিতে ভঙ্গি মিলাইয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া দেখিলে যে ভাগবত রসাস্বাদনের পরিপুর্ণ প্রেরণাদায়ক হয়, তাহা আমরা ব্রজলীলায় দেখিয়াছি। রাসলীলার ভিতরে আমরা বিশ্বস্থষ্টির পরিপুর্ণ দিব্য চিত্র পাইয়াছি, যাহা শুনিতে শুনিতে ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়, পুরুষোত্তম-সাধর্ম্মালাভ করিয়া পুরুষোত্তম-চেষ্টার সঙ্গে একীভূত হইয়া এই ধুলিমলিন ধরাকে ব্রহ্মধামে গড়িয়া তুলিবার জন্য, সার্থক স্থষ্টির জন্য মানুষ উন্মাদ হয়।

কেন শ্রীকৃষ্ণের মানুষী লীলা সর্ব্বোত্তম? এই লীলার মধ্যেই তো মানুষ ভগবানের সহ-আসনে সমাসীন থাকিয়া বিশ্বস্থষ্টিকে পরিপূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। মানুষের আত্মসমর্পণাত্মিকা সহযোগিতা না পাইলে ঈশ্বর-স্থষ্ট এই বিশ্ব যে ভাবুকের বিশ্বই থাকিয়া যায়, বাস্তব বিশ্ব আস্বাদন করিতে হইলে যে সর্ব্বভূতকে শ্রীকৃষ্ণে লয়যোগ সাধনার ভিতর দিয়া কিংবা আত্মসমর্পণ যোগের ভিতর কৃষ্ণময় হইয়া যাইতে হয়, না হইলে যে বিশ্ব-ঈশ্বর-জীব সব কিছুই মায়া মাত্রে পরিণত হয়, তাহা এই রাসলীলার ভিতর ভূতসমূহ প্রত্যক্ষ দেখিয়া ধন্য হইতে পারে। সর্ব্বভূতের হৃদয়ের মধ্যে, জীবনের মধ্যে এই রাসক্রীড়া অহরহঃ চলিতেছে বলিয়া, ইহা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া এবং ইহার পরম অর্থ সর্ব্বভূত সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না বলিয়াই সে পুরুষ-প্রকৃতির পরিণামবিরস দেহ সঙ্গের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, যাহার ফল সর্ব্বতোভাবে 'দুঃখযোনি'।

মানুষকে সৃষ্টির ব্যাপারে 'অর্দ্ধেক অধিকার' আনিয়া দিবার জন্যই স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট জীবের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইবার গূঢ়তম প্রয়োজন। প্রতিটী জীব পুরুষোত্তম বিশ্বে নিজের অদৃষ্ট-স্রষ্টা, সমাজ-স্রষ্টা, বিশ্ব-স্রষ্টা। স্রষ্টৃত্বের এক অর্দ্ধ রহিয়াছে নারায়ণে, অপর অর্দ্ধ রহিয়াছে নরে। নর-নারায়ণ তাই এই ভারতবর্ষে স্রষ্টার ক্রম-বিবর্ত্তিত চরম রূপ। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ কবির ভাষায় লিখিয়াছেন: "মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে। সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে—কী করলে সে স্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু, স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, 'তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমায় স্বর্গ করতে হবে।' সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এতদিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে? সে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলই দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচারবিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে? তার ঘর-ভরা শিশু, তার মা-বাপ ভাই-বন্ধু আত্মীয়-প্রতিবেশী—এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু, সে সৃষ্টি কি একলা হবে? না, তিনি বলেছেন, 'তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব—আর-সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গসৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের অপেক্ষায় এত বড়ো একটা চরম সৃষ্টি হতে পারে নি।' সর্বশক্তিমান এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব করেছেন, এক জায়গায় তিনি হার মেনেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে করে নিয়ে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গরচনাই অসম্পূর্ণ রইল। এই জন্যে যে তিনি যুগযুগান্ত ধরে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কতকাল ধরে অপেক্ষা করেন নি? আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী এমন শস্যশ্যামলা হয়েছে—কত বাষ্পদহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ: শীতল হয়ে তরল হয়ে তারপরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরী হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনও বাকি। বাষ্প আকারে যখন পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য্য ফোটে নি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কী অপরূপ

সৌন্দর্য দেখা দিয়েছে? ঠিক তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প-আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েছে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠে নি। তাঁর সেই রচনাকার্যে তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েছেন, কিন্তু আমরা কেবল 'খাব' 'পরব' 'সঞ্চয় করব' এই বলে বলে সমস্ত ভুলে বসে রইলুম। তবু এ ভুল তো ভাঙবে, মরবার আগে একদিন তো বলতে হবে, 'এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলেম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলেম।'...আমাদের সৃষ্টি করবার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। তিনি যে নিজে সুন্দর হয়ে জগৎকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, এ নিয়ে তো মানুষ খুশি হয়ে চুপ করে থাকতে পারল না। সে বললে, আমি ওই সৃষ্টিতে আরও কিছু সৃষ্টি করব। ...তাঁরই জিনিষ তাঁর সঙ্গে মিলে নিতে হবে। ...আজ বলবার দিন, 'তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে বসিয়েছিলে, কিন্তু আমি ভুলেছিলুম, আমি সব জুড়ে নিজেই বসেছিলুম। তোমার সঙ্গে বসব এ গৌরব ভুলে গেলুম। তোমাতে আমাতে মিলে বসবার যে অপরূপ সার্থকতা এ জীবনে কি তা হবে না?' আজ এই কথা বলব, 'আমার আসন শূন্য রয়ে গেছে। তুমি এসো, তুমি এসো, তুমি এসে একে পূর্ণ করো। তুমি না এলে আমার এই গৌরবে কাজ কী! ...হায় হায়, ধুলোবালি নিয়ে বাস্তবিকই এই-যে খেলা করছি, এই কি আমার সৃষ্টি! এই সৃষ্টির কাজের জন্যেই কি আমার জীবনের এত আয়োজন হয়েছিল!' " (শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯-১২)

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মধ্যে মানুষের এই সৃষ্টির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। মানুষকে দিব্য সৃষ্টি করিতে হইবে, বাষ্প (idea) আকারে অবস্থিত গোলোক-বৈকুণ্ঠকে ধরার ধূলিতে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার জন্যই এই রাসক্রীড়ার আয়োজন। স্বর্গ গোলোক বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মলোক সবই আদর্শ সৃষ্টি, ideal creation; যেমন এই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা ছিল বাষ্পলোক। বাষ্পলোক যেন ঘন হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে পৃথিবীরূপে। তেমনি আদর্শলোক ঐ ব্রহ্মলোক প্রভৃতি গড়িয়া উঠিবে শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার মধ্য দিয়া এই পৃথিবীর দিব্য রূপান্তরিত পুরুষোত্তম-লোকে। রাসচক্রের ভিতরে তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটী ব্রজগোপীকে নিজের সঙ্গে একীভূত করিয়াছেন, ব্রজগোপীগণও আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়া শূন্য হইয়া গিয়া পুরুষোত্তমকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। এই পৃথিবীকে দিব্য সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করিবার কৌশল

মানুষকে শেখানই রাসলীলার গূঢ় প্রয়োজন। সৃষ্টির এই গূঢ় রহস্য কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জ্জুনের একই রথে আসীন হওয়ার ভিতরেও অভিব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন, 'সর্বশক্তিমান এক জায়গায় তাঁর শক্তি খর্ব করেছেন, এক জায়গায় তিনি হার মেনেছেন,' ব্রজগোপীদের সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণও এই রাসক্রীড়ার মাঝে সেই কথাই বলিয়াছিলেন,

> ন পারয়েঽহম্ নিরবদ্যসংযুজাম্
> স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
> যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
> সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১০।৩৩।২২

—'নিরবদ্যযোগে যুক্তা তোমাদের এই আত্মনিবেদনের স্ব-সাধুকৃত্য (উপযুক্ত মর্য্যাদাদান) করিতে আমি পারিলাম না, যে-তোমরা দুর্জ্জর সংসার-শৃঙ্খলা ছিন্ন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছিলে। তোমাদের ঋণ তোমাদের সেবাদ্বারাই শোধ হউক। আমি তোমাদের কাছে ঋণী রহিলাম। 'ন পারয়েঽহম্' (আমি পারি না) ইহাই শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরম সার্থক ঘোষণা। সর্ব্বশক্তিমান যদি একান্ত সর্ব্বশক্তিমানই থাকিতেন, সর্ব্বশক্তির সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যদি পরকীয় না হইত, বিশ্বসৃষ্টি মায়াময়ই থাকিত, ইহার দিব্য রূপান্তর কোন কালেই সম্ভব হইত না। সর্ব্বশক্তিমান তাই আজ সৃষ্টিশক্তি ভূতসমূহের কাছে সমর্পণ করিয়া নিঃশক্তি হইবার জন্য জীবকে একই আসনে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। ভাগবতের সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের 'হার মানিবার' দৃষ্টান্তে ভরপুর। এই দিব্য সৃষ্টির দর্শন ও জীবন যাহা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ভারতের হৃদয়ে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই পাঁচটী হাজার বৎসরের ক্রমবিবর্ত্তিত পরিস্থিতি ও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির—আইনষ্টিনের আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েডের কামতত্ত্ব, প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম্ থিয়োরী এবং হাইসেনবার্গের অনির্দ্দেশ্যবাদের—ভিতর দিয়া আজ বিশ্ব গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই ব্রজদর্শনই বর্ত্তমান যুগে শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার দার্শনিক প্রতিভা ও সংগঠনমূলক জীবনের মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করিয়াছেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন, পুরুষোত্তম বিশ্ব দিব্য রূপরস-গন্ধস্পর্শে গড়িয়া উঠুক। বন্দেমাতরম্

রবীন্দ্রনাথের শিশু-শিক্ষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রেণু মিত্র

সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথের কথা হইতেছে 'চিত্তের গতি অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায়না, এইজন্যই কোনদিনই কোন একজন বা একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা-লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।' রবীন্দ্রনাথ কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর কথা এইজন্যই বলিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা ছাড়া আরও একটা যে সত্য তিনি জানিতেন সেটা হইল এই যে, 'আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য সস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত, তখন বাঁধা-প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পুরণ করা যায় কিনা। মানুষ বারবার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি না কেন শেষ কালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে।' উপনিষদের 'প্রাণঃ প্রাণং দদাতি'—এই সত্যটিকেই শিক্ষাদানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ বলিয়া তাঁহারা জানিয়াছিলেন। আজিকার দিনে প্রাণ হইতে প্রাণের সৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারেই লোপ পাইয়াছে বলিয়া কেবলই প্রণালীর পর প্রণালীর পরীক্ষা নিরীক্ষার কার্য্য চলিতেছে। 'আমরা জানিয়া-ছিলাম মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকেনা, সে তখন আপিস-আদালতের বা কলকারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে,...।' 'গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য্য

সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে।' এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কোন প্রণালীর ব্যবস্থা দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

এই যদি হয় নিয়ম, তবে পিতামাতাই শিক্ষাদানের জন্য একমাত্র যোগ্য। সত্যিই তো শিশুর পালন ও শিক্ষণের ভার মাতাপিতার উপরেই। কিন্তু পিতামাতার সে সুযোগ সুবিধা বা যোগ্যতা থাকেনা বলিয়াই শিক্ষক বা গুরুর প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু 'এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষকে টাকা দিয়া কিনিতে বা আংশিক-ভাবে গ্রহণ করিতে পারিনা, তাহা স্নেহ, প্রেম, ভক্তিদ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারকরস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে।'

সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে শিক্ষাদাতাকে মানুষ হইতে হইবে এবং যাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার সহিত জীবনগত স্নেহপ্রেম-দয়ামায়ার সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রাণের সম্পর্ক ছাড়া প্রণালী বা পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন তাহাতে মানুষ তৈরী হয় না—কতকগুলি ছাঁচ তৈরী হইতে পারে।

এইখানে রবীন্দ্রনাথ একটা বিশেষ কথা বলিয়াছেন। মানুষ হওয়ার পিছনে কোন্ মনোবৃত্তি বা আদর্শ রাখিতে হইবে? পুর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতেই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আমরা জানিতে পারিয়াছি। নিখিলের সঙ্গে যোগে ভারতবর্ষ চিরদিন পরিপুর্ণতাকেই চাহিয়াছে। এক সময়ে ধর্ম্ম বা সমাজ ব্যবস্থা এই সামগ্রিক পরিপুর্ণতার সাধনাকে সঙ্কুচিত করিয়াছিল এবং সকল জাতি বর্ণ বা সম্প্রদায়ের নিকট খোলা না রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল—সে বন্ধ মুখ সকলের জন্যই আজ খুলিয়া দিতেই হইবে। এই দেওয়ার পরে এই পরিপূর্ণতার সাধনা সকলের কাছে ধরিতে হইবে।

এই পরিপুর্ণতার সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ বস্তুকে পুঞ্জীকৃত না করা। 'সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা; বহু আয়োজনের জটিলতা বর্বরতা; বস্তুতঃ তাহা গলদ্‌ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলো জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যতের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না, বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে—নিস্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত

দ্বারা।...আসবাবকে আমরা ঐশ্বর্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না।... তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন।' এইখানে রবীন্দ্রনাথ সাবধান বাণীও উচ্চারণ করিয়া রাখিয়াছেন। 'যে-দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্ভূত, সে কুৎসিত।...সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্যশিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জ্জন ক'রে। সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যে ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।' শিশুকাল হইতেই যে বিদ্যালয়ে এই সহজ সরলতাকে অভ্যাস করিতে হইবে—একথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। 'আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিতে হইবে। চৌকি টেবিল ডেস্ক্ সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি টেবিলে সত্যসত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশ ভূষা এমন নয় যে আমরা নীচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণে আবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে।'

ভারতবর্ষের সভ্যতার দার্শনিক যুগে—ঔপনিষদীয় যুগে নয়—আমরা বস্তুকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া পূর্ব্ব অগ্রাহ্যের প্রতিক্রিয়াতেই আজ আমরা বস্তুকে আবার অনাবশ্যক বাড়াইয়া চলিতেছি। একটা কাজ হাতে করিলে তাহার ঘরবাড়ী আসবাবপত্রের হিসাবেই চক্ষু স্থির হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না—আমরা মাটীর ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নীচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্দ্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায়, অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না।' গাছতলায় মাঠের মধ্যে মাদুর বিছাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। 'শিক্ষা বল, কর্ম্ম বল, ভোগ বল সহজ হইয়া ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় বলিয়া গণ্য করিবে।' এই সহজ হইয়া ওঠাতেই শিক্ষারও সার্থকতা, জীবনেরও সার্থকতা। এই বস্তুহীনতাকে আমরা যেন অভাব অর্থে লইয়া

ইহাকে দীন ও গ্লানিগ্রস্ত না করি। তিনি লিখিয়াছেন, 'দৈন্য জিনিষটাকে আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর বিলাসীর ভোগ-সামগ্রীর চেয়ে দামে বেশী—তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি, যাহা পুর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে।'

শিশুকে শিক্ষাদানকালে এই দৈন্যহীন অনাড়ম্বরতা শিশুকাল হইতেই অভ্যাস করান দরকার। ইহাকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষারই অঙ্গ বলিয়াছেন। অক্ষমতার দারিদ্র্য যেমন জীবনকে শক্তিহীন করিয়া দেয়, বস্তু-আতিশয্যও তেমন করিয়া জীবনের শক্তিই কাড়িয়া লয়। রবীন্দ্রনাথ ঐজন্য ধনীর ছেলের শিক্ষা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'সে সম্পূর্ণরূপে মানব-সন্তান হইতে শিখিবার পুর্ব্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে—ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়, জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়।

পুর্ব্বে বলিয়াছি শিশুর সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক থাকায় পিতামাতাই শিশুকে শিক্ষাদানের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের যোগ্যতা ও সুযোগ সুবিধা না থাকায় শিক্ষক বা গুরুর আশ্রয় লইতে হয়। অনেকে বলেন শিক্ষার জন্য শিশুদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়।...যদি সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি, তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইস্কুলে (সাধারণ ইস্কুলে) করা সম্ভবই হয় না।' রবীন্দ্রনাথের মতে 'বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পুর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরী হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।...উদাহরণ স্বরূপ দেখা যাক, ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ হইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরী করিয়া তুলিতে থাকে।' এই জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ছাপ মারা গৃহ হইতে কিংবা অপারগ পিতামাতার নিকট হইতে শিশুকে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে যাহাকে তিনি বলিয়াছেন 'আশ্রম', তেমন স্থানেই রাখিবার পক্ষপাতী।

শিশুকে শাসন করা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা যখন একই সঙ্গে কাঁদিতে পারেন, তখন দণ্ডদান চলিতে পারে। শিক্ষাদাতা-গণকে খুব বেশী ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে—'ছেলেদের প্রতি স্বভাবতঃই যাহাদের

স্নেহ আছে, এই ধৈর্য তাঁহাদেরই স্বাভাবিক।...ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলতঃ শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান। রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ।' শিশুদের অপরাধ বিচার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থা সম্বন্ধে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন লিখিতেছেন, 'শিশুদের অপরাধের বিচার শিক্ষকেরা করিবেন না; করিবে শিশুরা নিজেরাই। তাহাদেরই নির্বাচিত ছেলেরাই গড়িয়া লইল বিচার সভা। সেখানে শিশুরা ছেলেদের কোনো অন্যায় দেখিলে শিশুরাই অভিযোগ করে, শিশুরাই অপরাধীদের তলব করে এবং শিশু বিচারকেরাই বিচার করে। কতোবড় স্বায়ত্বশাসন।'

শিশুদের পাঠদান ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন, তখন এক বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন লিখিতেছেন, 'শিক্ষাদান তঁহার অভ্যস্ত কর্ম নহে, শিক্ষাদান তাঁহার ব্রত। এই জন্য শান্তিনিকেতনে তিনি ছেলেদের বই পড়াইতেন না, বই তৈয়ারী করাইয়া লইতেন। যে বিষয়টা পড়াইবেন প্রথমে তাহা বুঝাইয়া দিলেন, তারপরে তাহা শিশুদের দিয়া বলাইলেন। তারপর শিশুরা তাহা লিখিয়া দিল। ক্রমে তাহা শুদ্ধ করিয়া পাকা লেখায় দাঁড়াইল। শিশুর শিক্ষা আরও পাকা হইয়া গেল।'

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে, শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা দেন নাই—একথা বলিয়াছি। তিনি একটী বড় আদর্শ, একটী পরিপুর্ণতার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছেন; তারপরে শিশুদের স্বাধীন বিচরণের সুযোগ দিয়াছেন। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার মধ্য দিয়া একটী সমগ্র সত্তা প্রস্ফুটিত করাইবার প্রচেষ্টা ছিল তাঁহার। এজন্য শিক্ষাকে আনন্দময় করিতে চাহিয়াছেন। এই আনন্দময় করিতে গেলে শিক্ষাদাতা ও শিক্ষাগ্রহিতার সঙ্গে সম্পর্কটা কলকারখানার সম্বন্ধ না হইয়া হইবে জীবনগত সম্বন্ধ, প্রাণের সম্বন্ধ আর শিক্ষার মাধ্যম হইবে মাতৃভাষা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি ঘুরিয়াছেন, সেখানে যে নানারকম পদ্ধতির পরীক্ষা চলিতেছে তাহাও তিনি দেখিয়াছেন— তবু কোনো বিশেষ পদ্ধতি ভাল, তাহা বলিতে পারেন নাই। তাঁহার শিক্ষা-দানের ধারণার মধ্যে শিশুর স্বাধীনতা আছে, পাঠ্যপুস্তক তাঁহার লক্ষ্য নহে— কর্ম্ম সেখানে স্থান পাইয়াছে, প্রত্যক্ষ যে সমস্ত ভাবুকতা হইতে সত্য—

তাহা তিনি বার বার বলিয়াছেন। যাহা শিশু দেখিতে পায় না, ছুঁইতে পায় না তাহা লইয়া যে জ্ঞানের চর্চ্চা করা চলে না, শিশুর পক্ষে যে তাহা পীড়াদায়ক হয়, একথা তিনি বলিয়াছেন। 'যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানতঃ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থ ভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।...প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংশ্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে।' প্রত্যক্ষের মূল্যকে প্রস্থাপন করিয়া যুগচিন্তানায়ক শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন, 'প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে, তবে প্রত্যক্ষের সহিত যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে আমরা সেই যুক্তিই বিশ্বাস করি।' প্রত্যক্ষের এতখানি মূল্য আছে বলিয়াই শিক্ষাক্ষেত্রে যে পদ্ধতি আসিতে চাহিতেছে দার্শনিকের ভাষায় তাহাই 'বর্ত্তমান ভজন'। বর্ত্তমান ভজনের গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন, 'সেই জন্যই বলি বর্ত্তমান-ভজনা ভিন্ন ভজনীয়ের ভজনা করিবার আমাদের অন্য আর প্রশস্ত অবলম্বন নাই। সেই জন্য শুদ্ধ ভক্ত ও শুদ্ধ প্রেমিকগণের পক্ষে কেবলমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বর্ত্তমান ভজনাই বিশেষ মঙ্গলদায়িনী।'

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।' তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না।...যে মানুষ একদিন উদার ভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যখন সেই ভাব-পুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরী স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিন শেষ করে. । শুদ্ধ মাত্র ভাব যত বড়োই হউক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষ বস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।'—এই সমস্তই রবীন্দ্রনাথ জানিতেন—তাই শিশুকে গৃহের চতুঃসীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন নাই—মাঠে ঘাটে বনে বাদারে গাছের ছায়ায় আর তাহার ডালে শিশুকে তিনি মুক্তি দিতে চাহিয়াছেন—আকাশের বিস্তার যেখানে দেহমনকে স্পর্শ করিয়া যায় সেইখানে তিনি ছেলেদের পাঠশালা বসাইয়াছেন। এ সবই সত্যি কথা, তবু তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় ধারণাকে কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ফেলান যায় না। বিদেশে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার

কাজ দেখার পর কোন্ পদ্ধতি ভাল এ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, 'বস্তুতঃ, এ দ্বন্দ্ব কোনদিনই মিটিবে না ; কেননা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য— সুখও তাহাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয় ; শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই ; একদিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিসের প্রবেশদ্বার খোলা, আর একদিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিষের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত।' যেখানে মানুষের শ্রেষ্ঠতা, সেখানেই মানুষের বিপদ—ভগবান দুই দিকের পথ খোলা রাখিয়া তাহাকে কি বিড়ম্বনার মধ্যেই না ফেলিয়াছেন। কখনও মানুষ এদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, আবার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেই উল্টাদিকে টান পড়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'জীবনের গতি কোনদিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না—অন্তর বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না ; অতএব তাহার মাঝখানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্য রেখা, আর এক সময়ে তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্ত রেখা, এক জাতির পক্ষে যাহা প্রান্ত পথ, আর এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্য পথ।......এমন অবস্থায় মানুষ যখন একদিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর একদিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সংশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবলভাবে সজীব থাকে, তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভার-সামঞ্জস্যের পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে, সে যখন একদিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবতঃই অন্য দিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়, কিন্তু মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাৎ হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে।' মানুষের জীবনে এই ভারসাম্যের বোধটি ঘুমাইয়া আছে—দেহমনের একটা সবলতা একটা সজীবতা সেই বোধটিকে জাগাইয়া তোলে। এই ভারসাম্যের বোধটিকে ফুটাইয়া তোলাই মানুষের জীবনের সাধনা। শিশুর শিক্ষায় সেই বোধটিকে জাগাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা সর্ব্বদা সচেতন রাখিতে সাহায্য করে যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিই শিশুর শিক্ষায় উত্তম পথ। ইহা ছাড়া আর কিছু বলাই যায় না।

শিশুর শিক্ষার আর একটী বড় কথা শিশুর ভিতরে শ্রদ্ধা জাগ্রত করিতে হইবে। এই যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, যাহা কিছু আমরা ব্যবহার

করিতেছি—অর্থাৎ আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে যে জিনিষগুলি একান্তভাবে অপরিহার্য্য বলিয়াই প্রতিদিনের কাছের জিনিস বলিয়া যাহাদিগকে আমরা ভুলিয়া যাই, উপযুক্ত মর্য্যাদা যাহাদিগকে দিতে শিখি না—তাহাদিগকে আমাদের সে মূল্য দিতে শিখিতে হইবে। শিশুর জীবনে এই মূল্য দেওয়ার শিক্ষা বা শ্রদ্ধা জন্মান একান্ত দরকার। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায়, এইজন্যে প্রত্যহই নানা কর্মে, নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে। যে লোক চেতন ভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে, সে লোক খুব একটি মহৎ সিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে, আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না, কারণ এই সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা।' এই জড়তা শিশুদের না থাকে, প্রতিদিনের অভ্যস্ত বস্তু বা মানুষকে স্বাভাবিক ভাবে শ্রদ্ধা করতে বা ভাল বাসতে যেন তাহারা শেখে—শিশু শিক্ষায় ইহা যেন মস্ত বড় স্থান অধিকার করে। প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিষকে শ্রদ্ধা করিতে মনের একটী বিশেষ শক্তির প্রয়োজন—অভ্যাসের ফলে যে জড়ত্ব আসিয়া যায় তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রতিদিনের সামগ্রীকে প্রতিদিন নূতন করিয়া দেখিতে হইবে। আকাশে রোজ নূতন সূর্য্য উঠে, প্রতি রাতের চাঁদ একই চাঁদ নয়, নদীতে প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন জল প্রবাহিত হইতেছে—এই যে জল-মাটি গাছপালা চন্দ্রসূর্য্যকে রোজ নূতন করিয়া দেখিতে পারা—এ বড় কঠিন সাধনা। এজন্য চাই জীবনের গোড়ায় গভীর শ্রদ্ধা। এই যা কিছুকে, এই সংসার কর্ম্মশালাকে যদি কারাগার বলিয়া মনে করি, যদি জানি এই সব কিছু আমার বন্ধনেরই কারণ, তবে তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিব কি করিয়া? যদি জানি এই সবেরই মধ্যে সেই আনন্দময়েরই প্রকাশ এবং আমার সঙ্গে এই সবের যোগ আনন্দেরই যোগ, তবেই এই সব কিছুকে শ্রদ্ধা করা আমার পক্ষে সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ কবির দৃষ্টিতে এই সব কিছুকে ভাল বাসিয়াছিলেন, আর যুগচিন্তানায়ক শ্রীনিত্যগোপাল এই সব কিছুকে ভাল বাসিবার দার্শনিক চিন্তাধারা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। শিশু কেমন করিয়া চিরপুরাতন জগৎটাকে নিত্য নূতন করিয়া দেখিতে পারে, তাহার দায় শিক্ষাদাতার।

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'কোনো একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটিসংখ্যক পূর্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্গতি ঘটার সম্ভাবনা আছে, এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিষ বলে শ্রদ্ধা করি নে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে, আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কার সে লোক কাটিয়ে উঠেছে—এইজন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্য সংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরমচৈতন্য তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন। এই স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তের মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিচ্ছে।' যাহাহউক এই প্রত্যক্ষ বিশ্বটাকে শিশু যাহাতে শ্রদ্ধা করিতে শেখে, ইহার যথাযোগ্য মাত্রা ছাড়াইয়া নয়, মূল্য যাহাতে দিতে শিখে, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

এ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যত কথা শুনিলাম, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে তাঁহার শিক্ষা হইতেছে 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। ...কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে। আমাদের স্কুল কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা, বোধের তপস্যা নয়।' অথচ বিশ্বভুবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মনের নয়, জ্ঞানের নয়—বোধের। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কর্ম্ম হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, বৃত্তি হিসাবে তো নহেই—ইহা তাঁহার কাছে ছিল ব্রত। এইজন্য তাঁহার কাছে শিক্ষাদাতা শিক্ষক নহেন, তিনি গুরু আর শিক্ষার স্থান দেওয়াল-মোড়া কক্ষ নহে—তাহা তপোবন, তাহা আশ্রম।

রাত্রি

শান্তশীল দাশ

দিন ও রাত্রি যেন দুটি পাশাপাশি জগৎ। একটি কাজের জগৎ, অপরটি বিশ্রামের। একটি বাস্তবের, অপরটি কল্পনার। কারো সাথে কারো মিল নেই। প্রখর রৌদ্রের তাপে ক্লিষ্ট কর্মক্লান্ত মানুষ দিনের শেষে যখন রাতের জগতে এসে পৌঁছয়, তখন সেও বদলে যায়। বদলে যায় তার রূপ, তার মন। কাজের কথা সে ভুলে যায়, ভুলে যায় কর্মমুখর দিনের সমস্ত স্মৃতি; বাস্তবের রূঢ়তা, তার দুঃখ-বেদনা, তার দুর্জয় সংগ্রাম। রাতের জগতে যে-মানুষ এসে হাজির হয়, সেখানে নেই কোন কাজের কথা, কাজের হিসাব নিকাশ। সেখানে আছে পরিপুর্ণ বিশ্রাম, নিরুদ্বেগ প্রশান্তি।

এই রাত্রির আবার দুটি রূপ—একটি জ্যোৎস্নায় ভরা আলোক-উজ্জ্বল, অন্যটি ঘন তমসাচ্ছন্ন কালিমা-মলিন। কিন্তু দুটি রূপই স্নিগ্ধ, দুটিই সমান মন-মোহকর। কর্মক্লান্ত মানুষের চোখে দুটি রূপই এঁকে দেয় ঘুমের কাজল।

চাঁদের আলোয়-ভরা রাত্রি, অপরূপ তার সৌন্দর্য। পুর্ণারজনীর বিচ্ছুরিত কিরণধারা চারদিক ভাসিয়ে দেয়। পৃথিবীর বুকে নামে আলোর জোয়ার। আলোয়-আলোয় একাকার হয়ে যায় সব। ম্লান হয়ে যায় আকাশের বুকে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক; হারিয়ে যায় তাদের দ্যুতি। ঘরের প্রদীপ লজ্জায় মাথা নীচু করে। জ্যোৎস্না রাতের সেই অনুপম আলো মানুষকে নিয়ে যায় সে-কোন্ এক আলোর রাজ্যে, যে-আলোকে নেই দাহিকা-শক্তি। স্নিগ্ধ আলোর ধারা মানুষের সমস্ত ক্লান্তি হরণ করে নেয়, মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কর্মক্লান্ত মানুষ স্বপ্ন দেখে, সে এসেছে আলোক-তীর্থে; সেখানে নেই কোন দৈনন্দিন জীবনের কলরব, নেই অন্ধকার, নেই দুঃখ।

আঁধারের রাত্রি—তার সৌন্দর্যও বড় কম নয়। চতুর্দিকে নিস্তব্ধ নিজ্ঝুম অন্ধকার। নীল আকাশের বুকে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক। কোথাও তার ঘন বসতি, কোথাও বিরল। আপন আপন রাজ্যে তারা দীপ্যমান। অদৃশ্য হাতে কে যেন এঁকে দিয়ে গেছে আকাশের বুকে আলোর মালা, আলোর বিচিত্র ফুল, আলোর আল্পনা। আকাশের বুকে কোথায় যেন চলেছে নীরব সমারোহ। জ্যোতিষ্ক সন্ধানীদের চোখে ঘুম নেই। নূতন নূতন জ্যোতিষ্কের সন্ধানে কেটে যায় কত বিনিদ্র রজনী। তন্দ্রাহারা দুটি আঁখি ঘুরে বেড়ায়

পথহারা নাবিকের মতো আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। দু' চোখে ঘুমের কাজল পড়ে যখন কাজের মানুষ অচেতন, সেই শব্দহীন, নিঝুম রাতের আকাশে জ্যোতিষ্ক সন্ধানীরা খুঁজে ফেরে আকাশের বুকে অচেনা নক্ষত্র, নাম না জানা কত গ্রহ উপগ্রহ।

রাত্রির স্নিগ্ধতা যখন মানুষকে তার কর্ম্মক্লান্ত দিনের গ্লানিকে দূর করে তাকে নিদ্রার শীতল কোলে আশ্রয় দেয়, তখন জেগে থাকে আরো কিছু মানুষ, যারা দিনের প্রখর আলোকে, মানুষের ও যন্ত্রের কল কোলাহলে আপনাপন কর্মসিদ্ধির পথে বাধা পায়। এক দল সাধক, অপর দল তস্কর।

দিনের কোলাহলে, আলোকের প্রখরতায় সাধনার বাধা জন্মে, তাই রাত্রির নির্জনতা ও স্তব্ধতা ঈশ্বর-উপাসনার প্রশস্ত সময়। সাধকেরা তাই এই সময়টি বেছে নেন। 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাম্ জাগর্ত্তি সংযমী।' আর অচৈতন্য মানুষের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে আপন কার্য সিদ্ধির সুযোগ খোঁজে আঁধারের ব্যবসায়ীরা, তস্করেরা। আঁধারের বুকে তাই অন্যায়ের জন্ম। অন্যায় আলোকে মুখ দেখাতে লজ্জা পায়।

বিচিত্র এই মানুষ। শব্দহীন রাতের স্নিগ্ধতার মাঝে যখন একজন মানুষ ঊর্দ্ধলোকের তপস্যায় মগ্ন, তখন আর একটি মানুষ তার পাপ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার পথ খোঁজে।

সর্ব দুঃখ-ক্লান্তি-হরা রাত্রি ও তার সহচরী নিদ্রা—ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। দুঃখী তার দুঃখ ভোলে, বেদনা-ক্লিষ্ট ভোলে তার দুঃসহ বেদনা। সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন করে রাখে তারা তাদের কমনীয় স্নিগ্ধতার প্রলেপে। কর্ম কোলাহলে পরিপুর্ণ জগৎ কোন্ মায়া মন্ত্রে সর্ব-কোলাহল শূন্য নিস্তব্ধ পুরীতে রূপান্তরিত হয়।

মানুষের সর্বজয়ী উদ্দাম প্রবৃত্তি প্রকৃতির বুকেও নির্মম আঘাত হেনেছে। রাত্রির অপরূপ সৌন্দর্যকেও সে আপন শক্তিতে ব্যাহত করেছে। তার উদগ্র কর্মপিপাসা দিনের আলোকেই শেষ হয় না। রাত্রের বুক চিরেও চলে তার কর্মের জয়রথ। তাই রাত্রির নিবিড়তায় যখন বনভূমি, প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র নিদ্রায় অচেতন থাকে, তখন সভ্য মানুষের গড়া জগতে বিঘোষিত হয় যন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন কর্কশ ধ্বনি। সেখানে তৈরী হয় মানুষ-মারার অজস্র অস্ত্র—সভ্য মানুষের সৃজনী শক্তির শেষ নিদর্শন। স্তব্ধ আকাশ রণিত হয়ে ওঠে সেই কর্কশ ধ্বনিতে, বাতাসে লাগে তার ভীতি-ব্যাকুল শিহরণ। প্রকৃতির নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে চলে অজেয় মানুষ—বিশ্ব-স্রষ্টার সৃজনী শক্তির সর্বোত্তম বিকাশ।

———

চীনদেশ ও চীনদেশবাসী

লিন্-ইউ-তান্ অনুবাদক : **মনোরঞ্জন গুপ্ত**

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮) রক্ষণশীলতা

চৈনিক রক্ষণশীলতার উল্লেখ ছাড়া চৈনিক স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হয় না। রক্ষণশীলতা শুধু রক্ষণশীলতা বলেই এমন কিছু নিন্দার বিষয় নয়। রক্ষণশীলতা এক প্রকারের আত্মশ্লাঘার নামান্তর। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জীবনযাত্রার সামঞ্জস্যের ফলে যে আত্ম-তৃপ্তি ও আত্ম-তুষ্টি, তা থেকে এর উদ্ভব। দুনিয়ায় গৌরব করার মত বিষয়-বস্তু বড় বেশী নেই এবং পার্থিব জীবনের অনিবার্য্য ব্যবস্থায় সুখী হওয়ার মত অবস্থাও খুব কম। এরূপ ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা সত্যি সত্যিই অন্তরের ঐশ্বর্য্য বিশেষ—এটা একটা ঈশ্বরের দান, যার আছে, তার সৌভাগ্যই বলতে হবে।

চৈনিকরা স্বভাবতঃই অতিশয় গর্ব্বিত জাতি। অতটা গর্ব্ব সঙ্গত না-ও হতে পারে। কিন্তু গত একশত বছরের কথা বাদ দিয়ে চীন জাতির সমগ্র ইতিহাস এই কথাই প্রমাণ করে। রাজনীতি ক্ষেত্রে সময় সময় তাদের গর্ব্ব চূর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তাদের দেশ যে একটা উঁচু দরের মানব-প্রেমিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, সে সম্বন্ধে চৈনিকরা সর্ব্বদা সজাগ, সচেতন এবং যুক্তিযুক্ত বিচারের দ্বারা এই কথা প্রমাণ করবার লোকেরও তাদের মধ্যে কখনো অভাব হয়নি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা নূতন রকমের মতবাদ উপস্থাপিত করে চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে, এরূপ সামর্থ্য এক ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ছাড়া আর কারো ছিল না। কিন্তু যারা কন্‌ফিউসীয় মতবাদে সত্যিকার বিশ্বাসী, তারা বরাবরই বৌদ্ধধর্ম্মকে একটা উপহাস মিশ্রিত অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছে। কারণ কন্‌ফিউসিয়াস্ সম্বন্ধে তারা অপরিমিত গর্ব্বিত এবং তার ফলে তারা নিজেদের জাত সম্বন্ধেও গর্ব্বিত। তারা গর্ব্বিত এই মনে করে যে, জীবনের নৈতিক মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে, মানব চরিত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং মানব জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমূহের কি যে সমাধান, সে সম্বন্ধে তাদের যে জ্ঞান, তা আর কারো নেই।

মোটামুটি বলা যায় যে তাদের এ ধারণা নেহাৎ অযৌক্তিকও নয়। কেননা, জীবনের অর্থ কি, এই প্রশ্ন কন্‌ফিউসীয় মতবাদ জিজ্ঞাসার বিষয় করে নিয়েছে এবং তার জবাবও দিয়েছে—সে জবাব এমন জবাবই হয়েছে যাতে এ সম্বন্ধে লোকের সকল প্রশ্নের নিরশন হয়েছে এবং এই মনে করে তারা তুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করেছে যে মানবের অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অর্থ তারা পেয়ে গিয়েছে। এই জবাবটা এমন সারগর্ভ, পরিষ্কার ও যুক্তিযুক্ত বলে সকলের মনে হয়েছে যে, কেউ আর ভবিষ্যতে জীবন সম্বন্ধে নূতন করে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি, কিংবা বর্ত্তমানটাকে পরিবর্ত্তন করার কামনাও কারো মনে জাগে নি। যখন মানুষ এমন কিছু পায়, যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে তার কাজ চলে যায়, তখন সে সম্বন্ধে স্বভাবতই সে রক্ষণশীল মনোভাব-সম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং যাতে তার কাজ চলে যায়, তাতে যে নির্ভরযোগ্য সত্য আছে, এ কথা মনে করাও খুবই স্বাভাবিক। কন্‌ফিউসিয়াস্ জীবনের যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মতাবলম্বীরা সেই পথ ছাড়া অন্য পথ দেখে না—অন্য কোনো পথ সম্ভব বলেও মনে করে না। তাই যখন তারা শোনে যে পাশ্চাত্যদেরও সুসংবদ্ধ সমাজ আছে এবং বয়সের প্রতি সম্মান দেখানো সম্বন্ধে কন্‌ফিউসিয়াসের মতবাদ না জেনেও লণ্ডনের পুলিশ যে কোনো বৃদ্ধা মহিলাকে নিজে থেকে পথ দেখিয়ে দিয়ে সাহায্য করে, তখন সত্যই তারা মনে আঘাত পায়—একথা যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারে না।

যখন এই কথা নিশ্চিতরূপে তাদের উপলব্ধিতে এলো যে সৌজন্য, শৃঙ্খলা, সম্মাননা, দয়ালুতা, সাহসিকতা ও শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের সততা প্রভৃতি কন্‌ফিউসিয়াস্ প্রচারিত যাবতীয় গুণাবলি সত্যি সত্যি পাশ্চাত্যদেরও আছে এবং লণ্ডনের পুলিশ ও তথাকার ভূমির নিম্নস্থ সুরঙ্গ চালিত রেলের কর্ম্মচারীদের সুসংযত ভদ্র ব্যবহার কন্‌ফিউসিয়াস্ নিজেই নিশ্চয় সর্ব্বান্তঃ-করণে সমর্থন করতেন, তখন তাদের জাতিগত অহঙ্কারে বিশেষ ভাবে ধাক্কা লাগলো। পাশ্চাত্যদের আচার-ব্যবহারের কতগুলি বিশেষত্ব সম্বন্ধে অবশ্য চৈনিকরা খুসি হতে পারে না এবং সেগুলিকে তারা অসংস্কৃত কুৎসিত ও বর্ব্বরোচিত বলেই মনে করে; যেমন স্বামী-স্ত্রীর হাতে হাত ধরে রাস্তায় বেড়ানো, বাপ-মেয়ে পরস্পর চুমো খাওয়া, সিনেমা ও থিয়েটারে চুমো খাওয়ার চিত্র দেখানো, রেল ষ্টেশনে এবং সর্ব্বত্রই প্রায় চুমোর আদান-প্রদান ইত্যাদি।

এই সব ব্যাপার দেখে তাদের বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয় যে, চৈনিক সভ্যতাই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা। তবে অপর কতগুলি বিষয় আছে, যা তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক বলে মনে না হয়ে পারে না। যেমন—লোক-সাধারণের লিখতে পড়তে পারা, মেয়েদের নিজের হাতে চিঠিপত্র লেখার ক্ষমতা, সর্ব্বসাধারণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (যা মধ্যযুগের দান বলেই তাদের ধারণা ছিল—ঊনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার বলে তারা মনে করেনি), শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের সসম্মান ব্যবহার এবং বয়স্কদের কথার জবাবে ইংরেজ ছেলে-পিলেদের নম্রভাবে "Yer Sir" "হাঁ, মহাশয়" বলা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া ভাল রাস্তা, রেলের গাড়ী, ষ্টীমার, ভাল চামড়ার জুতো, প্যারিসের সৌখীন সুগন্ধী দ্রব্য, অত্যাশ্চর্য্য সুন্দর সাদা ফুটফুটে ছেলে-পিলে, একস্-রে ছবি, ফটো, ফটো তুলবার যন্ত্র, টেলিফোন্ এবং এরূপ আরো অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে চৈনিকদের জাতীয় গর্ব্ব বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

একদিকে জাতীয় গর্ব্বের খর্ব্বতা, অপর দিকে এ দেশে বিদেশীয়দের দেশের বিধি বহির্ভূত স্বত্বাধিকার প্রবর্ত্তন ও চৈনিক কুলিদের পৃষ্ঠে ইউরোপীয় বুটের যথেচ্ছ সদ্ ব্যবহার—এর ফলে বিদেশীয়দের সম্বন্ধে চৈনিকদের মনে একটা ভয় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পুরাকালের সে দিব্য অমর্ত্ত্য অহঙ্কারের নাম-গন্ধও আর তাদের নেই। বিদেশীয়দের উপনিবেশের সীমানার ভিতরে চৈনিকরা হানা দেবে বলে যে বিদেশীয় বণিকরা সোর-গোল তুলেছে, সেটা একদিকে তাদের সাহসের অভাব এবং অপর দিকে বর্ত্তমান চীন-জাতি সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা সূচনা করে। এ দেশীয় কুলিদের উপরে ইউরোপীয় বুটের যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরুদ্ধে চৈনিকদের মনে একটা চাপা ক্রোধ ধূমায়িত হোতে থাকা একান্তই অনিবার্য্য। তা সত্ত্বেও, যদি ইউরোপীয়ানরা মনে করে থাকে যে, সে ক্রোধের বশে একদিন চৈনিকরা নিজেদের নিকৃষ্ট চামড়ার বুটের সাহায্যে তাদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হবে, তবে সেটা তাদের নিতান্তই ভুল ধারণা। যদি কেউ তা করে, তবে খৃষ্টানরা করতে পারে—অখৃষ্টান চৈনিকদের দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর হবে না। সত্যি বলতে এক দিকে ইউরোপীয়দের প্রতি একটা সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব এবং অপর দিকে তাদের জুলুম ও উৎপীড়নের ভয় চৈনিকদের মনে বাসা বেঁধে আছে।

এরূপ কোনো তীব্র মানসিক বিক্ষোভের ফলেই চৈনিকরা উৎকট ভাবে

একটা আমূল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণেই চীনদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছে। নইলে চীন যে গণতান্ত্রিক দেশ হবে, তা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারে নি। চীনদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মানে এত বড় একটা বিপুল পরিবর্ত্তন যে, একমাত্র জড়-বুদ্ধি অথবা দৈব-প্রেরণা চালিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ সমর্থন করতে পারে না। এ যেন আকাশের গায়ে রাম-ধনুর সেতু-নির্ম্মাণ এবং তারপরে সেই সেতুর উপর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবার অদ্ভুত সাধ! ১৯১১ খৃষ্টাব্দের চৈনিক বিপ্লবীরা সত্যি সত্যি দৈব-প্রেরণা-সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পরে চীনকে সর্ব্বতোভাবে আধুনিক করে তুলবার একটা প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। দেশে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বী দুই দল দাঁড়িয়ে গেল। একদল নিয়মতন্ত্রাবলম্বী। তাঁরা ছিলেন নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ আধুনিক প্রকৃতির রাজ-তন্ত্রের পক্ষপাতী। অপর দল হচ্ছে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের পক্ষপাতী বিপ্লবীদের দল। এই বাম-পন্থী দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন সান্-ইয়াট-সেন এবং ক্যাং-ইউওয়েই ছিলেন প্রথমোক্ত দলের নেতা। লিয়াং চিচাও প্রথমে ক্যাংএর চেলা ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি গুরুকে ত্যাগ করে বাম-পন্থী দলে যোগ দেন। এই দুই দলের লোকেরা অনেক দিন ধরে জাপানে বসে সাহিত্যিক লড়াই চালিয়েছে। অবশেষে প্রশ্নের মীমাংসা হ'ল তাদের বিচার-বিতর্কের দ্বারা নয়—মাঞ্চু-শাসনের সংস্কার সম্বন্ধে নৈরাশ্য এবং জাতীয় গর্ব্বসম্ভূত জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার ফলে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের রাজনৈতিক আমূল পরিবর্ত্তনবাদের যুগের পরে দেখা দিল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের সাহিত্যিক আমূল পরিবর্ত্তনবাদের যুগ। এই সময়ে হু শী তাঁর চৈনিক নব-জীবন আন্দোলন আরম্ভ করেন। এর পরে এলো ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জাতীয় আদর্শের আমূল পরিবর্ত্তনবাদের যুগ। তার ফলে বর্ত্তমানে চীনের প্রাইমারী স্কুলের প্রায় সব শিক্ষকই সাম্যবাদী মতাবলম্বী—অন্ততঃ সেই মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

এই কারণে সমগ্র চীন আজ সাম্যবাদী ও প্রতিক্রিয়া-পন্থী এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে দেশের নব্যদের ও বয়স্কদের ভিতরে একটা দুস্তর সাগরের পার্থক্য দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এক দিকে বিবেক-বিচারশীল যুব-সম্প্রদায় দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও জাতীয় আদর্শের আমূল পরিবর্ত্তনের জন্যে বদ্ধপরিকর, অপর দিকে শাসক-সম্প্রদায়ের ভিতরে

একটা রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার আন্দোলন দেখা দিয়েছে। এই প্রতিক্রিয়ার আন্দোলন মোটেই বিচারসহ নয়। যে হেতু এই আন্দোলনের যারা ধুরন্ধর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে যুদ্ধ-বিগ্রহকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদলের স্ব-স্বপ্রধান অধিনায়ক অথবা এমন সব রাজনৈতিক আন্দোলনকারী যাদের ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রা-প্রণালী কন্‌ফিউসীয় মতবাদের দিক থেকে মোটেই আদর্শস্থানীয় নয়। বস্তুতঃ তাদের রক্ষণশীলতা ভণ্ডামীরই নামান্তর এবং যুব-সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের অবজ্ঞা-সূচক মনোভাবের একটা নির্ম্মম প্রতিক্রিয়ার বাহ্য রূপ। কন্‌ফিউসীয় মতবাদ যে বয়স্কের সম্মান এবং কর্তৃপক্ষের কর্ত্তৃত্বের কাছে নতি শিক্ষা, এরা তারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু যে সব রাজনৈতিক ধুরন্ধরেরা কন্‌ফিউসীয় মতবাদের বড় বড় বুলি বড় গলা করে বলে বেড়ান, তাঁরাই আবার তিব্বতীয় বৌদ্ধ লামাদের প্রার্থনা অনুষ্ঠান অবলম্বন করে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সাহায্য ভিক্ষা করেন। কন্‌ফিউসীয় মতবাদের চিরপুরাতন গতানুগতিক বুলি কপচানির সঙ্গে তিব্বতীয় প্রার্থনা-চক্র ও সংস্কৃত মন্ত্র—"ওঁ মণি পদ্মে হুং" মিশিয়ে তাঁরা এমন একটা অপার্থিব ঐন্দ্রজালিক অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, যা চৈনিক যুব-সম্প্রদায়ের কাছে অশ্রদ্ধেয় জুগুপ্সিত ব্যাপার বলে মনে হয়।

চীনদেশে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের এই লড়াই এখনও উপর উপর চলছে। এ সমস্যার মীমাংসা নির্ভর করে প্রধানতঃ জাপানী ও ইউরোপীয় রাজনৈতিক চাল-চলতির উপরে—নিজেদের মধ্যে তর্কের লড়াইয়ের দ্বারা কোনো মীমাংসায় পৌঁছানো যাবে না। রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ধুরন্ধরেরা যদি সন্তোষজনক ভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে না পারে, তবে সমগ্র চীন হয়তো বাধ্য হয়েই সাম্যবাদী মতাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। তা সত্ত্বেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে চীনজাতের রক্ষণশীল আন্তর প্রকৃতি বদলাবে না—বিশেষতঃ বিপুল জন-সাধারণের মধ্যে যারা শুধু চীন ভাষা পড়তে পারে কিংবা কিছুই পড়তে পারে না, তাদের রক্ষণশীল স্বভাব অব্যাহত না থেকেই পারে না।

সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে চৈনিকরা পরিবর্ত্তন পছন্দ করে না। বাইরের দিক থেকে দেখলে সামাজিক আচার-ব্যবহার মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও পথ চলাচলের অভ্যাস সম্বন্ধে প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সব উষ্ণ-মস্তিষ্ক যুবক বিদেশী ধরণের কোট পরে

এবং চোস্ত ইংরেজী ভাষায় কথা বলে, তাদের সম্বন্ধে চৈনিকরা ভিতরে ভিতরে একটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে। বয়স্করা সব সময়েই যুবকদিগকে অপরিণত-বুদ্ধি বলে মনে করে এবং চারদিককার 'ছি ছি'-র বহরের ফলেই অনেক সময়ে তাদের প্রগতি-বাদী রোগটা সেরে যায়। চীনদেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায় যে, লোকে যাকে আর অপরিণত-বুদ্ধি বা অপরিণত-বয়স্ক বলে মনে করে না, সে ব্যক্তি আপনা থেকেই ক্রমে রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। বিদেশাগত চৈনিক ছাত্র যখন মনের দিক থেকে সাবালক হয়ে ওঠে, তখন স্বভাবতঃই সে চৈনিক গাউন পরে এবং চৈনিক জীবন-যাত্রা-প্রণালী অবলম্বন করে। তখন সে চৈনিক স্বভাবের মৃদুতা, তার কর্ম্মহীন অবসর, তার সহজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও তার স্বল্পে সন্তুষ্টি প্রভৃতি গুণাবলীর পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। চৈনিক গাউন পরে তার আত্মা শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে। চৈনিক পারিপার্শ্বিকের যে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ শক্তি আছে, যার জন্যে বহু তথা-কথিত 'সৃষ্টি ছাড়া' ইউরোপীয় আজীবন চীনদেশেই থেকে যায় সেই শক্তির প্রভাব চৈনিক যুবকদের জীবনেও দেখা দেয়, যখন তারা জীবনের মধ্য বয়সে উপনীত হয়।

ইতিমধ্যে দেশের বেশী ভাগ লোকই যে তাদের চির-পুরাতন পন্থা অবলম্বন করেই চলতে থাকবে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। বিচার বিবেচনা করে এই পথই ভাল মনে করে যে সে সে-পথে চলবে, তা নয়—স্বাভাবিক জাতীয় সংস্কার বশেই সে পথে চলবে। আমার দৃঢ় ধারণা যে চৈনিক ঐতিহ্য ও জাতীয় সংস্কারের মূল এত দৃঢ়-বদ্ধ যে, আমাদের জাতীয় জীবনের মৌলিক গঠন কখনো ক্ষুণ্ণ হবে না। এমন কি যদি একটা ভীষণ ওলট্-পালট্ কাণ্ড সংঘটিত হয় অর্থাৎ বিষম একটা রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে সাম্যবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাও হয়, তা হলেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, পর-মত সহিষ্ণুতা, নরম-পন্থী মনোভাব এবং সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞানের জাতীয় ঐতিহ্য সাম্যবাদকেই তছনছ করে দেবে এবং তার চেহারা এমনভাবে বদলে ফেলবে যে, এ দেশে তাকে আর চিনবার উপায় থাকবে না। যদি কেউ মনে করেন যে, সমাজতন্ত্রবাদী, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যহীন কঠোর মনোভাব সম্পন্ন সাম্যবাদই প্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্য নষ্ট করে দেবে, তার ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। এরূপ না হয়েই পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

আগমনী

শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

আকাশে বাতাসে জাগিছে আভাসে
কাহার পদ-ধ্বনি !
গানে গানে কা'র ভরিছে বিশ্ব—
ওঠে কা'র আবাহনী !
প্রাবৃট-মেঘের আঁধার ঠেলিয়া,
কোন্ আলো আজ উঠিছে জাগিয়া,
কার আশ্বাসে মাতে আজ প্রাণ—
কোন্ সুরে ওঠে রণি ?
কা'র উচ্ছ্বাস নদী-কল-তান
রেখে যায় তীরে তীরে,
বিহগ-কণ্ঠে কা'র বাঁশী বাজে
উদার গগন ঘিরে !
কাহার চাহনি নীলিমার চোখে,
দেয় পরশন অন্তর লোকে,
রবির কিরণে কা'র হাসি হাসে—
সাজায় ধরিত্রীরে !
কাহারে বরিতে মেলেছে আসন
রক্ত-কমল-দল !
কা'র লাগি' আজ কানায় কানায়,
দীঘি-জল টলমল !
পথে ঘাটে বাটে বনে প্রান্তরে,
কা'র দীপ্তিতে দশদিশি ভরে,
লতায় পাতায় ফুলের শোভায়
কা'র রূপ উচ্ছল !

কি যেন আবেগ, কি যেন আবেশ,
কি যেন গভীর মায়া,
কা'র হৃদয়ের স্নিগ্ধ-মধুর,
স্নেহের শীতল-ছায়া !
কা'র আনন্দ-বন্যার ধারা,
ভরিয়া দিয়াছে এ নিখিল সারা,
কাহার স্বরূপ দৃশ্যে দৃশ্যে
লভিয়াছে রূপ-কায়া !
কে এল ভুবনে ? কে এল জীবনে ?
কে এল হৃদয়-পুরে ?
দেখিতে না পাই, শুধু শুনি কানে
আগমনী সুরে সুরে !
যুগ যুগ ধ'রে এমনি সে আসে,
ওঠে উজ্জ্বলি' চিত্ত-আকাশে,
ধরা নাহি দেয়, কোথায় লুকায়—
মনে হয় কত দূরে !

'ব্রহ্মকে পাওয়ার কথাটা ঠিক বলা চলে না। কেননা তিনি তো আপনাকে দিয়েই বসে আছেন, তাঁর তো কোনোখানে কমতি নেই—এ কথা তো বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে, অতএব আর এক জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব ব্রহ্মকে পেতে হবে একথাটা বলা ঠিক চলে না—'আপনাকে দিতে হবে' বলতে হবে।···যিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না।···তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা।'

—শান্তিনিকেতন

১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩১-৩২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

একাদশোঽধ্যায়ঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥১১।৩২

(যে প্রয়োজনে ভগবানে এই প্রবৃত্তি, তৎ সমস্তই ভগবান বলিতেছেন) কালঃ অস্মি [আমি দিব্য রূপভেদাস্পদ কাল। গড়িয়া গড়িয়া ভাঙ্গা এবং ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া গড়াই আমার চেষ্টা] লোকক্ষয়কৃৎ [লোকসমূহের ক্ষয়ের (নাশ এবং গৃহ) কারণ যিনি, তিনিই লোকক্ষয়কৃৎ। সব লোককে ক্ষয় করিয়া পুরুষোত্তম ছাঁচে নূতন গড়িয়া তুলিয়া লোক-গৃহ সৃষ্টি করাই আমার এই কাল-চেষ্টার মূল রহস্য।] প্রবৃদ্ধঃ [বৃদ্ধিপ্রাপ্ত] (কেন এরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছ ?) লোকান্ [ধর্ম্মগ্লানিগ্রস্ত লোক সমূহকে] সমাহর্ত্তুং [সংহার করিয়া সম্যক্‌রূপে আমার জীবনে সমাহার করিবার জন্য, সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য। সমস্ত ভাষ্য-টীকাকারগণ 'সমাহর্ত্তুম্' পদের অর্থ করিয়াছেন 'সংহর্ত্তুং' অর্থাৎ সংহার করিতে। কিন্তু 'সমাহর্ত্তুং' পদের অর্থ কেন 'সংহর্ত্তুম্ হইবে ? 'সমাহর্ত্তুম্' 'পদের অর্থ হওয়া উচিত সমাহার করিতে। ভগবানের সংহার সমাহার করিবার জন্যই।] ইহ [এই সময়ে] প্রবৃত্তঃ [প্রবৃত্ত] ; ঋতে অপি [বিনাও] ত্বাং [তোমাকে] অর্থাৎ তুমি বধ না করিলেও] ন ভবিষ্যন্তি [বাঁচিয়া থাকিবে না] সর্ব্বে [ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি সকলে] যে [যাহারা] অবস্থিতাঃ [অবস্থিত] প্রত্যনীকেষু [প্রতিপক্ষভূত অনীক সমূহে (সেনাদলের) মধ্যে, অনীকম্ অনীকং প্রতি ইতি প্রত্যনীকম্] যোধাঃ [যোদ্ধগণ]।

শ্রীভগবান বলিলেন আমি লোকক্ষয়কারী রূপভেদাস্পদ দিব্য কাল, লোকসমূহকে আমার জীবনে সমাহার করিবার জন্যই আমি প্রবৃত্ত রহিয়াছি, প্রতিপক্ষীয় সৈন্যদলে যে যে পুরুষগণ বর্ত্তমান, তুমি বধ না করিলেও তাহারা বাঁচিবে না। ১১।৩২

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ১১।৩৯

(যে হেতু আমার গুহ্যতম অভিপ্রায় হইতেছে, দুর্য্যোধন-শাসিত এই রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া (পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া তোলা) তস্মাৎ [সেই হেতু] ত্বম্ [তুমি] উত্তিষ্ঠ [পুরুষোত্তম-অভিপ্রায়ে অভিপ্রায় মিলাইয়া রাগদ্বেষের স্তরের ঊর্দ্ধে ক্লীবত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাঁড়াও] যশঃ [পুরুষোত্তম-সৃষ্টি গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত হওয়া-রূপ দিব্য যশ। ভগবানে 'জ্ঞানে'র মূল্য 'যশের' চেয়ে বেশী মূল্যবান নয়। 'ভগ' শব্দের মধ্যে জ্ঞান ও যশ দুই-ই সমভাবে রহিয়াছে। জ্ঞানের চেয়ে যশ অকুলীন নয়] জিত্বা [জয় করিয়া] শত্রূন্ [পুরুষোত্তম-ধর্ম্মের দলনকারী বলিয়াই যাহারা শত্রু, তাহাদিগকে] ভুঙ্‌ক্ষ্ব [পুরুষোত্তম শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া, 'ত্যক্তেন' ভোগ কর] রাজ্যং [রাজ্য] সমৃদ্ধং [পুরুষোত্তম সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধিমান] ময়া এব [আমাদ্বারাই] নিহতাঃ [তাহাদের আমি রূপে অবস্থিত আমার 'আমি'-র দ্বারা ও তাহাদের নিজেদের 'আমি' দ্বারাই সকল শোষণের চরম প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিশ্চয় রূপে হত] পূর্ব্বম্ এব [বর্ত্তমান যুদ্ধে তোমার প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ এই রাজ্যের সকল অত্যাচারের চরম পরিণতি স্বরূপ কুরু সভায় দ্রৌপদীকে অপমাননা দিবসে] নিমিত্তমাত্রং [সেই আদর্শের স্তরের মরণকে কার্য্য জগতে প্রকাশ করিবার জন্য নিমিত্ত স্বরূপ] ভব [হও] হে সব্যসাচিন্ [সব্য অর্থাৎ বাম হস্ত দ্বারাও শর সিঞ্চন করিতে পারেন যিনি, তিনিই সব্যসাচী, যাহার দক্ষিণ বাম হস্ত সমভাবে প্রয়োগ করিবার কৌশল আয়ত্ত হইয়াছে]।

সেই কারণ, তুমি উঠ, যশ লাভ কর। শত্রু নিকর বধ করিয়া রাজ্য ভোগ কর। আমিই ইহাদিগকে পূর্ব্বে মারিয়া রাখিয়াছি, হে সব্যসাচিন্, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। ১১।৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ১১।৩৪

(যে যে বীরের সম্বন্ধে অর্জ্জুনের আশঙ্কা ছিল, তাহাদেরই নাম নির্দ্দেশ করিয়া ভগবান বলিতেছেন) দ্রোণং [কুরুপাণ্ডবের ধনুর্ব্বেদাচার্য্য, দিব্যাস্ত্র সম্পন্ন এবং বিশেষ ভাবে গুরু দ্রোণকে] ভীষ্মং [কুরুবৃদ্ধ, বিশেষ ভাবে পূজ্য, স্বচ্ছন্দমৃত্যু, দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন, পরশুরামের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াও

অপরাজিত, অম্বা-অম্বালিকার আকর্ষণে অপ্রলুব্ধচিত্ত, কিন্তু কুরুসভায় দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ চোখের উপর দেখিয়াও কোনও প্রতীকার চেষ্টায় অসমর্থ, নিজের পদমর্য্যাদা ও ক্ষত্রিয় মর্য্যাদার পদদলনকারী, ক্লীব ভীষ্মকে] জয়দ্রথং [যে জয়দ্রথের পিতা এইরূপ বরের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, যে আমার পুত্রের মস্তক ভূমিতে ফেলিবে তাহার মস্তকও ভূমিতে পতিত হইবে, সেই জয়দ্রথকে] কর্ণং [ইন্দ্রপ্রদত্ত অমোঘ শক্তিসম্পন্ন, দিব্য কুণ্ডলধারী সূর্য্যপুত্র কর্ণকে] তথা [সেইরূপ] অন্যান্ [অন্য অন্য] যোধবীরান্ অপি [বীর যোদ্ধৃগণকেও] ময়া [আমাদ্বারা ;] তাহাদের 'আমি' রূপে আমাদ্বারা এবং তাহাদের নিজেদের দ্বারাই ; 'আত্মৈব আত্মনঃ শত্রুঃ'] হতাঃ [সব তেজ-শক্তি শুষিয়া নেওয়ার ফলে হত] ত্বং [তুমি] জহি [নিমিত্তমাত্র হইয়া নিহত কর] মা ব্যথিষ্ঠাঃ [ব্যথিত হইও না ; ধর্ম্মগ্লানির যে ব্যথা আমার বুকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সেই ব্যথাকে তোমার জীবনে বরণ করিয়া লইয়া অন্য সব বাজে ব্যথা ভুলিয়া যাও] যুধ্যস্ব [যুদ্ধ করিয়া যাও] জেতাসি [নিশ্চয়ই পরাস্ত করিতে পারিবে] রণে [যুদ্ধে] সপত্নান্ [পুরুষোত্তম-সৃষ্টি গঠনের শত্রুগণকে]।

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ, এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধৃগণকে আমিই মারিয়া রাখিয়াছি, তুমি নিমিত্ত হইয়া বধ কর ; তুমি ব্যথা পাইও না ; যুদ্ধ কর, এই যুদ্ধে নিশ্চিন্তরূপে জয় করিতে পারিবে। ১১।৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ১১।৩৫

সঞ্জয় উবাচ [সঞ্জয় বলিলেন] এতৎ [এই পূর্ব্বোক্ত] শ্রুত্বা [শুনিয়া] বচনং [বাক্য] কেশবস্য [কেশবের] কৃতাঞ্জলিঃ বেপমানঃ [কাঁপিতে কাঁপিতে] কিরীটী [কিরীটধারী অর্জ্জুন] নমস্কৃত্য [নমস্কার করিয়া) ভূয়ঃ এব [পুনরায়] আহ [বলিলেন] কৃষ্ণং [শ্রীকৃষ্ণকে] সগদ্গদং [গদগদ কণ্ঠে, 'ভয়াবিষ্টস্য দুঃখাভিঘাতাৎ স্নেহাবিষ্টস্য চ হর্ষোদ্ভবাৎ অশ্রুপূর্ণ নেত্রত্বে সতি শ্লেষ্মণা কণ্ঠাবরোধঃ ততশ্চ বাচোঽপাটবং মন্দশব্দত্বং যৎ স গদ্গদঃ' ; তাহার সহিত সগদ্গদম্ ; 'আহ' ক্রিয়ার বিশেষণ] ভীতভীতঃ [পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত ভয়াবিষ্ট চিত্ত হইয়া] প্রণম্য [প্রণাম করিয়া] (কৃষ্ণার্জ্জুনের ধারাবাহিক বচনাবলীর মাঝখানে বাধা দিয়া সঞ্জয়ের বাক্য বলার উদ্দেশ্য হইতেছে

ধৃতরাষ্ট্রকে বিবেচনার সুযোগ দেওয়া, যদি তিনি এই যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাদির অনিবার্য্য মৃত্যু এবং দুর্য্যোধনের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের কথা অবগত হইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব করেন)।

সঞ্জয় বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে কাঁপিতে কাঁপিতে অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, আবার অত্যন্ত ভীত হইয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিলেন।১১।৩৫

অর্জ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥১১।৩৬

অর্জ্জুন উবাচ [অর্জ্জুন বলিলেন] স্থানে [ইহা যুক্তিযুক্ত] হে হৃষীকেশ (কি যুক্তিযুক্ত ?) (যে) তব [তোমার] প্রকীর্ত্ত্যা [লোকে প্রসিদ্ধ তোমার সুভদ্র গুণকর্ম্ম ও গুণকর্ম্মার্থক নাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপের কীর্ত্তন দ্বারা ও শ্রবণ দ্বারা] জগৎ [জগৎ] প্রহৃষ্যতি [প্রহর্ষ প্রাপ্ত হয়] অনুরজ্যতে চ [এবং অনুরক্ত হয় ; 'এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগঃ দ্রুতচিত্তঃ উচ্চৈঃ। হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ'—ভাগবত।] রক্ষাংসি [রাক্ষসগণ] ভীতানি [ভয়াবিষ্ট হইয়া] দিশঃ [চারিদিকে] দ্রবন্তি [দ্রুত পলায়ন করে, ইহাও যুক্তিযুক্ত বটে] সর্ব্বে নমস্যন্তি চ [এবং নমস্কার করে] সিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ [এবং সিদ্ধদের সঙ্ঘসমূহ] (ইহাও যুক্তিযুক্ত যে, তুমি সর্ব্বরস-কদম্বমূর্ত্তি বলিয়া যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ের বিষয় ; 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্')।

অর্জ্জুন কহিলেন—হে হৃষীকেশ, তোমার গুণকর্ম্ম ও তদর্থক নাম কীর্ত্তন দ্বারা জগৎ যে প্রহর্ষলাভ করে এবং অনুরক্ত হয়, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে, সর্ব্ব সিদ্ধসঙ্ঘ নমস্কার করেন, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। ১১।৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥১১।৩৭

(ভগবানের হর্ষাদি বিষয়ত্ব হেতু বলিতেছেন) কস্মাৎ চ [এবং কি হেতুতেই] তে [তোমাকে] ন নমেরন্ [নমস্কার না করিবে] হে মহাত্মন্ গরীয়সে [গুরুতর তোমাকে] ব্রহ্মণঃ অপি [হিরণ্যগর্ভেরও] আদিকর্ত্রে [আদি কর্ত্তা, কারণ তোমাকে ; এই জন্যই তুমি নমস্কার ও হর্ষের উপযুক্ত

পাত্র বটে] হে অনন্ত হে দেবেশ জগন্নিবাস, ত্বম্ অক্ষরম্ [সেই অক্ষর যাহা উপনিষদে শ্রুত হয়, আজ সেই অক্ষরের মূর্ত্ত বিগ্রহ দৃষ্ট ঔপনিষদ পুরুষ তুমি] (সেই অক্ষর কি ?) সৎ ['আছে' বলাও যায় বটে] অসৎ ['নাই' বলাও যায় বটে, শ্রীকৃষ্ণ সৎ ও অসৎ দুইয়েরই সমন্বয়] পরং [সতেরও পর, অসতেরও পর অথচ সৎ-অসৎ সমন্বিত] যৎ [যে বস্তুটী] তৎ [তাহা তুমিই]।

হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, জগন্নিবাস, তুমি ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর, কেননা তাঁহার জনক। তোমাকে কেন না নমস্কার করিবে? তুমি অক্ষর, সৎ, অসৎ এবং সদসদতীত ও সদসৎ সমন্বিত যে পরবস্তু, তাহাও তুমি।১১।৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥১১।৩৮

(পুনরায় স্তব করিতেছেন) ত্বম্ আদি দেবঃ [জগতের স্রষ্টা বলিয়া পূজিত দেবগণেরও আদিদেব] পুরুষঃ [পুরুষবিধ] পুরাণঃ [পুরাণ বলিয়াই চির নবীন] ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য [এই বিশ্বের] পরং নিধানম্ [পুরুষোত্তম জীবনে এই বিশ্বের সর্ব্ব শেষ সত্য বাস্তব মীমাংসা বলিয়াই তিনি বিশ্বের 'পর নিধান'; যাহার ভিতরে বিশ্ব নিশ্চয় রূপে নিহিত, তিনি নিধান] বেত্তা অসি [তুমি জ্ঞাতা] বেদ্যং চ [এবং বেদ্য; ত্রিভঙ্গ তুমি বেত্তা থাকিয়াই বেদ্য এবং বেদ্যরূপে অচ্যুত থাকিয়াই তুমি বেত্তা; বেত্তা-বেদন-বেদ্য তোমাতে ত্রিভঙ্গ; তিন তিন থাকিয়াও ভাঙ্গিয়া গিয়া পরস্পরে গলিয়া গিয়া ঐ বেত্তা-বেদন-বেদ্য তিনই পুরুষোত্তম রূপে ফুটিয়া উঠে] পরং চ ধাম [বেত্তা-বেদ্যের সমন্বয় রূপ পর শ্রীধাম বিষ্ণুপদ] ত্বয়া [তোমা দ্বারা] ততং [সমব্যাপ্তিতে বিস্তৃত] বিশ্বম্ [সমস্ত] হে অনন্তরূপ [যাহার অন্ত নাই, ব্যাপক : যিনি সকল ছোট-অন্তেরও অনন্তত্ব বিধান করিতেছেন, তিনি সত্য বাস্তব অনন্ত]।

তুমি আদি দেব, পুরাণ পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের পর নিধান, তুমিই বেত্তা, তুমিই বেদ্য, তুমি পরধাম। হে অনন্ত রূপ, তোমা দ্বারাই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে।১১।৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥১১।৩৯

(আরও) বায়ুঃ [বায়ু তুমি] যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ [জলের পতি] শশাঙ্কঃ [চন্দ্র] প্রজাপতি [কশ্যপাদি প্রজাপতি] প্রপিতামহশ্চ [পিতা কশ্যপের পিতা ব্রহ্মাই পিতামহ; ব্রহ্মারও পিতা প্রপিতামহ তুমি] নমঃ নমঃ অস্তু তে

[তোমাকে] সহস্রকৃত্বঃ [সহস্র বার ; সহস্র শব্দের উত্তর 'কৃত্বসুচ্' তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়া সহস্রকৃত্বঃ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কৃত্বসুচ্' প্রত্যয়ের অর্থ এই স্থানে নমস্কার-বাহুল্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান রূপ আবৃত্তি] পুনঃ চ [পুনরায়] ভূয়ঃ অপি [এই প্রকার পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া অর্জ্জুন ভগবানের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য দেখাইতেছেন এবং বারবার নমস্কার করিয়াও যে তৃপ্তি লাভ হইতেছে না, তাহাও দেখাইতেছেন]।

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি, প্রপিতামহ ; তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনর্ব্বার তোমাকে নমস্কার, আবার তোমাকে নমস্কার করি। ১১।৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥১১।৪০

(সেই রূপেই) নমঃ পুরস্তাৎ [সম্মুখে তোমাকে] অথ [অনন্তর] পৃষ্ঠতঃ [পিছনের দিকে] তে [তোমাকে] নমঃ অস্তু তে [তোমাকে নমস্কার] সর্ব্বতঃ এব [সকল দিকেই] হে সর্ব্ব [সর্ব্বাত্মন্] অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ [অন্তহীনবীর্য্য [সামর্থ্য) এবং অমিতবিক্রম (পরাক্রম) যাহার ; বীর্য্য থাকিলেও কালে পরাক্রম নাও থাকিতে পারে ; তুমি বীর্য্যবান ও পরাক্রমশালী দুই-ই একাধারে] ত্বং [তুমি] সর্ব্বং [সর্ব্ব জগৎ] সমাপ্নোষি [সম্যক্ রূপে পুরুষোত্তম-জীবনে হজম করিয়া 'অহম্-'এর আস্বাদন রূপে সর্ব্বের বুকে নিজকেই প্রাপ্ত হইয়াছ] ততঃ [সেই হেতুই] অসি [আছ] সর্ব্বঃ [সর্ব্ব]।

তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাৎ দিকে নমস্কার, হে সর্ব্ব, তোমাকে সকল দিকে নমস্কার। তুমি অনন্তবীর্যশালী, অমিত পরাক্রমবান, সর্ব্বকে তুমি সম্যক্ রূপে পাইয়াছ, সেই হেতু তুমিই সর্ব্ব।১১।৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ১১।৪১-৪২

(যেহেতু আত্মানাত্ম সমন্বয়, স্বরূপ বিশ্বরূপ সমন্বয় তোমার সমগ্ররূপ না দেখিয়া, বিশ্বরূপহীন সখ্যরস-গম্য একান্ত স্বক রূপকেই একান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া, সমগ্রের কাছে অপরাধী হইয়াছি, সেই হেতুই) সখা ইতি [বিশ্বরূপ জীবন বর্জ্জিত একান্ত সমানবয়া, সদস্য এইরূপ] মত্বা [স্বরূপ-বিশ্বরূপের দ্বন্দ্ব-

মোহে আচ্ছন্ন মন দ্বারা মনন করিয়া] প্রসভং [হঠাৎ, ডাকিবার অধিকার না থাকিলেও গায়ের জোরে, ঐশ্বর্য্যহীন একান্ত মাধুর্য্য দ্বারা মোহাভিভূত হইয়া ; সত্যকার সখা ডাকিবার অধিকার হইত, যদি অর্জ্জুন তাঁহার সখার বিশ্বরূপকে স্বরূপের সঙ্গে সমন্বয় করিতে পারিতেন] যৎ উক্তং [যাহা উক্ত হইয়াছে] (কি কি উক্ত হইয়াছে ?) হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা ইতি [হে কৃষ্ণ যাদব সখা এইরূপ] অজানতা [অজ্ঞানী মূঢ় দ্বারা] (কি বিষয়ে অজ্ঞান ?) মহিমানং [পুরুষোত্তম জীবনের অন্তর্গত মহিমার দিক ঐ বিশ্বরূপের মাহাত্ম্য] তব [তোমার] ইদং [এই ; এখানে 'ইদম্' পদটী ক্লীবলিঙ্গ হইয়াও পুংলিঙ্গ 'মহিমানং' পদের বিশেষণ হইয়াছে] ময়া [আমা দ্বারা] প্রমাদাৎ [ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের দ্বন্দ্বমোহজনিত প্রমাদ বশতঃ] প্রণয়েন বা অপি [কিম্বা ঐশ্বর্য্যহীন স্নেহনিবন্ধন একান্ত বিশ্বাসের বশে] যৎ চ [এবং ইহা ছাড়াও যাহা কিছু] অবহাসার্থং [পরিহাসচ্ছলে] অসংকৃতঃ [তিরস্কৃত] অসি [হইয়াছ] বিহারশয্যাসনভোজনেষু [বিহার অর্থাৎ ক্রীড়া, ব্যায়াম ইত্যাদি এবং শয্যা (শয়ন) এবং আসন (উপবেশন) এবং ভোজন কালে] একা [বিশ্বরূপের আড়ালে একান্তে, একান্ত স্বরূপে স্থিত একাকী অথবা] অপি তৎসমক্ষম্ [অথবা লোক সমক্ষেও] হে অচ্যুত [যদিও তুমি স্বরূপে ও বিশ্বরূপে সমভাবে অচ্যুত, আমি কিন্তু তোমাকে বিশ্বরূপ হইতে সরাইয়া লইয়া একান্ত সখ্য রসে তোমাকে পাইয়াছি] তৎ সর্ব্বং [সেই সব অপরাধ, অধিকার না থাকিলেও ঐ ভাবে ব্যবহার করা] ক্ষাময়ে ['ক্ষমং কারয়ে,' শক্তিযুক্ত করাইয়া লইব, সক্ষম করাইয়া লইব ; যে সখ্য ব্যবহার ছিল অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া অক্ষম শক্তিহীন, আজ তাহাকে স্বকরূপ ও বিশ্বরূপের সমন্বয় রসরূপে শক্তিযুক্ত করাইয়া লইব, উপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধে গড়িয়া তুলিব, আজ সার্থক ডাকা ডাকিব, সার্থক ব্যবহার করিব। 'ক্ষাময়ে' পদের 'ক্ষমা করাইয়া লইব' এই অর্থ ঠিক শোভন ও যুক্তিযুক্ত হয় না। কেন না তাহা হইলে প্রমাণিত হয় যে, অর্জ্জুন এতদিন 'সখা' ডাকিয়া ভুলই করিয়াছেন এবং এইবার যখন তাঁহার মোহ কাটিয়া গেল, আর তিনি ইহার পর 'সখা' বলিয়া ডাকিবেন না। ইহাতে সখ্য রসের নিতান্ত লৌকিকতা ফুটিয়া উঠে। কিন্তু পুরুষোত্তমস্তরে কোনও লৌকিক ব্যবহারই ভুল নয়, যদি তাহা ব্রজের কৌশলে কৃত হয়, বিশ্বরূপ দর্শন রূপ যোগদ্বারা যুক্ত হয়। কৌশল পূর্ব্বক ব্যবহার করিতে না পারার জন্যই অর্জ্জুনের এই ভ্রম ; সখ্য ব্যবহার একান্তই ভ্রম নয়] ত্বাম্

[তোমাকে দিয়া] অহম্ অপ্রমেয়ম্ [দ্বন্দ্ব-মোহ স্তরে কোনও প্রমাণই যাহাকে প্রমাণ করিতে পারে না ; শরণাগতের কাছেই শুধু সর্ব্ব প্রমাণ-সমন্বিত তিনি প্রমাণাতীত থাকিয়াই ধরা দেন]।

তোমার এই বিশ্বরূপ রূপ-মহিমা অবগত না হইয়া গায়ের জোরে একান্ত সখ্য রসে সখা মনে করিয়া প্রমাদ বশতঃ, কিম্বা প্রণয় বশতঃ হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে এই বলিয়া আমি যে সম্বোধন করিয়াছি, একাকী ও বন্ধুগণের সমক্ষে বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন কালে উপহাসচ্ছলে যে তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, অপ্রমেয় তোমাদ্বারা, হে অচ্যুত, তাহা আমি শক্তিযুক্ত করিব, সক্ষম করিব। ১১।৪২

(ক্রমশঃ)

'আমি স্বরাজ বলতে কি বুঝি সে সম্পর্কে যেন কারও কিছু ভুল ধারণা না থাকে। আমার স্বরাজ—বিদেশী শাসন থেকে পূর্ণ মুক্তি, সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। সুতরাং এ পথে একদিকে আপনারা পাবেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। স্বরাজের আরও দুইটী দিক আছে। এর একটী হ'ল—নৈতিক ও সামাজিক—ধর্মের উদ্দেশ্য যা। ধর্ম বলতে ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ যা তা-ই আমি বুঝি। এর মধ্যে আছে হিন্দুর হিন্দুধর্ম, মুসলমানের ইসলাম, খৃষ্টানের খৃষ্টধর্ম—আবার এদের সবার উপরে এক ধর্ম। একে বলা যায় স্বরাজের বর্গক্ষেত্র, কোন একটী কোণ সঠিক না হলে এ আর স্বরাজ থাকবে না। কংগ্রেসের ভাষায় সত্য এবং অহিংসা ব্যতীত এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়; অর্থাৎ এজন্য চাই শ্রীভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস। নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনও এই জন্যই।'

—মহাত্মা গান্ধী

রামায়ণ শোনার একদিন *

হরিদাস বসাক

(১)

একমাত্র মহারাজ লঙ্কেশ্বর ব্যতীত লঙ্কাপতির শেষ বীর মহীরাবণ বধের পর লঙ্কা যখন বীরশূন্য, তখন লঙ্কেশ শোকাকুলাবস্থায় কৈলাস পর্ব্বতে তাঁহার ইষ্টদেবতা শঙ্করের নিকট গমন করিলেন। পর্ব্বতশিখরের বেদীমূলে সমাসীন শঙ্কর শঙ্করী আত্মানন্দে নিমগ্ন আছেন—ইত্যবসরে লঙ্কাপতি সেখানে আগমন করতঃ—দেব-দেবী উভয়ের চরণ বন্দনান্তে বলিতে লাগিলেন, প্রভু! আমার বংশ যে নির্ব্বংশ হয়ে গেল। আমার সোনার লঙ্কা শ্মশানে পরিণত হ'ল। প্রভু! দয়া করে আমার বংশধরগণকে ফিরিয়ে দিন।

শঙ্কর অতি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন—আমি কি করতে পারি বৎস? যখন সেতুভঙ্গ করতে গিয়েছিলে—তখন সেতুরক্ষায় নিযুক্ত আমি তোমায় বাধা দিয়ে একথাই বলেছিলাম—রামের সীতা রামকে ফিরিয়ে দাও। সেদিন কি আমার উপদেশ গ্রহণ করেছিলে?

রাবণের আকুল ক্রন্দনে জগন্মাতার প্রাণ কাঁদিল। তিনি শঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—এর অপরাধ মার্জ্জনা কর। রক্ষা করবার একটা উপায় করতেই হবে প্রভু!

অনেক ভাবিয়া শঙ্কর বলিলেন—শোন বৎস! কৈলাস থেকে আমার অভিন্নমূর্ত্তি শিবলিঙ্গ মস্তকে ধারণ করে লঙ্কায় নিয়ে স্থাপন কর। সাবধান, পথিমধ্যে অবতরণ করিও না—তাহলে লিঙ্গ সেখানেই থেকে যাবে, আর উঠবেনা। শিবলিঙ্গ লঙ্কায় স্থাপিত হলে কেউ লঙ্কার ক্ষতি করতে পারবে না।

* বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ রামায়ণ গায়ক প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে রামায়ণ গান শ্রবণ করিয়া তাহার সারাংশ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। প্রবন্ধে উল্লিখিত অংশটী "সারাবলী রামায়ণ" জগৎরাম (গ্রন্থখানা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য) হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া গায়ক ঠাকুর প্রবন্ধ লেখকের নিকট প্রকাশ করেন।

দেবাদিদেবের মুখে এই বাণী শ্রবণ করিয়া দেবদেবীর চরণ বন্দন পুর্ব্বক শিবলিঙ্গ মস্তকে ধারণ করিয়া লঙ্কেশ্বর তড়িৎগতিতে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ঘটনাচক্রে দেবর্ষি নারদ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবদেবীর চরণ বন্দনান্তে শঙ্করীকে উদ্দেশ করিয়া দেবর্ষি বলিলেন—মা! ভোলানাথকে এত বিমনা দেখছি কেন?

শঙ্করী—তিনি তাঁর ভক্ত রাবণের দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন। রামচন্দ্রের হাতে রাবণের সমস্ত বীর নিহত হয়েছে। লঙ্কা এখন বীরশূন্য। লঙ্কেশ্বর এইমাত্র এখানে এসেছিল—প্রভু তার মঙ্গলহেতু কৈলাসস্থিত শিবলিঙ্গ দান করে বলেছেন সেই লিঙ্গ মাথায় করে লঙ্কায় নিয়ে স্থাপন করতে এবং পথিমধ্যে উহা মৃত্তিকাস্পর্শ করাতে নিষেধ করে দিয়েছেন—তাহালে লিঙ্গ সেখানেই পড়ে থাকবে।

দেবর্ষি প্রমাদ গণিলেন—প্রণামান্তে দেবদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ পুর্ব্বক ত্বরায় সুরধামাভিমুখে গমন করিলেন।

(২)

ইন্দ্রজিৎ নিধন হওয়ায় অমরাপুরী দেবতাদের আনন্দ-উৎসবে নিমগ্ন।

নারদ সুরধামে আগমন করিয়া সুরমণ্ডলীর এরূপ আনন্দ দর্শন করিয়া অবাক হইলেন।

দেবর্ষিকে আগমন করিতে দেখিয়া সুরপতি আসন হইতে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—আসুন দেবর্ষি। আসুন! আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন—সেই ভীষণ মায়াবী মেঘনাদ নিহত হয়েছে।

দেবর্ষি আসনে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন—দেবরাজ। মেঘনাদ মরেছে বলে আপনারা নিশ্চিন্ত হয়েছেন মনে করবেন না। এখনও দুর্দ্ধর্ষ রাবণ জীবিত আছে। রাবণকে রক্ষা করবার জন্য দেবাদিদেব তাকে শিবলিঙ্গ দান করে অভয় দিয়ে বলেছেন লঙ্কায় শিবলিঙ্গ স্থাপন করতে পারলে—চিরকালের জন্য লঙ্কা রক্ষিত ও রাবণের অমরত্ব লাভ হবে।

শুনিয়া দেবতারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—আনন্দোৎসব তখনই থামিয়া গেল। দেবতারা মন্ত্রণা করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন—রাবণ যাহাতে শিবলিঙ্গ লইয়া লঙ্কায় পৌছাইতে না পারেন সেজন্য বরুণ ও পবনদেবকে নিযুক্ত করিলেন।

বরুণ ও পবনদেবের চক্রান্তে ও প্রকৃতির বিধানে শিবলিঙ্গ পথিমধ্যেই ভূমিস্পর্শ করিলেন, তাই রাবণকে শূন্যহাতেই লঙ্কায় ফিরিতে হইল।

(৩)

রাম রামানুজ দুই ভাই সাগরতীরে বসিয়া তর্পণ করিতেছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিয়া রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ব্রাহ্মণ, কি অভিপ্রায়ে এসেছেন ?

ব্রাহ্মণ—আমি বিধাতাপুরুষ, আপনার নিকটেই এসেছি। রাবণকে বধ করতে হলে আপনাকে অভিচার যজ্ঞ করতে হবে। এ যজ্ঞ আপনার ও আপনার ভ্রাতার অতি সঙ্গোপনে সমাধা করতে হবে। পর্ব্বতোপরি নির্জ্জন স্থান এ যজ্ঞের জন্য প্রশস্ত।

রাম—কিন্তু এ রাক্ষসপুরীতে পুরোহিত কোথায় পাব প্রভু ?

বিধাতা—সত্য বটে। তবে রাক্ষসগণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি স্বয়ং লঙ্কেশ্বর। তাঁকেই পৌরোহিত্যে বরণ করতে হবে।

রাম—আশ্চর্য্য করলেন বিধাতাপুরুষ! সে যে শত্রু! সে আমার পৌরোহিত্য স্বীকার করবে কেন ? তার উপর তারই মৃত্যু হেতু এই যজ্ঞ। এ কি করে সম্ভব হবে !

বিধাতা—সম্ভব হবে রঘুবীর—সম্ভব হবে। রাবণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রাজা। নিজের অনিষ্ট হলেও সে কখনও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হবে না। সে আপনার পৌরোহিত্য অবশ্য বরণ করবে। এই কার্য্যে লক্ষ্মণকে নিযুক্ত করুন। এই বলিয়া বিধাতা পুরুষ চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করিয়া ও রামনাম স্মরণ করিয়া রাবণের অন্দরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কি আশ্চর্য্য! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার যাহা কিছু প্রতিকূল ছিল—সবই অনুকূল হইয়া গেল। লক্ষ্মণ বিনা বাধায় সরাসরি রাবণের বিশ্রাম কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(৪)

বিশ্রাম কক্ষে চিন্তিত লঙ্কেশ্বর আর শোকাতুরা মন্দোদরী। মন্দোদরী বলিলেন, হায় মহারাজ! আমার যে সব গেল! কোথায় আমার বীরপুত্র, বীর পৌত্রগণ ? তাদের এনে দাও। তাদের অভাব যে আমায় উন্মাদ করেছে। কি কুক্ষণেই না তুমি সীতাকে হরণ করেছিলে। বল নাথ, কেন তুমি সীতাকে হরণ করলে ?

রাবণ—রাণি! আমি ত সীতাকে হরণ করিনি!

মন্দো—কি বললে, সীতাকে হরণ করনি?

রাবণ—না না, মিথ্যে আমায় অপবাদ দিচ্ছ। সীতা কে জান! তিনি যে বৈকুণ্ঠের স্বয়ং লক্ষ্মী। ইচ্ছে করে ধরা না দিলে কে তাঁকে ধরতে পারে! কে তাঁকে স্পর্শ করতে পারে! আমি তাঁকে কেন এনেছি জান? সেই জগৎপতি নারায়ণকে আমার লঙ্কায় আনব বলে।

মন্দো—মিথ্যে কথা!

রাবণ—এ যে খাঁটি সত্য। তুমি ভাবছ, তাঁকে আমার করবার জন্য এনেছি? তা যদি হ'ত তাহলে তাঁকে অন্তঃপুরে না রেখে শোকতাপ বিবর্জ্জিত অশোককাননে কেন রেখেছি?

মন্দো—এতই যদি বলছ, তবে তাঁকে চেরির বেত্রাঘাতে এরূপ ভাবে নির্য্যাতন করছ কেন?

রাবণ—তাঁর উপর বেত্রাঘাত হয়নি ত! আমার আদেশে শুধু বেত্রাঘাতের ভয় দেখানো হচ্ছে। আমার ইচ্ছা কি জান? সীতা যতই আকুল হয়ে কাঁদবেন—সীতা উদ্ধারে সীতাপতি ততই তৎপর হবেন, ততই শীঘ্র লঙ্কায় আগমন করবেন। আর অনতিবিলম্বে রাবণেরও মুক্তিপথ প্রশস্ত হবে। সেই নব দুর্ব্বাদল রাম-নারায়ণকে দর্শন করে আমার লঙ্কাপুরীর রাক্ষসকুল ধন্য হয়ে যাবে—আমিও ধন্য হব।

মন্দো—কি আশ্চর্য্য! আমি যে—

এমন সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

লক্ষ্মণকে দেখিয়া রাজারাণী প্রথমে বিস্ময়ে অবাক হইলেন। উভয়ে অপলক নয়নে লক্ষ্মণের পানে চাহিয়া রহিলেন। যখন চমক ভাঙ্গিল তখন রাণীকে উদ্দেশ করিয়া রাবণ বলিয়া উঠিলেন, রাণি! আজ আমাদের বড়ই সৌভাগ্য। সেই বৈকুণ্ঠপতির প্রিয় ভ্রাতা স্নেহের অনুজ আজ আমাদের দ্বারে অতিথি। তুমি শীঘ্র নিজ হস্তে দেবতার পদ প্রক্ষালন করে দাও। আর আমি তাঁর আসন প্রভৃতির ব্যবস্থা করি।

রাণী গললগ্নীকৃতবাস হইয়া লক্ষ্মণের পদযুগল ধৌত করিয়া দিলেন। পরে নিজ কেশগুচ্ছদ্বারা তাহা মুছাইয়া দিলেন। রাজা আসন প্রস্তুত করিয়া দেবতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইলেন।

লক্ষ্মণ এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া

আসিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—এ কি সেই রাবণ? যে রাবণ মায়াজাল বিস্তার করিয়া পঞ্চবটীবনে আমাদের দুই ভাইকে দূরে সরাইয়া কাপট্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভিক্ষুক সন্ন্যাসীবেশে সীতাকে হরণ করিয়াছিল? একি সেই রাবণ? যে রাবণ অশোকবনে সীতাকে অযথা নির্যাতন করিতেছে? আশ্চর্য্য! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! লঙ্কেশ্বর তুমি এত সুন্দর! এত মহৎ! আগে যদি জানতাম—

পদসেবায় নিরত রাবণ মৃদু ভাষায় বলিতে লাগিলেন—দেব! কি হেতু হেথায় আগমন জানিতে পারি কি?

লক্ষ্মণ—লঙ্কেশ্বর! দাদার আদেশে এখানে এসেছি। দাদা একটি যজ্ঞ করতে মনস্থ করেছেন—তার পৌরোহিত্য করতে হবে আপনাকে।

রাবণ—পৌরোহিত্য করব আমি? আমি যে তাঁর শ—। না, না, কি বলছি। আমি—আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য। তিনি কি যজ্ঞ করবেন?

লক্ষ্মণ—তাতো জানি না রাজন্। যজ্ঞের স্থান নির্ণয় করা হয়েছে নির্জ্জন পর্ব্বতে। আগামী কল্য প্রভাতে যজ্ঞের সময় নির্দ্ধারিত হয়েছে। আপনি অনুগ্রহ করে যথা সময়ে আসবেন।

রাবণ—আপনার দাদা নির্জ্জন পর্ব্বতে যজ্ঞের উপকরণ কি করে সংগ্রহ করবেন? দাদাকে বলবেন—যজ্ঞের যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে আমি উপস্থিত হব।

লক্ষ্মণ খুসী হইয়া রাজারাণীকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া ফিরিয়া গেলেন।

বাস্তবিক আমরাও ভাবিতেছি। রাবণ কি করিয়া এত উদার, এত মহৎ হইল? কিন্তু এই-ই রাবণের নিত্যকার রূপ। মনে পড়িয়া গেল রাবণের অতীতের কথা। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির দ্বারের দ্বারী জয় বিজয় নামধারী পরম ভক্ত মর্ত্ত্যে রাক্ষসকুলে জন্ম লইয়াছেন—অভিশপ্ত হইয়া। আজ মুক্তি সন্নিকটে, তাই রাবণের এত আগ্রহ এত উৎসাহ।

(৫)

অশোকবনে চেরিবেষ্টিত আলুলায়িতকুন্তলা ক্রন্দনরতা সীতা ভূমিতলে পড়িয়া আছেন। লঙ্কার রাণী মন্দোদরী ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মন্দোদরী, মা প্রকৃতিস্থ হও, বলিয়া সীতাদেবীর চরণ বন্দনা করিলেন। মহারাণীর আচরণে সীতাদেবী বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন।

মন্দো—দেবী ! মহারাজ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন ! যদি অনুমতি করো, তাহলে তোমার নিকট আসতে পারেন। মন্দোদরীর এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা আরও বিস্মিত হইলেন—কেন না রক্ষপতি ত অনেক দিন এই অশোকবনে সীতার নিকট আসিয়াছে, কিন্তু কই কোন অনুমতির ত অপেক্ষা রাখে নাই। যাহা হউক সীতাদেবী রাজাকে কুটীরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

মহারাজ ধীরে ধীরে দেবীর নিকট আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া দেবীকে বলিতে লাগিলেন—মা কমলা ! শোক পরিহার করো। তুমি যদি ইচ্ছা কর তোমাকে রাম দর্শন করাইতে পারি।

সীতা—প্রভুকে দেখাবে ? হ্যাঁ এখনই, এই মুহূর্ত্তে ! কিন্তু কে নিয়ে যাবে ?

রাবণ—কেন আমি।

সীতা—তুমি ? মনে মনে ভাবিলেন—আবার কোন্ অভিসন্ধি !

রাবণ—হ্যাঁ আমি। আজ আর আমি ছলনা বা মায়া দেখাতে আসিনি।

সীতা—তোমরা যে রাক্ষস ! তোমরা সব পারো ! একদিন বলপূর্ব্বক—না না আমি—

রাবণ—সেকথা আর তুলোনা মা ! তুমি মা ! আমি সন্তান ! মাতা পুত্রে যে প্রাণ-খোলা সম্বন্ধ। এখানে তো কোন দ্বিধা কোন সংশয় থাকতে পারে না ! আমরা রাক্ষস, দস্যু, অশিক্ষিত হতে পারি। কিন্তু আমাদেরও তো মা আছে। আমরাও তো মাতৃপুজা করি ! আমায় বিশ্বাস করো মা ! তোমাকে সত্যসত্যিই রামদর্শন করাবো।

সীতা খুসী হইয়া স্বীকৃতি দিলেন।

রাবণ—কিন্তু আমার একটা নিবেদন আছে—তুমি সেখানে নির্ব্বাক হয়ে থাকবে। আমি যা করতে আদেশ করব—নীরবে নির্ভাবনায় তা করে যাবে এবং যখন চলে আসবার জন্য আদেশ করব তখন বিনা আপত্তিতে আমার সঙ্গে আসবে ! প্রতিজ্ঞা কর ?

সীতাদেবী তাহাতে সম্মত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞাও করিলেন।

স্বর্ণ শিবিকায় সীতাকে আরোহণ করাইয়া লঙ্কেশ্বর ও লঙ্কেশ্বরী তাহা নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন গন্তব্য পথে।

সীতাদেবী রাজারাণীর এরূপ আচরণে মর্ম্মাহত হইলেন। ত্রিলোক বিজয়ী লঙ্কেশ্বর আর তাঁরই ধর্ম্মপত্নী কোমলাঙ্গী নারী মন্দোদরী নিজ স্কন্ধে

শিবিকা বহন করিয়া কষ্টসহিষ্ণুতার চরম পরিচয় দিতেছেন। না, না, এরূপ নির্য্যাতন তাহাদের আমি হইতে দিব না। এই ভাবিয়া দেবী ঐশ্বরিক শক্তি অবলম্বন করিলেন। শিবিকা হইতে শূন্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজারাণী হৃষ্টচিত্তে শিবিকা বহন করিয়া চলিলেন।

(৬)

কৌশল্যা ও সুমিত্রানন্দন পর্ব্বতোপরি দাঁড়াইয়া রাবণের অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ আনন্দাতিশয্যে চীৎকার করিয়া কৌশল্যা-নন্দন বলিয়া উঠিলেন—ভাই লক্ষ্মণ! আর আমাদের যুদ্ধেরও প্রয়োজন নেই, রাবণ বধেরও প্রয়োজন নেই।

লক্ষ্মণ—কেন দাদা!

রাম—দেখছ না! লঙ্কেশ্বর লঙ্কেশ্বরী নিজ স্কন্ধে সীতার শিবিকা বহন করে দেবীকে ফিরিয়ে দিতে আসছে।

লক্ষ্মণ ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—তাইতো দাদা। মা যে আসছেন। মা! মা! ওহো বহুদিন পরে মাকে আজ দেখতে পাবো। পুনরায় রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—দাদা! তবে বৃথা যজ্ঞ করে আর প্রয়োজন কি?

রাম—না ভাই, যজ্ঞ আমাদের করতেই হবে। নইলে বিধাতাপুরুষের আদেশ অমান্য করা হবে।

যথা সময়ে যথা স্থানে আসিয়া রাজারাণী শিবিকা অবতরণ করাইলেন।

রামলক্ষ্মণ দুই ভাই অগ্রসর হইয়া রাজারাণীকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন।

রাজারাণী তাঁহাদের দর্শন করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে উভয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এত রূপ! এত সৌন্দর্য্য! এই তো সেই নয়নাভিরাম রাম! আহা নয়ন যে আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না! এইরূপে রাজারাণী কতক্ষণ মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—রাম! আমায় ডেকেছ?

রামলক্ষ্মণ দুই ভাই পুরোহিত ও পুরোহিত পত্নীর চরণযুগল নিজ হস্তে ধৌত করিয়া দিয়া তাঁহাদের বরণ করিয়া লইলেন।

রাবণ—আমাকে কী যজ্ঞ সমাধা করতে হবে?

রাম—অভিচার যজ্ঞ!

রাবণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—অভিচার যজ্ঞ! এযে মরণ যজ্ঞ! কার মৃত্যু কামনায় এ যজ্ঞ?

রাম—সেই সীতা হরণকারী দুর্ব্বৃত্ত রক্ষপতির সংহারহেতুই এই যজ্ঞের অবতারণা করা হয়েছে।

শুনিয়া রাজারাণী শিহরিয়া উঠিলেন। পরে নিজদিগকে সামলাইয়া লইয়া রাবণ রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন—আমি যজ্ঞের যাবতীয় উপকরণ সঙ্গে করে এনেছি। তোমরা শুধু আমার আদেশ মত কাজ করে যাও।

রাজারাণী নিজ হস্তে যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন সমাধা করিয়া অতঃপর দুইটি আসন রচনা করিলেন এবং রামচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—এস রাম! তুমি এই দক্ষিণ আসনটীতে উপবেশন কর। এই বলিয়া লঙ্কেশ্বর সীতাদেবীকে শিবিকা হইতে আনয়ন করিয়া বাম আসনটীতে অর্থাৎ রামের বামে বসাইলেন। লক্ষ্মণ সীতাদেবীর চরণ স্পর্শ করিয়া 'মা! মা!' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সীতানাথ—'সীতা! সীতা'! বলিয়া তাঁহার করস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। অমনি পুরোহিত বাধা দিয়া বলিলেন—সাবধান, দেবীকে স্পর্শ করিও না। লক্ষ্মণ 'মা! মা!' বলিয়া, রাম 'সীতা সীতা' বলিয়া পুনঃ পুনঃ সীতাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন; তাঁহার কুশলাকুশল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! সীতা পুত্তলিকাবৎ নির্ব্বাক নিস্পন্দ। কেবল তাঁহার গণ্ড বাহিয়া নয়নাশ্রু নির্গত হইতেছিল।

পুরোহিত তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—রাম! স্থির হও! শান্ত হও! চুপ করে থাক, আমায় যজ্ঞ কার্য্য সমাধা করতে দাও।

রাবণ সহধর্ম্মীকে সঙ্গে করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। যজ্ঞাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাবণ মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া হোম করিতে লাগিলেন। আর যজ্ঞের আহুতি? রাবণ পুনরায় শিহরিয়া উঠিলেন! নিজের হৃদ্‌পিণ্ড নিজ হস্তে উপরাইয়া নিজ হস্তেই আবার যজ্ঞানলে নিক্ষেপ করিতে হইবে! পুনরায় কি ভাবিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন—ভাল হবে! বেশ হবে! রাবণের কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হবে। পাপী রাবণের মরাই উচিত। মৃত্যুঞ্জয়ী অভিলাষী রাবণ এবার মরে প্রকৃত মৃত্যুঞ্জয়ী হবে। না—না, আর দেরী নয়—এই বলিয়া পুরোহিত 'পুরোহিতকেই' আহুতি দিয়া যজ্ঞকার্য্য সমাধান করিলেন। আশ্চর্য্য! ভগবানের লীলা চাতুর্য্য বুঝা বড় কঠিন!

যজ্ঞ শেষ হইলে পর রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই আসিয়া পুরোহিতকে প্রণাম করিলেন। পুরোহিত, বিধাতা তোমাদের মঙ্গল করুণ, এই বলিয়া অশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রণাম করলে বটে, কিন্তু দক্ষিণা ত দিলে না। প্রণাম করে গুরু পুরোহিতকে যে দক্ষিণা দিতে হয় তা-ও কি জান না ?

রাম—কি চান বলুন। ধন রত্ন মণি মাণিক্য? বলুন এখনই আমি অযোধ্যা থেকে আনিয়ে দিচ্ছি।

রাবণ—হাসালে তুমি রাম। আমার লঙ্কাভাণ্ডারে সে সবের কি অভাব আছে ? তোমার অযোধ্যায় যে রত্নালঙ্কার আছে তার চতুর্গুণ আমার লঙ্কা-ভাণ্ডারে আছে।

রাম—তবে কি চাই বলুন ? অযোধ্যার সিংহাসন ? আমি হাসতে হাসতে তাও দিতে পারি।

রাবণ—সিংহাসন ? আমার লঙ্কার সিংহাসনের কাছে তুচ্ছ তোমার অযোধ্যার সিংহাসন। আমার স্বর্ণ-লঙ্কার স্বর্ণ-সিংহাসন—সে সিংহাসনের পাশে সমস্ত দেবতা বন্দী হয়ে আছে। স্বয়ং দেবরাজ পর্য্যন্ত।

রাম—তবে বলুন ? আজ আমার অদেয় কিছুই নেই। যদি আমার প্রাণ দিতে হয় তাও আমি অম্লান বদনে ত্যাগ করতে পারি।

রাবণ—তোমার প্রাণ ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! তোমার প্রাণ ! তুমি নও—তোমার প্রাণ ! তোমার বামে যে বসে আছে, সে-ই না তোমার প্রাণ ? তবে তাই হোক। এই বলিয়া রাবণ সীতার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া শিবিকায় চড়াইলেন।

রাম—এ কি প্রভু ! আমার প্রাণ-প্রিয় সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে পুনরায় নিয়ে যাচ্ছেন ! এ কিরূপ আচরণ ?

রাবণ—পুরোহিত তার মনের মত দক্ষিণা গ্রহণ করেছে শিষ্যের প্রিয়বস্তু লাভ ক'রে।

রাম—তবে তাকে কেন আনলেন—নিয়েই যদি যাবেন ?

রাবণ—মুর্খের মত কথা বলছ কেন ? তুমি না ক্ষত্রিয় তনয় ? যজ্ঞকারীর পাশে তার ধর্ম্ম-পত্নী না থাকলে কখনও যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় ? তোমার যজ্ঞ পুর্ণ করবার জন্য আমার মুক্তির পথ প্রশস্ত করবার জন্য সীতাকে সঙ্গে করে এনেছি। ত্রিলোক বিজয়ী দশানন কখনও কারও নিকট মাথা নত করে নাই—করবেও

না। সে তার মান রক্ষা করতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে—তথাপি সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে অপমানের বোঝা শিরে বহন করবে না। জেনে রেখো রাম—সীতাকে হরণ করেছি সীতাকে ফিরিয়ে দিতে নয়—সীতাকে হরণ করেছি নিজের মুক্তির জন্য। আগে রাবণের মুক্তি—তারপর সীতার মুক্তি। এই বলিয়া রাজারাণী শিবিকা স্কন্ধে লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

লক্ষ্মণ চীৎকার করিয়া মা, মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র হা সীতা, হা সীতা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ওদিকে দূর দূরান্তর হইতে রাবণের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে—মুক্তি দাও, মুক্তি দাও রাম।

'ডিমের মধ্যেই পাখির প্রথম জন্ম। তখনকার মতো সেই ডিমটাই তার একমাত্র ইদম্। আর কিছুই সে জানে না। তবু তার মধ্যে একটা প্রবর্তনা আছে বাইরের অজানার মধ্যে সার্থকতার দিকে। সেই সার্থকতা নেদং যদিদমুপাসতে। যদি খোলাটার মধ্যেই এক-শ বছর সে বেঁচে থাকত তাহলে সেটাকেই বলা যেত তার মহতী বিনষ্টি।

মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জড়প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবেই বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা। অহংকারকে ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি।'

—মানুষের ধর্ম্ম।

পৃঃ ২৪

বিশ্বের বৃহত্তম খালের উদ্বোধন *

প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পাঞ্জাবে বিশ্বের বৃহত্তম খালের উদ্বোধন করিয়াছেন। ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনার দুইটী বাঁধের মধ্যে নাঙ্গল বাঁধটী তৈয়ারী হইয়াছে। ভাক্রা বাঁধটীর কাজ আগামী শীতকালে সুরু হইবে।

নির্দিষ্ট সময়ের বৎসরাধিক কাল পূর্বেই নাঙ্গল খালের খনন কার্য শেষ হইয়াছে। হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে দুর্ভেদ্য ও দুরতিক্রম্য স্থানে ৪০ মাইল দীর্ঘ এই খালটি খননে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারেরা কোনও বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের এই স্বাবলম্বী কর্তব্যনিষ্ঠা ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও অনুপ্রেরণা জোগাইবে।

নাঙ্গল বাঁধের দ্বারা গঠিত সুবৃহৎ জলাধার হইতে নাঙ্গল খালে জল সরবরাহ করা হইবে। উহার মুখ্য কাজ হইবে দুইটী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং রূপারের নিকট মূল ভাক্রা খালে সেচের উদ্দেশ্যে জল সরবরাহ। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দুইটী যথাক্রমে জলাধারের ১২ মাইল ও ১৮ মাইল দূরবর্তী গাঙ্গুয়াল ও কোটলায় নির্মিত হইয়াছে। ঐ দুইটী কেন্দ্রে বর্তমানে ৯৬,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। প্রয়োজন অনুযায়ী পরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দেড়গুণ বাড়ান চলিবে। আগামী মাস হইতে গাঙ্গুয়াল কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে। দিল্লী নগরীও ঐ বিদ্যুৎ সরবরাহের দ্বারা উপকৃত হইবে। কোটলা কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ হইবে আগামী বৎসরের শেষের দিকে।

নাঙ্গল খালটীর যেখানে শেষ, সেখান হইতে মূল ভাক্রা খালটী আরম্ভ হইয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য ১০৮ মাইল। ঐ দুইটী খাল ও ভাক্রা খালের মূল শাখাটী মিলিতভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম পরিকল্পিত খাল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

নাঙ্গল বাঁধটীর নির্মাণকার্য ১৯৪৬ সালে আরম্ভ হইয়া ১৯৫১ সালে শেষ হয়। কিন্তু দ্বারের অভাবে এতদিন উহা অব্যবহার্য অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি অমৃতসরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দ্বার নির্মাণ করিয়া যথাস্থানে খাটান হইয়াছে।

---

* জ্ঞান ও বিজ্ঞান—জুন, ১৯৫৪, সংখ্যা হইতে গৃহীত।

ভাক্রা বাঁধটীর উচ্চতা ৬৮০ ফুট। উচ্চতায় ইহা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। ঐ বাঁধ নির্মাণের ফলে যে হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পরিধি প্রায় ৬০ বর্গ মাইল!

ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনার বিপুল কার্যাবলীর কিছু পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

১। মিশরের সাতটী সুবৃহৎ পিরামিডের দ্বিগুণ হইতেও ৫০ কোটি ঘন ফুট অধিক ইট ও পাথর উহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। খাল খনন করিতে ৩৫০ কোটি ঘন ফুট মাটী অপসারণ করিতে হইয়াছে।

৩। ১৫ লক্ষাধিক টন বিলাতী মাটী ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ১,১৭,০০০ টন লৌহ ও ইস্পাত, ১০,৪২,০০০ ঘন ফুট কাঠ, ২,৫০,০০০ টন কয়লা, ৭৫ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল, ১৮,০০,০০০ গ্যালন লুব্রিকেটিং তৈল, ৫৪,০০,০০০ গ্যালন ডিজেল তৈল, ৫৮,০০,০০০ গ্যালন জ্বালানী তৈল ও ১৫ লক্ষ পাউণ্ড গ্রীজ ঐ পরিকল্পনা রূপায়নে ব্যয়িত হইয়াছে।

নাঙ্গল জলাধারের অপরিমিত জলের সাহায্যে দুইটী কেন্দ্রে মোট ৯,০০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। ঐ বিদুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র দুইটীকে প্রয়োজন বোধে ভূমিকম্প নিরোধকল্পে রূপান্তরিত করা হইবে। ভাক্রা খালের জলের সাহায্যে প্রায় ১০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ প্রস্তুত করা চলিবে।

ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনায় মোট ১৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ঐ টাকা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণ লইয়া পাঞ্জাব পেপসু ও রাজস্থান গভর্ণমেণ্ট সরবরাহ করিবেন। কাজ সমাপ্তির ১০ বৎসর পর হইতে সেচকার্যে নিয়োজিত মূলধনের উপরে শতকরা ৩৲ টাকা হারে আয় হইবে। তাহা ছাড়া, ঐ পরিকল্পনার ফলে রাজ্যের দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রশমনের জন্য অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না। স্মরণ থাকিতে পারে যে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টকে বিগত ১৯৩৮ হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ঐ খাতে মোট ৩ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা সম্বন্ধে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য তথ্য

১। ভাক্রা বাঁধ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় উচ্চতম বাঁধ; খাড়া বাঁধসমূহের মধ্যে উহাই উচ্চতম।

২। মূল ভাক্রা খাল ও উহার শাখাসমূহের উভয় পার্শ্বে ৬৬ কোটি টালী ও ৩৮ কোটি ইট লাগান হইয়াছে।

৩। ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনাটী একদিনে শেষ করিতে ৭ কোটি শ্রমিকের প্রয়োজন হইত।

৪। ভাক্রা খাল ও উহার শাখাসমূহ খননের ফলে যে মাটী অপসারিত হয়, উহা দ্বারা ২০ ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট উচ্চ প্রায় ৯,২০০ মাইল দীর্ঘ সড়ক প্রস্তুত করা চলিত।

৫। ২৯ মাইল দীর্ঘ ভাক্রা-নাঙ্গল খালে ব্যবহৃত কাঁচা মালের দ্বারা ৯ বর্গ মাইল স্থানে ৬ ইঞ্চি পুরু মেঝে প্রস্তুত করা চলিত।

৬। ভাক্রা-নাঙ্গল খালের মাত্র ১ মাইল স্থান খনন করা সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত অফিসার ও কর্মচারীদিগকে প্রায় ২৫,০০০ মাইল স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে।

৭। ভাক্রা বাঁধের ১০টী কেন্দ্রে ৯০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। উহাই হইবে সমগ্র ভারত তথা এশিয়ার বৃহত্তম বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র।

৮। বর্তমানে যোগীন্দ্রনগর বিদ্যুৎ-কেন্দ্র হইতে সমগ্র পাঞ্জাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইয়া থাকে। উক্ত কেন্দ্রের প্রায় ২০ গুণ বিদ্যুৎ ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপন্ন হইবে।

৯। ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ২,৫০০ মাইল দীর্ঘ বিদ্যুদ্বাহী-তার খাটান হইবে। ঐ তারের সাহায্যে ১১,০০ হইতে ২,২০,০০০ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে।

———

১৫ই আগষ্ট

১৫ই আগস্ট ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। আত্মার মুক্তিভিক্ষু ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেহের বন্ধনের জ্বালা ভুলে গিয়েছিল। কেননা দেহকে গৌণ ও ব্যবহারিক বলে মানার ফলে মুখ্য ও পরমার্থ আত্মার মুক্তির জন্যে দেহের মুক্তির কোন প্রয়োজন-বোধকে সে তার দীর্ঘ দিনের চলার পথের মাঝখানে একদিন হারিয়ে ফেলল। সে বিস্মৃতির মূল্য সে কম দেয় নি। দীর্ঘ দাসত্ব যখন তাকে জর্জরিত করে ফেলেছে, তখন তারই প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিল দেহের অবস্থানক্ষেত্র নিজের দেশটাকে ভালবাসার প্রয়োজন-বোধ। বহু বীরের ফাঁসির রক্তে ভালবাসার জলজলে পথটা স্পষ্ট হয়ে উঠল দেশবাসীর চোখে। সেই পথ ধরে এলেন গান্ধীজী, দেশের প্রতি ভালবাসাকে যিনি সত্য শিব সুন্দরের সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। ক্রমে ভারতবর্ষ তার ঔপনিষদীয় বৈশিষ্ট্যে স্থিতি লাভ করার পথে এসে দাঁড়াল। ১৫ই আগস্টে এক দিন সে যে-স্বাধীনতা লাভ করল, তা শুধু আত্মবান হওয়ার গৌরবে মহিমান্বিত নয়, তা বিশ্বাত্মার জন্য কল্যাণবোধের অসাধারণ আত্মধর্মে উজ্জ্বল। মানুষের যে-কোন হওয়ার ভিতরে যখন পারস্পরিক কল্যাণবুদ্ধির অভাব ঘটে, তখনই তার মহতী বিনষ্টি। নিজে আত্মবান হওয়ার সাধনায় অন্যের আত্মবান থাকার অধিকারকে খর্ব না করার কল্যাণবুদ্ধিকে যে ভারতবর্ষ লাভ করেছিল, এইখানে সে বিশ্বগুরু।

তার সেই একদিনের বিস্মৃতিকে তাকে আজ ভুলে যেতে হবে—আজ তাকে জানতে হবে তার অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে দেশাত্ম-বোধের বিরোধ তো নেই-ই, বরং মুক্ত আত্মার মুক্ত বিচরণ ক্ষেত্র মুক্ত মাটি অপরিহার্য। এই কথা তাকে শোনাবার জন্য অধ্যাত্মক্ষেত্রে সমাধিস্থ পুরুষ শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর শ্রীশ্রীদুর্গা বন্দনায় লিখলেন,

ভারতের মহাশক্তি তিনি আদ্যাশক্তি,
রহুক আমার তাঁর শ্রীচরণে ভক্তি,
কবে বা তাঁর কৃপাতে, রত রবে মতি তাঁতে,
স্বদেশের তরে কবে হবে উন্মাদিনী ?
আমার স্বদেশ তাঁর শ্রীপদনলিনী (বা চরণদুখানি)।

উজ্জ্বলভারত

৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৬১

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীনিত্যগোপাল

শ্রীদুর্গা দীনতারিণী পরমা জননী,
আনন্দময়ী অভয়া পরমা শিবানী।
মহাজ্যোতির্ম্ময়ী তিনি চৈতন্যদায়িনী,
শিবানন্দ প্রদায়িনী শিবস্বরূপিনী,
মুক্তকেশী মনোরমা, কভু তিনি ঘনশ্যামা,
আভাময়ী অনুপমা অনন্তরূপিনী,
সারদা বরদা তিনি ত্রৈলোক্যতারিণী!

হিমালয়ে হেমাঙ্গিনী গৌরী গিরিবালা,
ভক্তের হৃদয়াকাশে চিন্ময়ী চপলা,
কমলাসনে কমলা, পুরুষোত্তমে বিমলা,
পরাভক্তি সুনির্ম্মলা মানসরঞ্জিনী!
মেনকা-মানসাকাশে উমা আদরিণী,
মেনকার মনোরমা অঙ্কসুশোভিনী
কভু বালা ভগবতী, কমলিনী ক্রীড়াবতী
বেদময়ী বেদবতী তিনি ওঁকারিণী,
মহাভাবময়ী শ্যামা শ্রীকৃষ্ণভাবিনী।

(তাঁর) সুচারু কটিতে শোভে সুবিচিত্র বস্ত্র,
শ্রীকর দশকে শোভে দিব্য দশ অস্ত্র,
দিব্য ভূষণে ভূষিত, দিব্য শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
তিনি দিব্য কিরীটিনী সুমনা মালিনী,
নিত্যজ্ঞান সরোবরে দিব্য সরোজিনী !

দক্ষিণ শ্রীপদ তাঁর ধর্ম্ম সিংহোপরে,
দিয়েছেন বামপদ অধর্ম্ম অসুরে,
কত তাঁহার করুণা, অধর্ম্মে ঘৃণা করে না,
অধমে তারিতে তিনি অধমতারিণী,
পতিত উদ্ধার হেতু পতিতপাবনী !

মায়া ভুজঙ্গিনী তাঁর শ্রীকরে অধীনে,
বদ্ধ করিবারে নারে তাহা ভক্তজনে,
বিষম বিষ অজ্ঞান, তাহা করে উদ্গীরণ,
মহাদেবী দুর্গা নিজে সে বিষবারিণী,
সে বিষে মরিলে তিনি মৃত্যুসঞ্জীবনী !
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্ম তিনি সত্য সনাতনী,
করুণাময়ী শ্রীকালী পরম কল্যাণী,
হয়ে মনসা রূপসী বিতরেন সুধারাশি,
(তিনি) অজ্ঞান বিষহারিণী সুধা স্বরূপিণী,
নিরুপমা নিত্যময়ী নিত্য নিরঞ্জনী।
গৌতমীয় তন্ত্র মতে তিনি কালাচাঁদ,
গোপিনী হরিণী-ধরা প্রেমময় ফাঁদ
তিনি পরমা সুন্দরী, শিবচন্দ্রে সুমাধুরী,
তিনি পরা শান্তি সুধা ভুবন মোহিনী।

ভারতের মহাশক্তি তিনি আদ্যাশক্তি,
রহুক আমার তাঁর শ্রীচরণে ভক্তি,
কবে বা তাঁর কৃপাতে, রত রবে মতি তাঁতে,
স্বদেশের তরে হবে কবে উন্মাদিনী !
আমার স্বদেশ তাঁর শ্রীপদনলিনী (বা চরণ দুখানি) !

শ্রীদুর্গা ও তাঁর স্বদেশমূর্তি

রেণু মিত্র

বিশ্ববিধাতার অপূর্ব বিধানে এক একটী ঋতু এক একটী মাধুর্য নিয়ে আসে—সবকেই ভাল লাগে। বর্ষাও ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে; আবার যখন শরতের মেঘমুক্ত সারা আকাশে একটা স্বচ্ছতার মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে যায় তখন সে-ও ভাল লাগে। সে স্বচ্ছতার মধ্যে যে বিশ্বশক্তির সঙ্গে আমাদের আর এক রকমের যোগ হয়। শরতের সে নীলিমা পরা শক্তিকে ধ্যান করবার উপযুক্ত অবসর। যে শক্তির এক কণা আমার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে, শক্তির সেই ব্যক্তি-প্রকাশের সঙ্গে শক্তির যে বিশ্বরূপ বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত হয়ে আছে, তার নিবিড় যোগের, একটা একাত্মবোধের ক্ষণ নির্দিষ্ট হয়ে আছে এই শরৎকালের একটি দিনে। শক্তিপূজার উপযুক্ত সময় তাই শরৎও ভাল লাগে।

অপহৃত রাজ্যলাভই হোক কিংবা মুক্তি অর্জনই হোক, যুদ্ধে জয়লাভই হোক কিংবা জীবনে ইষ্টলাভই হোক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দরকার বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোত ঐ পরাশক্তির আশীর্বাদ লাভ। মুক্তিপ্রয়াসী বৈশ্য সমাধিও তাই সেই শক্তিপূজা করেন, রাজ্যলাভেচ্ছু ভারতবর্ষেরই রাজা সুরথ সেই শক্তিরই আরাধনা করে' তাঁর অভীষ্ট লাভ করেন। কৃত্তিবাসের নবদুর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বধ-প্রয়াসী হয়ে তাই অকালেও সেই দুর্গাশক্তির বোধন করেন, আবার পরমার্থ ইষ্ট বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবার বাসনায় ব্রজগোপীবৃন্দ কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই দুর্গা শক্তি কাত্যায়নীরই পুজা করে ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে দিয়ে এই দুর্গাদেবীরই অর্চনা করিয়েছিলেন।

একই দেবী মোক্ষদাত্রীও, রাজ্য এবং যশ প্রদানকারীও। তাই চণ্ডীতে তিনি 'মুক্তেঃ হেতুভূতা সনাতনী' বলে পুজিতা, আবার তাঁরই কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে 'ধনং দেহি জনং দেহি'; প্রার্থনা করা হয়েছে 'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিযো জহি', 'ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি।' তাঁরই প্রার্থনায় বলা হয়েছে

'নমো রৌদ্রায়ৈ নমো জ্যোৎস্নায়ৈ নম অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ'। সর্বভূতের চেতনা বলে যেমন তাঁর পজিটিভদিককে বন্দনা করি, যেমন তাঁকে বলেছি বিষ্ণুমায়া, যেমন তাঁকেই দেখেছি বুদ্ধিরূপে, ক্ষান্তি-রূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, তুষ্টিরূপে, মাতৃরূপে, তেমনি চণ্ডী বন্দনায় ভারতবর্ষ একই নিঃশ্বাসে বন্দনা করেছে তাঁর নিগেটিভ দিকটাকেও। নিদ্রারূপেন সংস্থিতা তাঁকে প্রণাম জানিয়েছে, ক্ষুধারূপেন সংস্থিতা তাঁকে নমস্কার করেছে, ছায়ারূপেন সংস্থিতা তাঁর বন্দনা গেয়েছে ; তাঁকে দেখেছে তৃষ্ণারূপেও, ভ্রান্তি-রূপেও, লজ্জারূপেও। সর্ব্বভূতের বৃত্তিরূপে সেই শক্তিই প্রকাশিত, আর জাতি-রূপেও তিনিই বিকসিত। 'সব জাতিই দুর্গা।'

সমস্ত প্রার্থনা আর বন্দনা থেকে সেই পরা শক্তির সমগ্র রূপই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নিজেকে যিনি বলেছেন 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—তিনি তো সমগ্রই ; তাই মুক্তিরও তিনি হেতুভূত, আবার রাজ্যলাভেচ্ছু সুরথ, বিজয়লাভেচ্ছু অর্জুনেরও দেবী তিনিই। তাঁর এই সমগ্র রূপকে আমরা ধ্যান করি। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের শক্তিভূতা সনাতনী দুর্গাকে আমরা নমস্কার করি—'পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে'।

জাতিরূপে স্থিত পরাশক্তি শ্রীদুর্গাকে বন্দনা করে শ্রীনিত্যগোপাল লিখলেন,

> ভারতের মহাশক্তি তিনি আদ্যাশক্তি,
> রহুক আমার তাঁর শ্রীচরণে ভক্তি,
> কবে বা তাঁর কৃপাতে, রত রবে মতি তাঁতে,
> স্বদেশের তরে কবে হবে উন্মাদিনী ?
> আমার স্বদেশ তাঁর শ্রীপদনলিনী (বা চরণ দুখানি) !

পরা শক্তির এই দেশমাতৃকা রূপই ঋষি বঙ্কিমের ধ্যানে ফুটে উঠল—তিনি গাইলেন—

> ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
> কমলা কমল-দলবিহারিণী
> বাণী বিদ্যাদায়িণী নমামি ত্বাং
> নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্
> সুজলাং সুফলাং মাতরম্
> বন্দে মাতরম্।

ভারতের মহাশক্তি যে আদ্যাশক্তি, তিনিই আমার স্বদেশ, তিনিই মোক্ষদাত্রী, তিনিই জগৎ প্রতিষ্ঠার হেতু। সেই শ্রীদুর্গাশক্তির জাতিরূপ, স্বদেশরূপ যখন হারিয়ে ফেলি, বিস্মৃত হই, যখন তাঁকে কেবলই মোক্ষের কারণ বলে জানি, তখনই তাঁকেও মিথ্যে করে তুলি, নিজেরাও দ্বিধাখণ্ডিত হয়ে মিথ্যে হয়ে যাই। সমগ্র রূপ হারিয়ে গেলেই তো সব কিছুই অসত্য হয়। যিনি পরাশক্তি তিনিই মাতৃরূপে স্থিত আমার স্বদেশ, এ বোধ না জন্মালে জীবনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যে দ্বন্দ্বের ফলে আমাদের অধ্যাত্মজীবন আর রাজনীতি জীবনে কোন সম্পর্ক থাকে না, যেজন্য আমরা যারা রাজনীতি করি, অধ্যাত্মসাধনাকে তারা অকেজো বলে মনে করি, আর যারা অধ্যাত্মসাধক তারা রাজনীতিকে মিথ্যে বলে মানি।

কিন্তু ভারতবর্ষে অন্য একটি ধারাও ছিল—আজ সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সেখানে দেবীকে বাঙ্গালী কেবল দেবী করে রাখে নি, মেয়ে করে তার মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে—তারও পরে মাটীকেই সে দেবী বলে জেনেছে—স্বদেশকে দিয়েছে মাতৃত্বের পরম গৌরব ও স্থান। বঙ্কিমচন্দ্রে ভাষা পেল সেই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অনবদ্য অপূর্ব সঙ্গীত বন্দেমাতরম্-এ। মাটীও যে মা হন, বিশ্বের পরাশক্তি আদ্যাশক্তিই যে স্বদেশের মূর্তিতে রূপ পেয়েছেন —যেখানে তোমার আমার এই দেহখানা বিচরণ করছে—এ কথা তো আগে জানা ছিল না—তাই 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্' শুনে মহেন্দ্রের মুখে বিস্মিত মানুষ কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে, 'মাতা কে?' ভবানন্দ জবাব দেয় গান গেয়ে—

> শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
> ফুল্ল কুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
> সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্,
> সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মহেন্দ্র দেশকে মা বলতে জানে নি, শেখে নি—বলে, 'এ ত দেশ, এ ত মা নয়—'। কিন্তু আজ আমরা বুঝতে শিখেছি মাটীর মূল্য, জানতে শিখেছি যে মাটীতেই পরাশক্তির শেষ বিশ্রামস্থল। পাশ্চাত্য মাটীকে জড়কে মূল্য দিয়েছে—কিন্তু এই মাটী যে পরাশক্তিই, যিনি 'চেতনেত্যভিধীয়তে' বলে পূজিতা, মাটীই যে চৈতন্য—এ দৃষ্টি পাশ্চাত্যের নেই। এই দৃষ্টি দিতে হবে প্রাচ্যকে—মাটীই পরাশক্তি সেই আদ্যাশক্তি—সে ভাবে না জানলে মাটীর সত্যিকার মূল্য যেমন

প্রতিষ্ঠা হয় না, তেমনি এ ভাবে দেখলে মাটীর রূপ এবং ধর্ম্মও যায় বদলে। এই বদলে যাওয়া মাটীর পরিচয় আজ পাওয়া দরকার। অধ্যাত্মজগতের সমাধিস্থ পুরুষ শ্রীনিত্যগোপাল তাই লিখেছেন, 'আমার স্বদেশ তাঁর শ্রীপদনলিনী।' স্বদেশকে পরাশক্তিরই বিকাশ বলে দেখলেই স্বদেশকে বাদ দিয়ে অধ্যাত্ম-সাধনার প্রয়োজন হয় না। শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর 'বঙ্গভূমি' নামক ছড়াতে দেশমাতৃকার যে বন্দনা সঙ্গীত রচনা করে গেছেন আজ থেকে প্রায় সত্তর বৎসর আগে, তার থেকে আমরা শিখতে পারব আজকের দিনের আমাদের জীবনচলার ধারাটী হবে কি। এ যুগের সাধনা সমগ্রের সাধনা। তাঁর দেশমাতৃকার বন্দনায় শ্রীনিত্যগোপাল লিখেছেন,

'এই বঙ্গভূমি অতি সুশোভিত
কত মনোহর ভূষণে ভূষিত
দেবেন্দ্র-বন্দিনী ভক্তিপ্রবাহিণী,
স্নেহের প্রবাহ তাঁতে প্রবাহিত,
শুদ্ধ প্রেম সদা রয়েছে স্ফুরিত।
এ ভূমির তুল্য অন্য ভূমি নহে,
ইহার মহিমা তাই মন গাহে,
তাই প্রাণপটে আছেন অঙ্কিত,
আছেন হৃদয়ে তাই প্রকাশিত।
ধনধান্যপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের খনি,
পুণ্যময়ী ভূমি মোদের জননী,
ইহার মহিমা গাহ রে নিয়ত,
ইহার মহিমা হতেছে কীর্ত্তিত।
ইহার মহিমা গাহে সমীরণ,
সমস্বরে গাহে সর্ব্ব ভ্রাতাগণ
গাহিছে পুলকে শব্দ অনাহত,
গাহে অবিরাম ইহার চরিত।
ঐ 'বন্দেমাতরম্' সুললিত গীতে
ইহার মহিমা ঘোষিছে মহীতে
(আজি) নাচিছে উল্লাসে সবে পুলকিত
মাতার শ্রীনামে সবে আনন্দিত।'

'উচ্চতম ব্রহ্মজ্ঞান ও বিশ্বনাগরিকত্বের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের কোন বিরোধ তো নাই-ই বরং স্বদেশভক্তি না থাকিলে বিশ্বপ্রেম, ভগবৎপ্রেম বস্তুতন্ত্রহীন ক্লীবত্ব—ইহাই আমরা শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনে দেখিয়াছি। শ্রীনিত্যগোপাল একদিকে গাঢ় সমাধি ও অপর দিকে স্বদেশ এই দুইকে এক করিয়া বাঙ্গলার 'মহিমা' 'মহীতে' ঘোষণা করিলেন। 'বন্দেমাতরম্' নিত্যগোপালের সমাধির ভাষায়ও 'শ্রীনাম'। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিকে কোন্ সমাধিস্থ মহাপুরুষ এমন 'শ্রী' দান করিয়াছেন? বিশ্বপ্রেম ও দেশপ্রেমকে এক করিয়া জীবনে আস্বাদন করিবার কৌশল বা যোগ বাঙ্গালী নিত্যগোপালের শ্রীচরণতলে এতদিন অজ্ঞাতসারে বাঙ্গলা ভারতবর্ষ শিখিয়াছে; এইবার জ্ঞাতসারেই শিখিবে।' *

যুগসাধনার এই ধারা আমাদের আজ শিখে নিতে হবে। আজকের এই পুজার দিনে সে সাধনা শিখবার বিশেষ দরকার আছে। আমাদের অধ্যাত্ম জীবন আর দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যে মস্ত বড় ফারাক হয়ে আছে, তাকে ভরিয়ে দিয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুটো জীবনকে চালাতে হবে। আজকের পুজার দিনে শ্রীদুর্গাচরণ বন্দনা কালে আমরা যেন জানি এই পরা শক্তিই আমার স্বদেশ—রাজনীতি যখন করব, তখন যেন মনে রাখি ঐ শক্তিরই আরাধনা করছি। শ্রীদুর্গাচরণে অঞ্জলি দেবার সময় যেন মনে রাখি আমার দৈনন্দিন জীবনে আমার পিতামাতা স্বামী স্ত্রী পুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশী দেশবাসীর মধ্য দিয়ে এই আদ্যাশক্তিরই বিকাশ—তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে আমার যে ব্যবহারিক জীবন, সে সকল ব্যবহার এমনই যেন হয় যা দিয়ে সেই মহাশক্তিরই পুজা হয়। আমাদের স্বদেশ সেবা যে সেই মহাশক্তিরই পুজা সে কথা যদি বুঝতে পারি, রাজনীতির আবিলতা অনেকাংশেই তাহালে তিরোহিত হয়। আজকের এই পুজার দিনে এই যুগসাধনাই আমরা গ্রহণ করব যেন আমাদের জীবনটা সমগ্র হয়—একই ব্যাপকতর চিন্তাধারা দিয়ে যেন আমাদের অধ্যাত্ম জীবন আর আটপৌরে জীবন চালিত হয়। আমাদের মন্ত্র তন্ত্র জপ ধ্যান ধারণা এ সব যেন জীবনের বাইরে না থাকে। যে মন নিয়ে শ্রীদুর্গাপুজায় বন্দনা গাইব—

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধুত লিখিত গীতার অবধূতভাষ্য।

'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি! নমোঽস্তু তে ॥
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি! নমোঽস্তু তে ॥

তখন সেই মনোবৃত্তি নিয়েই যেন গাই

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

... ...

বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

একই মনোবৃত্তিতে ও একই সুরে জীবনের সব কাজ না করলে একদল হয় পুরোহিত সন্ন্যাসী আদর্শবাদী, আর একদল গৃহী বৈষয়িক রাজনীতিজ্ঞ বাস্তববাদী। নয়তো একই লোক তার পূজার সময় যেমন, তার কাজের জগতে তার উল্টো হয়ে দাঁড়ায়। এতে করে পুরোহিত সন্ন্যাসীর দল যেমন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে, বাস্তববাদীরাও তেমনি জীবনের আর একটা দিককে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করে। আর একই মানুষ যখন দিনে রাতে ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়, সমাজের পক্ষে সে যে বড় মস্ত গ্লানি।

এ গ্লানি থেকে, এ দ্বন্দ্ব থেকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে মুক্ত করতে আজকের এই পূজার দিনে আমরা সেই পরা শক্তি আদ্যাশক্তিকে বন্দনা করব, ধ্যান করব, যে একই শক্তির বিকাশ আমার অধ্যাত্ম জীবনে আর আমার আটপৌরে জীবনে, যাঁরই প্রার্থনায় বলব 'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি' কিংবা

'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥

অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুর্চ্চার্য্য বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়-বিভাবিনী।
কালরাত্রি র্ম্মহারাত্রি র্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রী স্তং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টি স্তথা তুষ্টি স্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ-সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥

মা আসিতেছেন

প্রতিভা রায়

শরৎ আসিল। সর্ব্বত্রই একটা সাড়া পড়িয়া গেল মা আসিতেছেন। মা কি সারা বছর ছিলেন না? মা ছিলেন সত্যই কিন্তু আমাদের কাছে না থাকার মতই ছিলেন। শরতের প্রকৃতি যেন মাকে বিস্মৃত এই সন্তানগণের হৃদয়ে মায়ের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। মায়ের স্নেহের স্নিগ্ধ শুভ্রতার প্রলেপ আজ প্রকৃতির সর্ব্ব অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রাণ তাই বলিতেছে মা আসিতেছেন।

মা আসিতেছেন মনে হইতেই একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম কোথায় এই প্রশ্নের জিজ্ঞাসু হইয়া একদিন শ্রীরাম-ভক্ত হনুমানের নিকট গিয়াছিলেন। হনুমানজী বলিলেন তোমার এই প্রশ্নের উত্তর ঐ নদী

তীরে যাইয়া মৎসগণের নিকট জিজ্ঞাসা কর। ব্রাহ্মণ তখন নদী তীরে যাইয়া প্রশ্ন করিল, মৎসগণ বল, ব্রহ্ম কোথায় থাকেন। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া মৎসগণ বলিলেন তোমার কথার উত্তর পরে দিতেছি, আমরা অত্যন্ত পিপাসাতুর তুমি আমাদের একটু জল দিয়া প্রাণ বাঁচাও। মৎসদের এই বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোমরা তো কম মূর্খ নও—জলের ভিতর থাকিয়া বলিতেছ জল দিয়া প্রাণ বাঁচাও? মৎসগণ বলিল, ব্রাহ্মণ, তুমি ততোধিক মূর্খ, ব্রহ্ম সাগরে দিবানিশি ডুবিয়া রহিয়াছ, আবার বল ব্রহ্ম কোথায়!

মা আসিতেছেন শুনিয়া তাই আজ মনে পড়িতেছে আমরা কেমন করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। যে মায়ের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেই মাকেই আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রতি বৎসর এই শরৎ রাণী আত্মবিস্মৃত আমাদের প্রাণে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার স্মৃতিকে জাগাইয়া দিবার জন্যই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের দুয়ারে আসিতেছেন, তবুও তো আমাদের জীবন দোলায় দোল দিতেছে না মায়ের আগমনি, তবুও তো আমরা জাগিলাম না। ব্রহ্ম কোথায় প্রশ্নের মতই আমাদেরও মা আসিতেছে মনে করা। মা আসিবেন কি? মা তো আসিয়াই আছেন,—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—জগতে আমি তো একাকী আমা ছাড়া আর কে আছে! এই বিশ্ব চরাচরে তো মায়েরই প্রকাশ, বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে মা বিরাজিত, মা-ই যে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, মা আসিতেছেন এ কথা ভাবটাই আমাদের অজ্ঞতার পরিচয় দিতেছে। মায়ের স্নেহের সাগরে আমরা ডুবিয়া রহিয়াছি। দিবানিশি নিখিলের ভিতর দিয়া অহরহ মায়ের স্নেহ আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে, নাই শুধু আমাদের সেই স্নেহ-স্পর্শ গ্রহণ করিবার মত অনুভূতি। মায়ের কোলে থাকিয়া তাই আমরা মাকেই বাদ দিয়া চলিয়াছি, সেইজন্যই ভাবিতে পারি মা শুধু বছরে তিন দিন আসেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—ঈশ্বরকে যে আমরা দিনরাত বাদ দিয়ে চলছি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি যদি সিকি পয়সাও হ'ত তা হলে তখনই সতর্ক হয়ে উঠতুম। কিন্তু সে বিপদ নেই; সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে, পৃথিবী আমাদের অন্ন দিচ্ছে, বৃহৎ লোকালয় তার সহস্র নাড়ী দিয়ে আমাদের সহস্র অভাব পূরণ করে চলেছে। তবে সংসারকে ঈশ্বরবর্জিত করে আমাদের কি অভাব হচ্ছে! হায়, যে অভাব হচ্ছে তা যতক্ষণ না জানতে

পারি ততক্ষণ আরামে নিঃসংশয়ে থাকি এবং সচ্ছল সংসারের মধ্যে বাস করে মনে করি, আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি।

কিন্তু ক্ষতিটা কী হয় তা কেমন করে বোঝানো যেতে পারে?

এইখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমার একটা স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগান বাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানিনে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন! তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন: তুমি এসেছ!

এই খানেই স্বপ্ন-ভেঙ্গে গেল। আমি ভাবতে লাগলুম—মায়ের বাড়ীতে বাস করছি, তাঁর ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি—তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই, কিন্তু যেন নেই এমনি ভাবেই সংসার চলছে। তাতে ক্ষতিটা কি হচ্ছে! তাঁর ভাঁড়ারের দ্বার তিনি বন্ধ করেন নি, তাঁর অন্ন তিনি পরিবেষণ করছেন, যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও তাঁর পাখা আমাকে বীজন করছে। কেবল ওইটুকু হচ্ছেনা, তিনি আমার হাতটি ধরে বলছেন না, 'তুমি এসেছ'! অন্নজল ধনজন সমস্তই আছে, কিন্তু সেই স্বরটি সেই স্পর্শটি কোথায়! মন যখন সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেইটিকেই চায় এবং চেয়ে যখন না পায়, কেবল উপকরণ-ভরা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়ায়, তখন অন্নজল তার আর কিছুতেই রোচে না'। শান্তিনিকেতন পৃঃ ৭

এই উপকরণ-ভরা সংসারে যে দিন মায়ের সেই স্নেহ স্পর্শের অভাবটুকু আমাদের জীবনে জাগিয়া উঠিবে, সেইদিন আমরা মায়ের জন্য আকুল হইয়া সারা বিশ্বে মায়ের স্পর্শটুকু খুঁজিয়া বেড়াইব। মা আছেন, মা আবার মা হইয়া বছরে বছরে আসেন-ও—সে শুধু আমাদের হাত ধরিয়া বলিতে আসেন 'তুমি এসেছ'। কিন্তু আমরা তো তাঁহার চরণ তলে শিশুর মত মা বলিয়া লুটাইয়া পড়ি না, তাই মায়ের সেই স্পর্শ, সেই স্নেহমাখা আহ্বানটুকু শুনিতে পাই না। আমরা আজ মায়ের কোলে থাকিয়াও মাহারা সন্তানের মতন

জীবন যাপন করিতেছি। মাকে ভুলিয়া আছি বলিয়াই রামপ্রসাদের মত বলিতে পারি না—'আমার মা আছে রে ঘরে'। আমাদের প্রাণ যেদিন মাকে ঘরে না পাইয়া হাহাকার করিয়া উঠিবে, আমাদের শূন্য ঘরে মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, সেই দিন হইবে মায়ের আসা সত্য; মা যদি সন্তানের হাত ধরিয়া না-ই বলিতে পারেন 'তুমি এসেছ', তাহা হইলে মায়ের আসার যে কোন অর্থই হয় না।

মায়ের সেই স্পর্শটুকু, সেই স্নেহমাখা সম্ভাষণটুকুই তো মানুষের জীবনে পরম ও চরম পাওয়া, মা যেমন আমাদের অপেক্ষায় আমাদের পথ চাহিয়া থাকেন, আমরাও অজানা সেই স্নেহের টানে যুগ যুগ ধরিয়া জন্মের পর জন্ম ছুটিয়া চলিয়াছি সেই স্নেহস্পর্শ, মায়ের সেই স্নেহের আহ্বান 'তুমি এসেছ' ইহারই সন্ধান করিয়া। কিন্তু হায় আমরা এমন করিয়াই আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছি যে, মাকে ভুলিয়া ছোট্ট গণ্ডির ভিতর নিজকে নিজের বোনা জালে জড়াইয়া ফেলিয়া জীবনকে ব্যর্থ করিতেছি।

মা আসিতেছেন, কবে এই বার্ত্তা আমাদের জীবনের দুয়ারে আঘাত হানিয়া বলিয়া যাইবে, যে আঘাতে মাকে বাদ দেওয়া শুধু উপকরণ ভরা পৃথিবীটা বিষাক্ত হইয়া উঠিবে। কবে আমরা মাতৃহারা শিশুর মত ব্যাকুল হইয়া হৃদয়ের কপাট খুলিয়া বাহির বিশ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া মায়ের আগমনকে জীবনে বরণ করিয়া লইব। মা যদি আমাদিগকে নাই-ই পান, তবে প্রতি বছর আমাদের নিকট মায়ের আসার কোন সার্থকতাই হয় না। জীব-চৈতন্যের সহিত বিশ্ব-চৈতন্যের মিলনেই তো মায়ের সেই স্নেহ স্পর্শ জীবনকে ভরপুর করিয়া তোলে। তখনই বিশ্বের জল-স্থল, আলো-বাতাস, অগণিত মানুষ, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ এমন কি বিশ্বের প্রতি ধুলি কণার ভিতর হইতেও মানুষ পায় মায়ের সেই স্নেহস্পর্শ, সেই স্নেহ আহ্বান 'তুমি এসেছ'।

মা আছেন ইহাও যেমন সত্য, আমরা মাকে চাই ইহাও তেমনি সত্য; আমাদের শুধু প্রয়োজন মায়ের স্বরূপকে জানা এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বরূপকে উপলব্ধি করা। এই জ্ঞানরূপ প্রদীপ আমাদের এই অন্ধকার ঘরে যেদিন জ্বলিয়া উঠিবে সেই দিন হইবে আমাদের জীবনে শারদীয়া উৎসব। বর্ত্তমানের যে প্রতি বৎসরের শারদীয়া উৎসব এ যে শুধু ব্যর্থ আয়োজনের আড়ম্বর মাত্র, এ উৎসবে মা কই? রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন। "আমরা যখন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুঁজে বেড়াই তখন

চার দিকে মাথা ঠুকতে থাকি, উছট খেতে থাকি, তখন কত ছোটো জিনিসকে বড়ো মনে করি, কত তুচ্ছ জিনিসকে বহুমূল্য বলে মনে করি, কত জিনিসকে আঁকড়ে ধরে বলি 'এই তো পেয়েছি', তার পর দেখি মুঠোর মধ্যেই সেটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়।

আসল কথা, এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্ছি। কিন্তু যেমনি একটি আলো জ্বালা হয় অমনি এক মুহূর্তেই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—অমনি এত দিনের এত খোঁজা, এত মাথা ঠোকার পরে এক পলকেই জানতে পারি যে, যা-সমস্ত আমার হাতে ঠেকছিল তাই আমার প্রার্থনীয় জিনিস নয়। যে মা এই সমস্ত ঘরটি সাজিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন তিনিই আমার যথার্থ কামনার ধন। যেমনি আলোটি জ্বলল অমনি সব জিনিস ছেড়ে দু হাত বাড়িয়ে ছুটে তাঁর কাছে গেলুম।

অথচ মাকে পাবামাত্রই অমনি তাঁর সঙ্গে সব জিনিসকেই একত্রে পাওয়া গেল, কোনো বিশেষ জিনিস স্বতন্ত্র হয়ে আমার পথের বাধারূপে আমাকে আটক করলে না। মাকে জানবামাত্র মায়ের এই সাজানো ঘরটি আমারই হয়ে গেল। তখন ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ হয়ে উঠল, তখন যে জিনিসের ঠিক যে ব্যবহার তা আমার আয়ত্ত হয়ে গেল, তখন জিনিসগুলো আমাকে অধিকার করল না, আমিই তাদের অধিকার করলুম।" শান্তিনিকেতন পৃঃ ৩৪১

পাওয়ার এই তো কৌশল, স্রষ্টাকে বাদ দিয়া সৃষ্টিকে ভোগ করিব কি করিয়া? উহা তো হাত ছাড়া হইবেই, মাকে বাদ দিয়ে মায়ের ঘরের উপকরণকে আমার করিতে গেলে তাহা যে আমার হইবে না সে, যে গুড়া হইয়াই যাইবে—এ বোধ আমাদের নাই। মাকে বাদ দিয়া তাই আমাদের প্রতি বৎসরের পুজার আয়োজন উপকরণ-ভরা অন্ধকার ঘরে হাতড়িয়া মরাই হইতেছে, আনন্দের কোন সন্ধানই দেখিতেছিনা। ব্যর্থ পুজার আড়ম্বরে মানুষের প্রাণ কেবল হাঁপাইয়া উঠিতেছে। মাকে পাইলেই বিশ্বের সব কিছু পাওয়া হয়। মা আমার আনন্দময়ী—মাকে বাদ দিয়া আনন্দের সন্ধান যে আমাদের বিভ্রান্তির চরণ পরিণতি।

আমাদের ব্যষ্টি জীবনের ক্ষুদ্র অহং-এর কঠিন শৃঙ্খল যে দিন মায়ের স্নেহ আহ্বানে গলিয়া গিয়া সমষ্টি জীবনের মাঝে একাত্মতা লাভ করিবে, সেই দিন, মা তুমি ও আমাদের মাঝে স্থিতি লাভ করিয়া বিশ্বমাতৃত্ব লাভ করিবে,

আমরাও তোমার মাঝে স্থিতি লাভ করিয়া বিশ্বাত্মিক হইব। মা, তোমার আসার বিজয় শঙ্খ তখন বাজিয়া উঠিবে বিজয়ার প্রীতি সম্মেলনে। মা তুমি আসিতেছ, সত্যই আসিতেছ, তোমার আসার মাঙ্গলিক ধ্বনিতে আমাদের সকল জড়তা সকল তন্দ্রালুতা কাটিয়া যাউক, তোমার বিশ্ব-ঘরে ভাই ভাইয়ের কোলাকুলির ভিতর দিয়া তোমার জগদম্বা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হউক। তোমার চরণতলে বসিয়া বিশ্বমূর্ত্তে মা আমার, তোমার সেবা করিয়া আমরা ধন্য হই।

উজ্জ্বল ভারত

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ভারত বিশাল উজ্জ্বল হবে
'বোমার' আলোকে নয়।
নয় কো স্বর্ণ মুদ্রা আলোকে
একথা সুনিশ্চয়।
আলোকিত হবে সে এই ভূলোকে,
জ্ঞান ধর্ম্ম ও সত্য আলোকে,
কাহারো ভীতির কারণ হবে না
নিজে সদা নির্ভয়।

২

সে জ্বালিবে হেথা বিশ্ব হিতের
    বিশ্ব জিতের আলো,
জগৎ হইবে বিশুদ্ধতর
    উন্নত, আর ভালো।
এ যে আমাদের আলোকের দেশ,
পুণ্য প্রভার পূত পরিবেশ।
কাল রাত্রির কুটিল কুয়াসা
    দেরী নাই কেটে গেলো।

৩

জগজ্জ্যোতির জগৎ ভারত—
    হেথা অমিতাভ রাজে,
দধীচির দেশ বজ্রে ইহার
    মাভৈঃ ধ্বনি যে বাজে।
'জাগৃহি' বাণী অণু কণিকায়,
সারা বিশ্বকে নিত্য জাগায়
সাধনা তাহার অমর হইয়া
    মর পৃথিবীতে রাজে

হজরত আব্দুল কাদের জিলানী

রেজাউল করীম

বর্ত্তমান জড়বাদী ও বস্তুতান্ত্রিক যুগে বিভ্রান্ত মানুষকে পথের নির্দ্দেশ দিতে পারেন এমন মহাপুরুষ পৃথিবীতে অতীতেও ছিলেন, এখনও আছেন। এই সব সাধকদের জীবনী পাঠ করিলে নিরাশার মধ্যেও আশার আলোক সঞ্চার হয়। যতই ইহাদের জীবনী লইয়া আলোচনা হইতে থাকিবে ততই দেশ ও সমাজের মঙ্গল। ইসলামের গৌরবময় যুগের একজন সাধকের জীবনী লইয়া আজ আলোচনা করিব। তাঁহার নাম হজরত আবদুল কাদের জিলানী। ইসলামের ইতিহাসে যাহারা সুফী সাধক মুরশেদ বা পীর বলিয়া সম্মানিত, আবদুল কাদের জিলানী তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই জন্য তাঁহাকে বড় পীরসাহেব বলা হয়। তিনি নিজের সাধনা বলে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন!

ইসলামের ইতিহাসে হজরত আবদুল কাদের জিলানীর মত আধ্যাত্মিক শক্তি আর কেহই লাভ করেন নাই। আজ তাঁহার প্রভাব কয়েকটি শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আবদ্ধ। তবুও একথা বলা ভুল হইবেনা যে তিনি এককালে সমগ্র মুসলিম জগতে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিয়াছিলেন। মুসলিম দার্শনিক আলগাজ্জালী দর্শনের দুরূহ তত্ত্ব বুদ্ধির দিক দিয়া আলোচনা করিয়া বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আবদুল কাদের সাহেব সেরূপ কোন দর্শন তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করেন নাই। জ্ঞান ও যুক্তি মার্গ অপেক্ষা ভক্তি মার্গের আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত সুফী কবি মৌলানা রুমীর মত কোন উচ্চাঙ্গের কবিতা লেখেন নাই। সুতরাং সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নাই। তাঁহার দুইখানি পুস্তক সমধিক প্রসিদ্ধ :—(১) ফতুহল্ গায়েব (অর্থাৎ রহস্য-মোচন) (২) আলগুলিয়া তুত্‌তালেবিন (অর্থাৎ ঐশ্বরিক সত্য অনুসন্ধানকারী)। এই দুইটী গ্রন্থে তাঁহার ভক্তিমূলক আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

আবদুল কাদের কুর্দ্দের অধিবাসী। তাঁহার জন্মভূমির নাম জিলান। সেই জন্য তাঁহাকে "জিলানী" বলা হয়। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ

"তাবারিস্থানের" অপর পার হইতে আসিয়া কুর্দিস্থানে বসবাস করিতে থাকেন। বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া তিনি "মুহিউদ্দিন" আখ্যা লাভ করেন। "মুহিউদ্দিন" কথাটার অর্থ ধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী। বাস্তবিকই তিনি ধর্ম্মের ব্যাপারে উদাসীন লোকের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়াছিলেন। হিজরী ৪৭০ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিলেন। হিজরী ৫৬১ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ছিল ৯০ বৎসর। ইংরাজি সন অনুসারে বলা যাইতে পারে যে দ্বাদশ শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি যখন সবেমাত্র আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ করেন তখন ইমাম গাজ্জলীর মৃত্যু হয়।

অপরাপর আধ্যাত্মিক বিদ্যায় পারদর্শী সাধকের মত তিনি উচ্চবংশ সম্ভূত। ইসলামের পয়গম্বর হজরত মহম্মদের তিনি সাক্ষাৎ বংশধর। সাধক ও সুফীদের বাল্যজীবনের কাহিনী লইয়া নানা উপকথা সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের শৈশবকাল নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনার দ্বারা রহস্যাবৃত হইয়া আছে। হজরত আবদুল কাদেরের সম্বন্ধেও এইরূপ উপকথা ও অলৌকিক ঘটনা অপ্রতুল নহে। কথিত আছে যে তিনি যখন শিশু ছিলেন তখন গোটা রমজান মাসটাই উপবাস করিতেন। মুসলমানগণ যে সময়ে রোজা ভঙ্গ করে সেই সময় তিনি মাতৃ দুগ্ধ পান করিতেন। তাঁহার অতি ভক্ত অনুবর্ত্তিগণ এই ধরণের আরও বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহার জীবনের যেসব প্রামাণিক কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে একটা কথা নিঃসন্দেহ ভাবে জানা যায় যে, তিনি সত্যই একজন সাধক ছিলেন। তিনি গভীর ধ্যান দ্বারা এমন সত্য উপলব্ধি করিতেন যাহা সাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক শ্রেণীর মুসলমানের বিশ্বাস যে প্রত্যেক যুগে একজন 'কুতুব' জন্মগ্রহণ করেন। কুতুব কথার অর্থ আধ্যাত্মিক বিষয়ে নেতৃস্থানীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। হজরত আবদুল কাদেরকে তাঁহার যুগের কুতুব বলা হয়। বাস্তবিকই তিনি ঐশ্বরিক শক্তি প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছিলেন। এই দিক দিয়া তিনি সে যুগের অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে অদ্ভুত সাধনা করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এবং সেই সব সাধনার ফলে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার ভক্তগণ এই সব ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়াছেন,

কিন্তু একথা স্বীকার্য্য যে তিনি অল্প বয়সেই ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি চিরকাল পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন বাগ্‌দাদে বসবাস আরম্ভ করেন তখন দেশের সাধক ও সুফীগণ তাঁহার নিকট আসিতেন। তাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়া তাঁহার নিকট মাথানত করিতেন। কিন্তু মানুষের নিকট মাথানত করা ইসলাম ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। হজরত আবদুল কাদের তাহা জানিতেন। সেই জন্য যখনই কেহ তাঁহার নিকট মাথানত করিত, তখনই তিনি ব্যস্ত হইয়া তাহাতে বাধা দিতেন। এবং বলিতেন আমার পায়ের নিকট নহে, আমার স্কন্ধে মাথা রাখুন। তাঁহার এই আচরণে তাঁহারা চমকিয়া উঠিতেন এই দেখিয়া যে, পূর্ব্বের দিন তাঁহারা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, আর স্বপ্নে তিনি তাঁহাদিগকে ঠিক এই কথাটাই বলিয়াছিলেন। এই যে অতীন্দ্রিয় দর্শনের অভিজ্ঞতা তাহা একেবারে অবৈজ্ঞানিক নহে। অনেক সাধারণ লোক এই ভাবে ভাবী কালের নিদর্শন প্রাপ্ত হন। ইংরাজিতে ইহাকেই বলে Clairvoyana। হজরৎ আবদুল কাদের ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্য সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। এই সময় তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা ছিল বার হাজার। তিনি সপ্তাহে তিনবার সাধারণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। তিনি এই তিন দিনই ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। চল্লিশ বৎসর এই ভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব এত বৃদ্ধি পাইল যে বহু ইহুদী ও খৃষ্টান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কারয়াছিল। তৎকালের বড় বড় সাধক ও সুফী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার বচনামৃত পান করিতেন। বস্তুতঃ তিনি সে যুগের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সুফী বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতে লাগিলেন।

সাধকদের জীবন বিচিত্র। এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহারা প্রথম জীবনে সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করেন। কিন্তু পরিণত বয়সে সাধনার উচ্চ মার্গে উপনীত হন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন বাল্যকাল হইতে তাঁহাদের মনে এমন সব লক্ষণ দেখা যায় যে, দেখিলেই মনে হইবে ইহাদিগকে বিধাতা সাধকরূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন। হজরত আব্দস কাদের এই ধরণের সাধক ছিলেন। তাঁহার বাল্যকাল তাঁহার

ধর্মপরায়ণা মাতার তত্ত্বাবধানে কাটিয়াছিল। তিনি প্রথম হইতেই পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতে অতীব সত্যপরায়ণ ছিলেন। কেহ কখনও তাঁহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে দেখে নাই। সেই সুকুমার বয়সেই যেন তাঁহার উপর সত্য ভর করিয়াছিল। ঈশ্বর-প্রেমের বীজ সেই সময় তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। তিনি ঈশ্বর দর্শনের সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছিলেন। অন্তর চক্ষু দিয়া ঈশ্বর দর্শন সকল দেশের সাধু সুফীদের মধ্যে সম্ভব হইয়াছিল। ঈশ্বর দর্শনের সহিত ব্যক্তিগত পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার মধ্যে যেন একীভূত হইয়াছিল। বাল্যকালে তিনি উপলব্ধি করিতেন যেন দেবদূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অতীন্দ্রিয় লোকের সংবাদ দিতেছে। কে যেন তাঁহাকে দৈববাণী শুনাইতেছে :—হে কাদের, আরাম ও আনন্দ করিবার সময় নাই! তোমার সামনে বিরাট দায়িত্ব আছে। তুমি সেজন্য প্রস্তুত হও। ইহা নূতন কথা নহে, প্রত্যেক সাধকই এই ধরণের বাণী পান।

বাল্যকালে তাঁহার মাতা তাঁহার লেখাপড়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সে সময় বাগ্দাদ বিদ্যালয়কেন্দ্র ছিল। সুতরাং তাঁহার মাতা তাঁহাকে বাগ্দাদে প্রেরণ করিলেন। সে সময় পথ-ঘাট নিরাপদ ছিল না। দস্যুতস্করের ভয় ছিল। বহু লোক একসঙ্গে দূর দেশে যাতায়াত করিত। যাহারা এই ভাবে দলবদ্ধ হইয়া দূরদেশে যাইত তাহাদের সাধারণ নাম ছিল কাফেলা। তাঁহার মাতা এই কাফেলার সঙ্গে আবদুল কাদেরকে বিদ্যার্জ্জনের জন্য বাগ্দাদ প্রেরণ করিলেন। খরচপত্রের জন্য তাঁহাকে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। কিন্তু কেহ কাড়িয়া লয় এই ভয়ে সেই মুদ্রাকয়টি একটি কাপড়ের মধ্যে সিলাই করিয়া দিলেন যেন সহজে কেহ জানিতে না পারে। বিদায় দিবার সময় তাঁহার মাতা অশ্রু ছলছল চোখে বলিলেন যে, সর্ব্বদাই সত্যকথা বলিবে। তারপর যাত্রা আরম্ভ হইল। তিনি যে যাত্রীদলের সঙ্গে গিয়াছিলেন পথিমধ্যে সেই দলটি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। যাত্রী দলের লোকেরা ভয়ে কে কোথায় পলায়ন করিল। কিন্তু আবদুল কাদের পলায়ন করিতে পারিলেন না। দস্যুদের একজন এই সুকুমার বালককে জিজ্ঞাসা করিল তাহার কাছে কিছু আছে কিনা? বালক সত্য বলিতে অভ্যস্ত। সুতরাং নির্ভীক কণ্ঠে বলিল যে তাহার কাছে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। কিন্তু তাঁহার কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। বরং বালকটি বিদ্রূপ করিতেছে মনে করিয়া

তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরে সর্দ্দারের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে সর্দ্দার বালকটিকে দেখিতে চাহিল। সর্দ্দারের নিকটও বালকটি সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিল। তাহাকে তল্লাসী করার পর সত্যই তাহার বস্ত্রের ভিতর হইতে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেল। ইহা দেখিয়া সর্দ্দার চমকিত হইল। তখন সর্দ্দার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কেন তুমি সত্য কথা বলিয়া নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিলে?" উত্তরে বালকটি বলিল, "মায়ের আদেশে আমি সত্য কথা বলিয়াছি।" বালকের কথা শুনিয়া সর্দ্দার অত্যন্ত লজ্জিত হইল। তখনই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া যে, একটি সামান্য বালক একটি বারও মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করিল না। আর তাহারা পরম পিতা ঈশ্বরের আদেশ কত শত বার লঙ্ঘন করিতেছে। তারপর সেই সর্দ্দারের আদেশে যাত্রীদলের সমুদয় লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পন করা হইল। আর দস্যু সর্দ্দার দলবল সহ অনুতাপ করিয়া দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দিল। মহাসাধকের পুণ্য স্পর্শে এই ভাবেই পাপীতাপীর ভাবান্তর হয়।

অতঃপর আবদুল কাদের নিরাপদে বাগ্‌দাদের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। ঠিক সেই সময় তিনি একটি দৈববাণী শুনিলেন। খাজা খিজির যেন তাঁহাকে বলিলেন "সাত বৎসর বাগ্‌দাদে প্রবেশ করিবে না।" তিনি এই আদেশ অমান্য করিলেন না। টাইগ্রিস নদীর অপর পারে তিনি সাত বৎসর ধরিয়া ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সাত বৎসর তিনি গভীর ধ্যান ও সাধনা করিলেন। বিদ্যাও প্রভূত অর্জ্জন করিলেন। এই সময় তাঁহার জীবনে বহু পরীক্ষা হইল। বহু বিপদ আপদ আসিল। বহু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাও লাভ করিলেন। সাত বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সগৌরবে বাগ্‌দাদে প্রবেশ করিলেন এবং বাগ্‌দাদের তৎকালীন বিখ্যাত সুফী শেখ হামিদের আবাসে গমন করিলেন। তিনি এই তেজোদ্দীপ্ত যুবককে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কতকটা ভয়ে অভিভূত হইয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন না। কিন্তু রাত্রিতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। কে যেন তাঁহাকে বলিল তুমি কাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছ। তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন। পর দিন সাগ্রহে আবদুল কাদেরকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং গত দিনের আচরণের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন, আজ আমরা সম্মান পাইতেছি, কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্ত সম্মান আপনার প্রাপ্য !

এখন হইতে হজরত আবদুল কাদের বাগ্‌দাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। তিনি কিছুদিন বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া অবশেষে নিজেই একটি বিদ্যালয় খুলিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার বিদ্যাবত্তা, শিক্ষন-রীতি ও অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির কথা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাগ্‌দাদ নগরের শতাধিক পণ্ডিত একবার স্থির করিলেন যে তাঁহারা এক সঙ্গে একশতটি প্রশ্ন কাদেরকে করিবেন। তিনি কত জ্ঞান রাখেন তাহারই পরীক্ষা হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে আবদুল কাদের অতি সহজেই তাঁহাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্ন করিবার পুর্ব্বেই তিনি হাবভাব বুঝিয়া নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এক একজন পণ্ডিত বিশেষ বিশেষ বিষয় লইয়া প্রশ্ন করিলেন। একজনের পক্ষে সকল বিষয় জানা সম্ভব নহে। কিন্তু বাগ্‌দাদের পণ্ডিতগণ অবাক হইয়া দেখিলেন যে, আবদুল কাদেরের জ্ঞানের অগোচর কিছুই নাই। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, কাদেরের জ্ঞান তাঁহাদের জ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী। তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইল ; ক্রমেই তাঁহার বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। শুধু বিদ্যাদান করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি অবসর সময়ে নানাবিধ কার্য্য করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাহা জনহিতে বিলাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন ফকিরের ঘরে আগামী কালের জন্য কিছুই সঞ্চিত করিয়া রাখা ঠিক নহে। আজ যাহা উপায় হইবে তাহা আজ খরচ করিতে হইবে। কল্যকার ভার বিধাতার হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ‘অপরিগ্রহ’ আদর্শের তিনি প্রতীক ছিলেন। তাঁহার গৃহের দ্বার সর্ব্বদাই মুক্ত থাকিত। যাহাদের খাবার ছিল না, তিনি তাহাদিগকে খাইতে দিতেন। যাহাদের আশ্রয় নাই তাহাদিগকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিতেন। তিনি বলিতেন যে ধর্ম্মের দিক দিয়া যে দরিদ্র, তাহাকে সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতে হইবে। আর যাহারা দরিদ্র তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম পেট ভরিয়া খাইতে দিতে হইবে। মানুষের দয়া দেখিলে তবেই ঈশ্বরের দয়ার উপর তাহাদের বিশ্বাস জন্মিবে।

তিনি সাধারণতঃ নিজের গৃহ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতেন না। কেবল মাত্র শুক্রবারে দ্বিপ্রাহরিক প্রার্থনার সময় মসজিদে যাইতেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিয়া কাটাইয়া দিতেন। প্রার্থনার পর শেষ

রাত্রে নিজের গোপন প্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইতেন। সেইখানে ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। কেহ তাঁহার এ ধ্যান ভাঙ্গিতে পারিত না। খলিফা পর্য্যন্ত আসিলে তাঁহার দর্শন পাইতেন না। তাঁহার আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে আলোচনার সময় বেশী কথা বলিতেন না। অল্প কথায় সমস্ত বিষয় বুঝাইবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি বাস্তব উদাহরণ দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। বস্তুতঃ হজরত আবদুল কাদের ধর্ম্মের এমন এক মহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন যাহা দীর্ঘ শতাব্দী পরেও ম্লান হয় নাই। তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ব্যক্তিগত চরিত্র এই দুইয়ের সমন্বয় করিয়া ছিলেন। ভারতের মুসলমানগণ তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুফী ও পীর বলিয়া মনে করে। তাঁহার বংশধরগণ নানাস্থানে মসজিদ খানকা বা আস্তানা রচনা করিয়া তাঁহার আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত সাধক। কত শত মানুষ তাঁহার অমৃত বাণী পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে। আজ তাঁহার কৃপা ভিখারী হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি, আনন্দকে দেখছি নে; সেইজন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে। আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি।

—রবীন্দ্রনাথ

মহাভারতের বিরাট পর্ব

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

সৈরিন্ধ্রীকে দেখে রাণী সুদেষ্ণা বললেন, দেখ সৈরিন্ধ্রি, তোমাকে নিয়ে রাজ্যে মহাভয় উপস্থিত হয়েছে, তোমার গন্ধর্ব স্বামীগণ কীচক বধ করেছে, জনসভা মৎস্যরাজকে অনুরোধ করেছে রাজ্য থেকে তোমাকে বিদায় দিতে। এত বড় কীচককে যারা বধ করল, না জানি তাদের কত বল, এই জন্যই প্রজাদের আতঙ্ক। তাই বলছি

গচ্ছ সৈরিন্ধ্রি ভদ্রং তে যথাকামংচরাবলে।
বিভেতি রাজা সুশ্রোণি গন্ধর্বেভ্যঃ পরাভবাৎ ॥

সৈরিন্ধ্রী—মিনতি করে বলছি আর একটু সময় দিন, মাত্র তেরটী দিন, তারপর আমার গন্ধর্ব স্বামীগণ এসে আমায় নিয়ে যাবেন, আপনার রাজ্যেরও অশেষ কল্যাণ করে যাবেন—করিষ্যন্তি চ তে প্রিয়ম্।

বিরাট রাজপুরীতে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতচর্যার কাল প্রায় অবসান হয়ে আসছে। এমন সময় এক দিন খবর এল ত্রিগর্তের (জালন্ধর—পাঞ্জাব) অধিপতি সুশর্মা মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করেছেন। সমস্ত সৈন্য নিয়ে মৎস্যরাজ সুশর্মার আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য অভিযান করলেন—সঙ্গে কঙ্ক (যুধিষ্ঠির), বল্লব (ভীমসেন) গ্রন্থিক (নকুল) ও তন্তিপাল (সহদেব)। রাজধানী একরূপ অরক্ষিত রইল।

পরের দিন বিপুল কৌরব বাহিনী নিয়ে দুর্যোধন মৎস্যরাজ্যের উত্তর দিক আক্রমণ করলেন, বিরাটের ষাট হাজার গোধন হরণ করলেন—

ষষ্টিং গবাং সহস্রাণি কুরবঃ কলয়ন্তি তে।

এরই নাম উত্তর গোগ্রহ (গোহরণ)।

গুপ্তচরের মুখে যখন দুর্যোধন শুনলেন পাণ্ডবদের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা, বিরাট সেনাপতি কীচক বধের রহস্যময় কাহিনীটীও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তখন পাণ্ডবগণ বিরাট রাজ্যে আত্মগোপন করেছে, কীচক বধের সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট—দুর্যোধনের এ সন্দেহ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। ওদিকে

কীচকের অত্যাচারে সুশমা ইতিপূর্বে অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়েছিলেন, মৎস্যরাজের প্রতি সুশর্মার বিদ্বেষ দুর্যোধনের সুবিদিত ছিল। কুটীল দুর্যোধন তাই সুশর্মার সঙ্গে পরামর্শ করে দু'দিক দিয়ে একই সময়ে মৎস্য রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এইরূপ বিপদ প্রায়ই হত। মহাভারতের যা কেন্দ্রস্থ ঘটনা, কুরুক্ষেত্রের নরমেদযজ্ঞ, তারই উদ্ভব হয়েছিল জ্ঞাতি বিরোধের ফলে। এই আত্মকলহে ভারত বার বার পরের পদানত হয়েছে।

গোপগণের অধ্যক্ষ রাজধানীতে এসে বিরাটের পুত্র ভূমিঞ্জয় বা উত্তরকে বলল—রাজপুত্র, মহারাজ আপনাকেই এই শূন্য রাজধানীর রক্ষক নিযুক্ত করে রেখে গেছেন, আপনি শীঘ্র গোধন উদ্ধারের ব্যবস্থা করুণ।

রাজপুত্র হি তৎ প্রেপ্সুঃ ক্ষিপ্রং নির্যাহি বৈ স্বয়ম্।
ত্বাং হি মৎস্যো মহীপালঃ শূন্যপালমিহাকরোৎ ॥

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভীরু উত্তর আস্ফালন করে বললেন, আমি সেখানে ছিলাম না বলেই কৌরবগণ গোধন হরণ করেছে। সৈন্য সামন্ত সারথি—সমস্তই পিতা নিয়ে গেছেন। উপযুক্ত যন্তা (সারথি) পেলে আমি এখনই যুদ্ধে যেতে পারি এবং এমন যুদ্ধ করতে পারি যা দেখে কৌরবগণ ভাববে স্বয়ং অর্জুন যুদ্ধে এসেছেন।

সৈরিন্ধ্রী সেখানে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। উত্তরের মুখে আত্মশ্লাঘা এবং বার বার অর্জুনের উল্লেখ তিনি সইতে পারলেন না।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভাষতশ্চ পুনঃ পুনঃ।
নামর্ষয়ত পাঞ্চালী বীভৎসোঃ পরিকীর্তনম্ ॥

দ্রৌপদী ধীরে ধীরে বললেন, আমাদের বৃহন্নলা পূর্বে অর্জুনের সারথ্য করতেন। এঁরই সাহায্যে অর্জুন নিবিড় খাণ্ডব বন দগ্ধ করে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেছিলেন। অস্ত্রবিদ্যায় ইনি অর্জুনের চেয়ে একটুও কম নন। আপনি বৃহন্নলাকে সারথি করে অভিযান করুণ। আপনার কনিষ্ঠ ভগিনী উত্তরা বৃহন্নলাকে অনুরোধ করলে নিশ্চয় তিনি আপনার সারথি হবেন।

তাই হ'ল। নৃত্যশিক্ষক বৃহন্নলা ছাত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। বৃহন্নলাকে সারথি করে উত্তর যুদ্ধে যাচ্ছেন, এমন সময় উত্তরা এসে হাসিমুখে বললে

বৃহন্নলে আনয়েথা বাসাংসি রুচিরাণি নঃ ॥
পাঞ্চালিকার্থং চিত্রাণি সূক্ষ্মাণি চ মৃদূনি চ।
বিজিত্য সংগ্রামগতান্ ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ কুরূন্ ॥

বৃহন্নলা, তুমি ভীষ্মদ্রোণাদিকে জয় করে আমাদের পুতুলের জন্য নানা বর্ণের সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র এনো। অর্জুন সহাস্যে বললেন, উত্তর যদি জয়ী হন তবে নিশ্চয়ই তোমার পুতুলের জন্য বিচিত্র বস্ত্র আনবো।

অর্জুন বায়ুবেগে রথ চালিয়ে দিলেন। চক্ষের নিমেষে রথ সহরের বাইরে এসে পড়ল। সেখান থেকে দেখা গেল কৌরব সৈন্যের অগণিত শিবির পড়েছে, হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, সৈন্যগণের কিলকিলা শব্দও শোনা যাচ্ছে। তা দেখে রোমাঞ্চিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে বিরাটপুত্র বললেন, বৃহন্নলে, এ আবার কোথায় নিয়ে এলে? কৌরব বাহিনী যে এত বড় তা তো আমি ভাবি নি। আমার সৈন্য নেই, আমি বালক, যুদ্ধে অনভিজ্ঞ। যুদ্ধে আর কাজ নেই, তুমি রথ ফিরাও।

সোঽহমেকো বহূন্ বালঃ কৃতাস্ত্রানকৃতশ্রমঃ।
প্রতিযোদ্ধুং ন শক্যামি নিবর্তস্ব বৃহন্নলে ॥

অর্জুন—শত্রু সৈন্য দেখেই তোমার এত ভয়? আসবার সময় তো অন্তঃপুরে খুব গর্ব করছিলে—অন্তঃপুরে শ্লাঘমান—এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? অপহৃত গোধন উদ্ধার করে না ফিরলে সকলে তোমায় উপহাস করবে।

কৌরবগণ মৎস্যরাজ্যের ধন হরণ করুক, নরনারী আমাকে উপহাস করুক, এই বলে কুণ্ডলধারী ভীত উত্তর মান মর্যাদা দর্প ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথ হতে লাফিয়ে পড়ে বেগে দৌড় দিলেন।

কামং হরন্তু মৎস্যানাং ভূয়াংসঃ কুরবো ধনম্।
প্রহসন্তু চ মাং নার্যো নরা বাপি বৃহন্নলে ॥

অর্জুনও লাফিয়ে পড়ে শতপদ গিয়েই তার চুল ধরে বললেন

নৈষ পূর্বৈঃ স্মৃতো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্য পলায়নম্।
শ্রেয়স্তে মরণং যুদ্ধে ন ভীতস্য পলায়নম্ ॥

অসহায় উত্তর কাতরভাবে বললেন, কল্যাণী সুমধ্যমা বৃহন্নলা, আমার কথা রাখ, রথ ফিরাও, তোমাকে খাঁটী সোনার শত নিষ্ক (মুদ্রা) মণি মুক্তা মত্ত মাতঙ্গ দেব, বেঁচে থাকলেই মানুষের মঙ্গল হয়। নির্বতয় রথং ক্ষিপ্রং জীবন্ ভদ্রানি পশ্যতি ॥

ভয়ব্যাকুলিত উত্তরের মলিন মুখ দেখে অর্জুন হেসে বললেন, আমাকে অত ঘুষ দেবার প্রয়োজন নেই। ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে তোমার এত ভয়! এস রথে উঠ, আমিই যুদ্ধ করব, তুমি আমার সারথি হও। যন্তা ভব নরশ্রেষ্ঠ যোৎস্যেঽহং কুরুভিঃ সহ॥ ভয়ার্ত উত্তর নিতান্ত অনিচ্ছায় রথ চালিয়ে দিলেন এবং অর্জুনের নির্দেশমত শ্মশানের কাছে এক শমীবৃক্ষের নিকট রথ থামালেন।

অর্জুন—ঐ দেখ শমীবৃক্ষে পাণ্ডবদের ধনু শর ধ্বজ কবচ বাঁধা রয়েছে। রাজপুত্র, ভয় পেয়ো না, গাছে উঠে ঐটী নামিয়ে আন, ওটা স্পর্শ করলে তুমি পবিত্র হবে।

বৃক্ষ থেকে অস্ত্র পেড়ে এনে উত্তর বন্ধন খুলে ফেললেন। সূর্যের প্রভার মত দীপ্তিমান সেই সব অস্ত্র দেখে উত্তর ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে বললেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণের অস্ত্রশস্ত্র এখানে রয়েছে, কিন্তু তাঁরা কোথায়?

অর্জ্জুন উবাচ

অহমস্ম্যর্জ্জুনঃ পার্থঃ সভাস্তারো যুধিষ্ঠিরঃ।
বল্লবো ভীমসেনশ্চ পিতুস্তে রসপাচকঃ॥
অশ্ববন্ধোঽথ নকুলঃ সহদেবশ্চ গোকুলে।
সৈরিন্ধ্রীং দ্রৌপদীং বিদ্ধি যৎ কৃতে কীচকা হতাঃ॥

আমি অর্জ্জুন, সভাসদ কঙ্কই যুধিষ্ঠির, তোমার পিতার পাচক বল্লবই ভীমসেন, অশ্বশালা আর গোশালার অধ্যক্ষ নকুল-সহদেব। সৈরিন্ধ্রীই দ্রৌপদী, যাঁর জন্য কীচক মরেছে।

উত্তর—আপনার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা। অর্জুনের দশটী নাম আছে, যদি বলতে পারেন তবে আপনার সব কথা বিশ্বাস করব। অর্জুন—তবে শোন

অর্জ্জুনঃ ফাল্গুনো জিষ্ণুঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ।
বীভৎসুর্বিজয়ঃ কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ॥

উত্তর—তবুও বিশ্বাস হচ্ছে না। অর্জুন সার্থকনামা বিরাট পুরুষ, তাঁর কোন নাম নিরর্থক নয়। কেন তাঁর এই নামগুলি হয়েছিল বলুন তো দেখি?

অর্জ্জুন উবাচ

সর্ব্বান্ জনপদান্ জিত্বা বিত্তমাচ্ছিদ্য কেবলম্।
মধ্যে ধনস্য তিষ্ঠামি তেনাহুর্মাং ধনঞ্জয়ম্॥

অভিপ্রয়ামি সংগ্রামে যদহং যুদ্ধদুর্মদান্।
নাজিত্বা বিনিবর্ত্তামি তেন মাং বিজয়ং বিদুঃ॥
শ্বেতা রজতসঙ্কাশা রথে যুজ্যন্তি মে হয়াঃ।
সংগ্রামে যুদ্ধমানস্য তেনাহং শ্বেতবাহনঃ॥
উত্তরাভ্যাঞ্চ পূর্ব্বাভ্যাং ফল্গুনীভ্যামহং দিবা।
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্গুনং বিদুঃ॥
পুরা শক্রেণ মে দত্তং যুধ্যতো দানবর্ষভৈঃ।
কিরীটং মূর্দ্ধি সূর্য্যাভং তেনাহুর্মাং কিরীটিনম্॥
ন কুর্য্যাং কর্ম্ম বীভৎসং যুধ্যমান কথঞ্চন।
তেন দেবমনুষ্যেষু বীভৎসুরিতি মাং বিদুঃ॥
উভৌ মে দক্ষিণৌ পাণী গাণ্ডীবস্য বিকর্ষণে।
তেন দেবমনুষ্যেষু সব্যসাচীতি মাং বিদুঃ॥
পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং বর্ণো মে দুর্লভো যতঃ।
করোমি কর্ম্ম শুক্লঞ্চ তস্মান্মামর্জ্জুনং বিদুঃ॥
অহং দুরাপো দুর্দ্ধর্ষো দমনঃ পাকশাসনিঃ।
তেন দেবমনুষ্যেসু জিষ্ণুর্নামাস্মি বিশ্রুতঃ॥
কৃষ্ণ ইত্যেব দশমং নাম চক্রে পিতা মম।
কৃষ্ণাবদাতস্য সতঃ প্রিয়ত্বাদ্বালকস্য বৈ॥

আমি সর্বদেশ জয় করে ধন আহরণ করেছি, তাই আমার নাম ধনঞ্জয়। যুদ্ধে শত্রুদের পরাজয় না করে আমি ফিরি না সেজন্য আমার নাম বিজয়। আমার রথে রূপার মত শাদা ঘোড়া যোজিত থাকে সেজন্য আমি শ্বেতবাহন। হিমালয় পর্বতে উত্তর ও পূর্ব ফল্গুনী নক্ষত্রের যোগে আমার জন্ম হয়েছিল তাই আমার নাম ফাল্গুন। দানবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমাকে সূর্যের মত প্রভাময় কিরীট পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেজন্য আমি কিরীটী। যুদ্ধকালে আমি কোন বীভৎস কর্ম্ম করি না, তাই আমার নাম বীভৎসু। উভয় হস্তেই আমি গাণ্ডীব আকর্ষণ করতে পারি, সেজন্য আমি সব্যসাচী। আমার শুভ্র (অকলঙ্ক) যশ চতুঃসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, আমি কখন কাল কাজ করি না, এজন্য আমার নাম অর্জুন (শুভ্র)। শত্রুবিজয়ী বলে আমার নাম জিষ্ণু। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালককে সকলে ভালবাসে, তাই বাবা আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ।

অর্জুনকে অভিবাদন করে উত্তর বললেন, জীবন আমার আজ ধন্য, আমি স্বচক্ষে আজ অর্জুনকে দেখলাম। কৌরবগণের সম্মুখীন হতে আমার আর ভয় নেই। স্বয়ং কৃষ্ণ বা ইন্দ্রের মত আপনার পরাক্রম, আমি তা শুনেছি। কিন্তু একটা কথা ভেবে আমি বিমূঢ় হয়েছি। আপনার দেহের গঠন ও রূপ পুরুষেরই যোগ্য, তবে কোন্ কর্মবিপাকে আপনার এই ক্লীবত্ব প্রাপ্তি হল।

কেন কর্ম্মবিপাকেন ক্লীবত্বমিদমাগতম্ ॥

অর্জ্জুন উবাচ

ভ্রাতুর্নিয়োগাজ্জ্যেষ্ঠস্য সংবৎসরমিদং ব্রতম্।
চরামি ব্রহ্মচর্য্যং বৈ সত্যমেতদব্রবীমি তে॥
নাস্মি ক্লীবো মহাবাহো পরবান্ ধর্ম্মসংযতঃ।
সমাপ্তব্রতমুত্তীর্ণং বিদ্ধি মাং ত্বং নৃপাত্মজ ॥

জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশে আমি এক বৎসর যাবৎ ব্রহ্মচর্য পালন করছি। আমি ক্লীব নই, পরাধীন ও ধর্মপাশে আবদ্ধ বলে আমি নপুংসক সেজেছি। ব্রহ্মচর্য ব্রত আজ সমাপ্ত হয়েছে।

বেশ পরিবর্তন করে অর্জুন যুদ্ধ বেশে সজ্জিত হলেন। রথ চলছে। উত্তর বললেন, আপনি একা কেমন করে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন?

অর্জুন—বীর, ভয় পেয়ো না। ঘোষযাত্রায় যখন আমি মহাবল গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন কে আমার বন্ধু ছিল—কস্তদাসীৎ সখা মম? যখন আমি নিবাতকবচ নামক দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন কে আমার সহায় ছিল—কঃ সহায়স্তদাভবৎ? মনে ভেব না আমি একা, আমি কৃষ্ণের শরণাগত, স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় উমানাথ আমার আশ্রয়, গুরু দ্রোণ, ইন্দ্র কুবের যম বরুণ অগ্নিদেবের আশীর্বাদ সর্বদা আমার মস্তকে বর্ষিত হচ্ছে। বীর, তোমার মনের সন্তাপ দূর কর, দ্রুত রথ চালাও।

উপজীব্য গুরুং দ্রোণং শক্রং বৈশ্রবণং যমম্।
বরুণং পাবকঞ্চৈব কৃপং কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্ ॥
পিনাকপাণিনঞ্চৈব কথমেতান্ ন যোধয়ে।
রথং বাহয় মে শীঘ্রং ব্যেতু তে মানসোজ্বরঃ ॥

অর্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার দিলেন, দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন। বনপর্বতময় পৃথিবী কেঁপে উঠল, আকাশের পাখীরা ঘুরতে লাগল। রথের অশ্বগুলি নতজানু

হয়ে মাটীতে বসে পড়ল, ভীত উত্তরের হস্ত হতে অশ্বের বল্গা খসে পড়ল। অর্জুন তৎক্ষণাৎ লাগাম টেনে অশ্বগুলিকে তুললেন, উত্তরকে আলিঙ্গন করে আশ্বস্ত করলেন।

এদিকে কৌরব শিবিরে চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। দ্রোণ ভীষ্মকে বললেন, অর্জুন আসছে, এ শঙ্খধ্বনি অর্জুন ভিন্ন আর কারও নয়, তাদের ব্রত সমাপ্ত হয়েছে, তাই তারা আত্মপ্রকাশ করেছে। সৈন্যগণ, ব্যূহ রচনা কর, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এমন সময় ছুটী শর দ্রোণের পায়ের কাছে এসে পড়ল, আর ছুটী শর তাঁর কানের পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে চলে গেল। দ্রোণ বললেন—আর আমার সন্দেহ নেই, মহাবীর অর্জুন এসেছেন। বনবাস ও অজ্ঞাতচর্যা সমাপ্ত করে ছুই শর দিয়ে সে আমায় প্রণাম করল, আর ছুই শরে সে আমার কুশল প্রশ্ন করল।

ইমৌ হি বাণৌ সহিতৌ পাদয়োর্মে ব্যবস্থিতৌ।
অপরৌ চ ব্যতিক্রান্তৌ কর্ণৌ সংস্পৃশ্য মে শরৌ॥
নির্বর্ত্ত্য হি বনে বাসং কৃত্বা কর্ম্মাতিমানুষম্।
অভিবাদয়তে পার্থঃ শ্রোত্রে চ পরিপৃচ্ছতি॥

রথ কৌরব বাহিনীর এত কাছে এসে পড়ল যে সব বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অর্জুন বললেন, সব মহারথদের দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কোথায় গেল সেই কুরুকুলকুলাঙ্গার—ক্বাসৌ কুরুকুলাধমঃ? মনে হচ্ছে প্রাণের ভয়ে দুর্যোধন গোধন নিয়ে পালিয়েছে। নিরামিশ যুদ্ধ (যে যুদ্ধে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নেই) এখন করব না। দক্ষিণ দিকে রথ চালাও—দুর্যোধনকে জয় করে গোধন উদ্ধার করে এদিকে আসব।

অশ্বের মুখ ফিরিয়ে উত্তর দক্ষিণ দিকে রথ চালালেন। অর্জুনের অভিপ্রায় বুঝে দ্রোণ বললেন, দুর্যোধন এইবার পার্থ-সাগরে নিমজ্জিত হবে।

কিং নো গাবঃ করিষ্যন্তি ধনং বা বিপুলং তথা।
দুর্যোধনং পার্থজলে পুরা নৌরিব মজ্জতি॥

অবলীলাক্রমে অর্জুন দুর্যোধনকে জয় করে গোধন উদ্ধার করলেন। গরু-গুলি তখন পুচ্ছতুলে হাম্বা হাম্বা রবে খাটালের দিকে দৌড় দিল।

ঊর্দ্ধং পুচ্ছান্ বিধুন্বানা রেভমানাঃ সমন্ততঃ।
গাবঃ প্রতিন্যবর্ত্তন্ত দিশমাস্থায় দক্ষিণম্॥

এদিকে বিপুল কৌরব বাহিনী দুর্যোধনকে রক্ষা করবে বলে অর্জুনের পশ্চাৎ ধাবিত হয়েছে। এখানেই উত্তর গোগ্রহের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। বিরাটপর্বের কয়েকটী অধ্যায়ে মহাকবি তা বিবৃত করেছেন। অর্জুনের অমিত বিক্রম এই যুদ্ধেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমে প্রত্যেক মহারথের সাথে অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর কৌরবগণ মিলিতভাবে অর্জুনকে আক্রমণ করেন এবং পরাজিত হন। যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা আমরা করব না। এই যুদ্ধের কয়েকটী ঘটনার মধ্য দিয়ে অর্জুন চরিত্র কি ভাবে ফুটে উঠেছে তার দিকেই আমরা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

অর্জুন দেখলেন কৌরব বাহিনী তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। রথের ধ্বজ চিহ্ন দেখে অর্জুন উত্তরকে বললেন—ঐ দেখ পঞ্চতারা চিহ্নযুক্ত পিতামহ ভীষ্মের রথ। ঐ দেখ অশ্বত্থামার রথে ধনু চিহ্ন। ঐ দেখ আমার গুরুর রথে সোনার কমণ্ডলু। আচার্যের দিকে রথ নিয়ে চল। গুরু শিষ্যে আজ যুদ্ধ হবে। জাননা কি তুমি আমার গুরুর পরিচয়?

দীর্ঘবাহুর্মহাতেজা বলরূপসমন্বিতঃ।
সর্বলোকেষু বিখ্যাতো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥
বুদ্ধ্যা তুল্যো হ্যুশনসা বৃহস্পতিসমো নয়ে।
বেদাস্তথৈব চত্বারো ব্রহ্মচর্য্যং তথৈব চ ॥
সসংহারাণি সর্বাণি দিব্যান্যস্ত্রাণি মারিষ।
ধনুর্বেদশ্চ কাৎস্নেন যস্মিন্ নিত্যং প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
ক্ষমা দমশ্চ সত্যঞ্চ আনৃশংস্যমথার্জবম্।
এতে চান্যে চ বহবো যস্মিন্ নিত্যং দ্বিজে গুণাঃ ॥

আমার গুরু ত্রিভুবনখ্যাত দ্রোণাচার্য—দীর্ঘবাহু রূপবান্ অনন্ত শক্তির আধার। বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য, নীতিজ্ঞানে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। বেদবেদাঙ্গ, সমগ্র ধনুর্বেদ তাঁর করায়ত্ত। ব্রাহ্মণের সকল গুণ—দয়া ক্ষমা সংযম সত্য সরলতা তাঁতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।

দ্রোণার্জুন সমাগম—সকলে দেখে বিস্মিত হ'ল। হাসিমুখে অর্জুন আচার্যকে অভিবাদন করে বিনীত ভাবে বললেন—সমরদুর্জয় আচার্য, প্রতিহিংসার প্রেরণায় আমি যুদ্ধে আসি নি। যে অন্যায় কৌরবগণ আমাদের প্রতি করেছে তার কিছু প্রতিবিধান করতে চাই—প্রতিকর্ম চিকীর্ষবঃ। বনবাসে ও অজ্ঞাতবাসে যে কষ্ট সহ্য করেছি সে জ্বালা আজ জুড়াবো। নিষ্পাপ

আচার্য রুষ্ট হবেন না। আপনার পূর্বের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করুন। যুদ্ধেইহং প্রতিযোদ্ধব্যো যুধ্যমানস্ত্বয়াহনঘ ॥ আপনি বলেছিলেন, আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো, তাতে তোমার কোন পাপ হবে না।

গুরু শিষ্যের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। প্রাচীনকালে বলি ও ইন্দ্রের যেমন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল দ্রোণার্জুনের তেমান যুদ্ধ হতে লাগল। অর্জুনের শরে দ্রোণের দেহ ক্ষতবিক্ষত দেখে পুত্র অশ্বত্থামা বাধা দিতে এলেন। আচার্যকে রক্তাক্ত দেখে অর্জুন অশ্বত্থামার দিকে অগ্রসর হয়ে গুরুকে সরে যাবার সুযোগ দিলেন।

অন্তরং প্রদদৌ পার্থো দ্রোণস্য ব্যপসর্পিতুম্ ॥

ফাঁক পেয়ে দ্রোণ শরাঘাতে জর্জরিত দেহে প্রস্থান করলেন। এইভাবে একে একে মহারথগণ অর্জুনের কাছে পরাজিত হলেন। তখন সঙ্কুল যুদ্ধ (promiscuous fighting) আরম্ভ হ'ল। রক্তের নদী বয়ে গেল যুদ্ধে।

প্রাবর্তয়ন্নদীং ঘোরাং শোনিতোদাং তরঙ্গিণীম্ ॥

অর্জুনের তেজ কৌরবগণের সম্মিলিত শক্তি সহ্য করতে পারল না। জীবনে নিরাশ হয়ে কৌরবগণ রণে ভঙ্গ দিলেন। তখন অর্জুন সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করে মহারথগণের সংজ্ঞা লোপ করলেন। প্রিয় ছাত্রীর কথা মনে করে অর্জুন উত্তরকে বললেন, যাও, অচেতন থাকতে থাকতে এঁদের উষ্ণীষ খুলে নিয়ে এস—দ্রোণ ও কৃপাচার্যের শুভ্র বস্ত্র, কর্ণের পীত বস্ত্র, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধনের নীল বস্ত্র। পিতামহের কাছে যেয়ো না, তিনি বোধ হয় সংজ্ঞা হারান নি, তিনি আমার অস্ত্রের প্রতিঘাত জানেন—জানাতি মেঽস্ত্রপ্রতিঘাতমেষঃ ॥ অর্জুনের নির্দেশ মত উত্তর মহারথগণের সুন্দর সূক্ষ্ম রঙীন বস্ত্র খুলে আনলেন।

আচার্য দ্রোণের প্রতি অর্জুনের ব্যবহার আজকার কালে খুব লক্ষণীয়। দ্রোণ শত্রুপক্ষের সেনাপতি, সুতরাং অর্জুনের বধ্য, তথাপি অর্জুন গুরুর প্রাপ্য যে শ্রদ্ধা তা তাঁকে নিবেদন করলেন। পূজনীয়গণের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে অধিকার প্রকাশ করবার একটী ভঙ্গী আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নেশায় আমরা শুধু শিখেছি গুরুজনকে আঘাত দিতে। অতিমাত্রায় বুদ্ধির অনুশীলন করতে করতে আমরা প্রাণস্পর্শ হতে বঞ্চিত হয়েছি।

প্রাণকে হারিয়েছি বলেই আমরা শ্রদ্ধাও হারিয়েছি। আমাদের বর্তমান সমাজ পুজ্যপূজা ব্যতিক্রম দোষে কলুষিত। যাঁদের অনুগ্রহে আমরা বিশ্বের সহিত পরিচিত হয়েছি, যাঁদের আশীর্বাদে আমরা জ্ঞানলাভ করেছি, সেই পিতা-মাতা শিক্ষকের সব কথা আমরা গ্রহণ কবতে না পারি, কিন্তু তাঁদের অপমান করব কোন্ অধিকারে। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা হারালে প্রকৃতির স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ভেঙে যায় এবং সেই বিশৃঙ্খলার ফাঁক দিয়ে অভিশাপ নেমে আসে। মহৎ জনের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও নিজের অধিকার রক্ষা করা যে সম্ভব তা অর্জুন চরিত্রে বেশ স্পষ্ট। দ্রোণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেও অর্জুন কখনো নিজের সীমাকে অতিক্রম করেন নি। এই নিজের সীমাকে অতিক্রম না করবার, পুজ্যপূজা ব্যতিক্রম না করবার বিদ্যা আজ আমাদের শিখতে হবে। মহাভারতে এমন সব কথা আছে যা হয়ত আধুনিক মানুষের ধারণার বিরোধী। কিন্তু সেই সব বিসংবাদী বিষয় বাদ দিলেও ভারতগ্রন্থে যা আছে তা অতুলনীয়। জাতির কল্যাণের জন্য তাই আজ মহাভারতের রত্নময়ী কথা প্রচারের এত প্রয়োজন।

বিজয়ী অর্জুন নগরে ফিরছেন। শ্মশানের নিকট শমী বৃক্ষের পাশে রথ উপস্থিত হ'ল। পাণ্ডবগণের অস্ত্রাদি আবার শমীবৃক্ষে বেঁধে রাখা হ'ল। বৃহন্নলারূপ ধারণ করে অর্জুন উত্তরকে বললেন, ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণের সব কথা তুমি জেনেছ। মৎস্যরাজের কাছে আমাদের পরিচয় এখন দিওনা। তুমিই কৌরবগণকে পরাজিত করে গোধন উদ্ধার করেছ—এই কথা নগরে প্রচারের জন্য দূত পাঠাও।

ওদিকে মৎস্যরাজ কঙ্ক বল্লব প্রভৃতির সাহায্যে সুশর্মাকে জয় করে নগরে ফিরে শুনলেন উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করে কৌরব আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গেছেন। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বিরাট আদেশ দিলেন

কুমারমাশু জানীত যদি জীবতি বা ন বা।
যস্য যন্তা গতঃ ষণ্ডো মন্যেঽহং ন স জীবতি ॥

তোমরা শীঘ্র দেখ কুমার জীবিত না মৃত। একজন ক্লীব যার সারথি হয়ে গেছে, সে যে এখনও বেঁচে আছে, এ বিশ্বাস আমার হচ্ছে না।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রোত্তর কাল ও রবীন্দ্রনাথ

সন্তোষকুমার অধিকারী

রবীন্দ্রনাথের পর সাহিত্যে যুগপরিবর্তন ঘটেছে কিনা এ' নিয়ে অনেক বাদানুবাদ চলেছে ও এখনও চলছে। বাদানুবাদ চলা ভালোই, এমনকি সত্যিই যদি রবীন্দ্রোত্তর কোন যুগের সৃষ্টি বাংলাসাহিত্যে হ'য়ে থাকে তবে তা' একান্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের পর এমন কোন একটি লোককে বা সাহিত্যিক দলকেও আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা যাঁরা প্রকাশভঙ্গী, বিষয় ও আঙ্গিকের গুণে সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রযুগের সাহিত্যধর্ম একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তাঁর দীর্ঘ জীবনে এই সাহিত্যধর্মকে তিনি এমনভাবেই রক্ষা করেছেন যে, মাঝে মাঝে সন্দেহবাদীরা নানা ভাবে বিরোধের ঝোঁক তুললেও সাহিত্যধর্ম তার গতিপথকে অব্যাহত রেখেছে। অবশ্য এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই না যে, রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে সাহিত্য ধর্মহীন হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেকে আমরা যতই সরে যাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব আমাদের ততই জড়িয়ে ধরছে। অথচ সময়ের পরিবর্তনে রবীন্দ্র মানসের উত্তরাধিকারী আমরা হ'তে পারছিনা। তার ফলে বর্তমানে সাহিত্যধর্মের বা সাহিত্যজীবনের নিরঙ্কুশ প্রগতি ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছে বলা চলে।

যাঁরা আমার মত সমর্থন করেন না তাঁরা আমারই ব্যবহৃত "প্রগতি" কথাটার উল্লেখ করবেন। একথা অনেকবার শুনেছি যে বর্তমান সাহিত্য "প্রগতি"শীল। এমনকি ঐ "প্রগতি"-সম্পন্ন সাহিত্যিকদের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে "প্রাচীন", "গণসংযোগহীন", "অবাস্তব" ইত্যাদি নানা বিশেষণে ভূষিত করে সাম্প্রতিক সাহিত্যের অগ্রগতিকে স্বীকার করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে "প্রাচীন" বলে মানতে আমাদের বাধা নেই। প্রাচীন বলেই ত' বটগাছ্ বনস্পতি। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য অবাস্তব ও অভিজাত শ্রেণীর সাহিত্য বলে যাঁরা অনুযোগ করেছেন কিম্বা রবীন্দ্রসাহিত্যকে আংশিক পূর্ণ বলে অভিহিত করে তার পরিপূরক হিসেবে দু একটি আধুনিক কবির নামও যাঁরা পেশ করে রেখেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু বলবার আছে।

তার আগে বর্তমান সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

বর্তমান যুগের অধিকাংশের মনে ধারণা যে বর্তমানে রবীন্দ্রোত্তর যুগ চলেছে। এই যুগকে চিহ্নিত করা হয়েছে কোন বিশেষ সত্য তত্ত্ব বা শিল্পনীতির আঙ্গিক কলাকুশলতায় নয়, রবীন্দ্রনাথে যা অসম্পূর্ণ, আমরা তার পরিপুরণ করছি—এই নেগেটিভ চিন্তাভঙ্গির মাধ্যমে। যেমন সমালোচকরা বলে থাকেন বর্তমান সাহিত্য "গণসাহিত্য" হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আদর্শবাদী। তিনি বস্তু বা ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে আপন আদর্শে জীবনকে কল্পনা করেছেন। কিন্তু বর্তমান সাহিত্য বস্তুবাদী, ফাঁকা আদর্শকে বাদ দিয়ে বর্তমান সাহিত্য বস্তুর প্রকৃত রূপকে নিরীক্ষণ করেছে। বর্তমান সাহিত্য কৃষকের, মজুরের আত্মাকে দেখতে পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তা পাননি। বর্তমান সাহিত্য আশাবাদী নয়, কারণ বর্তমানে জীবন যাত্রা ভঙ্গুর। জগতে আশা করবার মত নিশ্চয়তা নেই। বর্তমান সাহিত্য মানুষের জীবনের সাহিত্য কাজেই প্রগতিশীল।

যুক্তিগুলির মধ্যে কিছুই ভুল নেই। প্রগতিশীল সাহিত্যিকেরা নতুনত্বের সন্ধানে ও হাততালির বাহবার মোহে নিত্য নতুন বিষয়ে মনোনিবেশের চেষ্টা করছেন। তাঁদের চেষ্টায় সাহিত্যে শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি উদগ্র বাস্তবতার মোহে তাঁদের অনেকে যৌনজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাকে সম্ভোগের লালসার নির্লজ্জতার পরিণতিকেও সাহিত্যের সামগ্রী করে তুলতে চাচ্ছেন। এতেও আপত্তির কিছু পাইনা, কেননা রবীন্দ্রনাথকে যতই পশ্চাৎবর্তী বলে অভিহিত করা হোক না তাঁর বিশাল কবি-মানসের একটি মহৎ গুণকে আমি মেনে নিয়েছি (হয়ত সকলেই নেবেন)। সে গুণটি হচ্ছে সহৃদয় সহিষ্ণুতা। রবীন্দ্রনাথ কোনসময়েই সুদৃঢ় কণ্ঠে সাহিত্যের মান নির্ণয় করে দেন নি। বরঞ্চ তিনি আজীবন শুধু পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়েছেন। মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত তাঁর রচনায় নিত্য দিক্ পরিবর্তনের চিহ্ন পরিস্ফুট রয়েছে। আচারে ব্যবহারে কোনও সময়েই তিনি অতি আধুনিক মনোবৃত্তিকে দমিত করবার চেষ্টা করেন নি। আর এই উদারতার জন্যেই সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব দিক্‌বিজয়ী হয়েছে (বর্তমান লেখকের মতে।)

রবীন্দ্রনাথের সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি বলতে পারছি যে এই শ্রেণী-

সাহিত্য বা যৌন আবেদনমূলক সাহিত্য, অশ্লীলতা, রাজনীতি প্রভৃতিতে ভয় পাবার কিছু নেই। এবং এতে রবীন্দ্র-প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কাও নেই। উপরন্তু আমি এগুলিকেও পদক্ষেপ বলেই মনে করি। সত্যিই যদি সাহিত্যের সামগ্রী হ'য়ে ওঠে তবে যৌনসম্বন্ধে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অন্ততঃ ভারতীয় সাহিত্যে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলবে। সংস্কৃত কাব্যে যৌন সম্বন্ধকে এতই বড় স্থান দেওয়া হয়েছে যে কবিরা মুখর হয়ে নারীর যৌন অঙ্গের কাব্যবর্ণনা দিয়েছেন। রত্নাবলী কাব্য এমনকি কালিদাসেও এর অজস্র উদাহরণ। কাজেই সাহিত্যে অশ্লীলতাকে যে দোষ বা গুণ দেওয়া হ'য়ে থাকে আমি তা কোন তরফ থেকেই মানতে রাজী নই। উগ্রপন্থী সাহিত্যিকদের মত আরেক শ্রেণী—যাঁরা কিঞ্চিৎ রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন—তাঁরা যে এই অতি-আধুনিকতার প্রকোপে বিব্রত হ'য়েছেন, তার প্রমাণও ত দেখতে পাচ্ছি। একক বা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে সাহিত্যের অশ্লীলতাকে তাঁরা পরিহার করতে চাচ্ছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এই প্রতিরোধে যোগ দিতেন না। কেননা সাহিত্য বিচারে উপকরণটা বড় কথা নয়, বড় হ'চ্ছে প্রকাশ-ভঙ্গীর কুশলতা। কাজেই উপকরণ বা বিষয়বস্তুর মাধ্যমে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ হ'তে চাচ্ছেন তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়ে বলি উপকরণের ব্যবহারেই শুধু সাহিত্য সৃষ্টি হয়না। উপকরণকে নতুন আঙ্গিকে ও রসের আরকে সাহিত্য পর্যায়ে তুলতে হ'বে। প্রকাশ-ভঙ্গীই সাহিত্যের দিক পরিবর্তনের চিত্র। কাজেই স্বকীয়তায় নতুন যুগকে সৃষ্টি করতে পারলে তবেই রবীন্দ্রোত্তর কাল আসবে। এবং আমি বিশ্বাস করি তা আসবেই। সাহিত্যের গতি কোন চরম সীমাতেই স্থাণু হ'য়ে থাকতে পারেনা।

কথা হ'চ্ছে, উপকরণ রয়েছে, কাহিনী রয়েছে, চরিত্র রয়েছে, আধুনিক মতবাদের বিচার রয়েছে তবুও তা উৎকৃষ্ট সাহিত্য হবে না কেন? নতুন মানব সমাজের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রয়েছে, বাস্তবতার রূঢ় প্রকাশ রয়েছে তবুও তা সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য বলে মান্য হবেনা কেন?

সাহিত্যের সংজ্ঞা অনেক যুগে অনেকে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের মতামতের সঙ্গে আমার মিল আছে; তাঁদের মতকে উদ্ধৃত করছি। বিখ্যাত সাহিত্যিক এইচ জি ওয়েলস্ এমন কি আধুনিক ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার মমও মনে করেন যে, সাহিত্যের প্রধানতম ধর্ম

হ'চ্ছে পাঠকের মনে আনন্দের সঞ্চার করা। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলঙ্কারিকেরা এই কথাটাই একটু অন্য ভাষায় বলতে চেয়েছেন। তাঁদের ভাষায় কাব্যের উদ্দেশ্য মনে রসের সঞ্চার করা। পাশ্চাত্য ওই দুই মনীষীর বক্তব্যের সঙ্গে প্রাচ্য ভাষার আলঙ্কারিকের বক্তব্যের মিল থাকলেও অমিল আছে। কাব্যের (সাহিত্যের) অর্থ রসসঞ্চার করা। কিন্তু রস ত শুধু আনন্দ রস ও সৌন্দর্য রস নয়। এ বিষয়ে তাঁরা বলেছেন, যে-রস মনে ঘৃণা বা লজ্জার উদ্রেক করে তাই সাহিত্যে অশ্লীলতা পদবাচ্য। সংস্কৃত কবিদের মতে অশ্লীলতা উপকরণে নিহিত নয়, অশ্লীলতা হচ্ছে প্রয়োগের ব্যর্থতায়।

অতি আধুনিক সমালোচক হার্বার্ট রীড শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে সাবধানী বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, রসশিল্পকে সৌন্দর্যময় বলে বর্ণনা করবার বা সকল সৃষ্টিই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হ'বে এমন মনে করবার কারণ নেই। রীডের মতে আর্টের ক্ষেত্রে উপলব্ধি বড় কথা। উপলব্ধি যখন কোন ফর্ম ও টেকনিককে অবলম্বন করে প্রকাশ লাভ করে তখনই তাকে আর্ট বলি। কাজেই আমরা আবার সেই ফর্ম ও টেকনিকের ক্ষেত্রে এসে পড়ছি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করাই সাহিত্য।" হেজ্‌লিটের চিন্তাধারাও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ। তিনি বলেন যে, বস্তু থেকে আসে অভিজ্ঞতা! কিন্তু অভিজ্ঞতা সাহিত্য নয়। (তাহ'লে উদ্বাস্তু পল্লীর বাস্তব বর্ণনাকে সংবাদ পত্রে সাহিত্য বলেই পাঠ করতাম।) অভিজ্ঞতা থেকে আসে উপলব্ধি (Intuition)। কিন্তু উপলব্ধি আমার নিজের। সেই উপলব্ধিকে তোমার ও সকলের মনে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রয়োজন বাহনের। সাহিত্যিকের কাছে ভাষা ও শিল্পীর কাছে চিত্র এই বাহন। কিন্তু আমার উপলব্ধি যদি অন্যের মনে রসের সঞ্চার করতে না পারে তবে সে প্রকাশ নিরর্থক। রস সৃষ্টি করা যায় শুধু প্রকাশের ভঙ্গিতে। প্রকাশের বৈচিত্র্যকে শিল্পক্ষেত্রে ফর্ম ও টেক্‌নিক বলা হয়।

কাজেই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় শিল্প বা সাহিত্য বিচারে শ্রেণী বিভাগ আসে না। বিষয়ের প্রাধান্যও নেই। সত্য চিরকালই সত্য। আসল বস্তু হচ্ছে প্রকাশ-ভঙ্গি। প্রকাশ-ভঙ্গির কুশলতার জন্যই কালিদাস কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্য বিচারে আর একটি জিজ্ঞাসা আছে। রসসৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সকল সাহিত্য সময়ের বিচারে টেকেনা। তার কারণ রসের উপলব্ধি বিশেষ ও নির্বিশেষ হতে পারে। একজনের মনে যে রস আনন্দ দেয় বা একটি বিশেষ সময়ে যে নৈপুণ্য পুলকের সঞ্চার করে, সর্ব মনে ও সর্ব সময়ে সেই শিল্পরসকে উপভোগের যোগ্য যিনি করতে পারেন তিনিই সৎ সাহিত্যিক। (সৎ অর্থ স্থায়ী।) কিন্তু সর্ব কালের ও সর্ব দেশের মনকে ধরতে পারে শুধু জীবনধর্মের কতকগুলি সনাতন সত্য। কাজেই সাহিত্যের উপকরণে নিত্য বা সনাতন সত্যের প্রভাব। বৈচিত্র্য সেখানে নেই, বৈচিত্র্য হচ্ছে নতুন করে বলা ও নতুন করে ভাবানোতে। সাহিত্য নবযুগের সৃষ্টি করে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের কথাই ত' আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু যুগের উর্দ্ধে না উঠলে নবযুগের কথা কি ভাবা যায়? জীবন গতিশীল এবং কাব্য জীবনের প্রতিফলন; অতএব কাব্যও গতিশীল। যা গতিশীল তাই ত বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন। কিন্তু জীবনকে যারা শুধু স্থূল বস্তুবাদের দ্বারা বিচার করেন, আমি তাঁদের দলে নই। কেন নই সে কথা দর্শনের। আমার মতে, জীবনে মন ও দেহ পরস্পরের পরিপুরক। শুধু দেহ যা চায় তাকে জান্তব বলা চলে, শুধু চৈতন্য বা বিশুদ্ধ বিচার বুদ্ধি যা চায় তা' হয়ত রোমান্টিক্। কিন্তু জীবন যখন আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, যা হ'চ্ছে, যা হ'বে এবং যা হওয়া উচিত উভয়ই যখন জীবনের ও চিন্তাধারার উপাদান, তখন সাহিত্যও সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠবে। গণসাহিত্যের মানে আমি বুঝি না। যৌনসাহিত্য বা অশ্লীলতাতেও শঙ্কিত হই না। আর যুগের অপরিসীম দুঃখেও আশা হারাইনা। কারণ আমি জানি, দুঃখ ও হতাশার মধ্যে দিয়েও মানুষ বেঁচে থাকবেই এবং সমাজেরও বিবর্তন ঘটবে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের আশাবাদকে অবাস্তব বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের সম্বন্ধে বলতে পারি যে, যুগকে অতিক্রম করে যাওয়ার শক্তি তাঁদের নেই বলেই তাঁরা ও' কথা বলেন।

সর্বশেষে অতিআধুনিক সাহিত্যকে যাঁরা অবহেলা করেন তাঁদের সম্বন্ধে বলি যে, এ' অনুদারতা রবীন্দ্রনাথের ছিলনা। অগ্রগতির পথ কখনও একটানা নয়। পথ চলতে কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে ঘুরতে হয়। চড়াই ভাঙতে হয়ত পেছিয়েও আসতে হয়। কিন্তু এই পেছিয়ে-আসা পথকেই সংক্ষিপ্ত করে।

রবীন্দ্রযুগ অতিক্রান্ত না হ'লেও আমরা বিশ্বাস করছি আধুনিক সাহিত্যের চাঞ্চল্য ও পরীক্ষাপর্ব রবীন্দ্রোত্তর যুগেরই সূচনা দিচ্ছে।

জীবন-তীর্থ

শান্তশীল দাশ

আলোক পথের যাত্রী দলে দলে চলে তীর্থ পথে,
যুগ যুগান্তর হতে নিরলস পথ-পরিক্রমা ;
অন্তরে আলোর শিখা, বাহিরে গভীর অমানিশা ;
যাত্রীদল চলে আজো অনির্বাণ দীপশিখা লাগি।

বেদনা বন্ধুর পথ : নিরাশার ঘন অন্ধকার :
মাঝে মাঝে দীপ্ত গতি বুঝি কিছু হয় বা মন্থর ;
স্তব্ধ-গতি কভু নয়, যাত্রা তার অনাদি কালের ;
পথের বেদনা-ভার, পথিকের নব আভরণ।

দুর্যোগ-শংকিত রাতে গতিবেগ হয় দ্রুততর ;
নূতন উৎসাহে চলে শংকাহারা অগণিত প্রাণ।
আঘাতে আঘাতে জাগে অন্তহীন দুর্বার চেতনা ;
নৈরাশ্যের কালো ছায়া দূরে যবে যায় একেবারে।

জীবনে আঁধার আছে : জানি সে তো চির জীবনের ;
আলোকের হাতছানি মিথ্যে নয়, নয় মরীচিকা :
গভীর আঁধার পথে জ্বলে ওঠে ক্ষণিকের তরে।
পথিকেরে দিকভ্রান্ত করে না সে—জাগায় আশ্বাস।

ক্ষণস্পর্শ আলোকের সন্ধান পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে ;
আলোকের উৎসমুখে তাই চলে নিত্য অভিসার ;
কিছু আলো, কিছু গানে পরিতৃপ্ত নয় এ জীবন :
আলোর বন্যায় স্নাত হতে চায় অতৃপ্ত হৃদয়।

সে আলোর তীর্থে জানি যাত্রীদল একদিন এসে
পথ পরিক্রমা শেষে পঁহুছিবে, সর্ব গ্লানিহীন
জীবনের সুধারস পান করি আনন্দ-উচ্ছল
ধরণীর পদ প্রান্তে রেখে যাবে প্রীতির অঞ্জলি।

কাগজের নৌকা

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

গ্রামের পাশ দিয়া তিন ভাঁজ হইয়া বহিয়া গিয়াছে ছোট নদী—গায়ের লোক আদর করিয়া নাম রাখিয়াছে কাজলী-গাঙ। কাজলী-গাঙ তিন চার মাইল আগাইয়া গিয়া মিশিয়াছে প্রকাণ্ড নদীর সঙ্গে—যাহার দুই তীরের গাছ-পালার দুইটি কালো রেখা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সে নদী দিয়া দক্ষিণে আগাইতে থাকিলেই নাকি সীমাহীন সাগর—তাহার নীল জল গিয়া মিশিয়াছে দক্ষিণ দেশের কোন্ নীল আকাশের সঙ্গে।

কাজলী-গাঙের একটি ভাঁজের মোঁড়ে কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে বহুদিনের একটি জাম গাছ—বিছানায় কাঁৎ হইয়া শুইয়া থাকা অনেক দিনের একটি পুরোনো বৃদ্ধের মত। তাহার গোটা কতক মোটামোটা শিকড় চলিয়া গিয়াছে জলের দিকে—তাহারাই বেশ ঘাটের কাজ করে। গাছটার ডালপালা খানিকটা জলে—খানিকটা পাড়ে, স্বাস্থ্যবান্ বুড়োর মতন মরি মরি করিয়াও যেন মরিতেছে না।

নদীর পাশ দিয়াই গাঁয়ের পথ। হাঁটিতে চলিতে সব লোকেরই লক্ষ্য পড়িয়াছে আট-ন' বছরের একটি ছেলেকে। সকাল-বিকাল সে গাঙের জলে কাগজের নৌকা ভাসায়,—ছোট-বড়-মাঝারি, পাতলা কাগজের—মোটা কাগজের, সাদা-কালো, লাল-নীল কাগজের, ডিঙি নৌকা—পালতোলা নৌকা—জাহাজের মত নৌকা। কোনও দিন তাহাতে কাগজে-কাটা মানুষ থাকে, কোনও দিন ছোট ছোট ফুল—কোনও দিন বা অতি ক্ষুদ্র এক-আধটি কাঁচা পেয়ারা। নৌকা গাঙের জলে ভাসাইয়া দিলে কোনও খানি হয়ত গঠন-দোষে একটু দূরে গিয়াই কাৎ হইয়া ডুবিয়া যাইত, কোনও খানির কাগজ জলে ভিজিয়া ডুবিয়া যাইত, কোনটা হয়ত তীরের আগাছায় আটকাইয়া থাকিত ; কিন্তু একটু মোটা কাগজের কোনও কোনও নৌকা যখন স্রোতের টানে যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত ভাসিয়া যাইত, তখন উত্তেজনায় ছেলেটি গাঙ-পাড়ে একা একা পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া গান করিতে থাকিত—

স্রোতের জলে ঢেউয়ে চলে নিরুদ্দেশের নাও—
মন-পবনের বাতাস লেগে আর কতদূর যাও !

নৌকা চলিয়াছে—চলিয়াছে—চলিতে চলিতে স্রোতের ঘূর্ণিতে সহসা একটা পাক খাইয়া—হোগল বনের পাশ ঘেঁষিয়া—জেলেদের বাঁশের ঘেরে একবার আটকাইয়া গিয়া—কত দূর—কত দূর! তারপরে সেই বড় নদীতে—সেই অথৈ সমুদ্দুরে—সেই নাম-না-জানা দেশের নীলাকাশে !

ছেলেটির নাম পিলু, এই সোনামুখী গাঁয়ের পাঠশালার পণ্ডিত কানাই চাঁদ পিপলাইয়ের একমাত্র ছেলে। সোনামুখী ইহাদের আসল দেশ নয়—দেশ ছিল অনেক দূরে ঢাকা জিলায়। দাদা বলাই চাঁদের সঙ্গেই বাস করিত কানাই চাঁদ ; কিন্তু দাদা বড় চাকুরে, কানাই চাঁদ লেখাপড়াও তেমন কিছুই শিখে নাই—আয়-পত্তরও কিছুই ছিল না। বড় হইয়া বিবাহ করিয়া দুই মেয়ে এক ছেলে হইবার পর কানাই চাঁদ দেখিল—দাদার ঘাড়ের উপরে আর বেশি দিন বসিয়া থাকিলে চলিবে না; বাহির হইল ভাগ্যের খোঁজে ; বহু দূর ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সোনামুখীতে পাইয়াছে একটা পণ্ডিতি—আর একটা ছাড়া পোড়ো বাড়ি ; যাজনিক কর্মও কিছু কিছু মেলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। আজ পাঁচ ছ'বছর চলিয়া আসিয়াছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া এইখানে। তারপরে আর এখন পর্যন্ত দেশে ফেরা হয় নাই, বারবার অত দূরের পথে যাওয়া-আসারও সঙ্গতি নাই—ইচ্ছাও তেমন নাই। বলাই চাঁদ কিন্তু ভাইকে ভোলে নাই। দূর হইতেই বুঝিতে পারিয়াছে কানাই চাঁদের নিজের আয়ে সে খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না স্ত্রী-পুত্র আর মেয়ে দুইটি লইয়া—তাই দূর হইতেই দশ পারুক, বিশ পারুক প্রতি মাসেই কিছু করিয়া পাঠায়।

কিন্তু সংসারে অযাচিত মিত্রের কিছু অভাব নাই ; পাড়া-পড়শীর ভিতরে কে গিয়া বলাই চাঁদের কানে লাগাইয়াছে, কানাই চাঁদ টাকা-পয়সা, জমা-জমি, লগ্নি-পত্তরে সোনামুখীতে বেশ জমাইয়া বসিয়াছে। ভীষণ কান-পাতলা লোক ছিল বলাই পিপলাই ; কথাটা শুনিয়া অবধি সে রাগে অভিমানে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। কানাই চাঁদের বাড়-বাড়ন্ত—সে ত অতি ভাল কথা, তবে দাদার কাছ হইতে তাহা এমন করিয়া ছাপাইয়া রাখিবারই বা কি দরকার ছিল, আর তাহার কষ্টে প্রেরিত টাকাগুলিই বা এমন মাসে মাসে গায়েব করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? প্রথমে সে ভাবিল সে টাকা পাঠান বন্ধ করিয়া দিবে ; কিন্তু তাহাতেও যে গায়ের জ্বালা যায় না, এতগুলি টাকা যে সে

এতদিন বসিয়া দিল তাহার কি হইবে? উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে বলাই চাঁদ—পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, নগদ টাকা আর আদায় করিতে পারিবে না কানাই চাঁদের নিকট হইতে, তাহার চেয়ে টাকার জায় বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তির সব অংশ লিখাইয়া লইয়া আসিবে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরাও শুনিয়া বলিল, অন্ততঃ এইটুকু না করিলে যে ধর্মই থাকে না।

এই ত মাত্র অগ্রহায়ণ মাস চলিয়াছে, এদেশে ইহার মধ্যেই বেশ শীত পড়িয়াছে। অজ পাড়া গাঁ এই সোনামুখী—একেই নারিকেল বাগ আর সুপারী বাগ—বাঁশ বন আর কলা বাগে চারিদিক ঢাকা, তার উপর আবার কুয়াসায়-ভরা সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতে না আসিতেই ঘর-বাড়ি সব নিঝুম। কানাই পিপলায়ের কাল একটী শ্রাদ্ধের মন্তর পড়াইতে হইবে, তাই কুপি জ্বালিয়া সে বসিয়া তালপাতার পুঁথিখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া মন্ত্রগুলি একবার আওড়াইতেছিল। হঠাৎ তাহার ঝাঁপের দুয়ারে সজোরে এক সঙ্গে তিনবার আঘাত পড়িল,—'বলি কানাই আছিস্ নাকি রে?'

এঁ্যা—এ যে দাদার গলার স্বর! কানাই পিপলাই দৌড়াইয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল,—'এঁ্যা—দাদা তুমি যে!'

বলাই দাদা কণ্ঠ বিকৃত করিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল,—'হঁ্যা আমি, তোর মুণ্ডপাত করতে এসেছি হতভাগা! খুব ত জমিয়ে বসেছিস্ এখানে—একটা চিঠি-পত্তর যোগ-জিজ্ঞাসাও ত করতে নেই নেমকহারাম!'

কানাই ভাবিয়া দেখিল চিঠি-পত্র সে সত্যই লেখে নাই, তাই ভাবিল সবই দাদার অভিমান, সে কিছুই গা করিল না, আস্তে দাদার পায়ের ধুলা লইয়া তাহার হাতের ব্যাগ এবং বগলের বিছানাটুকু টানিয়া লইল। একখানি জলচৌকি টানিয়া দিয়া বলিল,—'বস দাদা বস।'

বলাই দাদা আর বাক্য ব্যয় না করিয়া ধপাস্ করিয়া চৌকিটুকুর উপর বসিয়া পড়িল, সত্যই সে অনাহারে এবং পথশ্রমে বড় শ্রান্ত।

কানাই চাঁদের মেয়ে কলমী তখনও মায়ের সঙ্গে কাজ করিতেছিল, পুঁটি ও পিলু লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমের আয়োজন করিতেছিল,—তাহারা যে যেখানে ছিল হুড়মুড় করিয়া আসিয়া জেঠুকে ঘিরিয়া ধরিল। মেয়েরা দু'জনে জেঠুকে প্রণাম করিল,—কিন্তু পিলু কাছে আসে না, দূর হইতে পিট্ পিট্ করিয়া জেঠুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। বলাই পিপলাইর চোখ পড়িল পিলুর দিকে—এত বড় হইয়াছে পিলু! কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর ডাগর চোখ, গোছা

গোছা হাত-পা। বলাই পিপলাই শুষ্ক কণ্ঠেই আদর করিয়া ডাক দিল,—'কে রে, আমার সেই পাগলা জেঠুটা নাকি রে ?

পিলু আরও সঙ্কুচিত হইয়া পাশের হোগলার বেড়ার সঙ্গে মিশিয়া রহিল। বোন পুঁটি আগাইয়া গিয়া হাত ধরিতেই পিলু তাহাকে ছিটকাইয়া ফেলিল। কানাই পিপলাই ধমক দিয়া বলিল,—'ওকি হচ্ছে পিলু, জেঠুকে প্রণাম ক'রে যা'। নিতান্ত আড়মোড় ভাঙিতে ভাঙিতে ব্যাঁকা বাঁকা পা ফেলিয়া আগাইয়া আসিল পিলু জেঠুর কাছে—খানিকটা খামচির মতন করিয়া একবার পায়ের ধূলা লইয়াই দ্রুত পদে আবার ফিরিয়া গিয়া মাদুরের পিছনে মুখ লুকাইল। বলাই পিপলাই ডাকিল—'ওরে জেঠু, তুই কি হোগল বনের কেঁদো বাঘ নাকি রে—একটা থাবল মেরেই যে পালিয়ে গেলি !'

কানাই চাঁদ বলিল,—'তুমি দাদা জামা ছাড়, তোমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, আগে একটু হাত মুখ ধু'য়ে খাওয়াটা সেরে নাও—তারপরে সব কথাবার্তা হবে।'

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বলাই পিপলাই যখন আসিয়া বিছানায় বসিয়া পান মুখে দিয়া বিড়িটি ধরাইয়াছে ততক্ষণে চাহিয়া দেখিল কানাই চাঁদের মেয়ে দুইটি এবং ছেলেটিও আসিয়া আবার তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। খাবার সময়ও তাহারা এমনিই তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। পাতে নুন থাকা সত্ত্বেও আর একটু নুন দেয়, একখানা লেবু কাটিয়া দেয়, ডাল খাওয়া শেষ হইতে না হইতেই ঝোলের বাটিটা আগাইয়া দেয়, আঁচাইবার জন্য গরম জলের ঘটি লইয়া সাথে যায়, পায়ের চটি আগাইয়া দেয়। এই এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাহার মনে হইল, জেঠুকে পাইয়া এই তিনটি ছেলেমেয়ে কি যেন এক পরম ধন—এক পরম আশ্রয় পাইয়াছে। এই বিভুঁই-বিদেশে কোনও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মুখ তাহারা দেখে না,—আজ যেন তাহারা বান্ধব পাইয়াছে। জেঠুর সঙ্গে ইতিমধ্যেই পিলুর ভাব জমিয়া গিয়াছে। বলাই চাঁদ যখন বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়া নাক-মুখ দিয়া এক সঙ্গে অনেকখানি ধুঁয়া হুশ্ হুশ্ করিয়া বাহির করিয়া দিল, পিলু তখন বলিল,—'জেঠু, এখন কি তোমার পেটের মধ্যেও আগুন ধ'রে গেছে ?'

'কেন রে ?'

'নইলে এত ধুঁয়ো বেরোয় কি করে ?'

'তবে রে বোকা—! এই বিড়ির ধোঁয়াই টানের চোটে পেটের মধ্যে

যায়, দেখবি?' বলিয়াই বলাই পিপলাই বিড়িতে সজোরে আর একটি দীর্ঘকাল স্থায়ী টান দিল—এবং তারপরে দম আটকাইয়া খানিকক্ষণ নির্ধূম হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর মুখের এককোণ দিয়া খানিকটা ধোঁয়া বাহির করিল, তারপরে অপর কোণ দিয়া, তারপরে ঠিক মাঝখান দিয়া, তারপরে মুখ বন্ধ করিয়া ডান নাকের ছিদ্র দিয়া, পরে বাঁ নাকের ছিদ্র দিয়া—তারপরে আবার একসঙ্গে নাক-মুখ সব দিয়া হুশ হুশ্ করিয়া।

বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। পিলু আরও জেঠুর কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া এতক্ষণে 'রূপতরাসী' রাক্ষসের গল্পটার জন্য সানুনয় আবেদন জানাইল। কানাই পিপলাই গর্জিয়া উঠিয়া বলিল,—'তোরা কি দাদাকে আজ একটু ঘুমোতে দিবি নে? যা শীগ্‌গির ঘুমোতে যা—'

বলাই চাঁদ বলিল,—'থাক, থাক।'

কিন্তু লাঠিধারী মানুষের গলার আওয়াজ পাইলেই ভীরু খেক্‌শিয়ালগুলি যেমন ডাক বন্ধ করিয়া লেজ গুটাইয়া বাঁশবনের গর্তে ঢুকিয়া পড়ে, পুঁটিসহ পিলুও তেমনি বিছানাবনের লেপের গর্তে নীরবে ঢুকিয়া পড়িল।

এতক্ষণে বলাই পিপলাইরও মনে হইল সে শ্রান্ত, ভাত খাইয়া এখন গা ছাড়িয়া দিয়াছে। শুইবার উপক্রম করিতেই মনে হইল,—বারে, যে কাজের জন্য আসা তাহার ত কিছুই হইল না। সে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল, কানাই পিপলাইর কাছ হইতে সইটই যাহা লইবার এই রাত্রেই তাহা আদায় করিয়া লইবে এবং সকাল বেলা উঠিয়াই আবার রওনা দিবে। কিন্তু এখানে আসিয়া সে ত সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছিল! কানাইর বজ্জাতি সব মনে পড়িয়া যাইতে সে উত্তেজিত হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল, গম্ভীর স্বরে ডাকিল, 'কানাই—'

কানাই পিপলাই আগাইয়া আসিয়া বলিল—কি দাদা?

বলাই চাঁদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—'এখন আমার ঘুমোলে চলবে না, আমি অনেক কাজের জন্য এসেছি, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

'এখন ঘুমিয়ে কাল সকালে বললে হয় না দাদা?'

'নারে না,—অত মিষ্টি মিষ্টি কথায় কাজ নেই। খুব ত শুনলুম এখান জাঁকিয়ে বসেছিস্—খবর টবর ত কিছুই আর দিস্ না।'

'কি আর খবর দেব দাদা, কোনও রকমে ত কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বেঁচে আছি।'

'কোনও রকমে বেঁচে আছি ? আমি আর জানি না কিছুই ? বলি এই ক'বছর ধ'রে মাসে মাসে আমার এই টাকাগুলো মারছিস কেন ?'

কানাই চাঁদ দাদার হাবভাব দেখিয়া কেমন থতমত খাইয়া যায়, বলিল,—'দাদা, তুমি কি বলছ ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার ও টাকা ক'টা না পেলে তোমার পিলুকে আমি বাঁচিয়ে রাখতুম কেমন ক'রে ?'

এক কথায় বলাই চাঁদ কেমন ঠাণ্ডা হইয়া যায়। আমতা-আমতা করিয়া বলে, 'হ্যারে টাকা দেব না কেন রে ? টাকা ত দেবই, তুই বললেও দেব না বললেও দেব। তা দেখ—ওরা বলছিল কি—মানে, তোর টাকা ত মাসে মাসে আমি পাঠাই,—আর তুই ত কোন দিন বাড়ি ঘরে যাস নে, কোনও দিন যে যাবি তাও মনে হচ্ছে না। তোর আর তা হ'লে বাড়ির ভাগ আর বিষয় সম্পত্তির অংশ রেখে লাভ কি ?—এই ধর আমাকেই তুই সব লিখে দিলি।'

'তা কেন দেব না দাদা ? তোমার খাই-পরি—আর ঐটুকু তোমাকে লিখে দিতে পারব না ?'

'পারব না নয়, যা পারবি তা এখনই ক'রে রাখ। আমি এই কাগজ-পত্র একেবারে লিখে নিয়ে এসেছি—এই খানে সই কর।'

কানাই চাঁদ আর কথা বলিল না, কেরোসিনের কুপিটা এবং দোয়াত-কলমটা আনিয়া দাদা যেখানে যেখানে দেখাইয়া দিল সেইখানে সেইখানে সই দিয়া দিল।

পরদিন সকাল বেলায় উঠিয়া কানাই চাঁদ বলিল,—'দাদা, আমার ত সকালে পাঠশালা—আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি, শীগ্‌গিরই আজ ফিরব। তুমি ততক্ষণে সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রে তোমার জেঠুর সঙ্গে একটু গল্প-সল্প কর।'

দুয়ারের সামনেই বসিয়াছিল বলাই চাঁদ। হোগলের বেড়ার ফাঁক দিয়া কাল সারারাত শীত লাগিয়াছে, শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করিতেছে—মনটা কেন যেন ততোধিক ম্যাজ ম্যাজ করিতেছে। এমন সময় বাহির হইতে একডালা ফুল লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল পিলু। রাত্রে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, দিনের আলোতে বেশ দেখা যাইতেছে—ঠিক যেন কষ্টিপাথরের কেষ্টঠাকুরটি। কিন্তু খালি পা, খালি গা,—একটু ময়লা ছেঁড়া ধুতি—তাহারই খোঁট কোনও রকমে জড়াইয়া লইয়াছে গায়ে। বলাই চাঁদ বলিল,—'কিরে জেঠু এত সকালে কোথায় গেছিলি ?'

একগাল হাসিয়া পিলু বলিল,—'ফুল তুলতে'—

'এত শীতের মধ্যে কেন খালি পায়ে বেরোলি ?'

পিলু বলিল,—'আমার জুতো নেই' বলিয়াই আবার কথাটা যেন ফিরাইয়া লইতে বলিল,—'আমার কখনো জুতো লাগে না, আমি খালি পায়েই বেশ বেড়াতে পারি।'

'পায়ে জুতো না দিস্—খালি গায়ে বেরিয়েছিস্ কেন শুনি ?'

'বারে খালি গা কোথায়, এই যে কাপড় জড়িয়ে নিয়েছি।'

'কেন জামা ?'

'জামা আমি গায়ে দি না, জামা আমার ভাল লাগে না। এই কাপড়ের খোঁটও দরকার করে না আমার, দেখবে ?'—বলিয়াই গা হইতে কাপড় খুলিয়া কোমরে জড়াইয়া খালি গায়ে খালি পায়ে পিলু ঘরের সামনে চক্কর মারিতে আরম্ভ করিল। বলাই চাঁদ থাম থাম বলিয়া চিৎকার করিবার পূর্বেই পিলু তিন পাক ঘুরিয়া ফিরিয়াছে। বলাই চাঁদ হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে টানিয়া তুলিতেই দেখে, বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। সে বলিল,—'এই দেখ বাঁদরের কাণ্ড—পা দিয়া যে রক্ত বেরিয়ে গেছে।'

পিলু বলিল,—'ও, হোঁচট খেয়েছি, শীতে কিছু হয় নি।'

'তোকে আর বাহাদুরি করতে হবে না জাম্ববান কোথাকার। দেখি বউ মা একটু জল আর নেকড়া দাও দেখি নি।'

পাশ হইতে পুঁটি মন্তব্য করিল,—'ওতে ওর কিচ্ছু হয় না।'

বলাই চাঁদ ধমক দিয়া বলিল,—'তোকে আর ফোড়ন কাটতে হবে না আজ্ঞি বুড়ী।'

জল আসিল, নেকড়া আসিল—বলাই চাঁদ আস্তে আস্তে পিলুর পায়ের আঙুল বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল,—'হ্যারে জেঠু, কাছে কোথাও হাট-বন্দর আছে ?'

পিলু মাথা দোলাইয়া বলিল,—'হ্যাঁ আছে। কেন জেঠু, কি কিনবে ?'

পিলুর কচি গালটা টিপিয়া দিয়া বলাই চাঁদ বলিল,—'তোর জন্য জামা জুতো কিনবো।'

পিলু পা ছাড়াইয়া বোঁ করিয়া একটা পাক খাইয়া বলিল,—'ও সব আমার ভাল লাগে না।'

'তবে কি তোর ভাল লাগে ?'

পিলু জেঠুর কানের কাছে মুখ আগাইয়া চুপি চুপি বলিল,—'মোটা মোটা কাগজ।'

'কেন, কি হ'বে তা দিয়ে?'

'কাগজের নৌকো করব।' আরও উৎসাহিত হইয়া পিলু বলে,—'যত মোটা কাগজ দেবে নৌকো তত ভাল হবে, তত জলে ভেসে থাকবে আর স্রোতের টানে সাঁই করে একেবারে সোজা সমুদ্দুরের দিকে চলে যাবে'—বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই পিলু হাত দিয়া সমুদ্দুরের দিকটা এবং তাহার নৌকার গতিবেগটার একটা আভাস দিয়া দিল।

বলাই চাঁদ দুয়ার হইতে উঠিল, জামার পকেটে কাল রাত্রে সইকরা দলিলের যে ক'খানা কাগজ ছিল সব আনিয়া পিলুর হাতে দিয়া বলিল,—'এই কাগজে হবে?'

চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া পিলু বলিল,—'খুউ-উব; বারে বাঃ, এই ত চাই। এ দিয়ে নৌকো ক'রব?'

বলাই চাঁদ মাথা নাড়িয়া বলিল,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ'।

পিলুর মুখে আর কথাটি নাই। একসঙ্গে এত মোটামোটা এতগুলি কাগজ? একবার অসীম কৃতজ্ঞতাভরে জেঠুর দিকে তাকাইল, আর বার অপ্রত্যাশিত বিজয়োল্লাসে পাশের ঈর্ষাপরায়ণা পুঁটির দিকে তাকাইল, তারপরে মাথা নাড়াইয়া পা দোলাইয়া সকলের সামনে বসিয়া সেই মোটা কাগজ দিয়া পাঁচ খানি নৌকা বানাইয়া লইল। তারপরে আর কোনও কথাবার্তা নাই, একেবারে সোজা দে ছুট—সেই কাজলী গাঙের পাড়ে—সেই নুইয়া পড়া জামগাছের শিকড়ের উপর। বহুক্ষণে আর তাহার টীকিটি দেখা নাই।

কানাই চাঁদ আজ সকাল সকাল পাঠশালা ছুটি দিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। ফিরিবার পথে চোখ পড়িল কাজলী গাঙের ঘাটে, পিলু যথারীতি তাহার নৌকা ভাসাইতেছে। দাদা আজ বাড়িতে—আজও তাহাকে ফেলিয়া এই সকালে নৌকা ভাসান—কানাই চাঁদের ভীষণ রাগ ধরিল। কান দুইটি ধরিয়া নীরবে বাড়ি টানিয়া লইয়া যাইবার মতলব লইয়া কানাই চাঁদ গাঙের দিকে আগাইয়া গেল। কাছে আগাইতেই একখানা ভাসমান নৌকার দিকে চোখ পড়িতেই দেখিল,—কি সর্বনাশ—এ যে দাদার সেই দলিলের কাগজ। ঘাটে আসিয়াই কানাই চাঁদ পিছন হইতে পিলুর মাথায় ঠাস্ ঠাস্ করিয়া এমন দুই

চাটি মারিল যে, পিলুর আর চিৎকার করিবার কোনও শক্তি রহিল না। আর কোনও কথা না বলিয়া গায়ের চাদর খানা পাড়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কানাই চাঁদ গাঙের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সাঁতার কাটিয়া সব ক'খানি নৌকাই তুলিয়া আনিল। তারপর নৌকাগুলি খুলিয়া খুলিয়া আবার ঠিক করিবার চেষ্টা করিল,—এবং তারপর পিলুর একখানি কান ধরিয়া টানিতে টানিতে রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে বাড়িতে ঢুকিল।

দূর হইতেই কানাই চাঁদকে অমন করিয়া পিলুর কান ধরিয়া টানিয়া আনিতে দেখিয়া বলাই চাঁদ লাফাইয়া বাহিরে পড়িল,—বলিল,—একি রে কানাই, একি ?'

রাগে ক্ষোভে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কানাই চাঁদ বলিল,—'হারাম জাদা ছেলে সর্বনাশ করেছে দাদা। তোমার পায়ে ধরি, তুমি চ'টো না, আমি তোমার সঙ্গে শহরে গিয়েই আবার সব লিখে দিয়ে আসব।' বলিয়াই কানাই চাঁদ মহা অপরাধীর ন্যায় সেই ভিজা কাগজগুলি বলাই চাঁদের হাতে দিল।

সেগুলি দেখিয়া বলাই বলিল,—'এই কাগজ ? সেই দলিলের কাগজ ? সে যে আমি নিজে আমার জেঠুকে দিয়েছি।'

'কেন দাদা ?'

বলাই গম্ভীর হইয়া বলিল,—'কেন ? কাগজের নৌকা ক'রে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিতে।'—বলিয়াই বলাই চাঁদ পিলুকে কানাই চাঁদের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইল।

'The world is passing through a period of uncertainty, of worldless longing ; it wants to get rid of its present mood of spiritual chaos, moral aimlessness and intellectual vagrancy.'

—Radhakrishnan.

পুরাণ-পুঁথি ও আধুনিক যুগ

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

আজকাল অনেকের মুখেই একটা কথা শোনা যায় যে বর্ত্তমান যুগে আমরা শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজের ক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হয়েছি যে, আমাদের প্রাচীনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত বা অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়ে কালক্ষেপণ করা আদৌ উচিত নয়। যাঁরা এমন মন্তব্য করে থাকেন তাঁদের সবাই অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা দায়িত্বহীন ব্যক্তি নন। রীতি মত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ খেতাবধারী বা বিদ্যায়তনের এবং শিক্ষা কেন্দ্রের পদাধিকারীও এমন উক্তি করতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আবার নিজেদের প্রগতিশীল বা অতি আধুনিক বলে মনে করেন, তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রাচীনতার বা পূর্ব্বতনের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানের কথা ঘোষণা করেন। কালবৈগুণ্যে অথবা অবস্থার প্রতিকূলতায় এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা আজ নগন্য নয়। ফলে তাঁদের উৎকট মতবাদটি যেমন সহজে প্রচারিত হয়ে প্রতিষ্ঠালাভের স্থযোগ পাচ্ছে তেমনি স্বল্প-চিন্তাশীল এবং অর্ব্বাচীন জনমানসে তা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে মহতী বিনষ্টির পথকে স্থগম করে তুলছে। আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে তোলবার জন্য যথাসময়ে দৃষ্টান্ত দেব। আপাততঃ এই প্রসঙ্গের আরও দু একটি কথা বলে ফেলা যাক।

স্থদীর্ঘ দেড়শত বছরেরও অধিক কাল পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকার পর অতি অল্প কাল হ'ল আমাদের দেশ বন্ধনহীনতার আস্বাদ লাভ করেছে। রাষ্ট্রীয় শক্তি অধিকারে আসার ফলে যে দেশব্যাপী পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে তা সমুদ্রমন্থনের পর একই সঙ্গে প্রাপ্ত বিষামৃতের ন্যায়। উভয়ের ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের জীবনে, সমাজে, চিন্তায় এবং প্রাত্যহিক কর্ম্মে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। অমৃতক্রিয়া এই যে, সদ্যমুক্ত জাতির প্রত্যেকটি জনসাধারণ, তা সে যতই অশিক্ষিত হোক না কেন, রাজনৈতিক চেতনায় দ্বিগুণতর উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আপনার জীবনের, প্রাণ-ধারণের জন্যে আজ তার দাবী পেশ করা বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা

পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকার ধারণ করেছে। পক্ষান্তরে বিষক্রিয়ায় তার চিন্তা বা মননশীলতা পঙ্গু হয়ে গিয়ে দীনহীন দশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। চিন্তার এই দেউলিয়া জীবন একটি জাতির পক্ষে যে কতখানি অনিষ্টকর, তা এক কথায় বুঝিয়ে বলা যায় না। যে জাতির চিন্তার পুঁজি ফুরিয়েছে তার সমস্ত সম্পদ কেবল শূন্যতার পরিচয় বহন করছে। সে তার দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারিয়ে পথভ্রান্ত পথিকের মত ক্রমশঃ লক্ষ্যস্থল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ভারতবাসী জনসাধারণ আজ এই দৈবদুর্ব্বিপাকের সম্মুখীন হয়েছে। তাই আজ কেবল মেকী আধুনিকতা বা কাল্পনিক প্রগতিশীলতার মোহে সে নিজের ভবিষ্যতকে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মম্ভরিতার এবং স্বাধীনতার মদমত্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে।

কোনও দেশ তা যতই উন্নত বা অগ্রগামী হোক না কেন, কখনও আপনার অতীতের গৌরবকে, ঐতিহ্যের নিদর্শনকে ঝেড়ে মুছে ফেলে বেঁচে থাকতে পারে না। তার ভবিষ্যতের পাথেয় কিছুই থাকে না যদি সে অতীতের ইতিহাস থেকে অর্থাৎ জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সংগ্রহ না করেই যাত্রা পথে চলতে আরম্ভ করে। আমরা যারা নিজেদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দিই, আমাদের অন্যান্য দেশের তুলনায় অতীতের ভাগটা কিছু বেশী থেকে গেছে। অন্যান্য দেশের ইতিহাস যখন রচিত হয় নি, তখন থেকেই যদি ধরা যায় তাহলেও দেখা যাবে যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষরা এমন সব জিনিষ আবিষ্কার করেছেন যা অপরের পক্ষে শুধু বিস্ময়কর নয়, কল্পনাতীতও বটে। আমাদের বেদ, পুরাণ, শ্রুতি, স্মৃতি যেমন অপূর্ব্ব তেমনি অনন্যসদৃশ। ঐগুলির উন্নতি, ঐগুলির অনুশীলন এবং পরিশীলন, প্রচার ও প্রসার, গ্রহণ ও ধারণ এক সময়ে চরম সীমায় পৌঁছিল। তারপর আবার ক্রমাবনতির ফলে বিলুপ্তিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমরা দেড় শতাব্দীর বৈদেশিক প্রভুত্বের অধীনে থেকে মোহগ্রস্ত হয়ে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণ করেছি। ফলে আজ রাষ্ট্রীয় অধিকারের সম্মান লাভ করেও অন্যান্য বিষয়ে সম্যক মর্য্যাদা আকর্ষণ করতে পারিনি। অতীতের গৌরবকে অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করে আমরা ভবিষ্যৎ গৌরব বৃদ্ধির দিবাস্বপ্ন দেখছি। তাই আজ আমাদের আধুনিক মনোভাবাপন্ন পণ্ডিতগণকে বলতে শুনি যে বেদপুরাণ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে অচল। ঐগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবৈজ্ঞানিক মনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধির পরিচায়ক।

এমন কি আধুনিক লেখক বা স্রষ্টাগণও এ বিষয়ে উদাসীন বা বিরূপ। এই কারণে আজ পুরাণ অলীক কল্পনার ফানুস বা বেদ অবাস্তব কল্পনার বিলাস নামে পরিচিত। বস্তুতঃ ভারতবাসী আজ ভারতীয়তা-বোধকে বাদ দিয়ে বাঁচার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। অতএব তার অপমৃত্যু যে আসন্ন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতবাসী একদা যে গৌরবের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল তার কারণ সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে যে যোগ স্থাপিত করেছিল, তা কেবল চিত্তের যোগ নয় আত্মার যোগ, কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ, পুর্ণযোগ ; অর্থাৎ ভারতবর্ষ যা কিছু অতীতে করে ছিল তার কোনটিই অর্থহীন বা উদ্দেশ্য বহির্ভূত নয়। আমাদের পুজা অনুষ্ঠান, বার ব্রত, ধর্ম্ম সাধনা সবের মূলে আছে গভীর তাৎপর্য্য অর্থাৎ জীবন বোধ এবং পরমার্থ সিদ্ধি বা সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন। আজ অনেকের কাছে অষ্টাদশ পুরাণ অবাস্তব কাহিনী বলে মনে হলেও আসলে তার মূল্য যে কত অধিক, তা একমাত্র ধীর ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই উপলব্ধি করবেন। বস্তুতঃ আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের যদি কিছু সারবস্তু থাকে তবে তা পুরাণেই আছে। কিন্তু কয়জন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসু ? যে মাতৃপুজা অর্থাৎ দুর্গাপূজা হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান, তা 'কালিকাপুরাণ' এবং 'দেবীপুরাণ' উভয়ে কতখানি পার্থক্যের সঙ্গে বর্ণিত, এ বিষয়ে কয়জনের কৌতূহল আছে ? সেইরূপ অন্যান্য পুজা পার্ব্বণ এবং আচার পদ্ধতি পুরাণকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে কিরূপে বিকাশ লাভ করে বিবর্ত্তিত হয়েছে, এ সন্ধান বা এই গবেষণার কাজ আজ কোথায় দেখা যায় ? বিষ্ণুপুরাণে নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কোন্ অর্থের উল্লেখ আছে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থের সঙ্গে তার প্রভেদ কোথায়, এ বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের প্রচারের প্রয়োজন আছে। কারণ সমগ্রভাবে পুরাণে নারায়ণের লীলা যেমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমন আর কোথাও নেই। বস্তুতঃ নারায়ণকে কেমন করে সেবা করতে হয়, তার ক্রম ও পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া নর কেমন করে নরোত্তম হতে পারে এবং সেই নর নারায়ণের দেহের কতখানি অংশ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তাও পুরাণে লিখিত আছে। কেউ কেউ পুরাণকে কেবলমাত্র ইতিহাস বলে ভুল করেন। পুরাণের ভিত্তি ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা সত্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। আসলে পুরাণ মানবতার উত্থান পতনের কাহিনী, তার বিশ্লেষণ ও পরিপোষণের উপাখ্যান। তাই তাতে যে তিনটি স্তর আছে তা হল—ঐতিহাসিক,

সামাজিক এবং সাধন মার্গ। পুরাণের অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা বলেছেন: 'ব্যাসাদি-মুনি-প্রণীত বেদার্থ বর্ণিত পঞ্চ লক্ষণান্বিত শাস্ত্রম্'। আবার পঞ্চ লক্ষণ কি এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতগণ জানিয়েছেন—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই কয়টি পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ হিসেবে অবশ্য প্রণিধানযোগ্য। যাঁরা পুরাণবিদ্ নন, অথচ হিন্দুধর্ম্ম এবং সংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়ায় এ বিষয়ে কিছু অনুরাগ বা অনুসন্ধিৎসা পোষণ করেন তাঁদের সর্ব্বাগ্রে আঠারোটি পুরাণের কোন্‌গুলি সাত্ত্বিক, কোন্‌গুলি রাজসিক এবং কোন্‌গুলি তামসিক তা জানা আবশ্যক। বিষ্ণু, নারদ, শ্রীমদ্ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ পুরাণকে কেন সাত্ত্বিক শ্রেণীর বিবেচনা করা হয়? কারণ এগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে মোক্ষ, ভগবদ্ভক্তি, ভগবানের লীলা। তেমনি ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণের উপজীব্য সমাজ রক্ষা, সমাজ বিন্যাস, রাজধর্ম্ম, প্রজাপালন ও জাতিরক্ষা ইত্যাদি। ফলে ঐগুলিকে রাজসিক পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। আবার ব্যক্তিগত ঋদ্ধি ও সিদ্ধিকে অবলম্বন করে মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, অগ্নি ও স্কন্দ পুরাণ সকল রচিত হওয়ায় ঐগুলিকে তামসিক নামে অভিহিত করা হয়।

মূল পুরাণ ব্যতীত আরও কতকগুলি উপপুরাণ বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়ে আমাদের হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির অনুশীলন ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। ঐগুলির সংখ্যাও আঠারো। পুরাণ অথবা উপ পুরাণ যাহাই দেখা যাক না কেন উভয়ের উদ্দেশ্য এক। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের বীজ সব পুরাণেই নিহিত; এবং সমাজের ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের প্রচার করা হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে পুরাণের এখানেই পার্থক্য। বেদে ব্যক্তির কর্ম্ম-শৃঙ্খলার উন্মেষ দেখা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিত্বের স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলাই পুরাণের মাহাত্ম্য। ব্যক্তি অর্থে এখানে সাধারণ মানুষ মনে করলে ভুল হবে। ব্যক্তির অর্থ জাতির প্রতীক—যেমন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র ইত্যাদি। তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে, পুরাণে সমাজতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব দুইই স্থান পেয়েছে। দেহতত্ত্বের রহস্য বুঝাবার জন্যে পুরাণকার আষাঢ়ে গল্পের অবতারণা করেছেন। ঐগুলি ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে হয়তো অবাস্তব এবং অসার ব'লে মনে হবে। কিন্তু শাস্ত্রকার বা শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তির বুঝতে বিলম্ব হবে না যে, মানবজীবনের কোন্ অন্তঃস্পর্শী রহস্যের ওপর ঐগুলি আলোক সম্পাত করছে।

এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং এই আলোচনার স্বল্প পরিসরে বাক্‌বিস্তারেরও অবকাশ নেই। আমি বলছিলাম যে, বর্ত্তমান যুগে আমরা এত অধিক আত্মকৈন্দ্রিক এবং অদূরদর্শী জীবনানুগ হয়ে উঠেছি যে অতীতের অমূল্য সম্পদকে পূর্ণ মর্য্যাদা দান করার কিছুমাত্র প্রচেষ্টা প্রদর্শন করছি না। জাতীয় সম্পদের প্রতি এই অবহেলা এবং মূঢ়তার মোহান্ধতা জাতিকে কোন্ সর্ব্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে তা যদি অবিলম্বে বুঝতে না পারা যায় তবে দুর্দ্দিন ঘোরতর আকার ধারণ করবে। তাই বলি যে, আধুনিক বিদ্যাশিক্ষার এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার অভিমান এবং অহমিকা ত্যাগ করে আজ যদি দেশের কয়েকজন কৃতবিদ্য এ বিষয়ে তৎপর হয়ে কিছু অনুশীলন করেন এবং দেশের জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারেন তবেই মঙ্গল। আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান-পরিষদ, সাহিত্য-পরিষদ, ইতিহাস-পরিষদ প্রভৃতি সংস্থাগুলিতে স্ব স্ব বিষয়ের আশানুরূপ গবেষণা হয়েছে বা হচ্ছে। এগুলির সুফল সমগ্র জাতির জীবনেও ফলে উঠছে। কিন্তু পুরাণের এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের গবেষণা কর্ম্মে আধুনিককাল যেন এখনও অনগ্রসর। অতএব 'পুরাণ-পরিষদ' বা ঐ জাতীয় কোনও সংস্থা যদি এ বিষয়ে কিছু সচেতন হন, তাহ'লে হৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার কল্পে আত্মনিয়োগ করে দেশের ঐতিহ্যকে পূর্ব্ব গৌরবে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। পুরাণের মধ্যে এমন অনেক গবেষণার বিষয় আছে যার বহুল প্রচার আজকের দিনে সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন। যে অবিশ্বাস, নাস্তিক্যবুদ্ধি, পরস্বাপহারী মনোবৃত্তি আজকের পৃথিবীতে উগ্র মূর্ত্তিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তাকে খর্ব্ব করার জন্যে পুরাণ-বর্ণিত ঈশ্বরে বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, ঈশ্বরে মনুষ্যত্বের আরোপ, ইষ্ট দেবতায় সর্ব্ব নিবেদন, সমাজধর্ম্মের ব্যাখ্যান এবং পুরাণের ফলশ্রুতিগুলি সহজবোধ্য ভাষায় এবং আধুনিক যুগের উপযোগী আলোচনার মাধ্যমে বা কাহিনীর বর্ণনায় শিক্ষিত সাধারণের কাছে তুলে ধরা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ ছাড়া যাঁরা সত্যিকার অনুরাগী তাঁদের জন্যে—পুরাণের অবতারবাদ, উপাসনাতত্ত্ব (তান্ত্রিকী ও বৈষ্ণবী), ভাষার স্বাতন্ত্র্য, শব্দযোজনা পদ্ধতির বৈচিত্র্য, শব্দের দ্যোতনার অপূর্ব্বত্ব, লীলা-আখ্যানের রসকল্পনা, ঐতিহাসিক আখ্যানের ঘটনা সংস্থিতি ও চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি একাধিক গবেষণার বিষয় রইল।

পুরাণের সঙ্গে পুঁথির আপাতদৃষ্টিতে কোনও মিল না থাকলেও পণ্ডিতেরা এই নির্দ্দেশ দিয়েছেন যে পুঁথি নিয়ে পুরাণ পাঠ করলে তার উদ্দেশ্য সফল হয়

না। গুরুর মুখ-নিঃসৃত বাণী হিসেবে বা ব্যাখ্যাতার মুখে শ্রুত উপাখ্যান হিসেবে এগুলির মূল্য অধিক। পূর্ব্বে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে পুঁথিগুলি যেমন শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে নিয়ে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হ'ত, আজ যদি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ঐ আসল পুঁথিগুলির মুদ্রিত সংস্করণগুলি নিয়মিতভাবে আলোচিত হয়, তবে অচিরে দেশের এবং দশের কল্যাণ সাধিত হবে। যাঁরা এই কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করবেন, তাঁদের আর্থিক সমস্যার কথা অস্বীকার করি না। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র এ বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু আমাদের দেশে নানাকারণে সে পথ রুদ্ধ। আমাদের ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেখানে শিক্ষামন্দির এবং পাঠ্য পুস্তক থেকে ধর্ম্মালোচনার নির্ব্বাসন দিয়েছেন, সেখানে তাঁদের কাছে কিছু আশা না করাই ভালো। তাছাড়া ভারতবর্ষের অধিবাসী যাঁরা তাঁদের সামনে গীতার আদর্শ—ফলপ্রাপ্তির কথা চিন্তা না করে কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ—ত আজও অটুট আছে। অতএব তাঁরা সেই শাশ্বত অমর বাণীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, বিশুদ্ধচিত্তে শুভকর্ম্মে নির্ভয়ে অগ্রসর হবেন। বিধাতার আশীর্ব্বাদ তাঁদের ওপর বর্ষিত হবেই।

'যতদিন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করবে ততদিন তোমার হারজিত, তোমার সুখদুঃখ ঢেউয়ের মতো কেবলই টলাবে, কেবলই ঘোরাবে। প্রত্যেকটার পুরো আঘাত তোমাকে নিতে হবে। যখন তোমার পালে তাঁর হাওয়া লাগবে তখন তরঙ্গ সমানই থাকবে, কিন্তু তুমি হু হু করে চলে যাবে। তখন সেই তরঙ্গ আনন্দের তরঙ্গ। তখন প্রত্যেক তরঙ্গটী কেবল তোমাকে নমস্কার করতে থাকবে এবং এই কথাটীরই প্রমাণ দেবে যে, তুমি তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছ।'

—রবীন্দ্রনাথ

বুনিয়াদী শিক্ষা কি

অনিলমোহন গুপ্ত

ভারত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ভারতের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে ছয় থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত আট বৎসর ব্যাপী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে। স্থির হয়েছে এই শিক্ষা হবে কর্মকেন্দ্রিক এবং এই আট বৎসর একটি নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষাকাল বলে পরিগণিত হবে। জাতীয় সরকার এই শিক্ষার নাম দিয়েছেন বুনিয়াদী শিক্ষা—Basic Education. আশা করা হচ্ছে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতির প্রতিটি ছেলেমেয়ে একটি জাতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হবে, একটা সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠবে। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার নীতি কেন গ্রহণ করা হয়েছে তা বুঝাও কঠিন নয়। পরাধীন দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল কেরানী তৈরীর উপযুক্ত। তাই প্রথম থেকেই ছেলে যাতে শান্ত শিষ্ট হয়ে বসে বসে কলম পিষতে শেখে সেভাবেই তাকে শিক্ষা দেওয়া হত। আজ আমাদের কাজের লোক দরকার। তাই আমাদের শিক্ষার মধ্যেও কাজের স্থানকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি অবশ্য ভারত সরকারের শিক্ষানীতির মধ্যে আর একটা কথা এসে গেছে। সার্জেন্ট সাহেব যখন যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করেন তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির মত ছিল শিক্ষার মধ্যে উপার্জনের কথাটাকে টেনে না আনা। তাঁরা বলেছিলেন : শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিক্ষার ব্যয় উঠে আসবে তা, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, সম্ভবও নয় আর বাঞ্ছনীয়ও নয়। শিক্ষার্থীর কাজ থেকে বড় জোর শিক্ষোপকরণের মূল্য উঠে আসতে পারে। * অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে ছেলেমেয়েরা কাজ করলে নানা জিনিষ

* The Board however are unable to endorse the view that education at any stage and particularly in the lowest stages can or should be expected to pay for itself through the sale of articles produced by the pupils. The most which can be expected in this respect is that sales should cover the cost of the additional materials and equipment repuired for practical work.'—Post-war Educational Development in India. p.7

উৎপাদিত হয়। বিচার বিবেচনা করে কাজ করলে, ভাল ভাবে শিখাবার ব্যবস্থা করলে, যে সব জিনিষ উৎপন্ন হয় তা ঔৎকর্ষের দিক থেকে মন্দ হয় না আর তার মূল্যও নেহাৎ কম হয় না। মালকানী রিপোর্টে এই উপার্জনকে উপেক্ষা না করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতের সমস্ত ছেলেমেয়ে যদি শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ৫ কোটি ছেলেমেয়ে শিক্ষা লাভ করবে। এরা যদি মাসে একটি মাত্র করে টাকাও উপার্জন করে, কাঁচা মালের মূল্য ছাড়া, তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রমের মজুরী স্বরূপ বৎসরে আয় হবে ষাট কোটি টাকা। এটা যে উপেক্ষা করার মত বিষয় নয় এইটুকুই মাত্র বলা হয়েছে। এটা স্বাবলম্বনের নীতির স্বীকৃতি নয়। অভিজ্ঞতা লব্ধ একটি তথ্যকে স্বীকার করা মাত্র।

এই সরকারী নীতির মধ্যে বৈপ্লবিকও কিছু নেই আর বিতর্কমূলকও কিছুই নেই। পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল দেশেই কাজ যে শিক্ষার—বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। কোন দেশেই শিশুরা জবুথবু হয়ে বইএর উপর মাথা গুঁজে চুপ করে বসে থাকে না। তাদের প্রাণশক্তিকে উৎসাহ দেওয়া হয়, তাদের কর্মশক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা হয়, যাতে তাদের যা কিছু শক্তি তা বিশ্ববাসীর সেবায় সবচেয়ে ভাল ভাবে নিয়োজিত হতে পারে।

কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির চর্চা নয়, শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা, তার চরিত্র সৃষ্টিই যে শিক্ষার আদর্শ তাও আজ সর্বদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ জন্য অভ্যাস গড়ে তোলার শিক্ষাকেও বিভিন্ন দেশের শিক্ষামূলক কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত দেখি। ছাত্রেরা যাতে বিদ্যালয়ে সহকারিতার শিক্ষা লাভ করে, এজন্য দলগত খেলা, দলগত কাজ, দলগত দায়িত্ববোধের উপর সকল প্রগতিশীল দেশের শিক্ষাসূচীতেই জোর দেওয়া হয়েছে। এ সকল কারণে পরীক্ষার ধারাও বদলে গেছে। কেবলমাত্র স্মরণ শক্তির পরীক্ষার বদলে দৈনন্দিন কাজের পরীক্ষা হচ্ছে, দলগত কাজের পরীক্ষা হচ্ছে। একদিনের পরীক্ষার বদলে বর্ষব্যাপী প্রচেষ্টার ফলাফল দেখা হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে, স্বাস্থ্য-শ্রীকে ফুটিয়ে তোলার জন্য কর্মপদ্ধতি ঠিক করা হচ্ছে।

কোন স্থায়ী ফল লাভ করতে হলে যে আট বৎসর ব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজন আছে তাও আজ সর্বত্র স্বীকৃত। বিভিন্ন দেশে তাই দেখতে পাই অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাকাল ক্রমাগতই বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভারত স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের এই শিক্ষাধারাকে স্বীকার করে নিয়েছে মাত্র। পরাধীন দেশের শিক্ষা ছিল পরাধীন লোক সৃষ্টির উপযুক্ত করে গড়া। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সে শিক্ষা ব্যবস্থার আয়ু স্বভাবতই ফুরিয়েছে। স্বাধীন ভারত স্বাধীন বিশ্বের দিকে চেয়ে স্বাভাবিক-ভাবেই স্বাধীন দেশের শিক্ষার মূলসূত্রগুলিকে গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে সাধারণভাবে এই অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষাকে নাম দেওয়া হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষা। এ শিক্ষা দেশের বুনিয়াদ গড়ে তুলবে, যাদের উপর দেশের ভবিষ্যৎ রূপ নির্ভর করবে সেই ভাবী নাগরিকদের গড়ে তুলবে—তাই এ শিক্ষার নাম বুনিয়াদী শিক্ষা। এই সহজ অর্থেই ভারতে সরকারীভাবে 'বুনিয়াদী শিক্ষা' নামটিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু 'বুনিয়াদী শিক্ষা' নামটিকে গভীরতর অর্থে গ্রহণ করলেন গান্ধীজী। গান্ধীজীর কাছে 'বুনিয়াদী শিক্ষা' কেবল মাত্র কতগুলি শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার নয়। তাঁর কাছে বুনিয়াদী শিক্ষা একটা শিক্ষা-বিপ্লব, একটা নূতন সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যম—the spearhead of a silent social revolution. এ জন্য কতগুলি মৌলিক ও অনেক পল্লবগ্রাহী সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা ও সরকার গৃহীত বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে কতগুলি মৌলিক প্রভেদ রয়েছে।

সরকার গৃহীত বুনিয়াদী শিক্ষার নাম পরিবর্তনের কোন প্রশ্ন নেই। সামাজিক বিপ্লব সাধন সরকারের কাজ নয়, সরকারের কাজ সমাজের বর্তমান অবস্থাকে মেনে নিয়ে তার মধ্যে যতটা উন্নতি সাধন করা যায় সেই চেষ্টা করা। সংস্কারকের কাজ, বিপ্লবীর কাজ এর চাইতে অনেক ব্যাপক। তিনি সামাজিক ব্যবস্থার ভিতটিকে উল্টে দিতে চান। গান্ধীজী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য এমনি একটা আমূল পরিবর্তন। সেজন্য গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার পেছনে একটা সামাজিক আদর্শ রয়েছে, সরকারী পরিকল্পনায় তেমন কিছুই নেই।

গান্ধীজী যে সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন তার ভিত্তি হবে সত্য ও অহিংসার উপর। প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে, নেবে প্রয়োজন অনুসারে। নিজের প্রতিভা কারু নিজের সৃষ্টি নয় একথা উপলব্ধি করবে প্রত্যেক লোক; উপলব্ধি করবে ভগবানের এই আশীর্বাদকে মর্যাদা দিতে হলে, ভগবানের এই স্নেহের যোগ্য হতে হলে নিজের প্রতিভা দিয়ে সেবা করতে

হবে সমাজের। অর্থের বিনিময়ে নয়, ভালবাসার বিনিময়ে, শ্রদ্ধার বিনিময়ে। এজন্য গান্ধীজী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ যাঁরা করতে যাবেন তাঁদের মধ্যে হাজারো রকমের বেতনের গণ্ডী থাকবে না। তাঁরা শিক্ষাকে ভালবাসেন বলেই, শিক্ষাদান কর্মে তাঁদের নিপুণতা আছে বলেই তাঁরা শিক্ষাব্রত গ্রহণ করবেন। শিক্ষার প্রতি ভালবাসা, শিশুর প্রতি ভালবাসাই হবে তাঁদের কাজের প্রেরণা।

সরকারী বুনিয়াদী শিক্ষায় রয়েছে বহু শ্রেণীর বেতন, বহু প্রকারের পদমর্যাদা, আর এগুলিকে কেন্দ্র করে বহু প্রকারের ঈর্ষা অবিশ্বাস। গান্ধীজীর পরিকল্পনায় এই অযথা আর্থিক শ্রেণীভেদ থাকবে না, দেশের অবস্থা বিবেচনায় যতটুকু সর্বনিম্ন প্রয়োজন ততটুকু পাবার ব্যবস্থা প্রত্যেক শিক্ষকেরই থাকবে এবং শিক্ষকও চেষ্টা করবেন তাঁর প্রয়োজনের বিষয়ে তিনি কতখানি স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারেন। ভাল কাজের পুরস্কার হবে অধিকতর মর্যাদা এবং দায়িত্ব সম্পন্ন কাজ করার অধিকার পাওয়া, আর্থিক উন্নতি নয়।

শিক্ষকের এই দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত করবে ছাত্রদের। তারাও কাজের প্রতি শ্রদ্ধা বশেই কাজ করবে। তারাও চেষ্টা করবে স্বাবলম্বী হবার। তারাও চেষ্টা করবে পরস্পরকে ভালবাসতে, নিজের বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সমাজকে সেবা করতে। তারাও প্রথম থেকেই শ্রদ্ধা করতে শিখবে সমবণ্টনের নীতিকে।

চৌদ্দবৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েই সকল কাজ করবে। এটা হবে তাদের যোগ্যতাকে যাচাই করে নেবার সময়। কোন্ কাজের মধ্য দিয়ে তারা সত্যি সত্যি সমাজকে সেবা করার যোগ্য তার বিচার হবে আট বৎসর ব্যাপী কাজের হিসাব দেখে। সরকারী বুনিয়াদী শিক্ষায় ৫ বৎসর পরে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যাবার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা এই বৈপ্লবিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেছে। ১৩ বৎসর বয়সের আগে শিশুর কর্মক্ষমতার সঠিক পরিমাপ কিছুতেই হতে পারে না, কোন্ কাজের সে যোগ্য তার বিচার এর আগে করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনাটাই থাকে বেশী। বর্তমান কালের বুদ্ধিজীবীদের ছেলেমেয়েকে বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যসূচী থেকে বাইরে নিয়ে আসার ইচ্ছার ফলেই এই ব্যবস্থাটি হয়েছে।

সরকারী বুনিয়াদী শিক্ষা এবং গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রভেদ রয়েছে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ নির্বাচনের পদ্ধতির মধ্যে। সরকারী ভাবে শুধু এটুকুই মেনে নেওয়া হয়েছে যে, বুনিয়াদী

বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে কাজ। যে কোন কাজ শিক্ষাদানের পক্ষে সুবিধাজনক তাই সেখানে নির্বাচন করা চলে। এখানে প্রথম চিন্তা করা হয় কি শিক্ষা দেওয়া হবে, তার পর চিন্তা করা হয় কোন্ কাজের মধ্য দিয়ে শিশু সহজে এই শিক্ষা পেতে পারবে।

গান্ধীজী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজ নির্বাচনের পদ্ধতিটা একেবারে উল্টা। কাজের মধ্য দিয়ে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ শেখে এ তো একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। আসল কথা হচ্ছে কোন্ কাজে মানুষ মানুষ হয় আর কোন্ কাজে মানুষ অপদার্থ অথবা কুড়ে হয়ে যায় সেই বিচার করা। কি রকম কাজ করলে মানুষ স্বাবলম্বী হবে, বুদ্ধির জোরে অন্যকে ঠকিয়ে নিজে বড় হবার চেষ্টা করবে না এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজে পীড়ন এবং হিংসাকে প্রবিষ্ট করাবেনা!

গান্ধীজীর মতে মানুষ যদি নিজের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য কাজগুলি নিজের হাতে আনন্দের সঙ্গে করতে না শেখে, তবে সে অপরকে খাটিয়ে ঐ কাজগুলি করিয়ে নেবার ফন্দি খোঁজে। মানুষ স্বাবলম্বী না হলে পর-পীড়ক হয়। এ হলেই সমাজে ঢোকে মিথ্যা আর হিংসা। সুতরাং তাঁর মতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ হচ্ছে শিশুদের স্বাবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া। অন্ন, বস্ত্র, আবাস আর পরিচ্ছন্নতা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। তাই প্রত্যেকে সর্বপ্রথমে শিখবে এই কাজগুলি আনন্দের সঙ্গে এবং নিপুণতার সঙ্গে করতে। এগুলি উৎপাদন করা, এসবের ব্যবস্থা করা যে মানুষ হিসাবে তার সর্বপ্রথম করণীয়, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই শিক্ষাই সে লাভ করবে। ভাল ভাবে যে কোন কাজ করতে গেলে মানুষকে অনেক কিছু শিখতে হয়; সেই শিক্ষা শিশুকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দিতে হবে এই সব কর্মের মাধ্যমে। সেজন্য গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথমে শিক্ষার বিষয়বস্তু ঠিক করে নিয়ে তারপর কি কাজের মধ্য দিয়ে এই বিষয়বস্তু পরিবেশন করা হবে এ খোঁজ করা হয় না। এখানে শোষণহীন, সত্য ও অহিংসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাগরিক হতে হলে কোন্ কোন্ কাজ করা উচিত তাই প্রথমে ঠিক করতে হয়, তারপর সেই কাজ বুদ্ধিযুক্ত ভাবে করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই নানা শিক্ষা এসে পড়ে।

এজন্য গান্ধীজীর মতে স্বাবলম্বন হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষার acid test—চরম পরীক্ষা। সরকারী ব্যবস্থায় আর্থিক স্বাবলম্বনের কথাই মাত্র চিন্তা করা

হয়েছে এবং সেই আর্থিক স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে সম্পূর্ণ হতে পারে না এটাই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। গান্ধীজীর কাছে স্বাবলম্বনের আর্থিক এবং মানসিক দুটো দিক আছে। আর্থিক দিকের বিচার কিন্তু অর্থ দিয়ে করা হয় নি—করা হয়েছে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন দিয়ে। একজন শিক্ষক যদি ত্রিশজন ছাত্র নিয়ে কাজ করেন তবে আট বৎসর কাজ করতে পারলে আট বৎসরে একত্রিশ জন লোকের যা প্রয়োজন তা উৎপাদিত হবে। আর তা যদি না হয় তবে শিক্ষাকালকে আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু স্বাবলম্বনের একটা অত্যন্ত জরুরী দিক হচ্ছে মানসিক দিকটা। মানুষ প্রথম নিজের হাতে নিজের একান্ত প্রয়োজনীয় সবগুলি কাজ করার শিক্ষা পাবে। সবগুলি কাজই সে করতে শিখবে আনন্দের সঙ্গে অত্যন্ত সহজে। এসব কাজ নিজে করতে না পারলে সে অস্বস্তি বোধ করবে, নিজকে অকর্মণ্য বলে বোধ করবে। এই ভাবটি প্রত্যেকের মনে এলে সমাজে অযথা পীড়ন থাকবে না, মিথ্যাচার থাকবে না। এই মানসিক বিপ্লবটাই বুনিয়াদী শিক্ষার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। আজ কাল যে কাজ করে যায় সেই ছোট লোক, আর যে কাজ না ক'রে সব কিছু লাভ করে সেই সাধু। এই মনোবৃত্তিই বর্তমান সমাজে বহু অবাঞ্ছিত ব্যবস্থার জন্য দায়ী। আচার্য বিনোবা সেদিন বলেছেন 'একমাত্র শ্রমিকই সাধু, প্রতিষ্ঠাবান মাত্রেই চোর।' বুনিয়াদী শিক্ষা সমাজ-মানসে এই ভাবটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

বুনিয়াদী শিক্ষার দুটি পরিকল্পনার মধ্যে এই মৌলিক তফাৎগুলি বুঝতে পারলেই অন্যান্য সমস্ত খুঁটিনাটি তফাৎ স্পষ্ট হয়ে যাবে। সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বিপ্লব করা সরকারের কাজ নয়। সরকার জনমানসের প্রতিচ্ছায়া। নূতন সমাজ যদি আমরা চাই, গান্ধীজীর সমাধানকে যদি আমরা গ্রহণ করি তবে জনমনে সেই সঙ্কল্পকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা হলেই বর্তমান ব্যবস্থা পাল্টাবে—এ ছাড়া কিছুতেই নয়।

রঙ্-বদল

দক্ষিণারঞ্জন বসু

ফুল ফোটার যে কী ব্যথা তা'
পাইনে টের।
কিন্তু ঢের জানি ভাই,
আনন্দ কি
নতুন ছেলের মুখ দেখার!
মরণ-বন্ধু নিয়েছে, নিক্—
চাইনে ফের।
চৌচির বুক,
শুক্‌নো শূন্য দুধ-সাগর।
বোঝেনা পেট,
জোটানো দায় ক্ষুদ-কুড়ো।
হালফিল্ এ নয় ঘটনা
আচম্‌কা।
দম-লাগানো ঘড়ির মতো
একটানা
অশ্রুর ঝড় ঝরেই চলে।
রুখবে কে?
অনেক দূরে আওয়াজ নাচে।
ঘোরসওয়ার।
হাওয়ার চেয়ে জোর বেগে ধায়।
কাল শুনি।
হাল ছেড়ে সব মাল গোছাতে
ব্যস্ত নাবিক এই ধারে।
রঙ্-বদলের চল্‌ছে পালা
পুরাণ-কেল্লার,
লালদীঘির!

নারীর নিজরূপ

নারী একাধারে রমণী ও জননী। সে একান্ত রমণীও নয়, একান্ত জননীও নয়। একই নারীর এপিঠ-ওপিঠ হইতেছে রমণীত্ব ও জননীত্ব; দুই-ই অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত। সে তাই রমণীত্ব ও জননীত্বের সমন্বয়মূর্ত্তি, অখণ্ড নারী-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। স্বভাবতঃ নারী পূর্ব্বে রমণী, পরে সে জননী; রমণী না হইয়া তো সে জননী হয় না, আবার জননীত্ব না থাকিলেও নারীর রমণীত্ব নিস্ফল, বন্ধ্যা দোষে দুষ্ট। স্বামী-পুত্রযুক্ত যে নারী, সেই পরিপূর্ণ সার্থক। তাঁহাকে একান্ত রমণী বা জননী বলিয়া দেখিলে বা ব্যবহার করিলে তাঁহার স্বরূপের চ্যুতিই হয়, বাস্তব সহজ সত্তাকেই অস্বীকার করা হয়। রমণীত্বকে মুছিয়া ফেলিয়া নারী একান্ত জননীত্বের সংস্কারে আটকাইয়া গেলে সে যেমন তাহার আত্মস্বরূপের একদিকের অপমান করে, পক্ষান্তরে সে যদি জননীত্বের পরিপূর্ণ মর্য্যাদা না দিয়া রমণীত্বের সংস্কারে গা' ঢালিয়া দিয়া এই সংসারটাকে একান্ত ভোগ বিলাসের স্থান বলিয়া তাহাকে সেই ভাবে ব্যবহার করিতে চায়, তবে সে অখণ্ডত্বের উপরে জুলুম করিবার অপরাধে অপরাধিনী হয়। নারীর পক্ষে রমণীত্বও উপাধি, জননীত্বও উপাধি। সে যখন সহজ, তখন সে রমণী-উপাধি বর্জ্জিত এবং জননী উপাধি-বর্জ্জিত। আমরা এই সহজ নারীর মূর্ত্তি ভারতবর্ষে সীতা দ্রৌপদী সুভদ্রা কুন্তী প্রভৃতির জীবনে দেখিয়াছি। তাঁহারা রমণী হিসাবে সার্থক রমণী, জননী হিসাবেও সার্থক জননী; তাঁহাদের জীবনে রমণীত্ব ও জননীত্ব সমঞ্জসীভূত। তাঁহাদের জীবনে রমণীত্ব ও জননীত্ব পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় নাই; তাঁহারা রমণী থাকিয়াও সার্থক জননী, জননী থাকিয়াও সার্থক রমণী। রমণীত্ব যোগাইত তাঁহাদের জীবনে আনন্দ-রস, জননীত্ব যোগাইত তাঁহাদের জীবনের স্থিতি। রমণী লীলাময়ী, জননী কৈবল্যময়ী; অখণ্ড সমগ্র নারী একাধারে লীলা-কৈবল্যময়ী। রমণী বিলাসিনী, জননী তপস্বিনী। রমণী মায়াবিনী, জননী যোগিনী। রমণী গতিশীলা, জননী স্থিতির মূর্ত্তি। নারী সমগ্রভাবে যোগমায়া—একাধারে যোগিনী ও মায়াবিনী। এই যোগমায়া-শক্তির উপাশ্রয়েই পুরুষোত্তম

শ্রীকৃষ্ণ এই ধূলি-মলিন বিশ্বের দিব্য রূপান্তর বিধান করিবার জন্য, গোলোকে গড়িয়া তুলিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একান্ত রমণী বা একান্ত জননী-শক্তিদ্বারা 'ধরার ভার' হরণ করা সম্ভব নয়। সৃষ্টির একদিক স্থিতি অপর দিক গতি; গতিহীন স্থিতিও সংসারের ভার, স্থিতিহীন গতিও সংসারের ভার। ধরার এই দুই ভার হরণ-উদ্দেশ্যে পুরুষোত্তম যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন। যোগমায়ার অংশরূপিণী এই সংসারের নারীও তাই একাধারে মহামায়া ও মহাযোগিনী। ইহাই কাত্যায়ন পুজিতা কাত্যায়নীর স্বরূপ, যাহার উপাসনা করিয়া ব্রজগোপীগণ পুরুষোত্তমকে 'পতি' রূপে পাইয়াছিলেন।

'হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥' ভাগবত ১০।২২।১

—'হেমন্তের প্রথম মাসে নন্দব্রজকুমারীগণ হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া কাত্যায়নী-অর্চ্চনা ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন।'

কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥' ভাগবত ১০।২২।৪

—'হে কাত্যায়নী মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরি, জীবন-ঘন নন্দগোপ-সুতকে পতিরূপে প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার।'

পরাশক্তি কাত্যায়নীই বর্ত্তমান যুগে শ্রীদুর্গারূপে পুজিতা। এই দুর্গাদেবীই শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী; শ্রীকৃষ্ণের রসলীলার পথ সুগম করিবার জন্যই ব্রজে তাঁহার নিত্য স্থিতি। তিনি শুধু মহামায়া নন, তিনিই একাধারে মহামায়া ও মহাযোগিণী। তিনি এক রূপে 'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী, আর একরূপে তিনিই আবার শিব-প্রাপ্তির সাধনায় মহাতপস্যায় নিমগ্না। কোন্ রূপকে আমরা গ্রহণ করিব? তিনি হর-মনোরমা শিবাণী; আবার তিনিই কার্ত্তিকেয়-জননী, গণেশ-জননী। কোন্ রূপের আমরা পুজা করিব?

প্রধানতঃ এই সমগ্র পরাশক্তির জননীত্বের দিকই ভারতবর্ষ নিয়াছে, যাহার ফলে সে পরাশক্তিকে 'মা' বলিয়াই ডাকিয়াছে, মাতা পুত্র সম্বন্ধের ভিতর দিয়া এই বিশ্বসৃষ্টিকে ব্যাখ্যা ও আস্বাদন করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সৃষ্টির পরিপুর্ণ ব্যাখ্যা হয় না। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য নিয়াছে প্রধানতঃ এই পরাশক্তিরই রমণীত্বের দিক। তাহাতেও সৃষ্টি অব্যাখ্যাতই রহিয়া গিয়াছে। প্রাচ্য সভ্যতা মূলতঃ তাই যোগের উপরে, স্থিতির উপরে ভারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে, যাহার ফলে জ্ঞান-বৈরাগ্য-তপস্যার সাধনাই সে

মাতৃরূপিণী পরাশক্তির কোলে বসিয়া শিখিয়াছে। পাশ্চাত্য উপাসনা করিতেছে পরাশক্তির রমণীত্বের দিকের, গতির দিকের, যাহার ফলে সে বিশ্বকে ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল, চঞ্চল, শুম্ভ-নিশুম্ভের মতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির মাধ্যমে পরাশক্তিকে চুলের মুঠা ধরিয়া ঘুরাইতেছে। কিন্তু এই আস্পর্দ্ধার দৌড় বেশী দূর নয়। দেবতারা যোগের উপাসক, অসুরশক্তি ভোগের উপাসক ; কেহই পরিপুর্ণের খোঁজ পায় নাই। কিন্তু শ্রীদুর্গাশক্তির ভিতর বর্ত্তমান যুগে আমরা পরিপুর্ণ শক্তির উপাসনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

ভারতবর্ষ পরাশক্তির এক শাখা ঐ স্থিতিশক্তির উপাসনা করার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নারীর রমণী মূর্ত্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে পারে নাই। তাই নারী এই সভ্যতায় বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি',—স্ত্রী কখনও স্বাতন্ত্র্য লাভের যোগ্য নহে। একবার ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য ধরিয়া লইলে নারীকে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই বিবাহ দিতে হয়। গৌরীদান প্রভৃতি এই 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি' নীতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল। এ দেশ দীর্ঘ দিন হইতে নারী ও নরের সম-স্বাতন্ত্র্যের উপর সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহে নাই। দুইকে দুই রাখিয়া এক অদ্বৈত সমাজ গড়িবার কৌশল সে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছে, যদিও বহু প্রাচীন যুগে এই সম-স্বাতন্ত্র্যের উপর সমাজ গড়িবার কৌশল জানা ছিল বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। এ দেশের দর্শন মায়াকে ব্রহ্মের ভিতর মুছিয়া ফেলিয়া ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করিয়াছে এবং ঠিক এই ছাঁচে সমাজ গড়িয়া তুলিতে গিয়া এ দেশের মনীষিগণ নরের ভিতর নারীকে মুছিয়া ফেলিয়া, যোগের ভিতর মায়াকে মুছিয়া ফেলিয়া, স্থিতির ভিতর গতিকে স্তব্ধ করিয়া একতরফা নর-প্রধান, যোগ-প্রধান, স্থিতি-প্রধান কাঠামো দাঁড় করাইয়াছে। দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই নারীর স্বাতন্ত্র্য বোধ (individuality) জন্মায় না। স্বামী মদ খাইয়া, ব্যভিচার করিয়া টলিতে টলিতে আসিলেও 'পতি পরম গুরু' জপে অভ্যস্ত বার বৎসরের নারীর প্রশ্ন করিবার সাহসই হইবে না, কোথা হইতে কেন এত রাত্রিতে সে আসিল। নারীর এই ভাবের সাধনায় ধীরে ধীরে পুরুষ স্ত্রীর একচ্ছত্র মালিক হইল, স্ত্রীর তরফ হইতে সমস্ত প্রতিবাদ বা অধিকার দাবীর পথ রুদ্ধ হইল। এ দেশের নারীরা যে স্বরূপতঃ জননী এই কথা বার বার দর্শন ক্ষেত্র হইতে

প্রচারিত হওয়ার ফলে সে নিজেরই অপর দিক ঐ রমণীত্বকে আড়াল করিয়া চলিয়াছে। নিজ অখণ্ড পরিপূর্ণতার একদিককে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, নারীর রমণী হিসাবে তাহার সকল দাবী নিঃশেষে চাপা পড়িল, তাহার সমস্ত দৃষ্টি স্বামীত্বের দিক হইতে রুদ্ধ হইয়া সন্তানের দিকেই প্রবাহিত হইতে চলিল, নারী একান্ত 'মা' হইল। পুরুষদের অবাধ কর্তৃত্ব, কায়েমী স্বার্থ (vested interest) ও দায়িত্ববোধহীনতার হেতু এবং নারীদের রমণীত্বের দিক উপবাসী থাকার ফলে রমণীত্ব শুকাইতে লাগিল।

কিন্তু পরাশক্তি তো চুপ করিয়া নাই, তিনি তাঁহার পূর্ণ শক্তির অন্তর্গত চাপা-পড়া নিরুদ্ধ দিকটাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রেরণা দান করিতে লাগিলেন। এই সূত্র ধরিয়া পাশ্চাত্যের রমণীত্বের উপাসনা প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় এ দেশের জননীত্বের উপাসকদিগকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। নারীর রমণী মূর্ত্তি, বিলাসিনী মূর্ত্তি জননী মূর্ত্তিকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিল, স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইল, বাল্যবিবাহ বন্ধ হইল, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশের মণীষিগণ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, সহমরণ প্রথা উঠিয়া গেল, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ নারী পথে বাহির হইল, পুরুষদের সকল ক্ষেত্রকে ছাপাইয়া তাহাদের বিলাস মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, নর-নারীর সহ-শিক্ষা, অবাধ-মিলন ঠেকাইবার আর কোন সম্ভাবনাই রহিল না। নারী আজ কালের স্রোতে প্রকৃতির বিধানে সর্ব্বক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ। স্কুল কলেজে নারী যোগ্যতার সহিত কৃতকার্য্যতা লাভ করিতেছে, অফিসে অফিসে নারী কর্ম্মচারীর অভাব নাই, উকিল ব্যারিষ্টার নারী, পুলিশ নারী, নারী লাট সাহেব, নারী রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি। পথে ঘাটে নারীদের পুরুষদের পাশাপাশি দাঁড়ানো আজ বাস্তব সত্য। বার বৎসরের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ আজ কল্পনার বস্তু। অথচ এদেশের কোন স্মৃতিই বার বৎসরের পর বিবাহের ব্যবস্থা দেন নাই। রজস্বলা মেয়ের বিবাহ দিলে পূর্ব্বপুরুষ পর্য্যন্ত কলঙ্কিত হয়—ইহা স্মৃতির ব্যবস্থা। অথচ এই কলঙ্ক ঘরে ঘরে পিতৃ-পুরুষদের কলঙ্কিত করিয়া চলিয়াছে।

নর-নারীর অবাধ মিলনের বিরুদ্ধে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ কতখানি কিরূপ তীব্র মনোভাব পোষণ করিতেন, তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকটীতে পরিস্ফুট হইবে।

'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবান ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥'

'মাতা, ভগিনী কিম্বা কন্যার সহিত কখনও নির্জ্জনে একাসনে বসিবে না। কেননা বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান পুরুষকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে।'

যেখানে মাতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, বা পিতা-কন্যার নির্জ্জন আসনে অবস্থান পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ, সেখানে সম্পর্কহীন নর-নারীর অবাধ মিলন যে ভারতীয় সভ্যতার পক্ষে কত বড় বিপজ্জনক, ইহা সহজেই বুঝা যায়। নর-নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ বাস্তবিক পক্ষে সমাজের কত বড় সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাই সঙ্গত ভাবেই এদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষ ও মেয়েদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মেয়েরা থাকিতেন ঘরের ভিতরে, আর পুরুষেরা বাহিরে ; উভয়ের পারস্পরিক মেলা-মেশা যত দূর সম্ভব সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল। ভাশুরের সহিত ছোট ভ্রাতৃ বধূর কথাবার্ত্তা ছিল নিষিদ্ধ, শাশুড়ীরা জামাতার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। মেয়ে মেয়ের ক্ষেত্রে, পুরুষ পুরুষের ক্ষেত্রে। কিন্তু আজ তো আর এই ক্ষেত্রবিভাগ চলিতেছে না। একই ক্ষেত্রে নর-নারী আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে, বিপদ তাই জাতির শিয়রে। প্রজ্জ্বলিত আগুনে পতঙ্গের মত কামের আগুনে পুড়িয়া মরিবার জন্য একটা জাতি প্রস্তুত হইতেছে। ইহা অসহ্য। অভিভাবকগণ কোন্ সাহসে নিজেদের পুত্র-কন্যাদের স্কুল-কলেজে পাঠান, যেখানে অবাধ মিলনের দ্বার অবারিত। অবাধ মিলন যে সহস্র সহস্র ছেলে-মেয়ের সর্ব্বনাশ বিধান করিতেছে, এবং যাহার ফলে সমাজের ভিত্তিমূলই ধ্বসিয়া যাইতেছে তাহার দৃষ্টান্ত কি বিরল? কিন্তু যে মন্ত্র সমাজপতিগণ, অভিভাবকগণ এই সব ছেলেমেয়েদের কানে দিলে তাহারা নিরাপদে ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিত, সে মন্ত্রের খোঁজ কি তাঁহারা পাইতে চান? এ দেশের সমাজপতিগণ বেহুঁস, অভিভাবকগণ চোখের উপর এই বিপদ সম্ভবনা দেখিয়া দিশেহারা।

এই বিপদপাত এড়াইবার জন্য কি আর পিছনে ফিরিয়া যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে? পথে-বাহির-হওয়া মেয়েদের কি আর ঘরে ফিরাইয়া আনা সম্ভব? বাল্য-বিবাহ প্রবর্ত্তন তো কল্পনাও করা যায় না। স্কুল কলেজ বন্ধ করিয়া মেয়েদের একান্তভাবে ঘর-কন্নায় নিয়োগ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। অথচ সামনের দিকে তাহার পথও খোলা নাই। সামনের দিক একেবারে বন্ধ (closed)। বর্ত্তমানে স্কুলের মেয়েদের যে নৃত্য-গীত শেখানো হয়, তাহা তো জননীত্বের সাধনার অনুকূল নয়। কেননা, নৃত্য-গীত এ

দেশের শাস্ত্রে কামবর্দ্ধক। নৃত্য-গীত প্রভৃতি কলাগুলির সঙ্গে রমণীত্ব-বিকাশের বিশেষ যোগ রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে কিন্তু নারীদের জন্য নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা ছিল। উত্তরার নৃত্য-শিক্ষক ছিলেন অর্জ্জুন, বেহুলা নৃত্য কলা দেখাইয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে বর চাহিয়া লক্ষীন্দরকে বাঁচাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভারতের আবহাওয়া সকল দিক দিয়া নারীর রমণীত্বের শিক্ষা ও অধিকার দানের জন্য উন্মত্ত হইয়াছে। নারী বিত্তের অধিকার চায়, নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ চায় ইহা দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠিলে চলিবেনা। আজ ইহার মুল কারণের খোঁজ করিতে হইবে। নারীদের এই চাওয়া কি শুধুই নিরর্থক? পুরুষরা যদি পুরুষোত্তম হইতেন, শোষণের পথ ছাড়িয়া পোষণধর্ম্মী হইতেন, নারীদের পক্ষ হইতে এ দাবী উত্থিতই হইত না। কিন্তু যেখানে দর্শন, শাস্ত্র, সমাজ নারীর সহযোগে নারী-সমস্যার সমাধান করে নাই, নারীর স্বয়ংমূল্য স্বীকার না করিয়া শুধু পুরুষকৈন্দ্রিক সমাজই গড়িয়াছে, সেখানে দুই এক জন পুরুষ সৎ পুরুষ থাকিলেও সাধারণ পুরুষ নিজ কায়েমী স্বার্থের গর্ব্বে ও অহঙ্কারে নারীকে শোষণ করিয়া চলিয়াছে। তাই আজ নারী-সমাজ ক্ষিপ্ত। নারীর অন্তরের মোহিনী কালী শক্তির উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যে সমাজকে বিপন্ন করিয়াই তুলিয়াছে। কোথায় শিব, কোথায় পুরুষোত্তম, যাহার বুকে দাঁড়াইয়া এই উচ্ছৃঙ্খল-শক্তি লজ্জায় জিভ কাটিবেন, শিবের বুকে শিবানী রূপে স্থিতি লাভ করিবেন? নারীর এই উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যের পজিটিভ দিক হইতেছে শিবের বুকে তাঁহার স্থির হইয়া দাঁড়ানো, সমাজ-কল্যাণে তাঁহার এই নৃত্যকে কাজে লাগানো, সার্থক রমণীত্বের সঙ্গে সার্থক জননীত্বের সমন্বয় বিধান করা। এ দেশের তন্ত্র এই রমণী-জননীর সমন্বয়ের বার্ত্তাই পৌছাইয়াছেন। আজ বেদ-পুরাণ-তন্ত্র সমন্বিত হইবে, সে দিন খুব দূরে নয়।

পুরুষদের পক্ষে এই রমণীভাবকে আর এড়াইয়া চলিবার সম্ভাবনা নাই; সে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে রমণীত্বের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সে আজ রমণীত্বের কাছে ধরা পড়িয়াছে; ভাগবতের ভাষায় সে 'স্ত্রীজিত'। তাহার কি আর পশ্চাৎপদ হইবার সম্ভাবনা আছে? আজ তাহাকে এই আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া (face) যুদ্ধ করিতেই হইবে। চণ্ডীর ভিতর বিশ্ব-প্রকৃতি সুগ্রীবের মারফত কামুক শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে যুদ্ধঘোষণা পাঠাইয়াছিলেন—

'যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥'

আজ বিশ্বের পুরুষদের সামনেও প্রকৃতির সেই যুদ্ধঘোষণাই চতুর্দ্দিকে প্রকট দেখিতেছি। কোথায় ইহার সমাধান! ইহার সমাধান আমরা দেখিয়াছি বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রাসলীলার মধ্যে।

এই বিশ্বের বুকে আছেন একমাত্র 'পুরুষ' শ্রীকৃষ্ণ, যিনি এই রমণী-প্রকৃতির আহ্বানকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, রমণীভয়ে ভীত হইয়া যিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, রমণীত্বের দিক হইতে দৈহিক মানসিক সর্ব্ববিধ আক্রমণের সামনে যিনি নিজ ব্রহ্মচর্য্যকে অটুট রাখিয়াছিলেন, 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ'-রূপে মদন-মোহন-রূপে রমণী প্রকৃতি জয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীধর স্বামী এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মধুর হইতেও মধুর একটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন—'ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্প-দর্পহা'। ব্রহ্মাদি দেবগণকে জয় করিয়া সংরূঢ় হইয়াছে দর্প যে কন্দর্পের, সেই কন্দর্পের দর্প যিনি হনন করেন তিনিই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। তাই গোপালতাপনী উপনিষদে ব্রজগোপীগণ মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'কথং কৃষ্ণঃ ব্রহ্মচারী'—শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়া ব্রহ্মচারী? আজ বিশ্বমানবকে শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মচর্য্য শিখিতে হইবে। প্রকৃতির বিধানে নর-নারী আজ এমনি এক দুশ্ছেদ্য জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, কাহাকে ফেলিয়া কাহারও পালাইবার পথ নাই। পুরুষ বা নারী পলায়নপর (escapist) মনোবৃত্তি লইয়া কিছুতেই এককভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। আজ তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ জীবনে জীবনলাভ করিয়া কৃষ্ণ-ব্রহ্মচারী হইবার কৌশল শিখিতেই হইবে। নারী আজ সর্ব্বক্ষেত্রে এমনকি মঠ মন্দিরেও পুরুষের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা জননী-উপাসনায় একান্তভাবে ভাবিত হইয়া আছি বলিয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ এই রমণী-শক্তিকে ভয়ের চক্ষে দেখিতেছি। তাই তাহাকে সামলাইতে পারিতেছি না। নারীর রমণীত্ব লইয়া পাশ্চাত্য এত বিপদে পড়ে নাই; কেননা, এই দিক দিয়া তাহাদের একটি সামাজিক ট্রেনিং আছে; তাহারা ইহাতে অভ্যস্ত। এ দেশের ছেলে-মেয়েরা এ বিষয়ে একান্ত অনভ্যস্ত। আমাদের দেশের মেয়েরা যেহেতু 'মা', সেই জন্যই তাহারা স্বামী অপেক্ষা পুত্রের দাবী সম্বন্ধে বেশী সচেতন: আর ও দেশের মেয়েরা সচেতন স্বামীর দাবী সম্বন্ধে। যদি স্বামী ও পুত্রের মধ্যে কোনও কিছু লইয়া মতের বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে এ দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ পুত্রের পক্ষই সমর্থন করে। এই অভিজ্ঞতা বর্ষীয়ান্ প্রতি পুরুষেরই আছে।

নারীর একদিকে স্বামী, অপরদিকে সে পুত্রের সঙ্গে যুক্ত; কোনও টানই তাহার পক্ষে গৌণ বা মুখ্য হওয়া উচিত ছিল না। এই দুই দিকের আকর্ষণকে যে নারী সমান মূল্য দিয়া সামলাইতে পারেন, তিনিই পরাশক্তির অংশ, সাক্ষাৎ দুর্গাস্বরূপিনী। একান্ত জননীও ব্যর্থ, একান্ত রমণীও ব্যর্থ, সার্থক নারী একাধারে জননী রমণী, রমণী জননী।

রমণী-জয়ের সাধনার প্রথম স্তর হইতেছে রমণীত্বকে জননীত্বের সঙ্গে তুল্য মূল্যে স্বীকার করা, রমণীত্ব-জননীত্বের সমন্বয় বিধান করা। কাম একান্ত রমণীত্বকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া তো থাকেই, একান্ত জননীত্বকে আশ্রয় করিয়াও সে বেশ বাঁচিয়া থাকে। 'মা' ভাবিলেই কি নারী একান্ত 'মা' হয়? তাহার যে স্বতঃসিদ্ধ রমণীত্ব। নারী রমণীত্বকে পিষিয়া মারিয়া একান্ত জননী সাজিতে গেলেও তাহার নিগৃহীত রমণীশক্তি প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া পুরুষকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। রমণীশক্তি একবার ক্ষিপ্ত হইলে সে আর জননী হইতে চায় না, জননীত্বের উপর তাহার একটা আক্রোশ প্রকাশ পায়। আজিকার নারী চরিত্রে এই দিকটা স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। Half truth is its own Nemesis. One-sided dogmatism has the opposite dogmatism latent in itself. একান্ত জননীর দেশে আজ আর বর্ত্তমানের মেয়েরা পারত পক্ষে জননী হইতে চায় না। সন্তান আর কামনার ধন নয়। নারী আজ রমণী হইবে; জননীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আজ তাহারা উদাসীন। কি করিয়া সুন্দর সন্তান সৃষ্টি হইবে? এই বিশ্বসৃষ্টিই বা কি করিয়া রক্ষা পাইবে, অথচ নারীর জননীত্বও যেমন তাহার স্ব-রূপ, রমণীত্বও তেমনি স্ব-রূপ, ইহার কোনও একটি না হইলে নারী আর অখণ্ড নারী থাকিবে না। স্ব-রূপ-চ্যুত নারী সমাজের পক্ষে এক মহা বিভীষিকা, তাহা সে রমণীই হউক বা জননীই হউক।

মদনকে মদন রাখিয়া অর্থাৎ তাহার উপর নিগ্রহ বা চাপ না দিয়া কিম্বা কামোপভোগের প্রশ্রয় না দিয়া যিনি মদনকে মোহন করেন, তিনিই মদনমোহন। জীবের কাম একটা বিকার; ইহা জীবের সুস্থ অবস্থা নয়। জীবনে যখন সামঞ্জস্যের (equilibrium) হানি ঘটে, তখন বিকৃত মনে কামের জন্ম হয়। জীবনে যখন মনের খেলা সুরু হয়, যখন জীবনে যৌগপদ্য-জ্ঞানের (knowledge of simultaneity) অভাব হয়, যখন স্বরূপ ও বিশ্বরূপের,—Self life ও Cosmic life-এর মাঝে সজ্ঘর্ষ সুরু হয়, তখনই

মনোজ কামের জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণতত্ত্বের বল্লভ, তাই তিনি প্রাণবল্লভ। এই প্রাণের মধ্যেই রহিয়াছে মনের লয়, স্বরূপ ও বিশ্বরূপের সমন্বয়। শ্রীকৃষ্ণ 'বিশ্বরূপ' বলিয়াই মদনমোহন। বিশ্বরূপ-সাধনা পরিত্যাগ করিয়া একান্ত ব্যক্তিগত সাধনায় যাহারা রত, তাহাদের পক্ষে মদন দমনের প্রচেষ্টা করা ছাড়া গতি নাই। কিন্তু দমন করিলেই যে মদন দমিত হয় না। বাহিরের রমণীকে এড়াইতে পারিলেও ভিতরের রমণী উর্ব্বশী মেনকার আক্রমণ যে কি ভীষণতর হয়, তাহার ছবি আমরা পুরাণে শত শত বার দেখিয়াছি। 'ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি',—ইহাও যেমন সত্য, 'নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি'—ইহাও তুল্য ভাবেই সত্য। কামের ইন্ধন যোগানো ও নিগ্রহ কোনও একটীই আজ চলিবে না। নিগ্রহ বা প্রশ্রয় কোনও একটীর প্রশ্রয় না দিয়া কেমন করিয়া মদনকে মদনমোহনে রূপান্তরিত করা যায়, তাহার মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণ। আজ নারীকে বিশ্বরূপা হইতে হইবে, স্বরূপ ও বিশ্বরূপের সমন্বয় বিধান করিয়া, জননীত্ব ও রমণীত্বের সার্থক সমন্বয় করিয়া নারীকে পরাশক্তি-রূপিণী হইতে হইবে। এই পরাশক্তিই শ্রীরাধাও। সীতা যেখানে বার বার সতীত্ব-পরীক্ষার তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইখানে মনস্তত্ত্বের সেইক্ষণেই শ্রীরাধা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মদন-মোহন, শ্রীরাধা মদনমোহিনী; তাঁহাদের জীবনে কাম সুস্থ, অবিকৃত, অমৃত। ব্রজের কাম অমৃতদ্রবসংযুক্ত। ভারতীয় নারী চরিত্রের শেষ চরিত্র শ্রীরাধা চরিত্র। বর্ত্তমান ভারতের নারী কুল চাহিতেছে এই শ্রীরাধারই পন্থা অনুসরণ করিতে; কিন্তু বিশ্বরূপ কই, পুরুষোত্তম কই, যাহার অনুবর্ত্তন করিলে তাহাদের এই ঘর-ছাড়া মনোবৃত্তি, উদ্দাম নৃত্য সুস্থ সমাজ সংগঠনে নিয়োজিত হইত? পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ইষ্ট থাকিলে তাহাদের এই ঘর-ছাড়া জীবন রমণীত্ব জননীত্বের সমন্বয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া নূতন সমাজ সৃষ্টি ব্যাপারে সহায়তা করিত। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ব্রজের শ্রীরাধাকেই ক্রমবিকাশের পথে দ্বারকার রুক্মিণীর মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন। রমণীত্বের পরাকাষ্ঠা জননীত্ব! ব্রজলীলার সামাজিক দিক (social aspect) ফুটিয়া উঠিয়াছে দ্বারকার মহিষীদের রূপের মধ্যে। সার্থক রমণীত্বেরই সার্থক আস্বাদন জননীত্ব। বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে শ্রীরাধার স্থান এইখানেই উজ্জ্বল। রমণী জীবনে যিনি সার্থক নন, জননী জীবনে তাঁহার ব্যর্থতা অনিবার্য্য। সীতা যেমন ঐতিহাসিক, রাধাও তেমনি ঐতিহাসিক। নারীর ইতিহাসে প্রথমে রাধা-চরিত্র, পরে সীতা চরিত্র, আমরা রাধাষ্টমী তিথিতে শ্রীরাধার আবির্ভাবকে সকল দেহ প্রাণ দিয়া বরণ করি। বন্দেমাতরম্

শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিদ্যা*

সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে আজ আপনারা আমাকে ডেকেছেন। আপনাদের এই সাদর আহ্বানের জন্যে আমি প্রথমেই বিজ্ঞান কলেজে আমার সহকর্মী ডাঃ চক্রবর্ত্তী এবং আপনাদের সকলকার কাছে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি মনোবিদ্যার চর্চ্চা করে থাকি। যাঁরা এ বিষয়ে পড়া শুনা করেন তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন নিশ্চয় কি রকম দ্রুত গতিতে এ বিদ্যার চর্চ্চা অগ্রসর হচ্ছে এবং জীবনের কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিদ্যালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ হচ্ছে। আর তা হওয়াই ত স্বাভাবিক—কারণ শেষ পর্য্যন্ত দেখলে মানুষের সব চেষ্টার, সব কর্ম্মের মূলেই ত রয়েছে তার মন। কাজেই এই মন সম্বন্ধে যে নতুন তথ্যই আবিষ্কার হবে, সে আবিষ্কার ত মানুষের সব চেষ্টা, সব কাজ সব উদ্দেশ্যকেই প্রভাবান্বিত করে তুলবে। এর অন্যথা আর কি করে হবে।

মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজ ছাড়া একলা সে থাকতে পারে না। কিন্তু এই সমাজে থাকতে গেলে তার একান্ত নিজস্ব অনেক বাসনা অনেক প্রিয় বস্তু তাকে ত্যাগ করতে হয়—তাতে সে কষ্ট পায়। তখন সমাজ সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি হয় তার মনে, সমাজকে না মানবার ইচ্ছা তার প্রাণে জাগে। নিজের দাবী না সমাজের দাবী—এই দ্বন্দ্ব চলে আসচে যুগ যুগান্তর থেকে। দাবীর প্রকার-ভেদ আছে। কিন্তু দ্বন্দ্বের আকারের তারতম্য নেই—আমি না সমাজ? এই হচ্ছে তার একমাত্র রূপ। এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন প্রত্যেক মানুষকেই হতে হয় কারণ প্রত্যেকেই শৈশবাবস্থায় শুধু 'আমি' নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এই 'আমি'র সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্য করবার পথ দেখানই হল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই শিক্ষক মাত্রেরই শিশুমনের এই আমিত্ব এবং তার বিকাশের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন

---

* হাওড়া পূর্ব সদর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও হাওড়া মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আহূত সভায় ২৮ শে আগষ্ট (১৯৫৪) পঠিত।

করা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে শুধু জ্ঞান লাভ করাই যথেষ্ট নয়। কি কৌশলে একে অন্য পথে চালনা করা যেতে পারে তাও তাঁদের জানতে হবে। শিশু-মনের ধারা এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা না থাকলে শিশুকে উপযুক্ত পথে চালনা করার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। মনোবিদ্যা শিশু-মন সম্বন্ধে আলোচনা, পর্য্যবেক্ষণ এবং নানারকম পরীক্ষা দ্বারা অনেক তথ্যের সন্ধান আমাদের দিয়েছে। শিক্ষক মাত্রেরই এই সমস্ত তথ্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা আবশ্যক। এইখানে শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে মনোবিদ্যার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সন্ধান আমরা পাই। একটা কথা বলে রাখা দরকার শিক্ষক অর্থে আমি শুধু শিক্ষাব্রতীদেরই এখানে মনে করছিনা, ৫।৬ বছর বয়সের আগে শিশুরা স্কুলে শিক্ষাব্রতীদের কাছে আসে না। কিন্তু তাদের শিক্ষা তাদের জন্মাবার প্রথম দিন থেকেই আরম্ভ হয় এবং ৫।৬ বছরের ভেতর অনেক অভ্যাস প্রভৃতি তাদের গড়ে ওঠে। এই সময়ের শিক্ষার জন্য দায়ী প্রধানত শিশুদের পিতামাতারা, অভিভাবকরা; সুতরাং তাঁরাও এই সময়ের শিক্ষকদের মধ্যেই গণ্য। বাস্তবিক শিশুদের শিক্ষার ভিত্তি-স্থাপন তাঁরাই করে থাকেন। শিক্ষাব্রতীরা সেই ভিত্তির ওপরেই গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। এ কথাটা আশা করি পিতামাতা এবং অভিভাবকরা মনে রাখবেন এবং উপযুক্তভাবে শিশুরা শিক্ষিত না হলে মাষ্টার মহাশয়দের ওপর সমস্ত দোষ ন্যস্ত করে নিজেদের ও বিষয়ে কোন দায়িত্ব নেই মনে করে স্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁরা যেন অবস্থান না করেন।

শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে খুব ব্যাপকভাবে ছাড়া মনোবিদ্যার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। শিক্ষার আদর্শ সমাজের আদর্শের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মনোবিদ্যার দিক থেকে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, মানুষ মাত্রেরই কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং একজন মানুষের মনোবৃত্তি কখনই আর এক জনের মনোবৃত্তির সর্ব্বতোভাবে অনুরূপ হয় না। মনোবৃত্তির স্বরূপ এবং পরিমাণ প্রত্যেক মানুষেরই বিভিন্ন। সুতরাং সকলের কাছ থেকেই আদর্শের দিকে একই ছন্দে, একই ধরণের অগ্রগতির প্রত্যাশা করা যায় না। এইখানে আবার শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে মনোবিদ্যার যোগাযোগ আমরা দেখি। এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে সব শিশুকেই জোর জবরদস্তি করে সব কিছুই সেখান যায়। আধুনিক মনোবিদ্যা এই একান্ত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করেছে। সে কালেও সব কবিই কালিদাস ছিলেন

না, এ কালেও সকলকেই চেষ্টা করেও রবীন্দ্রনাথ করা যায় না। সব পদার্থবিদ্‌ই নিউটন ছিলেন না, এখনও সকলেই আইনষ্টাইন হন না।

শিশুদের মনোবৃত্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সেই মনোবৃত্তিসমূহের পরিমাণ নিরূপণ করবার উপায় উদ্ভাবন শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দান। আপনারা সকলেই নানা রকমের অভীক্ষার বিষয় অবগত আছেন। বুদ্ধিবৃত্তি, চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী প্রভৃতি কোন্ শিশুর কত পরিমাণ আছে, তা সাধারণ না অসাধারণ—এ সমস্ত আজ অভীক্ষার সাহায্যে অনেকখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায়। এই সব অভীক্ষা শিক্ষার কাজে যেমন সহায়তা করে, সমাজের অনেক অপচয় নিবারণ করতে সাহায্য করে। যার হাতের কাজের দক্ষতা বেশী কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি বয়সোপযোগী যে রকম হওয়া উচিত সে রকম নয়—তাকে বার বার প্রবেশিকা পরীক্ষা—আজ-কাল স্কুল ফাইনাল—দেওয়াবার চেষ্টা না করে কোন কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দিলে তাকে সুশিক্ষাই দেওয়া হবে। তাতে সে তৃপ্তিলাভই করবে এবং নিজের সাফল্যে অনুপ্রেরিত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তেই কাজ করবে। আর শুধু স্কুলে কলেজে পাশ করা ছেলে মেয়ে নিয়েই ত সমাজ চলে না—সমাজে কারিগরেরও ত দরকার আছে। অভীক্ষার সাহায্যে এই রকম করে বেছে নিয়ে যার যে বৃত্তি অধিক পরিমাণে আছে সেই অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দিলে সমাজ সমৃদ্ধিশালীই হবে। গোল গর্ত্তে জোর করে চৌকো জিনিষ বসানোর চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র, শক্তি ও সময়ের অপব্যবহারই সে চেষ্টার একমাত্র ফল। এই উপমা বজায় রেখে বলা যায় মনোবিদ্যা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে, মনোবৃত্তি হিসাবে মানুষের মধ্যেও তারতম্য আছে, কেউ গোল, কেউ চৌকো, কেউ বা ত্রিভুজ প্রভৃতি। সকলকেই এক গোল গর্ত্তে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করা ঐ রকমই পণ্ডশ্রম মাত্র। পাশ্চাত্য দেশে বিষয় বিশেষের শিক্ষক ছাড়াও অধিকাংশ স্কুলেই একজন করে বৃত্তি নির্দ্ধারণকারী শিক্ষক (career master) থাকেন। ছেলেদের ওপর অভীক্ষা প্রয়োগ করে ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্ব্বাচন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই তাঁর কাজ।

স্কুলের দৈনন্দিন কাজে শিক্ষক মাত্রকেই ছাত্র সম্বন্ধীয় নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সমাধানের চেষ্টা করতে হয়। অনেক সময়ে সমস্যাটা ঠিক কি এবং কোথায়, শিক্ষকরা হয়ত তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন ছেলেটা নিছক দুষ্টমী করছে। মাষ্টার মশায়কে বিব্রত

করবার জন্যই ঐ রকম আচরণ করছে; সুতরাং বেত্রাঘাত বা ঐ ধরণের কোন রকম শারীরিক শাস্তিই তার একমাত্র ব্যবস্থা। এ বিষয়ে আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে—ছেলের ব্যবহার অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান এবং আচরণের ওপর। স্নেহ এবং সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে অধিকাংশ ছাত্রেরই শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা অর্জন করা যায়, শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে স্নেহের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলে, ছাত্রের দুর্ব্যবহারের মাত্রা আপনা আপনি কমে আসে। এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে এই মধুর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও দু একজন ছাত্র অযথা অসঙ্গত ব্যবহার করে থাকে। কোন ছেলে সর্ব্বদাই যেন মারমুখী। কারণে অকারণে অন্য ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করা তার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। অন্য ছেলের পেন্সিল, ছুরি, খাতা, কলম প্রভৃতি চুরি করা কোন কোন ছেলের অভ্যাস আছে। তাদের যে ঐ সমস্ত জিনিষের অভাব আছে তা নয়—তবু তারা চুরি না করে পারে না। ২।৩ জন স্কুল পালিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। অসময়ে রাস্তায় ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলার ক্রমবর্দ্ধমান দল দেখে মনে হয় এই জাতীয় ছেলের সংখ্যা বোধ হয় বেড়েই যাচ্ছে। এরাই হল সমস্যা-শিশু—ইংরাজীতে যাদের বলে problem children। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে প্রত্যেক স্কুলেই এই ধরণের কয়েকটি ছাত্র আছে। এরা শুধু স্কুলেরই সমস্যা নয়, ক্রমশঃ সমাজেরও সমস্যা হয়ে উঠছে।

এসব ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার বলবার কথা হচ্ছে এই যে, এ জাতীয় শিশুকে শুধু শাস্তি দিলে কোন কাজই হয়না। দুর্ব্ব্যবহারের ধরণ, ছেলের অভ্যাস প্রভৃতি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে, দুর্ব্ব্যবহারের মূল কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাবেন যে ছেলের এই দুর্ব্বোধ্য ব্যবহারের সূত্রপাত হয়েছে তার বাড়িতে।

এই ব্যাপারে আমরা ফ্রয়েড প্রবর্ত্তিত মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কারগুলির গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে পিতামাতার দায়িত্বের কথা আগে বলেছি; সে দায়িত্ব যে কি বিরাট এবং ব্যাপক তা ফ্রয়েড আমাদের পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। শৈশবাবস্থায় ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পিতামাতার ব্যবহার একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ব্যবহারে ছেলেমেয়েদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তার ছাপ তারা সারা-জীবন বহন করে। তাদের নিজেদের সহজাত বৃত্তি এবং পিতামাতার

ব্যবহার এই দুই-এর প্রভাবেই তাদের চরিত্র গঠিত হয়। সুতরাং স্কুলে ছেলেমেয়েদের যে ব্যবহার বা দুর্ব্ব্যবহার আপনারা লক্ষ্য করেন, তার জন্যে তাদের পিতামাতারা কোন ক্ষেত্রেই কম দায়ী নন।

ধরুন যে ছেলেটি সর্ব্বদাই মারামারি করে, তার ভেতরে যে একটা আক্রমণাত্মক ভাব সব-সময়েই জেগে আছে, তা ত সহজেই বোঝা যায়। তার মনের খবর আর একটু যদি নেন, বাড়িতে সে কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে, কবে থেকে তার এ রকম মনোভাব হয়েছে যদি জানবার চেষ্টা করেন, তা হলে অনেক সময়েই উপলব্ধি করতে পারবেন যে তার এই আক্রমণের ইচ্ছাটি প্রধানতঃ তার পিতার দিকেই চালিত। পিতাকে আক্রমণ করবারই তার ইচ্ছে; কিন্তু যেহেতু তা হতে পারেনা, পিতাকে আক্রমণ করা যায়না—সেই হেতু তা অন্যের দিকে চালিত হচ্ছে। এই পিতাকে আক্রমণ করবার ইচ্ছে সব ছেলেদেরই হয়, তবে কারও কম কারও বেশী। কেউ সেটা অন্য দিকে চালিয়ে দিয়ে সামলে নিতে পারে, কেউ তা পারেনা। যে পারেনা সে-ই সমস্যা-শিশু হয়ে দাঁড়ায়। পিতাকে আক্রমণ করবার ইচ্ছে ছেলেদের কেন হয়—সে আলোচনা আজ আর এখানে করবনা। করতে গেলে বিষয় বস্তু থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ব।

তারপর দেখুন, যে ছেলে মনে করে যে সে তার বাবা-মার কাছ থেকে তার প্রাপ্য ভালবাসা যথাযথ ভাবে পাচ্ছেনা, তার মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং কাজে কাজেই তার ব্যবহারও অনেক রকমের হতে পারে। সে বাবা-মার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে এমন কাজ করে ফেলতে পারে যাকে আমরা বাইরে থেকে গর্হিত আচরণ বলেই বর্ণনা করি। বাবার জামার পকেট থেকে পয়সা চুরি, ছোটখাট অন্যান্য জিনিষ চুরি প্রভৃতি তার অভ্যাস হয়ে পড়তে পারে—কারণ সে বুঝেছে এই রকম একটা কিছু না করলে বাবা মা তার দিকে দেখেনই না, কোন নজরই দেন না। এরাই ক্রমশঃ শিশু অপরাধীর (Juvenile delinquent) সংখ্যা বৃদ্ধি করে। অথবা এমনও হতে পারে যে, যেহেতু বাবা মা তাকে ভালবাসেন না—সে চায়না তাঁদের ভালবাসা—তাই তার যা ইচ্ছে তাই সে করবে, কেউকেই সে মানবে না। একটা বিদ্রোহী মনোভাব তার জাগতে পারে। বাবাকে যেমন সে মানে না, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকেও সে মানবে না এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্র, সমাজ সব কিছুকেই অবহেলা করবার একটা তীব্র প্রবৃত্তি তার সব কাজের মূল প্রেরণা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিদ্রোহীদের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করতে পারলে পিতাপুত্রের ভালবাসার সম্পর্কের এই রকম কোন ত্রুটি বিচ্যুতির সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি। যে সব অপরাধীরা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে কারাদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি ভোগ করে, তাদের বাল্যজীবনেও পিতামাতার সঙ্গে ভালবাসার আদান প্রদান ব্যাপারে একটা অসুস্থ, অস্বাভাবিক অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

যে ছেলে পিতামাতার একমাত্র পুত্র অথবা সমধিক প্রিয় পুত্র—pet child —(আদুরে ছেলে যাকে বলে) সেও স্কুলে এসে সমস্যা-শিশু হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাড়িতে তার কখন কিছুর অভাব হয় নি, যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে; সুতরাং সব ভাল জিনিষই কেবলমাত্র তারই প্রাপ্য এই রকম একটা মনোভাব তার হয়। স্কুলে এসে যখন সে অনুভব করে যে, সে অন্য পাঁচজনের মধ্যে একজন, তাকে আলাদাভাবে কেউ দেখছেনা এবং তার যখন যা ইচ্ছে, তখনই তা হচ্ছেনা—তখন আর সে নিজের অভ্যস্ত খেয়ালী ব্যবহারের সঙ্গে স্কুলের নিয়ানুবর্ত্তীতার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে না। গোলোযোগের সৃষ্টি হয়।

শিশুমনের বিকাশের এই সব সূক্ষ্মধারার কথা ফ্রয়েডই প্রথম বিশদভাবে আমাদের কাছে ফুটিয়ে তুলেছেন। মনোবিদ্যার সঙ্গে শিক্ষাতত্ত্বের এই যোগটি সবচেয়ে ঘনিষ্ট, এবং শিক্ষাতত্ত্বের দিক থেকে সবচেয়ে মূল্যবান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই সব সমস্যা-শিশুদের জন্যে শিক্ষক বা স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ কি করতে পারেন।

প্রথম প্রয়োজন এই সব শিশুদের বেছে নেওয়া। আবার বলতে হচ্ছে—পাশ্চাত্য দেশে সমস্যা-শিশুদের বেছে নেওয়ার জন্যে এবং তাদের বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থা করবার জন্যে 'স্কুল মনোবিদ্'— School Psychologist নিযুক্ত হন। এই সব ছেলেদের মনোবিদ্যার দিক থেকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা, দুর্ব্বোধ্যকে বোঝাবার চেষ্টা করা, অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির মূল উৎস অনুসন্ধান করা—এই সব হল তাঁর কাজের একটা দিক। তারপর এই সব ছেলেরা বাড়িতে কি রকম ভাবে থাকে তা নিজে দেখা, বাবা-মার সঙ্গে কতখানি এবং কি ধরণের সম্পর্ক ছিল এবং আছে এই সব তথ্য সংগ্রহ করে, ছেলের বাবা-মার সঙ্গে বার বার দেখা করে তাঁদের সঙ্গে ছেলে সম্বন্ধে আলোচনা করে কি রকম ভাবে অগ্রসর হলে ছেলের পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব সেই সম্বন্ধে বাড়িতে অভিভাবকদের এবং স্কুলে শিক্ষকদের পরামর্শ দেওয়া—

এই হ'ল তাঁর কাজের আর একটা দিক,—সংশোধনের দিক। এ সমস্তই বিশেষজ্ঞের কাজ, তাই হয় স্কুলে একজন শিশুমন সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা দরকার, অথবা স্কুলেরই কোন শিক্ষককে অন্যদিকের কাজ হালকা করে দিয়ে এই কাজে অভিজ্ঞ করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। ৩।৪ বছর হল কলকাতায় মাড়োয়ারী সম্প্রদায় পরিচালিত ২।৩ টি স্কুলে এই রকম বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হয়েছে। একটা স্কুলের খবর আমি জানি, কাজ সেখানে ভালভাবেই হচ্ছে।

অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের নিয়মিতভাবে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা দরকার। প্রয়োজন বোধে বারবার আলোচনা করাও বাঞ্ছনীয়। কাজ করতে গেলে অনেক সময়েই দেখা যায়—শিশু যে সমস্যা-শিশু হয়ে দাঁড়িয়েচে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের পিতামাতারাই প্রকৃত পক্ষে সমস্যা-পিতামাতা, অর্থাৎ problem parents. ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলে তাদের পরিণাম ভাল হবে, সে জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে তাঁদের নেই, কিন্তু সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আছে অনেক। কেউ পাঁচজনের সামনে বারবার রাখালকে ডেকে এনে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির, তার অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তির পরিচয় দিয়ে ক্রমাগত "রাখাল তুমি বাঃ বেশ" বলে চিরকালের জন্যে রাখালের সর্ব্বনাশ করেন, তার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করেন। কারও কর্ত্তৃত্ব করবার ঝোঁক খুব বেশী। ছেলেকে সব সময়েই শাসনে রাখতে চান। ফলে ছেলের নতুন কিছু সৃষ্টি করার উদ্যম স্তিমিত হয়ে আসে, হয়ত বা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। কেউ মনে করেন ছেলেমেয়েদের আদর করা—মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা; তীক্ষ্ণ বাক্যবান প্রয়োগ, প্রহার প্রভৃতিই ছেলেমেয়েদের প্রতি একমাত্র উপযুক্ত ব্যবহার—তাতে তাঁরা যা চান তা হয়ত হয়—ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে, যাকে বলে যমের মত ভয় করে। কিন্তু তাতে ছেলের ভবিষ্যৎ যে কতখানি নষ্ট হয়, তা বোঝবার ক্ষমতা তাঁদের আদৌ নেই। ভবিষ্যতে ছেলে হয়ত কোন লোককে, কোন প্রতিষ্ঠানকে, কোন কাজকে ভাল করে ভালবাসতে পারবে না। এবং ভালবাসার শক্তির অভাব ঘটলে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়াও তার পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর হবে। খাপ খাইয়ে নিতে পারলে ভাল, না পারলে তার স্থান হবে হয়ত মানসিক রোগীর হাসপাতালে, নয় ত কারা প্রাচীরের অন্তরালে।

পিতামাতার ব্যবহারের যে সব দৃষ্টান্ত এইমাত্র দিলাম, তার একটিও কাল্পনিক মনে করবেন না; সবই অভিজ্ঞতা-প্রসূত এবং আপনারাও একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে শুধু ঐ রকম নয় পিতামাতাদের আরও অনেক রকমের সমস্যা-ব্যবহারের সন্ধান নিশ্চয়ই পাবেন। শুধু ছেলেমেয়েদের নয়—পিতা-মাতাদেরও এই জাতীয় ব্যবহার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করবার জন্যে—অভিভাবক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্কুল-মনোবিদের নিয়মিত ভাবে দেখা শোনার ব্যবস্থা থাকা সমীচীন মনে করি।

যে সব ছেলে বাড়িতেও থাকে না, স্কুল থেকেও পালিয়ে যায়—তাদের বেলায় এই কথাই বুঝতে হবে যে, হয় তারা বাইরে এমন কোন বিষয় পায় যার আকর্ষণের শক্তি বাড়ির বা স্কুলের আকর্ষণের শক্তির চেয়ে বেশী অথবা বাড়িতে বা স্কুলে কোন রকম আকর্ষণ শক্তিরই অভাব। প্রত্যেক ছেলে সম্বন্ধেই বিশেষভাবে অনুসন্ধান প্রয়োজন। শেষোক্ত কারণটিই যদি প্রকৃত কারণ হয় তবে সেটা খুবই দুঃখের কথা বলতে হবে। বাড়িতে আকর্ষণের অভাবের ব্যাপারে পিতামাতাকে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া স্কুল কর্তৃপক্ষ আর কিছু বিশেষ করতে পারেন না। কিন্তু স্কুলে আকর্ষণের অভাব যাতে না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা নিশ্চয়ই তাঁদের কর্তব্য। ক্রমবর্দ্ধমান শিশুর মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের উপযোগী বিভিন্ন আকর্ষণীয় জিনিষ, খেলাধূলার সুযোগ প্রভৃতি স্কুলে নিশ্চয়ই থাকা দরকার। বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে একটা কথা আর একবার এখানে বলতে চাই। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের ব্যবহার স্কুলের প্রতি ছেলেদের আকর্ষণ, বিতৃষ্ণার একটি বড় উপাদান। সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, সব উপাদান অনুকূল হলেও যদি কোন ছেলে ক্রমাগতই স্কুল থেকে পালায়, তখন তাকে মনোবিদের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া অন্য পন্থা আর থাকে না।

ছাত্র সম্বন্ধে শিক্ষকদের আর একটি দৈনন্দিন সমস্যার কথা বলি। কোন একটি ছেলে অন্য সব বিষয়েই হয়ত বেশ পারদর্শী, কিন্তু একটা বিষয়ে, ধরুণ অঙ্কে কিম্বা ইতিহাসে কিম্বা ভূগোলে, একেবারেই সে অজ্ঞ। এই সব ছেলেদের সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে? প্রথমেই বলি, কোন একটা সাধারণ নিয়ম বলে দেওয়া যায় না যা এই ধরণের সব ছেলের প্রতিই প্রযোজ্য। কোথায়, কোন্ যুক্তিতে, কোন্ পদে তার ত্রুটি হচ্ছে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেটি প্রথমে আবিষ্কার করতে হবে। তারপর সাধারণ ক্লাশ থেকে সরিয়ে এনে বিশেষ পদ্ধতিতে

তাকে শিক্ষা দিতে হবে। প্রত্যেক বিষয়েই শিক্ষা দেবার মনোবিত্থা সম্মত উপায় সম্বন্ধে আজকাল অনেক পুস্তক প্রণয়ন হয়েছে। সেগুলির সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচয় থাকা কাম্য। আপনারা নিশ্চয়ই এই ধরণের অনেক বই দেখেছেন, পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে গোড়ার দিকে ভাল করে শেখান হয় নি বলে উঁচু ক্লাশে উঠে ছেলেরা আর সামলাতে পারে না, পেছিয়ে পড়ে। আমার একটি সহকর্ম্মীর একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। তাঁর কাছে তাঁর এক সহপাঠী ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে জানালেন যে ছেলেটা অঙ্কতে কিছুই করতে পারছেনা; স্কুলের পরীক্ষায় সব বিষয়েই পাশ হয়, ভাল নম্বর পায়, কিন্তু অঙ্কতে প্রত্যেক বার খুব কম নম্বর পাচ্ছে; তার কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না। আমার সহকর্ম্মী অনেকদিন ধরে ছেলেটিকে দেখে শুনে যে জিনিষটি আবিষ্কার করলেন, সেটি হচ্ছে এই যে, যে গৃহশিক্ষক প্রথমে ছেলেটিকে অঙ্ক শেখাতে এসেছিলেন, তাঁর চেহারাও যেমন ভাল ছিল না, তাঁর ব্যবহারও তেমনি উৎকট ছিল। প্রথম দিন থেকেই কেমন একটা অপ্রীতিকর বিদ্বেষভাব গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে ছেলেটির মনে জেগেছিল। লোকটির প্রতি বিদ্বেষভাব ক্রমশঃ অলক্ষ্যে বিষয়টির প্রতি সংক্রামিত হয়ে যায়; ফলে অঙ্ক শাস্ত্রটির ওপরেই তার একটা বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। চেহারার ওপর গৃহশিক্ষকটির কোন হাত ছিল না, তবে ব্যবহারটা অত উৎকট না হলেও ত হত; না হলে ছেলেটি হয়ত আজ অন্য বিষয়ের মত অঙ্কেও সমান পারদর্শী হতে পারত। কতখানি তার ক্ষতি হয়ে গেছে!

ছাত্র সম্পর্কে এই ধরণের বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব নিয়তই হয়। সেই সব সমস্যার সমাধান কি করে করা যেতে পারে মনোবিত্থার দিক থেকে তারই কিছু আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি আজ। শিক্ষার সঙ্গে মনোবিত্থার সম্পর্ক বিষয়টি অতিশয় বৃহৎ এবং যথেষ্ট জটিলও বটে। একটি বক্তৃতায় সব কথা বলা হবে—এ নিশ্চয়ই আপনারা আশা করেন না। অনেক কথাই না বলা রয়ে গেল। আশা করি ভবিষ্যতে, যে সমস্ত মনোবিদ্ শিক্ষা ব্যাপারটিকেই তাঁদের বিশেষ অধ্যয়নের ক্ষেত্র বলে বেছে নিয়েছেন, যাঁরা স্কুলের কাজে মনোবিত্থার প্রয়োগ করছেন আপনারা তাঁদের ডাকবেন; তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শুনবেন, আলোচনা করবেন। আমি এইখানে আজ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছি।

সহজ হিসাব

মৃত্যুঞ্জয় বক্সী

হিসাব আমার বড়ই সরল

বড়ই চমৎকার

খরচ জমায় সদাই সমান

না রয় পাওনা ধার।

বস্তুতন্ত্রী আছেন যাঁরা

বস্তা ভরতে ব্যস্ত তাঁরা

সদাই ভয়ে ভয়ে রহেন

সুযোগ ফস্তাবার!

পাপ পুণ্যের হিসাব নিয়ে

যাঁহাদের কারবার

পাপ কমাতে উপোস কাপাস

অস্থি চর্ম্ম সার

তীর্থ ব্রত প্রায়শ্চিত্ত

বামুন মোল্লা বাগায় বিত্ত

এদিকে হয়তো চলছে নিত্য

শতেক অনাচার!

কেউ বা আছেন "আত্ম"-বাদী

সাধন মার্গ যাঁর

পরমাত্মার সন্ধানেতেই

করেন দিন কাবার।

সাধন ভজন উপাসনা

সংসারেতে উদাসপনা

হত্যা করতে স্ব বাসনা

(শেষে) হয়েন শবাধার।

আমার কিন্তু সহজ সাধন
বড়ই চমৎকার
পাপ পুণ্য আত্মা আদির
ধারিই নেক ধার।
আমার পিতা "আনন্দময়"
স্মরণ রাখি সকল সময়
দুঃখ দিতে দুঃখ পেতে
নিষেধ মানি তাঁর।
ভুল হলে' পর শুধ্‌রে নেব
সাহস আছে তার
ব্যথা পেলে দুঃখ দিলে
খুঁজবো শোধন তার।
তাঁহার দেওয়া যুক্তি নিয়ে
চল্‌ছি সহজ পথটি দিয়ে
রেখেছি তাই তাঁহার পরেই
শেষ মিলাবার ভার।

'চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভরতা, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা। চাই সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত রাখিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই মস্তক, শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

গান্ধীজীর গঠনকর্ম্ম-ব্যবস্থা

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত ১৮ দফা গঠন কর্ম্ম আলোচনার ভূমিকায় গান্ধীজী গঠন কর্ম্মের অপর নাম দিয়াছেন সত্য ও অহিংসার পথে পূর্ণ স্বরাজ গঠন। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর পূর্ণ সাত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। সন্ধিক্ষণের প্রথম ভাগে স্বাভাবিক যে উত্তেজনা ও আবেগ, যে আনন্দময় আশা এবং উদ্বেগকর অনিশ্চয়তা, এক দিকে ইংরেজ আমলের ক্ষীয়মান মোহাবেশ, অন্য দিকে নূতন প্রভাতের সমুজ্জ্বল চঞ্চলতা জাতির চিত্তকে একটা বিমিশ্র অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্যে অনিবার্য্যরূপে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল, আজ সাত বৎসর পরে তার গতি বেশ কতকটা শান্ত হইয়াছে। গঠনকর্ম্মকে আজ পূর্ণ স্বরাজ গঠন নামে ঠিকমত বুঝিয়া দেখিবার উপযুক্ত অবসর মিলিয়াছে। নেতারা বলিতেছেন নানা পরিকল্পনার মধ্যে দেশে স্বরাজ গঠন সুরু হইয়া গিয়াছে। অতএব স্বভাবতঃই মনে হয়, পূর্ণ স্বরাজ গঠনের দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে আজ গান্ধীজীর গঠনকর্ম্মের গভীরতা, উপযোগিতা ও ব্যঞ্জনা নূতন করিয়া উপলব্ধি হইতে পারিবে।

স্বাধীনতা অর্জ্জন প্রচেষ্টায় গঠনকর্ম্ম সাধারণতঃ তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গমাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বক্তৃতামঞ্চ হইতে গঠন-কর্ম্মের মহিমা প্রচার বড় কম হয় নাই। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য অস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন যেরূপ, নিরস্ত্র বিদ্রোহের জন্য গঠনকর্ম্মের প্রয়োজনও সেইরূপ। গান্ধী-নেতৃত্বে তখন জাতিচিত্তে স্বাধীনতার নেশা ধরিয়াছে, তাই সারা দেশে গঠনকর্ম্মের প্রসার চেষ্টায় গান্ধীসেনারা সহর ও ইংরেজী শিক্ষিতের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া গ্রামে-গাঁথা বিশাল ভারতের অজ্ঞাত, অপরিচিত, অন্ধকার অভ্যন্তর ভাগে সর্ব্বজনের হৃদয়দ্বারে পৌছিবার নূতন পথ কাটিয়া তৈয়ারি করিয়াছে। সত্যাশ্রিত, বুদ্ধিদীপ্ত অকুণ্ঠ সেবা হইল গঠনকর্ম্মের আশ্রয়, গঠনকর্ম্মের ভাবধারায় অহিংস বিপ্লবের বার্ত্তা ভারতীয় সমাজকে সর্ব্বপ্রকার শোষণমুক্ত করিয়া সুস্থ মানব সম্পর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার বাণী। গান্ধীজীর সেই অমৃতবাণী সমষ্টির অবচেতনায় দোলা দিয়া—'ছায়া ভয় চকিত' মূঢ়ের ভয় ভাঙ্গিয়া,—ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্ টলাইয়াছিল। তারপর

সেই ভিত্ ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদের রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। কিন্তু গঠনকর্ম্মসহায়ে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা আজ অনেক দূর বলিয়াই মনে হইতেছে।

আন্দোলনে দোলা লাগে, উত্তেজনা জাগে, মন ছুটিয়া চলিবার জন্য পাগল হয়, কিন্তু গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্থিতির মধ্যে ধরিয়া রূপ না দিলে গঠন হয় না। গঠনকর্ম্ম এই স্থিতির দিক—গঠনকর্ম্মে ধৈর্য্য, সংযম, নিষ্ঠা, তিল তিল করিয়া আত্মদান। আমরা রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির ক্ষেত্রেই গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছি। গঠনকর্ম্ম ক্ষেত্রেও তাঁহার নেতৃত্ব ছিল অবিসম্বাদী, কিন্তু সত্যভাবে সে নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছে কয়জন? অসহযোগ, আইন অমান্য ও ভারত-ছাড় আন্দোলন যে অপূর্ব্ব গতিতে অগ্রসর হইয়াছিল, গঠনকর্ম্মে সেই গতিসঞ্চার স্বাভাবিক ও সম্ভব না হইলেও, দুই-এর গতির অসামঞ্জস্য এত অধিক হইয়া উঠিল যে, স্বাধীনতা-লাভের পর দেখা গেল পূর্ণ স্বরাজ গঠনের পথে আমরা দিশাহারা হইয়া রহিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির মূল্য আরোপ ক'রে তাঁকে আমরা দেখব না, যে দৃঢ় শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি, সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে; কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মান্তর ঘটে গেল।" প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির পর সেই লোকোত্তর পুরুষের শক্তির মহিমাকে আজ নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতেই হইবে। হিংসাবিক্ষুব্ধ শোষণক্লিষ্ট পরিবেশের মধ্যে সত্য ও অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত নব সমাজ তাঁরই শক্তির মহিমায় আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়াছে। কি সেই অমিত শক্তি, কি সেই হিমালয়-প্রতিম অটল বিশাল সমুন্নত শুভ্র চরিত্র বল, কি সেই সাধনা যা সমস্ত পৃথিবীর প্রচণ্ড গড্ডালিকা গতির বিরুদ্ধে একক দাঁড়াইয়া নূতনের বাণী ঘোষণা করিয়াছে, মানব সমাজে নূতন গঠনকর্ম্ম সহায়ে সত্য ও অহিংসার প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে গান্ধীর গঠনকর্ম্মের কাল ফুরায় নাই, আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

গঠনকর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে যে স্বরাজের উদয় হইবে তাহাতে কল্যাণ পৌঁছিবে দীনতমের কুটীরে; সেই পথে যে কেহ বা যা কিছু বাধাস্বরূপ হইবে,

তাহাকে সরিয়া যাইতে হইবে অথবা নতশিরে সর্ব্বোদয়ের বাণী মানিয়া লইতে হইবে, ইহাই হইল গান্ধীজীর নির্দ্দেশ। হিংসার মূল কথা হইল শোষণ—শোষণের আশ্রয় হইল অসত্য। একে পরিশ্রম করিবে—অপর বুদ্ধিমান্ তাহার ফল ভোগ করিবে, এইরূপে পরের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া চলিয়া পাপ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে, পুঞ্জীকৃত পাপে একদিন মানবসমাজে প্রলয়ের আগুন জ্বলিয়া বিধাতার কঠোর দণ্ড নামিয়া আসিবে—কার্য্য কারণ গতিতে ইহা ত অনিবার্য্য। গান্ধীজীর মহান জীবন, মহান্ কর্ম্ম-চেষ্টা, সত্য ও অহিংসার আশ্রয়ে নবসমাজ গঠনের নিরন্তর উদ্যম—এ সকলই হিংসামূলক শোষণের শুধু প্রতিবাদ নহে, পরন্তু নূতন পথ-নির্দ্দেশের স্থির পুণ্য দীপশিখা। গান্ধীর গঠনকর্ম্ম বা পূর্ণ স্বরাজগঠনের চেষ্টায় ভারতের রাষ্ট্রসাধনা সত্য সাধনা ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া সার্থক হইবে—নব্য ভারতকে এই কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে হইবে, ইহারই জন্য মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের সার্থকতার অন্য দ্বিতীয় পন্থা নাই।

গান্ধীজী বলিয়াছেন ১৮ দফা গঠন কর্ম্মের উল্লেখে কর্ম্ম তালিকা নিঃশেষ হয় নাই—ঐগুলি সর্ব্ব ভারতে প্রযোজ্য এবং উদাহরণ স্বরূপেই বলা হইয়াছে মাত্র। যে কর্ম্ম দীনতমের কল্যাণের বার্ত্তা বহন করে, তাহাতে শোষণ বা হিংসার স্থান নাই। সে কর্ম্ম যাহাই হউক, স্থানীয় লোকের বুদ্ধি, বিদ্যা, দক্ষতা ও সাধুতা যদি সেই কর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া কেন্দ্রীভূত হয়, তবে ত তাহাকে গঠন কর্ম্মেরই অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—তাঁহার নিজের ভাষায়—"উসে মৈঁ রচনাত্মক কার্য্যকা হিস্যাহি সমঝতা হুঁ।"

গঠনকর্ম্মতালিকায় **সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের** কথা রহিয়াছে। এই সদ্ভাব রক্ষার চেষ্টা কূট রাজনৈতিক স্তরে আপাততঃ ব্যাহত হইয়াছে, কিন্তু বিশাল ভারতে বহু সম্প্রদায় ও উপজাতির মধ্যে সদ্ভাব রক্ষাকে জাতি গঠনের অন্যতম মূল উপাদান ধরিয়াই আমাদের সংবিধান রচিত হইয়াছে। কঠিনের মধ্যে যাহা কঠিনতম তাহার সাধনা ত আর সহজ হইতে পারে না। আজ শুধু সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নহে, জাতিতে জাতিতে সদ্ভাবের কত প্রয়োজন, গান্ধীজীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত জওহরলাল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরূপ বুঝাইতেছেন এরূপ আর কেহ নহে। **অস্পৃশ্যতা ও মাদকবর্জ্জন** সম্পর্কে দেশের মন আজ জাগ্রত। কিন্তু সর্ব্বত্রই সংঘবদ্ধ কার্য্যদ্বারা ইহাকে সফল করিবার অপেক্ষা রহিয়াছে। **খাদি ও গ্রামশিল্প** নূতন শোষণহীন সমাজ গঠনের ভিত্তি-স্বরূপ। পুঁজিবাদী

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নাগপাশ ছেদ করিয়া কেন্দ্রীভূত শিল্পব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে কৃষির সহিত শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বজনের জন্য সাধু শ্রম ও সম্মানের জীবিকার সংস্থান করা স্বাধীন ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থনীতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙলার বহু সাধনার 'স্বদেশী' আবার নূতন করিয়া সর্ব্ব ভারতে গৃহীত না হইলেও আমাদের রক্ষা নাই। স্বদেশী অর্থে আমার প্রতিবেশীদের তৈয়ারি জিনিস আমি ব্যবহার করিব—তার খুঁত থাকিলে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিব। শিল্প বিকেন্দ্রীকৃত না হইলে প্রতিবেশী বেকার থাকিবে, তাহার হাতের রম্য স্পন্দনে পণ্য বা কারু সৃষ্টি হইবে না। গ্রাম শোষিত হইবে, সহর স্ফীত হইবে, সম্পর্ক অস্বাভাবিক হইয়া থাকিবে, পাপ জমিবে। তাই গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—আমার হাতে ক্ষমতা আসিলে আমি কাপড়ের কলগুলি তখনই বন্ধ করিয়া দিব। ঘরে ঘরে চরকা চলিয়া সাধু শ্রমের সেই সূতায় ৩৫ কোটি ভারতবাসীর বস্ত্রের সংস্থান হইবে। গ্রাম-শিল্প মণ্ডলে চরকা সূর্য্যরূপে বিরাজ করিবে আর তাহারই চতুর্দ্দিকে নৃত্যের ছন্দে আবর্ত্তিত হইবে অন্যান্য বহু গ্রাম-শিল্প, তাহারা নূতন প্রাণ পাইয়া গ্রামে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিবে।

গ্রামের স্বাস্থ্য বিধান এবং **স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার শিক্ষাদান**ও গঠন কর্ম্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত। **জাতীয়-ভাষা** এবং **প্রাদেশিক ভাষা** শিক্ষা এবং নিজ ভাষায় নিজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যতীত যে জাতি গঠন কখনও সম্ভবে না, গঠনকর্ম্ম ব্যবস্থায় তাহা বুঝান হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজ যাইলেও ইংরেজীর মোহ আমাদের কাটিতেছে না। নানা যুক্তি ও নানা ছাঁদে সেই ফাঁদে পড়িয়া থাকিবার প্রয়াসের আর অন্ত নাই। পণ্ডিত মহলে যাঁহারা ইংরেজী বুলির ঝঙ্কার তুলিয়া ঝলমল করিয়া বেড়ান, নিঃস্ব হইবার ভয়ে ইংরেজীর অলিটুকু যাঁহারা আজ প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন এবং ইংরেজীর অভাবে ইণ্টারনাসনালে ও য়ুনিভার্সিটিতে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইবে এই দুশ্চিন্তায় যাঁহারা দিবাভাগ উৎকণ্ঠায় এবং যামিনী বিভীষিকায় যাপন করিতেছেন, তাঁহাদের সাহস অবলম্বন করিয়া এই সহজ কথাটি বুঝিবার দিন আসিয়াছে যে, বিদ্যাদায়িনী বাণী মাতৃ ভাষাতেই ভারতের ৩৫ কোটির ঘরে তাঁহার আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিবেন, পণ্ডিত মহলে কান্নাকাটি সত্ত্বেও তাহার অন্যথা হইবে না।

বুনিয়াদী শিক্ষাই মাতৃ ভাষার বাহনে দেশের চিত্ত-কেন্দ্র সরল সবল ও সতেজ করিয়া তুলিবে। এই শিক্ষায় ঘরের ছেলে ঘরে থাকিবে, গ্রামকে সর্ব্বতোভাবে ভালবাসিবে, গ্রামের সুখদুঃখকে আপন বলিয়া লইবে, গ্রামের গাছপালা নদনদীর সঙ্গে তার সখ্য সম্পর্ক চিরস্থায়ী, গ্রামের কল্যাণের মধ্যে আপন কল্যাণ নিহিত এই সত্য বুঝিয়া লইবে এবং ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনার ধনকে শ্রদ্ধা করিয়া শিরোধার্য্য করিবে। লেখাপড়া শিখিয়া বাবু হইয়া, উচ্চস্তরে উঠিয়া আপন জন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহরের উচ্ছিষ্টকে পরম আদরে গ্রহণ করিয়া সে আর নিজ জীবনকে বিড়ম্বিত ও নিষ্ফল করিবে না। বুনিয়াদী শিক্ষা একটা প্রয়োজনীয় শিল্পের মাধ্যমে চলিবে। সেইজন্য এই শিক্ষার প্রসার ও পুষ্টি শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের অপেক্ষা রাখে। গ্রামের শিল্প গ্রামের প্রাণ হইয়া উঠিলে তাহার মাধ্যমে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিয়া ছেলেকে সত্যকার মানুষ করিয়া তুলিতে তখন আর বাপ-মার আপত্তি থাকিবে না।

বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত **বয়স্ক শিক্ষাও** চলিবে। দেশের পুরাণ ইতিহাস ধর্ম্মকথা, দেশের ভূগোল, অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কলা, দেশের সাহিত্য এ সকলই বৈঠক করিয়া, গান কথকতা প্রভৃতি সহায়ে মুখে মুখে সকল লোককে শিখাইয়া দিতে হইবে। বৈঠকগুলি হইবে আনন্দ সম্মেলন।

গঠনকর্ম্মে **মেয়েদের** প্রতি অকুণ্ঠ আহ্বান রহিয়াছে। মেয়েরা যে শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে সহজে পুরুষের পাশাপাশি একই পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন, গান্ধী আন্দোলনে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে পূর্ণ স্বরাজ গঠনেও তাঁহাদের সমান অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

গঠন কর্ম্মতালিকায় **অর্থ নৈতিকসাম্য** অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ স্বরাজ গঠন অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত সম্ভব নহে। শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে বিকেন্দ্রীকরণও যে কয়টা প্রধান শিল্প কেন্দ্রীভূত না হইলে চলে না তাহার জাতীয়করণ এবং কৃষির ক্ষেত্রে 'সবৈ ভূমি ত গোপালকী' এই মহানীতির পূর্ণ অনুকরণ ব্যতীত **মজদুর** ও **কিষাণের** অর্থনৈতিক সাম্যরচনা সম্ভব হইবে না। ভূমির ক্ষেত্রে সন্ত বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞ ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া উঠিতেছে। পূর্ণাহুতির পর

যজ্ঞ-সম্ভব যে দেবতা আবির্ভূত হইবেন, তিনি হইবেন সর্ব্বকল্যাণের সারভূত সাম্য ও মৈত্রীর ধারক। রাষ্ট্রও ভূমিসমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে দেশব্যাপী বেকার সমস্যা ধীরে ধীরে অনিবার্য্য গতিতে বিকেন্দ্রীকরণের পথে লইয়া যাইবে—এই আশা আমরা পোষণ করিব। সাম্যের প্রতিষ্ঠা এক সোনার সকাল বেলায় হঠাৎ ঘটিয়া উঠিবে না। সমবেত সংহত চেষ্টায় এক খানির পর একখানি ইট গাঁথিয়া তুলিয়া এই ইমারত খাড়া করিতে হইবে।

গঠন কর্ম্ম তালিকায় **আদিবাসী** ও **ছাত্রের জন্য** সমাদরের স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারত ভূমিতে আদিবাসীর দলিলই সব চেয়ে পাকা ও পুরাতন। আজ সেই আদিবাসীকে বড় ভাই বলিয়া আহ্বান করিয়া স্বরাজ গঠনে স্থান দিতে হইবে। ছাত্রদের ডাকিয়া বলিতে হইবে, ভারতে—আপন নিজ ভূমিতে—আপন চিরন্তন অধ্যাত্মে, আপন সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিদ্যার্জ্জন ও দেশসেবার পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদিগকে সর্ব্বভাবে স্বদেশীব্রতে দীক্ষা লইয়া স্বাধীনভারতের শ্রেষ্ঠ নাগরিক হইয়া উঠিতে হইবে।

আঠারো দফার শেষ দফা হিসাবে **কুষ্ঠরোগীর** উল্লেখ করি। গান্ধীজী প্রার্থনায় বলেন "কাময়ে দুঃখতপ্তানাম্ প্রাণিনাম্ আর্ত্তিনাশনম্।" দুঃখতপ্ত প্রাণীর আর্ত্তি কুষ্ঠরোগীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—ঐ এক দর্পণে জগতের যত ব্যথা সবই প্রতিফলিত। কুষ্ঠরোগীর সেবারত গান্ধীজীর ছবি অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। কুষ্ঠরোগীর সেবা কার্য্যে সর্ব্ব সেবা ও সর্ব্বাশ্রম নিহিত রহিয়াছে।

স্বরাজ গঠনের পথে এই ত যাত্রা সুরু হইয়াছে। শুধু রাষ্ট্রের মুখ চাহিয়া থাকিলে ব্যর্থতার বোঝা ভারি হইতে পারে। পরস্পরের মুখ চাহিয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেন্দ্রে কেন্দ্রে কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে স্বাধীন দেশে আমাদের জীবন সার্থক হইবে। এক পদ অগ্রসর হইলে আর এক পদের পথ খুলিয়া যাইবে। দেশব্যাপী সাধনা দ্বারা গঠন কর্ম্মকে সার্থক করিতে পারিলে পূর্ণ স্বরাজ গড়িয়া উঠিবে, যে স্বরাজে শোষণ নাই, যে স্বরাজ স্বশাসিত, যে স্বরাজ সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞানের সীমানা

প্রিয়দারঞ্জন রায়

বিজ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞান। যা চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, নাকে গন্ধ পাওয়া যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, বা জিহ্বায় আস্বাদ করা যায়, তা নিয়েই চলে বিজ্ঞানে জ্ঞানের আহরণ। এ ভাবে বস্তু ও শক্তির সমবায়ে গঠিত যে বিশ্বজগৎ তার খবর আমরা পাই। যা আবার আমাদের নগ্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে আসে না, বিজ্ঞানের কলকৌশলে তাকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমার মধ্যে এনে আয়ত্ত করি, যা শুধু চোখে দেখা যায় না, অতি ছোট বলে বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাকে আমরা দেখি বড় করে। যা আমাদের দৃষ্টির সীমার বাইরে, তাকেও দেখতে পাই দূরবীণ দিয়ে। কিন্তু পরিণামে সকল দেখাই হচ্ছে চোখ দিয়ে। আমরা আলো দেখি শুধু সাত রকমের; লাল হতে আরম্ভ করে পীত, নারঙ্গ, হরিৎ, নীল, ঘননীল এবং বেগুনি রং-এর। কিন্তু এ ছাড়াও যে আরো বহু রকমের আলোক-রশ্মি আছে, তাদেরও খবর আমরা পাই বিজ্ঞানের কৌশলে ছবি তুলে। বেগুনি রংএর অতীত বা লাল রং-এর ইতর আলোক-রশ্মিগুলিকে বিশিষ্ট আলোকচিত্রে পরিণত করে তাদের আমরা আমাদের দৃষ্টির সীমানার মধ্যে নিয়ে আসি। আসল কথা, আলোক, তাড়িত, তাপ ইত্যাদি যাদের শক্তি বলা হয়, তাদের সত্তা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে আসে একমাত্র বস্তুর সাহায্যে বা বস্তুর সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে। অন্য দিকে শক্তির সাহচর্য্য ব্যতিরেকে বস্তুর অস্তিত্বও আমরা জানতে পারি না। আলোর অভাবে অন্ধকারে কোন জিনিষ আমরা দেখিতে পাই না; অবশ্য হাতে স্পর্শ করে তাদের অবস্থিতি বা আকারের কতকটা ধারণা করতে পারি। কিন্তু এতেও রয়েছে শক্তির ক্রিয়া। বস্তুর অণুপরমাণুগুলি ছুটোছুটি করে আমাদের ত্বক বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর অনবরত ধাক্কা দেয় বলেই তাদের অস্তিত্বের অনুভূতি আমরা পাই। বাতাস পদার্থটিকে চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না, রসনায় আস্বাদ করা বা নাকে শোঁকা যায় না; কিন্তু ঝড়ে যখন গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে উৎপাতের সৃষ্টি করে তখন তার অস্তিত্বে কোন সন্দেহ থাকে না। বস্তুর

সাহায্যে শক্তিকে আবদ্ধ করে' এবং শক্তির সাহায্যে বস্তুকে বেঁধে আমরা তাদের হাজির করি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে। এ ভাবেই হয় আমাদের বস্তু ও শক্তিসমন্বিত এই বিশ্বজগতের অনুভূতি। এ সব অনুভূতিগুলিকে অগ্রপশ্চাৎ কার্য্যকারণসূত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আমরা সাজিয়ে নেই আমাদের মনের মধ্যে। তা হতে সিদ্ধান্ত করে যে-জ্ঞান আমরা অর্জ্জন করি, তাকেই বলা হয় বিজ্ঞানের জ্ঞান। এই হল বস্তুজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সনাতন ও প্রাকৃতিক পন্থা। জন্মাবার পর হতেই মানবশিশু এ ভাবেই করে জ্ঞানের আহরণ বা বিষয়বস্তুর অনুভূতি। বিজ্ঞান শুধু এই স্বাভাবিক পন্থাকেই তার যন্ত্রকৌশলে সমুন্নত করেছে, যার ফলে মানুষের অনুভূতি ও জ্ঞানের সীমা গেছে অপরিসীম বেড়ে। যা কিছু আমরা কোন উপায়ে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে আনতে পারি না, তা হয় বিজ্ঞানে অনুমান বা কল্পনা। এখানেই হচ্ছে বিজ্ঞানের একপ্রকার সীমানা। অবশ্য এ কথাও মানতে হবে যে, যা এক সময়ে কল্পনা বলে মানুষ মনে করেছে, বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত যন্ত্রকৌশলে পরবর্ত্তী কালে তা হয়েছে বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য। এর বহু দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানের ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। অতএব বলতে হয়, বিজ্ঞানের সীমানা যাচ্ছে ক্রমশঃ বেড়ে। আজ যা আজগুবি বা অসম্ভব, কাল হবে তা হয়ত জাজ্জ্বল্যমান সত্য। তা বলে কি বিজ্ঞানে জ্ঞানের সীমানা নির্দ্দেশ সম্ভব নয়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, বস্তু ও শক্তির প্রকাশ-ধর্ম্মের মধ্যেই রয়েছে বিজ্ঞানের সীমানা। এ কারণে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে অনেকে বলেন অপরা জ্ঞান। বিজ্ঞানে জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে কার্য্যকারণের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এবং প্রকৃতির রাজ্যে বস্তুজগতে নিয়মের বা আইন-কানুনের অলঙ্ঘনীয় বাঁধন। কিন্তু এ কার্য্যকারণের সম্বন্ধের মধ্যে বিজ্ঞান কোন আদি অন্ত খুঁজে পায় না। যা কিছু আছে বা যা কিছু ঘটছে, এ সবার আদিম কারণ বা শেষ কি এবং কোথায়, এর কোন উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে বস্তু এবং শক্তি আপাত-ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলে দেখা দিলেও আসলে এরা অভিন্ন,—একই সত্তার এ পিঠ ও পিঠ রূপে। তাই অবস্থা বিশেষে তাদের বিনিময় ঘটে। কিন্তু বস্তুরূপী শক্তির বা শক্তিরূপী বস্তুর উদ্ভব কোথা হতে, এর উত্তরে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নীরব। কার্য্যকারণবাদী, ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে নির্ভরশীল বিজ্ঞানে এর উত্তর মিলতে পারে না। এখানেই বিজ্ঞান মানে হার।

মানুষের কতগুলি অনুভূতি আছে, যাকে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ বলা যায়। সেগুলি উৎপন্ন হয় অনেক ক্ষেত্রে তার বিচারবুদ্ধি হতে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য, সদসৎ, সুন্দর অসুন্দর ইত্যাদি। কতগুলি অনুভূতি আছে যাকে আমরা বলি সহজাত বা instinct : যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহ, কামক্রোধ, মান অপমান, অহমিকা ইত্যাদি ; এরা ক্ষুৎপিপাসার অনুভূতির মত অনেকটা শরীর ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। আবার কতগুলি অনুভূতি আছে যাদের বলা যায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত বা intuitive ; যাদের উৎপত্তি কোথায় কি ভাবে ঘটে, বলা কঠিন—যেমন ঈশ্বর বা কোন বিশিষ্ট শক্তির অকস্মাৎ অনুভূতি, কোন দুরূহ সমস্যার হঠাৎ অকারণ সমাধানের অনুভূতি। মানুষ হিসাবে এ সব অনুভূতির তারতম্য দেখা যায় ; কোথাও প্রবল আবার কোথাও দুর্ব্বল। এ সব ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুভূতি বা সত্তা মানবজীবনের মূলে দেয় প্রেরণা ; এরা বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতিতে বা বিজ্ঞানের সীমায় বড় ধরা পড়ে না। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি বা ধর্ম্মবৃত্তির বিকাশ হয় এ সব অনুভূতিতে বা জ্ঞানে। এবং মানুষের বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটে বিজ্ঞানে। তথাপি বিজ্ঞানচর্চ্চা যে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি বিকাশেরও অনুকূল হতে পারে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে মানুষ খবর পেয়েছে অনন্ত বিশ্বের এবং অনন্ত কালের, যার তুলনায় মানুষের ক্ষুদ্র পৃথিবী এবং তার স্বল্প জীবন কালসমুদ্রে বারিবিন্দুর মত নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় কোটি কোটি শশী, ভাস্কর, গ্রহ, তারা, নক্ষত্র, নীহারিকা ও ছায়াপথ সমন্বিত বিশাল বিশ্বজগৎ যা মানুষের কল্পনাকে হার মানায়, আর কোথায় তার তুলনায় বালুকণাসদৃশ বসুন্ধরা যার উপর চলছে মানুষের এত জারিজুরী। এ অনন্ত বিশ্বের সন্ধান দিয়েছে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান। কোথায় মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবন, আর কোথায় কোটি কোটি যুগ-যুগান্তব্যাপী চলেছে জড় ও জীবজগতের অভিব্যক্তি। জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ভূবিদ্যা এবং জীববিদ্যার চর্চ্চায় মানুষ জানতে পেরেছে এর খবর। ফলে, মানুষের দম্ভ এবং অভিমান যায় ঘুচে। পাঠক হয়ত এখন বলে উঠবেন—তা হলে আজ এ বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব বিরোধ বেড়ে উঠেছে কি কারণে? পৃথিবী জুড়ে যে বিরাট হত্যাকাণ্ডের অহরহ অভিনয় চলেছে, তার মাল মশলা আসছে কোথা হতে? এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা সৃষ্টি হল কি করে? এ সব কি বিজ্ঞানচর্চ্চার পরিণাম নয়? এ কথা অস্বীকার করা যায় না, সত্য।

তাই বিজ্ঞানচর্চ্চায় মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্বোধিত না হয়ে, তার স্বার্থবুদ্ধিই শুধু প্রবল হয়ে উঠছে কেন, এটাই হল সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যা বিশেষ জটিল নয়। সহজেই এর সমাধান আমরা পাই। বিজ্ঞানকে আমরা শুধু আমাদের সুখ-সুবিধার কাজে লাগাবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করছি। ফলে, আমরা বিজ্ঞানচর্চ্চা করি খণ্ড-বিখণ্ড ভাবে। অখণ্ড বিজ্ঞানের যে রূপ, তার প্রেরণা হতে আমরা নিজেকে করি বঞ্চিত। তাই আজ দেশে দেশে শিল্পবিজ্ঞানী বা technician-এর সংখ্যা যাচ্ছে বেড়ে; আসল বিজ্ঞানীর সংখ্যা হচ্ছে বিরল। বিজ্ঞানকে একমাত্র প্রয়োজন ও স্বার্থসিদ্ধির সীমানার মধ্যে কারারুদ্ধ করে রাখলে, তা হতে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশের সম্ভাবনা যায় বিলোপ হয়ে। মানবজীবনের উদ্দেশ্য, তার ইতিহাস, বিরাট বিশ্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ণয়, এগুলিকেও করতে হবে বিজ্ঞান-চর্চ্চার অঙ্গ। শুধু বস্তুজ্ঞানকে আয়ত্ত করে প্রয়োজন সিদ্ধির কাজে লাগালে বিজ্ঞান থাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে। এতেই মানুষের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞান হয় এতে বিপথগামী। এ ক্ষুদ্র সীমার অবরোধ হতে বিজ্ঞানকে মুক্ত না করতে পারলে মানুষের নিস্তার নাই। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলেছে,—"নাল্পে সুখমস্তি"। অতএব ভূমার সন্ধানে পরিচালিত করতে হবে বিজ্ঞানকে, যদি মানুষ হয় মুক্তির প্রয়াসী। একমাত্র প্রয়োগ-বিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে মেতে থাকলেই মানুষের হবে অমঙ্গল। বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ডেই মিলবে এ কর্ম্মের পরিসমাপ্তি ও সার্থকতার সন্ধান। গীতায় বলেছে,

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

তাই বিজ্ঞানের সাধনায় করতে হবে কর্ম্ম এবং জ্ঞানের সমন্বয়।

"In practical affairs all life is a compromise, and most things reside in precisely that middle region which the law (The Law of Excluded Middle) attempts to abolish."

James Jeans.

আজকের নারী

বিভা সরকার

ওগো নারী বলিষ্ঠ সবল স্বচ্ছ দৃষ্টি হানো
ক্লেদাক্ত পঙ্কের মাঝে অমৃত পরশ তব দানো।
শুষ্ক জীর্ণ আবর্জ্জনা দূরে ফেলো ঠেলি
অজ্ঞানের অন্ধকারে দাও জ্বালি সত্য-দীপখানি।
দানবের সাথে মাতি হয়োনা দানবী
অমৃতের পুত্র তুমি, তুমি যে মানবী।
বন্ধন বেদনা ভাঙ্গি নাগপাশ জ্বালা
উর্ব্বশীর নৃত্য নয়—পর কণ্ঠে পারিজাত মালা।
ব্যাথিতা ধরিত্রী বুকে হও হে কল্যাণী
অন্যায় বিদ্রোহে দমি আন আজ বিপ্লবের বাণী।
দানবে দানবে দ্বন্দ্বে জাগে অপমান
দেবতা দানব দ্বন্দ্বে জয়ী ভগবান।
সত্যের অমোঘ অস্ত্র হানো তুমি অন্যায়ের শিরে
হলাহলে পান করি দাও নারী অমৃতেরে ফিরে।

'আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে তো সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপশিখার, দীপের নয়। নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া শুধু অনর্থক নয়, অপরাধ।'

—শরৎচন্দ্র

বাঙ্‌লা রঙ্গালয়ের বর্তমান অবস্থা

কুন্তল মজুমদার

দেশ ও জাতি গঠনে রঙ্গালয়ের দান অপরিসীম। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেকখানি প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বাঙ্‌লার রঙ্গমঞ্চ। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে বারবার আমাদের রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে। শত বাধানিষেধের মাঝেও আমাদের রঙ্গালয়গুলি অতীতে দেশ ও জাতির সেবা করে এসেছে। কিন্তু আজ বাঙলা রঙ্গালয়ের বড় দুর্দিন। নূতন নাটক নেই, নাট্যকার নেই, পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী—কিছুই নেই। শুধু পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে আজ এক অদ্ভুত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দেশ ও জাতির কল্যাণে এই অবস্থার অবসান করে আমাদের রঙ্গালয়গুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে।

বাঙ্‌লা রঙ্গালয়ের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণস্বরূপ সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে—সরকারী ঔদাসিন্য, জনসাধারণের রুচির অবনতি এবং চলচ্চিত্রের প্রভাব। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। এ কথা সত্য যে, দেশের রঙ্গালয়ের প্রতি সরকারের, বিশেষ জাতীয় সরকারের অনেকখানি দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু কালিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি যে কালে রাজসভা-কবি ছিলেন, আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় সে ব্যবস্থা সম্ভব নয়; অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে রঙ্গালয়গুলি সরকার পরিচালনা করবেন—এ ব্যবস্থা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। কারণ, তার ফলে রঙ্গমঞ্চ অচিরে সরকারী প্রচারযন্ত্রে পরিণত হবে। অভিনয়-কলাকে সরকারী বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখলে কোনদিনই তার প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। সরকার প্রধানতঃ যা পারেন এবং করা উচিত, তা হচ্ছে—আমাদের রঙ্গালয়ের প্রতি দেশের জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে দেওয়া। যে কোন জাতীয় সরকারের এটা অবশ্যকর্তব্য। আজকের আর্থিক দুর্দিনে আমাদের রঙ্গালয়গুলিকে অর্থ-সাহায্য করাও দেশের সরকারের একটি প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। কোন বশ্যতা-মূলক সর্তের বিনিময়ে নয়, পরন্তু দেশ ও জাতীয় কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবেই এই সাহায্য দেওয়া

উচিত। জাতীয় সরকারের আরও একটি প্রধান দায়িত্ব—দেশে এমন একটি "অভিনয় কলা কেন্দ্র" স্থাপন করা, যেখানে নাট্য-কলা সম্বন্ধে সব কিছুই শিক্ষা দেওয়া হবে।

—এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রধানতঃ যদি আমাদের জাতীয় সরকার অবহিত হন ও তাঁদের কর্তব্য পালন করেন, তা'হলে অচিরে রঙ্গমঞ্চ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, দেশের জনসাধারণ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আরও আগ্রহান্বিত ও শ্রদ্ধাশীল হবেন, চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মাঝে আমাদের রঙ্গালয়গুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যাবে না বা ভালো নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে অক্ষম হবেন না এবং নূতন নাট্যকলাবিদ্ তৈরী হয়ে ক্রমেই রঙ্গমঞ্চের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে সক্ষম হবেন।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়গুলি হলো জনসাধারণের তথাকথিত অবনত রুচি সম্বন্ধে। 'ফাইন আর্টস্' বা চারুকলা 'কালচার্' বা সংস্কৃতির অঙ্গবিশেষ। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক অবস্থার তারতম্যের সঙ্গে সংস্কৃতি তথা চারুকলারও উন্নতি বা অবনতি হয়ে থাকে। এতে হতাশার কিছু নেই এবং অবিলম্বে এর প্রতিবিধান করাও সম্ভবপর নয়। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, জনসাধারণের রুচির একটা ন্যূনতম মান সব সময়েই ঠিক থাকে এবং "ভালো" আর "মন্দ" তাঁরা সব সময়েই এবং ঠিকই বুঝতে পারেন। আমাদের রঙ্গালয়-কর্তৃপক্ষকে জনসাধারণের রুচির এই ন্যূনতম মানটির ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, এই তথাকথিত অবনত রুচিকে উন্নত করবার নৈতিক ও বৈষয়িক দায়িত্ব তাঁদেরও অনেকখানি। এ কাজে জাতীয় সরকার যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন বলে মনে করি। প্রসঙ্গতঃ চলচ্চিত্র সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। শোনা যায়, বম্বের কয়েকজন 'ডিস্ট্রিবিউটার' (ছবির) প্রদর্শনীর জন্য ছবি নেন না বা কোনভাবেই সাহায্য করেন না, যদি না তাঁদের মনোমত অভিনেত্রীগণ সে ছবিতে অভিনয় করেন, তাঁদের খেয়াল খুসীমতো নাচ-গান ছবিতে দেওয়া হয়—তা সে যতো অশ্রাব্য ও অশ্লীল হোক্ না কেন। সরকার এই সব ডিস্ট্রিবিউটারদের বাধ্য করতে পারেন যাতে তাঁরা এই ভাবে খেয়াল খুসীমতো কাজ না করতে পারেন। সরকারের এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে 'প্রডিউসার'গণ উৎসাহ পাবেন সত্য সত্যই ভাল ছবি তৈরী করতে এবং প্রকৃত ভাল ছবি যতো বেশী দেখানো হবে, কালে দর্শকরুচিও তত উন্নত হতে বাধ্য। এটি চলচ্চিত্র সংক্রান্ত

উদাহরণ দেওয়া হলো, রঙ্গমঞ্চের সম্বন্ধেও সরকারের করণীয় এমন অনেক কিছুই আছে।

তৃতীয় ও শেষ কথাটী হলো, সিনেমার প্রভাব। সিনেমার 'জনপ্রিয়তার' ফলে রঙ্গমঞ্চের ক্ষতি হচ্ছে—এমন ধারণার মূলে যথেষ্ট ভিত্তি নেই। সিনেমা ও থিয়েটার সম্পূর্ণ পৃথক। থিয়েটারের আবেদন প্রত্যক্ষ ও প্রবল। সিনেমার জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণ ইংলণ্ডে আজও প্রবল। বার্ণার্ড শ'য়ের নাটক আজও রাতের পর রাত সেখানকার থিয়েটারে অভিনীত হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে আজ ভালো নাটকের ভালো অভিনয় কোথায়? সিনেমার জনপ্রিয়তা প্রধানতঃ দর্শক-সংখ্যার ওপর বিবেচনা করা হয়। একই ছবি একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ৪০টী ছবিঘরে দেখানো চলতে পারে, কিন্তু থিয়েটারে তা সম্ভব নয়; তাই থিয়েটারের সাফল্য নির্ভর করবে দর্শক-সংখ্যা নয়, 'দর্শক-শ্রেণীর' ওপর,—অর্থাৎ কোন্ শ্রেণীর দর্শক, তারই ওপর।

বাঙ্‌লা রঙ্গালয়ের এই দুর্দিন ঘোচাতে হলে আজকের দর্শকের রুচি বুঝতে হবে। জানতে হবে আজকের নাটকের ধারা। আজ প্রয়োজন—যুগোপযোগী ও বাস্তব-ধর্মী নাটক। নিছক প্রেমের কাহিনী বা অবাস্তব কোন ঘটনা আজকের দর্শক ও শ্রোতার মনে রেখাপাত করতে পারে না। আজকে পৃথিবীতে মানুষের জীবনে যে বহুমুখী সমস্যা—আজকের নাটকের মাঝে তা মূর্ত হয়ে ওঠা উচিত। তবেই সে নাটক সার্থক। ভালো অভিনয় বলতে আজ জীবনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি বোঝায়। পুরানো অভিনয়ের ধারা আজকের দিনের উপযোগী নয়। রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি সব কিছুই আজ "বাস্তবতার" দিকে সম্পূর্ণ নজর রেখে করা উচিত।

———

প্রক্ষোভ

কণকপ্রভা মজুমদার

প্রক্ষোভ শব্দটি অনেকের কাছে অপরিচিত হলেও এতে যা বোঝায় তার সঙ্গে আমাদের সকলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং একে নিয়ে আমরা যথেষ্ট বিব্রতও হয়ে থাকি। প্রক্ষোভ বলতে রাগ, ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি বোঝায়। এদের এক একটিকে আলাদা করে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু এদের সংমিশ্রণকে বোঝা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। যেমন ধরুন—যাকে আপনি নিজের প্রাণাপেক্ষাও বেশী ভালবাসেন বলে মনে করেন তাকে কঠোর বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করে কষ্ট দিতে আপনি কি করে পারলেন? তা বুঝতে পারেন কি? বাবা ছেলেকে ভালবাসেন, মা মেয়েকে ভালবাসেন একথা স্বীকার করতেই হবে; কিন্তু ঘরে ঘরে পিতাপুত্রের মনোমালিন্য, মা মেয়েতে ঝগড়ার তিক্ত দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

ঝগড়া মনোমালিন্য—এসবের প্রধান কারণ হল একে অন্যকে বুঝতে না পারা; এই বুঝতে না পারবারও কারণ আছে। প্রত্যেক মানুষেরই শরীরগত ও মনোগত পার্থক্য আছে, তাই প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। প্রত্যেকের মধ্যে প্রক্ষোভের পরিমাণ ও প্রকাশ ভঙ্গি বিভিন্ন। কোন এক অবস্থায় বা ঘটনায় আমি রেগে গেলাম, আপনি রাগলেন না। আমার রাগের যতটা তীব্রতা আপনার রাগের ততটা নয়। আমি রেগে গিয়ে যে ব্যবহার করি আপনি তা করেন না ইত্যাদি বিষয়ে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে পৃথক; তদুপরি বিভিন্ন প্রক্ষোভের সংমিশ্রণ ও প্রতিক্রিয়া প্রত্যেকের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই বিভিন্নতার কথা কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের কিছুতেই মনে থাকে না। প্রত্যেক ঘটনাকে কেবলমাত্র নিজের হিসেব মতই আমরা বিচার করে থাকি, সব দিকে দেখি না, কাজেই বোঝবার মধ্যে থেকে যায় অনেকখানি অসম্পূর্ণতা এবং সেই জন্যেই অন্যের প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়ার সঠিক কারণ ধরতে পারিনা, বুঝতে পারি না; গোলমাল লেগে যায়। প্রক্ষোভগুলির মধ্যে কেউই কম বলবান নয়, তবে তার মধ্যে যার

প্রকাশ অহরহ চোখে পড়ে তার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে রাগ বা ক্রোধ।

রাগ বা ক্রোধের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি অতীব বিচিত্র এবং উৎপত্তিস্থল থেকে প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত এর গতিপথ অত্যন্ত অদ্ভুত। কার, কখন, কেন রাগ হল তা ভাল করে বুঝতে হলে দরকার আমাদের সাধারণ দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্ত্তন। যতক্ষণ তা না করতে পারছেন ততক্ষণ পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বেড়েই যাবে—রাগেরও মাত্রা বাড়তে থাকবে। যেমন ধরুন—বাড়ীর কাজ রোজই প্রায় একরকম থাকে, চাকরও পুরোনো, ভুল ক্রটি খুব বেশী হবার কথা নয়। কিন্তু তবু রোজই চাকর বাকর নিয়ে বাড়ীতে তুমুল কাণ্ড বেধে যায়। কেন? কারণ প্রথমেই আমরা ধরে নিই যে, ভুলক্রটিগুলো চাকরটা 'ইচ্ছে' ক'রে করে, বদমায়েসী ক'রে করে। এই কথা যেই মনে হয়, অমনি রাগ হয়, তারপর আর কি, উভয় পক্ষে লেগে যায়। গোড়ায় একটু ভুল ধারণার জন্য সব গোলমাল হতে থাকে। একথা যদি মনে হয়, আচ্ছা, চাকরটা যদি 'ইচ্ছে' করেই ভুল ক্রটি করে থাকে, তবে সে 'ইচ্ছেটা'ই বা তার হচ্ছে কেন? দৃষ্টিভঙ্গির এইটুকু মোড় ঘুড়িয়ে দিলেই সমস্যা সমাধানের পথে অনেকখানি এগিয়ে যায়। তবে প্রথমেই কেন মনে হয় যে চাকরটা 'ইচ্ছে' করে, বদমায়েসী করে ভুল ক্রটি করছে, সে কথার আলোচনা করা এই ছোট্ট প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

সকালবেলা উঠেই শুনব—"তোমাদের কলটা একটু বন্ধ করে দাও ত",—বাড়ীওয়ালার ঝিয়ের গলা; শুনেই রাগ হয়। চৌবাচ্চার কলটা প্রত্যেক দিন ভোরেই বন্ধ করে রাখা হয়—সারারাত ধরে চৌবাচ্চা ভরে থাকে—খুলে রাখবার কোন দরকারই নেই—তবু ওরা বিশ্বাস করে না। রোজ শুনি, রোজ রাগ হয়। তখন যদি মনে করতে পারি যে ওরা ওদের কলে জল পায়না বলেই ত রোজ বলবার দরকার হয়। যে কোন কারণেই হোক ওদের কলে জল পেতে অসুবিধা হয়। এখানেও দেখুন এই রাগের ঘটনাকেও যদি অপর পক্ষের হয়ে ভাবতে পারি তবে কিন্তু অনেক অশান্তি কম হয়; রাগ হওয়া মাত্রেই ত মনের অশান্ত অবস্থা।

মা দুপুরে ঘুমুচ্ছেন, ছোট ছেলের ঘুম আসছে না—বাইরেও যেতে পারছে না, দরজা বন্ধ। মাকে ঠেলে ঠেলে তুলছে, জল চাইছে, নয় পেচ্ছাপ করব বলছে; মা বিরক্ত হয়ে উঠছেন; দু একটা ধমকও দিচ্ছেন ছেলেকে। শেষে

উঠে পড়তেই হল। আর রেগে গিয়ে ছেলেকে মারতেও হল। কিন্তু মা যদি ছেলের হয়ে ভাবতে পারতেন তাহলে কি তিনি রাগতে পারতেন? ছেলের ঘুমও আসছে না, কোন কাজও করতে পারছে না, মাকে বিরক্ত না করে সে কি করবে?

ক্লাসে মাষ্টার মশাই রাজুর উপর রেগে গিয়ে দিলেন ঘুঁষা বসিয়ে। কি অপরাধ? কেবল ক্লাশে গোলমাল করে, কথা বলে। রাজু ক্লাশে ফার্ষ্ট হয়—ক্লাশের পড়ায় মন না দিয়েও। মাষ্টার মশায় যদি একদিনও ভাবতেন যে আচ্ছা, রাজু গোলমাল করে কেন, তাহলে বুঝতেন যে ক্লাশে তার বুদ্ধি খাটাবার মত উপযুক্ত কোন কাজ সে পায় না বলে। মাষ্টার মশাই ভাবছিলেন, রাজু 'ইচ্ছে' ক'রে বদমায়েসী ক'রে তাঁর ক্লাশে গোলমাল করছে। তাই মাষ্টার মশাইর রাগ হয়েছে।

বাবা ছেলেকে দু'চোখে দেখতে পারেন না। কেবল মায়ের জন্যে ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারছেন না। ভীষণ রেগেছেন বাবা, রাগবার কারণও যথেষ্ট আছে। ছেলে স্কুলের পড়ায় ক্রমশঃ পেছিয়ে পড়ছে, লুকিয়ে বই বিক্রি করছে, বাড়ীর জিনিষ পত্তর বিক্রি করছে আর সেই পয়সা দিয়ে সিনেমা দেখছে। ছেলেও বাবা মায়ের সঙ্গে ভীষণ রাগারাগি করে, বকাবকি, মারধোরও হয়, রোজই প্রায় হয়, বাবা মা ও ছেলেতে ভীষণ অবস্থা—বাড়ীতে রাগারাগি কান্নাকাটি, অশান্তি লেগেই আছে। এখানে কি হ'ল? ছেলে রেগে যাচ্ছে—সে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরের জিনিষ বিক্রি করছে অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ করছে এবং সেই পয়সা দিয়ে সিনেমা দেখছে, যেখানে সে এমন এক জাতীয় আনন্দ পাচ্ছে যাকে আমরা খারাপ বলে অভিহিত করে থাকি॥ লুকিয়ে নিষিদ্ধ কাজ করার জন্য ছেলের মনে অপরাধী ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কারণে অকারণে ক্রোধ প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তার অপরাধের জন্য সে যে রকম ধমকানি বা কঠোর ব্যবহার পাবে বলে মনে করে, সেই রকম ব্যবহার সে-ই আগে করে ফেলছে। বাইরে থেকে দেখতে গেলে দেখা যাচ্ছে ছেলের মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে—একটু ছুঁতো পেলেই ক্রোধের প্রকাশ হয়ে পড়ছে। বাবা মা রাগছেন—তাঁরা দেখছেন তাঁদের ছেলে এমন হল! লোকের কাছে তাঁরা হেয় হলেন, তাঁরা ভাবছেন ছেলেটা বদমায়েস হয়ে গেল! আর বদমায়েসী—সে 'ইচ্ছে' ক'রেই করছে, ইচ্ছে ক'রেই সে তাঁদের সঙ্গে লাগে আর ঝগড়া অশান্তির সৃষ্টি

করে; এবং ইচ্ছে করলেই সে ঐ রকম ব্যবহার শুধরে ফেলতে পারে। যখনই বাবা-মা মনে করছেন যে ছেলে 'ইচ্ছে' ক'রে ঐ রকম ব্যবহার করছে, তখনই সমস্যা জটিল হতে আরম্ভ করছে। কিন্তু ছেলে যদি তার মেজাজ খারাপের কারণ জানত তাহলে ত কোন গোলমালই হত না। ছেলেও জানেনা রাগের কারণ, বাবা মাও বুঝতে পারেন না ছেলের ব্যবহারের অর্থ। বাবা মা প্রথম প্রথম ছেলেকে বুঝিয়েছেন, তারপর রাগারাগি করেছেন এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ বোঝাবার ধৈর্য্য একেবারেই থাকল না—রাগারাগি, বকাবকি, চেঁচামেচি, মারধোর আরম্ভ হয়ে গেল; কেউ কেউকে বুঝছে না, বাবা-মার একথাও মনে হচ্ছেনা যে, ছেলে রেগে গিয়ে যে রকম ব্যবহার বা যে ভাষা প্রয়োগ করছে, তা ছেলেবেলায় সে তাঁদেরই মুখে এবং প্রতিবেশীর কাছে শুনে ও দেখে শিখেছে। বলতে গেলে একেবারে হুবহু তাঁদের রাগের সময়কার ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি করছে ছেলে। ছেলের মেজাজ খিটখিটে হবার কারণ বলেছি আগে এবং রাগের প্রকাশ ভঙ্গির উৎপত্তির কথাও বললাম। এর কোনটাই ছেলে এবং বাবা মা বুঝতে পারেন নি; এবং বাবা মা বোঝবার চেষ্টাও করেন নি; কারণ তাতে তাঁদেরই উপর দায়িত্ব এসে যাবে। এই রকম অশান্তিকর অবস্থার সময় এক পক্ষ যদি অপরের হয়ে ভাবতে বাস্তবিক চেষ্টা করে—তা হলেই এই জাতীয় সমস্যাগুলি অনেকখানি হালকা হয়ে আসবে। বাবা মা যদি সত্যি সত্যিই ভাবতে চেষ্টা করতেন যে 'কেন ছেলে ও রকম করছে' তা হলে ছেলের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারতেন।

এই রকমভাবে বোঝবার চেষ্টা সব সময়ে আসে না, কারণ এ পথে একটু অগ্রসর হলেই বাবা মা-রা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন যে, তাঁরা নিজেরাও ছেলের এই রকম ব্যবহারের জন্যে কতখানি দায়ী। এই উপলব্ধি অস্বস্তিকর; কিন্তু এই অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সৎসাহস যদি আমরা অর্জ্জন না করি, তা হলে ভুল বোঝাবুঝি কোন দিনই কমবে না—ফলে ছেলেরা অবাঞ্ছিত পথে যেতেই থাকবে এবং আমাদের রাগের মাত্রাও বাড়তেই থাকবে।

শিক্ষায় শারীর শিক্ষার স্থান

ডাঃ জে, সি, মুখার্জী

কিছুদিন যাবৎ আমাদের দেশে শিক্ষার পরিবর্তন সম্বন্ধে একটী আন্দোলন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অবশ্য সেটা সুরু হয়েছে প্রায় এ শতাব্দীর প্রথম থেকেই। বর্তমানে আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়েও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারায়, দিনের পর দিন বর্তমান শিক্ষার অভাব ও ত্রুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ পরাধীনতার পর নবলব্ধ স্বাধীনতার সূচনায় নানা বিষয়ক নূতন ধরণের গুরু দায়িত্বের চাহিদায় আমাদের ব্যক্তিগত সামাজিক ও জাতীয় জীবনে বহু অজ্ঞতা ও অক্ষমতা এমন বিকট ও উলঙ্গভাবে দেখা দিয়েছে যে, দেশময় শিক্ষা সম্বন্ধে একটা আলোড়ন এসে পড়েছে এবং যারা কোন দিন শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবেন নি, তাঁরাও এ বিষয় নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বহু আলাপ আলোচনা ও গবেষণা হলেও তার ফলে কোন একটী সুস্পষ্ট অভিমত গঠিত হয়ে ওঠে নি বা প্রণালী নির্দিষ্ট হয় নি।

বিগত অর্ধ শতাব্দীর প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে চরিত্র শক্তি নীতি অথবা এক কথায় মনুষ্যত্ব বা জাতীয়তা গড়বার খুব অল্প প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়। ফলে দুর্বল দেহ মন ও নীতি অবলম্বন করেই আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নানাপ্রকার দোষ ত্রুটি সংস্কার গড়ে উঠেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই দ্রুত পরিবর্তনের যুগেও বিকৃত এবং কুটিলতাপুর্ণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের অতি শীঘ্রই এ সব দোষত্রুটি দূর করে সময়োপযোগী ও জীবনোপযোগী শিক্ষার দৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করার নিতান্ত প্রয়োজন। দোষত্রুটিগুলোর কারণ বিশ্লেষণ করলে সহজেই দেখতে পাওয়া যায় যে নৈতিক শিক্ষা ও শারীর শিক্ষার অভাবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের ক্লৈব্য জড়তা অক্ষমতার জন্যে দায়ী।

নৈতিক শিক্ষাবিষয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র করা উচিত। বর্তমানে আমরা শারীর শিক্ষার মাধ্যমে উপরি উক্ত অভাব অভিযোগ কতদূর প্রতিকার করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করব এবং স্বভাবতঃই এ আলোচনা অধিকাংশভাবে বাংলার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই করা হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে সব সমস্যা একান্ত উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে

বেকার সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, অর্থাভাব ও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলাই প্রায় অধিকাংশ। অবশ্য সমস্যাগুলো পৃথকভাবে নামকরণ করা হলেও এগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তবু বিভিন্ন কোণ থেকে দৃষ্টিপাত করলে একটা সামগ্রিক ধারণা করা সহজ হবে।

বেকার সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করেছে এবং শিক্ষিতের মধ্যেই একটু বিকটরূপে দেখা দিয়েছে। এই দ্রুত পরিবর্তনের যুগে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ের সংঘাতেই মানুষের গুণ ও বিদ্যাবুদ্ধির মূল্যের যে বিপর্যয় ঘটিয়েছে, তাই-ই এই সমস্যাটির অন্যতম মূল কারণ। যে শিক্ষার অনেক সম্মান ও মূল্য ছিল এখন তার কোন মূল্যই নেই। ফলে খুব দুঃখের সঙ্গেই আমাদের দেখতে হয় যে, অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণের অধিকারী হয়েও বহু আদর্শ ছেলে ও মেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা হারিয়ে সমাজের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দায়ী কে? সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা থাকলে এরাই হতো সমাজ ও জাতির মহামূল্যবান সম্পদ। এ ভাবে যে আমরা জাতিগত ভাবে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। আমার মনে পড়ে প্রায় পনের বৎসর পূর্বে একজন বিশিষ্ট জাপানী শিক্ষাবিদ্ শিল্পী বলেছিলেন যে, মানুষের গুণ ও জ্ঞানের অনাদর ও অপচয় ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলাদেশের মত সমগ্র জগতে কোথাও হয় না।

এই অপচয় এবং অনাদর দূর করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বর্তমান যুগের চাহিদার অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা। বর্তমান যুগ শিল্পের যুগ, কর্মের যুগ, বিজ্ঞানের যুগ। এই হিসেবে আমাদের শিক্ষার ধারার পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের নেতারা সচরাচরই বলে থাকেন Produce or perish, Learn to labour এবং কর্মভীরু কর্মশক্তিহীন ইত্যাদি বলে যুব সমাজকে দোষী করে থাকেন। নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে এই চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়িত না হলে 'পুঁথিভরা নীতি জীবন বিফল' হয়ে যাবে। এই কয়টি উপদেশ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আমাদের নেতৃবৃন্দ দৈহিক পটুতা, কর্মশক্তি ও শ্রমের মর্যাদার ইঙ্গিত করছেন। কিন্তু এগুলো সৃষ্টির জন্যে প্রতি ছাত্র এবং ছাত্রীর যে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন, তার কিছু মাত্র বন্দোবস্ত আমাদের বর্তমান পাঠ্যক্রমে নেই বললে মিছে কথা বলা হয় না। যে দেশের গড়পরতা আয়ু মাত্র স্বল্লাধিক ত্রিশ—কাজেই স্বাস্থ্যহীনতাও যথেষ্ট—সেই দেশে শিক্ষার প্রতি স্তরে স্বাস্থ্য ও শারীর

শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না থাকা জনসমাজের কতবড় অকল্যাণের কারণ তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। এই স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার মাধ্যমেই বলিষ্ঠ দেহমন, স্বাস্থ্য, অধিকতর আয়ু, কর্মশক্তি ও ব্যক্তিত্বলাভ সম্ভব। কাজেই সুপরিকল্পিত ও পরিবর্তিত ধরণের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা অধিকতর কর্তব্য।

খাদ্য সমস্যা অধিকাংশভাবে কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অবশ্য উন্নততর কৃষি প্রণালী ও কৃষক-মালিক সম্বন্ধও আবশ্যক। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, কর্মশক্তির অভাবে, প্রেরণার অভাবে আমরা চাষের উপযুক্ত সম্পূর্ণ জমির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করি না। নিষ্ঠার সঙ্গে চাষ করা, ফসলের যত্ন করা সবই দৈহিক প্রচেষ্টা। কাজেই এ বিষয়েও কৃষি পরিবেশে কৃষিকার্য্যমূলক শিক্ষার মাধ্যমেই কৃষির প্রসার ও উন্নয়ন সম্ভব।

বিজ্ঞান, শিল্প ও যন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে আমাদের জীবনধারা ও কর্মপ্রণালী অত্যন্ত প্রভাবান্বিত ও আহত হয়েছে, বিশেষতঃ সহর ও সহরতলীতে। ফলে বিকৃত ও কৃত্রিম জীবনধারা অকারণেও গ্রামীণ জীবনে প্রবেশ করেছে। এই দৈহিক শ্রমের অপ্রয়োজনই এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণে দৈহিক অপটুতা এবং পরিশ্রমের অভাবে স্বাস্থ্যহীনতা যেন আমাদের জাতীয় জীবনকে ব্যাপকভাবে পেয়ে বসেছে। এ বিষয়ে আমাদের উদাসীনতা এত গভীর এবং বিস্তৃত যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এমনকি চিকিৎসা ব্যবসায়ীরাও ভুলতে বসেছেন যে, শ্রম ব্যায়াম শারীরিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনের মাধ্যমেই স্বাস্থ্যের লাভ, রক্ষা ও উন্নতি সম্ভব। ফলে কর্মক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা, শারীরিক শিক্ষা প্রচলনের প্রয়াস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। শক্তি সামর্থ্য পরমায়ুর সঙ্গে রোগ নিবারণী শক্তিও যে স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষাই প্রকৃষ্ট উপায়ে দান করতে পারে, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণেরও এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত। আমাদের একথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা উচিত যে রোগ নিবারণী সিরাম ভ্যাকসিন অবস্থা বিশেষে একান্ত আবশ্যক হলেও স্বাস্থ্যের দিক থেকেও শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে স্বাস্থ্য বিভাগের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। সুতরাং স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা স্বাস্থ্য বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগ উভয়েরই কর্তব্য। বর্ত্তমানের প্রচলিত শিক্ষার অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য যেসব পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শারীরিক শিক্ষা। মনের উপর দেহের প্রভাব

ও দেহের উপর মনের প্রভাব উভয়ই জীবনের সাফল্য নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং দেহ ও মনের পারস্পরিক প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন থেকেই প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব।

অর্থাভাব বাঙ্গালায় অন্যতম সমস্যা। কিন্তু এবিষয়ে বাঙ্গালীর অবাস্তব উদাসীনতা নিতান্ত পীড়াদায়ক। চারুশিল্পকলায় অধিক অনুরাগ ও ধৈর্যহীনতাই অধিকাংশভাবে দায়ী। Art for sake of art, education for the sake of education, religion for the sake of soul—nothing for the sake of life—এ দর্শন পূর্ব্ব জগতের বিশেষতঃ ভারতের আবার ভারতের মধ্যে বাংলারই বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা ও বুদ্ধি মূলক কর্মে বাঙ্গালীর স্থান আছে কিন্তু শ্রমের ক্ষেত্র থেকে তারা পশ্চাৎপদ হয়েছেন এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলায় প্রায় এক তৃতীয়াংশই শ্রমিক এবং তাদের অধিকাংশই অবাঙ্গালী। এটা শ্লাঘার কথা নয়। এদিকে বাংলায় প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক বেকার। ভবিষ্যতে বুদ্ধিমূলক কর্মস্থল বাড়বার সম্ভাবনা নেই—হয়ত বা কমতে পারে—সুতরাং ভবিষ্যতে ছোট ও বড় ব্যবসা ও শ্রমের কাজের জন্য বাঙ্গালীকে প্রস্তুত হতে হবে। এজন্য বর্তমানের বাবুকারক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন আমাদের একান্ত কর্তব্য। বড় শিল্পের প্রসারের সঙ্গে ও বিদেশী শিল্প জাত বড় ও ছোট জিনিষের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছোট বড় কুটীর শিল্প যেতে বসেছে। অন্য দিকে commission প্রভৃতি দিয়ে কুটীর শিল্পের রক্ষার প্রয়াস সফল হবে না। কাজেই বেকার সংখ্যা আরও বাড়বে বই কমবে না। সরকার বা কোন রাজনৈতিক দলের এ সম্বন্ধে কোন স্থির পরিকল্পনা নেই। যান্ত্রিক প্রসারে আমাদের জন-বহুল দেশের বেকার সমস্যার সমাধান ত হবেই না—উপরন্তু জটিলতা বেড়ে যাবে। কারণ তাতে অল্প সংখ্যক লোকের সুবিধা হবে এবং বহু সংখ্যক লোকের বেকার হতে হবে। বেশী সংখ্যক লোকের কর্ম সংস্থানের জন্য দৈহিক কর্মক্ষমতার মাধ্যমে জল মাটী গাছ বন বাগান তাঁত চরকা বাসন কাঠের কাজ রং ধোলাই প্রভৃতি কর্মে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। এবং এ সব কাজে চাই—শক্তি, স্বাস্থ্য, ধৈর্য, কর্মক্ষমতা দক্ষতা, আয়ু। এ সব গুণের জন্য প্রয়োজন শারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন। সুতরাং সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা অনুসারে যুবসমাজে এ শিক্ষার প্রচার ও প্রসার একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান যুবসমাজে ব্যাপক ভাবে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তা বন্ধ করা না গেলে অদূর ভবিষ্যতে তা দুরারোগ্য ব্যাধির আকার ধারণ করবে। এ বিষয়টী অতি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং ভবিষ্যতে পৃথক ভাবে এর আলোচনা করাই সঙ্গত হবে।

সাময়িকী

শ্রীনিত্যগোপাল-জন্ম-শতবার্ষিকী: গত ৪ঠা ভাদ্র শনিবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউস্থ মহানির্ব্বাণ মঠে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রীমৎ নিত্যশ্যামানন্দ অবধূতের প্রারম্ভিক সঙ্গীতের পর তিনিই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; পরে শ্রীমৎ ধীরানন্দ শাস্ত্রী কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের তাৎপর্য্য এবং ধর্ম্মগ্লানি দূর করিবার জন্যই যে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ, তাহা বিস্তারিত রূপে বলেন। তাহার পর শ্রীযুত দাশরথি মুখোপাধ্যায় স্মৃতিতীর্থ মহাশয় 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য,' 'ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—শ্লোক-দ্বয়ের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের সম্পর্কের উল্লেখ করত কৃষ্ণলীলার উপযোগিতা বর্ণনা করেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয় বলেন: 'ধরার ভার হরণ করিতে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, স্ত্রী যখন স্বামীর দ্বারা অপমানিত, তখন সে নিজকে স্বামীর 'ভার' মনে করে; ধরাও যখন দস্যুসদৃশ রাজাদের দ্বারা শোষিত, সমাজপতিগণের কাছে যখন সমাজের নিম্নশ্রেণী লাঞ্ছিত, দেবতার কাছে যখন সৃষ্ট জীব পশুরূপে ব্যবহৃত হইত, আকাশ যখন মাটীকে শোষণ করিতেছিল, পুরুষ যখন 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি' বলিয়া নিজেদের মান দ্বারা নারীদের চিহ্নিত করিতেছিল, নারীর স্বমর্য্যাদা যখন অবহেলিত হইতে বসিল, মুক্তিসাধক দল যখন প্রকৃতির 'নাম' ও 'রূপ'কে মিথ্যা মনে করিয়া অথচ মুক্তি-সাধনার সহায়ক রূপে স্বীকার করার ছলে নাম ও রূপকে পদাঘাত করিয়া অনাম-অরূপ ব্রহ্মের ধ্যানে বিভোর ছিলেন, তখন ধরা গো-রূপ ধারণ করিয়া অশ্রুমুখী হইয়া ব্রহ্মার, সৃষ্টিকর্ত্তার শরণ লইয়াছিলেন, ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতা সহ ক্ষীরোদ সাগর তীরে উপস্থিত হইয়া, হৃদয়ের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনারত হইলেন। দৈববাণী হইল—'আমি ধরার বুকে আসিতেছি ধরার ব্রহ্মমূল্য প্রদানের জন্য, ব্রহ্মলোকের সমকক্ষতা ধরাকে দিবার জন্য, তোমরাও ধরায় জন্ম গ্রহণ কর।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম শোষণের দেশে, কংস-কারাগারে। কিন্তু সেখানে তাঁহার পুষ্টি সম্ভব হয় নাই; তাঁহাকে যাইতে হইল বৃন্দাবনে পোষণের দেশে,

নন্দ-যশোদার নিরভিসন্ধি স্নেহের মধ্যে, গোপীদের অকৈতব স্পর্শের মধ্যে, 'মামেকং শরণং ব্রজ'-এর আবেষ্টনে। বৃন্দাবনে সকলের সকল দর্প চূর্ণীকৃত। বৃন্দাবনে দেবতার দর্প চূর্ণ, ব্রহ্মা সেখানে ব্রজগোপ-দেহ পাইবার জন্য ব্যাকুল। বৃন্দাবনে অজড়ের দর্প চূর্ণীকৃত, সেখানে 'জয় রাধে'-ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। নারীপ্রগতির জন্মভূমি ব্রজধাম। ভুবি-বৃন্দাবনে উদ্ধব মানুষের সৌভাগ্য লাভ করিয়াও তরুগুল্মলতা জন্ম প্রার্থনা করেন। সব উঁচু মাথা বৃন্দাবনে ধরার ধূলিকে নমস্কার করিয়া ধন্য। ব্রজের পোষণ-রসে পুষ্ট শ্রীকৃষ্ণই বিশ্ব-পোষণের জন্য কংস-জরাসন্ধ প্রভৃতির রাষ্ট্রীয় শোষণের পথ রোধ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই পোষণমূর্ত্তি। তাঁহার এই পোষণঘন দিব্য জন্মকে পোষণ-তত্ত্বের আলোকেই দেখিতে হইবে। 'মায়াবাদ' নাম ও রূপকে 'মায়া' বলিয়া তাহার ব্যবহারিক মূল্যই শুধু স্বীকার করিয়াছে; সেই নাম-রূপই বৃন্দাবনে পারমার্থিক—'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ,' 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ'। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে নাম রূপ নিত্য, চিদ্‌ঘন। নাম-রূপের উপরের শোষণকে শোষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পোষণের রসে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, ব্রহ্ম মূল্যে মূল্যদান করিয়াছেন। এবম্বিধ পোষণমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তাঁহার দেহত্যাগও হয় না, পুনর্জ্জন্মও হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-লীলার তত্ত্বতঃ শ্রবণের ফল অহংগ্রহোপাসনা বা প্রতীকোপাসনা হইতেও শ্রেষ্ঠ। 'ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্মনৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন' এই বাক্যের অর্থ কিছুতেই এইরূপ হইবে না যে, তিনি দেহত্যাগ করার পর আর পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না। 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'—ইহার সোজা অর্থ হইতেছে—'আমি বৃন্দাবনও ছাড়ি না, এক পা'ও অগ্রসর হই না।' 'ন'-পদটী দেহত্যাগ করা ও পুনর্জ্জন্ম পাওয়া এই দুইয়ের সঙ্গেই যুক্ত করিতে হইবে। শ্রীযুত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলায় নাম-রূপ যোগমায়া, একান্ত মায়াই নয়। ব্রহ্মযোগে যোগিনী যে মায়া তাহাই যোগমায়া (organic nature)। পক্ষান্তরে মায়া হইতেছে যান্ত্রিক প্রকৃতি (mechanical nature)। আমরা পোষণমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের জন্মে নিজ জন্ম আস্বাদন করিব, সর্ব্ব ক্ষেত্রের শোষণকে পোষণে গড়িয়া তুলিব। আমাদের জীবনে তাঁহার দিব্য জন্ম সফল হউক।

শ্রীরাধাষ্টমী ঃ গত ১৯শে ভাদ্র মহানির্ব্বাণ মঠে শ্রীরাধাষ্টমীর দিনে শ্রীরাধার জন্মলীলার তাৎপর্য্য আলোচিত ও আস্বাদিত হয়।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রথমে বাশুলী-ভক্ত চণ্ডীদাসের একটী কবিতার অংশবিশেষ উল্লেখ করেন :

'শুন গো মরম সই।
যখন আমার জনম হইল নয়ন মুদিয়া রই।'

শ্রীরাধা যে অন্ধ হইয়াই জন্ম নিয়াছিলেন মাতা কীর্ত্তিদার কোলে রাজা বৃষভানুর ঘর আলো করিয়া। বৃষরাশির ভানু অর্থাৎ জ্ঞানের দীপ্তরশ্মি যখন তাহার প্রখরতায় নামরূপাত্মিকা এই বিশ্বপ্রকৃতিকে ছাই করিতে চাহিতেছিল, তখন 'সবিতুঃ বরেণ্য' ভর্গরূপী প্রাণশক্তির ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীরাধা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি প্রাণমূর্ত্তি; তাই তাঁহার খোঁজ বুদ্ধি বিচারের শাস্ত্রে লেখে না। তাঁহার অস্তিত্ব হৃদয়ে; তিনি হৃদয়পুতলী। তিনি আসিয়াছিলেন অন্ধ প্রকৃতির (blind nature) চক্ষুষ্মান রূপ প্রকট করিতে। প্রকৃতিকে, প্রবৃত্তিকে আমরা 'অন্ধ' বলিয়াই জানি ; আমাদের ধারণায় ব্রহ্মই শুধু চৈতন্যময়; কিন্তু পুরুষোত্তমের স্পর্শে যেমন শ্রীরাধা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, তেমনি পুরুষোত্তম-দর্শন ও পুরুষোত্তমের জীবনের জন্য যাহারা লোলুপ, তাঁহাদের প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রতিটী স্পন্দনও নিবৃত্তিময়ী হইয়া উঠে। শ্রীরাধারাণীর জীবনে ভিতরের বাহিরের যাবতীয় প্রবৃত্তি স্পন্দন কৃষ্ণময়। তাঁহার খাওয়া পরা, হাসা খেলা, নাচ গান সব কৃষ্ণময়। 'কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাহার ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'। যিনি শ্রীরাধা, তিনিই প্রাণ, বিশ্ব-প্রাণ, মহাপ্রাণ, পরব্রহ্মমহিষী। এই প্রাণই উপনিষদের প্রাণ, যাহার উপাসনায় 'শুষ্ক তরু মুঞ্জরে মরা ভ্রমর গুঞ্জরে'। এই প্রাণ সর্ব্বম্ভরি, সর্ব্বভুক্—'আ শ্বভ্যঃ আ শকুনিভ্যঃ'। এই প্রাণই বলিয়াছেন :

একুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায়।

শ্রীরাধার জীবনে হয় ব্রহ্ম নয় মায়া, হয় নির্গুণ নয় সগুণ, হয় প্রবৃত্তি নয় নিবৃত্তি, হয় সন্ন্যাস নয় সংসার, হয় প্রবৃত্তির নিগ্রহ নয় প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগান, এক কথায় নির্ম্মধ্যম নীতির ভাষা বিলুপ্ত। শ্রীরাধা জীবন সমন্বয়ের জীবন। তাঁহার রসবিলাসিনী রূপের মাঝে আমরা সব পরস্পর বিরুদ্ধের সমন্বয় দেখিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিয়াছেন :

'আমি যৈছে পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময় ॥

বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় এই রাধাজীবন জমিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার আত্মনিবেদনাত্মিকা প্রকৃতির মধ্য দিয়া।

রাধাভাব বিনা হয় না আরাধনা।
সে ভাবের তত্ত্ব আত্মনিবেদন ॥

শ্রীরাধা আত্মনিবেদনময়ী। প্রতি জীবের অন্তরে এই আত্মনিবেদনময়ী সত্তা রহিয়াছে; শ্রীরাধা এই প্রাণসত্তারই ঘন বিগ্রহ। শরণাগতির মূর্ত্তিই শ্রীরাধা। তাঁহার জন্ম ঐতিহাসিক। বর্ত্তমান যুগের নারীপ্রগতির জন্ম শ্রীরাধাচরণ হইতে; ইহারই প্লাবন আসিয়াছে ভারতের বুকে, প্রকাশ হইবে 'বিশেষ বিবাহ বিলে'। শ্রীরাধার সতীত্ব পুরুষের দ্বারা রমণীত্ব-লুণ্ঠনের মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ। শ্রীরাধার সতীত্বে নর-নারী সমমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। একতরফা সৎ বা সতী হওয়ার কোনও পারমার্থিক অর্থ নাই। পুরুষ যখন সৎ এবং নারী সতী, তখনই নারীর সতীত্ব মর্য্যাদাপূর্ণ। পুরুষ যখন কাপুরুষ ক্লীব, সেখানে কামুক কাপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনের পরিহাস রাধা-সতীত্বে নাই। দুই যেখানে দুইয়ের গুরু, দুই যেখানে দুইয়ের মর্য্যাদারক্ষক, সেখানেই নর 'সৎ' এবং নারী 'সতী' হইতে পারে। পুরুষ কামুক থাকিবে, আর স্ত্রীরা সব সীতা হইবেন ইহা হয় না, হওয়া উচিত নয়, আর ভবিষ্যতে হইবেও না। ভারতীয় নারীপ্রকৃতির চরম সার্থকতা শ্রীরাধা। সীতা-সাবিত্রী হওয়ার পরিপূর্ণ সাধনার আরম্ভ শ্রীরাধার জীবনসাধনার ভিতর দিয়া। সার্থক রমণীই সার্থক জননী হইতে পারেন।

বিশেষ বিবাহ বিল: এই বিল মূলতঃ 'নারী বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন' —'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি'—হিন্দুসমাজগঠনের এই মূল ভিত্তির উপর আঘাত হানিবার জন্যই উদ্যত হইয়াছে। নারীও পুরুষেরই মত স্বরাট্ ভগবানের হাতে গড়া স্বরাট্। পুরুষের একান্ত ছায়াই নারী নয়। আর নারী ছায়া হইলে ছায়ারও একটী পজিটিভ বাস্তব সত্তা আজিকার সভ্যতা মানিয়া লইয়াছে। Light (আতপ) shade-এর(ছায়া) সমন্বয় ব্যতীত যেমন কোনও উৎকৃষ্ট ছবিই (half-tone) রচিত হয় না, তেমনি আতপস্থানীয় বুদ্ধিমান পুরুষ ও ছায়াস্থানীয় প্রাণময়ী নারীর পারস্পরিক প্রাণ-প্রজ্ঞাঘন সমন্বয় ব্যতীত সুস্থ সমাজ গড়িয়াই উঠিতে পারিবে না—

এতখানি দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ভারতের সংবিধান-সম্মত এই 'বিশেষ বিবাহ বিল' রচিত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধান নর-নারীর প্রকৃতিগত বিরাট বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও উভয়েরই সম-মর্য্যাদা, সম-স্বাতন্ত্র্য, সম-সুযোগ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম একটী কণাকেও কোন কায়েমী স্বার্থ দিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই; এখানে প্রত্যেককেই 'সাধন' করিয়া অপরকে পাইতে হয়। মানুষ গায়ের জোরে এ সংসারের একটী কণাকেও স্পর্শ করিবার অধিকারী নয়, যদিও তাহার প্রচুর সুযোগ থাকে। মানুষকে সাধনা করিয়া, ভোগের যোগ্য হইয়া ভোগ করিতে হইবে, কাহারও উপর কাহারও হঠ এ বিশ্ব বরদাস্ত করিবে না। যোগ্য হইয়াই ভগবানের দেওয়া আলো-জল-মাটী ভোগ করিতে হয়, নচেৎ মাটীও মানুষের উপর প্রতিশোধ লয়, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বুদ্ধির ক্ষেত্রে পুরুষের সুযোগ বেশী বলিয়া সে সহজেই প্রাণপ্রচুর নারীকে শোষণ করিতে পারিয়াছে; আজও সে তাই চায়। কিন্তু বিশ্বশক্তি তাহা কত দিন আর সহ্য করিবে? পুরুষেরা চান নারীগণ সীতা-সাবিত্রী হউন; কিন্তু নারীকে সীতা-সাবিত্রী চাহিলে যে নিজেদেরও রাম কিম্বা সত্যবান হইতে হয়, যোগ্য না হইয়া যে কোনও কিছুই ভোগ করা যায় না, তাহা পুরুষেরা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছে। 'বিশেষ বিবাহ বিল' এই ভুল ভাঙ্গাইবার মন্ত্র লইয়াই আসিয়াছে। বৃটিশ যদি ভারতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিত, তাহাকে বিদ্রোহের সামনা করিতে হইত না। পুরুষরা যদি 'পুরুষোত্তম' হইবার সাধনা বরণ করিত (যে জন্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এই দেশে হইয়াছিল), এই বিল উত্থাপনের কোন অবসরই থাকিত না। নারী আজ পুরুষের সমকক্ষতার দাবী, সম-মর্য্যাদার দাবী করিতেছে। নর-নারী দুই 'পতি' মিলিয়া এই সৃষ্টি পালন করিবে, ইহাই নারীদের দাবী। 'দম্পতি' শব্দের অর্থ 'দুই পতি'; এত দিন পুরুষই ছিলেন একমাত্র 'পতি', আর 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি।' আজ স্বতন্ত্র নর ও স্বতন্ত্র নারী মিলিয়া মিশিয়া ঘর গুছাইবে—ইহাই বিশেষ বিলের গূঢ় তাৎপর্য্য। নর স্বতন্ত্র, আর নারী নর-পরতন্ত্র—ইহা দ্বারা কোনও সুস্থ পরিবেশই সৃষ্টি হইতে পারে না। পুরুষেরা বলে, নারীরা কোথায় হিন্দুসমাজে পরতন্ত্র? 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'। স্বাতন্ত্র্যদান ব্যতীত পুরুষেরা আর সব-কিছু সম্মান দিয়াছে—এ কথা মোটামুটি বলা চলে। ইংরাজও ভাল অনেক কিছু দিয়াছিল, দিয়াছিল না শুধু স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য না পাইলে সকল সুবিধাই যে জীবনের পাশ বা বন্ধন হইয়া যায়,

তাহা আজ বিশ্ব মানবের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রজ্ঞাধর্ম্মী সভ্যতা কখনও প্রাণধর্ম্মী নারীদের সমকক্ষতা প্রদান করিতে পারে না। এ দেশ বহু শতাব্দী হইতে দুইকে দুই রাখিয়া এক অদ্বৈত বস্তু স্থাপন করিবার কৌশল হারাইয়া ফেলিয়াছে; আজ নর-নারীকে 'স্বতন্ত্র' রাখিয়া উভয়ের অদ্বৈত মিলনের মাঝে সমাজ গড়িবার দর্শন আসিয়াছে। স্বয়ং-মূল্যবান নর ও স্বয়ং-মূল্যবতী নারী আজ এক অদ্বৈত হইতে চাহিতেছে। এ দাবী বিশ্বের দাবী, বিশ্বেশ্বরের দাবী। বিশ্বশক্তি আজ এই বিলের সমর্থনে কাজ করিতেছে।

কিন্তু একটী কথা আজ সকলকেই স্মরণ রাখিতে বলিতেছি। ভারতের লোকসভায় এই বিলটী অনেক সংশোধন লইয়া অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর পাশ হইয়াছে; কিন্তু এই বিল পাশ হইলেও ইহাকে সমাজজীবনে রূপায়িত করা আদৌ সহজ হইবে না। বিধবা বিবাহ বিল, সারদা আইন, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আইন সভায় পাশ হইয়াছে, কিন্তু সমাজ কি তাহা সরল প্রাণে নিয়াছে? যাহারা নিতে চাহিবে, তাহারাও পারিবে না। ইহার মূল কারণ এই যে, পুরুষ-কৌলীন্য এ দেশের শাস্ত্রের ভিতর দিয়া, দর্শনের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইয়াছে, এবং এই দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়াই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। যেদিন 'মায়া'কে অস্বীকার করিয়া 'ব্রহ্ম'কেই একমাত্র সত্য স্বীকার করা হইয়াছে, সেইদিন হইতেই গোড়ায় জড়বাদ পারমার্থিকভাবে বাদ পড়িয়াছে, এবং তাহারই পরিণামস্বরূপ সমাজের শ্রমশক্তি, সমাজের নারীশক্তি, সমাজ সংগঠন সবই বাদ পড়িয়া গিয়াছে। যতদিন না দার্শনিক ক্ষেত্র হইতে ব্রহ্ম-মায়ার সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে, এবং ঝড়ের মত উহাকে সমাজ জীবনে ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে এবং এই দার্শনিক তত্ত্বের উপর সমাজ গড়িবার প্রেরণা মানুষের বুকে প্রবাহিত হইতেছে, তত দিন এই বিলের সুযোগ নারীরা পাইবেন না, সমাজও বঞ্চিত হইবেন। বর্ত্তমানকালে সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপালই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের বুকে এই দার্শনিক বিপ্লব আনয়ন করিয়া ব্রহ্মের মত মায়ারও অনাদিত্ব, অনন্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন যখন কার্য্যাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিবে, নারী তখন হইবে ধর্ম্মে পুরুষের সহযোগিনী, অর্থে সহযোগিনী, কামে সহযোগিনী, মোক্ষেও নারী পুরুষের সহযোগিনী। পুরুষ-প্রকৃতি সমন্বিত, অর্দ্ধনারীশ্বর পুরুষোত্তম জয়যুক্ত হউন। বন্দে মাতরম্

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৬১

'যত মত তত পথ'

সম্পাদক

বর্ত্তমান যুগ সর্ব্বস্তরের পরস্পর-বিরুদ্ধদের সমন্বয়ের যুগ। বর্ত্তমান যুগে এই সমন্বয়ের প্রথম প্রবর্ত্তক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। 'সমন্বয়' শব্দটি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের 'তত্তু সমন্বয়াৎ' এই চতুর্থ সূত্রে আমরা দেখিয়াছি। 'সমন্বয়' শব্দটি আধুনিক নহে, ইহা অতি প্রাচীন। সমন্বয়ের অর্থ প্রাচীন ভাষ্যকারগণ এইভাবে করিয়াছেন যে, ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে সমস্ত মতবাদ, সর্ব্ব ইষ্ট মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণ কিছুতেই বেদান্তের সঙ্গে সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক বৌদ্ধ জৈনের সমন্বয় বিধান করেন নাই, বরং তাঁহারা ঐ সব মতবাদের খণ্ডনই করিয়াছেন। ফলে মতবাদে মতবাদে লক্ষ্যে লক্ষ্যে সঙ্ঘর্ষ রহিয়াই গেল। ব্রহ্মসূত্রের সেই 'সমন্বয়'ই সর্ব্বস্তরে ঘন হইবার জন্য ভারতবর্ষের মনীষীদের প্রাণে কিছু দিন হইতে জমিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' এই সমন্বয়ের পূর্ব্ব পর্য্যায় দিয়াছে। 'যত মত তত পথ'-এর পর পর্য্যায় দিয়া গিয়াছেন ভগবান শ্রীনিত্যগোপাল। 'যত মত তত পথ'-এর অর্থ হইতেছে—যেমন একই গন্তব্যস্থলে বহু পথ দ্বারা পৌছানো যায়, পথ বহু হইলেও গন্তব্যস্থল যেমন এক, গন্তব্যস্থলে পৌছিলে যেমন পথ নিয়া মারামারি করিবার কোনও প্রয়োজনই হয় না, অতএব পথে দাঁড়াইয়া মানুষকে লইয়া 'আমার বাসে (Bus) উঠুন' বলিয়া যাত্রীদের লইয়া টানাটানি করিবার প্রয়োজন নাই। পথ লইয়া

কাড়াকাড়ি যে বাস ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সিদ্ধিরই একটী উপায় মাত্র, উহার সঙ্গে যাত্রীদের যেমন কোন সম্বন্ধই নাই, ঠিক তেমনি বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক বৌদ্ধ জৈন ইসলাম খৃষ্টানদের তরফ হইতে যত মতবাদই প্রচারিত হউক না কেন, সমস্ত মতবাদই একই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবে, কাহাকেও তাহার মতবাদ হইতে টানিয়া স্ব-মতে আনিবার চেষ্টা করিওনা, সকল মতকে সকল ইষ্টকে স্বীকার করিতে শিখ, যে-কোন পথে যাও পথের শেষ একই বস্তুতে। ব্রহ্মসূত্রের 'সমন্বয়' হইতে এই 'সমন্বয়' ব্যাপকতর বটে; কিন্তু ইহাও ব্যাপকতম নয়।

ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়ের দ্বারা বেদান্তের সঙ্গে সাংখ্য-পাতঞ্জল বৌদ্ধ-জৈনদের সাঙ্গীকরণ (integration) সম্ভব হয় নাই; কিন্তু আমরা বর্ত্তমান যুগের মানুষেরা সমন্বয়কে এতখানি বিস্তৃত ভাবেই আস্বাদন করিতে পারিতেছি। বেদান্তের নির্গুণবাদ বৌদ্ধের নির্ব্বাণ সব একেরই খোঁজ দিয়াছে, যাহা নির্গুণ ব্রহ্ম, তাহাই 'শূন্য'। কিন্তু এই সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য্য সম্যক্ অবধারণ করিতে না পারিয়া এ দেশেরই কোনও কোনও হিন্দু সম্প্রদায় ইহাকে বিদ্রূপ করিতেছেন। ইহাদের অভিযোগ এই যে, সমন্বয় একটী হুজুগ মাত্র। সমন্বয়কারিগণ হিন্দু ধর্ম্ম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, উহাই যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা জানেনা; জানিলেও ভীরু স্বভাব বশতঃ সে কথা ঘোষণা করিবার সামর্থ্য রাখে না এবং ইহারা বর্ত্তমান ধাপ্পাবাজীর যুগে সমন্বয়ের হুজুগে মাতিয়া কিছু বাহাদুরী নেওয়ার এবং বর্ত্তমান ভারত-রাষ্ট্রের শান্তির বাহানায় বিদেশী বিধর্ম্মী বিজাতিকে স্বার্থসাধনের সুযোগ দিয়া খুসী করিবার নীতির সমর্থন পুর্ব্বক রাষ্ট্রকর্ত্তাদের প্রসন্নদৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহারা হিন্দু জনগণকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন যে, 'তোমরা মিত্ররূপী শত্রুদের আত্মঘাতী প্রচেষ্টা হইতে সাবধান হও'।

শ্রীরামকৃষ্ণের মত সরল, নিরভিসন্ধি ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ দ্বিতীয় কেহ নাই একথা আজ বিশ্ববাসী কি এ-দেশের কি ও-দেশের মনীষিগণ মানিয়া লইয়াছেন। তিনি যে দক্ষিণেশ্বরে ইসলামের সাধনা, খৃষ্টানদের সাধনা করিয়া সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে বিদেশী বিধর্ম্মী বিজাতিকে স্বার্থ দানের সুযোগ দিয়া খুসী করার কোনও অভিসন্ধি ছিল না। তিনি খৃষ্টান বা মুসলমানদের তোষামদ করিবার পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন ইহা মনে

করিলেও অপরাধ হয়। মহাত্মাজীর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে (Hindu-Moslem Unity) কেহ সন্দেহের চক্ষে দেখিলেও দেখিতে পারেন—যদিও কোন অভিসন্ধি তাঁহার ছিল না; তিনি শুধু ভারত রাষ্ট্রের মহা-মৈত্রী মহা-ঐক্য বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য ঐ নীতির আশ্রয় নিয়াছিলেন। মহাত্মাজী রাজনীতি ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন, আর রাজনীতি ক্ষেত্রে কুটনীতির অবকাশও আছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঐরূপ কথা মনের কোণে স্থান দিলেও পাপ হয়। ধাপ্পাবাজী শ্রীরামকৃষ্ণে তো ছিলই না, মহাত্মাজীতেও ছিল না। বর্ত্তমান যুগ ধাপ্পাবাজীর যুগ—এ কথা নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমানে বহু সম্প্রদায়, এমন কি বহু রাষ্ট্র, বহু আন্দোলন ধাপ্পাবাজীর উপর চলিতেছে।

কিন্তু রাজা রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীনিত্যগোপাল, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ কিম্বা তাঁহাদের অনুগামিগণ কেহই ধাপ্পাবাজ ছিলেন না। তাঁহাদের সামনে আছে বিশ্বসঙ্ঘ-রচনার একটী মহান আদর্শ—সর্ব্ব-ধর্ম্মসমন্বয়, সর্ব্বমত-সমন্বয় সর্ব্বজাতি-সমন্বয়। 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা'—যিনি সর্ব্বভূতে জাতি-রূপে সংস্থিতা, তাঁহার শ্রীচরণতলে বসিয়া সর্ব্বজাতির অন্তরে একই মহাশক্তির খেলা দেখিয়া সর্ব্বজাতিকে সমন্বিত হইতে হইবে। ইহাকেই আমরা হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান প্রথম কথা বলিয়া জানি। আমরা ইহা ভালভাবেই জানি যে, মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলি স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম-মতবাদই সত্য এবং অন্য সবগুলি মিথ্যা—এই কথা প্রচার করিয়া স্বীয় স্বীয় দলপুষ্টির জন্য ছলে বলে কৌশলে অবিরাম চেষ্টিত। মুসলমানদের মত প্যান-ইসলামিজমের পথ অনুসরণ করিয়া প্যান-হিন্দুইজম (Pan-Hinduism) প্রচার করিলে হিন্দুধর্ম্মও কি মুসলমানদের বাদ দিয়া একান্ত হিন্দু রাষ্ট্র সংগঠনের কলঙ্কে কলঙ্কিত হইত না? অবশ্য মুসলমানগণ হিন্দুদের নিম্নে দাবাইয়া রাখিয়া ইসলামের নামে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্থান সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভাবে হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষ জিয়াইয়া রাখিলে কি হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইবে? পাকিস্থানের বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে।

হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা নূতন নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যবন হরিদাসকে হরিনাম লওয়াইয়া, চাঁদকাজির হাতে হরিনামের মালা দিয়া ও তাঁহার রাজ্যে গোবধ নিষিদ্ধ করিয়া চাহিয়াছিলেন সমস্যার সমাধান করিতে। কিন্তু সমাধান তাহাতে মিলে নাই। এ দেশের পুরাণ যদিও বলিয়াছেন যে, মুসলমান 'আল্লা' নাম করিয়া উদ্ধার হয় না। তাহারা

যে 'হারাম' শব্দ উচ্চারণ করে, সেই 'হারাম' শব্দের ভিতর রহিয়াছে যে প্রেম-বাচী 'হা'-অংশ এবং হিন্দুদের ভগবান 'রাম', সেই রাম নাম উচ্চারণেই মুসলমান উদ্ধার হইবে। এই পন্থা যত বিশুদ্ধভাবেই অনুসৃত হউক না কেন, পৃথিবীর সকল মানুষ লক্ষ বৎসরেও সবশুদ্ধ খৃষ্টান বা মুসলমান বা বৌদ্ধ বা জৈন বা হিন্দু হইবে না। এই সত্য কথাটা মানিয়া লইলে 'মত' লইয়া টানাটানি করার কোনও অর্থ হয় কি? বিশ্ব-শুদ্ধ সব লোক অনন্তকালেও হিন্দুও হইবে না, মুসলমানও হইবে না, খৃষ্টানও হইবে না—ইহা অপেক্ষা বড় সত্য যখন হইতেই পারে না, তবে কেন ব্যর্থ প্রচেষ্টা সকলকে বিশেষ কোনও এক মতে বা পথে টানিয়া আনিবার? যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইবার কোনও প্রয়োজনীয়তা সভ্য মানুষের থাকে, তবে সব মানুষকে তাহাদের রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী পথে চলিতে দিবার সুযোগ ও অধিকার দিয়াই তাহা করিতে হইবে। এই দৃষ্টি ভঙ্গি লইয়া বর্ত্তমান যুগের মহাপুরুষগণ বিশ্বসঙ্ঘ-রচনার জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। ইহা যুগের সাধনা। এই সাধনা যাহারা গ্রহণ করিবেন না, তাঁহারা বিশ্বসঙ্ঘের বাহিরে পড়িয়া থাকিবেন সাম্প্রদায়িকতা, ক্ষুদ্রতা ও গোড়ামি লইয়া, যুগের অগ্রগমনের সঙ্গে তাঁহারা কিছুতেই তাল রাখিয়া চলিতে পারিবেন না। তাঁহারা যতই সঙ্ঘবদ্ধ হউন না কেন, তাঁহারা এ যুগের কেহই নন। বর্ত্তমান যুগে হিন্দু বলিতেই বুঝাইবে যিনি বিশ্বের সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বমত, সর্ব্বজাতিকে তার তার যথাযোগ্য স্থানে ও মানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া এক, সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সাধনা বরণ করিয়াছেন।

জানি, এ-সাধনা ভারতবর্ষের হিন্দুগণই গ্রহণ করিতে পারেন ও করিতেছেন। মুসলমান খৃষ্টান সকলেই যে-যার ইষ্টকে, সাধন-পন্থাকে অপরের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য সর্ব্ব শক্তি নিয়োগ করিতেছেন। হিন্দু প্রাণধর্ম্মী; হিন্দুর সঙ্গে তাঁহারা পারিয়া উঠিবেন না। কোনও সময়ে এক ব্রাহ্ম বন্ধু বলিয়াছিলেন, 'হিন্দু ধর্ম্মের একটী প্রকাণ্ড 'হাঁ' আছে, যাহার ভিতরে সব-কিছুর গ্রাস সম্ভব হইতে পারে।' মুসলমান খৃষ্টান যদি অনুদার হন, তাঁহারা যদি উপনিষদের ভাষায় 'যঃ আত্মনঃ অন্যত্র সর্ব্বং বেদ'—যে নিজের বাহিরে সর্ব্বকে সর্ব্বধর্ম্মকে দেখে, তবে নিশ্চয়ই 'সর্ব্বং তং পরাদাৎ'—সর্ব্ব, সর্ব্বধর্ম্ম তাহাকে পরাস্ত করিবে। হিন্দুধর্ম্মকে আজ ব্যাপকতম গভীরতম রূপে দেখিবার দিন আসিয়াছে সর্ব্বধর্ম্মকে নিজের পাচক রসে পরিপাক করিবার জন্যই। যে হিন্দু ধর্ম্ম কিম্বা যে বৈদান্তিক ধর্ম্ম একদিন বৌদ্ধ-জৈনকে নিজের 'অন্য' বলিয়া বাদ

দিয়াছিল, যে বৈষ্ণব হিন্দু একদিন কালীর 'প্রসাদ' গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন, যে হিন্দুধর্ম্ম বুদ্ধমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছিল, যে অজড়বাদ-সর্ব্বস্ব হিন্দু জড়বাদকে বন্ধন বলিয়া ঘৃণা করিয়া পলায়নের মনোবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, সেই হিন্দুধর্ম্ম আজ আর নাই। যে হিন্দুধর্ম্মের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা এ দেশের লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে খৃষ্টান বা মুসলমান করিয়া দিয়াছে, ঘরের মানুষকে পরের করিয়া দিয়াছে, পাকিস্থান-সৃষ্টির সকল উপাদান যোগাইয়াছে, সেই হিন্দুধর্ম্ম কি আজও চালবে? কেন ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান হইল? সেদিন তো সমন্বয়ের হুজুগ কেহ তোলে নাই। অথচ সেদিনও সমন্বয়ের প্রাণশক্তি এ দেশের বুকে ছিল। একজন অশীতিবর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধাও মসজিদের নমাজকে ভগবানের 'আরাধনা' বলিয়াই বুঝিতেন। এই উদারতা কি দোষের? এই উদারতাই কি এ দেশকে এত বৈদেশিক আক্রমণের সামনে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি দিয়াছিল না? সাধারণ মুসলমানদের মত ধর্ম্মের গোড়ামি দেখিয়া হিন্দুরাও যদি সেই পথের পথিক হয়, তাহা হইলে কি হিন্দুর হিন্দুত্বই বিলুপ্ত হইবে না? 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্'—ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মূল শিক্ষা। এই শিক্ষা পরিহার করিলে হিন্দু হিন্দু থাকিবে না। বর্ণাশ্রমী হিন্দুর গোড়ামির ফলেই, উচ্চবর্ণ কর্ত্তৃক নিম্নবর্ণকে সকল সুযোগ ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করার ফলেই এদেশে পাকিস্থান সম্ভব হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সম্ভব হইতে পারিয়াছে। বিশ্বগ্রাসী হিন্দু, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুর আচার ব্যবহারের প্রতিষ্ঠা আজ হিন্দুর প্রাণদেবতা চাহিতেছেন। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' (tit for tat)—এই সর্ব্বনাশা নীতি যেন হিন্দুকে পাইয়া না বসে। রাজা রামমোহনের সমন্বয়-প্রচারের ফলেই হিন্দুদের দলে দলে খৃষ্টান হওয়া এ দেশে বন্ধ হইয়াছিল। ভগবান রামকৃষ্ণের সমন্বয়-প্রচারের ফলে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের বাহির হইতে হিন্দুর উপরে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিবার সুযোগ কমিয়া আসিয়াছে। জওহরলালের সমন্বয়-সাধনার ফলেই পাকিস্থান ধীরে ধীরে বিপাকের মধ্যে পড়িয়াছে। পাকিস্থান নিজের বিপদ নিজেই সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে হিন্দু-বিতাড়ণ বা হিন্দুকে কুক্ষিগত করিবার দুষ্টনীতির ফলে। ভারতবর্ষ সমন্বয়-সাধন গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই এত ঝড় ঝাপটার মধ্য দিয়া, এত বৈদেশিক আক্রমণের মধ্য দিয়া শক-হুণ পরিপাক করিয়া আগাইয়া আসিয়াছে। এই সমন্বয়ের পাচক-রসেই এদেশে মুসলমানও একদিন পরিপাক প্রাপ্ত হইবে, যদি মুসলমান

তাহার দমননীতি পরিত্যাগ না করে, অন্যান্য ধর্ম্মকে পিষিয়া মারিয়া অপরের রক্তে লাল হওয়ার, পুষ্ট হওয়ার বুদ্ধি পরিত্যাগ না করে। শোষণ, বলাৎকার প্রাণধর্ম্মী বিশ্বে আজ আর চলিবে না—ইহা ধ্রুব সত্য। co-existence-এর (সহ-অস্তিত্ব) নীতি আজ বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে স্পষ্টই স্বীকার করিতে চাহিতেছে।

কিন্তু হিন্দু রামমোহন, হিন্দু রামকৃষ্ণ সমন্বয়ের তত্ত্ব যতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়াছেন, তাহাতেও কুলাইবে না। সমন্বয়ের ক্রমবিবর্ত্তনের পথে শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন বিশ্বকে অধিকতর সঙ্ঘ-গঠন-কৌশল শিখাইবার জন্য। তোমার পথ তোমার কাছে সত্য, আমার পথ আমার কাছে সত্য ; তোমার মত তোমার কাছে সত্য, আমার মত আমার কাছে সত্য—ইহাও সবখানি সত্য নয়। এখানে সর্ব্বপথ-সমন্বয় নাই, সর্ব্বমত-সমন্বয় নাই। এই সাধনায় পথের মধ্যে কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল হইবে না, মতে মতে মিল হইবে না। কিন্তু পথে পথে, মতে মতে মিল না হইলে তো কোনক্রমেই পথের ক্ষেত্রে মতের ক্ষেত্রেও কোনও সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে না। প্রাণখোলা পারস্পরিক স্বীকৃতি ও আদান-প্রদান ছাড়া কোনও সঙ্ঘই বিশাল হয় না। পূর্ব্ব মতে সকলের সব ঐক্য পথের 'শেষে', মতের 'শেষে', যেখানে সব পথ সব মত 'শেষ' হইয়া গিয়াছে, যেখানে সর্ব্ব পথ ও সর্ব্ব মত পথের অতীত, মতের অতীত সমাধির মধ্যে অবগাহন করিতেছে। সর্ব্বপথ-সমন্বয়বাদী শ্রীনিত্যগোপাল কিন্তু লিখিতেছেন: 'সমাধিও মায়া', 'নির্ব্বাণও মায়া'। শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনে সমাধি খুব বড় কথা নয়, পুরুষোত্তম-জীবন যে সমাধিরও পরের স্তর, যেখানে সমাধি-ব্যুত্থান সমন্বিত। 'যত মত তত পথ'-সাধনায় পথ ও মত দুই-ই 'উপাধি', যাহা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আপনা আপনিই খসিয়া পড়ে। শ্রীনিত্যগোপাল মতে এই খসিয়া-পড়িয়া-যাওয়াও 'মায়া'। সকল বিশেষের ও-পারে যে নির্ব্বিশেষ, সকল গুণকর্ম্মের ও-পারে যে গুণকর্ম্মহীন নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, তেমন একটী ব্রহ্মবস্তুই ইহাদের সাধ্য। কিন্তু মানুষের জীবনে নির্ব্বিশেষ ও বিশেষের খোঁচা দুই-ই তুল্যমূল্য। দুইয়ের সমন্বয় ছাড়া এই দুই কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। ক্ষুধিত বিশেষত্ব কেমন করিয়া একান্ত নির্ব্বিশেষবাদীদের বীভৎস বিশেষত্বের ক্ষেত্রে নামাইয়াছে, ক্ষুধিত নির্ব্বিশেষত্বই বা কেমন করিয়া একান্ত বিশেষত্ববাদীকে শুষ্ক নির্ব্বিশেষত্বের আবর্ত্তে ফেলিয়াছে, তাহার

দৃষ্টান্তের অপ্রচুরতা শাস্ত্রে ও সমাজের দৈনন্দিন ঘটনায় নাই। শ্রীনিত্য-গোপালের মতে বিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব দুই-ই ব্রহ্মজীবনের দুইটী দৃষ্টিকোণ মাত্র।

এখানে আরও একটী বিশেষ কথা প্রণিধানযোগ্য। গন্তব্যস্থল মোটেই পথের 'শেষে'ই নয়। গন্তব্যস্থল রহিয়াছে পথের প্রতিটী ধাপে ধাপে। 'পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা। আনন্দে তাই এক হ'ল তার পৌঁছানো আর চলা'। স্থিতি ও গতি অর্থাৎ পৌঁছানো আর চলা আনন্দের সাধনায় এক হইয়া যায়, স্থিতি-গতি গলিয়া পুরুষোত্তম জীবনে গড়িয়া উঠে। এমনই ছন্দে পথ চলিতে হইবে, যাহাতে গন্তব্যস্থল পথের প্রতি পদক্ষেপে আস্বাদিত হয়। এই সাধনায় চলিতে চলিতে পৌঁছানো, এবং পৌঁছিয়া পৌঁছিয়া চলিতে থাকা একই পুরুষোত্তম-জীবনের দুইটী আস্বাদন। 'আমি' 'আমার' হইতে রওয়ানা হইলে নিশ্চয়ই পথ ও গন্তব্যস্থল একান্ত পৃথক্, পথের শেষেই গন্তব্যস্থল। **কিন্তু পথের শেষে গন্তব্যস্থল দেখিতে চাহিলে গন্তব্যস্থলও পথের সামিলই হয়।** তখন পথের 'শেষ' যে কিছুতেই মিলিবে না, পথ যে অনন্তই হইবে, এ তত্ত্ব একান্ত গন্তব্যস্থল-বাদীর কাছে ধরা পড়ে নাই। শ্রীনিত্যগোপালের কাছেই এই তত্ত্ব বর্ত্তমান কালে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, **'পথ গন্তব্যস্থলকে সৃষ্টি করে।'** কর্ম্মীর ঠাকুর, জ্ঞানীর ঠাকুর, ভক্তের ঠাকুর একান্ত পৃথক্ পৃথক্। হিংসার স্বাধীনতা ও অহিংসার স্বাধীনতা একান্ত পৃথক্ বস্তু। 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'। সিদ্ধি সাধন-অনুযায়ী রূপ ধারণ করে—ইহা মনস্তাত্ত্বিকের স্পষ্ট ঘোষণা। বহু পথ ধরিয়া একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়, বহু পথ ধরিয়া একই কালীঘাটে পৌঁছানো যায়—ইহা যান্ত্রিক জগতের পক্ষে সত্য কথা বটে; কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়। যে পথে মা পুত্রকে পান, সেই পুত্রকেই যখন তাঁহার পুত্রবধূ ভিন্ন পথে পায়, তখন মায়ের পাওয়া পুত্র ও স্ত্রীর পাওয়া স্বামী কি একান্ত এক? বস্তু হিসাবে পুত্র ও স্বামী এক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উভয়ের আস্বাদন গত কত পার্থক্য! মায়ের কাছে পুত্র যখন থাকে, তখন তাহার রূপ যাহা, সেই ব্যক্তিই যখন স্বামীবেশে স্ত্রীর কাছে যায়, দুই রূপ কি একান্ত পৃথক্ নয়? যে ব্যক্তি ভর-পেট খাওয়া-দাওয়ার পর পান চিবাইতে চিবাইতে নিশ্চিন্ত মনে পুরীর ট্রেনে গিয়া

যে-'জগন্নাথ' দেখিল, আর শ্রীমন্মহাপ্রভু মাসের পর মাস পায়ে হাঁটিয়া অনাহারে অনিদ্রায় পথ চলিয়া 'হা জগন্নাথ, হা জগন্নাথ' বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে-'জগন্নাথ' পাইলেন, এই দুই জগন্নাথ কি একই জগন্নাথ? সাধনার পৃথক্ত্বে বস্তু পৃথক হয়—ইহা অনিবার্য্য সত্য। অথচ 'যত মত তত পথ' এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই। এইখানে নিত্যগোপালের প্রয়োজনীয়তা। তিনি ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতেছি না, যিনি পৃথক্ পৃথক সাধনার প্রচেষ্টায় পাওয়া ইষ্ট সমূহের সমন্বয়ের খোঁজ দিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক পথকে নিজেরই পথ ধরিয়া লইয়া সকল দল মিলাইয়া এক অখণ্ড দল গড়িবার সাধনার কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ যে যাহার বিশেষ পথ ধরিয়া জীবনের সেবা করিতেছে, অথচ কেহই একান্ত পৃথক বা একান্ত অপৃথক্ নয়। চক্ষু বা কর্ণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুস্যূত না হইলে কেহই মিলিয়া মিশিয়া দেহযন্ত্রকে ঠিক রাখিতে পারিত না।

প্রতিটী দৃষ্টিকোণ হইতে বস্তুকে দেখিবার সাধনা আজ নিতেই হইবে; নচেৎ বাস্তব কিছুতেই সত্য বাস্তব হইবে না। মা যদি একান্ত 'মা' থাকিয়া তাহার পুত্রকে একান্ত পুত্র করিয়াই রাখিতে চান, মা যদি পুত্রবধূর দৃষ্টিকোণকে স্বীকার করিতে না চান, শাশুড়ী ও পুত্রবধূর মধ্যে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য। **প্রতি দৃষ্টিকোণকে নিজেরই দৃষ্টিকোণ বলিয়া যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া লওয়াই শ্রীনিত্যগোপালের সমন্বয়ের মূল তাৎপর্য্য।** 'রাধানাথ' ও 'যশোদা নন্দন' আস্বাদন হিসাবে নিশ্চয়ই এক নয়; যদি রাধানাথ ও যশোদা নন্দনের সমন্বয় সাধিত না হয়, তবে রাধা-যশোদার কি প্রাণখোলা সংহতি সম্ভব? বৃন্দাবনকে এক ভূমিতে গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্ব্ব দৃষ্টিকোণের সমন্বয় অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার বৃন্দাবন মথুরাকে এক করিতে হইলে বৃন্দাবনচন্দ্র ও মথুরাধীশের সমন্বয় বিধানও করিতেই হইবে। এই ভাবে সমন্বয়কে ব্যাপক ও গভীর করিয়া তুলিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়কে যে স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, শ্রীনিত্যগোপাল সেখান হইতে আরও অগ্রগামী হইয়াছেন। 'যত মত তত পথ'-এরও পরের কথা শ্রীনিত্যগোপাল শুনাইয়া গিয়াছেন। বিশ্বসঙ্ঘ-রচনার ব্রত, এক-বিশ্ব রচনা করিবার ব্রত যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সব ব্রতচারীদের পথপ্রদর্শক সর্ব্ব মত ও সর্ব্ব পথকেই নিজ মত বা পথ বলিয়া আস্বাদনকারী শ্রীনিত্যগোপাল। এই পথে সর্ব্বপথ সমন্বিত। এই পথে অনন্ত পথিক প্রতি পথে বিচরণ করিয়া, প্রতি পথের

পথিকের সঙ্গে অন্যোন্যবদ্ধবাহু হইয়া গলাগলি করিয়া প্রতি পথে প্রত্যেক ইষ্ট দেবের বিশেষ বিশেষ রস আস্বাদন করিতে করিতে বিশ্বরাসমণ্ডলী গড়িয়া তুলিবার জন্য রাসচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছেন। এই সাধনায় প্রতি পথ সর্ব্বপথ, সর্ব্বপথই প্রতি পথ ; পথ সমূহ পরস্পর অনুস্যূত হইয়া চলিয়াছে। ইহা মায়া-জাল নয়, ইন্দ্রজালও নয় ; পুরুষোত্তম-আস্বাদন ক্ষেত্র। এই পন্থার প্রবর্ত্তক বর্তমান বিশ্বের অগ্রগামী পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন। হিন্দু নিত্যগোপালের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বিত হিন্দু ধর্ম্মের জয় হউক। এই হিন্দু ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই আজ বিশ্ব-হিন্দু-মিলন সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই হিন্দুসঙ্ঘই বিশ্বের অভয় দান করিবে। ইহাই আত্ম-রক্ষক, বিশ্ব রক্ষক। এই হিন্দুধর্ম্মই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই হিন্দুধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন : 'ভবিষ্যতে জগতে সমস্ত জাতি এক জাতি হইবে, সমস্ত জাতি 'এক ধর্ম্ম' মানিবে। তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারো প্রতি কাহারো বিদ্বেষ থাকিবে না।' এই এক-ধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বিত হিন্দুধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম। এই নিত্যধর্ম্মই হইবে ভবিষ্যৎ যুগের সর্ব্বগ্রাসী হিন্দুধর্ম্ম।　　　　বন্দে মাতরম্।

সম্প্রদায় গঠন আমার উদ্দেশ্য নয়। তাহা হইলে আমি বিস্তর শিষ্য করিতে পারিতাম।…আমি দল গড়িতে আসি নাই। সাম্প্রদায়িক ভাব খুবই খারাপ—ইহাতে কোন না কোন ধর্ম্মমতের বা মহাপুরুষের নিন্দা করিতেই হয়।…আমি কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত নহি, আমার ইষ্ট যেমন বহুরূপী, আমি সেইরূপ বহু সম্প্রদায়ী। আমার ইষ্ট যখন শিব হন, আমি তখন শৈব ; তিনি যখন বিষ্ণু হন, আমি তখন বৈষ্ণব ; তিনি যখন অন্য কোন সাম্প্রদায়িক হন, আমিও সেই সাম্প্রদায়িক হই।……আমি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান।… …I am a cosmopolitan…প্রকৃত জ্ঞানীর কোন সম্প্রদায় নাই ; অথচ তাঁহার সকল সম্প্রদায়।'

—শ্রীনিত্যগোপাল

গণতন্ত্র ও শিক্ষা

শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষ

বর্ত্তমান যুগ—

বড় আশার কথা যে, অধুনা শিক্ষাব্যাপারে গণতন্ত্রের একটি ধুয়া উঠেছে। আমলাতান্ত্রিক বিধান-ব্যবস্থায় আমরা আজ আর সন্তুষ্ট নই, অথচ স্বাধীনতা লাভের পর আজ পর্য্যন্ত যে বিকল্প ব্যবস্থাটুকু প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তাতেও আমাদের মন ওঠে না। কেননা, এ ব্যবস্থা নামতঃ গণতান্ত্রিক হলেও, মূলতঃ অদ্যাপি উহা আমলাতান্ত্রিক। সে যাই হোক, এ কথা সত্য যে, আধুনিক ইতিহাসের একটি বৃহৎ সামাজিক পরিবর্ত্তনের যুগে আমরা আজ বাস করছি। একটি নূতন সমাজ ব্যবস্থার শুভ জন্মক্ষণের আমরা প্রতীক্ষা করছি আর এই সৃষ্টির ভাবী সার্থক পরিণতি আমাদের সম্মুখে নূতন দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তুলে ধরেছে। বর্ত্তমান যুগ যে সাধারণ মানুষের যুগ, এ কথা আজ স্বীকার করতেই হবে। তবে দেশের জনগণ যেখানে অধিকাংশ নিরক্ষর, গণতান্ত্রিক ধারার সঙ্গে যেখানে সাধারণের কোন পরিচয় হয় নি, সেখানে আজই উন্নততর অবস্থা প্রত্যাশা করা যায় না। তাই শিক্ষা-মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুভ সূচনা, সন্দেহ নেই।

গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধারণা—

গণতন্ত্রকে আমরা এ যাবৎকাল রাজনীতি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি, গণতন্ত্র বলতে শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্বন্ধকে বুঝে এসেছি—প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের ভাষায় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছি—Government of the people by the people for the people. আমরা সাধারণভাবে বুঝেছি গণতন্ত্র হল ভোটদানের অধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, সংখ্যালঘুর সংরক্ষণ, জুরির বিচার প্রভৃতি। অথচ অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ, দলপতি সংস্কার, ধর্ম্মীয় অসহনশীলতা ও শ্রেণী-বিভেদ সমাজে বরাবর অনুমোদন লাভ করে এসেছে। এ ভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মীয় ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন ও রাজনীতির ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কোণ-ঠাসা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি মৃত্যু।

গণতন্ত্রের অর্থ ব্যক্তির অপ্রতিহত পূর্ণ স্বাধীনতা, এরূপ ভুল ধারণাও রয়েছে। এই স্বাধীনতা স্বৈরিতা ও অসংযত আচরণ বুঝায়। গণতন্ত্রের

এরূপ ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদেরকে বলতে শোনা যায়—স্বাধীন দেশে প্রত্যেকেরই যা' খুশী করবার অধিকার আছে। এঁদের কথার সমর্থনে এঁরা বলেন—Our fathers thought of men as individuals first and as forming society afterwords.........Social arrangement a neccessary evil.' এই বিকৃত গণতন্ত্রের অবাধ প্রাতিস্বিকতা সমাজের কল্যাণ ও সমাজ-স্বার্থকে উপেক্ষা করে। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—যে সমাজে ও কৃষ্টির মধ্যে মানুষের জন্ম ও বৃদ্ধি, তা-ই মানুষকে মানুষ ক'রে গড়ে তোলে। সমাজই মানুষের অভ্যাসগুলোকে গঠন করে, তার ধারণাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তার অনুভূতি ও হৃদয় বৃত্তিকে জাগ্রত করে। মোট কথা, মানুষ সমাজেরই সৃষ্টি, আর এজন্য, সে সমাজের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত হবে, এটাই ঠিক।

কেউ কেউ আবার মনে করেন—গণতন্ত্র হ'ল সকলের সমান সুযোগ-সুবিধে। এখানে প্রথমেই প্রশ্ন আসে—সমান সুযোগ কি। সুযোগ গ্রহণের ক্ষমতা সকলের সমান নয়। তাই সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া হলেও গ্রহণ-ক্ষমতার বিভিন্নতার ফলে, সে সুযোগ সকলের জন্য প্রকৃতপক্ষে সমান আর থাকে না। যেমন, কোন অঞ্চলের সকল শিশুর জন্য সমান শিক্ষা-সুযোগ থাকতে পারে; কিন্তু শিশুদের মধ্যে যারা স্বল্পবুদ্ধি ও ক্ষীণমেধা তারা তো বুদ্ধিমান ও ধী-সম্পন্ন শিশুদের মত সেই সুযোগে সমানভাবে উপকৃত হতে পারে না। তাই কেবল সমান সুযোগদান গণতন্ত্র নয়। কারখানার শ্রমিক যখন মাত্র অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ পায়, তখন তাকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলা যায় না। মালিকের সঙ্গে শ্রমিক যখন কারখানার সকল কাজে বুদ্ধি ও অনুভূতির ঐক্য নিয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, তখনি তা' হ'ল পুরোপুরি গণতন্ত্র। শিক্ষাক্ষেত্রেও গণতন্ত্রকে এভাবে দেখা আবশ্যক। দেখতে হবে—শিক্ষার কোন ব্যবস্থাপণাতেই যেন যথার্থ গণতন্ত্রের স্থানাভাব না হয়। শিক্ষাব্যাপারে গণতন্ত্র সেদিনই সার্থক হবে, যেদিন শিক্ষার সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষের আবেগানুভূতির জীবন্ত সহযোগ ঘটবে।

গণতন্ত্রে ব্যষ্টি ও সমষ্টি—

গণতন্ত্রের প্রথম কথা হ'ল—ব্যক্তিত্বের বিকাশ। যেখানে ব্যক্তি উৎপীড়িত, দলীয় স্বার্থে ব্যক্তির স্বাধীন মতামত নিয়ন্ত্রিত, যেখানে একটি

বিশেষ রকমের সমাজ সৃষ্টি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কল্পে ব্যক্তি-সত্তা উপেক্ষিত, সেখানে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখি না। গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্বকীয় বিশ্বাস ও স্বাধীন আচরণের উপর অযথা কতকগুলি বিধি-নিষেধ থাকবে না সত্য, কিন্তু যুগপৎ মনে রাখতেও হবে যে, ব্যক্তির এই স্বাধীনতা স্বৈরিতা নয়। এই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে তার যথেচ্ছ আচরণ মনে করা ভুল হবে। গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির মাত্র ততটুকু করবারই অধিকার ন্যায়তঃ আছে, যতটুকু তার ব্যক্তিগত ও সমাজের কল্যাণ বিধায়ক। ব্যক্তি-স্বাধীনতা কথাটি সর্ব্বদাই এরূপ একটি আপেক্ষিক অর্থে প্রযুক্ত। যেমন, ধরা যাক, কোন ব্যক্তির যথেষ্ট বিত্ত আছে। গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকের যা' ইচ্ছে করবার স্বাধীনতা রয়েছে, এ মনে ক'রে যদি ঐ ব্যক্তি সঞ্চিত অর্থের অসদ্ব্যবহার দ্বারা অহরহঃ ব্যক্তিগত ভোগলালসা চরিতার্থে প্রবৃত্ত হয়, তবে গণতন্ত্র তা' সহ্য করবে না। অনেক শিশুর জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়বার অভ্যাস আছে। এতে প্রথমাবস্থায় পাঠাভ্যাসের কিছুটা সুবিধাও হয়ে থাকে। কিন্তু যদি এরূপ করার ফলে অন্যের অসুবিধা হয়, তবে এই অভ্যাস পরিত্যাগ না করা শিশুর পক্ষে গণতন্ত্র-বিরোধী কাজ হবে।

গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক সভ্যের স্বাধীন আচরণ, বিশ্বাস ও ব্যবহার উপযুক্ত শ্রদ্ধা পাবে, এ কথা বলা বাহুল্য। আবার প্রত্যেক সমাজ-সভ্যের কাছে সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গলই হবে প্রথম বিবেচ্য। সমাজহিতই হবে সমাজের প্রতিটি সভ্যের কার্য্যকলাপ ও মতামতের নিয়ামক। গণতান্ত্রিক সমাজের সকল সভ্য হবে অগ্রমুখী, আত্মসম্মানপর, দায়িত্বসম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল; আর পরার্থকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্দ্ধে ভাবতে পারার জন্য তাদের থাকবে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, স্বীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব।

মানুষ প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার, শক্তিমানের অভিমত ও নিজ প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়না দ্বারা প্রভাবিত ও এ সকলের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে থাকে। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে এ সবের ক্রিয়া আরম্ভ হয়, আর মানুষের জীবনভর চলতে থাকে এদের কাজ। মানুষের স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধির উপর আবরণ টেনে, তাকে এরা অস্বচ্ছ করে ফেলে ও ফলে, মানুষ তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে তখন আর নির্ম্মল বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারে না। নানা সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। মানুষের অস্তিত্ব হয় বিপন্ন। এ সকল সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের জন্য মানুষের অনাবিল

বিচারবুদ্ধির বিনিয়োগের প্রয়োজন তখন অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। ব্যক্তির বিশ্লেষ ও সংশ্লেষাত্মক এই যে বিচারবুদ্ধি, তা-ই মানুষকে সমাজ প্রগতিমূলক পরিবর্ত্তনকে অনুভব ও অনুধাবন করতে শেখায়। সামাজিক অবস্থাকে শান্তিময় করবার উদ্দেশ্যে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধকে সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ করা আবশ্যক। আর এজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক-সমাজ সভ্যের নির্ম্মল বিচারবুদ্ধি থাকা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য মানব হৃদয়ের দয়া, মায়া সহানুভূতি, সহনশীলতা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মেষ সাধন অপরিহার্য্য। সত্যিকার গণতন্ত্র মানুষকে মানুষের জন্য অনুভব করতে শেখায়। গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য চাই মানুষের মূল্যবোধকে জাগ্রত করা, তার হৃদয়বৃত্তিকে সরস ও কোমল করা। শিক্ষামাধ্যমে ভাবী গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষাদান পদ্ধতি, বিদ্যালয় পরিচালনা ও উহার পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ, এ সকলের প্রত্যেকটিতেই যথার্থ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাই।

(ক্রমশঃ)

আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলভির নিকট কল্‌মা পড়ে মুসলমান হই নাই, মুসলমানের দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপ্‌টাইজড না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না. বাহ্যিক জপতপ পূজা অর্চ্চনাও নাই কুলগুরুর কাছে কানে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহি না—ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা অর্চ্চনা জপই আস্তিকের কার্য্য তাঁহারা বলেন। এখন কোন দলে ত আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে ডোবাতেই, পঙ্কিল পঙ্ক পরিপূর্ণ পুতিগন্ধ-যুক্ত পল্বলেই হইয়া থাকে, স্বচ্ছ সরোবরে প্রবাহিণী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেমভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই, সেইজন্য আমার এক সকল দল লয়ে অখণ্ড দল।

—শ্রীনিত্যগোপাল

নিষ্ফল

শ্রীসুধা দেবজা

শান্ত হও, শেষ কর
অর্থহীন কর্ম অগণন
ফিরাও অন্তর পানে মুহূর্তের তরে দু নয়ন।
দেয়ে দেখ কী করুণ ক্লান্ত বেদনায়
অবসন্ন চিত্ত তব রয়েছে মূর্ছায়
জাগাও, জাগাও তারে,
করি লহ পূর্ণ সচেতন
নিরর্থক শ্রান্তিহীন বৃথা কোলাহল কর সমাপন।

জাননা নিষ্ফল তাহা
সাড়া নাহি দিল যাহে মন ?
চলার অভ্যাসে শুধু চলিতেছ টানিয়া চরণ !
যে কর্মে পুলকভরে আত্ম প্রেরণায়
সহজ আবেগে মন ছুটে যেতে চায়,
ক্লান্তি-মুক্ত সে চলার ছন্দ হতে সঙ্গীত যে ঝরে
কর্ম তার প্রাণময় পুষ্প হয়ে ফোটে থরথরে !

সে আনন্দ, সেই পথ হেথা খুঁজে নাহি পাও যদি
ফিরে এস, যাক্ তবে, বৃথা শ্রম কেন নিরবধি ?
নিরানন্দ, প্রাণহীন চেষ্টা চিরকাল
স্তূপ করি তুলিতেছে ভুলের জঞ্জাল
শ্রান্ত হস্ত অনিচ্ছায় অকাজের রাশি করে জমা--
বেড়ে ওঠে যে অন্যায়, বিশ্ব তারে নাহি করে ক্ষমা।

———

মহাভারতের বিরাট পর্ব

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ওদিকে মৎস্যরাজ কঙ্ক বল্লব প্রভৃতির সাহায্যে সুশর্মাকে জয় করে নগরে ফিরে শুনলেন উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করে কৌরব আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গেছেন। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বিরাট আদেশ দিলেন

কুমারমাশু জানীত যদি জীবতি বা ন বা।

যস্য যন্তা গতঃ ষন্ডো মন্যেঽহং ন স জীবতি।

তোমরা শীঘ্র দেখ কুমার জীবিত না মৃত। একজন ক্লীব যার সারথি হয়ে গেছে, সে যে এখনও বেঁচে আছে, এ বিশ্বাস আমার হচ্ছে না।

যুধিষ্ঠির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, মহারাজ, বৃহন্নলার সাহায্যে আপনার পুত্র ত্রিভুবন জয় করতে পারবে। এ কথা বিরাটের ভাল লাগল না। এমন সময় খবর এল বিজয়ী উত্তর নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন, তাঁর সর্বাঙ্গীণ কুশল।

বিরাটের আর আনন্দ ধরে না। কাহার সাহায্যে উত্তর বিজয়ী যুধিষ্ঠিরের নিকট তা বেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠল। ভাইয়ের গর্বে তিনি সংযম হারিয়ে বললেন

নাদ্ভুতং তদহং মন্যে যত্তে পুত্রোঽজয়ৎ কুরূন্।

ধ্রুব এব জয়স্তস্য যস্য যন্তা বৃহন্নলা॥

আপনার পুত্র যে কৌরবগণকে জয় করেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ বৃহন্নলা যার সারথি তার জয় সুনিশ্চিত।

কঙ্কের কথা অগ্রাহ্য করে পুত্রের জয়ে পুলকিত মৎস্যরাজ প্রধান মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন—রাজপথ মাল্য পতাকায় সজ্জিত কর, মন্দিরে মন্দিরে দেবতার পূজা দাও, মত্ত মাতঙ্গের উপর ঘণ্টা বাজিয়ে চৌরাস্তায় মৎস্যরাজ্যের বিজয় ঘোষণা কর

শৃঙ্গাটকেষু সর্বেষু আখ্যাতু বিজয়ং মম।

কঙ্কের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, আজ বড় আনন্দের দিন, এস পাশা খেলা যাক, সৈরিন্ধ্রী পাশা নিয়ে এস। উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, শুনেছি হৃষ্ট অবস্থায় পাশা খেলা ভাল নয়। অক্ষক্রীড়ায় অনেক দোষ, এ

অভ্যাস বর্জন করুন। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সর্বস্ব হারিয়ে আজ বনবাসী। রাজা শুনলেন না, পাশা খেলা আরম্ভ হ'ল।

খেলতে খেলতে বিরাট পুত্রের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণকে যে জয় করতে পারে তার বীরত্ব সত্যই অদ্ভুত। যুধিষ্ঠির আবার বললেন—বৃহন্নলা যস্য যন্তা কথং সন বিজেষ্যতে। মৎস্যরাজ এবার ধৈর্য হারালেন। তিনি বললেন—অসভ্য নীচ ব্রাহ্মণ, কোথায় কেমন করে কি কথা বলতে হয় তা তুমি আদৌ জান না। একটা নপুংসক কি করে ভীষ্ম দ্রোণাদিকে জয় করবে? যদি বাঁচতে চাও এমন কথা আর বলো না। ভ্রাতৃ-স্নেহে বিহ্বল যুধিষ্ঠির পুনরায় বললেন, মহারাজ, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণের সঙ্গে বৃহন্নলা ভিন্ন আর কে যুদ্ধ করতে পারেন?

বিরাট উবাচ

বহুশঃ প্রতিষিদ্ধোঽসি ন চ বাচং নিয়চ্ছসি।
নিয়ন্তা চেন্ন বিদ্যেত ন কশ্চিদ্ধর্মমাচরেৎ॥

বিরাট—বহুবার নিষেধ করেছি তবুও তুমি বাক্য সংযত করলে না। দেখছি শাসন না করলে কেউ ধর্মাচরণ করে না। এই বলে ক্রোধান্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখে পাশা দিয়া তীব্রভাবে আঘাত করলেন।

বৈশম্পায়ন উবাচ

বলবৎ প্রতিবিদ্ধস্য নস্তঃ শোণিতমাগতম্।
তদপ্রাপ্তং মহীং পার্থঃ পাণিভ্যামগ্রহীত্তদা॥
অবৈক্ষত স ধর্মাত্মা দ্রৌপদীং পার্শ্বতঃ স্থিতাম্।
সা বেদ তমভিপ্রায়ং ভর্ত্তুশ্চিত্তবশানুগা॥
পাত্রং গৃহীত্বা সৌবর্ণং জলপূর্ণমনিন্দিতা।
তচ্ছোণিতং প্রত্যগৃহ্লাদ্‌যৎ প্রসুস্রাব পাণ্ডবাৎ॥

গুরুতর আঘাতের ফলে যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। রক্ত মাটিতে পড়বার আগেই ধর্মরাজ তা হাত পেতে ধরলেন এবং দ্রৌপদীর দিকে চাইলেন। স্বামীর মনের কথা বুঝে অনিন্দিতা দ্রৌপদী তখনই একটী জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্রে বিগলিত রক্ত ধরলেন।

ঠিক এই সময়ে দ্বারপাল এসে খবর দিলে যে রাজপুত্র উত্তর এসেছেন, তিনি বৃহন্নলার সঙ্গে দ্বারে অপেক্ষা করছেন। হৃষ্ট মৎস্যরাজ আদেশ দিলেন প্রবেশ্যতামুভৌ তূর্ণং—উভয়কে শীঘ্র নিয়ে এস।

অর্জুনের এক প্রতিজ্ঞা ছিল যে, কোন লোক যদি যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কারণে যুধিষ্ঠিরের রক্ত পাত করে, তবে সে জীবিত থাকবে না। পাছে আশ্রয়দাতার অকল্যাণ হয় তাই ধর্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির দ্বারপালের কানে কানে বলে দিলেন, একা উত্তরকে নিয়ে এস বৃহন্নলাকে এনো না।

উত্তর প্রবিশত্বেকো ন প্রবেশ্যা বৃহন্নলা ॥

গৃহে প্রবেশ করে উত্তর পিতাকে প্রণাম করলেন এবং গৃহের এক প্রান্তে দেখলেন যুধিষ্ঠির, তাঁর নাসিকা রক্তাক্ত। উত্তর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজ, কে এমন পাপ কার্য করেছে? বিরাট বললেন, আমি এই কুটীলকে প্রহার করেছি, এ আরও শাস্তির যোগ্য। উত্তর—পিতাজী, আপনি ঘোরতর অন্যায় করেছেন, শীঘ্র এঁকে প্রসন্ন করুন, নইলে আমাদের সর্বনাশ হবে। পুত্রের কথায় বিরাট ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অবস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা চাইলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, রাজা আমি পূর্বেই ক্ষমা করেছি। আমার রক্ত ভূমিতে পড়লে আপনার সব নষ্ট হতো—জীবন ধন রাজ্য।

যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত থামলে অর্জুন প্রবেশ করলেন। তখন মৎস্যরাজ বৃহন্নলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, পুত্র, বল কেমন করে তুমি মহাবীর কর্ণ, কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ ভীষ্ম, ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য্যকে জয় করলে। এতবড় সুখের সংবাদ আমি জীবনে শুনি নি, যেন শার্দূলের কবল থেকে তুমি মাংস ছিনিয়ে এনেছ—আচ্ছিন্নং গোধনং সর্বং শার্দূলানামিবামিষম্। পুত্রের বিজয় গর্বে উৎফুল্ল পিতার আনন্দের আতিশয্য অর্জুন পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন।

উত্তর—পিতা, আমি গোধন উদ্ধার করি নি, শত্রুও জয় করি নি—ন ময়া বিজিতা গাবো ন ময়া বিজিতাঃ পরে। কোন এক দেবপুত্র এ সব কীর্তি করেছেন। সাগরের ন্যায় বিক্ষুব্ধ সেই বিশাল কৌরববাহিনী দেখে আমি আতঙ্কে পালিয়েছিলাম, সেই দেবপুত্রই আমাকে অভয় দিয়েছেন। তাঁর যুদ্ধ কৌশল দেখে আমার রোমাঞ্চ হ'ল, উরুস্তম্ভ হ'ল। সিংহের ন্যায় দৃঢ়-শরীর সেই দেবপুত্র কৌরবগণকে উপহাস করে তাঁদের বস্ত্র হরণ করলেন। বনমধ্যে মত্ত ব্যাঘ্র যেমন তৃণভোজী হরিণগণকে অবলীলাক্রমে জয় করে, সেই বীর একাই ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ অশ্বত্থমা দুর্যোধনকে জয় করেছেন।

একেন তেন বীরেণ ষড়্‌রথাঃ পরিনির্জিতাঃ
শার্দূলেনেব মত্তেন মৃগাস্তৃণচরা বনে ॥

বিরাট—সেই মহাবাহু দেবপুত্র কোথায় গেলেন ?

উত্তর—তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন, মনে হয় কাল বা পরশু তিনি আত্ম-প্রকাশ করবেন।

বৃহন্নলা উত্তরের সঙ্গে গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং অন্তঃপুরে গিয়ে উত্তরাকে বিচিত্র বসনগুলি নিজেই দিলেন।

প্রদদৌ তানি বাসাংসি বিরাট দুহিতুঃ স্বয়ম্ ॥

তিন দিন পরে পঞ্চপাণ্ডব রাজবেশে সজ্জিত হয়ে রাজ দরবারে রাজাসনে উপবেশন করেছেন। রাজকার্য্য করবার জন্য সভায় এসে বিরাট দেখলেন কঙ্ক রাজাসনে বসে আছেন। রাজ বললেন, কঙ্ক, এ কী পরিহাস তোমার, তুমি আমার সদস্য হয়ে রাজাসনে বসলে কেন ?

যুধিষ্ঠির নীরব। অর্জুন সহাস্যে বললেন :—

ইন্দ্রস্যাপ্যাসনং রাজন্নয়মারোঢ়ুমর্হতি।
ব্রহ্মণ্যঃ শ্রুতবাংস্ত্যাগী যজ্ঞশীলো দৃঢ়ব্রতঃ ॥
এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্যবতাং বরঃ।
এষ বুদ্ধ্যাধিকো লোকে তপসাঞ্চ পরায়ণম্ ॥
অয়ং কুরুণামৃষভঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥
অস্য লোকে স্থিতা কীর্তিঃ সূর্যস্যেব দিবা প্রভা ॥
অষ্টাশীতি সহস্রাণি স্নাতকানাং মহাত্মনাম।
উপজীবন্তি রাজানমেনং সুচরিতব্রতম্ ॥
এষ বৃদ্ধাননাথাংশ্চ ব্যঙ্গান্ পঙ্গুংশ্চ মানবান্।
পুত্রবৎ পালয়ামাস প্রজাধর্মেণ বীর্যবান্ ॥

রাজা, বেদহিতকারী শাস্ত্রজ্ঞ দাতা যজ্ঞপরায়ণ এই ব্যক্তি ইন্দ্রের আসনে বসবার যোগ্য। ইনি মূর্ত্তিমান ধর্ম। ইনি কৌরবশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির। হাজার হাজার ব্রতচারী গৃহস্থ এর প্রদত্ত বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করত। ইনি বৃদ্ধ অনাথ অঙ্গহীন পঙ্গু প্রভৃতিকে পুত্রের ন্যায় পালন করতেন। এইভাবে অর্জুন পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, মহারাজ, সন্তান যেমন সুখে মাতৃগর্ভে বাস করে আমরাও তেমনি আপনার ভবনে অজ্ঞাতবাস করেছি।

উষিতাঃ স্মো মহারাজ সুখং তব নিবেশনে।
অজ্ঞাতবাসনিহিতা গর্ভবাস ইব প্রজাঃ ॥

তখন উত্তর অর্জুনকে দেখিয়ে বললেন, মহারাজ ইনিই সেই দেবপুত্র যিনি কৌরবগণকে জয় করে গোধন উদ্ধার করেছেন। ইহারই শঙ্খনাদে আমার কর্ণ বধির হয়েছিল

অনেন বিজিতা গাবো জিতাশ্চ কুরবো যুধি।
অস্য শঙ্খনিনাদেন কর্ণৌ মে বধিরীকৃতৌ ॥

সব বৃত্তান্ত শুনে স্তম্ভিত মৎস্যরাজ বললেন, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির, আমরা না জেনে যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা করুন। আমার শ্রেষ্ঠ বস্তু দিয়ে আপনাদের পূজা করতে চাই। উত্তরা আমার বড় আদরের মেয়ে। আমি প্রস্তাব করছি সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরাকে গ্রহণ করুন, তিনিই তার যোগ্য স্বামী।

বিরাটের প্রস্তাব শুনে অর্জুন বললেন, মহারাজ আমি আপনার কন্যাকে নৃত্যগীত শিখিয়েছি, সে আমাকে পিতার মত সম্মান করেছে, আমাকে আচার্য বলে মনে করেছে। আমি এক বৎসর আপনার বয়স্থা কন্যার সঙ্গে অন্তঃপুরে বাস করেছি, আজ যদি আমি তাকে বিবাহ করি তাতে আপনার কন্যার অপবাদ হবে আর লোকে বলবে আমি চরিত্রহীন।

বয়স্থয়া তয়া রাজন্ সহ সংবৎসরোষিতঃ।
অভিশঙ্কা ভবেৎ স্থানে তব লোকস্য চোভয়োঃ ॥

আপনার উত্তরাকে আমি স্নুষা (পুত্রবধূ) রূপে গ্রহণ করব ; তাতে লোকে বুঝবে আমি শুদ্ধস্বভাব জিতেন্দ্রিয়, আপনার কন্যারও কলঙ্ক হবে না। আমার পুত্র মহাবাহু অভিমন্যু চক্রপাণি বাসুদেবের বড় আদরের ভাগিনেয়, দেবশিশুর ন্যায় প্রিয়দর্শী, অল্পবয়সেই অস্ত্রবিশারদ। অভিমন্যুই আপনার যোগ্য জামাতা ও উত্তরার উপযুক্ত স্বামী—

অভিমন্যুর্মহাবাহুঃ পুত্রো মম বিশাংপতে।
জামাতা তব যুক্তোঽসৌ ভর্তা চ দুহিতুস্তব ॥

অর্জুনের প্রস্তাব শুনে মৎস্যরাজ খুশী হয়ে বললেন, এমন সুবিবেচনার কথা সংযমী অর্জুন ছাড়া আর কে বলতে পারে।

পাণ্ডবগণের দুঃখের রজনী অবসান হ'ল, তাঁরা মৎস্যরাজ্যের সীমান্তে উপপ্লব্য নগরে ছাউনী ফেললেন। পাত্রের বাড়ীতেই বিবাহের বিরাট আয়োজন চলতে লাগল। দেশদেশান্তরে স্বজন বান্ধবের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র গেল। আনর্ত (দ্বারকা) হতে দাশার্হ শ্রীকৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রা ও ভাগিনেয় অভিমন্যুকে নিয়ে এলেন। সঙ্গে এলেন যাদব বীরগণ বিবিধ প্রকার মূল্যবান

যৌতুক নিয়ে। পাণ্ডবগণের শ্বশুর বৃদ্ধ দ্রুপদ এলেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী এক অক্ষৌহিনী সৈন্য নিয়ে এলেন। বিরাটমহিষী সুদেষ্ণা উত্তরাকে সঙ্গে নিয়ে শত শত পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে উপপ্লব্য নগরে উপস্থিত হলেন। পুরনারীরা সূক্ষ্মবস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর রূপের প্রভায় রূপবতী নারীদের লাবণ্যও যেন ম্লান হয়ে গেল—

বর্ণোপপন্না নার্যো রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
সর্বাশ্চাভ্যভবৎ কৃষ্ণা রূপেণ যশসা শ্রিয়া॥

নট বৈতালিক মাগধ সূতেরা স্তবগান আরম্ভ করল। স্বজন বান্ধবে উপপ্লব্য নগর জনাকীর্ণ হল। নানা প্রকারের হরিণ ও শত শত ছাগাদি পবিত্র পশু ভোজনের জন্য হত্যা করা হ'ল। বিবিধ রকম প্রচুর সুরাপানের ব্যবস্থা হ'ল

উচ্চাবচান্ মৃগান জঘ্নুর্মেধ্যাংশ্চ শতশঃ পশূন্।
সুরামৈরেয়পানানি প্রভূতান্যভ্যহারয়ন্॥

শঙ্খ ভেরী পণব আনক প্রভৃতি যন্ত্র বাজতে লাগল।

শুভ দিনে শুভ লগ্নে কন্যা সম্প্রদান হচ্ছে। রাণী সুদেষ্ণা পুরনারীদের সাথে রাজকন্যা উত্তরাকে সম্মুখে রেখে বসলেন। অভিমন্যুকে নিয়ে বসলেন অর্জুন ও মহারাজ যুধিষ্ঠির। জনার্দ্দনকে সম্মুখে রেখে অর্জুন অনিন্দিতা বিরাটতনয়াকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলেন।

তাং প্রত্যগৃহ্ণাৎ কৌন্তেয়ঃ সুতস্যার্থে ধনঞ্জয়ঃ।
সৌভদ্রস্যানবদ্যাঙ্গীং বিরাটতনয়াং তদা॥
প্রতিগৃহ্য চ তাং পার্থঃ পুরস্কৃত্য জনার্দ্দনম্।
বিবাহং কারয়ামাস সৌভদ্রস্য মহাত্মনঃ॥

বিরাটরাজা জামাতাকে ৭ হাজার অশ্ব, ২ শত হস্তী এবং বহুতর ধন যৌতুক দিলেন। শ্রীকৃষ্ণও অভিমন্যুকে বহু ধনরত্ন গোধন বস্ত্র অলঙ্কার শয্যা যান উপহার দিয়েছিলেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেই সব ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

বিবাহের বিপুল সমারোহে মৎস্যরাজের সেই নগরটী হৃষ্ট পুষ্ট জনে পূর্ণ হয়ে শোভা পেতে লাগল।

তন্মহোৎসবসঙ্কাশং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলম্।
নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ॥

বাঁচবার জন্যে

শ্রীভারতী

দেহ ও মনন শক্তির অধিকারী মানুষ হয়ে জন্মে ঠিক মানুষের মত বেঁচে থাকবার জন্যে আমাদের যে জিনিষটার সর্বাগ্রে প্রয়োজন, আমরা সকলেই জানি যে তা হল ঐ দেহ ও মনের সুষ্ঠু বিকাশ বা দুটোর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ। এই দু'য়ের জন্যেই সমগ্র মানব সমাজের সমস্ত রকমের চেষ্টা বা কর্মকাণ্ড ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে—ইতিহাস এমন কথাই বলে। আবার ইতিহাস এমনও বলে যে, এ চেষ্টার আকার যখনই আত্যন্তিক ভাবে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন মানব সমাজ সুস্থ সবল হওয়া তো দূরের কথা অবনতির শেষ সীমায়ই পৌছে যায়। আর সেই চরম ক্ষণে একটা আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য সমষ্টি মানুষের মনেই একটা প্রবল আলোড়ন চলতে থাকে। আজকের দিনেও এ কথাটা ঘোরতর ভাবেই সত্য। আমরা মানুষেরা সকলেই আজ যুগের এমন একটা কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি যে, হয় সেখান থেকে মরণ-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নয়তো বাঁচবার জন্যে একটা কিছু পথকে বার করতেই হবে। কিন্তু কী সে পথ? বিপ্লব? অবশ্যই একটা বিরাট পরিবর্ত্তনকে আনতে হলে বিপ্লব ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই; কিন্তু সে কেমনধারা বিপ্লব? এ প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর যাঁরা দিতে পারবেন, দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মত শক্তি ও দায়িত্ব একমাত্র তাঁদেরই আছে। আমরা সাধারণেরা শুধু একটুখানি চিন্তাই করতে পারি আর সেই সামান্য চিন্তাকে প্রকাশ করবার জন্যে একটা আবেগকে অনুভব করি মাত্র।

মানুষ কি চায়? সে সুখে শান্তিতে বাঁচতে চায়, বাঁচতে চায় একটু আরামে, আনন্দে; শোক ও অকাল মৃত্যুকে, ব্যাধি দুশ্চিন্তাকে, অভাব ও অনটনকে সে পরিহার করতে চায়, অতিশয় নিষ্করুণ বা সুকঠোর শ্রমকে সে পছন্দ করে না, কাজের মধ্যেও সে আনন্দকে পেতে চায়। এক কথায় সুখের সংসার গড়ে সকলকে নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতার মধ্যে বেঁচে ও বাঁচিয়ে চলাই তার মূল প্রেরণা বা ইচ্ছা।

শোনা যায় বিজ্ঞান আজ মানুষের হাতে এমন ক্ষমতা এনে দিয়েছে যা দিয়ে নাকি মানুষের এই মুলগত আকাঙ্ক্ষাটিকে পুর্ণ করে তোলা আর অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমরা যা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছি সেটা কি এর বিপরীতই নয়? কেন এ রকমটা হয়, কেন সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষ সমস্ত কিছু থেকেই এমন ভাবে বঞ্চিত হয়? কি তার কারণ? আজকের দিকে এ প্রশ্নের উত্তর কম বেশী আমরা সকলেই জানি; কিন্তু জেনেও অসহায় নিরুদ্ধশক্তি মানুষদের করবার মত কি-ই বা থাকতে পারে? ঐক্যবদ্ধ বিরাট শক্তি ভিন্ন এর প্রতিকার খুঁজতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র।

এক একটা জাতি বা ব্যক্তিকে গড়ে তুলতে হলে তার জন্যে প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য, অবারিত আলো বাতাস, সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, শীত গ্রীষ্ম বিশেষে পরিধেয় এবং প্রচুরতর জ্ঞান ও আনন্দ। কিন্তু আজকের দিনে ঘরে বাইরে প্রথমেই যে দৃশ্য চোখে পড়ে তা হল রুগ্ন ও কঙ্কালসার শিশুর দল আর প্রায় সে রকম চেহারারই মায়ের দল—অধিকন্তু তাদের বেশীর ভাগের মধ্যেই নানান্ রকমের অজ্ঞতায় ভরা এক একটি মন। মা ও শিশুর অবস্থা যে দেশে বা যেখানে এমন, সেখানে একটা সুস্থ সবল মানুষ বা জাতি গড়ে উঠতে পারে কি করে? আর গড়ে তোলবার জন্যে আয়োজন-টাই বা কি হচ্ছে? অল্প স্বল্প এটুকু ওটুকু চেষ্টা যা চোখে পড়ে তা দিয়ে এত বড় ভাঙ্গনকে কি রোধ করা সম্ভব? তাই দৈনন্দিন জীবনে সে সব ছোটখাট ছাড়া ছাড়া চেষ্টাগুলোর কোনো ফলকেই বিশেষ কেউ অনুভব করতে পারছে না। যে বিরাট ও বিপুল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে মানব সমাজ তার শরীর ও মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভের কিছুটা অন্ততঃ পথ পাবে সেটা অত্যন্ত দুরূহ হলেও অসম্ভব নিশ্চয়ই নয়।

প্রথমেই এর জন্যে অর্থাৎ মানুষের ভাল করবার জন্যে যে বস্তুটার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে কাজ বা কর্মী। বেকারের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় দেশ নাকি শংকিত; তাই যদি হয় তবে এও তো সত্য যে প্রয়োজনের অনুপাতে লোক-সংখ্যা আমাদের কিছুমাত্র কম নয়। মানুষের মধ্যে কাজ করবার মত সদিচ্ছারও অভাব নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু ঠিকমতো কাজে লাগানোর পদ্ধতি বা জ্ঞান এবং মানুষের জন্য যে গভীর দরদবোধ থাকা প্রয়োজন, অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে দেশের যারা পরিচালক তাদের অনেকেরই মধ্যে সেই

বস্তুটারই রয়েছে প্রকাণ্ড অভাব। অসংখ্য কর্মহীন লোক একটু কাজের সুযোগ না পাওয়ার দরুণ গোটা পরিবারকে পরিবার সহ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন, এই তো আজকের দিনের সত্যিকারের চেহারা। অথচ আমরা দেখছি কি সীমাহীন কাজই না দেশময় ছড়িয়ে আছে! দেশের রাস্তা ঘাট আশ্চর্যভাবে অসংস্কৃত থাকছে, পাচা নালা ডোবা কচুরিপানা আর আবর্জনার দুর্গন্ধে, জল নিকাশের অব্যবস্থায় ও সাধারণের অজ্ঞানতা ও স্বাস্থ্য বোধের প্রচণ্ড অভাবে রোগ কি পরিমাণে আপনা থেকেই পরমানন্দে বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে। রোগকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে অমানুষিক ভাবে অথচ রোগীদের জন্যে নেই কোনো ভাল এবং পরিমাণমত আরোগ্যশালা। যে ক'টাও বা আছে তাতেও নেই উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী ও দরদ, নেই পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা। ফলে কয়েদখানা আর এসব হাসপাতালে পার্থক্যও হয়ত খুব বেশী নেই। সুশিক্ষার অভাবে একটা গোটা জাতি মূর্খতা ও অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে খাবি খাচ্ছে। বাসস্থানের অভাবে হয় অনেককেই রাস্তায় দিন কাটাতে বাধ্য হতে হচ্ছে নয়তো ভাঙা ও প্রায় ধ্বসে-পড়া আলো বাতাসহীন অন্ধকার কুঠরী বা গহ্বরের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকতে হচ্ছে। শোনা যায় জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে খাদ্য জন্মায় না। অথচ পতিত জমি পড়ে থাকছে বিস্তর, নেই যন্ত্র, নেই মানুষের ব্যবহার। যান বাহনের অভাবেও মানুষের দুর্গতির কোনো অবধি নেই। এক একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে খালি রেখে দিয়ে এক একটা বিশেষ জায়গায় মানুষকে কেন্দ্রীভূত করার ফলে আলো বাতাস তো জীবন থেকে নেই হয়ে গেছেই, মানুষের মনের সম্পদও ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে। সব কিছুই ক্ষয়ে যাচ্ছে, সব কিছুই নেই কিন্তু আছে প্রচুর জন সমষ্টি, যা নাকি সবচাইতে বেশী মূল্যবান। অথচ এ সম্পদ অবহেলায় অনাদরে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেবারও প্রয়োজন যেন কিছু নেই। সকলকে মেরে দু' দশ জন যে বেঁচে থাকতে পারে না এটুকু বোধও যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। যে করে পারা যায় নিজের নিজের অবস্থাটাকে গুছিয়ে নিতে পারলেই হ'ল, দুনিয়ার আর কারো দিকে তাকাবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও বোধ করছি না। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রচুর বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে ক্ষমতার আসনে যারা বসে আছেন, তাঁদেরও অধিকাংশেরই মনোবৃত্তিটাও আসলে এই-ই। কিন্তু বাঁচতে হলে এ অবস্থাকে ও এই মনোভাবকে পাল্টাতে হবেই, নইলে যারা আজ

মারছেন, সংগে সংগে মরতে হবে তাঁদেরও। এ-ও ইতিহাসেরই অকাট্য ও অমোঘ নির্দেশ।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে একদিকে যেমন চাই নরনারী নির্বিশেষে সমবেত ভাবে সকলের কাছ থেকেই ক্ষমতা, যোগ্যতা ও ইচ্ছানুযায়ী বিচিত্র রকমের কাজের সহযোগিতা, তেমনই অপরদিকে চাই সেই কাজের সমগ্র ফলটাকেও সকলে সমান ভাবেই ভাগ করে নিয়ে ভোগ করা। কিন্তু তাইবা কেমন করে হবে? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি মানুষের পরিশ্রম আর তার উৎপন্ন সমস্ত রকমের সামগ্রীর মাঝেই দুস্তর ব্যবধান রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে টাকা বা মুদ্রা নামধেয় একটি অতিশয় সম্মানজনক পদার্থ। দু'য়ের মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে একদা এ বস্তুটির প্রচলন হলেও ক্রমশঃ এটিই দু'য়ের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কর্মহীনেরা তো নয়ই, পরিশ্রম করবার সুযোগ যারা পাচ্ছেন তাঁরাও তাঁদের খাটুনীর অনুপাতে ফলটাকে ধরা ছোঁয়ার সুযোগ প্রায় পাচ্ছেন না বললেই চলে। কাজেই অর্থকে যদি অনর্থকারী বলা হয় তা'হলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় বলে মনে হয় না। ব্যবসায়ীরা এরই বলে দেশটাকে উৎসন্ন দিচ্ছে, ছোট ও বড় সবাই মিলে জাল জুচ্চোরি, ঘুষ ও ভেজালে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছে এরই, মোহসমুদ্রে। আর এমনই এর পাপচক্র যে, এসবে অনিচ্ছুক সৎ ব্যক্তিরাও একান্ত নিরুপায় হয়েই এর জালে আট্‌কা পড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। মানুষের শারীরিক ও নৈতিক জীবন এরই আশ্চর্য মহিমায় ক্রমশঃ নীচু থেকে নীচু-তলায়ই নেমে যাচ্ছে। পদার্থটি নিঃসন্দেহ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। কিন্তু এ পাপবেষ্টনী থেকে মুক্তি পেতে চাইলে ঐ শক্তিমান পদার্থের হাত থেকে আগে অব্যাহতি পাওয়া চাই, নইলে সাম্য বা সমানাধিকারকে আমরা পেতেই পারিনা। যেমন দেশের সমস্ত সমর্থ মানুষই যদি কাজ করবার মত সুযোগ পায় বা করতে বাধ্য হয় তাহলেই কি সকলের সব অভাব মিটে যাবে? যাবে না, কারণ পারিশ্রমিকের অঙ্কটা তো আর সকলের ভাগ্যে সমান জুটবেনা; ওটা যে বেশী পাবে ফলটাতো তার হাতেই নেমে আসবে সেই অনুপাতে, অতএব যথা পূর্বং তথা পরং। কোথায় সাম্য? মাত্র উপোশে মরবে না এই পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য যে বস্তুটা সেটা হ'ল শরীর ও মনের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য বা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ। মানুষের জীবনে বা মনে পক্ষপাতিত্বের ফলে একদিকে অহমিকা ও স্বার্থপরতা এবং অপর দিকে যে ক্ষোভ জাগে,

হিংসা ঈর্ষ্যা ও আরো নানান্ ধরণের অস্বাস্থ্যকে সেই জন্ম দেয়। এই জন্যেই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা কথাটি এত বেশী মূল্যবান। সাম্য অর্থে কথায় সাম্য নয় নিশ্চয়ই, ভোগে সাম্য ; কিন্তু অর্থের তারতম্যে এই ভোগের মধ্যেও তারতম্য আসতে বাধ্য। ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ, দুঃখ কষ্টের অনুভূতি, জ্ঞান ও আনন্দ লাভের প্রয়োজন যদি সকলেরই থাকে তবে টাকার অঙ্কের কম বেশী দিয়ে সেই অনুভূতি ও প্রয়োজনকে মাপতে গেলে সমাজে বা মনে বিশৃঙ্খলা না এসেই পারে না। কাজেই কথা যদি এই হয় যে, সকলেই খুসি মনে কাজ করে যাও আর তার ফলটাকেও সবাই দু'হাত ভরে কুড়িয়ে নিয়ে যাও, টাকাটাকে যতটা পার সরিয়ে দাও মাঝখান থেকে, তা হলে এমন কি আর মন্দ হয়? ভারী কঠিন ব্যাপারটা! অনেক গোলযোগ, অনেক অসুবিধে, অনেক তর্ক আর অনেক স্বার্থ রয়েছে এর পেছনে—তবুও কল্যাণকেও তো চাই ; আর সেইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় করে ভাববার কথা।

একথা সকলেরই জানা আছে যে, লোকসংখ্যার প্রকৃত হিসাব আর তাদের চাহিদার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ সঠিক জানা থাকলে, সেই জনসমাজকে দিয়েই তাদের সমস্ত রকমের প্রয়োজনগুলো মেটাবার মত সমস্ত উপাদানই প্রস্তুত করান চলে। অবশ্যই তার জন্যে কাউকেই বেগার খাটানো চলবে না। সকলেই যদি এই প্রতিশ্রুতি পান যে কাজের বদলে তারা সকলেই পাবেন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুশিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, পরিধেয়, পুষ্টিকর খাদ্য, সন্তান সন্ততি ও নিজেদের নিরাপত্তা, নির্দোষ আমোদ প্রমোদ, ভ্রমণের সুযোগ ও অবসর, বার্ধক্যে ও অসুস্থ অবস্থায় আরাম ও বিশ্রাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছু—তবে দেখা যাবে দেশকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে খুব বেশী সময় লাগছে না। মানুষ টাকা চায় উপরোক্ত সামগ্রীগুলো সংগ্রহ করবার মাধ্যম হিসেবেই, অর্থ সঞ্চয় করবার স্পৃহাও জাগে নিজের এবং পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যেই ; কিন্তু এ সবগুলোই যদি শুধু শ্রমের বিনিময়েই এসে যায় তবে সাধ্যমত পরিশ্রম করতে মানুষের কিছুমাত্র অনিচ্ছা হবার কারণ থাকার কথা নয়। শ্রমের ওপরেই প্রত্যেকেরই প্রাচুর্য লাভের উপায় নির্ভর করছে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হবার ফলে কাজও হবে তখন দ্রুত ও ভাল। তবে প্রতিটি মানুষকেই কাজে নিয়োজিত করার সময়ে তাদের রুচি ও প্রবণতা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যাচাই করে নিয়ে ঠিক সেই সেই কাজটিতে নিয়োগ করতে পারলে কাজ হবে সুন্দর ও সম্পূর্ণ ; আর কাজটা সেখানে

অনিচ্ছুক মন থেকে না এসে খুশির সংগে আসার সুযোগ পাচ্ছে বলে কর্মকর্তার অবরুদ্ধ বা সুপ্ত শক্তিটাও তাতে আত্মপ্রকাশ করবার এমন একটি সহজ গতি পাবে, যার ফলে সেই ব্যক্তিটিও সহজ সুন্দর প্রাণবান ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠবে। অপর দিকে অর্থোপার্জনের বা অন্নবস্ত্র সংগ্রহের কঠিন চিন্তায় বিপর্যস্ত না হবার দরুণ কাজে ফাঁকি দেবার বা যেন তেন প্রকারেণ কাজ সারার বিশ্রী অভ্যাসটাও ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যাবে।

প্রথমেই জাতিগঠনের জন্য যে কাজটি অত্যাবশ্যক আমরা সকলেই জানি যে, সেটি হ'ল শিশুদের শরীর ও মনকে সুগঠিত করে তোলা। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, এ কথা তো আমরা হামেশাই শুনে থাকি। কিন্তু তারও আগে রয়েছেন মায়েরা, ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জীবনেই তাঁরাই হন প্রথম দিশারী। এই মেয়েরা বা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মায়েরা চিরকালই থেকেছে ত পরমুখাপেক্ষী হয়ে, তাদের জ্ঞান ও আনন্দ লাভের পথ প্রায় সম্পূর্ণই থেকেছে অবরুদ্ধ হয়ে, যার ফলে সন্তানদের জীবনকেও তারা সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মত কোন শিক্ষা ও সুযোগ পান না। এর চাইতে অকল্যাণকর ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে বলে তো কল্পনাই করা যায় না। মেয়ে পুরুষদের মধ্যে আর্থিক অসাম্যই রয়েছে এরও মূলে ; এই মৌলিক বৈষম্য ঘুচলেই দেখা যাবে শিশু-মানসের গতিধারাও ক্রমোন্নতির পথে সহজেই এগিয়ে যাবে। তাই কাজ দিতে হবে প্রত্যেকটি সমর্থ বা কর্মক্ষম মেয়েকেই। মেয়েদের হাতে বিশেষ করে শিশু ও বালক বালিকাদের জন্য সব রকমের কাজের ভারগুলো ছেড়ে দেওয়া এবং সংগে সংগেই সে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে খুব বেশী। এর জন্যে শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত শিশু বা বালক বালিকাদের সংখ্যানুপাতে শিশু প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক আয়োজনও অবিলম্বেই করা কর্তব্য। এ ছাড়াও বহু বিচিত্র দিকে নিজেদের নিয়োজিত করবার মত পথ মেয়েরা যাতে পান তারও উপায় থাকা প্রয়োজন। এখানে অবশ্য মেয়ে পুরুষ উভয় পক্ষেরই সংস্কার-মুক্তির কথাটাই আগে এসে যায়, আর এইসব সংস্কারের হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র সু-শিক্ষা। কাজেই সত্যকারের শিক্ষার দ্বার সকলের জন্যে অবারিত না করলে সত্যকার কল্যাণকেও পাওয়া যাবে না। এর জন্যে বিরাট বিরাট অট্টালিকা আর প্রচুর দামী দামী সাজ সরঞ্জাম নাই বা হ'ল, সুবিধেমত যেখানে সেখানে ক্লাস নেবার ব্যবস্থা, ভ্রাম্যমান ও স্থায়ী লাইব্রেরী,

কথকতা, থিয়েটার, সিনেমা, বক্তৃতা, পাঠসভা, সংবাদপত্র, রেডিয়ো ও অন্যান্য নানান্ ধরণের উপায়েই সর্বসাধারণের মধ্যে এ শিক্ষাকে দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া চলে।

অবশ্য মেয়েদের কাজের কথা ওঠার সংগে সংগেই স্বভাবতঃই যে প্রশ্নটি উত্থত হয়ে ওঠে তা হল এই যে, এভাবে সব মেয়েরাই যদি বাইরের কাজে মন দিতে যান তবে মানুষের পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে তার সৌন্দর্য ও মাধুর্য্যটুকু কি লোপ পেয়ে যাবে না? তাছাড়া বর্ত্তমানেও তো অনেক মেয়েই বাইরের কাজে খেটে খাচ্ছেন, তা বলে তাদেরই কি খুব সুখী মনে হয়? শেষের প্রশ্নটির জবাব এই যে—তা হয় না সত্যিই, কারণ যতদিন না বর্ত্তমান ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘট্‌ছে ততদিন মেয়ে পুরুষ সকলে মিলে উদয়াস্ত খাটলেও পরিবারে বা সমাজে স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। আর বন্ধন? অবশ্যই আর্থিক বন্ধন খুব একটা জোরালো বন্ধন তো বটেই, সেইটেকে বাদ দিলে থেকে যাবে শুধু স্নেহ ও প্রীতির যে বন্ধন তার মধ্যেই তো পাওয়া যাবে সত্যকারের মাধুর্যের পরিচয়। খাঁটি বা প্রকৃত বস্তু লাভের জন্যই তো মানুষের চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা যুগে যুগেই পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী হয়ে ওঠে। অন্নবস্ত্রের জন্য আবহমান কাল থেকে মেয়েরা পুরুষের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন, তার ফলে জটিলতাও কিছু কম সৃষ্টি হয়নি। এর একটা হচ্ছে মানসিক অনুদারতা ও কূপমণ্ডুকতা। সমাজের বা পাঁচজনের জন্যে কিছুটা সময় অন্ততঃ খুশির সংগে দিতে পারলে এই মনের গণ্ডীবদ্ধতাটা যেমন কাটে তেমনি ব্যক্তির নিজস্ব মননশক্তি ও কর্ম্মশক্তি একটা স্বাভাবিক পথ পেয়ে জীবনের সত্যকার মূল্য ও সার্থকতাকেও উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের মনের পক্ষে প্রাণের এই সহজ গতিপথটিকে খোলা রাখার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। সামাজিক কুব্যবস্থার বদ্ধ বায়ুতে আট্‌কে রেখে জনসংখ্যার অর্ধাংশেরই শক্তির এই যে অপচয় ঘটানো হচ্ছে তাতে শুধু মেয়েদেরই নয়, গোটা দেশ ও সমাজেরই এতে প্রচণ্ড রকমের অধঃপতন ঘটছে। যুগব্যাপী এই অসুস্থ অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন ঘটানো যায় তবে পরিবারের বা সমাজের কাউকেই আর কারোর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে না হবার দরুণ একপক্ষ ভারবাহীর অবস্থা ও অপর পক্ষ বোঝা হয়ে থাকার গ্লানির থেকেও মুক্তি পেয়ে যাবেন। একান্নবর্ত্তী পরিবার না-ও যদি হয় একতাবদ্ধ সুখী পরিবারই যে সৃষ্টি হবে এতে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। দাম্পত্য জীবনও আরো

সুখের হবে এ আশাও অবশ্যই করা চলে। পণপ্রথা, বেকার সমস্যা ও শিক্ষার অভাব প্রভৃতি না থাকার জন্য প্রত্যেকটি ইচ্ছুক ছেলেমেয়েই নিশ্চয় উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত সাথীর সংগে বিবাহিত হতে পারবে। আজকের দিনে পারিবারিক তথা সমাজ জীবনে যে বিশ্রী রকমের ভাঙনের স্রোত দ্রুতবেগে বয়ে চলেছে, তাকেই বরঞ্চ রোধ করে সুস্থ সুন্দর সমাজ ও পরিবার গড়ে তোলার সম্ভাবনাই এতে রয়েছে প্রচুর। সাধারণ ভাবে মেয়েরা কোনোদিনই ঘর ছাড়তেও চায় না, ঘর ভাঙতেও চায় না, তাদের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে একটি সৃজনশীল গঠনপ্রয়াসী স্থিতিধর্মী মনোবৃত্তি। সোজা পথ পেলেই এই মানসিকতা আরো অনেক মহান ও সুন্দর হয়েই ফুটে উঠবে। সারাদিন রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধাটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া নিশ্চয়ই খুব একটা ভাল কথা নয়। ঘর সংসারের কাজকে আরো সহজ, আরো দ্রুত করে নেবার অনেক রকম পদ্ধতিই তো পশ্চিমের অনেক দেশের মেয়েরা ব্যবহারে লাগাচ্ছেন, এ দেশেই বা সে ব্যবস্থা হবে না কেন? অবসর সৃষ্টি এবং সেই অবসরকে সার্থক ও আনন্দময় করে তোলবার আয়োজন ও প্রয়োজন প্রত্যেকটি মানুষেরই জীবনে রয়েছে। পারিবারিক বন্ধনকে স্বীকার করেও এই আনন্দ লাভ ও স্বাধীন সত্তাকে বিকশিত করে তোলা কিছুমাত্র অসম্ভব হবার কথা নয়।

ক্রমশঃ

'Uncompromising devotion to moral law is the secret of the strength of Buddhism, and its neglect of the mystical side of man's nature the cause of failure.'

—Radhakrishnan.

বর্গীকরণ ও এক-লিপি

[শ্রীসতীশচন্দ্র গুহঠাকুরের বক্তৃতার বিবরণ, ইংরাজী 'হিন্দু' দৈনিকে (২৩।৪।৫৪) প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অনুলিখিত]

মাদ্রাজ সংস্কৃত কলেজ-সংশ্লিষ্ট কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী গবেষণাগারে কাশীস্থ পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র গুহঠাকুর তাঁহার উদ্ভাবিত 'প্রাচ্য-বর্গীকরণ পদ্ধতি' প্রায় ২৫০ পণ্ডিত ব্যক্তির সমক্ষে বর্ণন করেন।

বক্তার পরিচয় দিতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের কর্তা, পী. ই. এন্ সদস্য ডক্টর শ্রী বে. রাঘবন্ বলেন: শ্রীযুক্ত গুহঠাকুর মহাশয় বর্গীকরণ ব্যতীত আরো যে-সকল বিষয় নিয়া প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ গবেষণায় ব্রতী আছেন তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে যে, দেশের সাংস্কৃতিক ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে সেগুলি কত প্রয়োজনীয়।

Indiana নামক তাঁহার গ্রন্থপঞ্জী-পত্রিকা ঐ বিষয়ে এদেশে প্রথম প্রচেষ্টা। উহাতে যে-কোন বিষয়ের অনুসন্ধিৎসু অধীতব্য গ্রন্থরাজি বা প্রকাশিত লেখ-তালিকার সন্ধান পাইতে পারেন। 'লিপি ভারতী' নামে তিনি যে সর্ব ভারতীয় এক-লিপির পরিকল্পনা দিয়াছেন তৎ সম্বন্ধেও তিনি এখানেই বর্ণন করিবেন।* আর একটি পরিকল্পনা তাঁহার 'ভাষাভারতী'। সর্বভারতীয় কৃষ্টিমূলক এক ভাষাকে Basic Sanskrit বলা যায়। উহাই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত। অন্য কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষা পদে আরূঢ় থাকিলেও (যেমন, বর্তমানে 'সংস্কৃত-মূলক হিন্দী ভাষা, নাগরী অক্ষরে লিখিত' রাষ্ট্রভাষা) পাশাপাশি কৃষ্টিমূলক আধুনিক ও মজ্জাগত (basic) সংস্কৃত—গুহঠাকুরের নামকরণে 'ভাষা-ভারতী'—আন্তঃপ্রাদেশিক আদান-প্রদানে চলিলে প্রাচ্য ভাবধারা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং কোন একটি প্রান্তের ভাষার জবরদস্তী প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয় না। বৌদ্ধভারতে প্রান্তীয় পালি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সর্বভারতের জন্য যে বিপুল সরল সংস্কৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠে, অদ্যাবধি সেগুলি আমাদের রাষ্ট্র-সম্পদ্। জৈন সাহিত্যও প্রথমে প্রাকৃত ও অর্দ্ধমাগধীতে লিখিত হইলেও শেষে বেশির ভাগ সংস্কৃতেই রচিত হয়। শঙ্কর-রামানুজ প্রভৃতি

* 'রাষ্ট্রভাষা ও রাষ্ট্রলিপির অভিব্যক্তি'—পুরাতন উজ্জ্বলভারতে দ্রষ্টব্য।

ধর্মপ্রচারকগণ সর্বভারতে বোধগম্য করার জন্য নিজ নিজ বক্তব্য ও পুস্তকাদি কোনো প্রান্তীয় ভাষায় না লিখিয়া, বরং সংস্কৃতের ভিতর দিয়া সর্বভারতে আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সময় পর্যন্ত পরিব্রাজকেরা সংস্কৃতে কথা কহিয়া যতটা বোধগম্য হইতেন, পরবর্তীকালে ইংরাজীর মাধ্যমে তাহার শতাংশও সম্ভব হয় নাই। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে যে ভাষাগত কাল্পনিক বিন্ধ্য পর্বত মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে, 'ভাষা-ভারতী' তাহার বিলোপ সাধনে কৃতকার্য হইতে পারে।

প্রাচ্যবর্গীকরণ

পুস্তক-বর্গীকরণ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে নানা পদ্ধতি রহিয়াছে। ডিউই-প্রবর্তিত 'দশমিক প্রথা' তন্মধ্যে বহুল প্রচলিত। আধুনিক যুগে ভারতবর্ষ হইতে ও-বিষয়ে দুইটি মৌলিক গবেষণা বাহির হইয়াছে: ডক্টর রঙ্গনাথনের 'কোলন-প্রথা' (১৯৩৩) এবং গুহঠাকুরের 'প্রাচ্য পদ্ধতি' (১৯৩১) শেষোক্তটির যেরূপ বিবৃতি ও উদাহরণ দেখা গেল, তাহাতে উহার উপযোগিতা স্বীকার করিতে হয়। উদ্ভাবক মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, ডিউই বা অপর যে-কোন পদ্ধতি হইতে এটি সহজ, বৈজ্ঞানিক এবং গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে অধিকতর কার্যকরী ও সুলভ। বিষয়গুলি প্রথমতঃ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গে বিভক্ত করিয়া 'সর্ব' (অথবা 'সাধারণী') নামে একটি পঞ্চম বর্গ স্বীকার করা হইয়াছে। এই পাঁচটি বর্গ দশমিক ছাঁচে ঢালিয়া মাত্র একশত মুখ্য বিষয়ে পরিণত করা হয়। (ডিউই করিয়াছেন এক হাজার এবং তদ্দৃষ্টে প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয় করেন দশহাজার।)

প্রাচ্য বর্গীকরণের এই একশত বিষয়ের প্রত্যেকটি দশমিক পথে যথেচ্ছ বিস্তৃত হইতে পারে। অধিকন্তু উহা 'কায়-নির্ণয়চক্র' অনুসারে নিয়ম-নির্দিষ্ট অসংখ্য রূপ কায় গ্রহণ করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে। এই ছক্-কাটা কায়নির্ণয় চক্রে প্রতি বিষয়ের আবশ্যকতা অনুসারে আরোপিত হইতে পারে। আবার, দেশ কাল জাতি ভাষা দৃষ্টিভঙ্গী ও গ্রন্থকার ভেদে বিষয়ের প্রকাশ সম্ভব করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"বর্গীকরণ কার্যেঽস্মিন্ অঙ্গমষ্টবিধং স্মৃতম্।
বর্গ-কায়ৌ দেশ-বাচৌ ন-কালৌ দিক্ চ কর্তা চ॥

প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে, এককাদি দশটি মাত্র গাণিতিক অঙ্ক (১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০) দ্বারা, দুই-একটি চিহ্ন সংযোগে বিষয়ের জন্য সরল প্রতীক এমন কি পুস্তকের পূর্ণ 'ডাক-নাম' call number) উৎপাদিত হইতে পারে। বর্ণমালা (ভারতীয় অথবা রোমক) একেবারেই ব্যবহার না করিয়া বিষয় প্রতীক স্থিরীকৃত হইবে। এমন কি গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের অতিরিক্ত গ্রন্থ-নাম পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে সরল প্রতীকের সাহায্যে উপলব্ধ হইতে পারে। যথা "রাজস্থানে লোক শিক্ষার ইতিহাস" বিষয় বা গ্রন্থনাম '৩৭, ০৯ ; ২, ৯৭' এই পাটীগাণিতিক অঙ্ক দ্বারা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। আবার, রাজস্থানের অন্তর্বর্তী মেবার (উদয়পুর) রাজ্যের সম্বন্ধে একাধিক পুস্তকের জন্য উক্ত অঙ্কের সহিত '৪' যোগে সম্পন্ন হইবে। ঐ রূপ 'পঞ্জাবের অর্থনীতি' ৩৩, ২, ৫ ; 'গীতার জার্মান ভাষ্য' ৯২, ৪০১, ৫'২, 'নিগ্রোনিগ্রহ' ১৪, ৫২ : ০.৯২ ইত্যাদি। অন্য কোনো পদ্ধতিতে এতদূর প্রতীকীকরণ সম্ভব বলিয়া জানা যায় না।

প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি উত্তর ভারতে কাশীর সর্বকার সংস্কৃত কলেজের সরস্বতী ভবনে, এবং দক্ষিণ দেশে তিরুপতি নগরে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর গবেষণাগারে গৃহীত হইয়া অনেক বৎসর যাবৎ আশাতিরিক্ত ফল দিতেছে। পদ্ধতিটি প্রথমে সরস্বতী ভবন গবেষণা পত্রিকার নবম বর্ষে (১৯৩০) তৎকালিক সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি নিবন্ধটিকে ঐ বিষয়ের আদি পথপ্রদর্শক (pioneer) বলিয়া স্বাগত করিয়াছে। সুধিজন ইহার গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখুন, দেশী-বিদেশী অপরাপর পদ্ধতি অপেক্ষা ইহার কার্যকারিতা প্রকৃষ্ট কিনা।

লিপি-ভারতী

লিপিসুধার বহুকাল ধরিয়া চলিতেছে, বিশেষতঃ নাগরী লিপির ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রায় সবার লক্ষ্য ভারতের অন্যান্য লিপির তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। লিপি-ভারতীর দৃষ্টিভঙ্গী কিছু অন্য ধরণের : সে চায়, জগতের সেরা লিপিগুলির গুণাবলি অর্জন করিয়া একটি সার্বভৌম এক-লিপির প্রতিষ্ঠা, যাহা দ্বারা কেবল যে রাষ্ট্রভাষাই লিখিত হইবে, তাহাই নহে ; বরং বিভিন্ন প্রান্তীয় অপরাপর ভাষাগুলিও সেই এক-লিপি ব্যবহার করিবে।

রোমক লিপির মত 'লিপিভারতী' ক্যাপিটাল ও স্মল ভেদে দ্বিবিধ কায় স্বীকার করে। একটি মুখ্যকায় 'অক্ষর', অন্যটি সামান্যকায় 'অক্ষরী'। দেশের প্রাচীন ও আধুনিক লিপিগুলি হইতে যে ভাবে এই 'লিপিভারতী' অভিব্যক্ত হইল, তাহা যেন একটি গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক গ. সা. গু.— Greatest Common Measure.

লিপিভারতীর বিশেষত্ব এই যে প্রতিটি শব্দ একটানা লিখিয়া যাওয়া চলে এবং ইহা দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সম্ভব বলিয়া অনায়াসে সাক্ষরতা বৃদ্ধি হইতে পারে ; যন্ত্রলেখন ও মুদ্রনাদি—মায় লাইনো-মনো টাইপ রোটারি ও টেলিপ্রিণ্টিং পর্য্যন্ত—সহজসাধ্য হইবে। মুদ্রণ-পারিপাট্যও বাড়িবে। চক্ষুকে যথা সম্ভব কম ক্লেশ দিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করা যাইবে, আন্তঃ প্রাদেশিক মেলামেশা আদান-প্রদান ব্যাপকভাবে চলিতে পারিবে। ইহা সুধিজনের এবং সর্কার নির্দিষ্ট বিচার সভার অনুধাবনের যোগ্য। পরীক্ষা প্রতিক্ষিত।

পণ্ডিত শ্রীরামস্বামী শাস্ত্রী (পী ই এন সদস্য) বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন (২২।৬।১৯৫৪)।

———

'যখন বাল্যে থাকিব তখন বালক হইয়াই থাকিব, বাল্যকে ভরপুর বাল্য হিসাবেই আস্বাদন করিব ; ইহার পর যখন বাল্য 'নিরুদ্ধ' হইবে, বাল্যক্ষণ কোনও অনির্ব্বচনীয় পরিণামের ভিতর দিয়া যৌবনক্ষণ উৎপন্ন করিবে, তখন যৌবনকে যৌবনের মাপকাঠি দিয়াই আস্বাদন করিব, বাল্যস্মৃতি দ্বারা যৌবনকে বাঁধিয়া যৌবনের স্বচ্ছন্দ গতিপথে বাধা সৃষ্টি করিব না। এই ভাবে প্রতিক্ষণকে আস্বাদন করিয়া অনাদি অনন্তে চলিবার যোগ্যতাই পুরুষোত্তম জীবনে যোগ্যতা। এই যোগ্যতা সম্ভব হইতেছে জীবনের সেই শক্তি আছে বলিয়াই, যে শক্তি প্রতিটী ক্ষণের স্বয়ংমূল্য বজায় রাখিয়া ও ক্ষণ সমূহের ইতরেতর যোগ বিধান করিয়াও প্রতিটী ক্ষণ ও ইতরেতর যোগে যুক্ত ক্ষণ সমূহের অতীত থাকিবার যোগ্যতা রাখে। এই শক্তিই গীতা ভাগবতের যোগমায়া।'

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রণীত
ব্রহ্মসূত্রের অবধূতভাষ্য

শঙ্খ

শ্রীঅনিলকুমার রায়

যুগে যুগে আমি তন্দ্রামুখর রাতে
ঘুমায়ে যখন পড়েছি জীবনটাতে
অমা রজনীর গভীর হৃদয়তলে
ঘুম ভেঙে গেছে তোমার শঙ্খরোলে।

ক্লান্তি যখন নেমেছে চোখের কোণে
শ্রান্তি এনেছে নিদ্রা সঙ্গোপনে
নিদ্রা এনেছে জীবন-মৃত্যু ডালা
তখনি শুনেছি তোমার জাগার পালা।

ঝরা বসন্ত শুকনো পাতায় যবে
তরুতলে তলে ভরেছে নীরবে রবে
গ্লানিতে মুখর হয়েছে মাটির ঘর
তখনি শুনেছি এসেছে তোমার ঝড়।

যখনি ভেঙেছি ভাঙা-জীবনের তীরে
তোমার মন্ত্র শুনেছি উর্ম্মী-নীরে।
দেখেছে জীবনে নতুন উজ্জীবন
সূর্য্যে জেগেছে আকাশে অগ্নিকোণ।

জীবনে-জীবনে নব লগনের মাঝে
ওগো জাগানিয়া তোমার ছন্দ বাজে॥

আজকের দিনের চলার পথ

শ্রীরেণু মিত্র

সংসারটা কেমন যেন হয়ে গেল। এক সময় ছিল যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা স্নেহ প্রেম দয়া মায়ার সম্পর্ক ছিল—একটা ভালবাসার আবহাওয়া ছিল। কিন্তু তখন একজন আর একজনের অধীন হয়ে ছিল—রাজার অধীন ছিল প্রজা, ধনিকের অধীন ছিল শ্রমিক, পুরুষের অধীন ছিল নারী, পিতামাতার অধীন ছিল সন্তান। কিন্তু এ অধীনতার শেকল আজ খসে পড়ছে—ভারতবর্ষ যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছে, বিশ্বের সর্বত্রই শাসক ও শাসিতের, বড় ও ছোটর সম্পর্ক বদলে গেছে। শ্রমিক আজ আর তার নিয়োগকর্তার খেয়ালখুশীর অধীন তো নয়ই, শ্রমিকের নিজস্ব একটা স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছে। সন্তান আজ আর পিতামাতার অধীনতা মেনে নিচ্ছে না—যেদিন থেকে সে কথা বলতে শিখেছে সেদিন থেকেই তার একটা নিজস্ব মতামত তথা অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়ে থাকে। এ সবই ভালই হয়েছে। কেউ কারো অধীন থেকে তার মানুষোচিত স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হোক—আজকের দিনে এ ভাবতে কিছুতেই ভাল লাগে না। তাই ছোট বড় নর নারী প্রত্যেকেই মানুষ হিসেবে সমাজের বুকে সুস্থভাবে দাঁড়াবার পথ পাচ্ছে—এ দেখে বড় ভাল লাগে। কিন্তু বুকটা যে কেমন খালি হয়ে গেল—স্বতন্ত্র হওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে ভুলে গেল কেন? স্নেহ দয়া মায়া প্রেম সহানুভূতির একটা গভীর স্পর্শ কোথাও যেন নেই। সকলের সঙ্গেই সকলের সম্পর্ক সমানে সমানে হওয়ায় আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেই সম্পর্কের মধ্যের আন্তরিকতার প্রাণটুকু উবে গেল কেন?

প্রাণটা কেমন হাঁপিয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র হতে চায়, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সত্তায় একটা অখণ্ড এককে অনুভব করে। এ তো ভাল কথা। কিন্তু স্বতন্ত্র একের সঙ্গে স্বতন্ত্র অপরের কি প্রীতি—গভীর আন্তরিক প্রীতি—হতে পারে না? মানুষের মধ্যে তো দুটো বৃত্তিই সমান—সে স্বতন্ত্রও হতে চায়, সে ভালও বাসতে চায়। এতদিন ছিল একজন আর একজনকে অধীন না করে ভালবাসতে পারত না। স্বামীর অধীন হলে স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে,

পিতামাতার অধীন হয়ে চললে পিতামাতা সন্তানকে ভালবাসে, ভাই বোনের অধীন হয়ে চললে বড়রা ছোটদের ভালবাসে, বন্ধুর অধীন হয়ে থাকলে একজন আর একজনকে ভালবাসতে পারে। এই রকমই আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আজকের যুগের কথাই হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতির কথা। আজ প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র, তাই আজ প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে একটী স্বতন্ত্র মানুষ অপর একটী স্বতন্ত্র মানুষকে ভালবাসতে পারে কি না। স্বামী স্বতন্ত্র, স্ত্রী স্বতন্ত্র, অথচ স্বামী স্ত্রীতে গভীর ভালবাসা—দুই-এ মিলে এক—দুই স্বতন্ত্রে মিলে এক। বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান স্বতন্ত্র, অথচ পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে গভীর একাত্মিকা ভালবাসা রয়েছে, যেমন ছিল সন্তান যখন পিতামাতার অধীন এই ছিল নিয়ম। ভাইদের মধ্যে অথবা ভাই বোনের মধ্যে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হয়েও পরস্পরের মধ্যে সেই আগেকার দিনের মত একটা সহযোগিতাপূর্ণ প্রীতি বর্তমান। এ কেন না সম্ভব হবে? দুটো মনোবৃত্তির অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যহীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য এই দুটো মনোবৃত্তির মাঝখানের সময়টুকু এই যে আজকের দিনগুলি—এই সময়টাতে ভারী একটা অসামঞ্জস্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু ক্রমে মানুষ এইভাবে ভাবতে ও কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, তখন অধীনস্থ হলেই, আমার কথা আমার নির্দেশ শুনে চললেই অপরের প্রতি আমার স্নেহ থাকবে, কর্তব্য থাকবে নয়তো সব দায় চুকে গেল—এ মনোবৃত্তি মুছে যাবে, সমানের সঙ্গে সমানের ব্যবহার ও তার মধ্যেও গভীর আন্তরিকতা মানুষ আয়ত্ত করবে।

কিন্তু এ সম্ভব হতে পারবে তখনই যখন মুক্তি বা স্বাতন্ত্র্য যারা পেল তাদের তরফ থেকে শ্রদ্ধাহীনতা দূর হবে। আজকের দিনে স্বাতন্ত্র্যের পথ দিয়ে একটা শ্রদ্ধার অভাব আমাদেরকে অভিভূত করেছে। যে পক্ষ অপর পক্ষকে একটা চাপের মধ্যে রেখেছিল, যেমন পুরুষ ধনিক নিয়োগকর্তা শাসক পিতামাতা —এক কথায় যে কোন একটা শক্তির চাপে যারা অপরকে নীচে রেখেছিল তারা যেমন অপর পক্ষকে স্বাতন্ত্র্য দিয়ে, সমান মনে করেও তাকে অন্তরের সঙ্গেই ভালবাসতে চেষ্টা করবে, তেমনি যারা চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল, অর্থাৎ শাসিত, শ্রমিক, সন্তান, নারী, তাদের পক্ষ থেকেও একটা মস্ত বড় করণীয় আছে—সে হচ্ছে অপরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাকে অটুট রাখা। স্বতন্ত্র হয়েছি বলেই আমার চাল চলন

কথাবার্তা সব সৌন্দর্য হারিয়ে সভ্যতার গণ্ডী পেরিয়ে যাবে, পুজ্য-পুজাব্যতিক্রম প্রতি পদে ঘটতে থাকবে, প্রত্যেকই নিজের পছন্দ ভাললাগা মন্দলাগাকেই চলার পথে সকলের চাইতে বেশী মূল্য দিতে থাকবে—এ কেন হবে? পুরুষকারের মূল্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ফাঁক দিয়ে নিজেকে নিজেই বড় করবার যে মনোভাবটা অত্যন্ত কুৎসিৎ আকারে দেখা দিল, সেটাকে শুধরে নিতেই হবে। শ্রদ্ধাহীনতা এই জন্যেই এত উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

এইভাবে তুটো পক্ষকেই যদি বিচার করি তাহালে দেখি, যতদিন সত্য ছিল এক তরফা ততদিন মাত্রাবোধের কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু আজ যখন প্রত্যেক বস্তুর তুটো দিককেই স্বীকার করবার দিন এসেছে এবং সেই স্বীকৃতির সামগ্রিকতাকেই যখন সত্য বলি তখন মাত্রাবোধই জীবনের একমাত্র মানদণ্ড হয়ে পড়েছে। অথচ চলার পথে এই মাত্রাই আমরা আয়ত্ত করতে পারছি না। অপরের দ্বারা নিজেকে শোষিত হতে না দিয়েও যে অপরের পুর্ণ মর্যাদাটুকু দিতে পারা যায়, তা শুধু মাত্রা বোধের উপর নির্ভর করে। অথচ বস্তুর সমগ্রতার ধারণা না থাকলে মাত্রাবোধ জন্মান সম্ভব নয়। সমাজ বস্তুটী সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা থাকলে ধনিক বা শ্রমিক নর বা নারী ইত্যাদি কোন এক পক্ষই নিজেকেই সমগ্র সমাজ বলে অপর পক্ষকে নিঃশেষিত করতে চাইত না। আমি এবং আমার প্রতিপক্ষ, সে আমি যে পক্ষই হই না কেন শাসক কিংবা শাসিত, নর কিংবা নারী, নিয়োগকর্তা কিংবা শ্রমিক, এই তুই-এ মিলেই যে একটা সমগ্র সমাজ এইটে বুঝতে ও শিখতে হবে। সেই সমগ্র সমাজে কোন্ পক্ষের সীমা কতটুকু এই মাত্রা বোধের উপরে সমাজের শান্তি ও প্রগতি নির্ভর করে। একদিন এক পক্ষ তার মাত্রা ছাড়িয়ে তার সীমা লঙ্ঘন করে গিয়ে ছিল, আজ আবার অপর পক্ষ মুক্তির নেশায় তার সীমাকে লঙ্ঘন করে মাত্রা ছাড়িয়ে নিজেদের অধিকার আর দাবীর ফর্দ পেশ করছে। অধিকারের নেশায় সে নিজের কর্তব্যকে ভুলে গেল। অথচ অধিকার এবং কর্তব্যবোধ যে পাশাপাশি চলে, নিজের অধিকার সম্বন্ধে কেবল সচেতন থাকলেই যে অধিকার আদায় হয় না, সেই সঙ্গে যে নিজের কর্তব্যটুকু সুষ্ঠু ও সঙ্গতভাবে করা দরকার—এ কথাটা যত দিন না বুঝব ততদিন পরিবারে সমাজে শান্তি ও স্বাস্থ্য কোনমতেই সম্ভব নয়। প্রকৃতির সেই যুদ্ধ ঘোষণা

এইখানে স্মরণ করি, যো মাং জয়তি সংগ্রামে স সে দর্পং ব্যাপোহতি'—এ বিশ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে জয় করতেই হবে সত্য, কিন্তু লাঠির গুঁতোয় অপরকে নশ্যাৎ করবার পথে নয়। ছোট জয় করবে বড়কে নিজের শ্রদ্ধা দিয়ে সেবা দিয়ে, বড় জয় করবে ছোটকে স্নেহ দিয়ে দরদ দিয়ে, দুজনই দুজনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও মর্যাদাবোধ নিয়ে বিরাজ করুক। আজকের সমাজের ধারণা এই রকমই। অপরকে মুছে ফেলবার প্রয়াস যেমন হবে বাতুলতা, নিজের কর্তব্যনিরপেক্ষ অধিকার আদায়ের দাবীকেও একান্ত করে তুলে তার চাপ দেওয়াও হবে মূর্খতা। নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থেকে, নিজেকে অপমানিত হতে না দিয়ে, অন্যকেও অপমানিত না করবার বীর্য নিয়ে, স্নেহপ্রেমশ্রদ্ধা নিয়ে নিজের কাজ করে যাওয়ার পথই হবে আজকের দিনের চলার পথ। স্নেহপ্রেমশ্রদ্ধার গভীর খাতে জীবনকে বহাতে না পারলে মানুষের সমাজ যে বনের পশুর আবাসস্থল হয়ে উঠল কেবল নিজের পেট ভরাবার প্রচেষ্টায়! কিন্তু তা তো কিছুতেই হতে পারবে না। আমরা মানুষ—আমরা নিজেরা বাঁচব অন্যকে বাঁচিয়ে রেখে—পশুই অন্যকে নষ্ট করে নিজে বাঁচে, কিন্তু সামগ্রিকতার ধারণা ও সেই সঙ্গে মাত্রাবোধ জীবনে জাগ্রত করতে পারলে আমার বাঁচা বলতেই বা কতটুকু কি বোঝায় আর অপরকে বাঁচতে দেওয়া বলতেই বা কি বোঝায় এ বোধ সহজ হয়ে আসবে। সেই সুস্থ চিত্তবৃত্তি আমাদের জাগ্রত হোক! আমরা কল্যাণব্রতে প্রতিষ্ঠিত হই!

'আমি বরং তোমাদের প্রত্যেককে ঘোর নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত নির্ব্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কারণ নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছু হইবার আশা আছে, সে মৃত নহে। কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, মাথা একেবারে যায়, মস্তিষ্ক নির্বীর্য্য হইয়া যায়; মৃত্যু-কীট সেই জীবন্ত শরীরে প্রবেশ করে—এই দুইটীই পরিত্যাগ করিতে হইবে। নির্ভীক সাহসী লোক—ইহাই আমরা চাই। আমরা চাই, রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্কের নিবীর্য্যতাসম্পাদক, দৌর্ব্বল্যজনক ভাবের দরকার নাই।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একাদশোঽধ্যায়ঃ

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।

ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোক ত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ১১।৪৩

পিতা [জনয়িতা] অসি [হও] লোকস্য [প্রাণিসমূহের] চরাচরস্য [স্থাবর জঙ্গমের] ত্বম্ [তুমি] অস্য [এই জগতের] পূজ্য চ [এবং পূজার্হ] (অতএব) গুরুঃ [গুরু] গরীয়ান্ [গুরু হইতেও গুরুতর] (কি হেতু গুরুতর ?) ত্বৎ সমঃ [দ্বিতীয় পরমেশ্বরের অভাব হেতু ত্বত্তুল্য] ন অস্তি [অন্য কেহ নাই] অভ্যধিকঃ [অধিক] কুতঃ [কোথা হইতে] অন্যঃ [অন্য কেহ] লোকত্রয়ে অপি [ত্রিভুবনেও] হে অপ্রতিমপ্রভাব [নাই প্রতিমা উপমা যাহার, এমন অপ্রতিম প্রভাব যাহার, সেই নিরতিশয়প্রভাব]।

হে অতুল্যপ্রভাব, তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, অতএব গুরু, গুরু অপেক্ষাও গুরুতর, ত্রিলোক মধ্যে তোমারই সমান কেহ নাই, অধিক আর কে আছে ? ১১।৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসিদেব সোঢ়ুম্ ॥ ১১।৪৪

(যে হেতু তুমি এই প্রকার) তস্মাৎ [সেই হেতু] প্রণম্য [প্রকৃষ্টভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া] প্রণিধায় [নত করিয়া] কায়ং [শরীরকে] প্রসাদয়ে [প্রসাদ করাইতেছি] ত্বাম্ [তোমার] অহম্ [আমি] ঈশম্ [ঈশ্বর] ঈড্যম্ [স্তুত্য] (অতএব তুমি) পুত্রস্য [পুত্রের সর্ব্ব অপরাধ] পিতা ইব [পিতা যেমন] সখা ইব [নিরুপাধি বন্ধু, সমপ্রাণ সখার মত] সখ্যুঃ [সখার অপরাধ] প্রিয়ঃ [কিম্বা যেরূপ প্রিয়জন তুমি] প্রিয়ায় [প্রিয়ের অর্থাৎ আমার অপরাধ, এখানে ষষ্ঠী বিভক্তির স্থলে চতুর্থীর প্রয়োগ হইয়াছে] (এইরূপ) অর্হসি [যোগ্য হও] হে দেব, সোঢ়ুম্ [সহ্য করিতে, ক্ষমা করিতে]।

সেই কারণে আমি নতদেহে প্রণাম করিয়া ঈশ্ স্তুত্য তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি ; পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ের অপরাধ সহ্য করে, তুমিও সহিয়া লইতে সক্ষম। ১১।৪৪

অদৃষ্টপূর্ব্বম্ হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ১১।৪৫

অদৃষ্টপূর্ব্বম্ [কোনদিন পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, এই তোমার বিশ্বরূপ] দৃষ্ট্বা [দর্শন করিয়া] হৃষিতঃ অস্মি [হৃষ্ট হইয়াছি] ভয়েন চ [এবং ভয়ে] প্রব্যথিতং [প্রকৃষ্টরূপে ব্যথিত] মনঃ মে [আমার মন] (অতএব) তৎ এব [বিশ্বরূপের সেই সখা-রূপই] মে [আমাকে] দর্শয় [দেখাও] হে দেব রূপং [মধুর সখা রূপ] প্রসীদ [প্রসন্ন হও] হে দেবেশ [হে জগন্নিবাস]।

তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছি, অথচ ভয়ে মনও প্রব্যথিত হইয়াছে। হে দেব, তোমার সেই পূর্ব্বের সখা রূপ দেখাও; হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। ১১।৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্, ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ১১।৪৬

কিরীটিনং [কিরীটিবান্] গদিনং [গদাধর] চক্রহস্তম্ [চক্রহস্ত] ইচ্ছামি [প্রার্থনা করি] ত্বাং [তোমাকে] দ্রষ্টুম্ [দেখিতে] অহম্ তথাএব [পূর্ব্বে যেমন সখা হইয়াছিলে] (যেহেতু আমার এইরূপ প্রার্থনা, অতএব) তেন এব রূপেন [বসুদেব পুত্ররূপে] চতুর্ভুজেন [চতুর্ভুজ রূপে] হে সহস্রবাহো [ভব [আবির্ভূত হও] হে বিশ্বমূর্ত্তে [তোমার বিশ্বরূপ সম্বরণ করিয়া বসুদেবপুত্ররূপে আবির্ভূত হও]।

আমি তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় কিরীটিবান, গদাধর, চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি; হে বিশ্বমূর্ত্তে, হে সহস্রবাহো, তুমি আবার পূর্ব্বের ন্যায় চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হও।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যে ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ১১।৪৭

[অর্জ্জুনকে ভীত দেখিয়া বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া প্রিয়বচন দ্বারা আশ্বাসিত করিবার জন্য) শ্রীভগবান্ উবাচ [শ্রীভগবান বলিলেন] ময়া প্রসন্নেন [অনুগ্রহ বুদ্ধিরূপ প্রসাদযুক্ত আমাদ্বারা] তব [তোমাকে] হে অর্জ্জুন, ইদং পরং রূপং [এই বিশ্বরূপ] দর্শিতং [দেখানো হইয়াছে] আত্মযোগাৎ [আত্মার যোগ হেতু, যোগমায়া শক্তি যোগে] তেজোময়ং [তেজোঘন] বিশ্বং [সমস্ত] অনন্তম্ [অন্তরহিত] আদ্যং [আদ্য] যৎ [যেরূপ]

যে [আমার] ত্বদন্যেন [তোমাছাড়া অন্য কাহারও দ্বারা] কেননা তোমার কাছেই সর্ব্বপ্রথম স্বরূপ-বিশ্বরূপ সমন্বিত পুরুষোত্তম দর্শন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে] ন দৃষ্ট পুর্ব্বম্ [পুর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই]

শ্রীভগবান কহিলেন—আমি প্রসন্ন হইয়া নিজ যোগ প্রভাবে আমার এই পর-রূপ তোমাকে দেখাইয়াছি ; এই তেজোময় আদ্য অনন্ত সমগ্ররূপ তুমি ছাড়া পুর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই। ১১।৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ১১।৪৮

('আমার এই রূপ দর্শন করিয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ'—এইভাবে ভগবান সেই রূপ দর্শনের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন) ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ [কর্ত্তৃতন্ত্র রাগদ্বেষস্তরের চারিবেদ এবং যজ্ঞবিদ্যাধ্যয়ন দ্বারা ; এখানে যজ্ঞশব্দে কল্পসূত্রাদি যজ্ঞবিদ্যা বুঝিতে হইবে] ন দানৈঃ [তুলা পুরুষাদি দান সমূহ দ্বারা] ন চ ক্রিয়াভিঃ [অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সমূহ দ্বারা) তপোভিঃ উগ্রৈঃ [চান্দ্রায়ণাদি উগ্র কৃচ্ছ্র সাধনা দ্বারা] এবংরূপঃ [এবম্বিধ বিশ্বরূপ যাহার, যে রূপ দর্শিত হইল, সেই রূপবিশিষ্ট] ন শক্যঃ অহম্ [আমাকে দেখিতে সক্ষম হয় না] নৃলোকে [মনুষ্যলোকে ; কেননা কর্ত্তৃতন্ত্র রাগদ্বেষ স্তরের যে কোনও সাধনাই পচাগলা এই মনুষ্যলোকের বাহিরে নিত্য আরাম-লোকের স্থাপনা করিতে ব্যগ্র ; একমাত্র শরণাগতির সাধনাই এই লোককে ব্রজলোকে গড়িয়া তোলে] দ্রষ্টুং [দেখিতে] ত্বদন্যেন [তোমাছাড়া অন্য দ্বারা, কেননা তুমিই পুরুষোত্তম দর্শনের সর্ব্বপ্রথম ধারক ও বাহক] হে কুরুপ্রবীর [কুরুশ্রেষ্ঠ]।

হে কুরুপ্রবীর, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞাধ্যয়ন, দান, ক্রিয়াকলাপ, অত্যুগ্র তপঃ প্রভাবে এই মনুষ্য লোকে এবম্বিধ রূপ দর্শনে কেহ সমর্থ নহে। ১১।৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ১১।৪৯

মা তে ব্যথা [তোমার ব্যথা না হউক ; অত্যাচারিত বিশ্বের বেদনায় বেদনাতুর আমার বেদনায় বেদনাময় হইয়া তোমার ব্যথা তুমি ভুলিয়া যাও] মা চ বিমূঢ়ভাবঃ [স্বরূপ-বিশ্বরূপের দোটানায় পড়িয়া দ্বন্দ্ব মোহাচ্ছন্ন হইও না] দৃষ্ট্বা [দেখিয়া] রূপং ঘোরম্ ঈদৃক্ [ঈদৃশ ভয়ঙ্কর রূপ] মম ইদম্ [আমার এই] ব্যপেতভীঃ [বিগতভয়] প্রীতমনাঃ [স্বরূপ-বিশ্বরূপের যুগপৎভাবের উৎপত্তি হওয়ায় প্রীত হইয়াছে মন যাহার, সেইরূপ হইয়া] পুনঃ [পুনরায়] ত্বং

[তুমি] তৎ এব [তোমার ইষ্ট সেই চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র গদাধর] মে [আমার] রূপ [রূপ] ইদং [এই] প্রপশ্য [ভাল করিয়া দেখ ; প্রাণ ঢালিয়া দেখ]।

আমার ঈদৃশ এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তুমি ব্যথিত হইও না, তোমার বিমূঢ় ভাব না হউক ; প্রীতমনে পুনরায় তোমার ইষ্ট সেই রূপ ভাল করিয়া দেখ ১১।৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ১১।৫০

ইতি [এইরূপে] অর্জ্জুনং [অর্জ্জুনকে] বাসুদেবঃ তথা [তথাভূত বচন] উক্ত্বা [বলিয়া] স্বকং রূপং [বসুদেব গৃহে জাত সখ্যরসলভ্য, সহজ, মানুষ, স্বকরূপ, সখারূপ] দর্শয়ামাস [দেখাইলেন] ভূয়ঃ [পুনরায়] আশ্বাসয়ামাস চ [এবং আশ্বাস দান করিলেন] ভীতং এনং [ভীত এই অর্জ্জুনকে] ভূত্বা [হইয়া] পুনঃ সৌম্যবপুঃ [প্রসন্নদেহ, সর্ব্ব শরীর হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে প্রসন্নতা যাহার] মহাত্মা।

সঞ্জয় কহিলেন—মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত বচন বলিয়া আবার সেই স্বকরূপ দর্শন করাইলেন এবং সৌম্যমূর্ত্তি হইয়া সেই ভীত অর্জ্জুনকে পুনরায় আশ্বাসিত করিলেন। ১১।৫০

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ১১।৫১

দৃষ্ট্বা [দেখিয়া] ইদং [এই] মানুষং রূপং [সহজ মানুষ রূপ] তব [তোমার] সৌম্যং [সৌম্য] হে জনার্দ্দন ইদানীং [এক্ষণে] অস্মি সংবৃত্তঃ [সঞ্জাত হইলাম] (কি হইলেন ?) সচেতাঃ [প্রসন্নচিত্ত] প্রকৃতিং গতঃ [প্রকৃতির সহজাবস্থা প্রাপ্ত]।

অর্জ্জুন বলিলেন—হে জনার্দ্দন, তোমার সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া অধুনা আমি সুস্থচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম। ১১।৫১

শ্রীভগবান্ উবাচ

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১১।৫২

সুদুর্দ্দর্শং [সুষ্ঠু দুঃখের সহিত দর্শন যাহার, তিনিই সুদুর্দ্দর্শ। বিশ্বরূপই

দুর্দ্দর্শ ; তাই তাহারও পর স্বক রূপ ও বিশ্বরূপ সমন্বিত সৌম্য সহজ মানুষরূপ তো তাহা হইতেও দুর্দ্দর্শ] ইদং রূপং [এই যে সহজ মানুষ রূপ। এখানে 'ইদম রূপম্' নিশ্চয়ই বিশ্বরূপকে বুঝাইতেছেনা ; কেননা এখানের প্রকরণ মানুষ-রূপের ; বিশ্বরূপ দর্শন তো দৃশ্যপটের বাহিরেই চলিয়া গিয়াছে। এখন অর্জ্জুনের সামনে যে রূপ রহিয়াছে, তাহাই 'ইদম্', স্বক ও বিশ্বরূপের সমন্বয়ে সহজরূপ] দৃষ্টবান্ অসি [এই যে দেখিলে এবং বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্বে এতকাল দেখিয়া আসিয়াছ] যং [যে রূপ] মম [আমার] দেবাঃ অপি [দেবগণও] অস্য রূপস্য [এই সহজ মানুষ-রূপের] নিত্যং [সদা] দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ [দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন, দর্শন পান না ; কেননা নরলোক ছাড়া অপর কোন লোকে এই তনুর প্রকাশ সম্ভব নয়। 'মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দসচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি'। ব্রহ্মা ব্রজের গোপগণের জীবনাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ-রূপ আস্বাদনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন—ভাগবত এই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।]

শ্রীভগবান বলিলেন—এই যে আমার সুদুর্লভ রূপ দেখিতে পাইলে, দেবগণও এই রূপের নিত্য দর্শনাভিলাষী। ১১।৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ১১।৫৩

(এই শ্লোকটী যে স্বক রূপ সম্বন্ধে তাহা নিঃসন্দেহ ; কেননা ঠিক এই রূপ একটী শ্লোক—'ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন দানং' ইত্যাদি। বিশ্বরূপ সম্বন্ধে পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে)।

অহম্ [সহজ মানুষ আমি] বেদৈঃ [রাগদ্বেষ স্তরের, কর্ত্তৃতন্ত্র, ভিন্নদৃষ্টি বশতঃ বহুশাখাযুক্ত বেদসমূহের দ্বারা] ন তপসা [তপস্যা দ্বারা] ন দানেন [দান দ্বারা] ন চ ইজ্যয়া [যজ্ঞ দ্বারাও নয়] এবম্বিধঃ দ্রষ্টুং [এই রূপ দেখিতে সক্ষম হয় না] দৃষ্টবান্ অসি মাং যথা [যে-রূপে আমাকে দেখিলে, এবং এতকাল দেখিয়া আসিয়াছ]।

তুমি আমাকে যে প্রকারে দেখিয়াছ, সেই রূপ কেহ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা দান যজ্ঞ দ্বারা দেখিতে সক্ষম হয় না। ১১।৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪

[কি সাধনায় তবে তোমাকে দেখা যায় ? ভক্ত্যা [ভক্তিদ্বারা] তু [কিন্তু] (কোন্ রূপ ভক্তিদ্বারা') অনন্যয়া [যে ভক্তিতে ভগবান্ ভক্ত

হইতে 'অন্য' নন্ 'অপৃথগ্‌ভূত নন, এবং ভক্তের কাছে ভগবান ছাড়াও 'অন্য' কিছু নাই, সেই ভক্তিই অনন্যা। এই ভক্তিতে ভক্ত যাহা কিছু অনুভব করে, তাহা ভগবান হইতে পৃথক্ নয়। তাহা ভগবানের বিচিত্র বিচিত্র আস্বাদন রূপেই গড়িয়া উঠে]। শক্যঃ অহম্ এবম্বিধঃ [বিশ্বরূপ সমন্বিত স্বরূপ] হে অর্জ্জুন, জ্ঞাতুং [নিজকে তাঁহার ভিতর হারাইয়া ফেলিয়া, সামান্য ভাবে এক রূপে জানিতে] (তাহার পর) দ্রষ্টুং চ [যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বিশেষের ক্ষেত্রে অভেদ-প্রভেদভাবে, সকল ইন্দ্রিয়কে চক্ষু বানাইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে] তত্ত্বেন [পুরুষোত্তম তত্ত্বের দৃষ্টিকোণে] প্রবেষ্টুম্ চ [এবং জীবনে জীবন মিলাইয়া, সকল অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া প্রবেশ করিতে] হে পরন্তপ !

হে পরন্তপ, অনন্যা ভক্তি প্রসাদেই এই রূপকে প্রথমে সামান্যভাবে জানা, পরে বিশেষের ক্ষেত্রে দর্শন করা সর্ব্বশেষ তত্ত্ব দৃষ্টিতে প্রবিষ্টও হওয়া যায়।

মৎকর্ম্মকৃৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১।৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিশ্বরূপ দর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

(এক্ষণে সকল গীতা শাস্ত্রের যাহা সারভূত অর্থ, এবং যাহা একান্ত নিঃশ্রেয়স, তাহার অনুষ্ঠানার্থ উপদেশ দিতেছেন) মৎকর্ম্মকৃৎ [মদর্থ কর্ম্ম এবং আমিই ঘনরূপে কর্ম্ম 'মৎ-কর্ম্ম'; এইরূপ মৎকর্ম্ম করেন যিনি, তিনিই মৎকর্ম্মকৃৎ] মৎপরমঃ [আমিই যাহার পরম ; প্রভুর জন্যও ভৃত্য কর্ম্ম করে কত, কিন্তু প্রভু-ভৃত্যের স্বার্থ ও দৃষ্টিকোণ ভিন্ন ; কিন্তু ভক্ত ও ভগবান একই স্বার্থ, একই দৃষ্টিকোণ, তাই ভগবান ভক্তের পরম] মদ্ভক্তঃ [আমার ভক্ত ; ভজনের রসে ভক্ত-আমি ডুবিয়া-ভাসিয়া অনন্তলীলা রত] সঙ্গ বর্জ্জিতঃ [সঙ্গবর্জ্জিত ; আমাদের এই সংযোগের মাঝে রাগদ্বেষ সঙ্গ-দোষ রূপ মলিনতার লেশও নাই। বিশ্বরূপের ব্যবধানে ভক্ত-আমি, আমি-বিশ্ব-ভক্ত পরস্পর পরস্পরের 'পর' হইয়া পরকীয় হইয়া, সঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া, উপাধি বিধুর সহজ নিঃসঙ্গ মিলনে মিলিত হই] নির্ব্বৈরঃ [অনাত্মার অনন্ত প্রকাশের উপর, দ্বন্দ্বের উপর, দ্বন্দ্বমোহাচ্ছন্ন সর্ব্বভূতের উপর, অনিত্য-অশুচি-দুঃখময় বলিয়া বৈরভাব নাই যাহার, তিনিই নির্ব্বৈর] সর্ব্বভূতেষু [সর্ব্বভূতে] যঃ [যিনি] সঃ [তিনি] মাং এতি [আমাকে পান] হে পাণ্ডব !

হে পাণ্ডব, যে মৎ কর্ম্ম করে, যাহার আমিই পরম, আমার ভক্ত, সঙ্গ-বর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে যিনি বৈরশূন্য, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। ১১।৫৫

একাদশাধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

পুস্তক পরিচয়

আগামী কাল: শ্রীমতী সুধা দেবজা। প্রকাশক শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি এম, এ.; বিদিশা প্রকাশনী। ৩১ রসা রোড, কলিকাতা ২৬। মূল্য ১৷৷০ টাকা। ১৩৪ পৃষ্ঠা।

বইখানি লেখিকা উৎসর্গ করেছেন আগামী কালের মানুষকে, যারা তাদের পূর্ববর্তীরা যা পারে নি তাই সৃষ্টি করবে—তারা নূতন পৃথিবী গড়বে। 'লোভ বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব—এই সব অতি পুরাতন পচা মনোবৃত্তিগুলি দূর করে প্রতিষ্ঠা করবে তোমরা সেই জীবন—যা মানুষের চিরন্তন ধ্যানের বস্তু।'

লেখিকার অনেক আশা। কতকগুলি বাস্তববাদী সুস্থ মানুষ তৈরী হোক—যাদের পা মাটীতে আর কল্পনার ঐশ্বর্য থেকেও যারা বঞ্চিত নয়—লেখিকার এই আশা। জীবনের প্রতি পদ ক্ষেপে নিজেদেরকে গড়ে তুলে যারা অগ্রসর হবার প্রয়াসী, যাদের অন্তরে 'ডাক' এসে পৌছেছে—এমন কিশোর আজকের দিনে তেমন চোখে পড়ে কই? তাই বইটী পড়তে ভাল লাগে। কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার শিহরণের মধ্য দিয়ে, কয়েকটী কাঁচ বুকের বাবা মা হারানোর রুদ্ধশ্বাস বেদনার মধ্য দিয়ে লেখিকা আমাদেরকে এক প্রীতির নীড়ের স্নিগ্ধতার মধ্যে এনে রেখেছিলেন—যেখানে শিবনাথবাবুর স্নেহসুধায় সব ব্যথা চাপা পড়ে গিয়েছিল মিলি জিষ্ণু অভির। তারপর আবার সবাইকে তিনি বের করে দিলেন অজানার সন্ধানে। কিশোরের রক্ত নেচে ওঠে যে সব কারণে তার সবই এর মধ্যে আছে। তাই কিশোরেরা যে বইটি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়বে—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ:

সাময়িকী

মহাপূজায় চণ্ডীব্যাখ্যা—শ্রীনিত্যগোপাল শতবার্ষিকীর তরফ হইতে মহাপূজা উপলক্ষে মহানির্বাণ মঠে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ চারি দিন চণ্ডী ব্যাখ্যা করেন। তিন দিনের পূজার তত্ত্ব মানব জীবনের তিনটী যে সাধনার খবর পৌঁছাইয়াছে, বিস্তৃতভাবে তাহা তিনি আলোচনা করেন। তিন দিনে জীবনের তিনটী গ্রন্থিচ্ছেদই শ্রীদুর্গাপূজার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য।

পরাশক্তি আমার জীবনের আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমার সকল অধিকার করিয়া তিনি তাঁহার বাসস্থান রচনা করুন—ইহাই অধিবাসের দিনের ভাবনা—ইহাই বোধন।

মানুষ সৃষ্টির অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে। কিন্তু সৃষ্টির পথে নানা অন্তরায়। নূতন সৃষ্টির মুখে আসিয়া দাঁড়ায় অতীতের সু-কু, জানা না জানার সংস্কার আর গতানুগতিকতার জড়তা। সপ্তমী পূজার দিন অতীতের এই সংস্কাররূপ ব্রহ্মগ্রন্থি ছেদ করা হয় মহাকালীর ধ্যানে, ঋষি যাহার ব্রহ্মা। অতীতের এই সু বা কু সংস্কারই সেদিনের শাস্ত্রকারের হাতে মধু ও কৈটভরূপে চিত্রিত হইয়াছিল।

অষ্টমীর দিনে বিষ্ণুগ্রন্থি ছেদ করিয়া মহালক্ষ্মীর ধ্যানে সপ্তমীর দিনে যে নূতন সৃষ্টি সম্ভব করা হইয়াছিল তাহারই সঙ্ঘ রচনা কৌশল শিক্ষা লাভ করা। এ দিনের ঋষি বিষ্ণু। সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে—কিন্তু সব বিচ্ছিন্ন—এই বিচ্ছিন্নতাকে দূর করিয়া সঙ্ঘ গঠনই অষ্টমী পূজার উদ্দেশ্য।

নবমী পূজায় রুদ্র গ্রন্থি ছেদ করিয়া জীবনে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছাময় আদিরস কাম জয়ের সাধনায় জয়ী হইবার আহ্বান। ঘটনাটী এইরূপ। শুম্ভ নিশুম্ভের মন্ত্রী সুগ্রীব পাহাড়ের উপর দেবীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইল। মানুষের জৈব স্বভাব এই যে যাহা ভাল লাগিল অমনি তাহাকে আত্মসাৎ করিবার তীব্র বাসনা হয়। সুগ্রীব মনে করিল তাহার প্রভুদের কাহারও জন্য তো মেয়েটীকে পাইলে ভাল হয়। সে যাইয়া দেবীর নিকট শুম্ভনিশুম্ভকে বিবাহের প্রস্তাব করিল। শুনিয়া দেবী বলিলেন, হ্যাঁ, বিবাহ তো আমাকে করিতেই হইবে। তবে পুরাকাল হইতে আমার একটী প্রতিজ্ঞা ছিল, তাহা এই—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

—আমাকে যদি তাহারা জয় করিতে পারে, তবেই আমি তাহাদের বিবাহ করিতে পারি।

পরা প্রকৃতির নিকট হইতে জয় করিয়া জিনিয়া লইবার এই চ্যালেঞ্জ মানুষের কাছে সেই দিন হইতে ঘোষিত হইয়া আছে। রাজা প্রজাকে জয় করিয়া যেমন প্রজাকে পাইবে, প্রজাও রাজাকে জয় করিবে; ধনিক শ্রমিককে জয় করিবে—শ্রমিক ধনিককে জয় করিবে; নর নারীকে জয় করিবে—নারী নরকে জয় করিবে; সন্তান পিতামাতাকে জয় করিবে—পিতামাতা সন্তানকে জয় করিবে। বীর্য্যহীনের স্থান বিশ্বে কোথাও নাই। সে জয় করার কৌশল কি?—যোগ্যতার পরীক্ষা দেওয়া। মনুষ্যত্বের যোগ্যতার পরীক্ষা না দিয়া এ বিশ্বকে কেহ ভোগ করিতে পারিবে না। শুম্ভ নিশুম্ভ কামের দ্বারা দেবীকে ভোগ করিতে চাহিয়াছিল, যেমন আমরা চাহিয়া থাকি। কিন্তু কাম দ্বারা এ বিশ্ব ভোগ্য হইবে না—হইবে প্রেম দ্বারা। নবমী পূজা ব্যক্তিগত কাম জয়েরই সাধনা দিয়াছে। এইভাবে সুরথের রাজ্যলাভ ও সমাধি বৈশ্যের মুক্তি প্রত্যেকের জীবনে আস্বাদান করাই মহাপূজার উদ্দেশ্য।

ইহার পর বিজয়ার দিনে জীবনের সকল গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া আত্মার বিজয় ও দেহের বিজয় লাভ করিয়া বিজয়ার দিনে সার্থক আলিঙ্গন।

"জ্ঞানকৃত মিথ্যা: ভারতের কতিপয় বিশিষ্ট সংবাদ পত্রে শ্রীতেন্দুলকর লিখিত একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়াতে ভারতের মহাত্মা গান্ধীর পরিচয় হিসাবে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই অংশ বিশেষ শ্রীতেন্দুলকরের উক্ত পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার এনসাইক্লোপিডিয়া মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে এই তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

'গান্ধী হইলেন প্রতিক্রিয়াশীল গান্ধীবাদী নীতির প্রণেতা। যে বেনিয়া জাতি ব্যবসায় ও সুদের কারবার করিয়া থাকে, সেই বেনিয়া জাতির লোক হইলেন গান্ধী। বৃটিশ সৈন্য যখন জুলুদিগের দেশের উপর আক্রমণ চালাইয়া জুলুদিগকে আগুণে পুড়াইয়া এবং তরবারির আঘাতে ধ্বংস করিতেছিল, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিবার জন্য গান্ধী ভারতীয়-দিগকে লইয়া একটি স্বাস্থ্য-সেবক দল গঠন করিয়া বৃটিশ সৈন্যের সেবা করিয়াছিলেন।

'(ভারতের) জনসাধারণের আন্দোলন যখন বৈপ্লবিকরূপ গ্রহণ করিল, তখন গান্ধী জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। সাম্রাজ্যবাদীরা

ভারতীয় জনসাধারণকেই প্রধান শক্র বলিয়া চিনিয়াছিলেন এবং গান্ধীও দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সাম্রাজ্যবাদীকে সাহায্য করিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে গান্ধী সন্ন্যাসীর জীবনের বানর সুলভ অনুকরণ করিতেন ('aped the ascetics')। কথার কেরামতির দ্বারা তিনি এমন ভাব দেখাইতেন যে, তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার কতই না সমর্থক এবং বৃটিশের কত বড়ই না শক্র। ধর্মীয় কু-সংস্কারগুলির বিপুল সুযোগ গ্রহণ করাই গান্ধীবাদের রীতি। উচ্চ শ্রেণীর কাছে বিনাসর্তে নিম্নশ্রেণীকে দাসত্বে অবনমিত করিয়া রাখিবার যে হিন্দু সংস্কার প্রচলিত আছে, গান্ধীবাদ তাহারও সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের উচ্চজাত (caste) কর্তৃক নিম্নজাতের উপর আধিপত্য উপভোগের যে প্রথা বর্তমান রহিয়াছে, সেই প্রথার পরিবর্তন করার প্রয়াসকে একটী পাপ কর্ম বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়া থাকে। গান্ধীবাদ এই বিশ্বাসের সমর্থক। জগতের বৈষম্য ও উচ্চ জাতের আধিপত্যকে গান্ধীবাদে ভগবানের ইচ্ছানুমোদিত প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।'

'সোভিয়েট রুশিয়ার সত্যনিষ্ঠা অথবা জ্ঞানের মহিমা, ইহার মধ্যে কাহাকে অভিনন্দন জানাইব? অজ্ঞতা প্রসূত মিথ্যার অনেক দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অনেক গ্রন্থেই দেখা যায়। কিন্তু জ্ঞানকৃত মিথ্যাবাদিতার এইরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। সোভিয়েট রুশিয়ার জনসাধারণের মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার সরকারী উদ্যোগে যে গ্রেট এনসাইক্লোপিডিয়া রচিত হইয়াছে, তাহা যে রুশীয় জনসাধারণের চিন্তার ক্ষেত্রে নূতন এক 'অন্ধকারের যুগে'র মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিবার আয়োজন, পৃথিবীবাসী এক্ষণে ইহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে। রুশীয় জ্ঞানকোষের এই ধরণের কুৎসিত ব্যাধিদুষ্ট অবস্থা দেখিয়া পৃথিবীর জনসাধারণ শুধু দুঃখিত চিত্তে বেচারা রুশীয় জনসাধারণেরই দুর্ভাগ্যের ও ক্ষতির কথা চিন্তা করিবে। ক্ষতি হইতেছে রুশিয়ারই সাধারণ মানুষের মনের, হৃদয়ের ও বুদ্ধিবৃত্তির। ইহাতে ভারতবাসীর অথবা মহাত্মা গান্ধীর জীবন দ্বারা উদ্‌যাপিত সত্যের কোন ক্ষতি হইবেনা।

'দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু বিদ্রোহের সময় মহাত্মা গান্ধী যে অ্যাম্বুলেন্স দল গঠন করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল আহতের সেবা। আহত ব্রিটিশ সৈনিকের সেবা করাই এই সেবাদলের একমাত্র লক্ষ্য বা প্রধান লক্ষ্য ছিল না। শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসক এবং শ্বেতাঙ্গ নার্স আহত কৃষ্ণকায় জুলুকে

স্পর্শ করিতেও অস্বীকার করিয়াছিল। সেই কারণে ভারতীয় গান্ধী কৃষ্ণকায় জুলুর আহত শরীরে সেবার স্পর্শ দান করিবার জন্যই রণক্ষেত্রে স্ট্রেচার লইয়া ঘুরিয়াছিলেন। সেই গান্ধী সেই দিন ভগবান বুদ্ধের, ভারতেরই মহা করুণার নূতন প্রতীক রূপে আফ্রিকা মহাদেশের কৃষ্ণকায় সন্তানের ব্যথা ও বেদনাকে সেবকতার দ্বারা নিরাময় করিবার কর্ত্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'সোভিয়েটের জ্ঞানের অভিধান যে জ্ঞানকৃত মিথ্যারই আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ তাহা ভারতের গান্ধী সম্বন্ধে লিখিত সন্দর্ভেই প্রমাণিত হইতেছে। ভারত যাহাকে 'জাতির জনক' বলিয়া স্বীকার করিয়া ধন্য হইয়াছে, সোভিয়েট রুশিয়ার অভিধানকর্ত্তা সেই গান্ধীকে ভারতীয় জন সাধারণের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিলে ভারতের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু ভারতবাসী সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, ইহা ভারতীয় জাতির এক ঐতিহাসিক গৌরবের সাফল্যকর অধ্যায়কেই মিথ্যার দ্বারা বিকৃত করিবার প্রচেষ্টা। সত্যের প্রতি এই অশ্রদ্ধা সত্যের প্রতি ভয় হইতেই উদ্ভূত। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধানগণ তাহাদের জন সাধারণের মনকেই ভয় করিয়া থাকেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও নীতির প্রকৃত স্বরূপ, তাৎপর্য্য ও ইতিহাস জানিতে পারিলে সোভিয়েট রুশিয়ার জনসাধারণের মন হয়তো এক নূতন সূর্য্যের আলোক দেখিতে পাইবে। তাই সোভিয়েট বিদ্বানদিগের ভয়, তাই জ্ঞানগ্রন্থেও এই মিথ্যার অন্ধকার।

'আমরা এক পাগলের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। জানুয়ারী মাসের এক সন্ধ্যায় ঘরের ভিতর বসিয়া সেই পাগল শীতে কাঁপিতেছিল এবং শীতের উপর খুব চটিতেছিল। লেপ গায়ে জড়াইয়াও পাগলের গায়ের শীত কমিতেছিল না। পাগল হঠাৎ উঠিয়া দেওয়ালের এক ক্যালেণ্ডারের কয়েকটি মাসের পাতা ফর্ ফর্ করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়া এপ্রিল মাসের পাতাটির দিকে তাকাইয়া রহিল। পাগল এই ভাবেই গ্রীষ্মময় এপ্রিল মাসকে আনিয়া জানুয়ারীর শীতকে মিথ্যা করিয়া দিল। সত্যই সেই পাগল তাহার পর খালি-গা হইয়া গায়ে পাখার বাতাস দিতে আরম্ভ করিল, কারণ খুব গরম বোধ করিতেছিল সেই পাগল।

'ধন্য দি গ্রেট সোভিয়েট এন্‌সাইক্লোপিডিয়া!' এই অভিধানের রচয়িতারা সেই উন্মাদসুলভ বিশ্বাসেই বোধ হয় গায়ে পাখার বাতাস দিয়া দুশ্চিন্তার তাপ জুড়াইতেছেন। মনে করিতেছেন, সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হয়

লিখিলেই সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইবে। মনে করিতেছেন, মিথ্যার প্রচারণ দ্বারা সত্যকে মিথ্যা করা যায়।'—আনন্দবাজার, শুক্রবার, ২৮শে আশ্বিন ১৩৬১

যাহারা সমাজের সামগ্রিকতা বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাতে একান্ত পৃথক অসহিষ্ণু দুইটী শ্রেণী বিভাগ করিয়া, পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেপাইয়া, 'class war' সৃষ্টি করিয়া এবং বর্ত্তমান যুগে শ্রমিকদ্বারা ধনিকদের নিশ্চিহ্ন করাইয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার নেশায় ভরপুর, তাহাদের দ্বারা অসত্য ও হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, প্রথমেই ইহারা বিশ্ব সৃষ্টির জীবন-ধারাকে অস্বীকার করিয়াছে। দুইকে দুই রাখিয়া এক হইবার কথাই বিশ্বের অন্তর হইতে উচ্চারিত হইতেছে। দুই যেমন স্বয়ং-পূর্ণ দুই, তেমনি উহাদের মধ্যে দিব্য একাত্মতাও রহিয়াছে। দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ ঝগড়াও বটে, মিলনও বটে। কম্যুনিজম দ্বন্দ্বের অর্থ শুধু ঝগড়াই নিয়াছে। তাই ইহাদের হিংসা, এবং হিংসার পোষক মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই, ইহারা বিশ্বের সামগ্রিকতার সঙ্গেই সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। যাহারা একটি দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করিতে পারে, যাহারা মহামানবকে চিনিতে পারেনা, তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য সম্মান দিতে পারে না, তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মহাত্মাজী এমন একজন পুরুষ নন, যাহাকে রাশিয়াবাসীদের কাছ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াই আড়াল করা যায়। কেন এই ভীতি? কংস একদিন যে-কৃষ্ণ হইতে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। রাশিয়ায় বিপদও আসিবে ভারত হইতে, ভারতের মহাত্মা গান্ধী হইতে যিনি চিন্তার ও ভাবের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ধনিক-শ্রমিক মীমাংসার পথের খোঁজ দিয়াছেন এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী যাহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, আচার্য্য বিনোবাও যে পথের একনিষ্ঠ সাধক। ভারতের সাধনা জয়যুক্ত হইবেই। 'ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' ভারত ধীরে ধীরে সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছে। বন্দেমাতরম্

কর্মযোগ

রবীন্দ্রনাথ

........নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ যেমন মাৎলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে, তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায়, যাঁরা কর্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু, এই কথা মনে রাখতে হবে, নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করছে, তাই যদি না হত তা হলে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে—মানুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানা দিক থেকে দেখতে পাচ্ছে।

এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মত ভয়ংকর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের প্রয়াস। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাইরে আকার গ্রহণের উপলক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের আত্মাও অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলই কর্ম সৃষ্টি করছে।...কেননা, সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়।...এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্যকে, মঙ্গলকে, নিজের আত্মাকে নানাবিধ কর্মের ভিতরে কেবলই বন্ধনমুক্ত করে দিচ্ছে। যতই তাই করছে ততই আপনাকে মহৎ করে দেখতে পাচ্ছে—ততই তার আত্ম-পরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

‘এক-বিশ্ব’ রচনা ও তাহার সাধনা : ভাব-রস সমন্বয়

সম্পাদক

বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের সমন্বয় সাধিত না হইলে কখনও ‘এক-বিশ্ব’ (One-world) রচনা সম্ভবপর হইবে না। আজ এ-দেশে ও-দেশে এই ‘এক-বিশ্ব’ রচনার সর্ব্বাঙ্গীণ একটা প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষ এই ‘এক-বিশ্ব’ রচনার দর্শন লইয়াই আগাইয়া চলিয়াছে। আমরা এই দর্শন সম্বন্ধে শ্রীনিতাইগোপাল দর্শন ও জীবন আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে আলোচনা করিব। তিনি বিশ্বের বুকে এক-বিশ্ব রচনার উপযোগী এক দিব্য দর্শন ও জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই দর্শনের খোঁজ দিয়া গিয়াছেন কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রচিত ভাগবত-গ্রন্থে এবং সেই দর্শনেরই মূর্ত্তিমান্ দৃষ্টান্ত স্বরূপে বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করিয়াছেন ‘বাস্তবম্ অত্র বস্তু বেদ্যম্’ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বস্তুকে। তিনি ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছেন :

> ‘নিগম কল্পতরোর্গলিত ফলং
> শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্।
> পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
> মুহুরহো রসিকাঃ ভুবি ভাবুকাঃ ॥’

—বিশ্বের ভাবুক (Idealist) ও রসিক জনগণকে (Realist) আহ্বান করিয়া বলিতেছেন : ‘ওরে বিশ্বের ভাবুক ও রসিক দল, তোমরা মুক্তির পূর্ব্বে

ও পরে (আলয়ম্) ভাগবত রস বার বার পান কর। এই ভাগবত রস বেদরূপ কল্পতরুর শুকমুখ হইতে গলিত ফল ; এই ফল সমগ্র ভাবে বেদ হইতে গলিত হইতে হইতে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থিত হইয়াছে। ইহা হঠাৎ উপর হইতে পতিত হইয়া স্ফুটিত হয় নাই, সমগ্রতা নষ্ট করে নাই, ফুটিয়া যায় নাই। এই রসঘন ভাগবত-ফল বেদব্যাস-নন্দন শুকদেবের মুখ হইতে নির্গলিত হইয়াছে। শুকপক্ষী কোনও ফলকে ঠোক্‌রাইলে তাহা যেমন মধুর হয় বলিয়া প্রবাদবাক্য রহিয়াছে, এই ভাগবতফলও তেমনি শুকদেবের মুখোচ্চারিত বলিয়া আরও মধুর হইয়াছে। এই রস-ফল অমৃতদ্রব সংযুক্ত। এই ভাগবত 'ফলম্' (concrete) 'রসম্' (abstract)-এর সমন্বয়, আকার-নিরাকার সমন্বয়। সাধারণ রস মরণই আনয়ন করে ; কিন্তু আমি যে রস পরিবেশন করিতেছি, তাহা অমৃত রস, জরা মরণ-বিধ্বংসী রসায়ন, দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি অহঙ্কার ও আত্মার রসায়ন। 'রস' রস থাকিয়া কোন্ কৌশলে 'ভাবে'র সমন্বয়ে অমৃতায়িত হয়, তাহার দর্শন ও জীবন বেদান্তভাষ্য রূপ এই ভাগবত গ্রন্থে আমি বর্ণনা করিয়াছি। আমি এক-বিশ্ব রচনার ভিত্তি স্থাপন করিলাম, যে বিশ্বের ইষ্ট পুরুষোত্তম, এবং যোগ পুরুষোত্তম-যোগ।'

এক-বিশ্ব রচনা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে চাই বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের সমন্বয়। বহুধা-বিভক্ত বিশ্ব 'এক' হইতে পারে বিশ্বাতীতের সঙ্গে সমন্বিত হইয়াই, দুইয়ের অন্যোন্য-মৈথুনের (inter-penetration) ভিতর দিয়াই। কিন্তু কয়েক হাজার বৎসর হইতে আমরা বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে একান্ত পৃথক্ ধরিয়া লইয়াই চলিয়াছি। কোনও কোনও দার্শনিক বিশ্বকে মুখ্য স্থান দিয়া বিশ্বাতীতকে গৌণ স্থান দিয়াছেন, কিম্বা তাহাকে একদম অস্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোনও দল বা বিশ্বাতীতের তর্পণের জন্য বিশ্বকে বলি দিয়াছেন, বিশ্বাতীতকেই একমাত্র পরমার্থ সত্য বলিয়া তাহার জয় জয়কার দিয়াছেন। প্রথমোক্ত দল হইতেছে দেহাত্মবাদীর দল, যাহারা দেহকে—দেহের সুখভোগকেই চরম সত্য বলিয়া তাহার পিছনে ছুটিয়াছে ; 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ'। ইহারা রসের উপাসক। দ্বিতীয় দল অধ্যাত্মবাদী, যাহারা দেহ প্রাণ মন বুদ্ধির সকল বৃত্তিকে নিরোধ করিয়া, দেহের ক্ষেত্রকে সর্ব্বতোভাবে সঙ্কুচিত করিয়া, একান্ত অন্তর্ম্মুখী গতিতে দেহাতীত আত্মার উপাসনায় বিভোর। ইহারা ভাবের উপাসক, ভাবুক। রসের উপাসক বিশ্বকেই 'পরমার্থ' মনে করে ; ভাবের উপাসক বিশ্বাতীতকেই

পরমার্থ মনে করে। 'ভাব' ও 'রস' সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে পরস্পর বিরোধী দর্শনশাস্ত্রের স্থান ও মান সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা সম্ভব নয়। তাই এইবার তাহার সম্বন্ধে কিছুটা দিগ্‌দর্শন করিব।

'ভাব' ও 'রস একই সমগ্র বস্তুর পরস্পর-বিরোধী দুইটী দৃষ্টিকোণ মাত্র। এই দুই দৃষ্টিকোণে বিশ্বের প্রতিটী বস্তু, তত্ত্ব ও ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়। 'খাওয়া' একটী 'ঘটনা'; ইহাকেও ভাব ও রসের দৃষ্টিকোণে দেখা চলে। দেহরক্ষার জন্য যে 'খাওয়া', তাহা 'খাওয়া'র ভাবুকতা, তখন যে-কোনও যৎসামান্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারাই দেহরক্ষা করা যায়, কোনও বিলাসের স্থান এখানে নাই। কিন্তু যখন খাওয়ারই জন্য খাওয়া, যখন খাওয়ার জন্যই দেহধারণ, তখনকার 'খাওয়া'ই 'রস', তখনই জিহ্বার রসাস্বাদনের স্থান। এ সংসারে বাঁচিবার জন্যই 'খায়' ভিক্ষুক; কেহ বা খাইবার জন্যই বাঁচিতে চায়; 'খাইয়া' মরিতেও তাহাদের আপত্তি নাই। 'রসে'র জন্যও মানুষ মরিতে পারে; কেবল ভাবের জন্যই যে ব্যক্তিগত সত্তার বিলোপ-সাধন মানুষ চায় তাহা নয়। এই 'দেহ'কেও দুই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায়। যখন 'শরীর' শুধুই ধর্ম্মসাধন, তখন শরীর সম্বন্ধে মানুষ ভাবের সাধনা করে; কিন্তু মানুষ যখন শরীরের সুখের জন্য আত্মাকেও বলি দিতে পারে, শরীরের জন্যই শরীরের আদর করে, শরীর সম্বন্ধে তখনকার ব্যাখ্যাই রসিকের ব্যাখ্যা। 'মায়া' সম্বন্ধেও দুই রকমের ব্যাখ্যা সম্ভবপর। যখন ব্রহ্মের মূল্যে মায়ার মূল্য, মায়ার নিজস্ব মূল্য যখন স্বীকৃত ও আস্বাদিত না হয়, তখনই মায়াবাদের সৃষ্টি; মায়া সম্বন্ধে তখনকার ব্যাখ্যাই ভাবুকতা। কিন্তু ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ মায়ার মূল্য যখন স্বীকার করা হয়, যখন মায়ার মূল্যে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত মূল্যবান হন, তখনই মায়ার সম্বন্ধে রস-সাধনা সার্থক হয়। যখন জড়ের নিজস্ব কোন 'মান' নাই, অজড়ের মানেই জড়ের মান, তখন তাহা ভাবুকতা। যখন জড়ের নিজস্ব 'মান' স্বীকৃত হয়, এমন কি অজড় পর্য্যন্ত জড়ের মানে মানী হয়, তখনই তাহা হয় রসিকতা। যখন চৈতন্যের মর্য্যাদায় অচৈতন্যের মর্য্যাদা, তখন তাহা অচৈতন্য সম্বন্ধে ভাবুকতা; আবার অচৈতন্যের মর্য্যাদায় যখন চৈতন্য মর্য্যাদাযুক্ত, তখন অচৈতন্যের রসঘন প্রকাশই আস্বাদিত হয়। রসের দৃষ্টিকোণে 'অসৎ'-ই পরমার্থ সত্য, সৎ-ই ব্যবহারিক সত্য; ভাবের দৃষ্টিকোণে সৎ-ই পরমার্থ সত্য, 'অসৎ' শুধু ব্যবহারিক সত্তা মাত্র। ভাবের দৃষ্টিকোণে নাম মায়া, রূপ মায়া এবং অনাম অরূপই পরমার্থ সত্য;

পক্ষান্তরে রসের দৃষ্টিকোণে নাম সত্য রূপ সত্য। ভাবের দৃষ্টিকোণে নিবৃত্তিই কাম্য, প্রবৃত্তি সেখানে অশুচি ; রসের দৃষ্টিকোণে প্রবৃত্তিই কাম্য, নিবৃত্তির স্থান রসে নাই। ক্ষরের দাবী অসৎ-পদবাচ্য ; অক্ষরের দাবী সৎ-পদবাচ্য। অনাত্মার দাবী অসৎ, আত্মার দাবী সৎ। বিশ্বের যাবতীয় বস্তু, সত্তা, কর্ম্মকে এইভাবে তুইটী দৃষ্টিকোণেই আস্বাদন করা যায়। প্রত্যেকটিই বাস্তব জীবনে fact ; কোনও একটীকেও একান্তভাবে বর্জ্জন করা যায় না।

এক একটী দৃষ্টিকোণ আশ্রয়ে এক একটী মতবাদ ও সাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোনও মতবাদ বা সাধনা ভাব-প্রধান রস অবলম্বনে, কোনও মতবাদ ও সাধনা বা রসপ্রধান ভাবাশ্রয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। চার্ব্বাক মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে একান্ত দেহকে আশ্রয় করিয়া ; পাশ্চাত্যের মার্কস্‌বাদও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে জড়াশ্রয়ে অর্থাৎ রসাশ্রয়ে। ইহারা জড় হইতে চৈতন্যের বিবর্ত্তনের কথা বলে। শঙ্করমতবাদ ও হেগেলের মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ভাবাশ্রয়ে ; চৈতন্য হইতে তাহারা বিশ্বের ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছে। কিন্তু কেহই একান্তভাবে অপরকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। কোনও না কোনও রকমে ইহারা চাঁদসওদাগরের বাম হাত দিয়া মনসা পূজা করার মত কিম্বা 'surreptitiously (চোরের মত) অপরকে দিয়া কার্য্য হাসিল করিয়া লইয়াছে। ইহারা স্পষ্টতঃ অভিসন্ধিপূর্ণ। অদ্বৈতবাদও একান্তভাবে এই জগৎকে অস্বীকার করিতে পারে নাই ; কেননা তাহা হইলে অদ্বৈতবাদের ভিত্তিই ধ্বসিয়া যায়। জগৎটা পরমার্থতঃ সত্য না হউক, ব্যবহারিক ভাবেও তো সত্য। কিন্তু ব্যবহারিক জগতের 'ব্যবহার' দ্বারা যখনই পরমার্থ সিদ্ধ হইল, তখন এই মতবাদ 'কাজ ফুরাইলে পাজি'—এই নীতির অনুসরণ করিয়া ব্যবহারিক বিশ্বকে 'দূর ছাই' বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। যে নামরূপ সাধকের ঈপ্সিত বস্তু লাভের সহায়ক, তাহাকে অস্বীকার করিবার অকৃতজ্ঞতাদোষে প্রচলিত সর্ব্ব-মতবাদ ও সাধনা তুষ্ট। জড়বাদীরাও অজড়কে একান্ত ভাবে অস্বীকার করিতে পারে নাই ; কেননা, একান্ত জড়দ্বারা (matter) অজড়ের (spirit) ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু যেহেতু জড় অজড়কে সৃষ্টি করিয়াছে, যেহেতু জড় 'পূর্ব্বে', এবং অজড় 'পরে' সেই হেতু জড়ই মুখ্য এবং অজড়ই গৌণ—এই যুক্তি আজ অচল। আজিকার বিবর্ত্তনের স্তরে স্রষ্টা হইতে সৃষ্টি বড়। মানুষ প্রথমে তাহার সংবিধান (constitution) সৃষ্টি করে ; কিন্তু সংবিধান-সৃষ্টির পর স্রষ্টা মানুষকে তাহার সৃষ্ট সংবিধানকেই সামনে

রাখিয়া, মুখ্য স্থান দিয়া তাহার অনুগামী হইয়া চলিতে হয়। এই নীতি-অনুযায়ী ভাব হইতে রসের সৃষ্টি স্বীকৃত হইলেও ভাবকে রসের অধীন হইয়া চলিতে হয়ই; কিম্বা জীবনের কোনও ক্ষেত্রে রস হইতে ভাবের সৃষ্টি হইলে রসকেও ভাবের অনুগত হইতে হয়। একই অখণ্ডিত জীবনের কতগুলি ঘটনা চলে রসাশ্রয়ে, কতগুলি ভাবাশ্রয়ে। প্রতিটী ঘটনারই স্বয়ংমূল্য রহিয়াছে। জীবনে কোনও একটাই একমাত্র সত্য নয়। জীবনে 'সৎ' হইতে 'অসৎ'-এর উৎপত্তি 'ভাবে'র খেলা, পক্ষান্তরে 'অসৎ' হইতে 'সৎ'-এর উদ্ভব 'রসে'র খেলা। উপনিষৎ স্পষ্টই বলিয়াছেন: 'সৎ এব সৌম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ' এবং 'অসৎ বা সৌম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ'। জীবনের কতগুলি ঘটনা সৎ-আশ্রয়ে প্রকাশিত, কতগুলি ঘটনা অসৎ-আশ্রয়ে। অসৎ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় শ্রুতি শুনাইতেছেন—'অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সৎ অজায়ত। তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃত মুচ্যতে। যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হি এব অয়ং লব্ধানন্দী ভবতি'।

হে সৌম্য, অসৎই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন; তাহা হইতে সৎ জাত হইল। তখন অসৎ নিজেই নিজকে সৃষ্টি করিলেন। সেই হেতু তাহাকে 'সুকৃত' বলা হয়। যিনি সেই সুকৃত, তিনিই 'রস'। এই জীব রস লাভ করিয়াই আনন্দী হয়। জীবের ভাবুক 'আমি' যখন পুরুষোত্তম-জীবনের মাঝে নির্বাণ লাভ করে, অসৎ (negative) হয়, তখনই তাহা সব বিশেষত্বের (determinateness) foundation (ভিত্তিস্বরূপ) হয়—'Negation is the foundation if all determination'—Hegel. তখনই সেই 'অসৎ' হইতে 'সৎ'-এর সৃষ্টি সুরু হয়। সৎ হইতে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় অসৎ হইতে। বীজ যখন পচিয়া অসৎ হয়, তখন সেই অসৎ-বীজ হইতেই সৎ-অঙ্কুরের জন্ম। বীজ নিজে মরিয়াই নিজের মধ্য হইতে নিজকে সৃষ্টি করে; এই সৃষ্টিই সুকৃত। এই সুকৃতিরই পরিণাম 'রস'। এই রস লাভ করিয়াই মানুস রসিক হয়, রসানন্দে বিভোর হয়।

সৎ যোগায় জীবনের ভাব, অসৎ যোগায় জীবনের রস। সৎ পুষ্ট করে জীবনের অক্ষরত্বের দিক, অসৎ পুষ্ট করে ক্ষরের দিক। বুদ্ধের অবিদ্যা অর্থাৎ একত্ব-দৃষ্টি হইতেছে জীবনের 'ভাব', শঙ্করের অবিদ্যা অর্থাৎ বহুত্ব দৃষ্টি হইতেছে জীবনের 'রস'। জীবনের একান্ত একত্ব-দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যাত বুদ্ধের জগৎ যেমন মিথ্যা, একান্ত বহুত্ব দৃষ্টিকোণ

হইতে ব্যাখ্যাত শঙ্করের জগৎও তেমনি মিথ্যা। এই মিথ্যাত্বের জন্য দায়ী কোনও একটি দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যার একান্তত্ব। যদি সৎ ও অসৎ সমন্বিত হইত, ভাব ও রস সমন্বিত হইত, শঙ্করের অবিদ্যা যদি বুদ্ধের অবিদ্যার সঙ্গে সমন্বিত হইত, তবেই এই বিশ্ব ব্রহ্মের মত সত্য হইত, ব্রহ্মরূপে উদ্ভাসিত হইত, 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' মন্ত্রের সফল আস্বাদন লাভ হইত, আমরা আনন্দী হইতাম। পুরুষোত্তম জীবনই সৎ-অসৎ সমন্বিত, ভাব ও রস সমন্বিত। গীতা বলিয়াছেন, 'সৎ অসৎ চাহম্ অর্জ্জুন,—হে অর্জ্জুন, আমি সৎ ও অসৎ। পুরুষোত্তম সৎও নন, অসৎও নন ; ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে ; আবার তিনি সৎ ও অসৎ দুই-ই। ভাবুকের দৃষ্টিতে যাহা যাহা হেয়—মায়া, নাম ও রূপ, কর্ম্ম, এই বিশ্ব ও জীবন ধর্ম্মী সর্ব্বভূত, যা-কিছু ক্ষুদ্র—সবই আজ পুরুষোত্তম-জীবনে উপাদেয় ভাগবত অমৃত রসের ঘন আস্বাদন। ভাবুকের দৃষ্টিতে 'বৃহৎ'ই উপাদেয় ; রসের আস্বাদন সব ছোটদের লইয়া। যে নাম-রূপ-আকার ছিল ভাবুকের কাছে পরিণামধর্ম্মী বলিয়া একরূপ অস্পৃশ্য, তাহারাই আজ পুরুষোত্তম-জীবনে অনবদ্য নির্ম্মল। দেহ-দেহী ভেদ, নাম নামী ভেদ, রূপ-স্বরূপ ভেদ পুরুষোত্তম জীবনে নাই। 'দেহদেহি বিভেদোঽয়ম্ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ'। যে 'আকার' ছিল এতদিন প্রতীক, তাহাই পুরুষোত্তম স্তরে 'বিগ্রহ'।

> নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
> পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

—'নাম ও নামীর ভেদ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণই 'নাম' ; এই নাম চিন্তামণি, নামই চৈতন্যরসবিগ্রহ, নাম ব্রহ্মেরই মত পূর্ণ, শুদ্ধ, নাম নিত্য মুক্ত।' নাম ও নামী যেরূপে পুরুষোত্তম-জীবনে অভেদ, রূপ ও স্বরূপও তেমনি অভেদ।

> নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
> মানন্দমাত্রং অবিকল্পম্ অবিদ্ধবর্চ্চঃ।
> পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
> ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্তে উপাশ্রিতোঽস্মি॥ ভাগবত ৩।৯।৩

—'হে পরম, অনাবৃত-প্রকাশ, বিকল্পরহিত অতএব আনন্দমাত্র তোমার যে 'স্বরূপ', তোমার এই 'রূপ' হইতে তাহা পর নহে, ভিন্ন নহে বলিয়া দেখিতেছি, উপলব্ধি করিতেছি, এই কারণে তোমার বর্ত্তমান এই রূপেরই উপাশ্রিত হইতেছি। তোমার এই 'রূপ' উপাশ্রয়ের পক্ষে যোগ্য, কেননা এই রূপ

উপাস্য সমূহের মধ্যে এক অর্থাৎ মুখ্য। হে আত্মন্, এই 'রূপ' অবিশ্ব হইয়াও বিশ্বস্রষ্টা; তুমি বিশ্বস্রষ্টা হইয়াও বিশ্বাতীত। আরও বিশেষ কথা এই যে, তোমার এই 'রূপ' ভূত ও ইন্দ্রিয় সমূহের 'আত্মা'।

পুরুষোত্তম জীবনে রূপ ও স্বরূপ অভিন্ন, বিশ্ব-বিশ্বাতীত এক। বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের মাঝে যে শক্ত ব্যবধান ভাবুক ও রসিক গড়িয়া তুলিয়াছিল, আত্মসমর্পণময় পুরুষোত্তম-যোগে তাহা গলিয়া যায়। তখন এ-দেশ ও-দেশ একই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের দ্বিধা আস্বাদন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

'এদেশে ওদেশে বহুত অন্তর
জানয়ে সকল লোকে।
এদেশে ওদেশে মাখামাখি আছে
একথা কয়ো না কাকে॥'

এদেশ ও-দেশ যে মাখামাখি হইয়া রহিয়াছে, ইহা এতদিন বলিবার মত না হইলেও, যুক্তিযুক্ত বা বিশ্বাস যোগ্য না হইলেও আজ শ্রীনিত্যগোপাল প্রসাদাৎ তাহা বুঝিবার ও বিশ্বাস করিবার সুযোগ মিলিয়াছে। 'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। য ইহ নানেব পশ্যতি স মৃত্যোঃ মৃত্যুমাপ্নোতি—' যাহা এখানে, তাহা ওখানে; যাহা ওখানে, তাহা এখানে। এ-দেশ ও ও-দেশের মধ্যে নানাদর্শন, অসহ-দর্শন যে করে, সে মৃত্যু হইতেও মৃত্যু অর্থাৎ ক্লৈব্য লাভ করে। একান্ত এ দেশের উপাসনা অর্থাৎ দেহাত্মবাদ যেমন ক্লীবত্ব আনয়ন করে, একান্ত ও দেশের উপাসনা বা অধ্যাত্মবাদও মানুষকে ক্লীব করে; একান্ত এক-এর উপাসনা বা ভাবুকের উপাসনা যেমন মানুষের 'রস' শুষিয়া লয়, মানুষকে mechanical (যান্ত্রিক), hard (কঠিন) ও soulless (হৃদয়হীন) করে, তেমনি একান্ত বহু-র উপাসনাও মানুষকে effiminate (নিৰ্ব্বীৰ্য) ও inert (অকৰ্ম্মণ্য) করে! যাহারা জড় বা অজড়, মায়া বা ব্রহ্ম, ক্ষর বা অক্ষর, এক বা বহুর কোনও ব্লকেই যোগদান না করিয়া 'মধ্যম প্রাণের' পথ ধরিয়া চলিলেন, তাঁহারা দেহাত্মবাদী হইয়াও অধ্যাত্মবাদী, অধ্যাত্মবাদী হইয়াও দেহাত্মবাদী থাকিতে পারেন। দেহাত্মবাদ যোগায় তাঁহাদের জীবনে 'রস', অধ্যাত্মবাদ যোগায় জীবনের 'ভাব'। ব্রজে এই প্রাণসাধনা মূৰ্ত্ত হইয়াছিল আত্মনিবেদন-ময়ী গোপীবৃন্দের ভিতর, গোপীশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর ভিতর।

'নিজাঙ্গমপি যাঃ গোপ্যঃ মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেমভাজনম্ ॥'

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন: 'হে পার্থ, যে সব গোপী নিজের অঙ্গ পর্য্যন্ত 'আমার' (মম ইতি) বলিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ নিগূঢ় প্রেমভাজন আর কেহ নাই।' দেহ-আত্মার সমন্বিত দেহ-উপাসনা নিশ্চয়ই 'নিগূঢ়', কেননা এই উপাসনায় দেহই আত্মা, আত্মাই দেহ। কোষকারগণ তাই 'আত্মা' শব্দের অর্থ দেহও করিয়াছেন, যেমন দিয়াছেন তাহার ব্রহ্ম অর্থও। এই উপাসনা সার্থক করিবার জন্যই গোপী শিরোমণি শ্রীরাধা বলিতেছেন—

'এ কূলে ও কূলে দুকূলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায়' ॥

জীবননদীর দেহের কূলে আত্মার কূলে, জড়ের কূলে, অজড়ের কূলে চৈতন্যের কূলে অচৈতন্যের কূলে, মায়ার কূলে ব্রহ্মের কূলে, সন্ন্যাসের কূলে, সংসারের কূলে কাহাকে আপনার বলিব? প্রাণ শীতল করিতে হইলে জড় বা অজড়, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, বিশ্ব বা অবিশ্ব একান্ত কাহাকে দিয়াও তো তাহা সম্ভব হইবে না; তাই শীতল বলিয়া শরণাগতির পথে উপনিষদের 'মধ্যম প্রাণ' পুরুষোত্তমের দুটী পায় আশ্রয় নিলাম, যিনি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়। এই ব্রজরসাস্বাদনই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-রূপে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ। এত বড় বৈপ্লবিক আদর্শের অধিকারী এই বাঙ্গলা দেশ। ধন্য বাঙ্গালা! এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই আবার ৪৫০ বৎসর পরে শ্রীনিত্যগোপাল-রূপে রসরাজ মহাভাব-সমন্বয় দর্শন জীবনে আস্বাদন করিয়া বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল বিশ্ব-অবিশ্ব সমন্বয় মূর্ত্তি; তাঁহারই চরণ তলে বিশ্ব অবিশ্ব হইবে, অবিশ্ব বিশ্ব বনিয়া যাইবে, বিশ্ব অবিশ্বের ভেদবুদ্ধি গলিয়া গিয়া এক-বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে। তখন বিশ্বের সব ব্যক্তি, সব পরিবার, সব জাতি, সব রাষ্ট্র রসলীলায় হাত ধরাধরি করিয়া অন্তর-বাহিরের পুরুষোত্তমকে আস্বাদন করিবে) জীবনের আরোহ গতি (ascent) ও অবরোহ গতি (descent) পুরুষোত্তম-গতিতে পরিসমাপ্ত হইবে। সব আরোহ আজ অবরোহের রসে ভরপুর হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। আরোহ-গতি

ও অবরোহ-গতি দুই-ই মনেরই বিকল্প। উপরে উঠাও মনের বৃত্তি, নীচে নামাও মনের বৃত্তি, 'উপরে উঠার পর নীচে আসা' এক কল্পে সম্ভবপরই নয়। উপরে উঠিবার প্রক্রিয়ায় নীচের ও আশে পাশের সব বৃত্তি শুকাইয়া যায়; সেই শুকাইয়া যাওয়া মনোবৃত্তি উপরে উঠা বৃত্তিকে আর নীচে নামিতে দিবে না; পরন্তু বাধারই সৃষ্টি করিবে। উপরে উঠিয়া যদি বা কেহ নীচে নামিতেও পারেন, তবে নীচে নামিয়া আসিয়া তাহার যে-জড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার মিলিবে, তাহা কখনই 'বাস্তব জড়' হইবে না; উহা আদর্শ-প্রধান ভাবুকের জড় মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। তাই চাই প্রাণ সাধনা, যেখানে অন্তর ও বাহির, পূর্ব্ব ও অপর, ঊর্দ্ধ ও অধঃ সব গলিয়া গিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস স্তর উপনিষদের প্রাণের স্তরেই সার্থক, সেখানে মন ও অতিমানস সমন্বিত। উপনিষদে যাহা কিছু অতীত, তাহাই আবার অনুগ। প্রাণের স্তরে মনের সাধনা ও অতিমানসের আস্বাদন যুগপৎ চলিবে। আজ প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনেই মনের স্তর ছাড়িয়া এই দুনিয়া প্রাণের স্তরের জন্য পাড়ি জমাইয়াছে। এই প্রাণস্তরের দেবতাই পুরুষোত্তম প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকে ধরার ধূলিতে পরিবেদনা করিবার জন্য শ্রীনিত্যগোপাল প্রকট হইয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দের 'অতি মানস' এমন কি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তু পর্য্যন্ত আজ ধরার ধূলিতে পুরুষোত্তম-রূপে অবতীর্ণ, মূর্ত্ত। তাঁহাকে আর একান্ত আরোহ গতি অবলম্বনে খুঁজিতে হইবে না। তিনি আজ প্রকৃতির সহজ ক্রম বিবর্ত্তনের পথেই জড়ের বুকে অবতীর্ণ। 'মন্মনা ভব' 'ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়' ইত্যাদি বাণী অনুসরণে মনলয় ও বুদ্ধিলয় হইলে 'অতিমানস'কে আর মনের অতীতে খুঁজিতে হয় না; তখন অতিমানস মনের প্রতিটী যুযুৎসু বৃত্তির মধ্যে, যুগপজ্-জ্ঞানানুৎপত্তির মধ্যে, Either—or-এর মধ্যে যোগসূত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মনের ও অতিমানসের ভেদও মনঃকল্পিত। শ্রীনিত্যগোপাল প্রাণদর্শন ও জীবনের মধ্যে মানস-অতিমানসের সমন্বয় বিধান করিয়া এক অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য দর্শনের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন ও জীবনের ছাঁচে এই 'বিশ্ব' ভাগবত-বিশ্বে গড়িয়া উঠিবে। আমরা সেই বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হইব। বন্দেমাতরম্

বাঁচবার জন্যে

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীভারতী

এখানে অবশ্যই এই প্রশ্নটি আমাদের মনে জেগে উঠতে পারে যে, মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেককেই কি তার রুচি ও মনের গড়ন অনুযায়ী কাজে নিয়োগ করা সম্ভব? অনেকেই যদি বিশেষ বিশেষ কতকগুলো কাজকেই বেশী পছন্দ করে এবং অন্য কতকগুলো কাজে না এগোতে চায় তবে? মানুষের জীবনে খুশি ও প্রয়োজন দু'টি কথাই সমান মূল্যবান। খুশিটা যদি প্রয়োজনের সংগে মিলে যায় তবে তো খুবই ভাল, কিন্তু সব সময় তো তা নাও হতে পারে, কারণ কতকগুলো নীরস ও কঠিন কাজ অবশ্যই থেকে যাবে, যেগুলো না হলে দৈনন্দিন জীবনের অভাবগুলো মিটতে পারে না। এখানে শিক্ষা, অভ্যাস বা প্রস্তুতি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ঐসব কাজগুলোকে মানুষ প্রয়োজনীয় ভেবেই করতে ইচ্ছুক হবে। গোড়াতেই শিশুচরিত্র গঠনে এ দিকটাতে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন রয়েছে খুব বেশী। অবশ্য এসব শুকনো কাজের জন্য লোকসংখ্যা নিয়োগ করতে হবে খুব বেশী পরিমাণে আর কাজের সময় দিতে হবে খুবই কমিয়ে, যাতে ঐ কাজের পরেও খুশির কাজে মন দেবার মত যথেষ্ট অবসর সকলেই পেতে পারেন। যুগটা জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নততর শিখরে দাঁড়িয়ে, কাজেই এ যুগে মানুষকে দিয়ে যন্ত্রের মত খাটানো নিশ্চয়ই চলতে পারে না। সমস্ত রকমের জ্ঞানকে আয়ত্ত করবার ব্যবস্থা ও তাকে কাজে লাগানোর মত প্রচুর আয়োজন অবশ্যই চাই।

এর পরেই আমাদের মনে যে প্রশ্নটি জাগবে তা হল এই যে, মানুষ যদি দেখতে পায়, যে বেশী কাজ করে আর যে কম কাজ করে এই উভয় ব্যক্তিই প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সমানভাবেই পেয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি সকলেই কাজ কম করতেই চাইবে না? তাছাড়া সময় ও গুণগত পরিমাণ অনুযায়ী কাজের মূল্যের মধ্যেও যদি তারতম্য না থাকে, তবে মানুষের কাজের উৎসাহই বা আসবে কোন্ বস্তুর মাধ্যমে? কথাটা খুবই মূল্যবান; কিন্তু বর্তমান অবস্থা বা কুব্যবস্থাটার মোড় ঘোরাতে গেলে অথবা যথার্থ সমানাধিকারের

ভিত্তিকে গড়ে তুলতে হলে এ ছাড়া হয়ত আর উপায়ও নেই। তবে এখানেও কতকগুলো কথা ভেবে দেখবার মত রয়েছে। ব্যক্তির স্বাস্থ্য বা সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের সময়ের পরিমাণ তো একটা থাকবেই নিশ্চয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কাজ কাজই, সেটা ঘরেরই হোক আর বাইরেরই হোক। যেমন যে মেয়েরা ঘরে তার সন্তান পালনে বা অসুস্থ আত্মীয় জনের পরিচর্যায় সময় দেবেন আর যারা বাইরে শিশু-প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিম্বা হাসপাতালে বা অন্যত্র কাজ করবেন, তাদের সকলের কাজই সমমূল্যবান বলে স্বীকৃতি পাওয়া চাই। কারণ কাজটা তখন আর টাকার জন্যে না হয়ে মানুষের জন্যই হবে। আর ঠিক এই জন্যেই শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির কাজ ও কলকারখানায় দৈহিক শ্রম যারা করেন, চাষ বাসের কাজে যারা সময় দেন এবং এমনি আরো তথাকথিত 'ছোট কাজ' যারা করেন তাদের প্রত্যেকটি কাজকেও সমমূল্যই দিতে হবে, কারণ এক ধরণের কাজ বা কর্মী না থাকলে অন্য ধরণের কর্মীরও বেঁচে থাকা অসম্ভব। আমাদের কাজের মধ্যে এবং তার ফলে মানুষের মধ্যেও যে শ্রেণী ভেদের সৃষ্টি হয়েছে সেটাও তো অর্থেরই রকম ফের মাত্র। যে পরিমাণে টাকা খরচ করে যারা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পেরেছেন, সেই খরচের অঙ্কটা দিয়েই তাদের মান সম্ভ্রমের পরিমাণও তো কম বেশী স্থির হয়। নির্বিশেষ মানুষ হিসেবে সকলেরই জন্যে যথাযোগ্য শিক্ষা পাবার মত ব্যবস্থা যদি চালু হয়, তা হলেই দেখা যাবে ছোট বড়'র এই কৃত্রিম বিভাগটাও লোপ পেতে খুব বেশী সময় লাগছে না। তাছাড়া আজকের জগতে সমস্ত কাজকেই যখন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে উন্নীত করবার মত ব্যবস্থা রয়ে গেছে, তখন চেষ্টা করলে সবরকমের কাজকেই আভিজাত্যের স্তরে নিশ্চয়ই টেনে তোলা যায়। তারপর কাজে ফাঁকি দেবার বা কম কাজ করে বেশী পাবার বা নেবার ইচ্ছেটা যে কিছু সংখ্যক লোকের থাকবেই, এতে তো কোন সন্দেহই নেই, কারণ অপরিমিত কুব্যবস্থার ফলে সমাজজীবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, কর্তব্যবোধের অভাবজনিত ফাঁকিবাজি এবং সততা ও নিয়ম নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতাকে আমরা আয়ত্ত করে নিয়েছি, সেটা দু'দশ দিনের মধ্যেই মন্ত্রবলে শুধ্‌রে যাবে এমন অসম্ভব আশা না করাই ভাল। এ জন্যেই অন্ততঃ পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কিছুটা কঠোর ভাবেই সমস্ত কাজ বা কর্মীকে নিয়ন্ত্রিত করবার প্রয়োজন তো থাকবেই, আর সেজন্য

দক্ষ, কর্মঠ, সৎ ও হৃদয়বান পরিচালকদের প্রয়োজন থাকবে আরও অনেক বেশী। এর পরের কথা, মূল্যের মধ্যে পরিমাণগত তারতম্য যদি না থাকে তবে কাজের উৎসাহ আমাদের আসবে কোন্ পথে? আমরা সকলেই জানি যে, প্রশংসা ও সমর্থন জিনিষটা মানুষের জীবনে অত্যন্ত দামী, সমস্ত কাজের মূলে রস জোগায় ঐ বস্তুটিই। এর অভাবে শুধু অর্থ থাকলেও মানুষের গতিশক্তি স্তব্ধ হয়ে যাবার আশংকা থাকে। অর্থ দিয়ে বাহ্যিক সম্পদ যত খুশি কেনা যায় সত্য, কিন্তু মানুষের মন থেকে মনে শক্তিসঞ্চারের যে কাজটি নিঃশব্দে চলে, তাকে তো ওটা দিয়ে আয়ত্ত করা যায় না। কাজেই যোগ্যতার পরিমাণ সেদিন যদি মুদ্রা দিয়ে না হয়ে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রশংসা দিয়ে নিরূপিত হয় আর সকলের সামনে আদর্শ হিসেবে যদি তাদের তুলে ধরা হয়, তবে সেইটেই তো হবে তাদের কর্মের প্রকৃত ও যোগ্যতম সমাদর। এর ফলে অন্যেরা যেমন এঁদের সমমূল্য পেতে আগ্রহান্বিত হবেন তেমনি এঁরাও এতে যে শক্তি ও উৎসাহ অর্জন করবেন, তা হবে কোটিপতি লক্ষপতিদের চাইতে অনেকগুণে বড় ও অনেক বেশী কল্যাণজনক।

এখানে আরো একটা জিজ্ঞাসা আমাদের মনে জাগা স্বাভাবিক যে, দ্রব্য সামগ্রীর সমবণ্টন প্রণালী যখন আসবে তখন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে খাওয়া পরা ও ভোগ বিলাসের যে প্রকার ভেদ বা জীবন যাপন প্রণালীর যে অভ্যস্ত ধারা থেকে গিয়েছে, তার ওপরে কি একটা প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়বে না? প্রথমেই বলা হয়েছে এখানে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি শরীর ও মনকে সুস্থ ও সুগঠিত করে তোলা, কাজেই সেই শরীর ও মন যাতে একটা আকস্মিক ধাক্কায় অসুস্থ না হয়ে পড়ে, তার জন্যে অবশ্যই সব কিছু সইয়ে সইয়ে (অবশ্য যতটা পারা যায় ততটাই দ্রুততার সংগে) একটা স্বাস্থ্যসম্মত সাধারণ মানের কোঠায় এনে পৌছান দরকার। একদিকে দেশের সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী যেমন এই মান গড়ে উঠবে, অন্যদিকে আঞ্চলিক জলবায়ু ভেদে শরীর ও মনের গড়নের বিভিন্নতার দিকেও দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন থাকবে। দেহ ও মনের পক্ষে যা কিছু ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে তার জন্যে শ্রমস্বীকার করবার প্রয়োজন তখন আপনা থেকেই কমে যেতে বাধ্য হবে বলে প্রয়োজনীয় সম্পদ তৈরীতে শ্রম নিয়োজিত হবে তখন অনেক বেশী, তার ফলে সত্যি-কারের অভাবটাও খুব বেশী দিন কাউকেই ভোগ করতে হবে না। আর অভ্যাসও তো গড়ে ওঠে প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই। যেমন আজকের দিনে

যে রেশনিং প্রথা চালু হয়েছিল, আগেকার দিনে এ ধরণের ব্যবস্থার কথা কি কেউ কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলেন? তবুও তো এ ব্যবস্থাকে সইয়ে নিতে হয়েছে প্রয়োজন বা সকলের সম্মিলিত কল্যাণের জন্যেই। অবশ্য টাকার লোভ এতই বেশী যে চোরাবাজারের রাস্তাটি তার জন্যে খোলা রাখতেই হয়েছে, যার ফলে এ ব্যবস্থায়ও সুব্যবস্থা খুব বেশী আসবার পথ পায়নি। যাই হোক, নূতন ব্যবস্থার প্রাথমিক ধাপে কিছু সংখ্যক লোককে সামান্য কিছুটা কষ্ট হয়ত পেতে হতে পারে, কিছু সংখ্যক—কেননা পৃথিবীর বা দেশের বেশীর ভাগ লোকই এত বেশী অভাবগ্রস্ত যে, তাদের দিক থেকে আরো বেশী কষ্ট সইবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবুও আমরা ভয় পাই সত্যিই, কারণ চিরাচরিত পুরণো ধারাকে বর্জন করবার কথা ভাবা সব মানুষের পক্ষেই একটু অসুবিধেজনক তো বটেই। কিন্তু সেই বাধাকে সরিয়ে সাহসের সংগে একবার আরম্ভকে গ্রহণ করতে পারলে পরিণতির মঙ্গল সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না। কারণ সকলের সমবেত চিন্তা ও কাজ থেকে আমরা যে প্রচুর সামগ্রী এবং সুব্যবস্থাকে পাব তাতে সর্বদিক থেকেই প্রাচুর্যের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে আর সেই প্রাচুর্য সেদিন শুধু মুষ্টিমেয় লোকের করায়ত্ত হয়ে থাকবে না।

এখন এ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা, তার সম্বন্ধে একটু ভাবা যাক্। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বা দেশে জিনিষপত্র আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রানীতি যদি অচল হয়, তবে দেশের প্রয়োজন মিটবে কি করে? আজকের দিনে স্থানীয় সব কিছু দিয়েই তো আর সব রকমের চাহিদা পূর্ণ হয় না? কথাটা ভারী সত্যি, কিন্তু—।

আমরা আবহমান কাল থেকেই শুনে আসছি বানিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। কথাটা বহু পুরণো হলেও এ যুগেই বোধহয় এর মূল্য সবচেয়ে বেশী; এ যুগটাকে বৈশ্যযুগ বা বনিকযুগ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই বনিক বৃত্তির ফলটা যে কি দাঁড়িয়েছে তাও তো কারোরই অজানা নেই। আজকের দিনে 'লক্ষ্মী' কথাটাকেও তাই তার যথার্থ মূল্যেই বিচার করে নেবার প্রয়োজন নরনারী সকলেরই পক্ষে রয়েছে। জ্ঞান না থাকলে শ্রীকে আমরা পাই কোন্ পথে? বানিজ্যের এই তথাকথিত লক্ষ্মী বা মোটা টাকার অঙ্কের জন্য কিন্তু সরস্বতী বা শুভ্র সুন্দর জ্ঞানের দ্বারস্থ হবার খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। তাই যদি হত তবে ব্যবসা বানিজ্য দ্বারা নিজদেশ বা পরদেশ লুন্ঠনের যে প্রবৃত্তি বা

লোভ উগ্র হতে অত্যুগ্র হয়ে উঠছে, তার দেখা আমরা কখনই পেতামনা। বাণিজ্যে এই তথাকথিত লক্ষ্মীর সংগে জ্ঞানের বিবাদও তাই অনিবার্য বলেই প্রবাদবচনটিও অতিমাত্রায় সত্য। আদান প্রদানের প্রয়োজন মানুষের জীবনে চিরকালই আছে এবং থেকেও যাবে;° কিন্তু এই আদান প্রদান বা মানুষের চাহিদাকে কেন্দ্র করে যে কুৎসিৎ ও কদর্যতার নিম্নতমস্তরে মানুষের মনোবৃত্তি এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে রোধ করতে না পারলেও তো কারোরই মঙ্গল নেই; তাই মনে হয় এই কুশ্রীতা ও অকল্যাণের থেকে রেহাই পাবার জন্যে মুদ্রাঘটিত অতিলোভের কারবারটিই বন্ধ করে দেবার প্রয়োজনটাই যেন সবচেয়ে বেশী। অবশ্য কোনো একটা স্থান বা দেশে সীমাবদ্ধ রেখে এর পরীক্ষা চালানোর কথাটা ভাবা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কারণ প্রশ্নটা তো শুধুই আহরণেরই নয়, বিতরনেরও। যেমন ধরা যাক্ একটা গোটা দেশে এ ধরণের ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করাই গেল এবং তার ফলে প্রচুর স্বচ্ছলতা বা প্রাচুর্যকে আমরা পেলাম। কিন্তু সকলে মিলে যে প্রাচুর্য ভোগ করবার পরেও যদি বাড়্তি সম্পদ থেকে যায়, তবে তাকে নিয়ে কি করা যাবে? বিদেশে বাজার খুঁজতে না বেরিয়ে তখন উপায়টা কি আছে? দেখা গেছে অনুন্নত দেশগুলোকে নিয়ে কাড়াকাড়ির মূলে ঠিক এই কারণটাই বর্তমান রয়েছে। মনএ কি দেশের বা স্থানীয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোকে পর্যন্ত না মিটিয়েও এবং দেশকে যতদূর পারা যায় দরিদ্রতর করেও অর্থ লোভে জিনিষ বাইরে চলে যাচ্ছে আর বিদেশে ভাল বাজার না পেলে এবং দেশেও প্রচুর টাকা না পেলে সে সব জিনিষ নষ্ট করে ফেলতে পর্যন্ত কোথাও বাধছে না। প্রচুরতম দ্রব্য সম্ভার চোখের সামনে রেখেও যে কত মানুষ অভাবের জ্বালায় কি অসহ্য কষ্ট পেয়ে চলেছে, তার সঠিক হিসেব থাকলেও অবস্থাটা সকলেরই চোখের ওপরেই ঘটে চলেছে। অভাব কিছুরই নাকি নেই, অভাব শুধু ক্রয়ক্ষমতার। এ কথা বুঝে এবং জেনেও আমরা কিছু মাত্র লজ্জাবোধ পর্যন্ত করছি না। এর পরেও বণিকবৃত্তিকে সমর্থন করবার কোনো উপায় আছে কি? তাছাড়া জীবনে সব চাইতে ক্ষতিকর যে যুদ্ধ ব্যাপারটা, সেও এই মুনাফা লালসারই পরিণতি ছাড়া যে আর কিছুই নয় এও তো আজকের দিনে আর কারোরই অজানা নেই।

অবশ্য আমাদের এও মনে হতে পারে যে কেবল মাত্র নিজ নিজ দেশ বা দেশের মানুষদের কেন্দ্র করেই কি শুধু সমস্ত কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব?

অপর দেশের বা সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রতি কর্তব্য বলেও কি কিছু নেই? তাদের অভাব পুরণের চেষ্টা করাটাও তো মানুষেরই কাজ। অবশ্য সে কর্তব্য যদি লুণ্ঠন বা আধিপত্য বিস্তারের জন্য না হয়ে যথার্থই অভাব মোচনের জন্য বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে হয়, তবে সে কর্তব্যকে ঠেকাতে যাবে এমন মূঢ় কে আছে? দেশের বা মানুষের ভাগ বিভাগ গুলো তো কেবল মাত্র কতকগুলো অসুবিধে ও দুরত্বের জন্যই গড়ে উঠেছে, ভূমি ও জলবায়ুর তারতম্যে প্রকৃতিতেও খানিকটা বিভিন্নতা থাকেই অবশ্য, নইলে সাধারণ সুখ সুবিধা গুলিতো সকলেরই প্রায় এক। আবার এই জলবায়ু ও ভূমির প্রকৃতিভেদের জন্যই সব জায়গায় সব জিনিষ সমানভাবে পাওয়া যায় না এও জানা কথা; কাজেই যেখানে যে বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে তাকে আরো প্রচুর করে তুলে যেখানে অভাব রয়েছে তার পুরণের ব্যবস্থা করাটাই কি মনুষ্যোচিত ব্যবহার নয়? আদান প্রদানটা এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়েও তো চালানো যেতে পারে। একমাত্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের প্রতিনিধিরা ছাড়া আর কোনো পক্ষেরই এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবার কথা নয়।

অবশ্য শুধু মুদ্রাবিলুপ্তি বা মুদ্রাকে ক্রমশঃ কোণ ঠাশা করে কাজ ও দ্রব্যের সরাসরি বিনিময় প্রথাকে যদি আমরা গ্রহণ করি, তবেই যে দেশ একেবারে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়ে যাবে, বা আমরা একেবারে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাব তা নয়, তবে এই ব্যবস্থার ফল কি রাষ্ট্রিক কি সামাজিক কি পারিবারিক সর্বক্ষেত্রেই যে সুদূর প্রসারী হবে, এতে কোনো সন্দেহই নেই। কারণ অসাম্য যতই কমতে থাকবে বাইরে ও ভেতরে জীবন থেকে লড়াই বস্তুটাও সেই অনুপাতে কমে আসতে থাকবে। তাছাড়া এর ফলে প্রত্যেকটি মানুষেরই স্বাধীন সত্তা বা ব্যক্তিত্ব স্ফুরনের যে অবাধ সুযোগ আসবে, তার দ্বারাই তো দেশ যথার্থ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে।

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপরে নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, এই অন্ধ পাগলামির গতিরোধ না করতে পারে তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়ত লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়ত নামবার উপায় নেই, এবার উঠ্‌বার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। যারা বলেন শ্রমিকরাজ বা গণরাজ

প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁরাও বোধহয় একটু ভুল করেন, কারণ 'রাজ' কথাটাইতো ঊর্ধ্বলোকের কথা। রাজা থাকলেই প্রজামতন কিছু একটা থাকা চাই, কিন্তু কথা তো সেটা নয়। প্রকৃত সাম্যবাদের ভিত্তি যথার্থ সমানাধিকারের ওপরে গড়ে ওঠাটাই কাম্য। বহু বহু যুগের অনুসৃত ধারার ক্রমপরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে আজকের সমাজ যে রূপ নিয়েছে সেটা স্বয়ংক্রিয় না হলেও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের খুব সচেতন মনের অপরাধের ফল না-ও হতে পারে কিন্তু তবুও এ অবস্থার পরির্তন অবশ্যই এবং দ্রুতগতিতেই আসা খুবই বাঞ্ছনীয়। প্রতিশোধ স্পৃহার মধ্য দিয়ে নয়, সর্বমানবের যথার্থ কল্যাণকামনার ভেতর দিয়েই যেন আমরা সমাজের একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নূতন রূপকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। অবশ্য একথা খুবই সত্য যে স্বার্থের দাবী মানুষকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও উগ্র করে তুলতে পারে, তাই এ কাজে বাধা আসবে এবং সে বাধা নিশ্চয়ই খুব প্রচণ্ড; কিন্তু তবুও শুভ কাজে কল্যাণ কাজে যদি আমরা এগোতে পারি তবে কবি-বাণী অবশ্যই জয়যুক্ত হবে—

ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের ডরে।

'বিজ্ঞানের সাহায্যে স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি ও জীবনের উন্নতি সাধন সম্ভব। উন্নততর জীবনযাত্রার সুযোগের সন্ধান বিজ্ঞানই দিয়া থাকে। তথাপি বর্তমান কালের সঙ্কট যে আধ্যাত্মিক সে সম্পর্কে আমাদের যুগের দুঃখক্লিষ্ট জনগণ সুস্পষ্টরূপে সচেতন নহেন। আজ জড় শক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়া ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে এবং আত্মিক শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। আজ আমাদের সভ্যতার পুনরুজ্জীবন, আধ্যাত্মিক শক্তির পুনরভ্যুত্থান, জীবনের নূতন করিয়া মূল্য নির্ধারণ এবং জীবনের আধ্যাত্মিক উৎসের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া জীবনের নব রূপায়ণ বিশেষ প্রয়োজন। অন্তর ও বাহিরের মধ্যে যে বিরোধ, সেই বিরোধের অবসানে আজ পৌছিতে হইবে।' —রাধাকৃষ্ণণ (কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১শে অক্টোবর। আনন্দবাজার ৩রা নভেম্বর, '৫৪)

রুদ্র জেগেছে আজ !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

ধ্যানলীন উদাসীন ভোলানাথ মহেশের,
শান্তির ধ্যান বুঝি ভাঙ্‌লো !
রক্ত-আবির রঙে দিগন্ত নয়নের
উন্মীল দিঠি তাই রাঙ্‌লো !
অম্বরে ডম্বরু প্রচণ্ড রবে বাজে,
সিন্ধুর কল্লোল উত্তাল হ'য়ে সাজে,
ললাটের রোষানল, হ'ল ভীম উজ্জ্বল,
রুদ্রের রূপে শিব সাজ্‌লো !
ধ্যানলীন উদাসীন ভোলানাথ মহেশের
শান্তির ধ্যান বুঝি ভাঙ্‌লো !

*   *   *   *

মস্তক জটাজুট ক্ষুব্ধ ঝড়ের বেগে,
শূন্যের পানে অই ছুট্‌লো !
প্রলয়ের মহাভাস, ছেয়ে ফেলে মহাকাশ,
সৃষ্টির আশা আজ টুট্‌লো !
খুলে পড়ে বাঘ-ছাল, নাচে শিব মহাকাল,
নাচে থৈ তাতাথৈ, কি ভীষণ, কি ভয়াল !
কাঁপে ধরা থর থর, কাঁপে গিরি প্রান্তর,
দিকে দিকে হাহাকার উঠ্‌লো !
মস্তক-জটাজুট ক্ষুব্ধ ঝড়ের বেগে
শূন্যের পানে অই ছুট্‌লো !

মরণের কালো ছায়া, তিমিরের গাঢ় মায়া,
এক সাথে ধ'রি কায়া মিল্‌লো,
দিকে দিকে বিদ্যুৎ হানে যেন কশাঘাত,
আলোকের ক্ষীণ দ্যুতি নিভ্‌লো!
রুদ্র জেগেছে আজ, এত নহে শংকর,
এত নহে সদাশিব, নিত্য শুভংকর,
দুর্বার দুর্দম এযে মহাভৈরব,
ধ্বংসের রূপে রূপ মিশ্‌লো!
মরণের কালো ছায়া, তিমিরের গাঢ় মায়া,
এক সাথে ধরি কায়া মিল্‌লো!

'উপনিষৎ বলেছেন: কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুর রূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপুর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্বল মুহ্যমানভাবে বলেন না, জীবন দুঃখময় এবং কর্ম কেবলই বন্ধন। দুর্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলবার পুর্বেই খসে যায় তাঁরা তেমন নন। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়ছি নে। তাঁরা সংসারের মধ্যে, কর্মের মধ্যে, আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছে করেন।...মানুষের মধ্যে এই-যে জীবনের আনন্দ, এই-যে কর্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। এ কথা বলতে পারব না, এ আমাদের মোহ; এ কথা বলতে পারব না যে, একে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনই মঙ্গল নয়।'

—রবীন্দ্রনাথ

অনাথ আশ্রম

(ডাক্তার উইটেনের কাহিনী)

শ্রীজয়দেব রায়

৭১ বৎসরের বৃদ্ধ ডাক্তার জন উইটেন নিজে বিবাহও করেন নি, তাঁর সংসারে নিজের আত্মীয়স্বজন বল্‌তেও কেউই নেই। তাই বলে তিনি নিঃসঙ্গ ন'ন, ১৫২টি ছেলেমেয়েকে তিনি তাঁর পরিবারের লোক করে নিয়েছেন, তাদের হাসিগানে তাঁর গৃহ সর্বদাই ভরে থাকে। ভার্জিনিয়া প্রদেশের এক প্রান্তে বিরাট এক বাগান বাড়ীতে তিনি তাঁর বিরাট পরিবার নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছেন।

গত ৪৩ বৎসর ধরে ডাক্তার উইটেন নানাস্থান থেকে অনাথ ছেলে-মেয়েদের খুঁজে খুঁজে এনে বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন। অপত্য স্নেহে সেই সব নিঃসম্বল পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে মানুষ হয়ে উঠেছে, অনেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, তারা আবার অনেকে বিবাহাদি করেছে; ডাক্তার তাঁর নাতি-নাত্‌নীদের নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। শিশুদের কলরবে আজ ৪৩ বছর তাঁর বাড়ী সরগরম হয়ে রয়েছে।

প্রথমে যখন তিনি এই কল্যাণব্রত গ্রহণ করেন, হাতে তাঁর টাকা ছিল না। পৈতৃক সম্পত্তি বেচে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তিনি তাঁর আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর ডাকে ঐ অঞ্চলের জনগণও সাড়া দিল। একজন প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার বলে তাঁর নামও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌ল; প্রতিবেশীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতে লাগল।

ভালো কাজের নিয়মই তাই—প্রত্যেকেই মনে মনে সৎকাজ করতে চায়, কিন্তু সকলেই হাত লাগাতে পারে না। কেউ ভালো কাজ করতে সুরু করলে আর পাঁচজন সহানুভূতি দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল! ডাক্তার দেশের সর্বত্র থেকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেলেন। অনেকেই টাকা দান করতে লাগলেন। সকলেই বলত ডাক্তার নিজে পাদ্রী না হ'লেও তাঁর মতো ধর্মপ্রাণ যাজক আর কেউ নেই। নিজে সংসার করেন নি, কিন্তু 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' হয়ে রয়েছে।

তাঁর জীবনী সংগ্রহ করে জানা যায় উত্তর ট্যাজওয়েলে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর মা ছিলেন চির রুগ্না, তার উপর প্রতি বছরই তাঁর একটি না একটি সন্তান জন্মাতো। পরপর ছয়টি সন্তানের জন্ম দিয়ে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। ডাক্তারের বাবা ছিল অতি অসৎ চরিত্রের লোক, ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব তিনি এড়িয়ে গেলেন। ডাক্তার জন ও তাঁর ভাইবোনেরা পথে পথে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াতেন ; অযত্নে, অনাদরে তারা একে একে সবাই মারা পড়ল।

সৌভাগ্য ক্রমে এক সম্পন্ন ভদ্রলোক ডাক্তার জনকে আশ্রয় দিলেন, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় তিনি ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে উঠলেন। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পাশ করলেন।

হ্যারিয়েট নামে একটি মহিলাকে তিনি বিবাহ করতে চান ; কিন্তু মহিলাটি দরিদ্র জনকে পছন্দ না করে এক ধনী ব্যবসায়ীকে বরণ করলেন। ডাক্তার তারপর আর বিবাহ করেন নি।

এমনই দৈবের বিধান যে হ্যারিয়েট একটি শিশু পুত্র রেখে হঠাৎ মারা গেলেন। মৃত্যুর পুর্বে তিনি জনের হাতে তাঁর শিশুটির ভার দিয়ে গেলেন।

এইভাবেই ডাক্তারের অনাথ আশ্রমের সৃষ্টি হ'ল। তিনি হ্যারিয়েটের শিশুটিকে নিয়ে তাঁর পল্লী আবাসে এসে আশ্রয় নিলেন।

তারপর এক শীতের রাতে এক বিধবার মৃত্যুশয্যায় তাঁর ডাক পড়ল। বিধবা আসন্ন মৃত্যুর যন্ত্রণায় যতটা কাতর তার চেয়েও একমাত্র সন্তান শিশু পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে বেশি চিন্তিত। ডাক্তার মুমূর্ষুকে আশ্বস্ত করলেন— 'আমি আপনার ছেলের ভার নিলাম'।

অনাথ, রুগ্ন, নির্য্যাতিত, অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেমেয়ের দল দলে দলে শীতের রাতে ঠাণ্ডায় জমে রাস্তার ধারে মরে পড়ে থাকত ; কেউ বা খাদ্যাভাবে, কেউ বা রোগে ভুগে অকালে প্রাণ হারাতো। নগ্ন, বুভুক্ষু, মলিন, অনাথ শিশুর দল শুষ্ক মুখে খবর শুনে দলে দলে তাঁর আশ্রমের দ্বারে গিয়ে জমা হতে লাগল।

ভোরবেলায় বিছানা থেকে উঠে ডাক্তার সদর দরজা খুলেই দেখতেন তাঁর বাড়ীর সাম্নে তারা সারারাত ধরে ধর্না দিয়ে পড়ে আছে। তিনি তাদের সাদরে আশ্রয় দিতেন, তা'দের পোষাক দিতেন, খেতে দিতেন, শুষ্ক মলিন বিবর্ণ মুখে রক্তের লেশ জাগ্‌ত, হাসি ফুট্‌ত।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডাক্তার হয়ে পড়্‌লেন ঘোর সংসারী. তাঁর তখন অনেক কাজ, সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি পড়্‌লেন। টাকা রোজ্‌গার কর্‌তে হবে, অনেক টাকা; এতো বড়ো সংসার চালানোর খরচ তো কম নয়! তার উপর উদ্বেগ, অশান্তিরও আর অন্ত নেই—আজ এর পেট খারাপ, কাল ওর দাঁতের ব্যথা। তারপর আছে তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা, নিজেই তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা কর্‌তে লাগলেন।

ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে বড় হ'ল, স্কুল থেকে অনেকে কলেজে গেল। গত যুদ্ধে ডাক্তারের বিশটি ছেলেমেয়ে যুদ্ধে গিয়ে আর ফিরেনি।

তাঁর বাড়ীতে সমস্ত কাজ ছেলেমেয়েরাই করে, বাগান বাড়ীতে দুশো একর জমি তিনি সংগ্রহ করেছেন। সেখানে ছেলেমেয়েরাই ফসল ফলায়; গরু-মোষ, হাঁস-মুর্‌গি পালন করে, নিজেরাই পোষাক বানায়, সমস্ত কাজই তাদের নিজের হাতে কর্‌তে হয়।

আর ডাক্তারের পরিশ্রমেরও অন্ত নেই। এই বুড়ো বয়সেও নবীন যুবকের মতো তাঁকে সারা মুলুক ঘুরে অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে হয়। এখন অবশ্য তাঁর অনেক সঙ্গী জুটেছে, তাঁরই হাতে গড়া তাঁরই ছেলের দল এখন তাঁর অনেক কাজ করে দিচ্ছে। অনেকেই লেখা পড়া শিখে বাইরে চাক্‌রী কর্‌ছে, তাঁকে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে সাহায্য কর্‌ছে।

সকলে মিলে একটা বৃহৎ পরিবারের অংশ হয়ে সবাই বাস কর্‌ছে। মেয়েরা বড় হ'লে ডাক্তার তাদের বাইরে ভালো ভালো জায়গায় সৎ পাত্র দেখে বিবাহ দিয়েছেন। ডাক্তার সকলের পিতার গুরুতর কর্ত্তব্য কঠোর ভাবে পালন করে চলেছেন।

তাদের মঙ্গলামঙ্গলের দিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। কেউ অন্যায় কর্‌লে, খারাপ পথে গেলে সমস্ত পরিবারই তার জন্য দায়ী হয়ে থাকে। যেমন করে পারে সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে তাকে সৎ পথে নিয়ে আসে, তার ভালোর জন্য সবাই দিন রাত চিন্তা করে।

ডাক দিয়া গেল

শ্রীপ্রতিভা রায়

একশত বৎসর পুর্ব্বে এই ধরার মাটিতে সৌম্য সুন্দর করুণায় প্লাবিত হৃদয় লইয়া এক সোনার মানুষ আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া ডাক দিয়া গিয়াছেন যত ছোট, সমাজের যত পতিত, হেয় লাঞ্ছিত, শোষিত মানুষদিগকে। কত খোকা মালী, পাঁচু শেখ, কত মুচি জেলে, কত অস্পৃশ্য নরনারী, কত দরিদ্র মূর্খ এমন কি জারজ তারাপদ, চরিত্রহীন গোলাপ গোয়ালিনী প্রভৃতি কেহই সে দিন তাঁহার সেই করুণার প্লাবনে বাদ পড়িয়াছিল না। সেই সোণার মানুষটী শ্রীনিত্যগোপাল, যাঁর কথা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন 'নিত্য কি আর বেছেগুছে নেবে? সে যা পাবে তাই নেবে। আমি এসেছি তাজা গোবরে ঘুঁটে দিতে, নিত্য এসেছে পচা গোবরে ঘুঁটে দিতে'। শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন ছোটর মূল্য দিতে, ছোটর গৌরব স্থাপন করিতে। তিনি তাই শুধু নিজের ভুবন পাবন কোলেই সবাইকে টানিয়া লন নাই, দর্শনের ক্ষেত্রে তাহাদের অনন্তকালের জন্য গৌরবের স্থানও প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্ম স্থিতিধর্ম্মী, আর বিশ্বপ্রকৃতি গতিধর্ম্মী। স্থিতির সহিত গতির সমন্বয় বিধান করিতে না পারিয়া গতিকে তাঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানে তাই প্রকৃতি নাই। ব্রহ্ম-মায়ার এই দৃষ্টিতেই ভারতবর্ষের সমাজ গঠিত বলিয়া ইহা পুরুষতন্ত্র সমাজ। পুরুষ নিরপেক্ষ নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য এখানে তাই স্বীকৃত হয় নাই। নারী বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন, স্বাধীন সে কোন কালেই নহে, চির পরাধীন নারী, মুক্তি তাহার নাই। মুক্তি আকাঙ্ক্ষী পুরুষ তাই নারীকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, ব্রহ্মকে পাইতে হইলে প্রকৃতিকে যে ছাড়িতেই হইবে। এই স্থানে দাঁড়াইয়া নারী সমাজ জগতে এত হেয় এত নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নিজস্ব গৌরবপূর্ণ স্থান তাহাদের নাই। যদিও ভারতবর্ষে বহু মহীয়সী নারী ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, সে আদর্শের অভাব নাই। এই ভারতেই প্রাচীন যুগের অম্ভৃণ ঋষির কন্যা

বাক্‌দেবী ঋষি দ্রষ্ট্রী ছিলেন। তাঁহার অনুভূতির পরিচয় রহিয়াছে ঋগ্‌বেদের দেবী সুক্তে। তাঁহার আমিকে তিনি সর্ব্বব্যাপী করিয়া দেখিয়া ছিলেন, বিশ্ব চরাচর সবই তাঁহার আনন্দময় প্রকাশ, এই অনুভূতি তাঁহার জীবনে লাভ হইয়াছিল। এইরূপ গার্গী, সুলভা প্রভৃতি কত মহীয়সী নারী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্ম সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। এবং বৌদ্ধ যুগে বহু মহিলা নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে মীরা প্রভৃতি কত মহীয়সী নারী জ্ঞানে কর্ম্মে ত্যাগে ভক্তিতে আদর্শ স্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ভারতের নারী সমাজ গ্লানি মুক্ত হয় নাই। ইহার কারণ আদর্শস্থানীয়া মহীয়সী নারীগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে সার্থক হইয়াছেন মাত্র, সমাজ জীবনে তাঁহাদের জীবনাদর্শ কোন প্রতিক্রিয়াই আনিতে পারে নাই, যেহেতু সমাজ কাঠামো যে দর্শনের উপর গঠিত তাহা বদলানো হয় নাই। প্রকৃতি যেখানে মিথ্যা হেয় প্রতিপন্ন হইয়া রহিয়াছে সেখানের নারী সমাজ গ্লানিমুক্ত হইবে কি করিয়া ?

যুগস্রষ্টা শ্রীনিত্যগোপাল এই দর্শনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব আনিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য। ব্রহ্মেরই মত মায়া সত্য বলিয়া স্থিতি গতির সমন্বয় করিয়া তিনি স্থিতিশীল ব্রহ্মকে গতিশীলা প্রকৃতির সহিত সমকক্ষতা দান করিয়া যত ছোট হেয় লাঞ্ছিত, শোষিতদের এক গৌরবময় স্বাতন্ত্র্য স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন দর্শনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির গৌরব দান করিয়াছেন, তেমনি বর্ত্তমান যুগের দুঃখী, লাঞ্ছিত নারী সমাজেরও সুদীর্ঘকালের বন্ধ দরজা খুলিয়া দিয়া সাদর আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের দর্শন যাহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনার একান্ত প্রতিবন্ধক বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল, শ্রীনিত্যগোপাল ভারতের সেই দুঃখী পরিত্যজ্য নারী জাতির নিকট, নারী হিসাবে তাহাদেরও যে একটী নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, তাহারাও যে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী এই বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

.এ পর্য্যন্ত কোন সন্ন্যাসী কোন মঠে মেয়েদের স্থান দিতে সাহস পান নাই, পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার মঠে মেয়েদেরকে স্থান দিয়া তাহাদের দীর্ঘদিনের কলঙ্কের বোঝা অপসারিত করিয়াছেন। যে মঠ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে সাদর আহ্বান করিয়া তিনি কত বড় দুঃসাহসের কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা অনুধাবনের বিষয়। তিনি আদর্শ ও সঙ্ঘের

সমন্বয়ের কথা বলিয়াছেন এবং জীবনে সেই আচরণ করিয়া গিয়াছেন। যাহা কিছু ঘটনা, আবেষ্টন তাহাই তো প্রকৃতি। শ্রীনিত্যসুন্দর আমার নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ পুরুষ। যেমন মুহুর্মুহুঃ তিনি সমাধিস্থ হইয়া প্রচলিত দর্শনের মতে প্রকৃতির পরপারে চলিয়া যাইতেন, তেমনি তাঁহার চারিদিকে ছিল অনন্ত ঘটনার সমাবেশ। অবশ্য নিত্যগোপাল লিখিতেছেন—'সকল প্রকার অবস্থাই মায়িক। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমি আছি এ বোধও থাকে না, কিন্তু সে অবস্থাও মায়িক। সকল প্রকার সমাধি অবস্থাও মায়িক, নির্ব্বাণ প্রাপ্তিও মায়িক। যা কিছু হয়, যা কিছু ঘটে, তাহাই মায়িক। নির্ব্বাণও একটা ঘটনা, সুতরাং তাহাও অমায়িক বলা যায় না'। প্রকৃতিবল্লভ পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের চতুর্দ্দিকে ছিল ঘটনা রূপিনী প্রকৃতি। এই স্থানে একটা ঘটনার উল্লেখ করিব।

পরম দয়াল শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার নবদ্বীপস্থ আমপুলিয়া মঠে ভক্তগণ সঙ্গে অপূর্ব্ব লীলা রস আস্বাদনে বিভোর, এমন সময় একদিন এক অশীতিপর বৃদ্ধা আশ্রম দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরণে শত ছিন্ন একখানি বসন, সঙ্গে একটী ঘটী ও এক খানা থালা, কিছু মলিন বিছানা। এই মহিলা নবদ্বীপের দুয়ারে দুয়ারে একটু আশ্রয় প্রার্থী হইয়া ঘুরিয়াছে, কেহই তাহাকে আশ্রয় তো দেয়ই নাই, উপরন্তু ঘৃণা ভরে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অতীত জীবনকে স্মরণ করিয়া বৃদ্ধা মহিলা তাহার লাঞ্ছিত বিতাড়িত জীবনে গভীর নিরাশার ঘনীভূত অন্ধকার দেখিতে পাইল, সেই সময় অহৈতুকী করুণার আলো তাহার জীবনের সকল শূন্যতার মাঝে আসিয়া অবতরণ করিল। সে শুনিতে পাইল আমপুলিয়া মঠে করুণার অবতার শ্রীনিত্যগোপালের কথা। সেদিন তাই আশার আলো বহন করিয়া দীনশরণের চরণ তলে শরণাগত হইবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধা মহিলাটীর নাম 'ফুলির মা'। সে চরিত্রহীনা, যৌবনে বিলাস সাগরে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল, পরিণামের চিন্তা তো সে দিন করে নাই। যৌবন চলিয়া গিয়াছে, দেহ রোগজীর্ণ; কাল বহন করিয়া আনিয়াছে ভয়াবহ পরিণতি। সুবিধাবাদী বন্ধুগণ যে যার মত সরিয়া পড়িয়াছে, নিরাশ্রয়া বৃদ্ধা তাই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় নিত্যগোপালের দুয়ারে উপস্থিত। কিন্তু ভক্তগণ স্থান দিতে অনিচ্ছুক হইয়া আশ্রম দ্বার হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন—'এমন সময় কাঙ্গালশরণ, পতিতপাবন ঠাকুর করুণাবিগলিত হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত

হইলেন ; শত জননীর স্নেহ উৎস যেন উথলিয়া উঠিল। ফুলির মা এই দিব্য স্বর্ণ কান্তি গৌরবর্ণ শ্রীনিত্যগোপালের দিকে একদৃষ্টে ছল ছল নেত্রে চাহিয়া রহিল ; ভাবিল ঠাকুর কি আমায় আশ্রয় দিবেন ? আর্তিহারী শ্রীনিত্যগোপাল সস্নেহে তাহাকে আহ্বান করিয়া একটী ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া বলিলেন, "ফুলির মা ! যা ঐ ঘরে থাক্"। ঠাকুরের শ্রীমুখে এই স্নেহপূর্ণ মিষ্ট কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা ঠাকুরের চরণে লুটাইয়া পড়িল।' ঠাকুর তাহাকে আশ্রয় দিলেন। ঠাকুরের কৃপালাভের পর ফুলির মায়ের জড়াজীর্ণ দেহ আর বেশী দিন বহন করিতে হয় নাই, সে অসুস্থ হইয়া পড়িল। ঠাকুরের আশ্রিত সতীশ সেন প্রভৃতি ভক্তগণ তাহার ঔষধ পথ্য দেওয়া এবং মল-মূত্রাদি পরিষ্কার সমস্তই করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধার অন্তিম কাল আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীনিত্যগোপাল দর্শন করিতে করিতে বৃদ্ধা নিত্য ধামে গমন করিলেন। সতীশ সেনই তাঁহার শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ফুলির মার শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঠাকুর মহোৎসব দিয়াছিলেন।

এইরূপ শত শত ঘটনার সমাবেশ নিত্যগোপালের চলার পথে ছিল। প্রকৃতি যে সন্ন্যাসের ও ব্রহ্ম জ্ঞানের একান্ত ভাবে প্রতিবন্ধই নয়, সে যে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মজ্ঞানের রক্ষকও হইতে পারে, প্রকৃতির এই গৌরব তিনি বিশ্ব দরবারে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাছে প্রকৃতির স্থান কত উচ্চে। 'শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন, শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ নইলে শুধুই মদন'। বর্ত্তমান যুগে এই মদনমোহন তত্ত্বের পরিবেশক শ্রীনিত্যগোপাল। এতদিনের ব্রহ্ম মায়াকে ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল ব্রহ্ম, আর শ্রীনিত্যগোপাল মায়াকে হজম করিয়া যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

ডাক তিনি দিয়া গিয়াছেন, স্থানও তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই ডাক অন্তরে অন্তরে মানুষকে নাড়াও দিয়াছে, যার জন্য আজ হেয়, লাঞ্ছিত, অধিকার বঞ্চিত ছোটর দল, এবং চির অবহেলিত নারী সমাজ রাস্তায় বাহির হইয়া তাহাদের দাবী জানাইতেছে। কিন্তু তাহারা জানেনা, কে তাহাদের ডাক দিয়াছেন, কোন্ অধিকারে তাহাদেরকে অধিকারী হইতে হইবে, তাহারা ভিখারীর মত রাস্তায় দাঁড়াইয়া দাবী করিতেছে। যিনি তাহাদেরকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের দাবীতে ডাক দিয়াছেন, দীর্ঘ দিনের হেয়ত্বের কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া আজও তাহারা সেই পুরুষোত্তম

শ্রীনিত্যগোপালের দুয়ারে তাহাদের অধিকারের গৌরব লাভ করিতে পাগলের মত ছুটিয়া আসিল না; শ্রীনিত্যগোপালই যে বর্ত্তমান যুগের লাঞ্ছিত অবহেলিত নারী সমাজের একমাত্র বন্ধু ও আশ্রয়, এ কথা আজও তাহারা বুঝিতে পারে নাই।

নিত্যগোপাল, তুমি জীবনের প্রভাতে ডাক দিয়াছিলে, আজও তুমি ডাকিতেছ; তোমার ডাকের বিরাম নাই, তোমার মতন এমন করিয়া কেউ তো কাহাকেও ডাকে না, তবু ও তো তোমার ডাকে প্রাণ খুলিয়া সাড়া দিতে পারি নাই। তোমার ডাকের এ বার্ত্তা দুঃখী নারী সমাজের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবার দায় তো আমাদের উপরই তুমি দিয়াছিলে কিন্তু দিলে যে পাওয়া যায় না, পাইতে হইলে যে যোগ্য হইতে হয়। আমরা অযোগ্যা তাই তোমার ডাকের মর্য্যাদা দিতে পারি নাই। প্রকৃতির মর্য্যাদাদাত, প্রকৃতিবল্লভ শ্রীনিত্যগোপাল, আজ বড় প্রয়োজন তোমাকে দিয়া আমাদের। তোমার ডাক শুনিবার মত কান ও প্রাণ আমাদিগকে দান কর, তোমার সেবার যোগ্য কর, অধিকারী কর, তোমার শ্রীচরণ তলে নবীন বিশ্ব গড়িয়া উঠুক, বিশ্বের প্রাণে তুমি জয়যুক্ত হও।

"অসংখ্য লক্ষ লক্ষ লোক যাহাদিগকে আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলিয়াছি এবং প্রাণপণে ঘৃণা করিয়াছি; অসংখ্য লক্ষ লক্ষ প্রাণী যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা লোকাচারের মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাদিগকে আমরা মুখে বলিয়াছি সকলেই সমান—সকলেই সেই এক ব্রহ্ম—কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি নাই—'মনে মনে রাখলেই হল—ব্যবহারিক জগতে অদ্বৈতভাব লইয়া আসা—বাপরে'!—তোমাদের চরিত্রের এই দাগ মুছিয়া ফেল।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১২।১

(পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তে 'মৎকর্ম্ম কৃন্মৎ পরমঃ'—ইত্যাদি এবং 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' ইত্যাদি শ্লোকসমূহের দ্বারা যেমন ভক্তির গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ পাশাপাশি 'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ একভক্তির্বিশিষ্যতে' ইত্যাদি এবং 'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে অতম্' ইত্যাদি দ্বারা এবং 'সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি' ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞানেরও মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুই শ্রেষ্ঠের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠতর, এই বিশেষ জিজ্ঞাসার জন্য) অর্জ্জুন উবাচ [অর্জ্জুন বলিলেন] এবং [মৎকর্ম্ম কৃৎ শ্লোকের মধ্যে যে উপায় দেখান হইয়াছে, সেই উপায়াবলম্বনে] সততযুক্তাঃ [নিরন্তর ভগবৎ প্রীতির জন্য তদর্পিত কর্ম্ম সমূহে সর্ব্বদা নিরত থাকিয়া, অনন্যশরণ হইয়া] যে ভক্তাঃ [যে ভক্তগণ] ত্বাং [তোমাকে] পর্য্যুপাসতে [পরি+উপ+আসতে, সকল দৃষ্টিকোণের সমন্বয়ে বুকে বুক মিলাইয়া থাকে] যে চ অপি [এবং যাহারা] অক্ষরং [যথা বিশেষিত, সকল 'ন'-এর ঘন রূপ, অক্ষর ব্রহ্ম] অব্যক্তং [সকল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অতীত একের পর্য্যুপাসনা করেন] তেষাং [এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে] কে [কোন্ সম্প্রদায়ের লোকেরা] যোগবিত্তমাঃ [অতিশয় যোগবিৎ]।

অর্জ্জুন বলিলেন—এইরূপে যে ভক্তগণ নিরন্তর অনন্যপরায়ণ হইয়া তোমার উপাসনা করেন, আর যাহারা অব্যক্ত, অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই দুই প্রকার উপাসকদের মধ্যে কোন্ প্রকারের উপাসকরা যোগবিত্তম? ১২।১

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ১২।২

ময়ি [স্বকরূপ ও বিশ্বরূপের সমন্বয়মূর্ত্তি সহজ মানুষ আমাতে] আবেশ্য মনঃ [মনকে আবেশ করাইয়া, অর্থাৎ মনকে রাগদ্বেষ স্তর হইতে উর্দ্ধে পুরুষোত্তম স্তরে পুরুষোত্তমাবিষ্ট করিয়া] যে [যাহারা] মাং [আমাকে] নিত্যযুক্তাঃ [স্বরূপভূত আমাতে বিশ্বের আড়ালে নিত্যযুক্ত থাকিয়া] উপাসতে [উপাসনা করে, সেই নিত্যযুক্ততাকে প্রকৃতির বুকে চিহ্নিত করে, অঙ্কিত করে, রূপের ক্ষেত্রে ফুটাইয়া তোলে, জমাইয়া তোলে] শ্রদ্ধয়া পরয়া [নির্গুণা শ্রদ্ধা দ্বারা] উপেতাঃ [যুক্ত] তে [তাঁহারাই] যুক্ততমাঃ [সকল দৃষ্টিকোণ হইতে যুক্ত বলিয়াই যুক্ততম] মতাঃ [অভিমত ; কেননা এই স্তরে রূপ-যোগ ও স্বরূপ-যোগ দুই-ই সমন্বিত। নিত্যযুক্ততা ও উপাসনা আপাতঃ দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ হইলেও পুরুষোত্তমে অবিরুদ্ধ। পুরুষোত্তমে নিত্যযুক্ততার আস্বাদনই উপাসনা, সিদ্ধির আস্বাদনই সাধনা। এখানেই 'শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ'—বাক্য সার্থক।]

শ্রীভগবান বলিলেন—যে সকল নিত্যযুক্ত আমাতে মন আবেশিত করিয়া পরা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সকল দৃষ্টিকোণের সমন্বয়ে উপাসনা করে, তাহারাই আমার নিকট যুক্ততম বলিয়া অভিমত। ১২।২

> যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
> সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
> সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
> তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ১২।৩-৪

[তবে কি অন্য প্রকারের উপাসকগণ যুক্ততম নন ? না, তাহাও নয় ; তাহাদের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য বলিতেছেন] যে তু [যাহারা কিন্তু] অক্ষরম্ [যাহা ক্ষরিত হয় না, স্থিতিমূর্ত্তি] অনির্দ্দেশ্যম্ [যাহার কোনও কিছু নির্দ্দিষ্ট ভাবে ইন্দ্রিয়ের গোচর করা সম্ভব নয়, তিনিই অনির্দ্দেশ্য] অব্যক্তং [কোনও প্রমাণে যাহাকে ব্যক্ত করা যায় না, তিনিই অব্যক্ত] পর্য্যুপাসতে [সমন্তাৎ 'ন'-রূপে, অর্থাৎ তাহার মাঝে হারাইয়া যাইবার জন্য উপাসনা করেন ; 'উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রম্ উপাস্যস্য অর্থস্য বিষয়ীকরণেন সামীপ্যমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহেন দীর্ঘ কালং যদাসনং তদুপাসনমাচক্ষতে] সর্ব্বত্রগম্ [সর্ব্বভূতের ত্বগষ্ঠি ছাড়াইয়া তাহারই রসরূপে একরূপে গত (প্রাপ্ত)] অচিন্ত্যং [সকল চিন্তার নাগালের বাহির ; যেহেতু অব্যক্ত, সেই হেতুই অচিন্ত্য] কূটস্থং [দৃশ্যমানগুণ অথচ অন্তর্দোষ বস্তুই কূট, যেমন কূট সাক্ষ্য ;

কূটরূপ এই বিশ্ব বাহিরে চাকচিক্যময় হইলেও অন্তরে ইহা দোষপূর্ণ বলিয়া ইহাকে 'নেতি নেতি' প্রণালীতে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার বুকে অব্যক্ত রূপে, একান্ত স্থিতিশীল রূপে যাহাকে পাওয়া যায়, তিনিই কূটস্থ ; কূট অর্থ রাশিও হয়।· অতএব] অচলম্ [গতিবর্জ্জিত একান্ত স্থিতিঘন] (অতএব) ধ্রুবম্ [নিত্য], সংনিয়ম্য [সম্যক্‌রূপে সংহরণ করিয়া] ইন্দ্রিয়গ্রামং [ইন্দ্রিয় সমুদয়] সর্ব্বত্র [সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব বস্তুতে] সমদৃষ্টয়ঃ [ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সম (তুল্য) বুদ্ধি যাহাদের, তাহারাই সমবুদ্ধি ; এই 'সম' সুষুপ্তির 'সম'] তে [তাহারা] প্রাপ্নুবন্তি [পান] মাম্ এব [আমাকেই প্রকারান্তরে] (পুরুষোত্তমকে এইরূপে প্রকারান্তরে পাওয়ার কৌশলটী কি ?) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ [সর্ব্বভূতহিত রত ; পুরুষোত্তমের এক দৃষ্টিকোণ 'ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি,' অপর দৃষ্টিকোণ কূটস্থ 'অক্ষরঃ'। ক্ষর-অক্ষর সমন্বিত এই সহজ পুরুষোত্তমকে যদি কেহ সাক্ষাৎ ভজনা না করেন, তাঁহার শ্রীচরণ হইতে রওয়ানা না হন, যদি সমগ্র ভজনের বিকল্পরূপ ভজনেরই দ্বিধা বিভক্ত 'অক্ষর'কে এক প্রান্তে এবং 'সর্ব্বভূতহিত'-কে অপর প্রান্তে রাখিয়া যদি কেহ যাত্রা করেন, তবে তো প্রকারান্তরে পুরুষোত্তম ভজনেরই অনুরূপ সাধনা হইল। ক্ষর 'সর্ব্বভূত'-সেবা যোগায় পুরুষোত্তমের দেহ, অক্ষর 'পরমাত্মা' যোগায় পুরুষোত্তমের স্রষ্টৃত্ব ও ভর্ত্তৃত্ব। যাহারা প্রথমে ক্ষর-অক্ষর সমন্বিত পথে রওয়ানা হইবার সুযোগ পান তাঁহারাই ভক্ত। ভক্তগণকেও এই বিশ্লেষণ-রস ধীরে ধীরে আস্বাদন করিতে হইবে ; আর যাহারা ক্ষর-অক্ষরের বিশ্লেষণ ধারা ধরিয়া রওয়ানা হন, তাঁহারাই অক্ষরোপাসক। তাঁহারাও পুরুষোত্তমকেই পান ; কেননা যুগপৎ অক্ষর উপাসনা এবং সর্ব্বভূত-সেবা যদি চলিতে থাকে, (অবশ্য এইরূপ যুগপৎ সাধনা চলিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইবে দুইকে ভিন্ন ভিন্ন দেখার অবশ্যম্ভাবী ফল পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ) এবং যদি শ্রীগুরুচরণ হইতে যাত্রা আরম্ভ করা যায়, তবে দুই-ই দুইয়ের মধ্যে বিনিময়ধর্ম্মে মিলিত হইয়া এক অখণ্ড পুরুষোত্তমকেই সৃষ্টি করিবে। এই স্থলে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত যে, অক্ষর উপাসনা যদি সর্ব্বভূতহিত-রতি-যুক্ত না হয়, সাধনা যদি একান্ত অক্ষর উপাসনাই হয়, তবে আর 'মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি,' এই বাক্য শ্রীভগবান বলিতেন না]।

যাহারা সর্ব্বভূতহিতে রত, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-পরায়ণ, অথচ ইন্দ্রিয় সমূহকে সংহরণ করিয়া সেই সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্যরূপ, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব,

অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত ও অক্ষরকে উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতি র্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে। ১২।৫

[সাধনা আমার প্রদর্শিত পথে অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিলেই তবে আমাকে পাইবে বটে ; কিন্তু যে সাধনার আরম্ভ একান্ত অক্ষর হইতে, অক্ষর ও সর্ব্বভূতের ভেদ দর্শন হইতে, তাহার পরিণতিও যে ভেদ-দর্শনই হইবে, দুইয়ের অন্যোন্যমৈথুন জাত ফলস্বরূপ পুরুষোত্তম-আমি যে সেখানে না-ও ফুটিয়া উঠিতে পারে, কেননা এই পথ অনন্ত সজ্ঘর্ষময়, তাহাই বলিতেছেন] ক্লেশঃ অধিকতরঃ [অধিকতর ক্লেশ] তেষাং [তাহাদের] অব্যক্তাসক্তচেতসাং [অব্যক্তে আসক্ত হইয়াছে চিত্ত যাহাদের ; সেই সব অব্যক্তাসক্তচেতা পুরুষদের] ; হি [যেহেতু] অব্যক্তাঃ [অব্যক্তাত্মিকা] গতিঃ দুঃখং [বড় দুঃখে ; পক্ষান্তরে ভক্তির সাধনা 'কর্ত্তুম্ সুসুখম্'] দেহবদ্ভিঃ [ব্যক্তের ক্ষেত্রে দেহবান দ্বারা] আপ্যতে [প্রাপ্ত হয়] (দেহ ও আত্মা পুরুষোত্তমের মধ্যে নিরবদ্য সংযোগে যুক্ত ; সেই সহজ স্বতঃসিদ্ধ যোগকে বিয়োগের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পরস্পরকে বিযুক্ত করিয়া কৈবল্য লাভের জন্য প্রাণপণ করিলে জীবন রক্তারক্তিই হইবে। আপাততঃ (বাহিরের দৃষ্টিতে) তথাকথিত 'পর পদে'র মত একটা কিছু মিলিতেও পারে বটে, কিন্তু অত্যাচারিত সর্ব্বভূতের অন্তর্নিহিত গোপন বিদ্রোহ একদিন তাহাদিগকে 'পরপদ' হইতে টানিয়া অধঃপতিত করিবেই। 'তেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-মানিনঃ ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ অনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥' পুরুষোত্তমে রক্তের মূল্য, দেহের দাবী এবং ভাবের মূল্য ও আত্মার দাবী দুই-ই সমন্বিত। একান্ত অক্ষরের উপাসনায় ক্ষরের দিক হইতে অনন্ত বাধার সৃষ্টি হয়।)

সেই অব্যক্তে যাহাদের চিত্ত আসক্ত, তাহাদের ক্লেশ অধিকতর হইয়া থাকে ; কারণ দেহবানের দ্বারা অতি দুঃখে অব্যক্তাত্মিকা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২।৫

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম ॥ ১২।৬-৭

যে তু [যাহারা কিন্তু] সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি [সর্ব্ব কর্ম্ম] ময়ি [পুরুষোত্তম আমিতে] সংন্যস্য [সংন্যাস করিয়া] মৎপরাঃ ['আমি' পর যাহাদের, তাহারা মৎপর] (হইয়া) অনন্যেন এব যোগেন [অনন্য যোগ দ্বারাই] মাং ধ্যায়ন্তঃ [সকল দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দ্বারা ধ্যান করিতে করিতে] উপাসতে [আমার জীবনের কাছে আসন স্থাপন করে] তেষাং [মদুপাসনৈকপর তাহাদিগের] অহম্ [তাহাদেরই আমি-রূপ আমি ; 'উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্'] সমুদ্ধর্ত্তা [সম্যক্‌রূপে উদ্ধার কর্ত্তা অর্থাৎ উৎ (ঊর্দ্ধে) পুরুষোত্তম স্তরে হরণকারি] মৃত্যু সংসারসাগরাৎ [মৃত্যুযুক্ত সংসার মৃত্যুসংসার, মৃত্যু-সংসার রূপ সাগর হইতে] ভবামি [হই] ন চিরাৎ [অচিরাৎ] হে পার্থ, ময্যাবেশিতচেতসাম্ [আমি-পুরুষোত্তমে আবেশিত (প্রবেশিত ও সমাহিত) চিত্ত যাহাদের]।

যাহারা সকল কর্ম্ম আমাতে সংন্যাস করেন, মৎপর হইয়া অনন্য যোগ দ্বারা আমার ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি সেই সকল আমাতে সমাবেশিতচিত্ত ভক্তগণকে অচিরাৎ মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। ১২।৬-৭

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ১২।৮

(ভক্তির সাধনা যখন সর্ব্বতোভাবে উপযোগী, তখন) ময়ি এব [পুরুষোত্তম আমিতেই] মনঃ [রাগদ্বেষ স্তরের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক, যুগপৎ-জ্ঞানানুৎপত্তি লক্ষণরূপ মনকে] আধৎস্ব [আধান কর, স্থাপন কর] ময়ি [আমাতে] বুদ্ধিং [অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে] নিবেশয় [নিশ্চিত রূপে, নিশ্চিন্ত রূপে নিবিষ্ট কর] (তাহা হইলে তোমার যে অবস্থা লাভ হইবে শোন) নিবসিষ্যসি [নিবাস করিবে, আমারই বুকের মাঝে আমার আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত হইবে] ময়ি এব [আমাতেই] অতঃ ঊর্দ্ধং [এই রাগ দ্বেষের স্তরের ঊর্দ্ধে পুরুষোত্তম স্তরে ইহলোকে] ন সংশয়ঃ [ইহাতে সংশয় করিবার কিছু নাই]।

আমাতে মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশিত কর ; এই স্তরের ঊর্দ্ধে পুরুষোত্তম স্তরে ইহলোকে আমাতেই বাস করিবে, কোনও সন্দেহ নাই।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ১২।৯

অথ [আমার বুকের মাঝে এইরূপে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকার পর যদি] চিত্তং [দৃক্ দৃশ্যোপরক্ত সর্ব্বার্থ চিত্তকে] সমাধাতুং [সমাহিত রাখিতে, স্থাপিত করিতে] ন শক্নোষি [না পার; আর পারিবেও না জানি; কেননা তোমার বুকের মাঝে 'বিশেষে'র যে একটী খোঁচা রহিয়াছে, যাহার জন্য তোমাকে আমার সঙ্গে একান্ত 'সামান্য'ভাবে কৈবল্যের মধ্যে থাকিতেই দিবে না, তাহা তোমাকে লীলা রসাস্বাদনের মাঝে প্রকৃতির বুকে টানিয়া আনিয়া তোমার সর্ব্বভূতস্বভাবকে ফুটাইয়া জাগ্রত করিবেই করিবে, স্তরে স্তরে প্রকৃতির ক্ষেত্রে কেবল, কেবলতর হইয়া আত্মবান্ করিয়া তুলিবে, আমা হইতেও স্বতন্ত্র করিয়া দিবে] ময়ি [আমাতে] স্থিরং [অচলভাবে]; (তবে প্রকৃতির বুকে জাগরণের পর কি করিব?) অভ্যাসযোগেন [অভ্যাস-পূর্ব্বক যোগদ্বারা; অভি (অ-ভাগে) আসনম্ (থাকাই) অভ্যাস; 'চিত্তস্য একস্মিন্ আলম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃ পুনঃ স্থাপনং অভ্যাসঃ।' যে যোগে তুমি আমি অর্দ্ধ নারীশ্বরের মত 'আধা আধা তনু,' সেইরূপ যোগদ্বারা] ততঃ [তাহার পর] মাম্ [পুরুষোত্তম আমিকে জাগ্রতের ক্ষেত্রে] ইচ্ছাম [প্রার্থনা কর] আপ্তুং [পাইবার জন্য] হে ধনঞ্জয়; (মন বুদ্ধির উপরের স্তরে হয় ভজনের পথে প্রথম সাক্ষাৎ, সে সাক্ষাৎ সৎ-অসতের ওপারের সাক্ষাৎ, বিশ্বের সব আলো নিভিয়া যাইবার মাঝে সাক্ষাৎকার। সে অবস্থায় স্থিরভাবে কাহারও থাকিবার সম্ভাবনা নাই, কেননা, মন বুদ্ধির ক্ষেত্রের যে রসাস্বাদন ভক্তের অপূর্ণ রহিয়া গেল, তাহা তো তাহাকে পূর্ণভাবেই আস্বাদন করিতে হইবে। তাই তাহাকে মনের স্তরে আবার ভক্ত-ভগবানের যোগ নিদ্রা হইতে জাগিতে হয়। এই জাগরণের পর কি ভাবে ভেদের বুকে পাইতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন—অভ্যাসযোগদ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। এইখান হইতে প্রকৃতির বুকে ভক্ত-ভগবানের পাওয়ার ক্রমগুলি ভগবান্ চিহ্নিত করিয়া দিতেছেন। ভগবান simultaneity-র (যৌগপদ্যের) স্তর হইতে succession-এর (ক্রমিকতার) স্তরে নামাইয়া আনিয়াছেন]।

এই যোগনিদ্রা প্রাপ্তির পর যদি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাধান করিতে না পার, (আর পারিবেও না জানি) তবে হে ধনঞ্জয়, অভ্যাস-যোগদ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। ১২।৯

অভ্যাসেঽপ্য সমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১২।১০

অভ্যাসে অপি [আধা আধি আসনে স্থিত থাকিতেও যদি] অসমর্থঃ অসি [অসমর্থ হও, আর অসমর্থও হইবে; কেননা এখনও আমরা দুই জন ভাগাভাগি করিয়া আছি; 'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি'। এখনও তো আমি তোমার মাঝে হজম হই নাই, তুমিও আমাকে হজম করিয়া কেবল, আত্মবান হইতে পার নাই। আধা আধি আসনে স্থিত থাকিবার পথে বাধা জন্মাইবে দুইকে ভাঙ্গিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার আমার এক হওয়ার খোঁচা; তখন আমি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে তোমার ভিতর হজম হইয়া যাইব, তোমার ভিতর তোমার 'আমি' হইয়া যাইব; তবে না তুমি হইবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আত্মবান ?] মৎকর্ম্মপরমঃ [আমার কর্ম্মই পরম যাহার, এমনটী হও। তখন তুমি কর্ম্মের বুকে অদ্বৈতাস্বাদনের সুযোগ পাইবে; সেখানে আমি স্তরে স্তরে সরিয়া যাইতেছি, তুমি তোমাকেই ঘন করিয়া পাইবে। এইটী 'জ্ঞানে'র স্তর] ভব [হও] ('এই মৎকর্ম্ম-পরমতায়ও যদি তুমি 'স্থিত' দাঁড়াইতে না পার, আর পারিবেও না'—এই অংশ এখানে লুপ্ত আছে ধরিয়া লইতে হইবে। কেননা, 'মৎকর্ম্ম' এবং পরবর্ত্তী 'মদর্থং কর্ম্ম' এক স্তরের নয়। শ্রীভগবান্ অভ্যাস, জ্ঞান, ধ্যান ও কর্ম্মফল-ত্যাগ এই চারিটী স্তরের কথা পরে বলিবেন। 'মদর্থমপি কর্ম্মাণি'—এই অংশকে কর্ম্মের বুকে 'ধ্যানে'র সূচক না করিলে চারিটী স্তরও হয় না] মদর্থম্ অপি [আমার জন্যই] কর্ম্মাণি [কর্ম্ম সমূহ] কুর্ব্বন্ [করিয়া] সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি [লাভ করিবে, এই কর্ম্ম-ধ্যানের স্তরে ভগবান নিজকে কর্ম্ম-জ্ঞানের স্তরের তুলনায় আরও বেশী মুছিয়া ফেলিয়াছেন। 'আমার' কর্ম্ম (মৎ কর্ম্ম) ও 'আমার জন্য' কর্ম্ম (মদর্থং কর্ম্ম) সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। 'আমার কর্ম্ম' যেখানে, সেখানে কর্ম্ম বাছিয়া লইবার স্বতন্ত্রতা ভক্তের কোথায় ? তাহাকে ভগবানের কর্ম্মই করিতে হয়। কিন্তু 'ভগবানের জন্য' যে কর্ম্ম, সে কর্ম্মকে বাছিয়া লইবার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভক্তের, শুধু সেই কর্ম্মকে ভগবৎ সেবার জন্য করিতে হইবে। 'মদর্থ' কর্ম্ম করাই কর্ম্মের ধ্যান; এই ধ্যানে ভগবান ভক্তের মাঝে অধিকতর ভাবে আত্মবিলয় সাধন করেন]।

অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, আমার কর্ম্মই তোমার পরম হউক। (যদি তাহাও না পার) আমার জন্যই কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধি পাইবে। ১২।১০

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌॥ ১২।১১

অথ ['মদর্থ' কর্ম্ম করার পরও] এতৎ অপি [এই 'মদর্থ' কর্ম্ম] অশক্তঃ অসি [আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্থির হইতে অশক্ত হও] কর্ত্তুং [কর্ম্ম করিতে] মদ্‌যোগম্‌ আশ্রিত্য [আমার সঙ্গে কেবল যোগটুকু আশ্রয় করিয়া। 'মদর্থ' কর্ম্মেও তুমি স্থিত হইতে পারিবে না; কেননা, এখনও 'আমি'র গন্ধ রহিয়াছে। 'আমি'কে নিশ্চিহ্ন করিয়া, হজম করিয়া, 'আমি' ছাড়া অন্য কিছু নাই—এইরূপ বুদ্ধিতে তোমার নিজেরই পুরুষোত্তম-'আমি' বনিয়া নাস্তিক (ন অন্যৎ দ্বিতীয়ম্‌ অস্তি) না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার স্থিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমিও তোমার কাছে মুছিয়া গিয়া তোমার 'আমি' বনিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত, স্থিত হইতে চাই] সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগং (সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কৃত সর্ব্ব কর্ম্মের ফলের ত্যাগ) ততঃ [মদ্‌যোগকে আশ্রয় করার স্তর পরিত্যাগ করিয়া আরও অবতরণ করার পর] সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগং [সর্ব্ব কর্ম্মফল-ত্যাগ] কুরু [কর] যতাত্মবান্‌ [সংযত-দেহবান্‌, সংযত-ইন্দ্রিয়বান্‌, সংযত-মনস্বী, সংযত-বুদ্ধি, সংযত-বৃত্তি; কেবল হইয়াও ভক্ত লীলার মাঝে এইখানেই এতকাল পরে তাহার বলিতে যাহা কিছু ছিল, যাহাকে পাইবার জন্য সে কত ছুটাছুটিই না করিয়াছে, সেই সবটুকুই পাইল, আত্মবান হইল, জুড়াইল]।

যদি আমার যোগ আশ্রয় করিয়া ইহাও করিতে অশক্ত হও, তাহা হইলে যতাত্মবান হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগ কর। ১২।১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ স্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌॥ ১২।১২

(কর্ম্মের ক্ষেত্রে কর্ম্মফলকে দুনিয়ার ভোগের জন্য লুট বিলাইয়া দেওয়ার মধ্যে যে ভগবানের 'চরম পাওয়া', সর্ব্বশেষ পাওয়া রহিয়াছে তাহাই বলিতেছেন) শ্রেয়ঃ [প্রশস্যতম; এখানের 'শ্রেয়' অসমর্থের, দুর্ব্বলের শ্রেয় নয়, ইহা শক্তিমানের শ্রেয়। যাহারা এই শ্লোকগুলির এই রূপ অর্থ করেন যে, 'যদি আমাতে নিবাস পাওয়া রূপ উচ্চ অবস্থায় স্থিত হইবার সামর্থ্য না থাকে, তবে তাহার নীচের স্তর অর্থাৎ অভ্যাসের স্তরই শ্রেয়; যেমন কোন ছাত্রকে বলা হয় যে, প্রথম শ্রেণীতে যদি পড়া চালাইতে না পার, দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ', তাঁহারা এই শ্লোকগুলির সহজ সরল স্পষ্ট নিগূঢ় অর্থ দিতে পারেন নাই। সমাধিস্থ অবস্থাকে উঁচু করিয়া তুলিবার

ঐকান্তিক আগ্রহেরই ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু ভক্ত বুত্থান ও সমাধিকে তুল্য মূল্য প্রদান করেন। সমাধির পর বুত্থান, বুত্থানের পর সমাধি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। গীতা কর্ম্ম ক্ষেত্রের শাস্ত্র বলিয়া সমাধির তুলনায় অনন্তকাল প্রকৃতির ক্ষেত্রে আত্মবান হওয়াকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন। নিন্দার্থে 'শ্রেয়ঃ' শব্দের অর্থ করিলে শ্রেয়ঃ শব্দের বাচ্যার্থকেই আঘাত করা হয়। গৌরবার্থেই শ্রেয়ঃ শব্দের ব্যবহার মুখ্য। বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের মধ্যে নিজকে হারাইয়া, ভগবানময় হইয়া ভগবানকে পাওয়ার চেয়ে প্রকৃতির মাঝে, নিজ বৈশিষ্ট্যের মাঝে ভগবানকে হজম করিয়া পাওয়াই সকল পাওয়ার চরম পাওয়া। প্রকৃতির বুকে, নাম রূপ কর্ম্মের বুকে ভক্ত-ভগবানের অদ্বৈতসিদ্ধিই গুহ্যতম, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ] হি [নিশ্চয়ই] জ্ঞানম্ ['মৎকর্ম্মপরম' হওয়া-রূপ জ্ঞান] অভ্যাসাৎ [প্রকৃতির বুকে ভক্ত-ভগবানে আধা আধি আসনে স্থিত থাকা রূপ অভ্যাস হইতে] জ্ঞানাৎ [মৎ কর্ম্ম পরম হওয়া রূপ জ্ঞান হইতে] ধ্যানম্ [মদর্থং কর্ম্ম করা রূপ ধ্যান] বিশিষ্যতে [বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে] ধ্যানাৎ ['মদর্থং' কর্ম্ম করা রূপ ধ্যান হইতে] কর্ম্মফলত্যাগঃ [স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করা ও তাহার ফল লুট বিলাইয়া দেওয়া রূপ ত্যাগই সব চেয়ে শ্রেয়ঃ] ত্যাগাৎ [ত্যাগের পর] শান্তিঃ [বিশ্ব, ঈশ্বর ও তাহার শক্তিকে দ্বিতীয় বার গড়িয়া তুলিবার (re-create) পর বুক জুড়াইয়া যাওয়া রূপ অবস্থা] অনন্তরম্ [অনন্তর অর্থাৎ ত্যাগের সঙ্গে, লুট বিলাইয়া দেওয়ার সঙ্গে অন্তর না রাখিয়া ; ত্যাগের অন্তর বাহিরে যে শান্তি, তাহাই চরম অবস্থা]।

নিশ্চয়ই অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, অভ্যাস হইতে ধ্যানের বিশেষত্ব, ধ্যানের চেয়ে কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, ত্যাগের অনন্তর শান্তি লাভ হয়। ১২।১২

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনো বুদ্ধি র্যো মদভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১২।১৩-১৪

(জাগ্রতের ক্ষেত্রে, পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়া পচাগলা এই মাটীর জগতের বুকে ভগবৎপ্রসাদের হেতুভূত, আস্বাদনভূত ভক্তের ধর্ম্ম সমূহ বলিতেছেন) অদ্বেষ্টা [দ্বেষ্টা নন] সর্ব্বভূতানাং [ক্ষর সর্ব্বভূতের ; সর্ব্বভূতের দিক্ হইতে কোনও অনিবার্য্য বাধা সৃষ্টি হইলে, তাহাতে দ্বেষ না করিয়া, প্রতিকূল বুদ্ধিতে তাহার হাত হইতে বাঁচিবার ব্যর্থ প্রয়াস না করিয়া, পুরুষোত্তম-স্পর্শের ভিতর

সর্ব্ব ভূতের স্বয়ংমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া সর্ব্বভূতকেই আত্মা বলিয়া আস্বাদন করিয়া যিনি সেই বাধাকে হজম করেন, তিনিই অদ্বেষ্টা] মৈত্রঃ [পুরুষোত্তমাধীন ভক্তে মৈত্রীযুক্ত, ("মিত্রভাবঃ মৈত্রী মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ")], করুণঃ এব চ [দুঃখিতের প্রতি কৃপাপরবশ, সর্ব্বভূতে অভয়প্রদ] নির্ম্মমঃ ['মম'-প্রত্যয় বর্জ্জিত] নিরহঙ্কারঃ [নির্গত হইয়াছে অহংপ্রত্যয় যাহার, পুরুষোত্তম-আমিই যাহার আমি] সম দুঃখসুখঃ [সর্ব্বভূতের দুঃখ সুখই যাহার সুখদুঃখ, তিনিই সম দুঃখসুখ ; অথবা দুঃখ ও সুখকে সমভাবে জীবন বর্দ্ধক বলিয়া যাহার উপলব্ধ হইয়াছে] ক্ষমী [ক্ষমাশীল ; সকলের সব অক্ষমতাকে ক্ষমতায় গড়িয়া তুলিবার মত মনের সহিষ্ণুতাময় শক্তি বিশেষই ক্ষমা ; সকল অত্যাচারের সামনে চুপ করিয়া যাওয়াই ক্ষমা নয়, উহা ক্লৈব্যেরই নামান্তর মাত্র] সন্তুষ্টঃ [যাহা কিছু আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেই ভগবৎ করুণার পরিপূর্ণ দান মনে করিয়া, তাহাকেই সম্বল লইয়া সেখান হইতে সমগ্র জীবনের পথে, সর্ব্বভূত-জীবন যাপনের পথে যাত্রা করার তুষ্টিতা যাহার আছে তিনিই সন্তুষ্ট] সততং [সর্ব্বদা] যোগী [ভক্তি যোগে যুক্ত, সর্ব্বক্ষেত্রে যোগ্যতাযুক্ত] যতাত্মা [যত স্বভাব] দৃঢ়নিশ্চয়ঃ [দৃঢ়নিশ্চয় (অধ্যবসায়) যাহার] ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ [আমাতে অর্পিত হইয়াছে মন ও বুদ্ধি যাহার, যিনি মন্মনা ও মদ্বুদ্ধি হইয়াছেন] যঃ [এইরূপ যিনি] মদ্ভক্তঃ [আমার ভক্ত] সঃ [তিনি] মে [আমার] প্রিয়ঃ [প্রিয়; 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম্ অহং স চ মম প্রিয়ঃ']।

আমার যে ভক্ত সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, সকল প্রাণীতে যিনি মৈত্র এবং করুণও ; যিনি নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যিনি দুনিয়ার সঙ্গে সমান দুঃখসুখ ; ক্ষমাবান, যিনি সতত সন্তুষ্ট ও সর্ব্ব যোগ্যতা যুক্ত, যিনি যত স্বভাব, দৃঢ় যাহার অধ্যবসায়, আমাতে অর্পিত যাহার মন ও বুদ্ধি, তিনি আমার প্রিয়। ১২।১৩-১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৫

যস্মাৎ [যে ভক্তের নিকট হইতে] ন উদ্‌বিজতে [উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, সন্তপ্ত হয় না, সংক্ষুব্ধ হয় না] লোকঃ [ভুবন ; এখানে লোক অর্থ বিশেষ কোন 'জন' নহে, কেননা, ঈশ্বরপুত্র ভক্ত যীশু হইতে তাঁহার শত্রুগণ উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, জগাইমাধাই মহাপ্রভু হইতে উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, হজরত মহম্মদ হইতে উদ্বিগ্ন হইয়াছিল তাঁহার বিরুদ্ধাচরণকারীগণ ; তবে কি যীশু, মহাপ্রভু

শ্রীগৌরাঙ্গ, হজরত মহম্মদ ভক্ত নন ?] লোকাৎ [ভুবন হইতে] ন উদ্বিজতে চ [যাঁহার বিকাশ লোক হইতে ভীত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না] যঃ [যিনি], হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ [প্রিয়লাভে অন্তঃকরণের রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদি চিহ্ন যুক্ত উৎকর্ষই হর্ষ। হর্ষ, অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা), ভয় (ত্রাস) ও উদ্বেগ (উদ্বিগ্নতা) হইতে] মুক্তঃ যঃ [যিনি] স চ মে প্রিয়ঃ।

যাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগমুক্ত, তিনিও আমার প্রিয়। ১২।১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৬

অনপেক্ষঃ [নাই অপেক্ষা যাহার; অপেক্ষা করার প্রতি দ্বেষ যুক্ত হইয়া অপেক্ষার বিপরীত যে উপেক্ষা, তাহা অপেক্ষা করারই প্রচ্ছন্ন রূপ বলিয়া তাহাও তাঁহার নাই, তিনিই অনপেক্ষ। পুরুষোত্তম শিক্ষায় নিজের শিক্ষা মিলাইয়া সর্ব্বভূতের সকল অপেক্ষা ও উপেক্ষার অতীত হইয়া অনন্ত অপেক্ষায় ও অনন্ত উপেক্ষায় যিনি সর্ব্বভূতের সঙ্গে যুক্ত, তিনিই সত্য বাস্তব অনপেক্ষ। 'বৈষ্ণব হইয়া যে বা করে পরাপেক্ষা। কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা'। (অতএব) শুচিঃ [বাহিরে ও অন্তরে অপেক্ষা-করা রূপ অশুচিমুক্ত, সর্ব্বতোভাবে শৌচসম্পন্ন] (অতএব) দক্ষঃ [কুশল; সর্ব্বভূতস্তরের যে কোন জটিল ঘটনাই উপস্থিত হউক না কেন, তাহার সম্যক্ তত্ত্ব নির্ণয়ে তিনি দক্ষ] (যেহেতু) উদাসীন [উৎ, উর্দ্ধে পুরুষোত্তম স্তরে আসীন; কাজেই রাগদ্বেষের কোন কিছু লইয়াই তিনি অস্থির হন না, বরং যথাযথভাবে ঘটনা সমূহকে দেখিতে সুযোগ পান] (অতএব) গতব্যথঃ [গত হইয়াছে ঘটনাবলীর মাঝের সামঞ্জস্যসূত্র না দেখার মত বুকভরা ব্যথা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেই ব্যথার অভিব্যক্তি যাহার] সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী [সর্ব্ব আরম্ভ পরিত্যাগ করাই যাহার সহজ ভাব, যাহার সকল আরম্ভ পুরুষোত্তম হইতে তিনিই সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ভগবান নিজেই আরম্ভ করিয়াছেন। অর্জ্জুনকে শুধু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। যঃ [যিনি] মদ্ভক্তঃ [আমার ভক্ত] সঃ মে প্রিয়ঃ [তিনি আমার প্রিয়]।

অনপেক্ষ, শুচি, কুশল, উদাসীন, ব্যথাহীন ও সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী—এতাদৃশ যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। ১২।১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৭

(আরও) যঃ [যিনি] ন হৃষ্যতি [ইষ্ট প্রাপ্তিতে হর্ষে মাত্রা ছাড়াইয়া উন্মত্ত হন না] ন দ্বেষ্টি [আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিতে করিতে (ভুঞ্জানঃ এব আত্মকৃতং বিপাকম্) অনিষ্ট প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না] ন শোচতি [পুরুষোত্তম পথে চলিবার পক্ষে বিঘ্নকারক, মাত্রা ছাড়াইয়া শোক তিনি করেন না] ন কাঙ্ক্ষতি [আকাঙ্ক্ষা করেন না, পুরুষোত্তম-ভজনের সঙ্গে সম্বন্ধহীন কোনও কিছুর আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই] শুভাশুভপরিত্যাগী [শুভ ও অশুভ পরিত্যাগ করাই যাহার শীল, যাহা রাগদ্বেষ-স্তরের দৃষ্টিতে শুভ বা অশুভ, তাহা পুরুষোত্তম দৃষ্টিকোণ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতও হইতে পারে বলিয়া ভক্ত শুভ ও অশুভ দুইই পরিত্যাগ করেন। তিনি পুরুষোত্তম স্তরের দৃষ্টিতে শুভ ও অশুভ স্থির করেন।] ভক্তিমান্ [পুরুষোত্তমে ভক্তিযুক্ত] যঃ স সে প্রিয়ঃ।

যাহার হর্ষ বা দ্বেষ নাই, শোক বা আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি শুভাশুভপরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। ১২।১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনিঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১২।১৮-১৯

সমঃ [সমান সুযোগ দান করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে সত্তা চৈতন্য আনন্দ আস্বাদনের অনুকূল, সমান ও স্বাস্থ্যকর আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া স্থিত] শত্রৌ চ মিত্রে চ [শত্রু এবং মিত্র] তথা [সেইরূপ] মানাপমানয়োঃ [পুজা ও তিরস্কার; দুই-ই পুরুষোত্তম-পথচারীর পক্ষে সম আদরে বরণযোগ্য] শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু [শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ এইরূপ সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বের মাঝে] সমঃ [পক্ষপাতবিনির্ম্মুক্ত, সম দৃষ্টিযুক্ত] সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ [কোনও কিছুতে আটকাইয়া যাইয়া পথ চলার মাঝে বাধা জন্মাইবার মত সঙ্গবিবর্জ্জিত] তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ [তুল্য হইয়াছে নিন্দা স্তুতি যাহার কাছে] মৌনী [সংযত-বাক্] সন্তুষ্টঃ যেন কেনচিৎ [যাহা কিছু করুণাময়ী প্রকৃতির বিধানে উপস্থিত হয়, তাহা দ্বারাই সন্তুষ্ট; 'বিধিবৎ যৎ প্রাপ্যতাং তেন সন্তুষ্যতাম্'] অনিকেতঃ

[ব্রজের পথে দাঁড়ানো, ঘর ছাড়া] স্থিরমতিঃ [পুরুষোত্তমেই স্থির মতি যাহার] ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ নরঃ।

যিনি শত্রু ও মিত্রে সম, মান ও অপমানে সম, যিনি শীত ও উষ্ণে, সুখ দুঃখে সম, সঙ্গবর্জ্জিত, নিন্দাস্তুতি যাহার কাছে সম, যাহা-কিছু দ্বারা সন্তুষ্ট, ঘর-ছাড়া, স্থিরমতি, ভক্তিমান যিনি, সেই নরই প্রিয়। ১২।১৯

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতামিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ১২।২০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ভক্তিযোগনাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

(অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে ভক্তগণের যে সব ধর্ম্ম বলিতে শ্রীভগবান আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারই উপসংহার করিতেছেন) যে তু [যাহারা কিন্তু] ধর্ম্ম্যামৃতম্ [ধর্ম্ম হইতে অপেত নয়, তাহা ধর্ম্ম্য ; যাহা ধর্ম্ম এবং অমৃত, তাহাই ধর্ম্ম্যামৃত] ইদম্ যথোক্তং [অদ্বেষ্টা ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা এই যে সব উক্ত হইয়াছে] পর্য্যুপাসতে [সকল দিক দিয়া উপাসনা করেন। কেননা ধর্ম্ম ও ভগবান এক] শ্রদ্দধানাঃ [শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া] মৎপরমাঃ [পুরুষোত্তম আমিই যাহাদের পরম অর্থাৎ নিরতিশয় গতি, তাহারাই মৎপরম] ভক্তাঃ [ভক্তগণ] তে [তাহারা] অতীব [অত্যন্ত] মে প্রিয়াঃ।

মদেকপরায়ণ যে সব শ্রদ্ধাবান্ ভক্তগণ যথোক্ত এই ধর্ম্ম্যামৃত উপাসনা করেন, তাঁহারা আমার অতীব প্রিয়। ১২।২০

দ্বাদশাধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত

(ক্রমশঃ)

ছোটদের গ্রন্থাগার

শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য গ্রন্থাগারের প্রচলন আমাদের দেশে খুবই কম। কিন্তু পশ্চিমে ও সকল সভ্য দেশে ইহার প্রচলন সমধিক। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, তাহাদের গড়িয়া তুলিবার জন্যে গোড়া হইতেই যে চেষ্টা অন্য দেশে হয় তাহা সত্যই অদ্ভুত। সমগ্রভাবে এই যে চেষ্টা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে করা হয় তাহার তুলনা হয় না। আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের ঠিক্ ঠিক্ ভাবে গড়িয়া তুলিবার কোন প্রচেষ্টাই নাই। ও দেশের তুলনায় আমাদের ছেলে মেয়েরা হেলায় ফেলায় মানুষ হয়—খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ছেলে মেয়েদের জ্ঞানের আগ্রহ বাড়াইবার ও তাহা মিটাইবার জন্য কোন সুষ্ঠু উপায় বা পন্থা আমরা নিয়াছি।

হয়তো বা দুই পাঁচ জন পিতামাতা যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল তাঁহারা নিজেদের মত এভাবে কিছু চিন্তা করেন ও তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য সুচিন্তিত বই-এর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমগ্রভাবে কোন প্রচেষ্টাই আমাদের দেশে নাই। বিদেশে সচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহার বিষয়েই এখানে অল্প কথায় খানিকটা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। এবং আশা করিব যে আমাদের দেশের জনসাধারণ তথা গ্রন্থাগারিকরা ইহা হইতে খানিকটা নিজেদের কর্মপন্থা সম্বন্ধে নির্দেশ পাইবেন।

ও সব দেশে বড়দের গ্রন্থাগারের মতনই ছোটদেরও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সেবা করিবার একটি বিশেষ আগ্রহ ও ব্যবস্থা আছে। প্রথম প্রথম বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারেই বড়দের পুস্তক সংগ্রহের ভিতরেই, ছোটদের জন্য কয়েকটি শেলফ্ বই আলাদা রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। কোথাও কোথাও যথা ম্যাঞ্চেষ্টারে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দেও ছোটদের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা ছিল। ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার প্রচলন বাড়িতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে প্রায় সর্বত্রই ছোটদের জন্য আলাদা ঘর ও বাড়ীতে পড়ার বই ধার দিবার ব্যবস্থা ছাড়াও, রেফারেন্স বই-এর সংগ্রহ ও গ্রন্থাগারে বসিয়া পড়ার আলাদা ব্যবস্থার প্রচলন হইতে আরম্ভ হয়।

অনেক জায়গায় উপযুক্ত অর্থের অভাবে ভাল ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়া উঠিত না। কিন্তু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের গ্রন্থাগার পরিষদ ছোটদের গ্রন্থাগার

ও তাহার সুচারু কর্মপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লহেন। সব গ্রন্থাগারের সেবার মূলে থাকিবে শিশুদের বই পড়াইবার ও জ্ঞানের চাহিদা মিটাইবার ভাল ব্যবস্থা—এই নীতি সব গ্রন্থাগারের পক্ষেই প্রযোজ্য বলিয়া স্থির করা হয়। ১৯১৯ সালে গ্রন্থাগার আইনের অদলবদল হইলে পর 'পেনী রেট ব্যবস্থা' রদ হইলে গ্রন্থাগার আর কিছু বাড়াইবার পথ হয়। এবং তাহার পর হইতেই প্রায় দেশের সর্বত্রই ছোটদের গ্রন্থাগারের প্রচলন হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে নিজের নিজের অবস্থা অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার—প্রদেশ গ্রন্থাগার—জেলগ্রন্থাগারের ও পৌর গ্রন্থাগারের অধীনে সব শাখা প্রশাখা ও কেন্দ্রেই ছোটদের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা চালু হয়। কোথাও বা ইহাকে বলা হইত 'চিলড্রেনস্ লাইব্রেরী', কোথাও বলা হইত 'জুনিয়ার লাইব্রেরী', কোথাও বা 'ইয়ং পিপিল্স রুম্', কোথাও বা 'জুভিনায়েল ডিপার্টমেণ্ট।'

ছোটদের গ্রন্থাগারের ঘরটি সচরাচর ভাল হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ভাল ঘরের ব্যবস্থা অপেক্ষা প্রথম ব্যবস্থা হইল ভাল বই জোগান। প্রথমটি সব জায়গায় সব সময়ে সম্ভব না হইলেও দ্বিতীয়টি যাহাতে ঠিক ভাবে হয় সেই দিকে সব গ্রন্থাগারিকই নজর দিতে লাগিলেন। অনেক সময় ভাল বড় ঘরের ব্যবস্থা না হইলেও ছোট ঘরেই কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়—তবে যে ঘরে ছোট ছেলে মেয়েরা আসিয়া পড়িবে সে ঘরটি যতটা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আলো হাওয়া ও শীতপ্রধান দেশের ব্যবস্থানুযায়ী যাহাতে বেশ গরম থাকে তাহার ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া হইত। দিনের আলো বা কৃত্রিম আলো বা ইলেকট্রিক আলোর ভাল ব্যবস্থার দিকে নজর প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকই রাখিতেন। শিশুদের গ্রন্থাগারে আসা যাওয়ার পথে যাহাতে অনেক সিঁড়ি না থাকে, যাহাতে অনেক সময় উঠা নামার বেলায় ছেলে মেয়েরা পড়িয়া যাইতে না পারে—সেই দিকেতে দৃষ্টি রাখা হইত। সব গ্রন্থাগারেরই রিডিং রুমে বা গ্রন্থাগার কক্ষে বড়দের অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—ছিম্ ছাম্ ও ডেকরেটেড্, ছবি ও রং-এর পরিবেশে সুন্দর একটি আনন্দদায়ক আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা আছে। সাদা দেওয়ালের পরিবর্তে ভাল ভাল ছবি টাঙ্গান, ফুল ও রঙ্গীন কিছু রাখা যাহাতে ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট ও প্রফুল্ল হয়, সেদিকে নজর দেওয়া হইত। জানালাতে পর্দার প্রচলন ওদেশে খুব সাধারণ। অনেক সময় ঘরে সিনেমা বা অনুরূপ কিছু দেখাইবার প্রয়োজন হইলে জানালায় পর্দার বিশেষ প্রয়োজন যাহাতে অনায়াসে ঘর অন্ধকার করা যায়।

বড়দের গ্রন্থাগারেও যাহা যাহা ব্যবস্থা থাকে ছোটদের বেলাতেও কম বেশী সেই সব ব্যবস্থা করা হয়। গ্রন্থাগারিককে দেখিতে হয় যে গ্রন্থাগারের স্ব স্ব ব্যবস্থানুযায়ী ছোটদের রেফারেন্স বই, তাহাদের লেণ্ডিং বিভাগ, তাহাদের সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি সব ব্যবস্থাই রাখা হয়। অনেক জায়গায় টেবিল চেয়ারের এমন একটি ব্যবস্থা রাখা হয় যে প্রয়োজন মত ঐসব আসবাব পত্র মুড়িয়া সরাইয়া রাখা যায়। লেকচার বা অনুরূপ মিটিং এর প্রয়োজনে অনেক জায়গায় ছোটদের গল্পের আসরের আলাদা ঘরের ব্যবস্থা থাকে। এই গল্পের আসর ছেলেমেয়েদের বিশেষ ৪।৫ বৎসর হইতে ৭।৮।৯।১০ বৎসরের শিশুদের যে কী মস্ত বড় একটা আকর্ষণ, সে যে না দেখিয়াছে সে কখনও তাহা কল্পনা করিতেও পারিবে না। মনমাতান গল্প সব দেশেই ছোটদের মাতাইয়া দেয়—এই গল্পের ভিতর দিয়াই কত শিক্ষা দেওয়া যায়। আমাদের দেশে ঠাকুরমার কোলে বসিয়া আমরা কত গল্প ও তাহার ভিতর দিয়া কত জ্ঞানের কথাই না শিখিয়াছি। কিন্তু এ প্রথার চলন ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। পুরাতন জীবন যাত্রা আর নূতন জীবন যাত্রার সঙ্গে খাপ্ খাওয়াইয়া চলিতে পারিতেছে না। আমরা ক্রমশঃই তথাকথিত ভাবে সভ্য হইতেছি। পুরাতন যাহা কিছু সবই সেকেলে বলিয়া বাতিল হইতে চলিয়াছে। ওদেশে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এই গল্পের আসরে বেশ সুন্দর ভাবে শিশু ও বালক বালিকাদের নানা বিষয়ের জ্ঞানের কথা বলা হয়—কত সুন্দর সুন্দর ছড়া ছবি শেখান হয়।

আজকাল তো ফিল্ম ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে এ ব্যবস্থার আরও অনেক সুবিধা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দুই একদিন করিয়া কোথাও বা বেশীদিন—এই গল্পের আসরের বা গল্পের ঘণ্টার (ষ্টোরী আওয়ার) ব্যবস্থা থাকে। গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগের গ্রন্থাগারিক যিনি তিনি ও তাঁহার সহকর্মী কেহ এই গল্প বলেন—ছেলে মেয়েরা সব বৃত্তাকারে চারিধারে বসিয়া হাঁ করিয়া ঐ গল্প শোনে বা গেলে। দেখিয়া মনে হয় যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া আছে। ওদেশে ছোটদের গল্প ও গল্পের বইয়ের প্রাচুর্য প্রচুর। তাহার ভিতর হইতে প্রয়োজন মত গল্প বাছিয়া লইয়া পরিবেশন করা হয়। অনেক জায়গায় দেখিয়াছি গল্প বলার জন্য বাহির হইতে ছোটদের গল্প লেখক ভাল লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি তাঁহার বক্তব্য বা গল্প বলেন, ছেলে মেয়েরা বেশ মনোযোগ সহকারে তাহা শোনে।

বাহির হইতে লেখক বা অন্য কাহাকেও যখন আনা হয় তখন বেশ বড় ব্যবস্থা হয়। প্রায় ৬০-৭০ জন কোথাও বা ১০০-র উপর বসিবার আসনের ব্যবস্থা করিতে হয়। ওদেশে বক্তার গল্প বা কথা শেষ হইলে কিছু সময় শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তরের জন্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে। বড় বড় গ্রন্থাগারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু অর্থ সাহায্য করিবার রীতি আছে। সুইডেন দেশের মাল্‌মো সহরে পৌর গ্রন্থাগারে ছোটদের বিভাগে গল্প বলিবার একটি সুন্দর ঘর আছে—সেটি এমন কায়দায় তৈয়ার করা যে দিনের বেলাতেই আলো নিবাইয়া দিয়া ভিতরে ঠিক জ্যোৎস্না ও আকাশে ঠিক তারার আলো প্রকাশ পায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই তারার আলোতে কেমন সহজেই খুশী হয় ও গল্পের আসরে বেশ সহজেই আবিষ্ট হইয়া যায়। এই রকম শিশুমন ভোলাইবার পরিবেশ অল্প বিস্তর সব গ্রন্থাগারে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ওদেশের সবার বড় উৎসব, যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে বা বড়দিনের সময় কত সুন্দর ভাবেই না এই সব শিশু বিভাগ সাজান হয়। ক্রীস্‌ আস্‌ ট্রী ও কত খেলনা সব চারিধারে ঝোলান হয়—কত রঙ্গীন ফানুস্‌ ও কাগজের শিকল তৈরী করিয়া সাজান হয়—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সে কী আগ্রহ। আমাদের দেশের সরস্বতী পুজার সময় খানিকটা সেই রূপ আগ্রহ দেখা যায়। ওদেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিশু অবস্থা হইতেই গ্রন্থাগারের উপর যে আকর্ষণ ও আগ্রহ জন্মাইয়া যায় তাহা আমাদের দেশে দুর্লভ। গ্রন্থাগার ও তাহার বই এবং আসবাব পত্র—এ যেন তাহাদের প্রাণের জিনিষ—গ্রন্থাগারের প্রতি দরদ থাকায় ভবিষৎ জীবনেও তাহারা কখনও গ্রন্থাগারকে হেনস্ত করেনা। বই পত্রের অমর্যাদা করেনা। জ্ঞানের চর্চায় গ্রন্থাগারের দান যে কী অপরিসীম তাহাও তাহারা জানে। ছেলেবেলা হইতে এই যে আগ্রহ জন্মান হয় সেইটেই হইল আসল। ওদেশের গ্রন্থাগারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন আসা যাওয়া ও গ্রন্থাগারের ব্যবহার ও উহার ভিতর নিজেদের চলাফেরা, বই দেওয়া নেওয়া—সব ব্যাপারই নূতন দর্শককে অভিভূত করে। মনে হয় ইহারাই করে আসল সরস্বতী পুজা নিত্য নৈমিত্তিক। আমাদের দেশের সরস্বতী পুজায় আছে শুধু প্রবল উত্তেজনা অসম্ভব উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসার উন্মাদনা, কিন্তু সবই সাময়িক। এতে আসল জ্ঞানের চর্চা কিছু নাই—বিনয় সমীহ ও শ্রদ্ধা—এ সবের একান্ত অভাব—বই ও গ্রন্থাগারের প্রতিও দরদ ও সম্মানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে

সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় না। ওদেশের ছোট ছেলেমেয়েরাই জ্ঞান ও জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি যে শ্রদ্ধার পরিচয় দেয় তাহাতেই উহারা বড় হয়। আশা করা যায় আমাদের দেশের বাবা মা, সমাজের যাহারা শীর্ষে, তাঁহারা এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। বিদেশে বিশেষ আমেরিকায় নাকি গ্রন্থাগারে বিশেষ ছোটদের গ্রন্থাগারে যে সব ব্যবস্থা আছে তাহা পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। সচরাচর শিশুদের গ্রন্থাগার দুইটি ঘরে বিভক্ত থাকে; কোথাও বা একটি মস্ত বড় ঘর কাঁচের পার্টিশন দিয়া দুই ভাগ করা। ইহার একটি রেফারেন্স অপরটি লেণ্ডিং বিভাগ। যে কোন একটি হইতেই অপরটির প্রত্যেক অংশই বেশ পরিষ্কার ভাবেই দেখা যায়; সুতরাং একটিতে বসিয়া যে কোন কর্মচারী দুইটিরই তত্ত্বাবধান করিতে পারেন। বেশীর ভাগেই রেফারেন্স বিভাগে লোক থাকে। লেণ্ডিং বিভাগে ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নিজেদের মনমত বই বাছিয়া লইয়া কাউণ্টার হইতে ইস্যু করিয়া লইয়া যায়। কেহ কোন বই ইস্যু না করিয়া বাহিরে যাইতেছে বা সেলফের বই অগোছাল করিতেছে—সে সব কাঁচের পার্টিশনের পাশ হইতে অনায়াসে তদারক করা যায়।

বিলাতে একটি জিনিষ খুব আশ্চর্য ঠেকে যে গ্রন্থাগারের দরজায় কখনও কোন দরোয়ান রাখিবার ব্যবস্থা নাই। আমাদের দেশের মত বই চুরী হইবার রেওয়াজ এদেশে নাই। কী ছেলেমেয়ে যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রায় কেহই গ্রন্থাগারের বই যথাযথভাবে ইস্যু না করিয়া বাড়ী লইয়া যায় না। ইহার জন্য আলাদা দরোয়ান রাখিবার খরচ ওদেশের কোন গ্রন্থাগারিকই করেন না। তাঁহারা বলেন উহাতে যে শুধু খরচ পোষায় না তাহা নয়—উহাতে নিজেদেরও অসম্মান করা হয়!! সত্যই ইহা একটা বড় কথা যে, যে জাতের লোকের নিজেদের উপর বিশ্বাস নাই তাহারাই কেবল দ্বারবান রাখে ঐ রকম বই চুরি ধরিবার জন্য। বই চুরি অবশ্য সে দেশেও যায়—কারণ ভালমন্দ সব রকম লোকই আছে সেদেশে—যেমন এদেশে।

তবে সেদেশে সাধারণ লোকের এই সাধারণ জ্ঞানটা খুব প্রখর—গ্রন্থাগার সকলের জন্য, সেখান হইতে বই পড়ার জন্য লইতে হয়; চুরি করিয়া আত্মসাৎ করার জন্য নয়। এই জ্ঞান উহারা ছেলেবেলা হইতেই পাইয়া আসে বলিয়া বড় হইয়া উহারা কখনো ভাবিতে পারে না যে কেহ গ্রন্থাগার হইতে বই চুরি করিবে। আমাদের দেশে সাধারণ লোকের এই জ্ঞান হয় নাই, যাহাদের হইয়াছে তাহারা মুষ্টিমেয়। সেই জন্যই আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের গ্রন্থাগার

হইতে অসতর্ক হইলেই বই চুরি যায়। বড় বড় গ্রন্থাগারে গেটে লোক রাখিতে হয় গেটপাশ লইবার জন্য ও বিনা ছাড়পত্রে বই না বাহির হইয়া যায় এই তদারক করিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন জায়গাতেও গ্রন্থাগার হইতে বই বিনা ছাড়পত্রে বাহির হইয়া যায় এবং এই ব্যাপারে—লেখাপড়া জানা লোক—ছেলে ও মেয়ে বিভিন্ন সময়ে ধরা পড়িয়াছে। শহরে সুশিক্ষিত সমাজেই যখন এই, তখন অল্পশিক্ষিত ছোট শহরে ও পাড়াগাঁয়ের কথা না ধরাই ভাল। ইহার একমাত্র ব্যবস্থা হইতেছে ছেলে বেলা হইতে শিক্ষা দেওয়া—ছেলে বেলা হইতেই গ্রন্থাগারের প্রতি শ্রদ্ধা ও দরদ জন্মাইবার সুযোগ দেওয়া। না হইলে জাতি মানুষ হইবে না, শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে আমাদের। যে কোন সৎগুণ ছেলে বেলায় একবার মনে গাঁথিয়া দিলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহা কখনও নষ্ট হয় না। কিন্তু ছেলেবেলায় এ বিষয়ে অমনোযোগী হইলে পরে বেশী বয়সে এই সব শিক্ষা তেমন কার্যকরী সহজে হয় না। রেফারেন্সের ঘরে প্রায়ই ছেলে মেয়েরা গ্রন্থাগারিক বা তাহার সহকর্মীদের তত্ত্বাবধানেই লেখাপড়া করিয়া থাকে। অনেক গ্রন্থাগারে বিশেষ ম্যানেষ্টার শেফিল্ড ইত্যাদি বড় বড় গ্রন্থাগারে ছোটদের বিভাগে তাহাদের জন্য নানান্ ব্যবস্থা আছে, যাহাতে ছেলে মেয়েরা গ্রন্থাগারে অনেক বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা পায়। এসবের কিছু কিছু আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকরাও নিজেদের কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ওদেশের প্রত্যেক স্থানেই ছেলে মেয়েদের গ্রন্থাগারে আনার জন্য একটা ভাল ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে সপ্তাহে ১ ঘণ্টা করিয়া নীচু হইতে উচুঁ ক্লাশের অবধি সব-ছেলেমেয়েদেরই গ্রন্থাগারে আসা বাধ্যতা মূলক। তাহারা গ্রন্থাগারে ছোটদের বিভাগে ও গ্রন্থাগারের সর্বত্রই প্রায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখে, গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা হয়; গ্রন্থাগারের কর্মীরা তাহাদের সব ব্যবস্থা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন। অনেক জায়গায় দেখিয়াছি যে শিশু বিভাগের গ্রন্থাগারিক এই সব বিভিন্ন ক্লাশের ছেলে মেয়েদের ছোটছোট পরীক্ষা নেন। সাধারণ বিষয়ের পরীক্ষা যা গ্রন্থাগারের রেফারেন্স বিভাগের বইপত্র হইতে ও বই দেখিয়াই উত্তর দেওয়া হয়। ইহাতে ছেলে মেয়েদের রেফারেন্সের জন্য রেফারেন্স বইয়ের ব্যবহার করান শেখান হয়। এ বিষয়ে আরও বিশদ ভাবে স্কুল ও গ্রন্থাগার এই পরিচ্ছেদে আলোচনা হইবে বলিয়া এখন আর কিছু বলিব না।

যে কোনো সম্পূর্ণ গ্রন্থাগারেই ছোট ছেলেমেয়েদের যাহা কিছু দরকার তাহার ব্যবস্থা রাখা হয়। তাহাদের গোড়া হইতে সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া তোলা হয়। অনেক জায়গায় যেখানে রেফারেন্স ও লেণ্ডিং বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে সেখানে যে ঘরে ছেলে মেয়েরা বসিয়া পড়ে রেফারেন্স রিডিং রুমে যাহাতে কোনো গোলমাল না হয় তাহার ব্যবস্থা করা আছে। সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা বাড়ীতে পড়িবার বই বাছিতে পারে না। লেণ্ডিং বিভাগ স্বতন্ত্র রাখায় রিডিং রুমে কাহাকেও হট্টগোল করিতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। গ্রন্থাগারে বসিয়া গ্রন্থাগারিকের সাহায্য লইয়া পড়াশুনা করায়—যদিও সব জায়গায় বেশী ছেলেমেয়েরা সব সময়ে করে না—তবুও যে মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়েরা তাহা করে—তাহাদের ফলাফল অন্যদের অপেক্ষা ভালই হয়। গ্রন্থাগারিক এই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করায় তাহাদের চাহিদা ও প্রশ্ন ইত্যাদিতে সাহায্য করেন ও উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনা সহজ হইয়া যায়।

যে সব শিশু বিভাগে বা শিশু গ্রন্থাগারে ভাল ব্যবস্থা আছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই ছেলেমেয়েদের অবাধে বই দেখিবার ও বাছিবার সুযোগ দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা সবাই শেলফ হইতে যে বই ইচ্ছা বাছিয়া লইতে পারে, ইহাতে তাহাদের বাধা দিবার কেহ থাকেনা। এই সব শেল্‌ফ বা তাক্ ৫ ফুটের বেশী উঁচু করা হয় না, যেখানে আরো অল্প বয়স্কদের বই রাখা হয় যেমন ৩।৪।৫ বছরের ছেলেদের ছবির বই, সেখানে শিশুদের হাত যায় এমন মাপেরই শেল্‌ফের ব্যবস্থা করা হয়। শেল্‌ফ লম্বায় সচরাচর তিন ফুট করা হয়। ছোটদের ব্যবহারের টেবিল চেয়ারও বড়দের টেবিল চেয়ারের চেয়ে কম উঁচু। সাধারণ আসবাব পত্রের চেয়ে ১½″। ২″ ইঞ্চি ছোট টেবিল চেয়ার হইতে নিতান্ত শিশুদের জন্য খুব ছোট্ট ছোট্ট টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা দেখিয়াছি। অনেক জায়গায় বিশেষ যে অঞ্চলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কাজে যায় তাহাদের ১০।১২ বছরের ছেলেমেয়েদিগকে তাহাদের ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা করিতে হয়—তাহারা ছোটদেরও লইয়া যায়, সেইজন্য গ্রন্থাগারিক উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের সবরকম ব্যবস্থা করেন। গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগের আসবাবপত্র সচরাচর যে সব প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারের আসবাব পত্র নির্মাণে বিশেষজ্ঞ তাঁহারাই করিয়া থাকেন। শিশু বিভাগের চারি দিকের দেওয়ালেই ছবি টাঙ্গানো থাকে না, অনেক সময় একটি দিক্ ম্যাজিক লণ্ঠনের পর্দা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

সেদিকে কিছু টাঙ্গানোই থাকে না। ছবি টাঙ্গানো বা আঁকা থাকিলে তাহাতে ফিল্ম বা ম্যাজিক লণ্ঠনের কাজে অসুবিধা হয়। অনেক জায়গায় ছোট ছোট পর্দা বা Screen থাকে। তাহাতে নানান্ ছবি ও নোটীশ ঝুলাইবার ব্যবস্থা থাকে। ছেলেমেয়েদের বই ইস্যু করিয়া বাহির হইবার ও বই লইয়া ভিতরে যাইবার আলাদা আলাদা রাস্তা রাখা হয়। এই সব Wicket gate অনেক সময়ে বিশেষ ভীড়ের সময় গোলমাল বন্ধ করিতে সাহায্য করে—সব সময় এই gate বা যাওয়া আসার দরজার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে শিশু গ্রন্থাগারের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এ সব সমস্যা লইয়া কেহ এখনো মাথা ঘামায় না। ভবিষ্যতে হয় তো ইহার প্রয়োজন হইবে—তখন বিদেশে যেমন ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা দেখিয়া নিজেদের প্রয়োজন মাফিক্ নিজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই বিধেয়।

এবারে ছোটদের গ্রন্থাগারের বইয়ের বিষয় আলোচনা করিব। শিশু গ্রন্থাগারের বই বাছা বা পুস্তক নির্বাচন বেশ কঠিন কাজ। যা তা বই রাখা উচিত নয়। ওদেশে ছোটদের নানা রকম বই আছে ও প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের দেশে সে তুলনায় বই অনেক কম বাহির হয়। ওদেশে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, সে সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিয়া আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইংলণ্ডে ছেলেদের ক্লাসিক হিসাবে Pilgrim's Progress Robinson Crusoe, Alice in Wonder Land, Water Babies, and The Jungle Books ইত্যাদির নাম করা যায়। এই ধরণের বই অনেকগুলি করিয়া প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই রাখা হয় এবং এই সব বইয়ের ভাল সংস্করণই কেনা হয়—ছবি দেওয়া চকমকে সংস্করণ ছেলেমেয়েদের অধিক প্রিয়। সব দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ভাল বাঁধানো, ঝক্‌ঝকে, বড় বড় ছাপা, ভাল কাগজে ছাপা, এই রকম বই গ্রন্থাগারে রাখাই উচিত। ওসব দেশে ছোটদের জন্য শত করা প্রায় ষাট ভাগ গল্পের বই রাখা হয়—বাকী যাহা বই রাখা হয় তাহা নানান্ বিষয়ের—ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কলা, জীবনী ইত্যাদি। শেষোক্ত শ্রেণীর বই সব সময়েই যে ছোটদের বই হয় তাহা নয়—বড়দের বইএর ভিতরই সহজভাবে লেখা ঐ ধরণের বইও থাকে—সে সব বই বড় ছোটো সবাই পড়িতে পারে। যে কোনো নোতুন বই বিনা পরীক্ষায় গ্রন্থাগারে রাখা হয় না—বিশেষ ছোটদের পুস্তক সংগ্রহে রাখিতে হইলে সে বই প্রথমে পড়িয়া দেখিতে হয়—ছোটদের উপযোগী

হইবে কি না। ভাল বইয়ের সস্তা বা বাজে সংস্করণ, অপ্রচলিত ভাষায় লেখা বা slang এ লেখা, খারাপ ছাপা ও খারাপ ছবিওয়ালা বই গ্রন্থাগারে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নয়। ইংলণ্ডে সচরাচর ছোটদের গ্রন্থাগার স্কুল বন্ধের দিনে বেশীক্ষণ ধরিয়া খোলা হয়; আর স্কুল যখন চলে তখন শুধু স্কুলের ছুটী হইলে পর খোলা হয়—তাহাতে স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুল কামাই না করিয়া গ্রন্থাগারে আসিতে পারে। আমেরিকায় শুনিয়াছি শিশু গ্রন্থাগার সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে—স্কুল যখন চলে তখনো গ্রন্থাগার খুলিয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। ইংলণ্ডের অধিকাংশ শিশুদের গ্রন্থাগার স্কুলের খাবার ছুটীর [Lunch period] সময়ও খোলা হয়। সেই সময়েও অনেক ছেলেমেয়ে বই বদল করিতে গ্রন্থাগারে আসে। যে কোনো স্কুলের ছাত্র তাহার স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ের সুপারিশেই গ্রন্থাগারের সভ্য হইতে পারে—ইহাতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে গ্রন্থগারিকের একটী আদান প্রদানের ও পরিচয়ের পথও প্রশস্ত হয়। সচরাচর ১২ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের একখানি করিয়া বই নিতে দেওয়া হয়। বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্কদের অধিকার পাইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

'আমাদের হেরফের ঘুচলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য, নহিলে আছে সকলই। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, **শিক্ষার সহিত জীবন** কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন 'পানীমে মীন পিয়াসী শুনত শুনত লাগে হাসি।' আমাদের পানিও আছে পিয়াসও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে, এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।' —রবীন্দ্রনাথ

পুরাণের দেবাসুরদ্বন্দ্ব

শ্রীরেণু মিত্র

পুরাণের গল্পগুলি পড়িলে স্বতঃই যে একটী প্রশ্ন মনে জাগে তাহা এই যে দেবতারা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রতি বারই হারিয়া যান কেন? তাঁহাদের কোন বীর্য নাই, আত্মশক্তি নাই কেন? দেবতারা যদি সকল প্রকারে অসুরদের অপেক্ষা বড়ই, তাহা হইলে তাঁহারা মিলিয়া মিশিয়া অসুরদের পরাজিত করিতে পারেন না কেন?

পারেন না কেন না তাঁহারা দেবতা। কতকগুলি গুণের জন্য দেবতাদিগকে দেবতা বলা হয়, কিন্তু দেবতা বলিয়াই তাঁহাদের কতকগুলি ত্রুটি ছিল, যাহাই তাঁহাদের পরাজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেবতা মানেই তাঁহারা আলোর উপাসক, তাঁহারা আদর্শবাদী—আইডিয়ালিষ্ট। এবং আইডিয়ালিষ্ট বলিয়াই তাঁহারা বিচ্ছিন্ন—কখনও সঙ্ঘবদ্ধ নহেন। আদর্শবাদের অন্য যে গুণই থাকুক না কেন, উহা কখনও বহুকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারে না। সেখানে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা। আদর্শের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের আদর্শ আলাদা—কাহারো সাথে কাহারো মিল নাই। প্রত্যেকে যে যাহার মত নিজের ভিতরকার ও আবেষ্টনগত যোগ্যতা লইয়া আগাইয়া চলিয়াছে। সেখানে আর একজনের কি হইল, সে অগ্রসর হইতে পারিল কি না—এ ভাবনার কোন স্থান নাই। আমি আলো হইতে অধিকতর আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকিব—ইহাই সাধনা। তাই আইডিয়ালিষ্টদের কখনও দল হয় না—তাহারা কোনদিন সঙ্ঘবদ্ধ নয়।

ইহার একটা মোটা রকমের দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই পাওয়া যাইবে। ভারতবর্ষ মুসলিম কিংবা পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শে আসার পুর্ব হইতেই দীর্ঘকাল হইলই পুরোপুরি আদর্শবাদী ছিল। মনে বনে কোণে বসিয়া সে আত্মধ্যানে পরমার্থলাভের প্রয়াসকেই জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া জানিয়া ছিল। সেখানে সঙ্ঘবদ্ধতার কোন প্রশ্ন ছিল না। একদিক দিয়া ইহা একটী গুণ বটে, কিন্তু এই গুণকে যখন ঐকান্তিক করিয়া তোলা হইল, তখন তাহাই জাতীয় ত্রুটিতে পরিণত হইল। এবং সঙ্ঘবদ্ধহীনতার এই ফাঁক

দিয়াই একদিন ইসলাম সভ্যতা আদর্শবাদী ভারতবর্ষকে গ্রাস করিল; আর সেই একই কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ ভারতবর্ষের জনসাধারণকে উগ্র ও বিকৃত জড়বাদী করিয়া তুলিয়া তাহাকে একরকম অমানুষ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই ব্যক্তিগতভাবে ভারতবর্ষে মহান চরিত্র ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হইলেও জাতিগতভাবে তাহাকে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়া ছিল। যে জাতি নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া পরের গোলামী করিতে পারে, নিজের দেহকে আত্মাকে জাগতিক ক্ষেত্রে অপমানিত করিতে পারে, তাহার অধ্যাত্মসম্পদ যতই থাকুক না কেন, জীবনের সমগ্রতার কাছে তাহাকে জবাবদিহী করিতেই হইবে।

আদর্শবাদীর যে দল হয় না ইহার আরও দৃষ্টান্ত একটু ভাবিলেই মনে পড়িবে। মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি ক্ষেত্রে একটী আদর্শবাদকে প্রস্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন। একদিকে আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের বিকৃতিতে পঙ্গু ও আর একদিকে জড়বাদের কুফলে রাহুগ্রস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে সেদিন মহাত্মাজীর আদর্শবাদ একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর দল অপেক্ষা জড়বাদসর্বস্ব বামপন্থীদলের দলীয় সঙ্ঘবদ্ধতা বেশী ছিল এ কথা সকলেরই জানা আছে।

বাস্তববাদী পাশ্চাত্য শক্তিশালী তাহার সঙ্ঘবদ্ধতাদ্বারা। জীবনের সমগ্রতা তাহাদের নাই—জীবনের অতীগ দিক (transcendental aspect) সম্বন্ধে কোন সাধনা তাহারা ব্যবহারিক জীবনে গ্রহণ করে নাই—যদিও দার্শনিকের সেখানে অভাব ছিল না, আজও নাই। পাশ্চাত্য আত্মকৈন্দ্রিক—সর্ব্ব বা বিশ্বকৈন্দ্রিক নয়। অবশ্য তাহার আত্মা বলিতে তাহার জাতি বুঝায় কিম্বা সমস্বার্থসম্পন্ন একটী বিশিষ্ট গোষ্ঠী বুঝায়। জাতিগতভাবে সে সঙ্ঘবদ্ধ বটে কিন্তু তাহার জাতির বাহিরে বলিয়া যাহাদিগকে সে জানে, তাহাদের ক্ষুধার অন্ন কাড়িয়া খাইতেও তাহার কোন অসুবিধা বোধ নাই—বরং উহাই তাহার স্বভাবসিদ্ধ। অথচ জাতীয়তার নামে এক বাক্যে এক মুহূর্তে সে এক পতাকাতলে দাঁড়াইতে পারে নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ভয় এমন কি জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াও। অন্যের দ্বারা শোষিত হওয়ার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সে জানে।

এইভাবে দেখা যায় যে আদর্শবাদী ভারতবর্ষ disorganised, বিচ্ছিন্ন—জড়বাদী পাশ্চাত্যের সংহতিগুণ তাহাকে জাগতিক ক্ষেত্রে বাঁচাইয়াছে।

দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের পরাজয়ের পিছনেও তাহাদের বিচ্ছিন্নতা, তাহাদের দুর্বল সঙ্ঘশক্তিই বর্তমান। সঙ্ঘশক্তিই পশুশক্তি অর্থাৎ animality-র ধর্ম সঙ্ঘবদ্ধতা। পশুদের মধ্যে দলবদ্ধতা মানুষের অপেক্ষা অনেক বেশী—ইহা একটু চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পশুরা দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করিয়া থাকে; একটী কাক আহত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলে শতেক কাক আসিয়া কা কা শব্দে দিকবিদিক মুখরিত করিয়া তোলে। যাহার ভিতর পশুধর্ম যত বেশী, সে তত বেশী সঙ্ঘবদ্ধ। আদর্শবাদে পশুত্ব কম, তাই সেখানে সঙ্ঘের অভাব। জড়বাদে পশুত্ব বেশী, তাই সেখানে সঙ্ঘবদ্ধতাও বেশী।

অথচ পশুত্বকে চিরদিন নিন্দিত বলিয়া জানিয়াছি—তাহার প্রয়োজন বা সার্থকতা তো আমরা বুঝিতে শিখি নাই—আমাদের সঙ্ঘ হইবে কি প্রকারে? এই পশুত্ব জীবনের কোন্ দিক পুষ্ট করিতেছে তাহা না জানিলে পশুত্বের মর্যাদা দিব কি করিয়া? পশুত্ব সর্বথা ও সর্বদাই নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য—আমরা ইহাই শুনিয়াছি, জানিয়াছি। দেবাসুরের সংগ্রাম সেইখানে দাঁড়াইয়া। কিন্তু বাস্তবের জগতে যদি জাতি হিসাবে, মানুষ হিসাবে বাঁচিতে চাই, তবে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি সঙ্ঘবদ্ধতার সাধনা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এবং বাস্তব জীবনে পরের গোলামী করিয়া অধ্যাত্মক্ষেত্রের মুক্তির সাধনা কেবল আজিকার দিনের দৃষ্টিতেই নহে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতেও সর্বথা পরিত্যাজ্য ছিল। তাই গীতাতে তিনি অর্জুনকে রাজ্য ভোগ করিতেও বলিয়াছেন, আবার তাঁহাকে শরণাগতির সাধনাও লইতে বলিয়াছেন। তাই আদর্শবাদী ভারতবর্ষকে আজ শিখিতে বুঝিতে হইবে যে পশুত্ব জীবনকে কোন্ স্থানে দাঁড়াইয়া পুষ্ট করিতেছে—কি ভাবে সঙ্ঘবদ্ধতা গুণকে আয়ত্ত করিয়া পশুত্বের ধ্বংসাত্মক দিকটাকে বর্জন করা যায়। পশুত্ব মাত্রই নিন্দনীয় নয়। আমরা শব্দের ঐকদেশিক অর্থের সহিত পরিচিত এবং সেইভাবেই আমাদের ভাবধারা পুষ্ট হইয়াছে। একই হন্ ধাতু হইতে সঙ্ঘ শব্দ ও সংহার শব্দ গঠিত। আমরা হন্ ধাতুর সঙ্গে হননকেই জানিয়াছি, হননের মধ্য দিয়াই যে সঙ্ঘও গড়িয়া উঠে, এ সংবাদ রাখি নাই। বীজ পচিয়া বীজ হিসাবে নষ্ট হইয়া যায় বটে কিন্তু ঐ পচনই অঙ্কুরের জন্ম দান করে—এ কথা মনে না রাখিলে জীবনধর্মী এই বিশ্বটাকে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। তেমনি পশুত্ব বা অসুরত্ব কেবলই জীবনের যাহা কিছু বর্জনীয় তাহা দিয়াই

গঠিত, উহা জীবনকে কোন দিক দিয়াই গড়িবার শক্তি রাখে না—ইহা মিথ্যা জানিয়াছিলাম। পুরাণে দেখিয়াছি অসুরদের অনেক গুণ ছিল—তাঁহারা নিরাহার ও যতাত্ম হইয়া অযুতবর্ষ তপস্যাও করিয়া থাকিতেন। অসুর তথা রাক্ষসদের জীবনে জীবনের পক্ষে উপযোগী একটা দিক আছে বলিয়াই আজিকার দিনের কবি রাবণকেই মহনীয় করিয়া চিত্রিত না করিয়া পারেন নাই, রাবণের জন্যে তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। রাম রাবণের যুদ্ধটা আসলে কি তাহার উত্তর না পাইয়া, আবার রাবণের কতকগুলি মহত্ত্ব দেখিয়া আজিকার কবির হাতে রামের অপেক্ষা রাবণের চিত্র মধুর মহনীয় ও করুণ হইয়া উঠে। কেন? এই কেন-র উত্তর পাইলে বুঝিতে পারিব বাল্মীকি কাশীরামের হাতে রাম কেন আদর্শ চরিত্র হন আর মধুসূদনের হাতে রাবণই বা কেন মহান হইয়া উঠেন। দেবাসুর সংগ্রামের ব্যাখ্যাটাও তখনই বুঝিতে পারিব। সেদিন উত্তর পাইব অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে যাহারা বার বার পরাজিত হন, নিজেদের বাহুর উপর যাহারা নির্ভর করিতে পারেন না—নির্ভর করিতে হয় ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবের উপর—তাঁহারা কেন দেবতা, আর বাহু বলে সঙ্ঘবদ্ধতা দ্বারা যাহারা দেবতাদিগকেও পরাজিত করেন, তাঁহারা কেন অসুর।

আসলে কথাটা হইতেছে অসুর সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ছিল, তাহা বদলাইতে হইবে, দেবতা সম্বন্ধেও আমাদের পূর্বের ধারণা বদলাইতে হইবে। নহিলে দেবতারা দেবতা হইয়াও কেন পরাজিত হন আর অসুরেরা নিন্দনীয় হইলেও তাঁহারা অনেক গুণাবলীর অধিকারী হন কেন—তাহার উত্তর খুঁজিয়া পাইব না। অসুর অর্থই সর্বথা নিন্দনীয় ও পরিত্যজ্য কিছু নয়, আর দেবতা অর্থও সর্বদেশকালপাত্রে সর্বথা ভাল কিছু নয়। কতকগুলি গুণাবলীর সংমিশ্রণে দেবতা দেবতা, আবার কতকগুলি গুণাবলীর সংযোগে অসুর অসুর। অসুর ও দেবতা একই প্রজাপতিনন্দন। অসু অর্থ প্রাণ—এই প্রাণে যাহারা রমণ করে. তাহারাই অসুর পদবাচ্য। এই প্রাণ মুখ্যতঃ জৈব প্রাণ—তাই মুখ্যতঃ রসধর্মী। আর প্রাণের রসের আঠাতেই সঙ্ঘ গড়ে। তাই অসুরেরা সঙ্ঘবদ্ধ। দিব্ ধাতু হইতে দেবতা শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্ দীপ্তি পাওয়া অর্থে প্রযোজ্য। দেবতারা তাই আলোর উপাসক। আলোর উপাসক অর্থ প্রজ্ঞার উপাসক। অসুরেরা যে-প্রাণের উপাসক এই প্রজ্ঞার অপেক্ষায় সেই প্রাণ চিরদিন অন্ধকারধর্মী—অসুরেরা তাই অন্ধকারের

উপাসক। আলোর সঙ্গে অন্ধকারের একটা চিরন্তন বিবাদের সম্পর্কই একমাত্র সত্য কথা বলিয়া জানিয়াছি—তাই দেবতার সঙ্গে অসুরের বিবাদও চিরন্তন সত্য বলিয়া জানিয়াছি। অন্ধকারের অর্থাৎ জীবনের বা বস্তুর negative দিকটার কোন যথার্থতা বা সার্থকতা আমাদের জানা ছিল না—প্রাণের মূল্য দিতে আমরা জানিতাম না। আলোর মূল্য, প্রজ্ঞার মূল্য, একের মূল্য—ইহাই অধ্যাত্মবাদী সভ্যতার কাছে বড় ছিল। তাই দেবতা আমাদের আরাধ্য বস্তু—আর অসুর পরিত্যজ্য ছিল—শেষ পর্যন্ত ইহাদিগকে মিলাইতে পারি নাই।

আজ চোখ মেলিয়া বস্তুধর্মের দিকে চাহিয়া দেখি negative দিকটী একান্তই ঋণাত্মক বা অভাবাত্মক নহে। পজিটিভ ও নিগেটিভ এই উভয় মিলিয়া একটী সমগ্র বস্তু। ইলেকট্রিসিটি পজেটিভ ও নিগেটিভ দুইয়ে মিলিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। হাফটোন ছবি তুলিতে আলোর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা আজ স্পষ্ট। অন্ধকারের একটা নিজস্ব রূপ ও স্বরূপ আছে। আলোককে প্রকাশ ও উজ্জ্বল করিবার জন্যই শুধু তাহার অস্তিত্ব নয়—এ সত্য আজ বোঝা দরকার। প্রাণ ও তাহারই পথ বাহিয়া যাহারা আসে—রস, অন্ধকার, পশুত্ব, সঙ্ঘবদ্ধতা ইত্যাদি ইত্যাদি—ইহারা যে কেবলই অভাবাত্মক নহে, জীবনের সমগ্রতারই যে ইহারা একটী দিক মাত্র—ইহা আজ বুঝিতে হইবে। আমরা প্রাণ ও প্রজ্ঞাকে, অন্ধকার ও আলোককে একান্তভাবে জানিয়াছিলাম এবং জানিয়াছিলাম যে ইহাদের মধ্যে প্রাণ ও অন্ধকার পরিত্যজ্য, প্রজ্ঞা ও আলো আমাদের সাধনাদ্বারা লভ্য। এই দৃষ্টিতে দেবাসুর দ্বন্দ্ব, আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্ব, জড় অজড়ের দ্বন্দ্ব কোনদিন মিটিবে না। সমগ্রতার মধ্যে একই সত্যের ইহারা দুই প্রান্ত—এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দৃষ্টিতে দেখিলেই দেবাসুর দ্বন্দ্বের সমাধান হইতে পারে।　　ক্রমশঃ

সাময়িকী

গুরু নানক ঃ হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষ যখন ভারতকে, ভারতীয় সভ্যতাকেই বিব্রত, বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় মৈত্রী করুণার মূর্ত প্রতীকরূপে গুরু নানক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান কোন্ কৌশলে সঙ্ঘর্ষমূলক নিজ নিজ আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া একই সূত্রে মিলিত হইতে পারে, প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষকে নূতন ভারতবর্ষে গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহাই নিজ জীবনে আচরণ করিয়া গিয়েছেন গুরু নানক। তিনি স্বাধীন উজ্জ্বল ভারতের ভিত্তি রচনা করিয়াছেন। সেই সময়ে কবীর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি দিব্যমানবগণ এই একই উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানকে আকর্ষণ করিয়া নূতন সাম্য মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তো সে প্রাণ, সে মন্ত্র গ্রহণ করি নাই। এই প্রেমের মন্ত্রই বর্তমান যুগে বহন করিয়া আনিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু গুরু নানক প্রভৃতি বীর সন্তান দল তুইকে তুই রাখিয়া এক করিতে চাহেন নাই। সেই যুগে ইহার অধিক আশা করিবার ক্ষেত্রও ছিল না। আজ সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আজ হিন্দু হিন্দু থাকিয়া, মুসলমান মুসলমান থাকিয়া কোন্ পন্থায় একই সমগ্র ভারতের বুকে প্রাণ খুলিয়া থাকিতে পারে, অপরকে স্বীকার করিতে পারে, মৈত্রীর সেই ব্যাপকতম রূপই সকলের সামনে উদ্ভাসিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের সঙ্ঘর্ষ সমন্বয়রূপে গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে। হাজার বৎসরের ঝগড়া এইবার নিষ্পত্তির পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গুরু নানক প্রভৃতি বীর ভারত সন্তানদের ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা সে যুগে সম্ভব হয় নাই বলিয়াই না ভারত দ্বিধা-বিভক্ত হইতে পারিল? এইবার দ্বিধা-বিভক্ত ভারতবর্ষ আবার এক-ভারত রূপে কোন্ বিচিত্র কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময় লাগে। গুরু নানকের দিব্য আশা জয়যুক্ত হউক। রাস পূর্ণিমার দিনে তাঁহার আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক। তিনি হিন্দু-মুসলমান তুইয়েরই গুরু। গুরুজীকী জয়।

পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ : হিন্দু-বিদ্বেষের ভিতর, 'direct action'-এর ভিতর দিয়া যে পাকিস্তানের জন্ম, তাহার চতুর্দ্দিকে যে বিপর্য্যয় জমিয়া উঠিবে,

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে তাহা একরূপ চক্ষু বুঁজিয়াই বলা চলে। সেই সৃষ্টিই হয় সার্থক, যাহার জন্ম আনন্দ হইতে, চতুর্দ্দিকের আনন্দময় আবেষ্টনের স্পর্শে জীবিত যাহা, যাহা মরিলেও আনন্দ আস্বাদন করিতে করিতেই মরে। কিন্তু পাকিস্থানের কি অবস্থা দেখিতেছি ; তাহার জন্ম হিন্দু-বিদ্বেষে, সে বাঁচিয়া থাকিতে চায় ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করিয়া, তাহার সকল বিপর্য্যয়ের জন্য ভারতকেই দায়ী করিয়া। কাজেই সে যে বীভৎস মরণের দিকে আগাইয়া চলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি। হিন্দু-বিদ্বেষ আজ তাহার ঘরে পারস্পরিক বিদ্বেষের রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেখানে চলিয়াছে প্রদেশে প্রদেশে ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব। মুসলিম রাষ্ট্রে নবাব বাদশাহের যুগ হইতে যে ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার রূপে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া আছে, বর্ত্তমান যুগে পাকিস্থান তাহা হইতে রক্ষা পায় নাই। পাকিস্থানের প্রত্যেক ইউনিটে ইউনিটে চলিতেছে দ্বন্দ্ব। গণতন্ত্র সেখানে অসম্ভব। সেদিন বর্ত্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জ্জা ঠিকই বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানে 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' ছাড়া অপর কোনও শাসনতন্ত্র চলিবে না। ইহা খুব সত্য কথা। ব্রিটিশ-বিতাড়নের সাধনায় হিন্দুর সঙ্গে সেদিন মুসলমান জাতি-হিসাবে যোগদান করে নাই। তাহাদের সে সাধনা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল। সে সাধনা তাহাদের তো পূর্ণ করিতে হইবে। একটা পরাধীনতার মধ্যে থাকিয়া এবং সেই পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করিয়া এবং তাহার পর সেই জ্বালা হইতে উদ্ধার পাইবার সাধনা আজ পাকিস্থানকে শিখিতে হইবে। ভারতের হিন্দুগণ যখন 'ভারত ছাড়' (Quit India) বলিয়া ব্রিটিশকে চ্যালেঞ্জ দিল, তখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ ব্রিটিশের সঙ্গে কূটচক্রান্ত করিতেছিল, যাহার ফলে তাহাদের হাতে পাকিস্থান লাভ ঘটিয়াছিল। পাকিস্থানে মন্ত্রীসভা একটীর পর একটী বদল হইতেছে। মিঃ লিয়াকত আলি খাঁ মারা গেলেন আততায়ীর গুলীতে, আসিলেন মিঃ নাজিমুদ্দিন। আবার গেলেন তিনি, আবার আসিলেন মিঃ মহম্মদ আলি। তাঁহারই চোখের সামনে তাঁহার শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ পাকিস্থান গণপরিষদ, তথা পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত পূর্ব্ববঙ্গের বিধান পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া সেখানে গভর্ণরের শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আজও তাহাই চলিয়াছে। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, গভর্ণর জেনারেল

সামরিক ব্যক্তিদের অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর উপর পাকিস্থানের ভাগ্য ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছেন। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের নিগূঢ় অর্থও তাহাই। ব্রিটিশ গিয়াছে; কিন্তু ব্রিটিশের ভূত আজ আমেরিকা রূপে পাকিস্থানের ঘাড়ে চাপিয়াছে। আজ নিজের দেশে পরাধীন থাকিয়া, তাহার জ্বালা বুঝিয়া তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার সাধনা তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কোথায় ভারতের গণতন্ত্র, কোথায় পাকিস্থানের 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র'।

ভারতবর্ষ কখনও পাকিস্থানের মরণ চায় না। কিন্তু পাকিস্থান তো নিজের মরণ নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছে। যতদিন সে দ্বি-জাতিতত্ত্ব মানিয়া চলিবে, যতদিন ভারত-বিদ্বেষ পুঁজি করিয়া সে চলিবে ততদিন মরণ তাহার অনিবার্য্য হইয়াই উঠিবে। ভারতবর্ষ আক্রান্ত না হইলে কখনও তাহাকে আক্রমণ করিবে না। কিন্তু সেই তো নিজের শত্রু নিজে। 'আত্মনা উদ্ধরেৎ আত্মানম্'—নিজের উদ্ধার নিজে না করিলে কে তাহার উদ্ধার করিবে? দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং কোরাণ শরিফের আদর্শে পাকিস্থান গড়িয়া তুলিবার প্রশ্ন যতদিন তাহার দূর না হয়, ততদিন তাহার উদ্ধার নাই। পাকিস্থান নিজের মধ্যে নিজে আত্মস্থ হউক, তবেই তাহার রক্ষা। ছোট সুইজারল্যাণ্ডও স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া আছে। এত বড় রাশিয়া-জার্ম্মাণ যুদ্ধের মাঝেও সে অক্ষত আছে। আর পাকিস্থান ভারতবর্ষের সঙ্গে খোঁচাখুচি করিয়াই চলিয়াছে। এই ভাবে তাহার কি কোনও সুবিধাই হইবে? পাকিস্থানে কি এমন দূরদর্শী নেতা কেহই নাই যিনি পাকিস্থানকে এই আত্মহত্যার পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন? পরাক্রমশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ করিয়া কেহ কি কখনও আত্মরক্ষা করিতে পারে? ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিলেই পাকিস্থান বাঁচিত। আমেরিকার অর্থ ও অস্ত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। যাহার ভাবনীশক্তি দিনের পর দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তাহাকে আমেরিকান ডলার ও অস্ত্রশস্ত্রের ইনজেকশন কি করিবে! পাকিস্থান প্রাণের কাছেই অপরাধ করিয়াই চলিয়াছে। প্রাণধর্ম্মী, আকাশ-ধর্ম্মী ভারত যে আক্রমণ করিতে পারে না, কোন দিনই পারিবে না, তাহা সে জানে; তবুও ভারত হইতে আক্রমণের বিভীষিকার রূপ মিথ্যার আশ্রয়ে ভারত আক্রমণের জন্যই গোপনে চক্রান্ত করিতেছে। আমেরিকা তাহার বিপদকে আরও জমাইয়া তুলিতেছে। পাকিস্থান যদি এখনও সাবধান না হয়, সে

যদি এখনও 'বুদ্ধির' শরণ না লয়, তবে তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, অতীব শোচনীয়।

এই নিবন্ধ লিখিতে লিখিতে পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল ইস্কান্দার মির্জ্জার মুখ হইতে তাঁহার পূর্ব্ব-ঘোষিত 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র'-এর যে ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছে, তাহাতে আমাদের উপরে লিখিত বিশ্লেষণই পরিপূর্ণভাবে সমর্থিত হইবে। 'অবজারভার' পত্রিকার প্রতিনিধি মিঃ ডীন জিজ্ঞাসা করেন, যুক্ত ফ্রণ্টের নেতা মওলানা ভাসানী যদি ইংলণ্ড হইতে পাকিস্থানে ফিরিয়া আসেন, তবে তিনি (মিঃ ইস্কান্দার মির্জ্জা) কি করিবেন?' উত্তরে জেনারেল মির্জ্জা বলেন, 'আমি আশা করি তাঁহার সমর্থকগণ তাঁহাকে সমর্থন করিবেন। আর আমি লক্ষ্যভেদে সুদক্ষ আমার একজন সৈন্যকে পাঠাইব তাঁহাকে গুলী করিবার জন্য।' মিঃ ডীন জিজ্ঞাসা করেন, একথা তিনি তাঁহার বিবরণে লিখিতে পারেন কি? জেনারেল মির্জ্জা সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দান করেন এবং বলেন, 'নিশ্চয় লিখিবেন। আমাদের বন্ধু (মওলানা ভাসানী) এই বিবরণ পাঠ করিতে পারেন, এই দেশের বাহিরে থাকিবার সিদ্ধান্তই হয়ত গ্রহণ করিবেন।' ইহার পর জেনারেল মির্জ্জা একটু চিন্তা করেন এবং চিন্তার ফলে এই মন্তব্যটী তাঁহার মুখ হইতে পাওয়া যায়, 'সত্যই লোক জনকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে আমি চাহি না, তাহা ছাড়া আমি জানি যে নেটিভদের কেমন করিয়া শাসন করিতে হয়।' ইহার পরে পূর্ব্ববঙ্গের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তথাকার 'নেটিভ'দের সম্বন্ধে জেনারেল মির্জ্জা বলেন ও এই তথ্য পরিবেষণ করেন যে, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তথায় মুসলমান হইয়াছে।...তাঁহার এইরূপ মনোভাব দেখিয়া বিলাতের আর একখানি পত্রিকা 'নিউজক্রনিকেল'-এর জনৈক সংবাদদাতা জেনারেল মির্জ্জাকে 'ব্রাউন ব্রিটিশ' বিশেষণে অভিহিত করেন; অর্থাৎ রঙ্গে ও চর্ম্মে নেটিভ হইলেও দীক্ষা শিক্ষা ও স্বভাবে জেনারেল মির্জ্জা ইংরাজ আমলের একজন ব্রিটিশ পুরুষ।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে মির্জ্জা সাহেবের বক্তব্য এই: 'জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা মানে নির্ব্বাচনের ক্ষমতা। নির্ব্বাচন করিতে হইলে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অশিক্ষিত নিরক্ষর চাষা ভূষার কি জ্ঞান আছে? দেশের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার চাইতে তাহারা বেশী জানে বা বুঝে, ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করা যায় না। তাহারা নির্ব্বাচন করে কতগুলি অসৎ, কতগুলি নীচ ও কতগুলি মাথা-

পাগলকে। জনসাধারণের হাতে চাঁদ তুলিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি তাহারা দেয়। আর সমস্ত কিছুকে বিশৃঙ্খল ভণ্ডুল সৃষ্টি করিয়া বসে ইহারা…ইত্যাদি।' মিঃ ডীন জিজ্ঞাসা করেন, জেনারেল মির্জ্জারা যখন থাকিবেন না, তখন কি অবস্থা হইবে? জেনারেল মির্জ্জা স্পষ্টভাবেই উত্তর দিয়াছেন, 'আমাদের স্থান পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। আমাদের এই পরিকল্পনা করিতে হইবে যে, ইংরেজগণ যে ভাবে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, আমাদের যুবকগণকে সেইভাবে গড়িয়া তুলিবার মত সময় আমরা মোটেই পাইতেছি না। কিন্তু যতক্ষণ আমরা জীবিত আছি, ততকাল ইংরেজ আমলে আমরা যেমন শাসন ব্যবস্থা চালাইয়াছি, তেমন ভাবে এই আমলেও শাসন ব্যবস্থা চালাইয়া যাইব, আর ইংরেজ আমলের শাসন ব্যবস্থাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল।'

হায় পাকিস্থান! ভারতীয়দের ব্রিটিশ-বিতাড়ন-রূপ সাধনার সঙ্গে এক না হইয়া ব্রিটিশের সঙ্গে যুক্ত হইয়া স্বার্থসিদ্ধির প্রায়শ্চিত্তই কি আজ তোমাকে করিতে হইবে? ভগবান ইহাকে সুবুদ্ধি দিন। ব্রিটিশ কবল-মুক্ত স্বাধীন পাকিস্থান স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করুক তাহাকে যেন আবার 'কেঁচে গণ্ডুষ' না করিতে হয়—ইহাই ভারতবর্ষ চায়। বন্দেমাতরম্।

———

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উজ্জ্বলভারত

৭ম বর্ষ　　　　　　　　　　　　১২শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৬১

কার্ল মার্ক্‌স্, মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

কার্ল মার্ক্‌স্-এর আদর্শ রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ রাম-রাজ্য স্থাপন। উভয় আদর্শই মূলতঃ এক। আসল কথা হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষের যে মানুষ হিসেবেই একটা নিজস্ব মহিমা আছে, তা অস্বীকার করে' ধন-তন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বরবাদ করে' দিয়েছে দেখে উভয়ের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তার স্বরূপটা মূলতঃ এক। তাঁদের মনে হয়েছে, 'মানুষের জন্য শাসন, না শাসনের জন্য মানুষ'? এখন তো শাসনের জন্যই মানুষ—এই অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধন-তন্ত্রবাদ মজুর হিসেবে মানুষকে কল-কব্‌জার অঙ্গ করে ফেলেছে এবং জাতীয়তা-বাদ মানুষকে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না রেখে যখন তখন কামানের খাদ্য (cannon fodder) করে তুলছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার লেশমাত্রও নেই—তার স্বীকৃতিও নেই। জগন্নাথের রথের মত ধন-তন্ত্র ও রাষ্ট্রের রথ চলবে—তার চাকার তলায় ব্যক্তিবিশেষ কেউ গুড়িয়ে গেলেও কিছু আসে যায় না। এই অবস্থায় প্রতিকার ভাবতে গিয়ে উভয়ের মনে হয়েছে যে রাষ্ট্র-শাসনের নাগ-পাশের বজ্র-আটুনী থেকে মুক্তি চাই। এই ভাবটাকে ভাষা দিতে গিয়ে কার্ল মার্ক্‌স্ বলেছেন—'রাষ্ট্রহীন সমাজ চাই, অর্থাৎ চাই এমন সমাজ, যেখানে রাষ্ট্রের শাসন থাকবে না—মানুষ সুখে শান্তিতে পুর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী হয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।' মহাত্মা গান্ধীও সেই

ভাবটাকেই ভাষা দিতে গিয়ে বলেছেন—চাই রাম-রাজ্য স্থাপন, অর্থাৎ এমন রাজ্য, যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ হবে নীতিপরায়ণ, শান্ত, শিষ্ট, সুখী। মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত রাম-রাজ্য এমন রাজ্য, যেখানে বাইরের শাসন-প্রয়োগের কোনো প্রয়োজনই হবে না। অতএব উভয়ের আদর্শ যে মূলতঃ এক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই আদর্শে পৌঁছাবার পথ উভয়ের এক নয়—দুই জনের দুই রকমের—এরূপ মনে হতে পারে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। একটু বিচার করে দেখলেই আমরা বুঝবো যে দুই জনে একই পথের বিভিন্ন পর্য্যায়ের কথা বলেছেন।

কার্ল মার্ক্স্ বলেছেন—'রাষ্ট্রহীন সমাজে পৌঁছাতে হলে পথের বাধা যে ধনিক-তন্ত্র ও জাতীয়তা-বাদ, তার বিলোপ-সাধন প্রয়োজন। অতএব ভাঙ্গো ধনিক-তন্ত্র ও জাতীয়তা-বাদের মোহ—যে কোনো উপায়ে, যেমন করে পারো।' গান্ধীজী ধনিক-তন্ত্র জোর করে ভেঙ্গে ফেলা সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নি। অথচ গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থায় ধন-তন্ত্রের কোনো স্থান নেই। তিনি কংগ্রেসের কাজটাকে তাঁর জীবনের মুখ্য কাজ বলে মনে করেন নি। তিনি নিজে কংগ্রেসের চারি আনার সভ্যও ছিলেন না। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের উপদেষ্টা মাত্র। কংগ্রেসের কার্য্য-ক্ষেত্রকে তিনি তাঁর জীবনাদর্শ রূপায়িত করবার পরীক্ষা-ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সেবাগ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁর যে কাজ, সেইটেকেই তিনি জীবনের মুখ্য কাজ বলে মনে করতেন। সে কাজটা কি? এক কথায় বলা যায়—তা হচ্ছে একটা নতুন সমাজ সৃষ্টির পথ খোঁজা—এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা, যে ব্যবস্থায় তাঁর স্বপ্নের রাম-রাজ্য বাস্তবে রূপ নেবে। অহিংস সমাজ না হলে তো শাসনহীন বা রাষ্ট্রহীন সমাজ হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন—'সবাই অহিংস হও'। সমাজ একটা নীতি-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ একটা নৈতিক আদর্শ মেনে চলতে প্রস্তুত না হলে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের আইন লোপ পেতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন—'সবাই সকল কাজে এক অখণ্ড নৈতিক আদর্শ দ্বারা নিজেকে নিয়মিত ও পরিচালিত করো'। এই ভাবে বিচার করে দেখলে বোঝা যায় যে কার্ল মার্ক্স্ যে পর্য্যায়ের কথা বলেছেন মহাত্মা গান্ধী তার পরের পর্য্যায়ের কথা বলেছেন। অর্থাৎ ধন-তন্ত্রের অবসানে শাসনহীন বা রাষ্ট্রহীন সমাজ গড়ে তোলার যে পথ, গান্ধীজী সেই পথের নির্দ্দেশ দিতে চেয়েছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল বলেন—আমাদের রাষ্ট্রের আদর্শ Co-operative Common-Wealth (সমবায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বা সমবায় সমাজ)। এ কথার মানে কি? কার্ল মার্ক্স্ ও মহাত্মা গান্ধীর যে আদর্শ, পণ্ডিত জওহরলালও তাঁর এই কথায় সেই আদর্শের কথাই বলেছেন। অধিকন্তু কোন্ পথ অবলম্বন করে চললে সেই আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে, সেই পথের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে পণ্ডিত জওহরলালের এই কথার ভিতরে। কেন এ কথা বলছি, তা এই আলোচনার ভিতর দিয়ে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

কার্ল মার্ক্স্ চেয়েছিলেন ধন-তন্ত্রের ধ্বংস। সে কাজ মোটামুটি সুসম্পন্ন হয়েছে, বলা যায়। কেননা, দুনিয়ায় আজ একটি লোকও পাওয়া যাবে না, যে বলে—ধন-তন্ত্র একটা ভাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অতএব আজ ধন-তন্ত্রের পেছনে কোনো নৈতিক সমর্থন (moral support) নেই। নীতির দিক থেকে যে ব্যবস্থা সমর্থন-যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না—একটা লোকও যার সমর্থনে কথা বলতে প্রস্তুত নয়, সে ব্যবস্থা তো গতায়ু—তার শ্রীবৃদ্ধি নেই—সে ধ্বংসের মুখে (waning force)। দুনিয়ার পানে চোখ মেলে চাইলেও তা-ই দেখতে পাই। রুশিয়া, চীন, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে ধন-তন্ত্র নেই। তার মানে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক লোকের দেশে ধন-তন্ত্রের অবসান হয়েছে। যে সব দেশে ধন-তন্ত্র এখনও আছে, সে সব দেশেরও কোনো লোকই এখন আর ধন-তন্ত্রের সমর্থনে কোনো আলোচনায় যোগ দিতে অগ্রসর হয় না—তারা দোহাই পাড়ে গণ-তন্ত্রের (Democracy) নামে, 'গেল গেল গণ-তন্ত্র গেল' এই বলে। এ সম্বন্ধে অবশ্য কোনো সংশয় নেই যে, মানব-সমাজের সংস্কৃতি-ভাণ্ডারে ধন-তন্ত্রের দান সুপ্রচুর। কিন্তু ধন-তন্ত্র ইতিমধ্যে সমস্যাও সৃষ্টি করেছে সুপ্রচুর, যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে মনুষ্য-সমাজের আর অগ্রগতি অসম্ভব। তাই দুনিয়ায় আজ আর ধন-তন্ত্রের সমর্থক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এখন প্রশ্ন এই যে ধন-তন্ত্রের অবসানে তার জায়গায় দুনিয়ায় কোন্ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হওয়া সম্ভবপর? সেটা তো হঠাৎ এক দিন আকাশ থেকে পড়বে না! সেটা নিশ্চয় ধীরে ধীরে বাস্তব পরিস্থিতি থেকে আপন অনুকূল আব-হাওয়ায় গড়ে উঠতে থাকবে। আগের যুগে যেমন সামন্ত প্রথা (Feudalism) থেকে অনেক দিন ধরে একটু একটু করে ধন-তন্ত্র প্রথা উদ্ভূত

হয়ে ক্রমে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি ধন-তন্ত্রের জায়গায় নূতন যে অর্থ নৈতিক প্রথা কায়েম হবে, তা-ও নিশ্চয় অনেক দিন ধরে একটু একটু করে গড়ে উঠবে। তাই যদি হয়, তবে আজকের দিনে ধন-তন্ত্র যখন ধ্বংসোন্মুখ, তখন এর জায়গায় যে প্রথা দাঁড়াবে, তা ইতিমধ্যেই নিশ্চয় জন্ম-লাভ করেছে। আমাদের এখন খুঁজে দেখতে হবে যে, ক্রম-ক্ষীয়মান ধন-তন্ত্রের পাশে বর্ত্তমানে আর কোনো অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছে কিনা, যা সামান্য অবস্থা থেকে আরম্ভ করে ক্রমে বেড়েই চলেছে। জগতের পানে চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, আছে এরূপ ব্যবস্থা। সেটা আর কিছুই নয়—সেটা হচ্ছে সমবায়ের অর্থনীতি (co-operative economy)। শ' খানেক বছর পুর্ব্বে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি রকডেল নামক স্থানের আটাশ জন সাধারণ অধিবাসী পরীক্ষা-মূলক ভাবে যে সমবায় প্রথার প্রথম সূচনা করেন, তা আজ জগৎ-ব্যাপী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে দেশে ধন-তন্ত্র আজো সুপ্রতিষ্ঠিত —যেমন আমেরিকায়—সে দেশেও সমবায়ের অর্থ-নীতি যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে এবং দিন দিন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আর যে দেশে ধন-তন্ত্র নেই—যেমন রাশিয়ায়—সে দেশে তো রাষ্ট্রই এ প্রথা সুষ্ঠু ভাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে।

ধন-তন্ত্রের দেশে সমবায় নীতি প্রসার লাভ করছে কৃষক ও মজুরদের মধ্যে, অর্থাৎ যারা অপেক্ষাকৃত গরিব, তাদের মধ্যে। ধনিকরাও এ ব্যাপারে সাহায্য করছে। ধন-তন্ত্র এই যে অসম-ধন-বণ্টনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যার ফলে ধনিকরা আরো ধনী হয় এবং তাদের তুলনায় গরিবরা আরো গরিব হয়, এ সমস্যার প্রতিকার ধন-তন্ত্রের হাতে নেই। সমবায় নীতি অনুসরণ করলে দরিদ্রের ক্রমান্বয়ে আরো দরিদ্র হয়ে যাওয়ার পথে কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয় বলে ধনিকরাও এ ব্যবস্থা সমর্থন করে। অসম-ধন-বণ্টনের সমস্যা থেকে রুশ দেশে যে একটা বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তা দেখে এবং পাছে অন্যান্য দেশেও সে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে, এই ভয়ে অন্যান্য দেশের ধনিক সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত গরিবদের ভিতরে সমবায় প্রথা প্রবর্ত্তনে সহায়তা করতে অগ্রসর হয়। তারা মনে করে যে এর ফলে বিপ্লবের আব-হাওয়া গড়ে ওঠার পক্ষে বাধার সৃষ্টি হবে। তাই তারা নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার বুদ্ধিতেই সমবায় নীতির প্রবর্ত্তন সমর্থন করে। অথচ সমবায়ের অর্থ-নীতি দেশে ব্যাপক হয়ে উঠলে যে ধন-তন্ত্রের অবসান হবে, তাতেও সন্দেহ নেই। আর

যে দেশে ধন-তন্ত্র নেই, সে দেশেও সমবায়ের অর্থনীতি প্রসার লাভ করছে এই কারণে যে, এই অর্থ-নীতি সে দেশের ধন-তন্ত্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল বই প্রতিকূল বিবেচিত হয় না।

পণ্ডিত জওহরলালের আদর্শ যে কো-অপারেটিভ কমন-ওয়েল্‌থ্‌ বা সমবায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, তার প্রতিষ্ঠা কেমন করে হতে পারে? সমগ্র দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা যদি সমবায় নীতির দৃঢ় ভিত্তির উপরে গড়ে ওঠে, তবে সে দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে কো-অপারেটিভ কমন-ওয়েল্‌থ্‌। সমগ্র দেশে এই অর্থনীতি চালু হলে অবস্থাটা কিরূপ হয়ে দাঁড়াবে, তা-ই দেখা যাক। কোনো একটা গ্রামের কথা নিয়ে আরম্ভ করা যাক। সে গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবার যদি সে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতির মেম্বার হয় এবং সে সমিতির দোকান থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র ক্রয় করে এবং ক্রমে গ্রামের যাবতীয় উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থাও যদি সমবায় সমিতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে সে গ্রামের সমগ্র অর্থনীতি সমবায় নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। এই ভাবে কোনো দেশের প্রত্যেক গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি যদি সমবায় নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সেই দেশের গোটা অর্থ-নীতিই সমবায় অর্থনীতি হয়ে দাঁড়ায়। সে অবস্থায় গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিও গড়ে উঠবে। তখন গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলি স্বভাবতঃই তাদের প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মারফতেই তাদের সমস্ত কাজ কারবার চালাবে। কেননা, তাতেই তাদের লাভ। সেইরূপ প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সমিতিগুলিও রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্রে যে সর্ব্ব-প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সমিতি থাকবে, তার মাধ্যমে সব কাজ কারবার চালাবে। এ থেকে সর্ব্ব-প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সমিতি সমগ্র দেশের যে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা, তার একটা হিসাব অনায়াসেই প্রস্তুত করতে পারবে। তখন চাহিদা অনুসারে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক জাতীয় অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তার ফলে ক্রমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তো বটেই, অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা দূরীভূত হয়ে তার জায়গায় সর্ব্বত্র সহযোগিতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

এইরূপ যদি সমবায় নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তবে প্রত্যেক দেশই অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে তার যাবতীয় কাজ-কারবার চালাবে একটা আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মারফতে।

তখন সেই আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় সমিতি সারা বিশ্বে কোন্ বস্তুর কি পরিমাণ চাহিদা, তা অনায়াসেই জানতে পারবে। তার পরে কোন্ কোন্ মাল কোন্ কোন্ দেশে কি পরিমাণ তৈয়ারী হওয়া সুবিধাজনক, তা বিবেচনা করে, সেই কেন্দ্রীয় সমিতিই প্রত্যেক দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়মিত করতে পারবে এবং তারপরে মাল পরিবর্ন্তনের ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে। তার ফলে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনানুযায়ী অর্থনীতি (planned economy) গড়ে উঠবে। তার মানে দুনিয়ায় যে বস্তুর যতটা চাহিদা, উৎপাদনও সেই প্রয়োজন অনুযায়ীই হতে থাকবে—তার বেশী নয়।

ধন-তান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিযোগিতা-মূলক অর্থনীতি। সেই জন্য এই প্রথাকে বলা হয় পরিকল্পনাহীন অর্থনীতি (unplanned economy)। লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় সবাই চেষ্টা করে অন্যান্যদের তুলনায় উৎপাদনের হার ও পরিমাণ বাড়াতে। তার ফলে সময় সময় চাহিদার তুলনায় উৎপাদন এত বৃদ্ধি পায় যে বাজারে মালের কাটতি থাকে না। কাটতি না থাকায় মালের দাম যায় পড়ে—ব্যবসাদারের হয় লোকসান। তার ফলে আবার উৎপাদনও যায় বন্ধ হয়ে এবং বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে ঘটে অর্থনৈতিক সংকট (economic crisis)। কিন্তু সমবায়ের অর্থনীতি চালু হলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না থাকায় চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক সংকট ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। তার ফলে ধন-তান্ত্রিক অর্থনীতির একটা মস্ত বড় সমস্যার সমাধান হয়।

ধন-তান্ত্রিক অর্থনীতির সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অসম-ধন-বণ্টনের সমস্যা। সমবায়ের অর্থনীতিতে এ সমস্যায়ও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়। কেননা, সমবায়ের নীতি অনুসারে লাভের কোনো অংশ মূলধন খাতে পরিবর্ন্তন করা হয় না বলে দু চার জন ধনিকের হাতে ধন জমতে পারে না। সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় লোকের ভিতরে অর্জ্জিত লভ্যাংশের খানিকটা বেটে দেওয়া হয় এবং বাকীটা সমিতির তহবিলে জমা থাকে। যে টাকাটা জমা থাকে, সেই টাকাটা সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় লোকের সম্মতি-ক্রমে সাধারণের জন্য ব্যয় করা হয়। অতএব সমবায়ের অর্থ-নীতি চালু হলে অসম-ধন-বণ্টনের সমস্যা উদ্ভূত হ'তে পারে না।

গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবার যদি সমবায় অর্থনীতির আওতায় সেই নীতি অনুসারে তাদের সমস্ত কাজ-কারবার চালাতে বদ্ধপরিকর হয়, তবে তার

ফলে সমবায় সমিতির রিজার্ভ তহবিলে ক্রমে যে টাকা জমতে থাকবে, তার পরিমাণ নেহাৎ কম হবে না। সেই তহবিলের টাকা দিয়েই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি গ্রামের যাবতীয় সেবা ও উন্নয়ন-মূলক কাজ অনায়াসে সুসম্পন্ন হতে পারবে। এ সবের জন্য রাষ্ট্রের কাছে হাত পাতবার কিংবা ধনীর দুয়ারে ভিক্ষার জন্য ধন্না দেবার প্রয়োজন হবে না। সত্যি বলতে কি, বর্ত্তমান যুগের সমাজ সেবার প্রতিষ্ঠানগুলি (Social service Institutions) ধন-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থারই অঙ্গ-বিশেষ, তা ছাড়া কিছু নয়।

সমবায় ভাবাদর্শের উপরে ভিত্তি করে যদি সমবায় সমিতিগুলি গড়ে ওঠে, তাহলে সমিতির অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের ভিতরে ঝগড়া-বিবাদ কমে যাবে। ঝগড়া-বিবাদের কারণ উপস্থিত যদি হয়ও, তাহলে সমবায় সমিতিই তার সুষ্ঠু মীমাংসা করে দিতে পারবে। তার ফলে রাষ্ট্রের আইন-আদালতের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন ফুরিয়ে আসবে। গ্রামে রাষ্ট্রের যা করণীয়, তার সবটাই ক্রমে গ্রাম্য সমবায় সমিতির তাবে এসে যাবে এবং কেন্দ্রীয় সমবায়-সমিতি একদিন রাষ্ট্রের জায়গা জুড়ে বসবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সমগ্র দেশে সমবায় প্রথা চালু হলে রাষ্ট্রের তাবেদারির প্রয়োজন ক্রমে ফুরিয়ে আসতে থাকবে এবং একদিন রাষ্ট্র-শাসন আপনা থেকেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমগ্র বিশ্বের অর্থ নৈতিক কাঠামোটা যদি সমবায় নীতির উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং তার ফলে যদি সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতি একটা সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক অর্থনীতি হয়ে ওঠে, তবে কার্ল মার্কস্‌-এর রাষ্ট্রহীন সমাজের আদর্শ রূপায়িত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা হবে।

কিন্তু এক একটা সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত সভ্যগণের ভিতরে সমবায়ের ভাবাদর্শ যদি সম্যকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে কিছুই হবে না—সমবায়ের অর্থনীতি গড়ে তোলার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। সমবায় সমিতি একটা সাধারণ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় মানে মিলন। শুধু অর্থের জন্যে বা স্বার্থ-সাধন বুদ্ধিতে সভায় এসে মিলিত হওয়া নয়—সত্যিকার মনের মিলন হওয়া চাই। সমিতির অন্তর্ভুক্ত সকল সভ্যের মনের সম্পূর্ণ মিলনের উপরে প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিষ্ঠান, তাকেই বলা যেতে পারে সমবায় প্রতিষ্ঠান। সমবায়ের ভাবাদর্শ সকলের মনে সম্যক্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানেই হচ্ছে পরস্পরের ভিতরে স্থায়ীভাবে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা কায়েম হওয়া। তা যদি

হয়, তবেই সমবায়ের আদর্শ পূর্ণ সাফল্যলাভ করতে পারবে। সমবায়ের ভাবাদর্শ বলতে কি বোঝায়, বঙ্গের একজন বিখ্যাত মহিলা কবি কামিনী সেনের একটী কবিতার দুইটি ছত্রে তা সম্যক্ রূপ লাভ করেছে। সে দুটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

পশু সর্ব্বদা আপনাকে এবং স্ব-গণকে নিয়েই বিব্রত থাকে। সেইটেই তার স্বভাব। যে মানুষের ভিতরে পশু-প্রকৃতিটাই প্রবল, তার পক্ষে আপনাকে নিয়ে বিব্রত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ কেবল পশু নয়—পশুত্বকে ছাপিয়ে তার ভিতরে দেবত্বও (Rationality) বর্ত্তমান। যে মানুষের ভিতরে দেবত্বটা প্রবল, সে কখনো শুধু আপনাকে নিয়ে বিব্রত থাকতে চাইবে না—সে চাইবে সেবার মনোভাব নিয়ে অপর সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে' সকলের সুখ-সুবিধার জন্য একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে এবং আর সবাইকে সেই ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে। সমবায়ের ভাবাদর্শ মানেই হচ্ছে মানবতার আদর্শ—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব-বোধের আদর্শ। বিশ্ব-সমাজে এই ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে মহাত্মা গান্ধীর রামরাজ্যের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে পণ্ডিত জওহরলালের প্রচারিত কো-অপারেটিভ কমন-ওয়েল্‌থ্ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হলে কার্ল মার্ক্‌স্ ও মহাত্মা গান্ধী উভয়েরই আদর্শ সফলতা লাভ করতে পারে। উভয়ে যে আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছেন, তাতে বিশ্ব-সমস্যারই সমাধান হবে বলে তাঁরা মনে করেছেন। আজকের দিনে বিশ্ব-সমস্যা মানেই হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক ধন-তন্ত্র ও জাতীয়তা-বাদের সমস্যা।

অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলে মাঝে মাঝে অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশে দেশে প্রতিযোগিতার ফলে সৃষ্ট হয়েছে এটম্ বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা যার ব্যবহারের ফলে মানব-জাতির ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখা দেবে। আর মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতার ফলে সমাজের কাঠামোটাই ভেঙ্গে পড়ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রের এই যে ত্রিবিধ সমস্যা, এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে সর্ব্বক্ষেত্রে সমবায়ের নীতি অনুসরণ করে চলা। শুধু সমবায় অর্থনীতি গড়ে তুলবার

চেষ্টা করলে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও পূর্ণ সাফল্য লাভ করা যাবে না, যদি আমরা মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে সমবায় বা পুর্ণাঙ্গ সহযোগিতার আদর্শ অনুসরণ করবার চেষ্টা না করি। আজকের বিশ্ব-পরিস্থিতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে আমরা বুঝবো যে, বিশ্বের জন-মত (world-opinion) এই ভাবের ভাবুক এবং এই পথের পথিক ও সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে জওহরলাল, তথা ভারতই এই পথের পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা অভিনয় করে চলেছে।

আজ যে আমেরিকার মত সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ ভারতের মত সামরিক শক্তিহীন দেশকে তার মতে মত দিচ্ছে না বলে বিশ্বের দরবারে হেয় করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও পারছে না—বরং ভারতের প্রতিষ্ঠা, মান-সম্ভ্রম বাড়ছে বই কমছে না, তার কারণ কি? কারণটা এই যে বিশ্বের জন-মত আজ ভারতের মুখ-পাত্র জওহরলালের সমর্থনে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সব দেশেরই সাধারণ জন-গণ আজ মনে করছে যে, জওহরলাল তো ঠিক কথাই বল্‌ছে—নিশ্চিত মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে এনে সে তো বাঁচবার পথই দেখাচ্ছে, তবে কেন তাকে হেয় করবার চেষ্টা? এই মনোভাবের ফলে আমেরিকাই বিশ্বের জন-মতের কাছে মান খোয়াচ্ছে, আর ভারতের মান-সম্ভ্রম বাড়ছে বই কমছে না।

পণ্ডিত জওহরলাল কি বলছেন—কোন্ পথ দেখাচ্ছেন? জওহরলাল বলছেন অর্থনৈতিক ব্যাপারে সমবায়ের কথা এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে সহযোগিতার কথা। তিনি বলছেন—প্রতিযোগিতার পথ নিশ্চিত মৃত্যুর পথ। সে পথ ছেড়ে সব দেশকেই সহযোগিতার পথে আসতে হবে। সেই পথেই বিশ্ব বাঁচবে—তুনিয়ার অগ্রগতি সম্ভবপর হবে। নইলে জগতের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। দেশে দেশে—জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতার ফলে যুদ্ধ বাধে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয়েছে এটম্ বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা। এর পরে প্রতিযোগিতার পথে আর এক পা এগোলেই হাইড্রোজেন্ বোমার ধ্বংসলীলায় জগৎ ছাড়েখাড়ে যাবে। প্রতিযোগিতার পথে মনুষ্য-সমাজ উন্নতির শেষ সীমায় পৌছেছে। আর এই পথে চলবার চেষ্টা করলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বংস সুনিশ্চিত। এমন কি মানুষ জাতটারই বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তাই আজ বিশ্বের জন-মত প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতার ভাবের ভাবুক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই জওহরলালের প্রদর্শিত পথের পথিক ও সমর্থক হয়ে উঠেছে।

জওহরলাল বলেন, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের যে কোনো বিবাদ বিসম্বাদ পরস্পরের ভিতরে আলাপ-আলোচনা দ্বারাই মীমাংসিত হতে পারে, যদি উভয়ের ভিতরে সহযোগিতার মনোভাব থাকে। প্রতিযোগিতার ভাব নিয়ে অগ্রসর হলে আলাপ-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধ দ্বারা কোনো সমস্যারই সমাধান হয়না, বরং এক যুদ্ধ আর এক যুদ্ধের বীজ বপন করে এবং আরো বহু নতুন নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। তিনি বলেন, কোরিয়া ও ইন্দো-চায়না সম্বন্ধে কোনো সুষ্ঠু মীমাংসায় পৌছাতে হলে বিবদমান পক্ষদ্বয় যদি প্রথমেই স্বীকার করে নেয় যে, কোনো পক্ষই যুদ্ধে জয়-লাভ করেনি এবং তারপরে যদি আলাপ-আলোচনায় অগ্রসর হয়, তবেই অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা। এ কথার মানে হচ্ছে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ আরম্ভ করা। তিনি যে শান্তিপূর্ণ ভাবে সহ-অবস্থানের নীতি (Principle of peaceful co-existence) সকল জাতির পক্ষেই অনুসরণীয় বলে প্রচার করেন, তারও মানে এই যে, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের সহযোগিতার সম্পর্কই গড়ে ওঠা উচিত। এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই ভারত মহাচীনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতির উপরে ভিত্তি করে সন্ধি স্থাপন করেছে। এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই জওহরলাল ফ্রান্সের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ঐক্যমতে না পৌছানো পর্য্যন্ত ফরাসী কবল থেকে জোর করে ছিনিয়ে আনা ভারতের ভূখণ্ডগুলিকে এক তরফা ভাবে করায়ত্ত করার প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। পরে আলাপ-আলোচনা করে উভয় পক্ষ এক মত হয়েই ফরাসী-অধিকৃত ভারতের যাবতীয় ভূখণ্ডগুলিকেই ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই সহযোগিতার নীতি অনুসারে বিচার করেই ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কোনো বিচার্য্য বিষয়ে এইরূপ অভিমত দেয় যে এইটে ঠিক, এইটে বেঠিক—এইটে উচিত, এইটে অনুচিত। এই যে একটা সার্ব্বজনীন নীতি অনুযায়ী নিজে চলবার ও অপরকে চালাবার চেষ্টা, এটা ভারতেরই বিশেষত্ব।

পণ্ডিত জওহরলাল যে সমবায় বা সহযোগিতার আদর্শ প্রচার করছেন, এ আদর্শ তিনি পেয়েছেন মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে। তিনি ইংলণ্ডে এক বক্তৃতায় নিজেই বলেছেন যে, 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারত কোন্ নীতি অবলম্বন করে চলবে, সে সম্বন্ধে মন স্থির করতে আমার কোনো বেগ

পেতে হয়নি। মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, সেই শিক্ষা থেকেই আমি আমার অনুসরণীয় নীতি খুঁজে পেয়েছি।' মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাটাই ছিল—মানুষে মানুষে ভাই ভাই বা মানুষে মানুষে সহযোগিতার শিক্ষা। এই যে মহামানবতার আদর্শ, এইটেই মহাত্মা গান্ধীর জীবন-দর্শন। এই আদর্শ হিন্দু-সভ্যতারই বিশেষত্ব। বাংলার প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের মুখেও শুনতে পাই—

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

মহাভারতেও অনুরূপ ভাবের শ্লোক আছে। শর-শয্যায় শুয়ে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—

'গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং যো ব্রবীমি
ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ॥' (শান্তি পর্ব্ব ২৯৯-২০)

—তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ রহস্য আজ বলছি, মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নেই।

যে জাতির লোকেরা প্রতিদিনকার তর্পণের সময়ে বলে—'আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তং ভুবনং তৃপ্যতু', আজকের দিনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে মানবতার দর্শনের শিক্ষা দিতে তাদের মত যোগ্য অধিকারী আর কে হতে পারে? তারাই যে যোগ্যতম, তাতে সন্দেহ নেই। তাই এই শিক্ষা দানে ব্রতী হওয়া ভারতের পক্ষে আজ একান্তই স্বাভাবিক এবং সেই স্বাভাবিক কাজটাই ভারত করছে জওহরলালের মারফতে। জওহরলাল যদি মহাত্মা গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই শিক্ষা দেবার উপযুক্ত পাত্র হয়ে গড়ে উঠে থাকেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ভারতের প্রধান ও উপযুক্ত সন্তান হিসেবে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হওয়া তাঁর পক্ষেই তো শোভন ও স্বাভাবিক।

———

যুগসমস্যায় শ্রীনিত্যগোপাল

সম্পাদক

[শ্রীনিত্যগোপাল শতবার্ষিকী উপলক্ষে নবদ্বীপে পাঁচদিনে যে পাঁচটী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিগত ২২শে নভেম্বর দ্বিতীয় দিনের সভায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত অভিভাষণের সারমর্ম্ম নীচে দেওয়া হইল। এইদিন সভাপতি ছিলেন নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীপূর্ণচন্দ্র বাগচী মহাশয়।]

ওঁ ফুল্লেন্দিবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস প্রিয়ম্।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরম্ সুন্দরম্
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেনুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্ত্তয়ে ভক্ত ভগবতে নিত্যগোপালায়
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয় তুরীয়াতীতায়
ব্রহ্মপরমাত্মভগবৎ পুরুষোত্তমায় শ্রীনিত্যগোপালায় নমঃ।

দীর্ঘদিন পরে আজ আবার আমি নবদ্বীপবাসীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি। নবদ্বীপে আমি বহুবার আসিয়াছি এবং বহু সভায় বক্তৃতা করিয়াছি। কংগ্রেসের আন্দোলনে এবং তাহার পরেও একটা নূতন কৃষ্টির খবর লইয়া অনেকবারই নবদ্বীপ আসিয়াছি। নবদ্বীপবাসী জনগণ আমার আপনজন। বহু স্নেহপ্রীতিভালবাসা আমি নবদ্বীপবাসীদের নিকট হইতে পাইয়াছি। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর আগে মৎপ্রতিষ্ঠিত 'গৌরাঙ্গ-গোষ্ঠী'নামক সঙ্ঘের তরফ হইতে নবদ্বীপ আসিয়া এখানে উহার একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত করি, তখন সেই নবদ্বীপ গৌরাঙ্গগোষ্ঠী শাখার সভাপতি ছিলেন অদ্যকার সভার সভাপতি

আমার ভ্রাতা পুর্ণচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের পিতা ৺তারাপ্রসন্ন বাগচী মহাশয়। পুর্ণবাবুর মা আমাকে মায়ের মত কাছে বসিয়া খাওয়াইয়াছেন। এই রূপ নবদ্বীপের সহিত আমার কত স্নেহ ভালবাসা জড়িত হইয়া আছে। সেই নবদ্বীপে দীর্ঘদিন পরে আবার আজ আসিয়া নবদ্বীপবাসীকে আমার প্রাণের প্রীতি জানাই। আজ যাহা বলিবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, সে দিনও তাহাই বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা যাঁহার কথা ছিল, তাঁহার নামে সে কথা আপনাদিগকে শুনাই নাই। আজ তাঁহারই নামে তাঁহার কথা আপনাদিগকে বলিতে আসিয়াছি। কলিকাতার ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ স্থিত কেন্দ্রীয় মহানির্ব্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা সমন্বয়মূর্ত্তি ভগবান শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহারই সেবকরূপে তাঁহার বর্ত্তমান যুগোপযোগী জীবন ও জড়াজড় সমন্বয়ের দর্শন লইয়া আজ আমি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি।

একটী বড় বেদনার ঘটনা উল্লেখ করি। নবদ্বীপ আসিয়াছি, কিন্তু এই নবদ্বীপের সর্ব্বজন পরিচিত আমার গুরুভ্রাতা ৺জনরঞ্জন রায় উপস্থিত নাই। এই কিছুদিন হইল তিনি নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপালের শতবার্ষিকীর কাজ আরম্ভ করিয়া তাহা শেষ না করিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তিনি এবং আমার অপর গুরুভ্রাতা শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রচর্ত্তী যিনি এই সভায় উপস্থিত আছেন—এই দুই জনই কলিকাতা মহানির্ব্বাণ মঠের তরফ হইতে শ্রীনিত্যগোপালের শতবর্ষ উৎসব পালন করিতে আমাকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আরব্ধ কাজ শেষ না করিয়াই জনরঞ্জনবাবু চলিয়া গেলেন। শতবার্ষিকী কমিটীর তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাই আজ বুকভরা বেদনা লইয়া নবদ্বীপে শতবার্ষিকীর কাজ করিতে আসিয়াছি। জনরঞ্জন-বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের প্রাণের সমবেদনা জানাইতেছি।

এই নবদ্বীপ আমার দীক্ষাস্থান। ১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ আমপুলিয়া পাড়াস্থিত 'অবধূত আশ্রমে' সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের চরণতলে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার আশীর্ব্বাদে জীবনের যে নূতন কথার প্রেরণা আমাকে সারা বাঙ্গলার পথে পথে ঘুরাইয়াছে, তাহারই সেই জড়াজড় সমন্বয়ের বাণী লইয়া আজ আবার জীবনের এই সায়াহ্নে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।

আজিকার বলার বিষয় 'যুগসমস্যায় শ্রীনিত্যগোপাল।' বর্ত্তমান যুগের

সমস্যাটী কি? সমস্যাটী জড় ও অজড়ের, বাস্তববাদ ও অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের। এই সঙ্ঘর্ষকে দূরীভূত করতঃ তাহাদের সমন্বয় বিধান করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল বিশ্বের যুগ-চিন্তানায়ক। অজড়ের উপাসক ভারতীয় সভ্যতা ও জড়বাদের উপাসক পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের স্বয়ংমূল্য স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের স্থান ও মান স্বীকার করিয়া ইহাদের সমন্বয় শ্রীনিত্যগোপাল দার্শনিকভাবে প্রস্থাপন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপকতর ও গভীরতর সমন্বয়ধর্ম্মই বর্ত্তমান বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান দান করিতে সমর্থ।

মহাপ্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া জগাই মাধাই একদিন বলিয়াছিলেন,

বহুদিন শ্রবণে শুনেছি ঐ নাম
কভু তো পরাণ করেনি এমন,
(আজ) কি জানি কি এক নব ভাবোদয়
হৃদয় মাঝারে হতেছে।

ভারতবর্ষ অদ্বৈতবাদ শুনিয়াছে, দ্বৈতবাদও শুনিয়াছে, এমনি আরও অনেক বাদের সহিতই সে পরিচিত। কিন্তু শ্রীনিত্যগোপাল সেই অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদেরই এক নব রূপের খোঁজ দিয়াছেন—যেখানে দাঁড়াইয়া অদ্বৈতবাদের সঙ্গে দ্বৈতবাদের বিরোধ নাই, শঙ্করের সঙ্গে বুদ্ধের বিরোধ নাই, চার্ব্বাকের সঙ্গে আস্তিক্যবাদের বিরোধ নাই। শ্রীনিত্যগোপাল আমার নূতন শঙ্কর, নূতন রামানুজ, নূতন বুদ্ধ, নূতন কপিল, নূতন গৌতম, নূতন চার্ব্বাক।

বর্ত্তমান বিশ্বের প্রতিটী ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র আজ নিজ নিজ জীবনের সমগ্রতা হারাইয়া যুযুৎসু মনোবৃত্তি লইয়া দ্বিধা-বিভক্ত। এই বিভাগদ্বয় হইতেছে আত্মা-অনাত্মা বিভাগ, চৈতন্য-অচৈতন্য বিভাগ, মায়া-ব্রহ্ম বিভাগ, এক-বহু বিভাগ, আদর্শ-বাস্তব বিভাগ। দ্বিধা বিভক্ত আত্মা ও অনাত্মা প্রভৃতি চাহিতেছে পরস্পর পরস্পরকে দাবাইয়া, পরস্পর পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া অথচ সুকৌশলে চোরের মত এক অপরকে দিয়া নিজ অভিসন্ধি পূরণ করাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে। তাহাদের এই প্রয়াস যে-মন যুগপৎ জ্ঞানের উৎপাদন করিতে পারে না, সেই মনোধর্ম্মজাত। 'যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসঃ লিঙ্গম্'—যুগপৎ জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়াই মনের লিঙ্গ। মনের ভাষা নির্ম্মধ্যম নীতির ভাষা। হয় আত্মা নয় অনাত্মা, হয় চৈতন্য নয় অচৈতন্য, হয় আদর্শ নয় বাস্তব—ইহা মনেরই সিদ্ধান্ত। মন আত্মা-অনাত্মার

যৌগপদ্য বিধানে অক্ষম। অথচ সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোনও একটীকে লইয়াই জীবন চলে না। একান্ত আদর্শবাদ জীবনকে বাস্তব জীবন হইতে দূরে সরাইয়া রাখে, জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর কোনও সুস্থ সমাধান দিতে পারে না। আদর্শ চায় বাস্তবকে সঙ্কোচ করিতে কিম্বা নিরোধ করিতে, বাস্তবকে বাস্তব রাখিয়া বাস্তবকে পরম অর্থে গড়িয়া তুলিয়া কোনও আদর্শ ই এ যাবৎ প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু আজ বাস্তবের দাবী এমন করিয়াই আদর্শকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে যে, আদর্শেরও আজ ক্ষমতা নাই যে, সে বাস্তবকে একান্ত ভাবে অস্বীকার করে। একান্ত আদর্শ চলে নাই, চলিবে না, একান্ত বাস্তবও চলিবে না। মনের স্তরে এমন একটী প্রলয় আসিয়া গিয়াছে যে, আজ সামনের পথ রুদ্ধ। এই প্রলয় পয়োধিজলে নিমগ্ন মনঃকল্পিত বিশ্বের সামনে শ্রীনিত্য-গোপাল ধৃতবান্ অসি বেদং বিহিত বহিত্র চরিত্রম্ অখেদম্। শ্রীনিত্যগোপাল প্রলয় পয়োধিজলে নিমগ্ন বিশ্বের সামনে ঐ মনের স্তরের উর্দ্ধে অবস্থিত প্রাণময় এক স্তরের জীবন-দর্শন ও জীবন-চরিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ বার বার এই মধ্যম প্রাণকে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণতত্ত্বেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ।

উপনিষদে ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বন্দ্বের কথা আপনারা জানেন। একদিন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ কে বড় ইহা লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। চক্ষু বলে আমি বড়, কর্ণ বলে আমি বড়, মন বলে আমি বড়। কে ইহার মীমাংসা করিবে? সকলে মিলিয়া প্রজাপতির নিকট গেল। কে বড় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, যে দেহ হইতে চলিয়া গেলে দেহ অচল হইয়া যায়, সে-ই বড়। চক্ষু এক বৎসর দেহ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল। কিন্তু চক্ষু না থাকিলে তো লোক মরে না, অন্ধ লোক তো খাইয়া পড়িয়া বেশ থাকে। এক বৎসর পর চক্ষু ফিরিয়া আসিল। দেখিল দেহ যেমন সেইরূপই রহিয়াছে; সে তখন লজ্জিত হইয়া পুনরায় দেহে প্রবেশ করিল। এইরূপে একে একে কর্ণ বাক্য মন সকলেই এক বৎসর করিয়া দূরে সরিয়া থাকিয়া দেখিল দেহ জীবিতই রহিল। তখন প্রাণ বলিল এইবার আমি যাই। এই বলিয়া প্রাণ যেমন বাহির হইতে চাহিল, অমনি সকলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, প্রাণ তুমি থাক, তুমি গেলে আমরা কেহই থাকি না। তখন সকল ইন্দ্রিয় প্রত্যেকের শক্তি লইয়া প্রাণের মাঝে সংহত হইল।

এই যে প্রাণ, এই প্রাণ জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। বায়োলজিক্যালি যেমন সে জ্যেষ্ঠ, সাইকোলজিক্যালিও তেমনি শ্রেষ্ঠ। প্রাণ যে বায়োলজিক্যালি জ্যেষ্ঠ তাহা আমরা সহজেই বুঝি। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণে চক্ষু কর্ণ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ পরিস্ফুট হইবার পুর্ব্বেই প্রাণের সঞ্চার হয়। আর মনেরও পরের স্তরে স্থাপন করিয়া উপনিষদ এই মধ্যম প্রাণ যে সাইকোলজিক্যালিও শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল আমার অন্ন কি? ইন্দ্রিয়গণ বলিল—'আ স্বভ্যঃ আ শকুনিভ্যঃ'—কুকুর হইতে শকুনি পর্য্যন্ত জগতে যাহা কিছু ভক্ষ্য বস্তু অন্ন বলিয়া গৃহীত হয়, সে সকলই তোমার অন্ন। এই ভাবে সর্ব্বান্ন সর্ব্বম্ভরী মধ্যম প্রাণের মহিমা উপনিষদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রাণদর্শন যদি কোন 'শুষ্কায় স্থানবে' শুনান যায়, তবে সেখান হইতেও পত্র পুষ্পাদি উদ্গত হয়। 'শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে মরা ভ্রমর গুঞ্জরিবে।' মনের স্তর অংশদৃষ্টি সম্পন্ন স্তর, প্রাণের স্তর সমগ্রের স্তর। সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, কিন্তু প্রাণের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। দেহের এক স্থানে আঘাত লাগিলে সমস্ত দেহ টন টন করিয়া উঠে, প্রাণ কোথায়? সে সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। সমগ্রতার এই প্রাণতত্ত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন শ্রীনিত্যগোপাল।

এতদিনের দর্শনশাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে মনের স্তর হইতে। মন একদিকের কথা বলে, অন্য দিক বাদ দেয়—সে সমগ্রের ভাবনা ভাবিতে পারে না। একটা ঘরের অনেক দিক হইতে অনেক রকম ফটো তোলা যায়, কিন্তু সকল দিক মিলাইয়া হয় সমগ্র একটী ঘর। আপনি পিতার পুত্র, স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের পিতা, ভাইয়ের ভাই, আপনি কে? আপনি একটী সমগ্র সত্তা। সমগ্র লইয়াই আপনি। এই সমগ্রের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ মুর্ত্তিমান প্রাণ। মনের স্তর আজ ব্যর্থ, প্রাণের স্তর নামিয়া আসিতেছে। মনের স্তর ছাড়িয়া বিশ্ব আজ প্রাণের স্তরে পাড়ি জমাইয়াছে। মনের সঞ্চয় লইয়া আজিকার নূতন দিনের পথে চলা সম্ভব নয়—প্রাণের পথের পাথেয় অন্যরূপ। রবীন্দ্রনাথ সেইখানে ডাক দিয়াছেন:—

'ডাকিছে কাণ্ডারী এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা
আর চলিবে না।'

তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।'

এই প্রাণই অরবিন্দের ভাষায় অতিমানস স্তর, আজ সেই অতিমানস স্তর ধরার ধুলায় অবতরণ করিতেছে। ইহার নামই অবতারবাদ, অবতরণ।

শ্রীনিত্যগোপাল যখন আসিয়াছিলেন তখন একজন মাত্র তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। দুই জনের ভিতর ছিল গভীর প্রীতির সম্পর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিয়াছিলেন—'তুই এসেছিস, আমিও এসেছি।' এই দুই জনের আসার ভিতর গভীর উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিয়া গিয়াছেন সমন্বয়ের প্রথম পর্য্যায়, আর শ্রীনিত্যগোপাল দিয়া গিয়াছেন সমন্বয়ের দ্বিতীয় পর্য্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিয়া গিয়াছেন সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের ব্রহ্মজ্ঞান। আর শ্রীনিত্যগোপাল দিয়া গিয়াছেন জটিল কুটিল জীবনের ব্রহ্মজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'ট্যাঁকে টাকা ও সমাধি এক নিত্যগোপালেই সম্ভব'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল মূর্ত্তি অর্থাৎ কালী কৃষ্ণ শিব রাম আল্লা যীশু সবই যে এক ব্রহ্মময়ীরই রূপ, যে যে পথে পার যাও, গন্তব্যস্থান একই—ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। পথের সমন্বয়ের কথা তিনি বলেন নাই। পথের প্রশ্ন না তুলিয়া গন্তব্যস্থানের সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। আর শ্রীনিত্যগোপাল দিয়াছেন পথের সমন্বয়, পরস্পর বিপরীতের ব্যাপকতর ও গভীরতর সমন্বয়। উহা জড়-অজড়ের সমন্বয়, চৈতন্য অচৈতন্যের সমন্বয়, জ্ঞান ও অজ্ঞানের সমন্বয়, দ্বৈত অদ্বৈতের সমন্বয়, সাকার আকারের সমন্বয়, সাকার আকার নিরাকারের সমন্বয়, সর্ব্ব সমন্বয়। শ্রীনিত্যগোপালের সমন্বয় এতখানি। তিনি লিখিতেছেন,—'পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান।' আমার গুরুদেব বলিয়াই আমি শ্রীনিত্যগোপালকে আপনাদের ঘাড়ে চাপাইব না, আমি স্বরাজের উপাসক। আমি শুধু আপনাদের নিকট তাঁহার দিব্য জীবন ও দর্শন তুলিয়া ধরিব, আপনাদের যুগসমস্যার প্রয়োজনে তাঁহার জীবন ও দর্শন কোনও সমাধান বহন করিয়া আনে কিনা তাহা আপনারা বুঝিয়া লইবেন।

ভগবান বলিলেই মানুষ কাহাকেও ভগবান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, গ্রহণ করা উচিতও নয়। 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম এবম্ যো বেত্তি তত্ত্বতঃ'। ভগবৎ জন্মের এবং কর্ম্মের একটী তত্ত্ব রহিয়াছে। ভগবানের

জীবনের একদিক ব্যাপক অন্য দিক গভীর। 'বিস্তীর্ণঞ্চ গভীরঞ্চ দ্বিবিধং ভগলক্ষণম্'—ইহাই হইল ভগ শব্দের লক্ষণ। এই ভগের সহিত যিনি নিত্যযুক্ত, তিনিই ভগবান। আমার শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন এক দিকে গভীর, অন্য দিকে বিস্তীর্ণ। অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ ছোটকে, মাটিকে, প্রাণকে বাদ দিয়া বড়র উপাসনা করিয়াছে, অজড়ের, চৈতন্যের উপাসনা করিয়াছে। জড় তাই তাহাদের নিকট মিথ্যা, ছোটরা তাই বাদ পড়িয়া গিয়াছে। এইখানে সে বিস্তারের সাধনা করিয়াছে, কিন্তু গভীরতার সাধনা লয় নাই। আজ একান্ত অজড়বাদী ভারতবর্ষ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পাশ্চাত্যের জড়বাদের ধাক্কায় টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছে। আজ ছোটরা, লাঞ্ছিতেরা গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছে। কে ইহার মীমাংসা দিবে? দর্শনের ক্ষেত্রে শ্রীনিত্যগোপাল বান্ধব। জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য-বাদ প্রচার করার ফলে আজ জগৎ সত্য ব্রহ্মই মিথ্যা হইতে বসিয়াছে, অন্নের দুয়ারে আজ সকল অধ্যাত্মবাদীকে ধন্না দিতে হইতেছে। শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্ম এবং জগৎ এই দুইকেই দার্শনিক ভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশ্ব-নাগরিক। এই বিশ্বকে, জগৎকে স্বীকার করার মধ্য দিয়াই গভীরতাকে, রসকে স্বীকার করা হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল বলিতেছেন, তুমি প্রত্যক্ষ জগৎ দেখিতেছ, ইহাকে মিথ্যা বলিতে পার না। প্রত্যক্ষের উপর তিনি বার বার জোর দিয়াছেন—'প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়'। আজ দার্শনিকভাবে একটা পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে, নতুবা ভারতবর্ষ কম্যুনিজমের ধাক্কায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এই জায়গায় শ্রীনিত্যগোপালের দান অপূর্ব্ব ও অভিনব। দীর্ঘ দিন কংগ্রেসের কাজে লক্ষ লক্ষ লোকের সহিত মিশিয়াছি এবং চৌদ্দ হইতে পনর হাজার বক্তৃতা দিয়া ইহাই বুঝিয়াছি যে, দার্শনিক ভিত্তি পরিবর্ত্তিত না হইলে ভারতবর্ষে কোন আন্দোলনই কার্য্যকরী হইবে না। সেই কাজ করিয়া গিয়াছেন শ্রীনিত্যগোপাল। ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে আমি যখন এক বৎসর জেলে ছিলাম, তখন তাঁহার এই দর্শন ও জীবনের আলোকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া উপনিষদের ঈশ কেনো আদি ১১ খানার ভাষ্য এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখিয়াছি। বেদান্তের ভাষ্য ১৯১৯-এই লিখিয়াছিলাম। অবশ্য আমি ফকির মানুষ, অর্থাভাবে দুই তিনখানি বই মাত্র ছাপ হইয়াছে।

বৈদিক যুগে নহে, দার্শনিক যুগে এই মাটির জগতকে অস্বীকার করিয়া সকল দার্শনিক দর্শন শাস্ত্র লিখিয়াছেন এবং তাহার উপর ভারতবর্ষের সমাজ গঠিত হইয়াছে। সংসারকে মিথ্যা বলিয়া শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাহাকে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহাকে দূর ছাই বলিয়া সরাইয়া দিয়াছে। অকৃতজ্ঞ ভারতবর্ষ আজ তাহারই ফল ভুগিতেছে। সংসার মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য বলিয়া সকলেই বৈকুণ্ঠের টিকিট কাটিয়া বসিয়া আছেন। সংসারের মূল্য দিয়া সংসার করা হয় নাই—সংসার তো ভূতের বেগার খাটা, দুই দিন পর যাহাকে ছাড়িতেই হইবে, তাহার জন্য আর কে মাথা ঘামায়! এ দেশ কর্ম্মের মূল্য দেয় নাই। এ দেশ নৈষ্কর্ম্ম্যের দেশ; কর্ম্ম ছোট, উহা অস্পৃশ্য, জপ-তপ বড় এবং তাহা সাত্ত্বিক। অবশ্য একদিন তাহাও থাকিবে না। 'ধ্যান করবি মনে বনে কোণে'। ইহারই ফলে দেশকে দীর্ঘদিন মুসলমান ও ইংরাজের পদানত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। একটি গল্প আছে; এক ভারতবর্ষের ছেলে এক ইংরাজের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ভাই তোমার বাপেরা আমাদের দেশে কেমন করিয়া প্রবেশ করিল? ইংরাজের ছেলে বলিল, যে দিন তোমার বাপেরা চোখ বুজিয়া কোণে বনে ধ্যান করিতেছিল, সেই সময় আমার বাপেরা তোমাদের দেশে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষ কর্ম্মকে, মানুষকে অস্বীকার করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যের ও জগতের ওপারে ভগবানকে লাভের নেশায় ছুটিয়াছিল। আজিকার প্রতিক্রিয়া তাহারই ফল। বুদ্ধ আসিয়াছিলেন মানুষের গৌরব, কর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই কথা স্থাপন করিতে। তিনি ঈশ্বরের কথা বাদ দিয়া শুধু মানুষের জীবন গঠনের উপর, চরিত্র গঠনের উপর জোর দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ তাঁহাকে লয় নাই। বুদ্ধকে যদি সেদিন ভারতবর্ষ লইত, তাহা হইলে পাকিস্থান হইত না। ভারতীয় প্রচলিত দর্শন ও সমাজ কেবল মানুষকে বর্জ্জনই করিয়াছে, হজম করিতে তাহারা জানে না। এই হজম করার ধর্ম্ম লইয়া নানক, কবীর মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সনাতন ভারত লয় নাই। অদ্বৈতবাদী ভারতবর্ষ বহুর মূল্য, ক্ষণের মূল্য স্বীকার করে নাই। এ দেশে দার্শনিকে দার্শনিকে কেবল লড়াই, কেহই কাহারও মত স্বীকার করেন না। অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক শাক্ত বৈষ্ণব শৈব জৈন বুদ্ধ ইত্যাদিতে কেবল লড়াই। বুদ্ধ বলেন বহু সত্য এক মিথ্যা, আচার্য্য

শঙ্কর বলেন একই সত্য বহুই মিথ্যা। ইহা লইয়া রক্তারক্তি। কেহই কাহাকেও অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইতে পারেন নাই, রহিয়াছেন সকলেই, কেবল নাই পরস্পরের সহিত মিলন। শ্রীনিত্যগোপাল এই এক ও বহুর বিবাদ মিটাইয়া বলিলেন, শ্রীভগবান একও বটে, বহুও বটে, এক ও বহুর অতীতও বটে। নিজেকে তিনি বলিতেছেন, 'আমি অভেদ-বাদীও বটে, প্রভেদবাদীও বটে'। তিনি লিখিতেছেন, 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পুর্ণ, পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ।' এই অল্প ও পুর্ণের ভেদ মিটাইয়া উহাদের সমন্বয় স্থাপন করিবার জন্য শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন। তিনি সকল মতবাদের স্বীকৃতির মধ্য দিয়া এক মহারাসের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছেন। সেখানে অদ্বৈতবাদী ধরিবে দ্বৈতবাদীর হাত, দ্বৈতবাদী ধরিবে পাতঞ্জলের হাত, শঙ্কর ধরিবেন চার্ব্বাকের হাত, বৈষ্ণব ধরিবেন শাক্তের হাত, যীশু ধরিবেন মহম্মদের হাত। এই মহারাস সম্মুখে আসিতেছে।

বর্ত্তমান যুগ ভাগবত ধর্ম্মের যুগ, সমগ্রতার যুগ; মুনিঋষির ঐকদেশিক শাস্ত্র আজ অচল। ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, 'মন্বাদিমুখেন বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মানুক্ত্বা অতিরহস্যত্বাৎ স্বমুখেনৈব ভগবতা অবিদুষামপি পুংসাম অঞ্জঃ সুখেনৈব আত্মলব্ধয়ে যে বৈ উপায়াঃ প্রোক্তাঃ তান্ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ বিদ্ধি'। মুনিঋষিরা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের, অরণ্যের বেদান্ত বলিয়াছেন। সেই আরণ্যক বেদান্তকে শ্রীকৃষ্ণ নাগরিক বেদান্ত করিয়াছেন। ভারতের শেষ বেদান্ত গীতা পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্রের বুকে উচ্চারিত হইয়াছিল। আজ আর মনে বনে কোণে বসিয়া বেদান্ত শুনিলে চলিবে না, বাস্তবের মূল্য দিয়া আজ যুদ্ধের মাঝে বেদান্ত শুনিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সেই বেদান্তই শুনাইয়া গিয়াছেন, আমাদিগকেও সেই বেদান্তই শুনিতে হইবে। সংসার সন্ন্যাস এক করিতে হইবে, জনকের আদর্শ লইতে হইবে।

এই ভাগবত ধর্ম্ম লইয়াই গৌর আসিয়াছিলেন। রসরাজ মহাভাব শ্রীগৌর আমার একাধারে এক তনুতে রাধাশ্যাম। এই শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় কলেবর শ্রীনিত্যগোপাল এক শত বৎসর পুর্ব্বে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু রস ও ভাবের মিলিত বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়া উহাদিগকে মিলাইতে আসিয়াও সেদিন আবেষ্টনকে মানিয়া লইয়া নিজের কাজ শেষ

করিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্রীনিত্যগোপাল মহাপ্রভুর সেই আরব্ধ ব্রতকে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্র হইতে প্রসারিত করিয়া বাস্তব জীবনেও তাহাকে বিস্তৃত করিয়া গিয়াছেন। যিনি ব্রজের গোপাল তিনিই গৌরগোপাল আবার তিনিই শ্রীনিত্যগোপাল। আদর্শ ও বাস্তব এই উভয়কে সমমূল্যে স্বীকার করিয়া কি করিয়া জীবনকে পরিচালনা করিতে হয় সেই সংবাদ যিনি নিজ জীবন ও দর্শন দিয়া প্রস্থাপন করিয়া গেলেন, তিনিই বর্ত্তমান যুগের সকল প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম। সেই শ্রীনিত্যগোপালের জড়াজড় সমন্বয় বার্ত্তা মানুষকে পথ দেখাইবে। বন্দে মাতরম্।

'শূদ্র নারায়ণকে স্পর্শ করিলে নারায়ণ অপবিত্র হন্, একথা সঙ্গত নহে। পরম পবিত্র যে নারায়ণ, তাঁহাকে চণ্ডাল স্পর্শ করিলে পর্য্যন্ত সে পবিত্র হয়।'

*   *   *   *   *

'ঋকবেদের কোন স্থলে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের ঐ বেদে অধিকার নাই বলা হয় নাই। ঋকবেদের কোন কোন সূক্তের ঋষিই স্ত্রীলোক। বিশ্ববারা নাম্নী কোন একটী স্ত্রীলোক ঋকবেদের কোন একটী সূক্তের ঋষি। সুতরাং ঋকবেদে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।'

শ্রীনিত্যগোপাল

হৈমন্তী

শ্রীসুধা দেবজা

ধূসর কুয়াসা ঢাকা হিমেল প্রত্যূষ
তিমির রাতের শেষে ধীরে নেমে এলো
সিক্ত অঙ্গ আবরিয়া সূক্ষ্ম আচ্ছাদনে
দাঁড়ালো উদয় দ্বারে। মেলি কমল নয়ন পল্লব
স্মিত স্নিগ্ধ দৃষ্টির প্রসাদে ধরারে পরশ করে।
আনন্দ স্পন্দন জাগে পৃথিবীর বুকে। সহস্র
কাকলি ছন্দে ওঠে আবাহন। অঙ্কুরে অঙ্কুরে
সমুদ্গত কিশলয়ে চকিত কম্পন।
নিদ্রাগত মূর্চ্ছাহত
অন্ধকারা টুটি চেতনার মহা আবির্ভাব। ছিন্ন কর
ওই সূক্ষ্ম কুহেলীর মায়া তবে সুন্দর প্রভাত!
আমারে দেখাও তব ভাস্বর যে রূপ। বিচ্ছুরিত
জ্যোতির লাবণ্য সহস্র ধারায় যার। অপরূপ
অনির্বচনীয়। অপূর্ব সে আলোর সুধায় ভরি লব
দেহপাত্র। জরত্বের জীর্ণ মৃত্যু পার হয়ে এসে
জাগ্রত জীবনে মোর পুনর্জন্ম হোক—অপগত
মূঢ়তার গাঢ় নিদ্রা যত!

ছোটদের গ্রন্থাগার

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

ছোটদের গ্রন্থাগারের নিয়ম কানুন যত সহজ ও সরল হয় ততই ভাল। নিয়মের সংখ্যাও যত কম হয় ততই মঙ্গল। বিলাতে সচরাচর প্রধান প্রধান কয়েকটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, যথা—পরিচ্ছন্নতা, গ্রন্থাগারের ভিতর উচ্ছৃঙ্খলতা না করা, শিষ্টাচার বা নিয়মানুবর্ত্তিতা, বই-এর প্রতি যত্ন, বাড়ীতে আনিয়া বই ঠিক ভাবে শেষ করা ও বইপত্র অসুখ বিসুখে সংক্রামক না করা। ও দেশের ছেলে মেয়েরা ও তাহাদের মা বাপ সবাই জানেন যে বই ছিঁড়িলে বা নষ্ট করিলে তাহার মূল্য দিতে হয়—ঠিক সময় বই ফেরৎ না দিলেও সচরাচর প্রতি সপ্তাহে ১ পেনি হিসাবে ফাইন নিবার ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগারিক অনেক সময় এই ফাইন মাপ করিতে পারেন যদি তাহার সঙ্গত কারণ থাকে।

শিশু-গ্রন্থাগারিককে অশিষ্ট ছেলেমেয়েদের শাসন করিবার জন্য সময় সময় কড়া হইতে হয়, এমন কি গ্রন্থাগারের তালিকা হইতে তাহাদের নাম সাময়িকভাবে কাটিয়া দেওয়ার ক্ষমতা গ্রন্থাগারিকের থাকে। আগেও বলিয়াছি যে শতকরা ৯০।৯৫ জন শিশু-গ্রন্থাগারিকই মহিলা। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিকের কাজে মহিলাদের প্রবেশ এখনো ব্যাপকভাবে সুরু হয়নি, তবে গ্রন্থাগারিক শিক্ষায় আজকাল ২।৫ জন মহিলা ছাত্রী আগাইয়া আসেন, ইহা লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও গ্রন্থাগারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলা কর্ম্মীদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এই আশা করা যায়।

শিশু-গ্রন্থাগার নানা ভাবে কাজ করিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রধান ও প্রথম কাজ হইল উপযুক্ত ভাবে বইএর ব্যবহার করিতে শেখান। গ্রন্থাগারে গল্পের আসরের কথা আগেই বলিয়াছি। ঐ গল্পের আসরে অনেক সময়ে নতুন বই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, অনেক ভাল বইএর খবর দেওয়া হয়। যাহাতে ঐ সব বই ছেলে মেয়েরা পড়ে তাহার জন্য একটা আগ্রহ সৃষ্টি করাই

হইল আসল। গল্পের আসরে কম বয়সী ২৫।৩০ জন ছেলেমেয়ে—কোথাও কম কোথাও বেশী—এক সঙ্গে হয়। তাহাদের সঙ্গে নানা শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে কথা হয়। কখনো গল্পের ছলে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, কখনো ম্যাজিক লণ্ঠন বা ফিল্ম দেখাইয়া দেশ বিদেশের ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়ে ছবি দেখান হয়। এই সব গল্পের আসরে সচরাচর বেশ ভীড় হয়, কাজেই পূর্ব্ব হইতে টিকিট না বিতরণ করিলে নির্দ্ধারিত দিনে প্রবেশ পথে বেশ গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বয়স্ক ছেলেমেয়েদের অনেক জায়গায় ছেলে ও মেয়েদের আলাদা আলাদা দিনে গল্প ও ছবি দেখানর ব্যবস্থা আছে। অনেক জায়গায় এক সঙ্গেই সবাই দেখে।

প্রায় প্রত্যেক শিশু-গ্রন্থাগারে অথবা সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগে নিকটবর্ত্তী স্কুল হইতে এক একটি ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তাহাদের শিক্ষক বা শিক্ষিকা সমভিব্যাহারে গ্রন্থাগারে আসে। ইহাদের আসার সময় পূর্ব্ব হইতে ঠিক করা থাকে, গ্রন্থাগারিক সেই মত ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। প্রয়োজন মত বিভিন্ন বিষয়ের বই যাহা ছেলেমেয়েদের দেখা দরকার সে সব গ্রন্থাগারের বিভিন্ন জায়গা হইতে এক জায়গায় জড করা হয় যাহাতে ছেলে মেয়েরা আসিলে সেই সব বইপত্র এক জায়গায় বসিয়া দেখিতে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ব্যবস্থা, গ্রন্থপঞ্জীর যথাযথ ব্যবহারের নিয়ম, বই ঠিকভাবে ব্যবহার করার নিয়ম, ও রেফারেন্সের বইয়ের ঠিকঠিক কাজে লাগানোর উপায়—এই সব বিষয়েই ছেলেমেয়েদের হাতে খড়ি হইতে থাকে। এই সব শিক্ষা বয়স্ক ছেলেমেয়েদের খুবই কাজে লাগে, কেন না অল্প দিন পরেই তাহারা সাবালক হইয়া সাধারণ পাঠাগার ব্যবহার করিতে যাইবে। বিলাতে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নানা সমিতি আছে—যাহা গ্রন্থাগার হইতে অনেক বিষয়ে সাহায্য পায়—যথা ছেলেমেয়েদের পাঠচক্র, স্ট্যাম্প ক্লাব, অভিনয় আসর, গানের আসর বা সঙ্গীত সভা, ভ্রমণচক্র। আমাদের দেশে আজকাল বিশেষ সহরের স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভিতর স্ট্যাম্প জোগাড় করার একটা নেশা কাহার কাহার হইয়াছে দেখা যায়। অনেক বড় স্কুলে অবশ্য নাচগান ও থিয়েটার, আবৃত্তি ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এই সব আয়োজন ও ব্যবস্থা মোটেই ও দেশের মতন ব্যাপক নয়। আমাদের ছেলেমেয়েদের চারিদিক দিয়া চৌকস করিয়া তুলিতে হইলে এসব বিষয়েও সতর্ক হইতে হইবে—শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছোটদের গ্রন্থাগারিকদের এ বিষয়ে সচেষ্ট না হইলে

চলিবে না। কিন্তু মাতাপিতা ও অভিভাবকদেরও এ বিষয়ে কিছু নজর দেওয়া প্রয়োজন। ওদেশের প্রায় প্রত্যেক শিশু-গ্রন্থাগারে ও সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগে ছোটদের জন্য বেশ সুন্দর চিত্র সংগ্রহশালা গড়িয়া উঠে। বড় বড় গ্রন্থাগারে অবশ্য ইহার জন্য অনেক পয়সা খরচ করিয়া ভাল ছবি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গাতেই বেশ অল্প খরচে শুধু সমবেত চেষ্টায় ছোটদের উপযোগী ছবি সংগ্রহ করা হয়। পুরাতন ও অকেজো বই, ম্যাগাজিন, সাময়িক পত্রিকা, ক্যাটালগ্ ইত্যাদি হইতে ছবি সব বাছিয়া কাটিয়া লইয়া অন্য মোটা কাগজে আঁটিয়া রাখা হয়। এক রকম মাপের কাগজে আঁটিলে দেখিতেও বেশ সুন্দর হয় এবং ঐ সংগ্রহ যদি ছবির বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন ভাগে গুছাইয়া রাখা হয় তাহা হইলে অনেক সময় অনেক কাজে লাগে। অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি এই সব ছবি বর্গীকরণ পদ্ধতিতে নম্বর দিয়া গুছাইয়া রাখা আছে এবং কাজে অকাজে ছোট বড় অনেকেই নানা বিষয়ের ছবির খোঁজ এই সব সংগ্রহে পাইয়া থাকেন। ছেলে মেয়েদের ঠিকভাবে দেখাইয়া দিলে তাহারাও এই সংগ্রহের কাজে বেশ সাহায্য করিতে পারে—তাহাদের কাজ করাও হয়, শিক্ষাও হয়। বিলাতের বহু স্কুল হইতে শিক্ষক শিক্ষিকারা এই সব চিত্র সংগ্রহশালা হইতে নিজেদের প্রয়োজন মাফিক বিষয়ের ছবি ও ছবির মাল মশলা সংগ্রহ করেন। এই সব ছবি শিক্ষকদের ধার দেওয়া হয়, তাঁহাদের প্রয়োজন ফুরাইলে ছবি আবার গ্রন্থাগারে ফিরিয়া আসে। অনেক গ্রন্থাগারে এই সব ছবির সংগ্রহ বেশ ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে—৬০।৭০ হাজার বা আরো বেশী সংখ্যক ছবি অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। আমাদের দেশে এই একটি জিনিষের চলন এখনো হয় নাই ; ব্যাপক ভাবে ত নয়ই—সীমাবদ্ধ ভাবেও আমাদের দেশের ছোট বড় কোনো গ্রন্থাগারেই চিত্র-সংগ্রহ রাখার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। আর্টস্কুলের কথা বাদ দিয়াও খুব কম জায়গাতেই সাধারণ লোকের ছবি দেখার আগ্রহ বা প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে জ্ঞানীগুণী কেউ উপলব্ধি করেন বলিয়া মনে হয় না। হয়তো বা ২।৫ জন আছেন যাঁহাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আছে, কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে তাঁহারা মুখ খোলেন না। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকদের এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। বিশেষ ছোটদের শিক্ষার ব্যাপারে ছবির সাহায্য অনেক কাজ করে। আমাদের দেশে দেশী বিদেশী অনেক ছবির বই আসে যাহা হয়ত যত্ন করিয়া রাখা হয় না—রাখার

দরকারও কেহ বোধ করে না—ঐ সব বই ও কাগজ পত্রাদি হইতে ছবি কাটিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিতেও খুব বেশী খরচ হয় না।

ছোটদের গ্রন্থাগারে ছেলেদের ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্র প্রকাশের রীতি ওদেশে প্রচলিত আছে। কোথাও বা হাতে লিখিয়া, কোথাও টাইপ্ করিয়া বা cyclo styled করিয়া, কোথাও বা ছাপিয়া। Croydon, Leads, Hendon, Islington ও নানা গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগে ঐরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি। এ পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা খুব বেশী নয় কিন্তু নিয়মিত ভাবে ইহাতে নূতন বই এর খবর, কোথাও বা নূতন বই সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের নিজস্ব মতামত, নিজেদের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও তাহার সুবিধা অসুবিধার কথা ইত্যাদির আলোচনা থাকে। ছেলেমেয়েদের রচনা ও লেখাও ইহাতে পত্রস্থ করা হয়। ছেলেবেলা হইতে নূতন বই ও গল্প সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশের এই ব্যবস্থা বই রিভিয়ু করার হাতে খড়ি বলা যাইতে পারে। ইহার দাম শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ও ছেলেবয়েস হইতে এই প্রচেষ্টার চলন রাখার উপকারিতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে কেহই দ্বিমত হইবেন না। গ্রন্থাগারে নূতন বই কি কি আসিল বা কি কি বই শীঘ্র আসিবে—গল্পের আসরে কে কি বিষয়ে বলিবেন—গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নূতন কোনো খবর—কোনো একটি বিষয়ের, বিভিন্ন বইয়ের বা লেখার নাম—এই সব পত্রিকায় স্থান দেওয়া হয়। এই ধরণের পত্রিকার প্রচলন আমাদের দেশে খুব অসম্ভব নয়, হয়তো ২।৪ জায়গায় আছেও। কিন্তু শুধু ছেলেমেয়েদের লেখা গল্প ও পদ্যর বদলে যদি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া এই রকম পত্রিকার চলন হয়—যাহাতে নূতন ও ভাল বই সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সমালোচনা—দেশবিদেশের গ্রন্থাগারের খবর, দেশে নূতন বই ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রয়োজনীয় কোথায় কি প্রকাশ পাইয়াছে ইত্যাদি তালিকা থাকিলে এগুলি বেশ কাজের জিনিষ হইয়া উঠে। ছোট ছেলেমেয়েদের—তাহাদের বই কেন ভাল লাগিল—কেন ভাল লাগিল না এ বিষয়ে আলোচনা প্রচলন হইলে—ছেলেমেয়েদের বইয়ের বিষয় ভাবিবার সুযোগ বেশী দেওয়া হইবে—তাহারা সমালোচনাও করিতে শিখিবে—ভবিষ্যতে এই জ্ঞান তাহাদের আরো প্রখর হইবে। আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার, শিশু-গ্রন্থাগার কাহারো সঙ্গেই স্কুলের গ্রন্থাগারের কোনো যোগাযোগ নাই। এদেশে সহরের প্রায় সব স্কুলেই একটা করিয়া নামমাত্র গ্রন্থাগার রাখার ব্যবস্থা আছে

—না হইলে সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থাগারে নিয়মিত বই আসিতেছে কিনা—গ্রন্থাগারের ব্যবহার ঠিক ভাবে হইতেছে কিনা অথবা ব্যবহারের প্রসার হইতেছে কিনা এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা আছে বলিয়া মনে হয় না। স্কুলের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক যিনি তাঁহার গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জ্ঞান কতদূর আছে, শিশুদিগের উপযোগী বই বাছা ও গ্রন্থাগারকে শিশুদের মনের মতন করিয়া তোলা এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন সব দেশেই আছে, আমাদের মতন শিক্ষায় অনগ্রসর দেশের ত কথাই নাই। কিন্তু এসব বিষয়ে আমাদের দেশের স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ অথবা শিক্ষাদপ্তর কতটা ভাবেন তাহা আমার জানা নাই। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারকে সকলের প্রিয় করার খুব বেশী প্রচেষ্টা হয় না। ছোট ছেলে মেয়েদের প্রায়ই দেখা যায় যে বই দেখিলেই তাহারা তাহা হাতে করে—কিন্তু কি বাড়ীতে কি অন্যত্র আমরা অভিভাবকরা ও বড়রা সবাই বইটি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া নেই—বইয়ে হাত দিতে নাই, বই ছিঁড়িয়া যাইবে—এই তাহাদের বলা হয়, কোথাও বা বকিয়া দেওয়া হয়। এ রীতি খুবই খারাপ—ছেলেবেলা হইতেই তাহাদের বই এর ঠিক ঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া দরকার—যেমন ও দেশে হয়—তাহাতে বই ছিঁড়িবেও কম—জ্ঞানও বাড়িবে।

শিশু-গ্রন্থাগারে—ঐ সব দেশে—পড়িতে শেখে নাই এমন সব বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যও ছবির বই রাখা হয়—যাহা তাহারা নিজেদের ইচ্ছা মত নিয়া ব্যবহার করে। ইংলণ্ডের সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ হইতে নিকটবর্ত্তী সব স্কুলে বই যোগান দেওয়া হয়। নিয়মিত ভাবে স্কুলে বই নিয়া যাওয়া হয় ও পুরাতন বই ফিরাইয়া আনা হয়। এ যে অনেক সুবিধা—দামী বই সব সময়ে স্কুলে কেনা সম্ভব নয়। কিন্তু উপরোক্ত ঐ প্রথানুযায়ী প্রায় সব স্কুলই ঐ বিনিময়ের মাধ্যমে সব বই পায় ও ছেলেমেয়েরাও তাহা পড়িবার সুযোগ পায়। স্কুলের যত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ততগুলি করিয়া বই স্কুলে দেওয়া হয়। ৩।৪ মাস অন্তর কোথাও বা ৬ মাস বা ১ বছর অন্তর ঐ স্কুলের পুরাতন বই বদলাইয়া আনা হয়। শিক্ষক শিক্ষিকারা তাঁহাদের প্রয়োজন মত বইয়ের তালিকা আগে গ্রন্থাগারিককে পাঠাইয়া দেন ও সেই চাহিদা মতন বই সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগার হইতে বই স্কুলে নিয়া যাওয়া হয়—পুরাতন বই ফেরৎ নিয়া নূতন বই দিয়া আসা হয়। এই রকম কাজে ইংলণ্ডের বহু স্কুলে স্কুলে ঘুরেছি। অনেক সময় বিভিন্ন বয়সানুযায়ী বিভিন্ন ক্লাসে ক্লাসে ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের

উপযোগী বই নিয়া যাওয়া হয়—ছেলেমেয়েরা তাহা হইতে বই বাছিয়া নেয়। অনেক সময় নিজেদের চাহিদানুরূপ বই না পাইলে গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের নিজেদের চাহিদার বিষয় জানায়—তাহাদের চাহিদানুযায়ী বই যোগান দিবার বিশেষ চেষ্টা করা হয়। ইহাতে ছেলেমেয়েদের বই পড়ার আগ্রহও বাড়ে—নিজেদের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে দরদও হয়। জ্ঞানের অনুসন্ধানের ও অনুশীলনের কত যে সুবিধা গ্রন্থালয় হইতে পাওয়া যায়, এ বিষয়ে ছেলেবেলা হইতেই সকলের বেশ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বড় হইয়া গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উহাদের জ্ঞান বাড়ে ও গ্রন্থাগার হইতে নিজেদের পড়িবার ও জ্ঞানান্বেষণের সব চেষ্টা ও সুবিধা আদায় করে। স্কুল হইতে ঐ জ্ঞান জন্মান দরকার, তবেই বড় হইয়া ছেলেমেয়েদের জন্য আর বিশেষ কিছু ভাবিবার থাকে না। ভিত্তি ঠিকমতো হইলে তাহার উপর কাঠামো দাঁড় করান খুব শক্ত নয়। কিন্তু আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে ভিত্তি কিছুই দেওয়া হয় না—কাজেই ভবিষ্যৎ জীবনেও তাহারা প্রতি পদে আঘাত পায়।

অনেক স্কুলে আলাদা নিজস্ব গ্রন্থাগার না থাকায় ছেলেমেয়েরা সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগ হইতে বই নেয়—এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক প্রতি স্কুলে ও ক্লাশে ঘুরিয়া ছেলেমেয়েদের চাহিদা শিক্ষকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় নিজের গ্রন্থাগারের সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদির বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের শিক্ষা স্কুলের শিক্ষার সহযোগী হিসাবে কাজ করে। সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের উপরই অথবা শিশু-বিভাগের গ্রন্থাগারিকের উপরই শিশু-গ্রন্থাগারের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে। বিদেশে শিশু-গ্রন্থাগারিকের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থার প্রচলন আছে—একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় এ শিক্ষার খুবই প্রয়োজন—আমাদের দেশে শিশু-গ্রন্থাগার অথবা সাধারণ গ্রন্থগারে শিশু-বিভাগ যত বেশী বাড়িবে, ততই শিশু-গ্রন্থাগারিকের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। আশা করা যায় এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সম্যক ওয়াকিবহাল। ওদেশে শিশু-গ্রন্থাগারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিতর নানা বিষয়ের প্রতিযোগিতা হয়, তাহাতে ছোট ছোট প্রাইজও দেওয়া হয়। ইহাতে ছোটদের মন সহজে আকর্ষণ করা যায়। আমাদের দেশেও তাহার প্রচলন খুব সহজেই করা যায়। গ্রন্থাগারিককেই নিজেদের অবস্থানুযায়ী সব বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে—তাঁহার চেষ্টাতেই গ্রন্থাগার সজীব বা নির্জীব হইবে—একথা তাঁহাকে সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে॥

অপরাধপ্রবণ লোধা জাতির কথা*

শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক

আজকার দুনিয়া আর হাজার বছর আগের দুনিয়ায় তফাৎ অনেক। মানুষের সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক জীবনে এই তফাৎ বেশ নজরে পড়ে। বিভিন্ন অবস্থায় বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মানুষের রীতিনীতি পাল্টে যায়। কোথাও বা সহজ সরল সুস্থ জীবন এক পঙ্কিল আবর্তে পাক খেয়ে যায়। আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে লোধা নামে এক সম্প্রদায় আছে। মেদিনীপুরে তাদের সংখ্যা অধিক। কালের পরিপ্রেক্ষিতে তারা এখন স্বভাব-দুর্বৃত্ত (Criminal tribe) জাতি বলে পরিগণিত। বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানী মন তাদের এই স্বভাবেরও কারণ নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছে; সুস্থ, নিরুপদ্রব সমাজ-জীবনেরও ইঙ্গিত দিয়েছে। আজ বিশ্বের দরবারে এদেরও প্রয়োজন আছে।

মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশে পাহাড়ী দেশের হদিশ মিলে। আম-মহুয়ার ঠাসাঠাসি, লম্বা লম্বা শালের গাছ, লাল গুঁড়িমাটি, কোথাও বা অপ্রশস্ত নদী— গ্রীষ্মে শীর্ণা, বর্ষায় পুষ্টা; কোথাও বা ধরিত্রী ঝর্ণাধারায় স্নাতা। এই পরিবেশ হলো লোধাদের। অবশ্য এদের সঙ্গে অন্যান্য জাতি-উপজাতিও আছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোড়া আর কোথাও বা মাহাত, রাজু, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য ও কায়স্থ। এদের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। কিছুদিন আগে তারা ১১,০০০ হাজার পর্য্যন্ত ছিল। অন্যান্য জাতি উপজাতির সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে, এরা স্বভাব-দুর্বৃত্ত বা অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে পরিগণিত ছিল। আর এখনও প্রায় সবাই এদের সেই ভাবে দেখে থাকে; অর্থাৎ কোথাও কোন চুরি ডাকাতি হলেই কি সরকার, কি জনসাধারণ, সকলেই এদের সন্দেহ করেন এবং তাদের জন্যে অনুরূপ ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়।

এদের অতীত ইতিহাস গৌরবে সমুজ্জ্বল। রামায়ণে দেখা যায়, প্রতীক্ষমানা শবরীকে বন্য বেশে। মহাভারতের যুগের কিরাত বা চণ্ডী-মঙ্গলের ব্যাধ (কালকেতু-ফুল্লরা) হলো এদের সগোত্র। এদের কাজই হলো

* জ্ঞান ও বিজ্ঞান (আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪) সংখ্যা হইতে গৃহীত।

ফলমূল ও মাংসের সংস্থান করা এবং বন্য জীবন-যাপন। উড়িষ্যার প্রভু জগন্নাথেরও অতীত জীবন কেটেছে বিশ্বাবসু শবরের আশ্রয়ে, নীলাচলে—নীলমাধবরূপে। সুকৌশলী ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি শবরতনয়া ললিতাকে স্ত্রীরূপে বরণ করায় নীলমাধব লাভের পথ সুগম হয়েছিল। এদের দেহ মনে এই কাহিনী জাগরূক। কাহিনী নয়, যেন সেদিনের ঘটনা। তারপর থেকে নাকি এরা ব্রাহ্মণকে আর শ্রদ্ধা করে না, জামাইয়ের বংশধর বলে। তাই এদের সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান নেই। অতীতে যাই হোক না কেন, আমার ধারণা লোধা শব্দ লুব্ধক শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। লুব্ধক মানে হলো ব্যাধ। কেউ কেউ মেদিনীপুর শহরের চিড়মার বা শিকারীদের সঙ্গে এদের বংশাবলীর জের টানেন।

এরা দেখতে বেঁটে এবং কালো। ঢেউ খেলানো চুল এবং মুখে দাড়ি-গোঁফ অপ্রচুর। বিকৃত বাংলা ভাষায় এরা কথা বলে। লেখাপড়া-জানা লোক এদের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে।

জঙ্গলে যাদের ব.স তাদের ঘরদোর খুব ছোট ছোট; দোচালা বা চারচালা। ডালপালার উপর মাটির আস্তরণ দিয়ে দেওয়াল তৈরী হয়। জানালা নেই—আর দরজা খুব ছোট। অনেক সময় হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। ঘরের উপকরণ অতি নগণ্য। কয়েকটি বাসন কোসন, অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস; খেজুর পাতার দু-একটা চাটাই; বিয়ের বাসরে সেইটির খোঁজ পড়ে। এরা প্রায় ভূমিহীন—পরের জায়গায় বাস করে থাকে। জঙ্গলের ধারে বা সভ্য মানুষের সংস্পর্শের বাইরে থাকতেই এরা ভাল বাসে। মেয়ে-পুরুষ সবাই সমানে ক্ষেতে কাজ করে এবং অনেকে গাঁয়ে দিনমজুরী করে। কেউ কেউ বনের কাঠ সংগ্রহ করে' বিক্রী করে বাড়ী বাড়ী গিয়ে। সাপের চামড়া, কচ্ছপ, মাছ বা মধু সংগ্রহ করে' বিক্রী করা এদের আর এক ব্যবসায়। শীকারের জন্য তীর ধনুক আছে আর মাছ ধরবার জন্যে আছে জাল ও ঘুনি। বসন্তের মাতাল হাওয়ায় মহুয়া ফুল ঝরে পড়ে, লোধারমণী তার সন্ধান পায়। তখন এরা শুখা করে' বিক্রী করে। আর সব চাইতে অদ্ভুত ব্যবসায় যা নাকি সকলে করে না, সেটা হলো চুরি করা। অবশ্য মুরগী, ছাগল, ঘটিবাটি চুরি করে অনেকে। আবার সিঁদকাটা, রাহাজানি ডাকাতি করেও নাকি অনেকে ধরা পড়ে। যাই হোক, এদের কেউ দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় না।

পরণে তেমন কিছু নেই। ছোট ছেলেমেয়েরা নেংটি পরে থাকে। বড়রা গামছা বা কাপড় এবং মেয়েরা শাড়ী পরে। গয়নার চালও আছে—জার্মান সিলভার বা রেশমী চুড়ি। হাতে বুকে উল্কি নিয়ে অনেকে ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টা পায়।

আমাদের যেমন গোত্র আছে, এদেরও তেমনি অনেক গোত্র আছে। গোত্রে গোত্রে বিবাহ হয় না। গোত্র-দেবতা (Totem)কে শ্রদ্ধা দেখায়। কারো বা গোত্র চুবিড় আলু, কারো শাল মাছ, কারো বা গঙ্গাফড়িং। কচি বয়সে বিয়ের রেওয়াজ আছে। বেশীর ভাগ জায়গায় মেয়ে সোমত্ত না হলে বিয়ে হয় না। কচি মেয়ের বিয়ে হলে পরে পুনর্বিবাহ হয় মেয়ে সেয়ানা হলে। বিয়ের পণ ছিল ১০।১২ টাকা, কয়েকখানি কাপড়। কথাবার্ত্তা ঠিক হলে কনের মা থালায় করে দুর্বা ধান গোময় নিয়ে এসে দাঁড়ায়। পনের টাকা রাখা হয় তার উপর। মা টাকা গুণে নেয় আর বরপক্ষ গোময়-ধান-দুর্বা গামছায় বেঁধে নিয়ে যায় বিয়ের স্বীকৃতি হিসাবে। কোথাও বা বিয়ের দিনে বেদী তৈরী হয় সিধা গাছের গোড়া থেকে মাটি এনে। শাল, মহুয়া বা কলা পাতায় তৈরী হয় ছামড়া। মঙ্গল ঘট ওঠে—তাতে রাখা হয় তীর, বিঘ্ননাশক হিসাবে। বরের ভগ্নীপতি বা 'সংবর' হাত বেঁধে দেয়। কোথাও বা হাত বাঁধে কোটাল গোত্রের লোক। কোন মন্ত্র নেই। সিঁদুর দেওয়া আর লোহার খাড়ু পরানো হয়। বাসী বিয়ে হয় বরের বাড়ীতে। মেয়েকে বালিভর্তি গাগ্‌রা তুলে দাঁড়াতে হয় শক্তির পরীক্ষা দিয়ে। কাদা নিয়ে লুকোচুরি খেলা হয় বাসী বিয়ের দিন। বিধবা বিবাহ করা এদের আর এক রীতি। বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকেও সাঙা করে। মেয়ে-পুরুষে ভাল না লাগলে পরস্পরকে বাতিল করে নতুন সাঙ্গালী সঙ্গী জুটিয়ে আবার সংসারী সাজে।

গর্ভাবস্থায় মেয়েরা সাবধানে থাকে। বড়শীতে বা নিতে আটকানো মাছ তাদের খেতে নেই—পোয়াতি কষ্ট পায়। একুশ দিনে জন্মাশৌচ যায়।

মানুষ মারা গেলে তাকে মাটিতে পোঁতা হয়। বর্ণ হিন্দুদের দেখা দেখি কোথাও বা পোড়ানো হয়। দশ দিন বা এক মাস ধরে অশৌচ চলে। অশৌচের সময় মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্যাদি দেওয়া হয়। অশৌচ শেষে হয় মুণ্ডন। মুণ্ডনের দিন 'আঁশ ডুবান' হয়, অর্থাৎ পুকুর বা নদীর ধারে মাথার চুল, বৌ ঝিয়ের হাতের নখ, একটা ছোট মাছ আর চা'ল সিদ্ধ করে পিণ্ডরূপে ভাসান হয় মৃতের উদ্দেশ্যে। শববাহীরা উঠানে রান্না করে খায়। 'প্রেত

হাঁড়ি' ফেলে মাঠের দিকে। পরের দিন ঘি পোড়ান বা শ্রাদ্ধ করেন ঘরের কর্ত্তা, উনুনের পাশে 'ঈশানের' উপর।

এদের নিজেদের সমাজ আছে। গ্রামের মোড়লকে বলা হয় মুখিয়া। যে সংবাদ দেয়, হাকডাক করে তাকে বলা হয় আটঘরিয়া বা ডাকুয়া। পূজা পদ্ধতির জন্যে আছে দেহেরী। দেহেরীকে সাহায্য করবার জন্যে আছে টলিয়া। অসুখবিসুখে গুণীন আসে, ঝাড়ফুঁক করে—অনেক সময় মন্ত্র পড়ে।

গরীব হলে কি হবে, এদেরও পুজাপার্বণ আছে। দুঃখের দিনের ব্যর্থতা দেবদেবীর পূজায় সার্থকতায় ভরে উঠে। উৎসবের দিনে আমোদ আহ্লাদে জীবনটাকে ভরে দিতে চায়—কোথাও বা হাঁড়িয়া চলে। শীতলা হলো এদের প্রধান দেবী—বছরে অনেকবার তাঁর পুজা হয়। ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি শক্ত শক্ত ব্যারাম এঁর খেয়ালের উপর নির্ভর করে। পূজার দিনে দেহেরী মুরগী বা ছাগল বলি দেয়। পুজায় বা পরবে চাঙল বাজে—চাঙল হলো এক বিরাট খঞ্জনী বিশেষ। পুরুষেরা নাচে—বারমাসি গানের ধুয়া তুলে দিকদিগন্তে এক প্লাবন বইয়ে দেয়। নাচের মাদকতায় অনেকের উপর দেবী ভর করেন; তাকে বলে ব্যাকড়া। তার মুখ দিয়ে গ্রামের অনেক ভাল-মন্দ ফিরিস্তি দেন। তাছাড়া 'বড়াম' বা 'গরাম' হলো গ্রাম্য দেবতা। ইনি কিন্তু জঙ্গলের দেবতা—লম্বা-চওড়া, লোমশ শরীর। হাতে কুঠার বা ত্রিশূল। বাঘ বা হাতীর পিঠে চড়ে ইনি ঘুরে বেড়ান। বড়াম ক্ষেপলে গ্রামে বাঘ এসে দৌরাত্ম্য করবে। এঁর প্রীতির জন্যে মুরগী বা পায়রার ব্যবস্থা করতে হয়।

যোগিনী দেবতারও পুজা হয়। গ্রামের প্রান্তে তাঁর ভোজ জোটে। কালো মুরগী বলি দেওয়া হয় যোগিনীর উদ্দেশ্যে। এ ছাড়া গ্রাম-চণ্ডী পূজার বিধান আছে।

এমন দুঃখের দিন লোধাদের ছিল না। তাদের সুখের দিন ছিল। স্বাধীন বন্য জাতি ঘুরে বেড়িয়েছে বন থেকে বনান্তরে নদীর কূলে উপকূলে। ফলমূলের প্রাচুর্য্যে, শিকারের ঘটায়, উৎসবের আতিশয্যে তাদের যে আনন্দ-মুখর দিন ছিল, তা গেছে অবলুপ্ত হয়ে। বন-মাতৃভুমি যে দিন শোষকের শাসনে গেল, সে দিন থেকে তারা হলো প্রকৃত গৃহহীন। দুর্নিবার ক্ষুধার পীড়নে, অত্যাচারীর শোষণে, জীবিকার্জনের ব্যর্থতায় তাদের দেহ-মনে আসে বাঁচবার ক্ষীণ প্রচেষ্টা, অপরাধের পথে হয় তার সমাধান। আবার

বৃটিশ শাসকের বিবেকবিহীন শাসনে তারা নিজেদের অজ্ঞাতে 'স্বভাব-দুর্বৃত্ত' বলে পরিগণিত হয়েছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আজ তারা নিঃসম্বল, দুর্বল ও সংযোগবিহীন এক অপরাধপ্রবণ জাতি। বিশ্বের পরিবর্তনে আবার কি তারা তেমনি করে নিষ্ঠায় সমুজ্জ্বল, বীরত্বে ভাস্বর হয়ে সুস্থ, সবল গৃহীরূপে সাড়া দিতে পারবে ?

ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা ও সমাজ

শ্রীরেণু মিত্র

গান্ধীজী শুধু রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না—তিনি ছিলেন জীবনবিদ্—তাই রাজনীতির জন্যই তিনি রাজনীতি করেন নাই, মানুষকে মানুষ করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছাই তাঁহার সকল প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি যখন ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামে শিক্ষানীতি মানুষের কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন তাহা শুধু মাত্র একটী সাধারণ শিক্ষানীতি ছিল না—তাহা একটী নূতন সমাজ স্থষ্টির ভিত্তিগত প্রয়াস ছিল। বিশ্বের বুকে প্রবলের হাতে দুর্বলের যে শোষণ চলিয়া আসিতেছে, যে অসাম্য ধনিকে শ্রমিকে বর্ত্তমান থাকায় আজ মানুষের অন্তরাত্মা কাঁদিয়া ফিরিতেছে, যাহারই একটা সুরাহা করিবার জন্য রাশিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা মুষ্টিমেয়ের নিকট হইতে রাষ্ট্র ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া রাষ্ট্রকে অগণিত জনসাধারণের প্রতিনিধি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, অথচ রাষ্ট্রহীন সমাজ গড়িতে যাইয়া সকল ক্ষমতা যেখানে আজ রাষ্ট্রেই কেন্দ্রীভূত হইয়া ক্রমে ভগবানকেও স্থানচ্যুত করিয়াছে, বিশ্বের বুক হইতে মানুষের প্রতি মানুষের সেই অত্যাচার বন্ধ করিয়া ভোগ ও প্রতিদ্বান্দ্বতামূলক সংস্কৃতি এবং শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের স্থলে একটী নূতন সমাজ গঠন করিবার প্রেরণাতেই গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার এই নূতন রূপ আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন। একান্ত ব্যক্তিগত ভোগ ও প্রতিযোগিতা বোধ যদি শিশুর জীবন হইতেই উৎখাত করা না যায়, তবে সেই শিশুর দল বড় হইয়া যে নিজের প্রয়োজনে বিশ্বকে চালাইবার চেষ্টা করিবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। আমরা শান্তি শান্তি করি—কিন্তু শান্ত তো

বাহিরের কোন বস্তু নহে, বাহির হইতে ইহাকে তৈরী করিয়া তোলাও যায় না—ইহা মনোবৃত্তির ব্যাপার। পারস্পরিক সহযোগিতাই যে ব্যক্তি বা সমাজের সুষ্ঠু অস্তিত্বের একেবারে গোড়ায় রহিয়াছে—এ বিশ্বে যে আমার অস্তিত্ব তোমার অস্তিত্বদ্বারা সিদ্ধ হয়, তোমার অস্তিত্ব আমার অস্তিত্ব দ্বারা সিদ্ধ হয়—আমার মঙ্গলের সঙ্গে তোমার মঙ্গল যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—একথা যদি শিশুকাল হইতেই না জানি, যদি জানি যে তোমাকে বঞ্চিত করিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিব—ইহাই জীবনের চলার নীতি—তবে শান্তি কেমন করিয়া কোন্ পথে প্রতিষ্ঠিত হইবে? শক্তিতে প্রবল হইয়া ওঠাদ্বারা শান্তি স্থাপিত হয় না—শান্তি স্থাপিত হয় পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণবুদ্ধির ব্যাপক প্রসারের দ্বারা। গান্ধীজী শিশু জীবনের মধ্যেই সহযোগিতা ও কল্যাণ বুদ্ধিকে জাগ্রত করিবার সংকল্প লইয়াই তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রেণী-বৈষম্য ও ভেদবাদের মূলে রহিয়াছে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ। বিশ্বের চিন্তা ধারায়ও যেমন, তেমনি ভারতবর্ষের চিন্তাধারাতেও বুদ্ধি ও হৃদয়ের এই বিরোধ তীব্রভাবে বর্ত্তমান বলিয়াই মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার এমন বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। পাশ্চাত্যের রাজনীতিক্ষেত্রে তাহা ধনিক-শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদী আর শোষিত জনসাধারণ এই রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আর ভারতবর্ষে তাহা বুদ্ধিপ্রধান ব্রাহ্মণের হাতে প্রাণপ্রধান শূদ্র তথা ব্রাহ্মণেতর জাতির অবমাননা রূপে চলিয়া আসিতেছে। কর্ম ছোট হইয়া গিয়াছে, বুদ্ধি তাহার কৌলীন্য চালাইতেছে। এই ভাবে যে বৈষম্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিতে গান্ধীজী কর্মকে প্রথমাবধি পূর্ণ মর্য্যাদায় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, 'My plan to impart primary education through the medium of village handicrafts like spinning and carding etc., is thus conceived as the spearhead of a silent social revolution fraught with the most far reaching consequences.' একটা নীরব অথচ বিরাট সমাজ বিপ্লবের উদ্দেশ্যই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। কর্ম মাত্রকেই আমরা বুদ্ধি অপেক্ষা ছোট করিয়া দেখি আর কতকগুলি কাজকে তো একেবারেই হেয় বলিয়া মনে করি। অথচ যেগুলিকে আমরা ছোট বলি, ঠিক সেইগুলির উপরই আমাদের জীবনের অস্তিত্ব ও স্থিতি। অন্ন বস্ত্র গৃহ ও পরিচ্ছন্নতা—

জীবনের এই সব অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির জন্য পুরাপুরি অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া থাকা অর্থ জীবণ-মরণের চাবিকাঠিটী অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা। অথচ বুদ্ধিপ্রধান সমাজে কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থায় এই পরমুখাপেক্ষিতাই থাকে পুরা মাত্রায়—মানুষের মরণের বীজ অথবা অশান্তির মূলও এইখানে। গান্ধীজী বলিলেন অন্নবস্ত্র এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রত্যেক মানুষের খানিকটা শ্রম প্রত্যহ দিতে পারা অহিংস সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাহা না করিলেই উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হইয়া দাঁড়ায় ও একের হাতে অপরে ক্রমাগতই মার খাইতে থাকে। শোষণহীন সমাজ চাহিলে সর্বপ্রথমে বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমান মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং গুণ ও কর্ম-বিভাগের বিভাগকে স্বাকার করিয়া তাহাদের কোন একটীর সর্বদেশকালপাত্র নিরপেক্ষ কৌলীন্যকে অস্বীকার কারতেই হইবে। অর্থাৎ বুদ্ধি তথা বুদ্ধিমান সকল সময়েই বড় আর কর্ম বা কর্মী সকল সময়েই ছোট—এই মনোভাব দূর করিবার ব্রত লইয়াই গান্ধীজী সাধারণভাবে সকলের জন্যই কর্মকে শিশুজীবনের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন। অর্থ নৈতিক শোষণের পশ্চাতে রহিয়াছে বুদ্ধিগত শোষণ। তাই বুদ্ধি ও শ্রমকে সমান মর্যাদা দিতেই হইবে। তাহা হইলেই ব্রাহ্মণের অত্যাচার হইতেও শূদ্র মুক্তি পাইবে, ধনিকের অত্যাচার হইতে শ্রমিক এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের অত্যাচার হইতে জনসাধারণ মুক্তি পাইবে। শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখিলেই বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা ও সাম্যবাদ চাই অথচ প্রত্যেকের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অন্নবস্ত্র সম্বন্ধে খানিকটা পরিশ্রম করিতে রাজী নই। দাসসুলভ মনোভাব তথা কেন্দ্রীভূত সমাজ ব্যবস্থার মনোবৃত্তি আমাদের রক্তের মধ্যেই এমন স্থায়ী বাসা বাঁধিয়া আছে যে, আমরা অপরের কারখানায় প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে রাজী আছি—বুদ্ধি দিয়াই হউক বা শ্রম দিয়াই হউক—কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য এতটুকু শ্রম করিতেও রাজী নই। তখন বলিব এই বিজ্ঞানের জগতে, এই ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজেসনের যুগে ঐ ব্যবস্থা একেবারেই অচল—সত্যযুগে ফিরিতে পারিব না। আমাদের চিন্তাধারার মধ্যেই যে বিকেন্দ্রীকরণের মনোভাবের একান্ত অভাব—এই সকল যুক্তি তাহাই বিশেষভাবে প্রমাণ করে। তাই পরবর্তী জীবনে বিকেন্দ্রীকরণকে সমাজে ও অর্থনীতিতে রূপ দিতে গেলে শিশুর জীবনের প্রথম পদক্ষেপ গুলি হইতেই ঐ ভাবধারা অনুসরণ করিয়া

চলিতে হইবে। বুদ্ধির ক্ষেত্র স্বভাবতঃই বাধাহীন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। পরবর্তী জীবনের প্রতিযোগিতাকে বন্ধ করিতে হইলে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করিতে কর্মকে প্রথম হইতে গ্রহণ করিতেই হইবে। কেননা কর্মের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রয়োজন এত স্পষ্ট যে, অপরকে বাদ দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। প্রচলিত শিক্ষা যে আমাদের সঙ্গে আমাদের জীবনের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, যে-কর্মের উপর আমাদের জীবনের স্থিতি, তাহার সঙ্গেই দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমাদের কোনো পরিচয় থাকে না। আমাদের মনের গড়ন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভ্যাস সবই কর্ম-বিমুখ হইয়া যায়—কর্মকে অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করিতেও শিখি না, হাত পা দিয়া সম্পন্ন করিতেও শিখি না। ইহাই জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কর্মজীবীকে বুদ্ধিজীবীর অধীন করিয়া তোলে—ইহাতেই অত্যাচার আর শোষণ স্থায়ী হইয়া থাকে। তাই গান্ধীজী নূতন যুগকে যাহারা সৃষ্টি করিবে সেই শিশুর দলকে একেবারে প্রথম দিন হইতে একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় পুষ্ট করিতে চাহিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাই শিশুর উঠাবসা, চলাফেরা কথাবার্তা প্রতিটী অভ্যাস, দাঁতমাজা, পাইখানা করা, খাওয়া, খেলা, নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান করা ও গুছান সব ব্যাপারকেই একটা নূতন রকমে, নূতন দৃষ্টিতে করিবার কথা সেখানে রহিয়াছে। সেটা পারস্পরিক সহযোগিতার দৃষ্টি, ব্যক্তির স্বয়ংমূল্য স্বীকৃতির পরেও সমষ্টির সঙ্গে তাহার অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধের দৃষ্টি—যে সম্পর্ক দেহের প্রত্যেক সেলের (cell) সঙ্গে সমগ্র দেহের। 'Each cell lives for itself as well as for the whole organism ; all the parts are correlatives to the whole, and the whole to the parts'. ইহা জীবিত যন্ত্রের কথা, মৃত যন্ত্রের নহে। জীবিত প্রতিটী সেল নিজের জন্যও বাঁচিয়া থাকে, যেমন বাঁচে সমস্ত দেহযন্ত্রের জন্য ; সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্পর্ক পরস্পরাপেক্ষ। সমাজের ব্যষ্টি যখন সমষ্টির সঙ্গে তাহার সম্পর্ককে এই দৃষ্টিতে দেখিতে শেখে, একটা হাত একটা দেহের পক্ষে যেমন, নিজেকে সমাজের সঙ্গে তেমনই অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া জানে, তখনই ব্যষ্টিও সার্থক, সমাজও সুস্থ। পারস্পরিক সম্পর্কের এই জীবন্ত চিন্তাধারাটা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলেই একটা নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে। আজ নূতন সমাজ সৃষ্টির জন্য, নূতন পরিবেশ রচনা করিয়া তুলিবার জন্য একটা

আকুলতা চারিদিকের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রাশিয়া তাহার নীতিতে বাহিরের দিক হইতে খানিকটা সফলতা অর্জন করিলেও মানুষের অন্তরকে যেমন শুদ্ধ করিতে পারে নাই, তেমনি যুদ্ধকেও বন্ধ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। গান্ধীজী তাই মানুষের আন্তর সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া অর্থনীতিকে যাহাতে রূপ দেওয়া যায়, তাহারই জন্য পথ কাটিতে এই শিক্ষানীতির প্রবর্তন করিয়াছেন। তাই মনে হয় কেবল আমাদের দেশের জন্য নহে, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য, ভবিষ্যৎ বিশ্বে একটী শোষণহীন বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ সৃষ্টির জন্য এই বুনিয়াদী শিক্ষা সকল দেশের পক্ষেই আজ একান্ত প্রয়োজন।

এই সহযোগিতামূলক বৈপ্লবিক চিন্তাধারা কি করিয়া শিশুকে বদলাইয়া দিতে পারে, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

অপরের বাড়ীর লেবু গাছ হইতে আমার ছেলে যখন লেবু চুরী করিল, তখন তাহাকে আমি এই বলিয়া শাসন করিলাম যে, কেন অন্যের বাড়ীর জিনিষ সে লইল? অর্থাৎ তাহার প্রতি আমার ইহাই বক্তব্য থাকে যে, লেবুগাছটা আমাদের নহে, উহা অপরের; অপরের জিনিষ কেন লইব? অপরের জিনিষ চুরী করিলে পাপ হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ চুরী বন্ধ করিতে যাইয়া আমি আমার ছেলেকে আপন পরের ভেদবুদ্ধি শিখাইলাম। ঐ ভাবে শাসন না করিয়া আমি যদি ছেলেকে বলি যাহা তুমি নিজের শ্রমদ্বারা সৃষ্টি কর নাই, কিংবা সবটুকু সৃষ্টি তুমি না কর কিছুটা শ্রমও অন্ততঃ যাহার জন্য তুমি ব্যয় কর নাই, তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার তোমার নাই। লেবুর অধিকারীর সঙ্গে যদি তোমার প্রীতির সম্পর্ক থাকিত তাহা হইলে সেই সম্পর্কেও তুমি তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লেবু লইতে পারিতে; কিন্তু তাহাও যখন নাই তখন নিজের শ্রম দ্বারা যাহা সৃষ্টি কর নাই, তাহা লইলে তোমারও কোন সম্মান থাকে না, অপরের শ্রমের মর্যাদাও লঙ্ঘন করা হয়। এই ভাবে বলিলে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীটা বদলাইয়া গেল। একই সমাজের মধ্যে থাকিয়া প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধের সুরটুকুও নষ্ট হইল না, আপন পরের মনোবৃত্তিও ছেলেকে দেওয়া হইল না, আবার সেই সঙ্গে শ্রমের মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ইহাই সৃজনাত্মক শিক্ষা, সংগঠন এইভাবে সম্ভব। বুনিয়াদী শিক্ষা দ্বারা এইরূপ সৃজনাত্মক মনোভাব জাগাইয়া সমাজে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আনিয়া দেওয়া সম্ভব, তাহাই নূতন সমাজের গোড়া পত্তন করিবে।

শৃণ্বন্তু

শ্রীতপন বসু

অনন্ত বিশ্বের বুকে এক সাম্য নীতি
সমুজ্জ্বল জাগ্রৎ দীপ্ত, অবিরাম গীতি।
ক্ষিতি-অপ্‌-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে এক পরমাত্মীয়,
সংজ্ঞা-বিরহিত-তত্ত্ব—আত্মা অদ্বিতীয়।
আশীর্বাদ-পুষ্ট মোরা অমৃতের সন্তান;
এক আত্মা—এক পথ, সত্য সুমহান।
আলোবাতাসরূপরসগন্ধে ভরা বিশ্বভুবন—
জীবে শিব শিবে জীব লীলা চিরন্তন।
আদিহীন অন্তহীন শ্রান্তিহীন লীলা
অনন্ত প্রেক্ষার এই তত্ত্বগত ইলা!

———

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীভগবান উবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১৩।১

(শ্রীভগবান সপ্তমাধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ আরম্ভ করিয়া বহিঃ সৃষ্টির ক্ষর-অক্ষর বিচার প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহারই সমন্বয়রূপ ভক্তির গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তি যে পুরুষোত্তমমুখী হইয়া বিশ্ব, ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তিকে পুরুষোত্তম-ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার জন্য ধরার ধূলিতে অবতীর্ণ, তাহা দ্বাদশ অধ্যায়ে 'ময্যেব মন আধৎস্ব' ইত্যাদি শ্লোক হইতে 'শ্রেয়ঃ হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ' শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভজনের মধ্যে জীব-ঈশ্বর-বিশ্ব অন্যোন্যমৈথুনে গড়িয়া উঠে ভক্ত রূপে, ভগবান রূপে ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্ররূপে। ভক্তি হইতেছেন পুরুষোত্তম-ছাঁচে সব কিছুকে দ্বিতীয়বার গড়িবার (re-create) পরাশক্তি। এই ভক্তি শরীর ও আত্মার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উঁহাদিগকে দ্বিতীয়বার গড়িয়া তুলিয়া যে-পুরুষোত্তমক্ষেত্র রচনা করেন, সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিচার প্রসঙ্গেই এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে। সপ্তমাধ্যায়ে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞকে অপরা ও পরা প্রকৃতি বলিয়া শ্রীভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।) ইদং শরীরং [এই প্রত্যক্ষ শরীর] হে কৌন্তেয় ক্ষেত্রং [ইহা দ্বারা ক্ষত হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, অথবা ইহার ক্ষয় হয় অথবা ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া যেমন কৃষক সেখান হইতে ফল আহরণ করে, তেমনি এই দেহে যে রূপ বীজ বপন করা হইবে, সেই রূপ ফল পাওয়া যাইবে, এই জন্যই এই শরীর ক্ষেত্র] ইতি অভিধীয়তে [এই প্রকারে ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়] এতৎ [এই শরীর রূপ ক্ষেত্রকে] যঃ [যিনি] বেত্তি [জানেন, পুরুষোত্তম-দৃষ্টিকোণ হইতে ক্ষেত্রের তত্ত্ব অবগত হন, কেবল-ক্ষেত্র ও কেবল-

নিজকে অনন্ত 'অন্তরে' অর্থাৎ দূরে ও নিকটে, সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে ও অপৃথক্‌ভাবে, পরকীয় উপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধে যুক্ত জানেন] তং [সেই পুরুষকে] প্রাহুঃ [পণ্ডিতগণ বলেন] ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি [ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া] (কাহারা বলেন ?) তদ্‌বিদঃ [যাহারা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইকেই জানেন] ('ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা। ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং যে বিদুর্যান্তি তে পরম্'—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর অর্থাৎ অবকাশ, দূরত্ব ও নৈকট্য, পার্থক্য ও তাদাত্ম্য যুগপৎ জ্ঞানচক্ষুতে যাহারা জানেন, এবং ভূত ও প্রকৃতির উপর ভোগের যে শোষণ চলিতেছিল সেই শোষণের চাপ হইতে মুক্ত, ক্ষেত্রজ্ঞের সমকক্ষ রূপে স্থাপিত ভূত ও প্রকৃতিকে যাহারা জানেন, তাঁহারা সেই পর পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্র কেবল, ক্ষেত্রের প্রতি অংশও স্বয়ংপূর্ণ; ক্ষেত্র সমূহের সন্ধিতে রহিয়াছে বিশ্বক্ষেত্র ও বিশ্বেশ্বর। এই অনন্ত ব্যবধানের মাঝেই প্রত্যেক ক্ষেত্র অন্য ক্ষেত্রের সব চেয়ে নিকট। মহামতি আইনষ্টিন প্রমাণ করিয়াছেন যে maximum distance-ই সব চেয়ে সরল রেখা। অনন্ত বিচিত্র বিচিত্র ক্ষেত্রের সমন্বয়ই পুরুষোত্তমক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বজীবঘন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষোত্তম)।

হে কৌন্তেয়, এই দৃশ্যমান শরীরকে 'ক্ষেত্র' এই শব্দে অভিহিত করা যায়; এই ক্ষেত্রকে যিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিৎ পুরুষগণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৩।১

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ১৩।২

(ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ কোন্ কৌশলে উপাধিবিধুর হয়, ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন) ক্ষেত্রজ্ঞং চ অপি [এবং ক্ষেত্রজ্ঞকেও] মাং ['আমি' বলিয়া] বিদ্ধি [জানিও] সর্ব্বক্ষেত্রেষু [সর্ব্বক্ষেত্রে; প্রতি ক্ষেত্রজ্ঞ যখন অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হইবার জন্য পুরুষোত্তম-শরণাগত হন্, তখনই শুধু পুরুষোত্তমের 'আমির' সঙ্গে তাঁহার 'আমি'র তাদাত্ম্যলাভ সম্ভবপর হয়, 'মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতা'। প্রতি ক্ষেত্রের তাহা হইলে দেখিতেছি দুইটি ক্ষেত্রজ্ঞ, দুই মালিক। একজন জীব-ক্ষেত্রজ্ঞ এবং অপর ঈশ্বর-ক্ষেত্রজ্ঞ। কোন্ মালিক সত্য মালিক ? ঈশ্বরই যদি একমাত্র মালিক হন, তবে জীব 'দাস' ছাড়া আর কিছুই নহে। 'তোরা শুধু চাষের মালিক গ্রাসের মালিক নয়'। জীব করে খেত চাষ, ফল ভোগ করেন ঈশ্বর। এইরূপ ঈশ্বর হন শোষক।

তবে কি ঈশ্বরকে সরাইয়া দিয়া জীবকেই ক্ষেত্রের একান্ত মালিক বলিতে হইবে? জীব যদি একান্ত মালিক হয়, তবে অনন্ত ক্ষেত্রের অনন্ত মালিকের দল যে পরস্পরের খেত কাড়িয়া লইবার জন্য পারস্পারিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করিবে, তাহা রোধ করিবে কে? ভিন্ন ভিন্ন মালিকদের মধ্যে সজ্ঘ স্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে এক করিয়া, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেককে সংহত করিয়া এক সমগ্র বিশ্ব গড়িবে কে? প্রতি খেতের মালিক যে প্রতি খেতের স্বয়ং-মালিক, ইহা তো প্রত্যক্ষ সত্য; তাহাদের যে লোভ রহিয়াছে ইহাও তো প্রত্যক্ষ সত্য। সেই জন্যই এমন একজন মালিকের প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে, যিনি প্রতি খেতের ও প্রতি খেতের মালিকের স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকার করিয়া প্রতি স্বয়ং-মূল্যবান খেতগুলিকে সর্ব্ব খেতের সমন্বয়ে গড়িয়া এবং স্বয়ংমূল্যবান ক্ষেত্রজ্ঞ-গুলিকে এক অখণ্ড ক্ষেত্রজ্ঞে সমন্বয় করিতে পারেন। প্রতি খেতের মালিক যদি এই সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞত্বের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ সমন্বয়তত্ত্ব অবগত হন, প্রতি ক্ষেত্রজ্ঞ যদি পুরুষোত্তম 'আমি'কেই 'আমি' বলিয়া অন্যান্য পুরুষোত্তম আমির সঙ্গে সজ্ঘবদ্ধ হয়, প্রতি খেত যদি অন্যান্য খেতের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া সজ্ঘবদ্ধ হয়, তখন কি সংহত, ঘনতাপ্রাপ্ত সর্ব্বক্ষেত্র-সজ্ঘ ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র একই নয়, ঘন সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ সমন্বয়ই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রজ্ঞ নন্? তখনই সর্ব্বক্ষেত্র-সমন্বিত প্রতি ক্ষেত্রের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মালিকদের সম্বন্ধ উপাধিবিধুর সহজ হয়, নিরবদ্য সংযোগে উহারা গড়িয়া উঠে। কোনও বিশেষ খেতের মালিকই নিজের খেতকে বিশ্ব-খেতের সঙ্গে সমন্বয় না করিয়া নিজের খেতের একান্ত মালিক হইতে পারিবে না। মালিক হইতে হইলে চাই প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ খেতকে একজন পোষণঘন সর্ব্বক্ষেত্রাধিপতির সেবায় সমর্পণ করা। এই সমর্পণের ভিতরেই প্রতি খেতের সত্য বাস্তব পারমার্থিক মালিক হইবার কৌশল নিহিত রহিয়াছে। তখন বিশেষ বিশেষ খেতগুলিও 'সামান্য বিশেষে একতারূপ' রতি প্রাপ্ত হইয়া দিব্য খেতে গড়িয়া উঠে। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্রের বিত্তে অধিকার দায়ভাগ স্বীকার করে না, পরন্তু মিতাক্ষরা নিয়মে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেই পিতার সঙ্গে পুত্র সম অধিকার প্রাপ্ত হয়। পুরুষোত্তম দর্শনে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার বিধি সমন্বিত হইয়াছে) ক্ষেত্রক্ষেত্র-জ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের; ক্ষেত্র জীব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-ঈশ্বরের] জ্ঞানং [জ্ঞান, পূর্ব্বোক্তরূপ উপাধিবিধুর সহজ জ্ঞান] যৎ [যাহা] তৎ [তাহাই] মম [আমার] জ্ঞানং মতম্ [অভিমত জ্ঞান]।

হে ভারত, সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞকেও 'আমি' বলিয়া বুঝ; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, তাহাই আমার জ্ঞান বলিয়া অভিমত। ১৩।২

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ১৩।৩

(যদিও চতুর্ব্বিংশতি ভেদভিন্না প্রকৃতিই 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত, তথাপি দেহ রূপে পরিণত এই প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষোত্তম প্রেরণায় অহং ভাবদ্বারা জীব ইহার সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধভাবে যুক্ত হইয়া আছে, যাহা তাহাকে ভক্তিরূপ অভিজ্ঞান দ্বারা পুনরায় উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহার জন্যই 'ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্' এইরূপ বলা হইয়াছে ; তাহাই বিশেষ ভাবে বলা হইতেছে) তৎ [যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই] ক্ষেত্রং [ক্ষেত্র] যৎ চ [স্বরূপতঃ যাহা, অর্থাৎ জড়-চিদ্‌ঘন দৃশ্যাদি-স্বভাব] যাদৃক্ চ [এবং যাদৃশ ইচ্ছাদি-ধর্ম্মক] যদ্বিকারি [যাহা বিকার (পরিণাম) ইহার, তাহা যদ্‌বিকারি] যতঃ চ [এবং যাহা হইতে অর্থাৎ যে প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ হইতে] যৎ [স্থাবর জঙ্গমাদি যে-যে প্রকারে ভিন্ন কার্য্য] সঃ চ [এবং সেই নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ] যঃ [স্বরূপতঃ অর্থাৎ পুরুষোত্তম স্বরূপ] যৎপ্রভাবঃ চ [যে প্রভাব সমূহ (শক্তি সমূহ) যাহার, সে-ই যৎপ্রভাব] তৎ [সেই সব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যাথার্থ্য, যথাবিশেষিত] সমাসেন [সংক্ষেপে] মে [আমার কাছ হইতে] শৃণু [শোন, ধারণ কর]

এই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ যাহা, যে প্রকার, যে যে ইন্দ্রিয়বিকার যুক্ত, যে -রূপে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে উদ্ভূত, স্থাবরাদি ভেদে যেরূপ বিভিন্ন এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা, যেরূপ প্রভাব যুক্ত, তাহা সংক্ষেপে আমার কাছ হইতে শোন। ১৩।৩

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ১৩।৪

(ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যে স্বরূপ ফুটাইয়া তোলা হইবে, তাহারই প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন, যাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের ইহার প্রতি আদরাতিশয্য জাগ্রত হয়) ঋষিভিঃ [গৌতম কণাদাদি ঋষিগণদ্বারা] বহুধা [বহুপ্রকারে পৃথক পৃথক দৃষ্টি কোণ হইতে] গীতঃ [জীবনেরই ভাষায় গানরূপে কথিত] ছন্দোভিঃ বিবিধৈঃ [নানা মশলা মিশাইয়া, নানা ছন্দে, নানা ঢংএ, বিনাইয়া বিনাইয়া বিচিত্র বিচিত্র ভাবে] পৃথক্ [পৃথক্ পৃথক্ ভঙ্গিতে] ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ চ এব [এবং ব্রহ্মসূত্র পদসমূহের দ্বারাও ; ব্রহ্মের সূচক বাক্যসমূহই ব্রহ্মসূত্র, সেই

ব্রহ্মসূত্র দ্বারা ব্রহ্ম পদ্যতে অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ইহারা ব্রহ্মসূত্রপদ ; সেই ব্রহ্মসূত্রপদসমূহ দ্বারাই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-যাথার্থ্য গীত হইয়াছে ; 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'আত্মেত্যেব উপাসীত'—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারা পুরুষোত্তম-আত্মবস্তু জ্ঞাত হয়] হেতুমদ্ভিঃ [যুক্তিযুক্ত] বিনিশ্চিতৈঃ [সামান্য বিশেষের সামঞ্জস্য সম্পাদক, অসন্দিগ্ধ প্রতিপাদক, সংশয়রহিত] (অথবা 'ব্রহ্মসূত্র' পদ দ্বারা বেদান্ত দর্শনও হইতে পারে)।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ঋষিগণ বহুপ্রকারে বিবিধ ছন্দে পৃথক্ পৃথক্ গান করিয়াছেন, এবং নিশ্চিত যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্র পদসমূহ দ্বারাও গান করিয়াছেন। ১৩।৪

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণিদশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ১৩।৫-৬

মহাভূতানি [সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত সমূহ ; 'মহৎ' শব্দের অর্থ বৃহৎ ও ব্যাপক, সকল প্রকার বিকারের ব্যাপক বলিয়া স্থূল পঞ্চভূতের কারণ এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত] অহঙ্কারঃ [মহাভূতের কারণ অহংপ্রত্যয় লক্ষণ অহঙ্কার] বুদ্ধিঃ [অহঙ্কার-কারণ মহত্তত্ত্ব] অব্যক্তম্ এব চ [এবং মহত্তত্ত্বের কারণ পুরুষোত্তম-শক্তি, অব্যক্ত মূলা প্রকৃতি] (ইহারই অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতি) ; ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং [শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ পাণ্যাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়] এবং চ [এবং সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক একাদশ মন] পঞ্চ চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ [স্থূল পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, আকাশাদি গুণযুক্ত ভাবে প্রকাশিত শব্দাদি পঞ্চবিষয় সমূহ ; এই ভাবে সাংখ্য দর্শন চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন]। (তাহার পর এক্ষণে বৈশেষিকগণ যেগুলিকে আত্মার গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সেই ইচ্ছা প্রভৃতি গুণসমূহ এবং বৌদ্ধগণ যে চেতনাকেই ক্ষণিক আত্মা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, সেই চেতনাও যে ক্ষেত্রেরই নিজস্ব ধর্ম্ম এবং পুরুষোত্তম স্তরে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ পরকীয় ভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে তাহা যে ক্ষেত্রজ্ঞেরও ধর্ম্ম, তাহাই ভগবান বলিতেছেন) ইচ্ছা [রাগ ; 'যজ্জাতীয়ং সুখহেতুং অর্থং উপলব্ধবান্ পূর্ব্বং পুনস্তজ্জাতীয়-মুপলভমানঃ তমাদাতুম্ ইচ্ছতি সুখহেতুরিতি সেয়মিচ্ছা অন্তঃকরণধর্ম্মঃ, জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্')] দ্বেষঃ [দ্বেষ, 'যজ্জাতীয়মর্থং দুঃখহেতুত্বেন অনুভূতবান্ পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভমানস্তং দ্বেষ্টি সোয়ং দ্বেষঃ, জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্'] সুখং

[যাহা অনুকূল, প্রসাদময় ও সত্ত্বগুণের পরিণাম তাহাই সুখ ; জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত ইহাও ক্ষেত্রের ধর্ম্ম] দুঃখং [প্রতিকূলবেদনীয়, বাধনালক্ষণ ; জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত তাহাও ক্ষেত্র] সংঘাতঃ [দেহ-ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্তের সংহনন, জমিয়া যাওয়া, শরীর রূপে ঘন হওয়া] চেতনা [দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম্মসমূহের পরস্পরের বিনিময়ের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে পরস্পরকে নিংড়াইয়া সর্ব্বাত্মিকা রসময়ী প্রাণবৃত্তি এবং যে বৃত্তি পুরুষোত্তম চৈতন্যাভাসরূপ ভাবের দ্বারা বিদ্ধ, তাহাই প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বিত চেতনা ; জ্ঞেয়ত্ব হেতু ইহাও ক্ষেত্র, 'যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে'—শ্রীশ্রীচণ্ডী] ধৃতিঃ ['যয়া অবসাদপ্রাপ্তানি দেহেন্দ্রিয়াণি ধ্রিয়ন্তে'—যাহাদ্বারা অবসন্ন দেহেন্দ্রিয় ধৃত হয়, তাহাই ধৃতি ; জ্ঞেয়ত্ব হেতু ইহাও ক্ষেত্র] (সকল প্রকার অন্তঃকরণের যাবতীয় ধর্ম্মকে প্রতিপাদিত করিবার জন্য উপলক্ষণ হিসাবে ইচ্ছাদির গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই ভাবেই উপসংহার করিয়া বলিতেছেন) এতৎ ক্ষেত্রং [এই ক্ষেত্র] সমাসেন [সংক্ষেপে] সবিকারম্ [বিকার বা পরিণামের সহিত সম্বন্ধ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্য বস্তু ক্ষেত্র বলিয়া] উদাহৃতম্ [উক্ত হইয়াছে] (যে ক্ষেত্রভেদসমূহের সংহতি এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হইল, সেই ক্ষেত্রকেই মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ভেদে বিভক্ত করিয়া বলা হইয়াছে)।

ক্ষিত্যাদি পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূলা প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় ও মন, শব্দাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয় আর ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংহতি চেতনা ও ধৈর্য্য—এই কয়েকটী বিকার সমেত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল। ১৩।৬

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ১৩।৭

(ক্ষেত্রজ্ঞের বিশেষণ পরে বলা হইবে। ক্ষেত্র নিরূপণ করিয়া ইদানীং তাহার সঙ্গে অভেদে ও প্রভেদে অনন্ত দূরে ও নিকটে অবস্থিত পুরুষোত্তম যোগসূত্রে প্রথিত ক্ষেত্রজ্ঞের নিরূপণ করিবেন। সেই নিরূপণের পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানের উপযোগী সাধনসমূহ নির্ণয় করিতেছেন।) অমানিত্বম্ [অমানী অর্থাৎ কোন বিশেষ মানদণ্ডকেই, মাপিবার যন্ত্রকেই একমাত্র মানদণ্ড বলিয়া গ্রহণ না করার ভাব এবং সর্ব্ব মানদণ্ডের সমন্বয় রূপ পুরুষোত্তম-মানদণ্ড স্বীকার করাই অমানিত্বম্] অদম্ভিত্বম্ [বিশেষ কোন মানদণ্ডের চাপে অপর তুল্যমূল্য মানদণ্ডগুলিকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজ মানদণ্ডের মাহাত্ম্য প্রকটীকরণই দম্ভিত্ব ; ন দম্ভিত্ব অদম্ভিত্ব] অহিংসা [অন্যের 'মান'কে শোষণ না

করিয়া তাহাকে স্বস্থানে স্থিত থাকিয়া অগ্রসর হইবার সর্ব্ববিধ সুযোগ দেওয়াই অহিংসা] ক্ষান্তিং [আক্রমণ ও আঘাত হাসিমুখে সহ্য করিয়া এবং এই সাধনায় তাহাকে পরিপাক করিয়া ব্রজের পথে চলিবার স্বচ্ছন্দ ভাবই ক্ষান্তি] আর্জ্জবং [পথ চলিবার ঋজুভাব, সরলতা ; অনন্ত প্রসারিত বক্র (curved) পথ সমূহের সমন্বয় রূপ ব্রজ পথে চলার মত দিলদরিয়া ভাবই ঋজু স্বভাব ; কোনও একটি পথকেই একমাত্র পথ ধরিয়া লইয়া চলিতে থাকিলে সে পথ ঋজু হওয়া তো দূরের কথা, বরং বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া অনন্ত জটিলতা কুটিলতার সৃষ্টি করে। সর্ব্বপথ-সমন্বয় বঙ্কিম পথই ঋজু পথ, সরল পথ] আচার্য্যোপাসনং [যাহার জীবনে উপরোক্ত গুণসমূহ মূর্ত্ত হইয়াছে তেমন আচার্য্যের শ্রীচরণ সমীপে আসন গ্রহণ করা, এবং তাঁহার আচরণে আচরণ মিলানোই আচার্য্যো-পাসন] শৌচং [আবিলতা-হীনতা, স্বচ্ছতা] স্থৈর্য্যম্ [ব্রজ পথে স্থির থাকা] আত্মবিনিগ্রহঃ [পুরুষোত্তমাত্মার মাঝে আত্মাকে দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সবটুকু বিশেষের সহিত নিশ্চিতরূপে, নিশ্চিন্তরূপে গ্রহণ করা, হজম করা] (এই সকল উপায় জ্ঞানের সাধন ও আস্বাদন বলিয়াই 'জ্ঞান পদ বাচ্য)।

অভিমানশূন্যতা, দম্ভের অভাব, অহিংসা, ক্ষান্তি, ঋজুতা, আচার্য্যের উপাসন, শৌচ, স্থৈর্য্য ও জিতেন্দ্রিয়তা ॥ ১৩।৭

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ১৩।৮

(আরও) ইন্দ্রিয়ার্থেষু [দৃষ্টাদৃষ্ট শব্দাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সমূহে] বৈরাগ্যং [ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমূহের মধ্যে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া বৈরাগ্য সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ও পুরুষোত্তমানুরাগে নিজের রাগ মিলাইয়া পুরুষোত্তম প্রসাদ জ্ঞানে বিষয় সমূহকে ভোগ করাই সত্য বাস্তব বৈরাগ্য। 'রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্। আত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি'] অনহঙ্কারঃ এব চ [অহঙ্কারাভাবই] জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখ-দোষানুদর্শনম্ [জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখকে অনিত্য, অশুচি দুঃখদ বোধে 'হেয়' প্রতিপন্ন করার মূলে যে 'দোষ' অর্থাৎ রাগদ্বেষ রূপ 'দোষ' এবং সেই দোষের কারণ 'মিথ্যাজ্ঞান' রহিয়াছে, সেই দোষকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবার উপযোগী যে দর্শন তাহা] ('মিথ্যাজ্ঞান' ও রাগদ্বেষ রূপ 'দোষ' পশ্চাতে থাকিলেই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ হয় দোষযুক্ত ; দিব্য

জ্ঞানের উদয়ে মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হইলে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ সবই নির্দ্দোষ, নিত্যনির্ম্মল রসঘন আস্বাদন মাত্র)।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহে বৈরাগ্য, অহঙ্কারের অভাব, এবং জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির মূল কারণ দোষের তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন। (এই সকল সাধন জ্ঞানের আস্বাদন বলিয়াই' জ্ঞান'-পদ বাচ্য)। ১৩।৮

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১৩।৯

অসক্তিঃ [পুরুষোত্তমের বাহিরে রাগদ্বেষ স্তরের সঙ্গ হেতু বিষয়সমূহে আসক্তি রহিত] অনভিষঙ্গঃ [অভিনিবেশ রহিত] পুত্রদারগৃহাদিষু [রাগদ্বেষ স্তরের পুত্র-জায়া-গৃহাদিতে ; 'তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনা তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্। তাবন্মোহঙ্ঘ্রিনিগড়ঃ যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ'] নিত্যং চ [নিত্য] সমচিত্তত্বম্ [তুল্যচিত্ততা] ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু [ইষ্ট সমূহ ও অনিষ্ট সমূহের উপপত্তি অর্থাৎ সং প্রাপ্তিতে] (এই সকল সাধন 'জ্ঞানের' আস্বাদন বলিয়াই 'জ্ঞান'পদ বাচ্য)।

পুরুষোত্তম-স্পর্শহীন বিষয় সমূহে অপ্রীতি, রাগদ্বেষ স্তরে স্থিত পুত্র, পত্নী ও গৃহে অভিনিবেশ রহিত, ইষ্ট এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে অবিকৃতস্বভাব। ১৩।৯

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১৩।১০

ময়ি চ [এবং পুরুষোত্তম-আমিতে] অনন্যযোগেন [অপৃথকবুদ্ধি যোগ দ্বারা] ভক্তিঃ [ভজন] অব্যভিচারিণী [ব্যভিচারহীন ; স্বরূপহীন বিশ্বরূপ কিম্বা বিশ্বরূপ ভজনহীন একান্ত স্বরূপ দুই-ই পুরুষোত্তম দৃষ্টিতে ব্যভিচার, যেমন স্বামী ও স্বামীর সংসারকে পৃথক্ বুদ্ধিতে দেখা প্রেমের দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম ব্যভিচার] (অব্যভিচারিণী ভক্তির আস্বাদন কোথায় কোন্ কৌশলে সম্ভব ?) বিবিক্তদেশসেবিত্বং [সর্ব্বগুহ্যতম একান্ত পুরুষোত্তমকে সমস্ত জীবনে আপনার করিবার সাধনার উপযোগী একান্ত নির্জ্জন স্থান ঐ 'হৃদয়'। হৃদয়-দেশের সেবাই যাহার জীবনব্রত সে-ইবি বিক্তদেশসেবী, তাহার ভাব। বিবিক্ত হৃদ্দেশই বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। কোন্ দেশ হৃদ্য, কোন্ দেশ হৃদয়হীন, তাহাই বাছিয়া বাহির করিতে পারে একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তি] অরতিঃ [অ-রমন, প্রীতি লাভ না করা] জনসংসদি [সংস্কারশূন্য অবিনীত জনগণের সভায়, হট্টগোলের মধ্যে ; 'সতঃ সঙ্গস্ত ভেষজম্'] (এই সকল সাধনই জ্ঞানের সাধন ও আস্বাদন বলিয়া 'জ্ঞান'পদ বাচ্য)।

অনন্যযোগের সহিত অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জন দেশসেবন, প্রাকৃত জনতার সভায় অরুচি। ১৩।১০

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১৩।১১

(আরও) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্ [আত্মা ও দেহ প্রভৃতির যে জ্ঞান, তাহাই অধ্যাত্মজ্ঞান, সেই অধ্যাত্মজ্ঞানের নিত্যভাব অর্থাৎ সর্ব্বদা অনুশীলন] তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্ [অমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানসাধন গুলির ভাবনা পরিপাকের ফলে যে তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ (পরম প্রয়োজন) যে পুরুষোত্তমবস্তু, তাহার দর্শন] এতৎ [এই অমানিত্ব হইতে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন পর্য্যন্ত সাধনগুলিকে] জ্ঞানম্ ইতি ['জ্ঞান' বলিয়া শাস্ত্রে] প্রোক্তম্ [বলা হইয়াছে]; অজ্ঞানং [তাহাই অজ্ঞান] যৎ [যাহা] অতঃ [এই সকল হইতে] অন্যথা [বিপরীত অর্থাৎ মানিত্ব, দম্ভিত্ব, হিংসা, অক্ষান্তি, অনার্জ্জব ইত্যাদি।

সর্ব্বদা অধ্যাত্ম জ্ঞানের অনুশীলন, তত্ত্বজ্ঞানের পরম প্রয়োজন যে পুরুষোত্তম দর্শন—ইহাকেই জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে; এই সকল হইতে যাহা বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান। ১৩।১১

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩।১২

(পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সমন্বয় জ্ঞান দ্বারা কি জ্ঞাতব্য, এইরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে ভগবান বলিতেছেন) জ্ঞেয়ং [জানিবার যোগ্য ; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের 'অন্তর' দর্শনের পূর্ব্বে অমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে যে 'ক্ষেত্র' ক্ষেত্রজ্ঞের 'জ্ঞেয়' ছিল, এখানে সেই ক্ষেত্রকেই 'জ্ঞেয়' রূপে ভগবান বলিতেছেন না। যে 'ক্ষেত্র' সর্ব্ব ক্ষেত্রের সহিত সমন্বিত, জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই ত্রিরূপ ভঙ্গ পূর্ব্বক 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞান'-এর অবশ্যম্ভাবী আস্বাদন-রূপ যে 'জ্ঞেয়' অমানিত্ব প্রভৃতির মন্থনে ক্ষেত্রজ্ঞের বুক নিংড়াইয়া শ্রীক্ষেত্ররূপে গড়িয়া উঠিবে, সেই ক্ষেত্রকেই এখানে জ্ঞেয় বলিয়া ভগবান বলিতেছেন; সেই ক্ষেত্রই 'জ্ঞেয়' ব্রহ্মধাম, ব্রহ্মঘন পুরুষোত্তম ক্ষেত্র] যৎ [যাহা] তৎ [তাহা] প্রবক্ষ্যামি [প্রকৃষ্টরূপে বলিব]; যৎ [যে ব্রহ্মক্ষেত্র] জ্ঞাত্বা [জানিয়া, রসঘন জ্ঞানের ভিতর সৃষ্টি করিয়া] অমৃতম্ [অমৃত] অশ্নুতে [ভোগ করে, একান্ত 'জ্ঞেয়' ক্ষেত্রও অমৃত নয়, আবার বাস্তব ক্ষেত্রকে 'হেয়' বুদ্ধিতে অস্বীকার করিয়া তাহার বাহিরে অপর কোন পৃথক্ 'জ্ঞেয়' ব্রহ্মও অমৃত নন্] (সেই অমৃত

কিরূপ ?) অনাদিমৎ [অনাদি প্রকৃতিমৎ ; আদি নাই যে ক্ষণিক প্রকৃতি-পরিণামের, সেই প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে যুক্ত যিনি, তিনিই অনাদিমৎ ; তিনি অনাদি ও আদিমৎ দুই-ই একাধারে ; যে স্তরে প্রতি আদি ক্ষণ-পরিণাম অনাদি, তিনিই অনাদি-আদিমৎ, অনাদিমৎ। ক্ষণিক প্রকৃতি-পরিণামের প্রত্যেক 'আদি' অতীতের ক্রম পরম্পরার ফল হইলেও যখন তাহার প্রথম আবির্ভাব হয়, তখন তাহা চির নবীন পুরুষোত্তমের স্বয়ংপূর্ণ পরশের ফলে নিতুই নবীন, অনাদি আদিযুক্ত নিত্য বর্ত্তমান রূপেই পরিণত হয়, প্রতিটী আদি ক্ষণ-পরিণাম পুরুষোত্তম চুম্বিত বলিয়াই অনাদি। এই রূপ অনাদি-অনন্ত ক্ষণ পরিণামের সংহতিই প্রকৃতি ; 'অনিত্য তারা তব ইতিহাসে নিত্য নাচন নাচে'—রবীন্দ্রনাথ। ইহাই শ্রীনিত্যগোপালের নিত্যানিত্য সমন্বয়] পরং ব্রহ্ম [পর পুরুষ ব্রহ্ম-পুরুষোত্তম] (ব্রহ্মের পরত্ব কোথায় তাহাই বলিতেছেন) ন সৎ [অস্তির মানদণ্ডে যিনি ধরা দিয়াও অধর, তিনিই 'ন সৎ] (তবে কি তিনি অসৎ ?) তৎ [সেই বস্তুটী] ন অসৎ [অসৎও নন্ ; 'নাই' বলিবার মানদণ্ডে পূর্ণভাবে ধরা পড়িয়াও যিনি অসতের অতীত, তিনি আস্তিকের অস্তি, নাস্তিকের নাস্তি] উচ্যতে [উক্ত হন্ ; পূর্ব্বে বলিয়াছেন—'সদসচ্চাহমর্জ্জুন' ; তাঁহাকে একান্ত সৎ, একান্ত অসৎ, কিম্বা একান্ত 'ন সৎ' বা একান্ত 'ন অসৎ' কিছুই বলা চলিবে না। রাগদ্বেষস্তরের সব থাকা ও না থাকার অতীত-সমন্বিত তিনি পুরুষোত্তমজীবন-প্রবাহ]।

যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি ; যাহাকে জানিয়া অমৃতত্ব মানব লাভ করে, সেই জ্ঞেয় অনাদিমৎ, পরব্রহ্ম ; তিনি সৎও নন্, অসৎও নন্ ॥ ১৩।১২

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩।১৩

('ন সৎ ন অসৎ' অনাদিমৎ পর ব্রহ্ম কোন্ কৌশলে প্রকৃতির প্রতি পরিণামে রহিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন) সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্ (সর্ব্বক্ষেত্রে সমন্বিত থাকিয়া এবং প্রতি অংশ ক্ষেত্রের সবটুকু পরিপূর্ণ করিয়া যাহার পাণি ও পাদ। 'সর্ব্ব' শব্দটীর নিগূঢ় অর্থ আস্বাদন করা প্রয়োজন। পুরুষোত্তম দর্শনে প্রতি অংশও 'সর্ব্ব'। যেমন এক পোয়া দুধকে 'সবখানি' দুধ বলা হয়, এক মণ দুধকেও 'সবখানি' বলা হয়। 'সব' মানুষ বলিলে পাঁচজন মানুষ যেখানে উপস্থিত, সেখানে তাহাদিগকেই 'সব' বলা হয় এবং যেখানে পাঁচ হাজার মানুষ থাকে, তাহাদিগকেও 'সব' বলা হয়। শ্রীনিত্যগোপাল

লিখিয়াছেন ঃ 'অল্প অগ্নিও পুর্ণ, অধিক অগ্নিও পুর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পুর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পুর্ণ।' প্রতি অংশও 'সর্ব্ব' এবং এইরূপ সর্ব্বময় অংশসমূহের সংহতিও 'সর্ব্ব'। এইরূপ অনাদি-আদিমৎ 'সর্ব্ব' পরিণামে তাহার পাণিপাদ ছড়ানো রহিয়াছে। ব্রহ্ম-পাণি-পাদ সব শুচি-অশুচি হজম করিয়া প্রতি শুচি স্থানে, দেব স্থানে, প্রতি অশুচি স্থানে বেশ্যালয়ে—চিন্তামণির গৃহে—সর্ব্বত্রই আপনার প্রভাব বিস্তার করেন। প্রতি অংশ ক্ষেত্রজ্ঞ স্বতঃসিদ্ধ সর্ব্বতঃ পাণিপাদ প্রভৃতি বিশেষণ যুক্ত। এইরূপ বিশেষণযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পুরুষোত্তম হওয়া সম্ভবপর নয়। সব বিশ্বব্যাপারেই যাহার 'হাত' রহিয়াছে, সব ক্ষেত্রেই যাহার 'পা' ফেলিবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে, তিনিই সর্ব্বতঃ পাণিপাদ] সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ [সব ব্যক্তি ও সব বিশ্ব-পরিণামের মধ্যেই রহিয়াছে যাহার দৃষ্টি, যাহার মস্তকে বিশ্বের সব ঘটনা মীমাংসিত হওয়ার জন্য উপস্থিত, যাহার মুখে বিশ্বের সমাধানপুর্ণ অমৃত বাণীই শুধু স্ফুরিত হয়, তিনিই সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ] সর্ব্বতঃ শ্রুতিমান্ [সব কিছু ঘটনাই যাহার শ্রুতিগোচর হইবার সুযোগ পাইয়াছে] লোকে [ভুবনে] সর্ব্বম্ (প্রতি 'সর্ব্বাত্মক' খণ্ড এবং 'সর্ব্বাত্মক' খণ্ডগুলির সংহতিকে) আবৃত্য [সন্তানকে মায়ের মত আবরণ করিয়া রাখার মত আবরণ করিয়া] তিষ্ঠতি [বর্ত্তমান আছেন]।

সেই ব্রহ্মের সকল পরিণামেই হস্তপদ ছড়ানো, সর্ব্ব ব্যাপারেই তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্ব্ব-কিছুই তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, সবকে আবরণ করিয়াই তিনি আছেন। ১৩।১৩

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৩।১৪

(এই অধ্যায়েরই 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা' শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের 'অন্তর' জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিবার কথা বলিয়াছেন, যাহা দশমাধ্যায়ের 'দ্বন্দ্ব সমাস'। সেই 'অন্তর' পদের অর্থ লইয়াই এই শ্লোক বলিতেছেন) সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং [সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গুণের সঙ্গে যাহার অনন্ত অব্যবধানে (অন্তরঙ্গতায়) সেই সেই রূপে আভাস, তিনিই সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস; অন্তরের অব্যবধানে অর্থ ধরিয়াই সর্ব্বেন্দ্রিয় রূপ ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞের নিরবদ্য যোগ বিধান করিতেছেন। প্রতিটী ইন্দ্রিয়ে যখন অন্যান্য ইন্দ্রিয় বর্গ 'একভূয়ং ভূত্বা' ভাসমান হয় এবং এইরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়মান প্রতিটী ইন্দ্রিয় যখন সংহত হয়, তখনই

ইন্দ্রিয়দের গুণসমূহ পুরুষোত্তম-স্বগুণ রূপে ফুটিয়া উঠে ; তখনকার ইন্দ্রিয়গুণ পুরুষোত্তম-গুণদ্বারা নিগূঢ়। এই গুণের সঙ্গে পুরুষোত্তম অভিন্নভাবে যুক্ত] (তবে তো তাঁহাতে গুণে আসক্তি দোষ আপতিত হইতে পারে, তাই 'অন্তর' পদের 'ব্যবধান' অর্থ ধরিয়া বলিতেছেন) সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং [সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সঙ্গে অনন্ত অন্তর ব্যবধান সম্বন্ধ থাকার ফলে তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, তখনই সর্ব্বেন্দ্রিয় পুরুষার্থশূন্য হইয়া 'কেবল', এখানে ক্ষেত্রজ্ঞও কেবল] অসঙ্গং [সর্ব্বের সঙ্গে অনন্ত ব্যবধানে স্থিত বলিয়াই অসঙ্গ] (অথচ) সর্ব্বভৃৎ চ এব [অনন্ত তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সর্ব্বকে ভরণ করিয়া তিনি সর্ব্বভৃৎও] নির্গুণং [প্রতি গুণকে সর্ব্বগুণে সংহত করিয়া সর্ব্বগুণের সঙ্গে যাহার অনন্ত অন্তর (ব্যবধান) সম্বন্ধ, তিনিই নির্গুণ] (অথচ) গুণভোক্তৃ চ [কৈবল্য-প্রাপ্ত প্রতিগুণ ও সর্ব্বগুণের সঙ্গে অব্যবধানে তাদাত্ম্য যুক্ত গুণভোক্তা]।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গুণে তত্তদাকারে ভাসমান অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত, সঙ্গশূন্য অথচ সর্ব্বভৃৎ, এবং গুণ-ভোক্তা নির্গুণ। ১৩।১৪

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৩।১৫

('অন্তর' শব্দের পরস্পর বিপরীত অথচ পুরুষোত্তম জীবনের স্তরে সামঞ্জস্য-যুক্ত অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন) বহিঃ অন্তঃ ভূতানাং [ভূতসমূহের বাহিরে 'কাল'রূপে ও অন্তরে 'পুরুষ'রূপে থাকিয়া যে পুরুষোত্তম অন্তর ও বাহিরের সমন্বয় করিতেছেন, তিনি বাহির হইতেও বাহির, অন্তরেরও অন্তর।] অচরম্ [স্থিতিধর্ম্ম বিশিষ্ট] (অথচ যুগপৎ) চরম্ [গতিধর্ম্ম বিশিষ্ট ; তিনি একান্ত স্থিতিও নন্, একান্ত গতিও নন্। যাহা এক ব্যক্তির দৃষ্টিতে স্থিতি—যেমন চলন্ত নৌকার আরোহীর কাছে চলন্ত নৌকা, তাহাই তীরস্থ ব্যক্তির দৃষ্টিতে গতিসম্পন্ন, পক্ষান্তরে যাহা চলন্ত নৌকার আরোহীর দৃষ্টিতে 'গতি' সম্পন্ন—যেমন তীরের বৃক্ষাদি—তাহাই তীরস্থ ব্যক্তির দৃষ্টিতে 'স্থিতি'ধর্ম্ম বিশিষ্ট। কাহাকে 'স্থিতি' বলিবে ? কাহাকে 'গতি' বলিবে ? তীরস্থ গাছ বা চলন্ত নৌকা এমন একটী স্তরের 'ঘটনা', যাহাকে দুই দৃষ্টিকোণ হইতে সমভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। যাহা দুইয়েরই অতীত অথচ দুই দৃষ্টিই যাহাতে সমন্বিত, সেই স্তরই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, তাহারই নিগূঢ় তত্ত্ব পুরুষোত্তম উদ্ঘাটিত করিতেছেন] সূক্ষ্মত্বাৎ [একান্ত স্থিতি হইতেও সূক্ষ্মত্ব, একান্ত গতি হইতেও সূক্ষ্মত্ব হেতু] তৎ [সেই পরব্রহ্ম] অবিজ্ঞেয়ং [স্থিতির মানেও অবিজ্ঞেয়, গতির মানেও অবিজ্ঞেয়] দূরস্থং চ [অনন্ত দূরে অর্থাৎ অন্তরে] অন্তিকে চ [যুগপৎ অনন্ত নিকটে অর্থাৎ অন্তরে] তৎ [সেই ব্রহ্মবস্তু]।

সেই জ্ঞেয় পরব্রহ্ম ভূতগণের অন্তরে ও বাহিরে ; স্থিতিও তিনি, গতিও তিনি ; সূক্ষ্মত্ব হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়, তিনি যুগপৎ অনন্ত দূরে, অনন্ত নিকটে। ১৩।১৫

ক্রমশঃ

সাময়িকী

জগৎ সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ আসন: সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ শ্রীনিত্যগোপাল ৭০ বৎসর পুর্ব্বে যে দর্শন বাঙ্গালীর কাছে রাখিয়া গিয়াছেন, আজ তাহাই সর্ব্বক্ষেত্রে—রাজনীতিতে অর্থনীতিতে সমাজনীতিতে—স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। তিনি লিখিতেছেন 'আমি অভেদবাদীও বটে প্রভেদবাদীও বটে।'—'আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবান এক ও বহুর অতীতও বটেন।' 'সমস্ত আর্য্যশাস্ত্র আলোচনা করিলে এক ও বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে।' ভারতবর্ষ এই দার্শনিক ভিত্তির উপর তাহার পরিবার সমাজ রাষ্ট্র, নর-নারী সম্পর্ক, উচ্চ-নীচ সম্পর্ক, সরকারী বেসরকারী সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে। এখানে কোনও একই বহুকে মুছিয়া ফেলিতে, বহুর বহুত্ব ঘুচাইয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হইতে পারিবে না। এখানের 'একত্ব' সংখ্যার একত্ব' (numerical unity) নয়, এই একত্ব জীবনগত (organic)। শ্রীনিত্যগোপাল এই 'এক' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'একম্' শব্দও একটী সংখ্যা। সেইজন্য 'একম্' প্রাকৃত। সেই জন্য 'একম্' অনাত্মারই এক প্রকার বিকাশ। সেইজন্য ব্রহ্ম 'একম্' নহেন। 'একম্' শব্দ আত্মা নহেন বলিয়া, 'একম্' শব্দকেও নিত্য বলা যায় না। সুতরাং 'একম্' শব্দের অর্থ যাহা, তাহাও ব্রহ্ম নহেন্ স্বীকার করিতে হয়। তুমি এক ব্রহ্ম বলিলেই কি তিনি বাড়িবেন। কারণ সেই 'এক' ত কেবল তাঁহাকেই বলা হয় না। এক চন্দ্র এক সূর্য্য একাকাশ প্রভৃতিও বলা যায়'।

সকল বহুর বহুত্ব সম্পূর্ণ অটুট রাখিয়া যে 'এক', সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' একম্-এর কথাই শ্রুতি শুনাইয়াছেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি দর্শন সমূহকে খণ্ডন করিয়া বেদান্ত দর্শনের এক ও অদ্বিতীয় হইবার দুঃসাহসের পুর্ণ প্রতিবাদ শ্রীনিত্যগোপাল। শ্রীনিত্যগোপাল বহুদর্শন-বাদী ও একদর্শনবাদী, প্রভেদ-দর্শনবাদী ও অভেদ-দর্শনবাদী। তিনি সর্ব্বদর্শন সমন্বয়মূর্ত্তি। ইহা যেমন দর্শন ক্ষেত্রে, তেমনি জাতিক্ষেত্রেও তিনি সর্ব্বজাতি সমন্বয়-মূর্ত্তি। কোনও বিশেষ জাতি অপর সব জাতিকে কুক্ষিগত

করিয়া, নিজের সত্তার মাঝে অপরের স্বয়ংমূল্যবান সত্তাগুলিকে নিক্ষিপ্ত করিবার পথে পা বাড়াইয়াছে, শ্রীনিত্যগোপাল ইহার মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ। বিশ্বে যত জাতি আছে, তাহারা সকলে যে যাহার বিশেষত্বের পরিপুর্ণত্ব আস্বাদন করিয়া এবং অপরের পরিপুর্ণতাকেও তুল্যভাবে মর্য্যাদা দিয়া উহাদের সঙ্গে সমন্বিত বা co-existed থাকিবার জন্য আকুপাকু করিবে, ইহাই শ্রীনিত্যগোপালের প্রাণধর্ম্ম। সকল মতবাদের (-ism) ক্ষেত্রেই, তাহা ধর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজক্ষেত্রে বা রাষ্ট্র ক্ষেত্রে যে কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন, শ্রীনিত্যগোপাল অভেদবাদী ও প্রভেদবাদী। একান্ত কম্যুনিজম বিশ্বে চলিবে, ইহা অসম্ভব। বিশ্বের জীবনী শক্তি তাহার একত্বকে মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে সকলের সঙ্গে একীভূত করিবেই।

গত ২১ ডিসেম্বর ভারত সরকারের অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্তের বিতর্ক-কালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে যে আশা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীনিত্যগোপাল প্রবর্ত্তিত প্রভেদবাদ ও অভেদবাদের সমন্বয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমাজতন্ত্রের কথা তিনি ইতঃপুর্ব্বেও বহুবার বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় লোক সভার বুকে দাঁড়াইয়া তিনি সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট ভাষায় এই যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। আজ এই আদর্শকে ভারতবর্ষের সর্ব্বক্ষেত্রের জনগণকে বুঝিতে হইবে, হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে এবং উহাকে কার্য্যাত্মক ভাবে আস্বাদন করিতে হইবে।

সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে ভারতকে সংগঠিত করিতে হইলে কোন্ পথে তাহা সিদ্ধ হইবে? আদর্শ যেমন অপুর্ব্ব, পথও হওয়া চাই তাহার অপুর্ব্ব। বহুর অন্তর্গত কোনও একটী যখন অপরগুলিকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজ ঐক্যের মাঝে অনেকত্বকে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া বহুকে 'এক' করিতে চায়, তখনকার পন্থা, আর বহুর বহুত্বের মর্য্যাদা অটুট রাখিয়া যখন কোনও একটী যে পথে সকলকে সকল রাখিয়া এক হইতে চায়—এই দুই পথ তো ভিন্ন হইতে বাধ্য। ভারত তাই তো কোনও ব্লকে যোগ দিবে না, পরস্পরবিবদমান কোনও পথকেই বরণ করিবে না। তাই ভারতবর্ষ 'প্রাণের পথে'ই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চায়। এই প্রাণ-পথ মনের স্তরের উর্দ্ধে। মনকে সম্বল করিয়া বিশ্বে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি আজ চলিবে না। মনের পথ সঙ্ঘর্ষের পথ, প্রাণের পথই সমন্বয়ের পথ। ভারতবর্ষ প্রাণোপাসক। প্রাণধর্ম্মী ভারতবর্ষ কি

ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের পথ, বিরোধের পথ, শ্রেণী-সঙ্ঘাত ও দ্বন্দ্বের পথ বাছিয়া লইতে পারে ? মনের পথ মনোজ কামের পথ, সব কিছু লইয়া কড়াকাড়ির বাড়াবাড়ির পথ। ও পথ বিশ্বের অন্তরাত্মা পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে রওনা হইয়াছে। শ্রীনেহরু তাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন : যত শীঘ্র সম্ভব এবং যত দ্রুত সম্ভব শান্তিপূর্ণ পথে ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সকলের স্বীকৃতি সম্মতি ও সমর্থনের মধ্য দিয়া এবং জনসাধারণের বড় একটী অংশের প্রাণখোলা সহযোগিতায় এই দেশকে তাহার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে। 'Short-cut' নীতির মাধ্যমে অপরগুলিকে মুছিয়া কোনও একের ডিক্টেটারসীপের সাহায্যে আপাত দৃষ্টিতে পথ সহজ হইতে পারে, কিন্তু যে সংসারটা নিজেই বঙ্কিম (আইনষ্টিনের ভাষায় curved), সেখানে পথ সহজ করিতে গেলে সে পথ সহজ না হইয়া জটিল হইতে জটিলতর জটিলতম হইতে থাকে, তাহা আজ বৈজ্ঞানিকেরা পর্য্যন্ত ধরিয়া ফেলিয়াছেন। Maximum distance is the shortest distance'—ইহাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত, সকলকে সঙ্গে লইয়া যে পথ, তাহা ব্রহ্মপথ, সত্য সনাতন ভারতীয় পথ। তাই ভারতবর্ষ কাহাকেও আঘাত করে নাই, করিবে না।

কেহ কেহ রাতারাতি অপরকে নিশ্চিহ্ন করিয়া একত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের শান্তি আনিবার, একটা অঘটন ঘটাইবার কথা ভাবেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীনেহরু বলিয়াছেন : ইহাদের মনে রাখা উচিত যে, ভারত এক বিরাট প্রাচীন দেশ, কোটি কোটি নরনারীর অধ্যুষিত এক দেশ। এই দেশ প্রাচীন রীতিনীতির সহিত জড়িত। এই বিরাট দেশে কত লোক বাস করিতেছে, দার্শনিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতির কতপ্রকার বিভিন্ন এমন কি পরস্পরবিরুদ্ধ কত প্রকার স্তরেই না বসবাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে শুধু পার্থক্যই নাই, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধও। সমাজের মানুষে মানুষে পার্থক্য না থাকুক, ইহা আমরা সকলেই চাই, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষ একটী পন্থা অনুসরণ করিয়াই ভারতকে চলিতে হইবে। সমাজে দ্রুত ও আমূল পরিবর্ত্তনের অত্যাগ্রহে 'ডিক্টেটরী চাবুক' লাগাইয়া সংগঠনের ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য হারাইয়া বিরোধ, সঙ্ঘাত ও অশান্তির পথে ভারত তাহা করিতে পারিবে না। যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত শান্তির এই পথই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে

এবং জয়ী হইয়াছে, তেমনি ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য ভারত শান্তি ও সহযোগিতার পথই গ্রহণ করিবে। এই পথে কিছু বিলম্ব হইতে পারে, কিছুটা আর্থিক ব্যয় হইতে পারে, তথাপি ভারতের স্থিতি ও অগ্রগতির ইহাই ধ্রুব পথ। দৃষ্টান্তস্বরূপে শ্রীনেহরু দেশীয় রাজ্যগুলির বিলোপ সাধনের কথার উল্লেখ করেন। এই বিরাট সমস্যা সহযোগিতা ও শান্তির পথেই মীমাংসিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির জন্য যে অর্থব্যয় হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার কোন প্রয়োজনই ছিল না; দেশীয় নৃপতিগণের সম্মতি অসম্মতির কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া উহাদের অন্তর্ভুক্তি ঘটানো যাইত। এই সমস্যার সমাধানের পথে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা কম নয় সত্য, কিন্তু অন্য পথে যে বিঘ্ন, অশান্তি ও বিরোধ আত্মপ্রকাশ করিত, তাহার ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় এই অর্থব্যয় অকিঞ্চিৎকর।

যাহারা ভারতের শিল্পপ্রচেষ্টা অগৌণে রাষ্ট্রীয়করণের দাবী উপস্থিত করেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, এদেশে এখনও শিল্পে বেসরকারী অংশ সরকারী অংশ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, অধিক গুরুত্বপুর্ণ। সুতরাং ইহাদের সামগ্রিক সহযোগিতা ও সম্মতি ভিন্ন বাধ্যতামূলকভাবে সহসা কিছু করিতে গেলে সমাজে যে বিপর্যয় দেখা দিবে, তাহাতে সমাজের কল্যাণ হইবে না। বলা বাহুল্য, বাধ্যতামূলকভাবে শিল্পকে সরকারী করিয়া তোলার একটা সীমা আছে। এ ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব বিরোধ ও সজ্ঘাত এড়াইয়া শান্তিপুর্ণভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া যাইতে হইবে। এই পথে ভারত অনেকটা অগ্রসরও হইয়াছে। যাহারা বলেন, ভারত মোটেই উন্নতির পথে যাইতে পারিতেছে না, শ্রীনেহরু তাহাদের 'ভারতের কোনকিছু ভাল' না দেখিবার' অশোভন ও দেশের ক্ষতিকর দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

উপনিষদের প্রাণ-উপাসনা আজ ভারতবর্ষ বিশ্বের সর্ব্ব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত। বিশ্ব এইবার নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিবে। প্রাণ স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় সর্ব্বপ্রকার ভেদকে দূর করিয়া এক অখণ্ড বিশ্ব রচনা করিবার বীর্য্য রাখে। শ্রীনিত্যগোপাল সকল বহুকে বহু রাখিয়া 'এক' হওয়ার কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি 'অদ্বিতীয়' পদের 'দ্বিতীয়াধিক' অর্থ করিয়াছেন। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় অর্থাৎ তিনি এক হইয়াও প্রথম দ্বিতীয়

তৃতীয় প্রভৃতি 'সর্ব্ব'কে নিজের বুকে ধারণ করিয়া আছেন। এক ব্রহ্মের সঙ্গে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ প্রভৃতি সর্ব্ব সংখ্যক বস্তুর সমন্বয় করিবার দিন আসিয়াছে। গত ২৩শে ডিসেম্বর নয়াদিল্লী হইতে মার্শাল টিটো ও শ্রীনেহরুর যে যৌথ বিবৃতি বাহির হইয়াছে তাহাতে ঘোষিত হইয়াছে যে, 'বলপ্রয়োগ অথবা সমরাস্ত্র সংগ্রহের ভিত্তিতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না এবং বলপ্রয়োগ অথবা সমরাস্ত্র সংগ্রহ আলোচনা চালাইবার অথবা সঙ্ঘর্ষের অবসান ঘটাইবার উপায়ও হইতে পারে না।' তাঁহারা আরও ঘোষণা করিয়াছেন যে, সহ-অস্তিত্বের নীতির ব্যাপকতর প্রয়োগ হইতে পারে এবং উহা যদি স্বীকৃত হয় তবে উহাদ্বারা বিশ্বের উত্তেজনার ভাব বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্বের নীতি শুধু বিকল্প উপায় রূপে গ্রহণ না করিয়া অপরিহার্য্য পন্থারূপে গ্রহণ করিলে বিশ্ববাসীর প্রগতি তথা সভ্যতা রক্ষার আশা সফল হইবে।

প্রাণ উপাসক, এক ও বহুর সমন্বয় সাধক ভারতবর্ষ যে প্রাণকে বাহিরের বিশ্বেই আস্বাদন করিবে তাহা নয়, তাহা ঘরের প্রভেদগুলিকে, স্ব-গত ভেদগুলিকেও অভেদে অদ্বিতীয়তে গড়িয়া তুলিবে। নয়াদিল্লীতে আসাম হইতে নির্ব্বাচিত। সংসদ সদস্য শ্রীমতী বি খগুমেনের আহ্বান ক্রমে দুইদিন ব্যাপী খণ্ডজাতি সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন : যে সমস্ত নাম ও বর্ণনা খণ্ডজাতি সমূহের ও ভারতের অন্যান্য অধিবাসীর মধ্যে আদর্শ ও মনস্তত্ত্বের দিক হইতে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তাহা সমস্ত দূরীভূত করাই সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য। দেশের খণ্ড জাতি হইতে অন্যান্য লোক পৃথক—এইরূপ চিন্তা হইতে বিরত থাকা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হইতে মুক্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে উচিত। তিনি সমতলের অধিবাসীগণ ও খণ্ডজাতিসমূহের মধ্যে ক্ষতিকর মানসিক রোগ দূরীকরণ এবং ভারতের অবশিষ্টাংশের অধিবাসীদের মত খণ্ডজাতি সমূহের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ভারতের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং তথাকথিত সভ্যতার 'মিথ্যা উৎকর্ষ সূচক বিষয়সমূহে' অভ্যস্ত না হইয়া খণ্ডজাতিসমূহের স্ব স্ব মৌলিক সত্য আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভের প্রয়োজনের উপরই সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রাণ-দর্শনে বিশ্বের প্রতিটী খণ্ড, প্রতিটী জীব, প্রতিটী মানুষ, প্রতিটী দর্শন, প্রতিটী মতবাদ (ism), প্রতিটী ধর্ম্ম, প্রতিটী জাতি স্বয়ংপূর্ণ, স্বয়ং মূল্যবান, 'কেবল'।

'কেবল' এই সর্ব্বকে ব্রহ্মরূপে আস্বাদন করিয়া ভারত ইহাদের দ্বারা একটী মালা গাঁথিবে এবং তাহা বনমালীর গলায় পরাইয়া কৃতার্থ হইবে। ভারত ছাড়া আর কোন্ 'এক' আছে যে 'প্রথম' হইয়াও সকল দ্বিতীয়-তৃতীয়কে বুকে লইয়া এক অদ্বিতীয় হইবার দুঃসাহস পোষণ করে? প্রাণ-পুরুষ পুরুষোত্তম স্পর্শে ভারত সেই 'বল' লাভ করিয়াছে। প্রতিটী অণুর মৌলিক ব্রহ্মত্বকে বিকশিত করিয়া ভারত সর্ব্ব দর্শন-সমন্বয়, সর্ব্ব মতবাদ-সমন্বয়, সর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয়, সর্ব্ব জাতি-সমন্বয় আস্বাদন করিবে। ভারতবর্ষের বেদমন্ত্র 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'—সব এই-কিছু ব্রহ্ম। অনন্ত ব্রহ্ম-সম্ভাবনা রহিয়াছে সভ্য ও অসভ্যদের বুকের মধ্যে। কিসের অহঙ্কার তোমার নিজ কৃষ্টির জন্য? সকলের বুকে নিহিত ব্রহ্মবস্তুকে আজ প্রাণের উষ্ণ স্পর্শে জাগাইয়া জপ করিতে হইবে 'একোঽহম্ বহু স্যাম্'-মন্ত্র। সত্য বটে স্বরূপতঃ সব-কিছু ব্রহ্ম-বস্তু, কিন্তু কৃষ্টির ক্ষেত্রে, প্রকাশের ক্ষেত্রে তো সব 'ব্রহ্ম' হইয়া প্রকাশিত হইবে না। সর্ব্বের ব্রহ্ম-প্রকাশকে আদর্শরূপে সামনে রাখিয়া 'বহু' কে ব্রহ্মের 'হওয়া'র মধ্যে আকর্ষণ করা সম্ভব। সব-কিছু যদি আদর্শের ক্ষেত্রে, জাগ্রতের ক্ষেত্রে ব্রহ্ম বনিয়া যায়, সৃষ্টি বন্ধ হইবে। অথচ মায়া অনাদি অনন্ত বলিয়া সৃষ্টিও অনাদি অনন্ত। কোনও দিনই সামাজিক ভাবে এই জাগ্রতের ক্ষেত্রে এই বিশ্ব চূড়ান্তরূপে ব্রহ্মময় রূপে গড়িয়া উঠিবে না। এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ সাধনাই মুক্তির সাধনা, ভারতের সাধনা। সৃষ্টির ক্ষেত্রে, হওয়ার (Becoming) ক্ষেত্রে বহু সব-কিছু ব্রহ্ম হন। কিন্তু অনন্ত কালেও তাহার 'ব্রহ্ম' হওয়া শেষ হইবে না। তাই সেই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য প্রাণপণ সাধনা বরণ করিয়া যাওয়াই ভারতের প্রাণ-সাধনা। ব্রহ্ম (Being) হইলেন সর্ব্বের ক্ষেত্রে; কিন্তু ব্রহ্ম-ভবন (Becoming) হইতেছেন 'বহুর' ক্ষেত্রে। 'বহু'কে সর্ব্বের 'ব্রহ্ম'রূপে গড়িয়া তুলিবার সাধনা প্রেমোন্মাদ, দিব্যোন্মাদ ভারতবর্ষ বরণ করিয়া লইয়াছে। 'ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'—সেদিন অদূরে। বর্ত্তমান যুগ-স্রষ্টা সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন। বন্দেমাতরম্।

শ্রীনিত্যগোপাল জন্ম-শতবার্ষিকী: বিগত ১৬ই ডিসেম্বর কালনা (বর্ধমান) শহরে 'জ্ঞানানন্দ মঠে'র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ নিত্যগৌরবানন্দ অবধূতের ৬১তম জন্মতিথি উপলক্ষে ১৬ই হইতে ১৯শে পর্য্যন্ত নানা অনুষ্ঠানাদি সহ শ্রীনিত্যগোপাল শতবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হইয়াছে।

শ্রীনিত্যগোপালের নূতন মন্দিরে প্রবেশ, হোম, বিশেষ পূজা, ভোগরাগ আরত্রিক, অহোরাত্র কীর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়। ১৬ই তারিখে প্রায় তিন হাজার নরনারী প্রসাদ পান। ১৭ই তারিখে শ্রীনিত্যগোপালের সুবৃহৎ প্রতিকৃতিসহ এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা সমস্ত কালনা সহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। ১৯শে ডিসেম্বর কালনার পৌরপ্রধান শ্রীসুধাংশু-ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রীমৎ নিত্যগৌরবানন্দ মহারাজের গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও তত্ত্বালোচনার জন্য এক মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান-অতিথিরূপে ধর্ম্মের সামাজিক রূপের কথা বলিয়া বিশ্বশান্তির জন্য রাজনীতিকে যে অধ্যাত্মবাদী হইতে হইবে, সে কথা তাঁহার বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেন। অতঃপর শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত শ্রীনিত্যগোপালের সর্ব্বাঙ্গীণ বিপ্লবাত্মক জীবনবাদের পরিচয় দিয়া বলেন যে, আমাদিগকে অধ্যাত্মবাদী অবশ্যই হইতে হইবে, কিন্তু সে অধ্যাত্মবাদ প্রচলিত অধ্যাত্মবাদ নহে, যেখানে বাস্তবজীবনের সঙ্গে তাহার বিরোধ আছে। শ্রীনিত্যগোপাল বাস্তববাদকে অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে সমমূল্যে স্বীকার করিয়া এক ব্যাপকতর সমন্বয়ের বার্ত্তা কহিয়া গিয়াছেন। তাই যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধর পার্থের সম্মিলিত সাধনাই বর্ত্তমান বিশ্বের সাধনা। শ্রীকৃষ্ণের যোগেশ্বরত্ব বাদ দিলে পার্থের ধনুর্দ্ধরত্ব পাশ্চাত্যের মত অপরকে বিনষ্ট করিয়া নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় পর্য্যবসিত হয়; আবার পার্থের ধনুর্দ্ধরত্ব বাদ দিয়া অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘ সাত শত বৎসর কাল পরের গোলামী করে। শ্রীনিত্যগোপালপ্রদত্ত নারীর জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ রূপের খবর দিয়া বক্তা বলেন যে কালী হইলেন নারীর জননীত্বের ব্রহ্মময়ী রূপ, আর নারীর রমণীত্বের ব্রহ্মময়ী রূপ শ্রীরাধা। এই উভয় রূপের সম্মিলনেই নারীর পূর্ণ সার্থকতা।

বর্ত্তমান বিশ্বের রাজনীতিতে ভারতের সহ অবস্থান নীতিই বিশ্বশান্তির পক্ষে একমাত্র সত্য পথ বলিয়া বক্তা অভিমত ব্যক্ত করেন। এই সহ-অবস্থান নীতি ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়, সর্ব্ব দর্শন সমন্বয়, সর্ব্ব ইষ্ট সমন্বয়, সর্ব্ব পথ সমন্বয় করা আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই সকলের ধর্ম্ম, প্রত্যেক দর্শনই সকলের দর্শন, প্রত্যেক ইষ্টই সকলের ইষ্ট, প্রত্যেক পথই সকলের পথ। প্রত্যেক মানুষ যখন প্রত্যেক

ধর্ম্মকে, প্রত্যেক দর্শনকে, প্রত্যেক ইষ্টকে, প্রত্যেক পথকে নিজেরই বলিয়া আস্বাদন করিতে যত্নবান হইবে, তখনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যকার মিলন সম্ভব। অন্যথা তোমার পথ তোমার, আমার পথ আমার—এ অবস্থায় মিলন একান্তই বাহিরের জিনিষ হইয়া পড়ে। সমন্বয় বলিতে এতখানিই বুঝায়। জীবনকে এতখানি গভীর ও ব্যাপক করিয়া দেখিলেই অধ্যাত্ম জগতে ও বাস্তব জীবনে একই নীতি অনুসরণের ফলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

কিন্তু বুদ্ধি মানুষকে একই সঙ্গে এতখানি গভীরতা ও ব্যাপকতা দান করিতে পারে না। একমাত্র প্রাণের উদার ঔদার্য্যের মধ্যেই মানুষ এতখানি বড় হইতে পারে। এই পৃথিবীতে এক সময়ে মানুষ প্রাণ-সাধক ছিল—কিন্তু সভ্যতার মধ্য দিয়া ক্রমে সে একান্ত বুদ্ধিমান হইয়া উঠে, তাই ডিপ্লোমেসি আজ আর শুধু রাজনীতিতে নাই—পিতাপুত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে পরিবারে পরিবারে—ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র। এই ডিপ্লোমেসির স্থলে বুদ্ধিকে পরিপাক করিয়া যে প্রাণধর্ম্ম উপনিষদে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই প্রাণধর্ম্মকে আজ আবার সভ্যতার মধ্যে আনিতে হইবে। ইহাই শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-দর্শন।

শ্রীজগদীশ প্রেস—৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।